ধর্মচিন্তা :

রবীন্দ্ররচনা-সংকলন

প্রথম প্রকাশ তাং: ১৯৫৩

সূচীপত্র:

তিন। ব্রহ্মভাবনা: উপলব্ধির আলোকে

চার। 'তোমায় আমায় মিলন হবে বলে' : রসের সাধনা

পাঁচ। 'আপনি আমার কোন্‌খানে' : সহজের সাধনা

সাত। সংযোজন ১

সংযোজন ২

আমার ভগবান মানুষের যা শ্রেষ্ঠ তাই নিয়ে।"

২৩ এপ্রিল ১৯৩১, হেমন্তবালা দেবীকে চিঠি, চিঠিপত্র-৯

"…মানুষের যে-কোনো প্রকাশে মহিমা আছে, বিজ্ঞানে দর্শনে শিল্পে সাহিত্যে, অর্থাৎ যাতে সে এমন কিছুকে প্রকাশ করে যার মধ্যে পূর্ণতার সাধনা আছে। এ সমস্তই মানুষের সম্পদ, ক্ষণজীবী পশুমানুষের নয়, কিন্তু সেই চিরমানবের,—ইতিহাস যার মধ্যে দিয়ে ক্রমাগতই বর্বরতার প্রাদেশিকতার সাম্প্রদায়িকতার বন্ধন কাটিয়ে সর্বজনীন সত্যরূপকে উদ্ঘাটিত করছে,।"

২০ জুলাই ১৯৩৯, হেমন্তবালা দেবীর চিঠি, চিঠিপত্র-৯

"এই বিশ্বরচনায় বিস্ময়কারিতা আছে, চারি দিকেই আছে অনির্বচনীয়তা ·· বাল্যকাল থেকে অতি নিবিড় আনন্দ পেয়েছি বিশ্বদৃশ্যে। সেই আনন্দবোধের চেয়ে সহজ পূজা আর কিছু হতে পারে না, সেই পূজার দীক্ষা বাইরে থেকে নয়, তার মন্ত্র নিজেই রচনা করে এসেছি।"

১ বৈশাখ ১৩৪৭ (১৯৪০ এপ্রিল), আত্মপরিচয়, র ১০/২১৯-২০

প্রতিকৃতি : কলম্বো, ১৯৩৪

১৭২

১৭৩

১৭৪

১৭৫

১৭৬

১৭৭

১৭৮

১৭৯

১৮০

সং

১৮১

১৮২

১৮৩

১৮৪

১৮৫

১৮৬

১৮৭

ভূমিকা
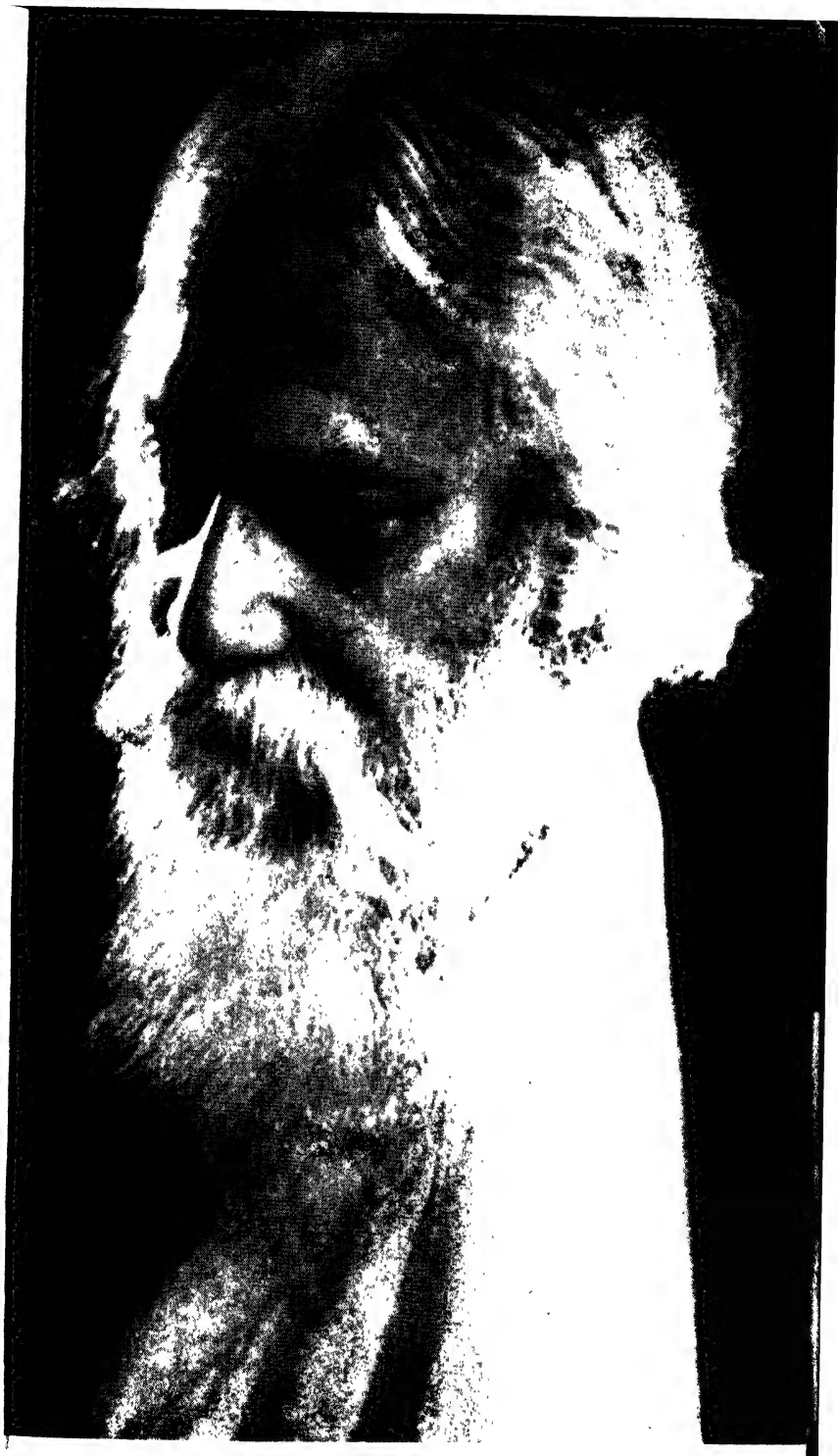
১। সংকলন পরিচয়
২। ঐতিহাসিক পরিচয়
৩। বিষয়গত পরিচয়: ধর্ম জিজ্ঞাসা

ধর্মচিন্তা ঃ রবীন্দ্ররচনা-সংকলন

ভূমিকা

১। সংকলন-পরিচয়
২। ঐতিহাসিক পরিচয়
৩। বিষয়গত পরিচয় : ধর্ম জিজ্ঞাসা

১। সংকলন-পরিচয়

ক. সূচনা
খ. বিন্যাস
গ. উপস্থাপনা
ঘ. সীমানা
ঙ. আকর ও সূত্র

ক. সূচনা

'রবীন্দ্রনাথের চিন্তাজগৎ'-প্রকল্পের বর্তমান সংকলন গ্রন্থটির বিষয় হল রবীন্দ্রনাথের ধর্মচিন্তা। শিক্ষা নিয়ে, সাহিত্য নিয়ে, সমাজ নিয়ে যেমন, বা অন্যান্য অনেক বিষয় নিয়ে যেমন সারা জীবন রবীন্দ্রনাথ অনেক ভেবেছেন, এবং এই সব বিষয়ে নিজের ভাবনা-চিন্তাকে যেমন নানাভাবে ভাষায় ব্যক্ত করেছেন, ধর্ম নিয়েও ঠিক তাই ঘটেছে। অপরিণত বয়স থেকে আরম্ভ ক'রে সুপরিণত বয়স পর্যন্ত—বস্তুত একেবারে মৃত্যুকাল পর্যন্ত নানা উপলক্ষে এবং বিনা উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ সেই সব বিষয়গুলিকে নিয়ে প্রায় সব সময়ই ভেবেছেন যাদের এককথায় বলা যায় ধর্মসংক্রান্ত বিষয়। শুধু ভাবেন নি, এই বিষয়ে নিজের ভাবনাচিন্তাকে তিনি প্রবন্ধে ভাষণে চিঠিপত্রে আত্মকথায় কবিতায় নাটকে গানে নানাভাবে লিপিবন্ধ করেছেন।

রবীন্দ্রনাথ কখনোই নিজেকে সাধক বলেন নি, বলেছেন তিনি কবি, তিনি ধরণীর কবি, মুক্তির সন্ধান তিনি রাখেন না।—

'শুধায়ো না মোরে তুমি মুক্তি কোথা, মুক্তি কারে কই,
আমি তো সাধক নই, আমি গুরু নই।

আমি কবি, আছি
ধরণীর অতি কাছাকাছি,
এ পারের খেয়ার ঘাটায়।'

পান্থ, পরিশেষ, র/২/৮৭৭

রবীন্দ্রনাথ একাধিক বার বেশ জোর দিয়ে বলেছেন তিনি মোক্ষসন্ধানী নন। অথচ আমরা জানি রবীন্দ্রনাথ যে ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারী, সেখানে মোক্ষই হল শেষ পুরুষার্থ।

ভারতীয় ঐতিহ্যের সব সাধকই যে মোক্ষসন্ধানী তা অবশ্য বলা যাবে না। অনেক বৈষ্ণব মহাজনের নাম করা যাবে যাঁরা মোক্ষসন্ধানী নন, উপরন্তু কবি, তবু তাঁরা সাধক। কিন্তু রবীন্দ্রনাথকে সে অর্থেও সাধক বলা যাবে না।

কিন্তু সাধক সাধনা এই কথাগুলিকে সব সময়ই খুব পারিভাষিক অর্থে আমরা ধরি না। এ কথা ঠিকই যে শ্রীরামকৃষ্ণ অথবা রমণমহর্ষি যে-অর্থে সাধক, উত্তরজীবনে শ্রীঅরবিন্দ যে-অর্থে সাধক, রবীন্দ্রনাথ ঠিক সেই অর্থে কখনোই সাধক নন। কিন্তু একথাও ঠিক যে ধর্ম বিষয়ে আগ্রহ রবীন্দ্রনাথের অত্যন্ত প্রবল। লক্ষ করতে হবে যে এই আগ্রহ কেবল জিজ্ঞাসার দ্বারা প্রণোদিত নয়, তার মধ্যে ভিতরের হৃদয়াবেগের প্রেরণা, গভীর উপলব্ধি ও অনুভূতির প্রেরণাও সমানই প্রবল। রবীন্দ্রনাথের ধর্মচিন্তা কেবল চিন্তাই নয়, এ তাঁর জীবনযাপনের সংগে মিশে গিয়েছে। রবীন্দ্রনাথের ধর্মচিন্তা তাঁর অন্তরংগ জীবন-সাধনার সংগে যুক্ত। তাঁর এই জীবনসাধনা আর যা-ই হোক বিশুদ্ধ জ্ঞানাত্মক ব্যাপার নয়। অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের ধর্মজিজ্ঞাসা বিশুদ্ধ জিজ্ঞাসা নয়, একান্তভাবে জ্ঞানান্বেষণ নয়। রবীন্দ্রনাথের ধর্মভাবনার সংগে তাঁর অনুভূতি ও উপলব্ধি অচ্ছেদ্যভাবে মিশে গিয়েছে, এখানে মননে আর সৃজনে একাকার হয়ে গিয়েছে। শিক্ষাচিন্তাই হোক সাহিত্যচিন্তাই হোক আর সমাজচিন্তাই হোক, রবীন্দ্রনাথের সমস্ত চিন্তাই অল্পবিস্তর সৃজনশীল। তার মধ্যেও সব থেকে বেশি সৃজনধর্মী রবীন্দ্রনাথের ধর্মচিন্তা। সকলেই জানেন রবীন্দ্রনাথের একাধিক নাটক তাঁর ধর্মভাবনার বাহন। প্রবন্ধের তুলনায় কবিতা ও গানেই রবীন্দ্রনাথের ধর্মভাবনা বেশী সাবলীলভাবে, ঋজুতর ও স্বচ্ছতরভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে। রবীন্দ্রনাথের চিন্তাজগতের বিভিন্ন এলাকার পরিচয় দিতে গিয়ে আমাদের বার বার সৃজনধর্মী রচনার দ্বারস্থ হতে হয়েছে। এই ব্যাপারটি ধর্মচিন্তার ক্ষেত্রে ঘটেছে আরো অনেক বেশি পরিমাণে।

আপেক্ষিক অর্থে জ্ঞানাত্মক ধর্মবিষয়ক একাধিক শাস্ত্রের সাক্ষাৎ পাশ্চাত্য সংস্কৃতিতে পাওয়া যাবে। একটি যেমন Philosophy of religion, অনুবাদে বলা যেতে পারে ধর্মের দর্শন। বলা দরকার, আমাদের ধর্ম আর পাশ্চাত্যের religion ঠিক এক বস্তু নয়। আমাদের ধর্ম কথাটা অনেক ব্যাপক, তদুপরি তা বহু-অর্থবোধক। সে আলোচনা যথাস্থানে হতে পারবে। আপাতত এই কথাটা জানিয়ে রাখি যে, অন্য লাগসই শব্দের অভাবে এখানে religion কথাটির প্রতিশব্দ হিসেবে ধর্ম-কথাটাকেই আমাদের ব্যবহার করতে হয়েছে। তা করা হয়েছে এই জোরে যে religion কথাটির প্রতিশব্দ হিসেবে বাংলায় ধর্ম কথাটির প্রয়োগ আজকাল ব্যবহারসিদ্ধ হয়ে গিয়েছে। সে যা-ই

হোক, আর-একটি ধর্ম বা religion বিষয়ক জ্ঞানাত্মক শাস্ত্র হল তুলনামূলক ধর্ম, comparative religion। শাস্ত্রটি কোথাও কোথাও নৃতত্ত্বের কোলঘেঁষা বিষয় রূপে গৃহীত, আবার কোথাও-বা গৃহীত হয়ে থাকে দর্শনের কোলঘেঁষা বিষয় রূপে। দেবতত্ত্ব বা ঈশ্বরতত্ত্ব, পাশ্চাত্যে যাকে theology বলা হয়, তা-ও মূলত জ্ঞানান্বেষণ—ক্ষেত্রটা দেবতা বা ঈশ্বর। মোটামুটিভাবে এই শাস্ত্রটি philosophy of religionএর গোত্রেই ধরা হয়ে থাকে।

গোড়াতেই বলে রাখা দরকার যে, রবীন্দ্রনাথের ধর্মভাবনা কোনো শাস্ত্র বা অ্যাকাডেমিক বিষয়ের চেহারা নেয় নি। রবীন্দ্রনাথের ধর্মভাবনায় দর্শন প্রায় সর্বত্রই অল্পবিস্তর মিশে আছে, তাকে স্পষ্টভাবে পাওয়া যাবে সেই সব ক্ষেত্রে যেখানে প্রকাশের বাহন প্রবন্ধ ও ভাষণ—সব থেকে বেশি এবং সব থেকে স্পষ্টভাবে পাওয়া যাবে শান্তিনিকেতন ভাষণাবলীতে। দর্শনের নিবিড় সান্নিধ্য সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথের ধর্মভাবনা কিন্তু খাঁটি দর্শন গোত্রের ধর্মজিজ্ঞাসা নয়, তা দেবতত্ত্ব বা ঈশ্বরতত্ত্ব বা থিয়লজি নয়, তুলনামূলক ধর্মবিচার নয়। তা ব্যক্তিবিশেষের ধর্মবোধ ও ধর্মীয় উৎকণ্ঠার প্রকাশ। তা কোনো বিদ্যাভবনের অধীতব্য শাস্ত্র বা ডিসিপ্লিন নয়।

ধর্ম বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের ভাবনার একদিকে আছে ভারতের ঐতিহ্যগত ধর্মচিন্তা এবং ধর্মসাধনার প্রভাব, পারিবারিক উত্তরাধিকার, বিশ্বের নানাদেশের নানা মণীষীর চিন্তাভাবনার ছায়াপাত, তেমনি অন্যদিকে আছে রবীন্দ্রনাথের স্বকীয় চিন্তাভাবনার ফসল, নিজস্ব উপলব্ধির সঞ্চয়, স্বানুভূতির প্রাপ্তি। যে মানুষ একই সংগে চিন্তানায়ক, কর্মী এবং শিল্পী, যাঁকে আমরা মহাকবি বলে জানি, যাঁর চিন্তা চিত্ররূপময় এবং অনুভূতিতে সমর্পিত, তাঁর ভাবনায় যে বহু-বিচিত্রের সমন্বয়প্রয়াস দেখা যাবে তা স্বাভাবিক, অন্যদিকে যে মানুষ তাঁর নিজের কালের প্রবল এক ধর্ম-আন্দোলনের শরিক তাঁর ধর্মভাবনায় যে অনেক স্তর-পরম্পরা থাকবে, অনেক রূপসংহতি ও সুরসংহতি থাকবে, তা বোঝাও খুব কঠিন নয়। বোঝা কঠিন নয় যে, এই মানুষের ধর্মভাবনার যে কোনো সহজ পরিচয় একদেশদর্শী পরিচয় হয়ে দাঁড়াতে পারে, অতি-সরলীকৃত পরিচয় হয়ে দাঁড়াতে পারে।

রবীন্দ্রনাথের ধর্মচিন্তা বরাবর এক জায়গায় স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে নি, চলতে চলতে তাঁর ধর্মচিন্তা বার বার বাঁক নিয়েছে। বাঁক নেওয়ার অর্থ হল ঝোঁকের বদল ঘটা, ভাবের বদল ঘটা। এক-একটা ভাবের প্রাধান্যকে নিয়ে যদি এক-একটা পর্যায় কল্পনা করি, তাহলে রবীন্দ্রনাথের ধর্মচিন্তায় বেশ কয়েকটি ভাব-পর্যায়ের সাক্ষাৎ পাব। এই যে একটা ভাব-পর্যায়ে গিয়ে দাঁড়ানো, একে আমরা কী ভাবে দেখব? একে কি নিজের একসময়ের ভাবনাকে খন্ডন করা বলা যাবে? অথবা এ কি তাঁর চিন্তার ক্রম-পরিণতি? পূর্বের পর্যায়ের ভাবকে আত্মস্থ করেই ধাপে ধাপে পূর্ণতার দিকে এগিয়ে যাওয়া? বিষয়টি পাঠককে সাবধানে অনুসরণ করে বুঝে দেখতে হবে।

ভাবনার স্বাতন্ত্র্যকে দিয়েই এক-একটা পর্যায়ের স্বাতন্ত্র্য, কিন্তু তার সংগে কি কালগত পারম্পর্যের কোনো যোগ আছে? ভাবের পর্যায়ের সংগে কালপর্বের কিছুমাত্র

যোগ নেই এমন বলা সংগত হবে না, কিন্তু কালপর্বগুলি খুব সূচিহ্নিত নয়, একই কালপর্বে একাধিক ভাবের সহাবস্থানও মাঝে মাঝে নজরে পড়বে। ভাবগুলিও যে একেবারে সু-উচ্চারিত সীমারেখায় একে অপরের থেকে স্বতন্ত্র, সব সময় এমনও বলা মুশ্‌কিল। এ সব জেনে নিয়েই বলি, মোটামুটি ভাবের স্বাতন্ত্র্য এবং তাকে অবলম্বন ক'রে কালপর্বের পারম্পর্য আমরা রবীন্দ্রনাথের ধর্মচিন্তাতে দেখতে পাব। কেবল এইটুকু মনে রাখতে হবে যে এই পর্যায়-ভাগে গাণিতিক পরিচ্ছন্নতা প্রত্যাশা করা যাবে না।

খ. বিন্যাস

'রবীন্দ্রনাথের চিন্তাজগৎ'-সিরিজের অন্যান্য গ্রন্থগুলির মতো, অর্থাৎ 'শিক্ষাচিন্তা', 'সাহিত্যচিন্তা', 'সমাজচিন্তা', ও 'স্বদেশচিন্তা'-র মতো বর্তমান গ্রন্থটির রচনাগুলিও কালানুক্রমিকভাবে বিন্যস্ত। কোনো কোনো রচনার নির্দিষ্ট সময় নিয়ে কিছু সংশয় আছে, কোথাও সন পাওয়া গেলেও মাস বা তারিখ পাওয়া যায় নি। দু'একটি গানে এবং শান্তিনিকেতন ভাষণাবলীর কিছু ভাষণে এই রকম সংশয়ের কারণ ঘটেছে। এতে কালানুক্রমিক বিন্যাসে কিছু অনিশ্চয়তা এসেছে। ভরসা করি, তাতে রবীন্দ্রনাথের চিন্তাধারাকে ঠিকভাবে বুঝতে পাঠকের খুব অসুবিধা হবে না। কেননা রবীন্দ্রনাথের ধর্মচিন্তায় খুব অল্প সময়ের মধ্যে কখনোই বড়ো রকমের অদল-বদল ঘটে নি। কাজেই সময়ের ছোট মাপের সামান্য এদিক-ওদিকে ভাবনাকে বোঝার ব্যাপারে ক্ষতি হবার সম্ভাবনা কম। তাছাড়া প্রাসঙ্গিক তথ্যাদি থেকে সময়টা মোটামুটি ঠিকই আন্দাজ করা যায়। তবু একথা মানতেই হবে যে, নিশ্চিত তারিখ না পাওয়ায় ত্রুটি খানিকটা থেকেই গেল।

অন্যান্য খণ্ডের মতো বর্তমান সংকলনের রচনাগুলিও কয়েকটি বড়ো কালপর্বে ভাগ করে নেওয়া হয়েছে। এই ভাগ কৃত্রিম। রবীন্দ্রনাথের ধর্মচিন্তায় কোনো কাটা-কাটা ভাগ নেই। ভাবনার বদল যখন যা ঘটেছে তা কোনো তারিখ ধরে' বা মাস ধরে' হয় নি, হয়েছে মসৃণভাবে অলক্ষ্যে। একই কালপর্বে একাধিক ভাবের সহাবস্থান মাঝে মাঝেই দেখতে পাওয়া যায়। তবু যে সংকলনের রচনাগুলিকে বিভিন্ন কালপর্বে কাটা কাটা ভাবেই ভাগ করা হয়েছে তা ভাবের প্রধান এলাকাটিকে চিহ্নিত করার সুবিধার জন্য, আলোচনার সুবিধা হবে বলে'। অর্থাৎ কাজের খাতিরে।

বলে রাখা দরকার, বিশেষ একটা পর্বে বিশেষ একটা ভাবের নিরঙ্কুশ একাধিপত্য একেবারে গোড়ার দিকে যদি বা পাওয়া যায়, পরের দিকে তা মোটেই পাওয়া যাবে না। একাধিক ভাবের সহাবস্থান বা সমান্তরাল প্রবাহ, পরের দিকের পর্বগুলিতে এরকম প্রায়ই নজরে পড়বে। সুতরাং বিশেষ একটা ভাবের একাধিপত্যকে দিয়ে নয়, তার প্রাধান্যকে দিয়েই এখানে এক-একটা কালপর্বকে চিহ্নিত করে নেওয়া হয়েছে। লক্ষ করা দরকার যে, ভাববিশেষের এই প্রাধান্য কালপর্বের কেন্দ্রের দিকটাতে যে রকম স্পষ্ট,

সীমানার দিকে---কী গোড়ার দিকের সীমানা, কী শেষের দিকের সীমানা, কোনো দিকের সীমানাতেই সে-রকম স্পষ্ট নয়। গোড়ার দিকের সীমানায় আগের অর্থাৎ বিগত পর্বের ভাবের সঙ্গে মিশ্রণ, আর শেষের দিকের সীমানায় পরের অর্থাৎ আসন্ন পর্বের ভাবের সঙ্গে মিশ্রণ।

এইবারে পর্বভাগের কথা বলা যাক।—

প্রথম পর্ব ধর্মচিন্তার উন্মেষের কাল। সময়-সীমা খুব নির্দিষ্ট করা যায় না, সংকলনের রচনার কাল ধরে' বললে, ১৮৮৪ থেকে ১৯০০ সাল। এ হল মোটামুটি ছিন্নপত্র-শিলাইদহবাস—এই সবের সময়। এই সময় ধর্ম-বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের আগ্রহ দেখতে পাই, কিন্তু চিন্তায় স্বকীয়তা খুব স্পষ্ট হয়ে ওঠে নি। এই কালপর্বের মোট ১২টি রচনা এখানে সংকলিত হয়েছে।

দ্বিতীয় পর্বের ব্যাপ্তি—মোটামুটিভাবে বলছি—১৯০১ থেকে ১৯০৭ সাল। এর গোড়ার দিকটায় নৈবেদ্য রচনা আর শেষের দিকটাতে খেয়া এবং তারপর গোরা উপন্যাসের রচনারম্ভ---গীতাঞ্জলির পূর্বসীমা। আগাগোড়া এই পর্বে নৈবেদ্যের সুরের প্রাধান্য। ভক্তির সুর, সন্তানের দৃষ্টি দিয়ে ঈশ্বরকে দেখা—বাৎসল্য ও প্রতি-বাৎসল্যের সম্পর্ক। ধর্ম বইয়ের (১৯০৯) 'ধর্মের সরল আদর্শ' প্রবন্ধটির (সংকলনের ১৯ নং রচনা) নামে এই পর্বের নামকরণ করা হয়েছে। 'পিতার বোধ'—এই বিকল্প নামও হতে পারত। সংকলনের ১৩ নং থেকে ৩০ নং এই ১৮ টি রচনা এই কালপর্বের।

তৃতীয় পর্ব ১৯০৮-০৯ সালের রচনা নিয়ে। রচনাগুলি সবই শান্তিনিকেতন ভাষণাবলী থেকে নেওয়া, মোট ৩৭টি রচনা, ৩১ নং থেকে ৬৭ নং রচনা। বর্তমান সংকলনে শান্তিনিকেতন ভাষণাবলী থেকে আমরা নিয়েছি মোট ৪৭টি রচনা, তার ৩৭টি এই পর্বে, বাকি ১০টি নেওয়া হয়েছে পরের দুটি পর্ব থেকে। এই তৃতীয় পর্বটিকে অনায়াসে 'শান্তিনিকেতন-পর্ব' বলা যেতে পারত। আগের পর্বের পিতৃভাব এইখানে এসে একটা নতুন পরিবর্তনের দিকে পা বাড়িয়েছে। এই পরিবর্তন এনেছে রবীন্দ্রনাথের কবি-মনের নিজস্ব উপলব্ধি, বলতে পারি তাঁর স্বানুভূতি।

শান্তিনিকেতন-ভাষণাবলী এই পর্বকে ছাপিয়ে আরো কিছুটা দূর এগিয়ে গিয়েছে বটে, কিন্তু এই পর্বেই তার মূল ভাবের অধিষ্ঠান। বলা দরকার যে, শান্তিনিকেতন-গ্রন্থের ১৫২টি রচনার প্রথম ১০৪টি ভাষণ কথিত ও লিখিত হয়েছে ছ'মাসের কিছু কম সময়ে, বাংলা ১৩১৫ সালের ৭ অগ্রহায়ণ থেকে ১৩১৬ সালের ৭ বৈশাখের মধ্যে। বাকি ৪৮টি রচনার বেশির ভাগই অল্পকাল পরে, অল্পকয়েকটি চার-পাঁচ বছর পরের দিকে। রচনার উক্ত ছয় মাসই আমাদের তৃতীয় পর্বের ব্যাপ্তিকাল।

ব্যাপ্তির দিক থেকে কম সময়ের হলেও গুরুত্ব তার কিছুমাত্র কম নয়। ব্রহ্মভাবনা এই সময়েই রবীন্দ্রদর্শনে এবং রবীন্দ্রনাথের ধর্মভাবনায় সুস্পষ্ট চেহারা নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে। চেহারাটা স্পষ্ট, কিন্তু তা স্থির নয়, প্রচ্ছন্নভাবে গতিশীল। তা পিতৃভাব থেকে

প্রেমভাবে পৌঁছুবার, নৈবেদ্য থেকে গীতাঞ্জলিতে পৌঁছুবার, ভক্তির দূরত্ব থেকে প্রাণসখার নৈকট্যে পৌঁছুবার খেয়ার মতো। নৈবেদ্য (১৯০১) এবং গীতাঞ্জলি (১৯১০) এই দুয়ের বিচিত্র দ্বৈতসংগীতের সুর শান্তিনিকেতন ভাষণাবলীতে শুনতে পাওয়া যাবে। কালপর্বটির নাম দেওয়া হয়েছে—'ব্রহ্মভাবনা : উপলব্ধির আলোকে'। তৃতীয় পর্বের মোট ৩৭টি রচনা—৩১ নং থেকে ৬৭ নং রচনা—এই সংকলনে নেওয়া হয়েছে।

কোনো পর্বেই চিন্তা স্থানুবৎ নয়, ভাবের গতিশীলতা কম-বেশি সব পর্বেই দেখতে পাওয়া যাবে, সব পর্বেই গোড়ার দিকে আগের পর্বের ভাবের পূর্বসূচনা লক্ষ করা যাবে। নিজস্ব উপলব্ধি বা স্বানুভূতির দ্বারা অনুরঞ্জিত যে ব্রহ্মভাবনা আমরা তৃতীয় পর্বে দেখি, তা পরবর্তী পর্বেও দেখা যাবে। কিন্তু পরবর্তী পর্বে অর্থাৎ চতুর্থ পর্বে প্রেমভাবেরই প্রাধান্য। এই আপেক্ষিক প্রাধান্যের জন্যই চতুর্থ পর্বটিকে আমরা স্বতন্ত্র পর্ব বলে চিহ্নিত করতে পারি এবং পর্বটিকে গীতাঞ্জলির ভাবের পর্ব বলে ধরতে পারি। এই পর্বের সংকলিত অধিকাংশ রচনাই গীতাঞ্জলির গান, যদিও পর্বের যে-নামকরণ করা হয়েছে সেই নামের প্রথম অংশ গীতিমাল্যের একটি গানের বাক্যাংশ। 'তোমায় আমায় মিলন হবে বলে': রসের সাধনা—এই হল এ পর্বের নাম। বাক্যাংশ অনায়াসে গীতাঞ্জলির গানও হতে পারত—'পরাণসখা বন্ধু হে আমার', কিংবা 'আমার মিলন লাগি তুমি', অথবা 'তাই তোমার আনন্দ আমার পর'। নামের শেষের অংশ—'রসের সাধনা এইটেই হল এই পর্বের ভাবের আসল কথা। পর্বের ব্যাপ্তিকাল ১৯০৯ সালের শেষ ভাগ থেকে ১৯১৪ সালের প্রথম ভাগ পর্যন্ত। এই পর্বে সংকলিত হয়েছে মোট ৩২টি লেখা, ৬৮ নং থেকে ৯৯ নং রচনা।

পঞ্চম পর্বটি দীর্ঘ, ১৯১৪ সাল থেকে ১৯২৯ সাল, প্রায় ১৬ বছর বিস্তৃত। এই ১৬ বছরের ঠিক আগে নোবেল প্রাইজ প্রাপ্তি (১৯১৩), বলাকার কবিতা রচনার আরম্ভ, আর এই ১৬ বছরের কালপর্বের পরে ১৯৩০ সালে অক্স্ফোর্ড হিবার্ট বক্তৃতা (The Religion of Man)।

প্রেমের পথ, রসের সাধনা চতুর্থ বা গীতাঞ্জলি পর্বে (তোমায় আমায় মিলন হবে বলে) যেমন ছিল, এ পর্বেও তেমনি আছে, কিন্তু এ পর্বে প্রেমাস্পদ আরো কাছে—একেবারে নিজের ভিতরে। এ পর্বের ভাবনাবেদনা আরো অন্তর্মুখী—সন্ধানটা হৃদয়ের মধ্যে যে লুকিয়ে আছে তার জন্য। পর্বের নাম 'আপনি আমার কোন্‌খানে' এই পঙ্ক্তিটিকে দিয়ে। অনায়াসে এই পর্বের নাম 'আমার হিয়ার মাঝে লুকিয়ে ছিলে;' অথবা 'আমি তারেই খুঁজে বেড়াই'—এইসব পঙ্ক্তিতে হতে পারত। চতুর্থ পর্বের পথকে যদি বলি বৈষ্ণবীয়—তা সে দীক্ষিত বৈষ্ণব মহাজনের যদি না-ও হয়, মোটামুটি বৈষ্ণবীয়, তাহলে এই পঞ্চম পর্বটিকে বলব অদীক্ষিতদের পথ, ব্রাত্যদের পথ, লোকায়ত পথ। এ যেন খানিকটা সহজিয়াদের বা বাউলদের পথের মতো। সংকলনের ১০০ নং রচনা থেকে ১২৭ নং রচনা, এই ২৮টি রচনা এই কালপর্ব থেকে গৃহীত হয়েছে।

আগের পর্বের মতো এই পর্বের সংকলিত রচনাগুলির মধ্যেও গানের সাংখ্যাধিক্য। আগের দুটি পর্বের ভাবের ধারা এ পর্বেও প্রবাহিত, তবে প্রাধান্য পায় নি তা মানতে হবে। গীতাঞ্জলি পর্বে শান্তিনিকেতন-গ্রন্থ থেকে নেওয়া হয়েছে ৩টি রচনা, আর এই পঞ্চম পর্বে উক্ত গ্রন্থ থেকে এসেছে ৪টি রচনা।

এর পরের পর্ব—ষষ্ঠ পর্ব ১৯৩১ সাল থেকে শেষ অবধি, ১৯৪১ সাল অবধি, ১০ বছর বিস্তৃত। এই পর্বের মূল কথা মানুষ। ব্যক্তিবিশেষ নয়, বলা যেতে পারে—মানবসমগ্রতা। পর্বটির নাম দেওয়া হয়েছে 'সকল মানুষের মানুষ : মানবধর্মের সাধনা। পর্বের প্রধান ভাবটি প্রকাশ পেয়েছে, ইংরাজিতে 'The Religion of Man' (১৯৩১) বইয়ে, আর বাংলায় 'মানুষের ধর্ম' (১৯৩৩) বইয়ে। আর প্রকাশ পেয়েছে এই সময়ের নানা লেখায়—কবিতায়, গানে, চিঠিপত্রে। সংকলনের ১২৮ নং রচনা থেকে ১৬৬ নং রচনা—মোট এই ৩৯টি রচনা এই পর্ব' থেকে নেওয়া হয়েছে।

এর পরের অংশ সংযোজন। এই অংশটি পরিশিষ্টের মতো। এর কোনো রচনারই দাবি আগের অংশের কোনো রচনার থেকে কম নয়। কাজের ধারাতে এরা পরে প্রবেশ করেছে, গুণগত কোনো কারণে নয়। সংযোজন দুইভাগে বিভক্ত—সংযোজন-১ এবং সংযোজন-২। এই ভাগও কাজের প্রয়োজনে,গুণগত কারণে নয়।সংযোজন-১-এ গৃহীত হয়েছে ১৪টি এবং সংযোজন-২-এ গৃহীত হয়েছে ৭টি রচনা, অর্থাৎ সমগ্র সংকলনে স্থান পেয়েছে মোট ১৮৭টি রচনা।

গ. উপস্থাপনা

সংকলনের রচনাগুলি—সংযোজন অংশ বাদে বাকি সবই কালানুক্রমে বিন্যস্ত। রচনার বর্জিত অংশ চিহ্নিত ক'রে দেওয়া আছে। বর্জনের লক্ষ্য প্রথমত সংকলিত অংশে শুধু ধর্মচিন্তাকেই স্থান দেওয়া, তার মধ্যে প্রসঙ্গান্তর প্রবেশ করতে না দেওয়া। দ্বিতীয় লক্ষ্য সংকলনটি যথাসম্ভব পুনরুক্তির ভার থেকে মুক্ত রাখা।

আনুষঙ্গিক তথ্যাদি সহ রচনাগুলি সংকলনে যে-ভাবে পরিবেশিত হয়েছে তার নির্দেশ নিচে দেওয়া গেল।—

এক: শিরোনাম।

দুই: রচনাটির প্রথম প্রকাশ সংক্রান্ত তথ্যাদি।

তিন: মূল রচনা বা টেক্‌স্ট। সেই সঙ্গে রচনাটি যেখান থেকে বর্তমান সংকলনে গৃহীত হয়েছে তার নির্দেশ।

চার: টীকা।

পাঁচ: প্রয়োজনের ক্ষেত্রে মূল বিষয়ের নির্দেশ।

ছয়: তুলনীয় প্রসঙ্গ বা প্রাসঙ্গিক রচনার নির্দেশ, অর্থাৎ খানিকটা ক্রসরেফারেন্স।

সাত: মন্তব্য। সব রচনায় মন্তব্য দেবার প্রয়োজন হয় না। বলে রাখা ভালো যে, মন্তব্য-অংশের পুরো দায়িত্ব সম্পাদকের।

এ-ছাড়া আছে ভূমিকা। ভূমিকাটি স্থূলভাবে তিন ভাগে বিভক্ত। ভূমিকার প্রথম ভাগে আছে বর্তমান সংকলনের সংক্ষিপ্ত একটি সাধারণ পরিচয়। এর নাম দেওয়া হয়েছে 'সংকলন-পরিচয়।'

ভূমিকার দ্বিতীয় ভাগ হল সংকলনের রচনাগুলির ঐতিহাসিক পরিচয়। রচনাগুলি যে কালক্রমে রবীন্দ্রনাথের জীবনের সঙ্গে সংযুক্ত, এখানে এই কালক্রম এবং

প্রয়োজনমতো তার ঐতিহাসিক অনুষঙ্গই এই অংশের লক্ষ্য। ধর্ম-আন্দোলন আমাদের নবজাগরণের একটি অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য দিক। রবীন্দ্রনাথ একই সঙ্গে এই নবজাগরণের সন্তান, এবং এর শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি। তখনকার ধর্ম-আন্দোলনের প্রত্যেকটি তরঙ্গের সঙ্গে, নানা মুখে প্রবাহিত তার প্রত্যেকটি ধারার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের ভাবনাচিন্তা অতি ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত। রবীন্দ্রনাথের ধর্মচিন্তাকে বোঝার পক্ষে—এবং আমাদের নবজাগরণকে বোঝার পক্ষেও সেদিনের ধর্ম-আন্দোলনের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটটি পাঠকের সামনে থাকা দরকার।

তৃতীয় ভাগে আছে 'বিষয়গত পরিচয়'। এই অংশে রবীন্দ্রনাথের ধর্মভাবনাকে ঐতিহাসিক ভৌগোলিক অনুষঙ্গ থেকে এবং রবীন্দ্রজীবনের অনুষঙ্গ থেকে যথাসম্ভব বিযুক্ত করে বিশুদ্ধ ধর্মভাবনা হিসেবে দেখার চেষ্টা করা হয়েছে। কতকগুলি বিশিষ্ট ভাববীজ বিভিন্ন সময়ে রবীন্দ্রনাথের ভাবনায় অঙ্কুরিত হয়ে উঠেছে। সময়সূত্র ছিন্ন করে সেই ভাববীজগুলি স্বতন্ত্রভাবেও দেখা সম্ভব। যেমন দেখা সম্ভব ঈশ্বরভাবনাকে, ব্রহ্মভাবনাকে, মনের মানুষকে, মানবব্রহ্মকে। যেমন দেখা সম্ভব মধুর রসের সাধনায় বিগলিত আত্মসমর্পণকে, অথবা অন্যদিকে নাস্তিকতাকেও। যেমন দেখা সম্ভব আনন্দকে, এবং অন্যদিকে দেখা সম্ভব অশুভকে পাপকে অধর্মকে। শুভঅশুভ থেকে সম্পূর্ণ আলাদা করেও দুঃখকে দেখা যায়, যার সংকেত হল 'পদ্মফুলের মাঝখানে বজ্র।'

মোটামুটি বলা যায়, তৃতীয় ভাগটি তত্ত্বগত আলোচনা। এই তত্ত্ব তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ব বা comparative religion নয়, অন্যদিকে এ তত্ত্ব আমাদের সুপরিচিত এবং ধর্মযাজকদের দ্বারা বহু সমাদৃত থিয়োলজি অর্থে 'ঈশ্বরতত্ত্ব'ও নয়, যদিও ঈশ্বরের তত্ত্ব, জগতের তত্ত্ব, আত্ম তত্ত্ব সবই এর অঙ্গস্বরূপ। এমন কি মানবতত্ত্বও।

ঘ. সীমানা

গোড়াতেই বলে রাখা ভালো যে এই সিরিজের আগের চারটি গ্রন্থে যেমন হয়েছে, বর্তমান গ্রন্থের রচনা-নির্বাচন ঠিক সেই নীতি অবলম্বন করেই করা হয়েছে, অর্থাৎ এ-গ্রন্থের রচনা-নির্বাচনও সম্পূর্ণভাবে সংকলনের মূল উদ্দেশ্যের দ্বারা নিরূপিত। বর্তমান গ্রন্থের মূল উদ্দেশ্য হল রবীন্দ্রনাথের ধর্মচিন্তার সঙ্গে পাঠকের পরিচয় ঘটানো। ধর্মসংক্রান্ত আলোচনা সুবৃহৎ রবীন্দ্ররচনাবলীর নানা অংশে ছড়ানো এবং অনেক ক্ষেত্রেই তা প্রসঙ্গান্তরের সঙ্গে নিবিড়ভাবে জড়ানো। অনেক সময় তাকে ভাষণ বা প্রবন্ধ আকারে পাওয়া যাবে, অনেক সময় তাকে পাওয়া যাবে কবিতায়, গানে, নাটকে, চিঠিপত্রে। কখনো তা দর্শনচিন্তার সঙ্গে, কখনো সাহিত্যতত্ত্ব শিল্প-তত্ত্বের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে মিশ্রিত। বর্তমান গ্রন্থের উদ্দেশ্য কালানুক্রমে বিন্যস্ত ক'রে রবীন্দ্রনাথের ধর্মচিন্তার যথাসম্ভব সংক্ষিপ্ত কিন্তু যথাসাধ্য নির্ভরযোগ্য পরিচয় দেওয়া। বলা বাহুল্য, এই পরিচয়ের মূল অবলম্বন রবীন্দ্রনাথের নিজের রচনা।

একথা সহজেই বোঝা যায় যে, লক্ষ্যের ভিন্নতার কারণে গ্রন্থ সম্পাদনায় স্বভাবের ও পদ্ধতির ভিন্নতা আসে। সব গোত্রের রবীন্দ্ররচনার সন্ধান এবং সংগ্রহ, দুষ্প্রাপ্য রবীন্দ্ররচনার আবিষ্কার বা উদ্ধার এখানে আমাদের লক্ষ্য নয়। নানা পাণ্ডুলিপির পাঠ ও

পাঠান্তর মিলিয়ে বিশুদ্ধ পাঠের প্রতিষ্ঠা এখানে আমাদের লক্ষ্য নয়। বর্তমান গ্রন্থের সম্পাদনা টেক্‌স্‌চুয়াল সম্পাদনা গোত্রের নয়। টেক্‌স্‌চুয়াল সম্পাদনার প্রথম ও শেষ লক্ষ্য নির্ভুল পাঠের প্রতিষ্ঠা—টেক্‌স্‌টের বিশুদ্ধি। সেখানে টেক্‌স্‌টে বানান ইত্যাদি সবই যন্দৃষ্টং রাখতে হবে। বানান ভুল বা অন্য কোনো রকম ভুল থাকলে সম্পাদক নোট দেবেন, কিন্তু মূল টেক্‌স্‌ট ভুলকেই রক্ষা করবে। এ ক্ষেত্রে আমরা তা করি নি। মূল বই, কিংবা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের জন্মশতবর্ষ সংস্করণের অথবা ক্ষেত্র বিশেষে বিশ্বভারতী রচনাবলীর পাঠকে আমরা মোটামুটি অভ্রান্ত বলে গ্রহণ ক'রে আমাদের মনোযোগ নিবন্ধ করেছি রবীন্দ্রনাথের চিন্তার দিকে। জানি, টেক্‌স্‌টের বিশুদ্ধি এই রকম ক্ষেত্রেও মূল্যবান। জানি, বিকৃত টেক্‌স্‌ট চিন্তাকে বিকৃতভাবে পরিবেশিত করতে পারে। সুতরাং পাঠের বিশুদ্ধি আমরাও চাই, কিন্তু তার প্রতিষ্ঠা আমাদের কাজ নয়, তা ভিন্ন ধরণের গবেষণার কাজ। টেক্‌স্‌টের অন্তঃসংগতির বিচার ছাড়া আর কোনো উপায় আমাদের হাতে নেই। এটা আমরা জেনেই নিয়েছি। প্রয়োজন বোধে আমরা ভুল বানান সংশোধন করেছি, পুরনো বানানের জায়গায় নতুন বানান রেখেছি। সম্পাদনা কর্মে যা-কিছু করা হয়েছে, তার একটা শর্ত : রবীন্দ্রনাথের চিন্তা যেন বাধাহীন এবং নির্ভরযোগ্যভাবে প্রকাশিত হয়। সাধারণ পাঠকের যেন কোনো রকম অসুবিধা না হয়।

আগের চারটি খন্ডের মতো বর্তমান খন্ডের রচনাগুলিও প্রকাশের দিক থেকে নানান গোত্রের। এদের মধ্যে রবীন্দ্ররচনাবলীতে অন্তর্ভুক্ত রচনা যেমন অনেক আছে, তেমনি কিছু আছে যা গ্রন্থভুক্ত হয়েছিল, কিন্তু কোনো রচনাবলীর অন্তর্ভুক্ত হয় নি। কিছু রচনা আছে যা পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল, কিন্তু কোনো গ্রন্থে বা রচনাবলীতে স্থান পায় নি। কিছু আছে যা এখন পর্যন্ত প্রকাশিত হয় নি, যেমন কিছু চিঠিপত্র। প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত, সহজপ্রাপ্য ও দুষ্প্রাপ্য সব রচনাই সংকলনে স্থান পেতে পারে এবং পেয়েছে, কিন্তু নিছক দুষ্প্রাপ্য বা অপ্রকাশিত বলেই স্থান পায় নি, স্থান পেয়েছে মাত্র এই একটি কারণেই যে রচনাটি রবীন্দ্রচিন্তার প্রতিনিধিস্থানীয়।

ঙ. আকর ও সূত্র

প্রতি রচনার শিরোনামের সামনে ক্রমিক সংখ্যা ও শিরোনামের নিচে রচনাটির প্রথম প্রকাশের স্থানকাল দেওয়া হয়েছে। রচনাকাল ও প্রকাশকালের মধ্যে বেশি ব্যবধান থাকলে টীকায় আলাদা ক'রে রচনাকালের কথা বলা হয়েছে। টেক্‌স্‌ট বা মূল পাঠের নিচে রচনাটি এই সংকলনে কোথা থেকে উৎকলিত হয়েছে তার উল্লেখ আছে।

অধিকাংশ রচনারই আকর পশ্চিমবঙ্গ সরকারের জন্মশতবার্ষিক সংস্করণের (১৯ ৷) রবীন্দ্ররচনাবলী। উৎকলন-নির্দেশক সূত্রটি এই রকম :-

র = পঃ বঃ সরকারের জন্মশতবার্ষিক সংস্করণের রবীন্দ্ররচনাবলী। পরের সংখ্যাটি রচনাবলীর খন্ড-সূচক। তার পরের অর্থাৎ শেষের সংখ্যা পৃষ্ঠা-সূচক। যেমন, র/১২/২৫ = রচনাবলী (পঃ বঃ), ১২শ খন্ড, ২৫ পৃষ্ঠা।

পাঠের কিছু ভিন্নতার দরুণ অথবা অন্যতর কোনো অনিবার্য কারণে কিছু রচনা

বিশ্বভারতীর রবীন্দ্ররচনাবলী থেকে নেওয়া হয়েছে। সেই সব ক্ষেত্রে তাদের আকরের বিষয়ে আলাদা ক'রে বলা হয়েছে। কোনো কোনো রচনা বিশেষ কারণে স্বতন্ত্র বই থেকে নেওয়া হয়েছে। পত্রিকা থেকে নেওয়া হলে তার নাম সংখ্যা ইত্যাদি মূল পাঠের শেষে আলাদাভাবে দেওয়া হয়েছে। আকর সংক্রান্ত কোনো সংকেত না থাকলে বুঝতে হবে রচনাটি এখনও পর্যন্ত অপ্রকাশিত এবং এর আকর আছে বিশ্বভারতীর রবীন্দ্রভবনের সংগ্রহশালায়।

কোনো রচনা যদি চিঠি হয় এবং তা যদি 'চিঠিপত্র' থেকে নেওয়া হয়, তাহলে চিঠির শেষে চিঠিপত্রের সংখ্যা দেওয়া থাকবে। যে চিঠির নিচে 'চিঠিপত্র' ও তার সংখ্যার নির্দেশ নেই, বুঝতে হবে তার আকর বিশ্বভারতীর রবীন্দ্রভবন সংগ্রহশালা এবং চিঠিটি এখন পর্যন্ত অপ্রকাশিত।

২। ঐতিহাসিক পরিচয়

ক. প্রেক্ষাপট: দেশকালপাত্র

খ. রচনা-পরিক্রমা

ক. প্রেক্ষাপট: দেশকালপাত্র

রবীন্দ্রনাথের ধর্মভাবনাকে ঐতিহাসিকভাবে দেখতে হলে তাঁর কালের ধর্মভাবনার গতি-প্রকৃতি ও তার প্রেক্ষাপট সম্পর্কে একটা সাধারণ পরিচয় থাকা দরকার। এবং সেই একই কারণে দরকার উনিশ শতকে এদেশে যে সাংস্কৃতিক রূপান্তর ঘটেছে তার একটা সাধারণ পরিচয়ের। কেননা ধর্মচিন্তার রূপান্তর সেই সামগ্রিক সাংস্কৃতিক ও সামাজিক রূপান্তরের অন্যতম প্রধান একটি অংগ।

১৯ শতকে বংগদেশের সমাজে ও সংস্কৃতিতে অল্পকালের মধ্যে যে বড়ো পরিবর্তন দেখা গিয়েছে, যার মধ্যে ঐতিহাসিকেরা মধ্যযুগের অবসানের এবং আধুনিক যুগের সূচনার লক্ষণ দেখতে পেয়েছেন এবং ইউরোপীয় রেনেসাঁসের সাদৃশ্যে যাকে তাঁরা রেনেসাঁস বা নব-জাগরণ আখ্যা দিয়েছেন, তার সম্পর্কে সম্প্রতিকালে অনেক তর্ক উঠেছে। ইউরোপীয় রেনেসাঁসের সংগে আমাদের দেশীয় সাংস্কৃতিক রূপান্তরের সাদৃশ্য কতটা গভীর, যদি তেমন গভীর না হয় তাহলে অগভীর সাদৃশ্যের ভিত্তিতে একে রেনেসাঁস বলা সংগত কি না তা বিবেচনা ক'রে দেখবার বিষয়। শক্তিশালী ধনতান্ত্রিক এবং সাম্রাজ্যবাদী দেশ তার শাসন ও শোষণ মসৃণ করার জন্য তার উপনিবেশে যেটুকু আলোড়ন ঘটায় তাকে কি যথার্থ জাগরণ বলা যায়? ঔপনিবেশিক ব্যবস্থার মধ্যেই তো মানসিক দাসত্বের বীজ থেকে যায়। তার মধ্যে যে আলোর ছটা, সে তো আলেয়ার আলো। এই তথাকথিত জাগরণের ব্যাপ্তি গভীরতা স্থায়িত্ব কতখানি যে একে রেনেসাঁস বলা যাবে?

এ প্রশ্ন অসংগত নয়। ঔপনিবেশিকতা যে আধুনিক ভারতবর্ষের একটা প্রবল প্রভাবশালী ঐতিহাসিক সত্য, তার প্রভাবে আমাদের জাতীয় জাগরণে যে অনেক

বিকৃতির সঞ্চার হয়েছে তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু কেবল ঔপনিবেশিকতার উপরেই একান্ত জোর দিলে সংস্কৃতি-সংঘর্ষের, দুই বিপরীত সংস্কৃতির সংঘর্ষজনিত ভাবমন্থনের সত্যকে অবহেলা করা হবে। এর আগেও একবার ইসলামের ও ব্রাহ্মণ্য আদর্শের সংঘর্ষ এবং তজ্জনিত ছোট আকারের জাগরণ আমাদের ইতিহাসে ঘটে গিয়েছে। মানতে হবে যে তার মধ্যে ঔপনিবেশিকতার অভিশাপ ক্রিয়াশীল ছিল না। কিন্তু শুধু ঔপনিবেশিকতাকে দেখলে, ইতিহাসের গতিকে না দেখলে একদেশদর্শিতা হবে। ইতিহাস চলমান এবং সমাজ চলতে চলতে বদলায়। ঔপনিবেশিকতাও অনড় পদার্থ নয়। এবং, বলা বাহুল্য, রেনেসাঁসও অনড় নয়।

একথা ঠিক যে আমাদের ক্ষেত্রে রেনেসাঁস একটা সাদৃশ্যভিত্তিক নাম। দুয়ের মধ্যে সাদৃশ্য যেমন আছে, বৈসাদৃশ্যও তেমনি আছে। এক্ষেত্রে নামের উপর খুব বেশি জোর দিলে ভুল হবে। কিন্তু ১৯-শতকে যে রকম আগ্রহ ও উদ্যম নিয়ে প্রাচ্য বিদ্যার চর্চা হয়েছে, তাতে রেনেসাঁস নামটা যে একেবারে অপপ্রয়োগ এমনও বলা যায় না।

আরো একটা কথা মনে রাখতে হবে। জাগরণ কোনো রেডি-মেড ব্যাপার নয়, সিদ্ধিতে বিফলতায় জড়ানো জটিল প্রক্রিয়া, ইতিহাসের প্রায় সব পদক্ষেপই সেই রকম। ঔপনিবেশিকতাও তেমনি চিরকালের-জন্য-হয়ে-থাকা কোনো ব্যাপার নয়। তারও পথ ইতিহাসের-পতন-অভ্যুদয়-বন্ধুর পথ। মনে রাখতে হবে, কোনো দুটো উপনিবেশের ইতিহাসই হুবহু এক ইতিহাস নয়। এক-এক ক্ষেত্রে তার এক-এক পালা। পূর্ব-ইতিহাসহারা, ঐতিহ্যহারা কুমারী-জমিতে উপনিবেশ যেমন, ভারতবর্ষের মতো একদা-সমৃদ্ধ দেশের ঔপনিবেশিক পরিস্থিতি ঠিক সে রকম নয়। এখানে পশ্চিমের ইংরেজ বণিক যে উপনিবেশ স্থাপন করল, তার ঔপনিবেশিকতার মধ্যেই ভিতরের এবং বাইরের বহু শক্তির টানা-পোড়েন। একদিকে তার মধ্যে যেমন তার নিহিত আত্মতার টান, অন্যদিকে তার ভিতরে নতুন জীবনের নতুন আদর্শের তোলপাড়, আর বাইরের দিকে প্রবল টান বহির্বিশ্বের, বিশ্ব-ইতিহাসের। তার কোনো ঐতিহাসিক অবস্থাই হয়ে-যাওয়া বা থেমে-থাকা অবস্থা নয়। তার ঔপনিবেশিক অবস্থার মধ্যেই তাকে দীর্ণ করার বিপরীত শক্তি সব সময় কাজ ক'রে চলেছে, ঔপনিবেশিক পরিস্থিতির মধ্যে তাকে খণ্ডন করার শক্তি সব সময় অলক্ষ্যে ক্রিয়া করে চলেছে। এই শক্তির গতি সরল নয়। কিছু কিছু সিদ্ধি, কিছু কিছু ব্যর্থতা, এই নিয়েই তার চলা। একটু বড়ো প্রেক্ষাপটে ফেলে দেখলে তবে তার চলাটা স্পষ্ট হয়।

কিন্তু এখানে সে বিতর্কে ঢোকার অবকাশ আমাদের নেই। সূক্ষ্ম তর্কে না ঢুকে, বিষয়টিকে মোটা প্রেক্ষণীতে রেখেই বলতে পারি, মধ্যযুগের অবসানের কিছু কিছু সূচনা, আধুনিক যুগের আগমনের কিছু কিছু পূর্বাভাস—কিছু জাগরণের লক্ষণ, কিছু আলোকের দীপ্তি, চিন্তা ও অনুভবের কিছু মৌলিক রূপান্তর আমাদের উনিশ শতকের সংস্কৃতিতে নিশ্চিতভাবেই দেখতে পাওয়া গিয়েছিল। তার ব্যাপ্তি, গভীরতা ও স্থায়িত্ব নিয়ে প্রশ্ন ক'রে লাভ নেই। দারিদ্র্য অশিক্ষা এবং নিঃস্বতা যতক্ষণ সমাজগত, বৈষম্য এবং বঞ্চনা যতক্ষণ সমাজব্যবস্থার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী ততক্ষণ সব রেনেসাঁসই আপেক্ষিক, ততক্ষণ সব দীপ্তিই এলাকাবিশেষের দীপ্তি, তার সব দীপ্তিই ক্ষণ-দীপ্তি। আজকের ইতালির দিকে তাকালে কি আমরা লেওনার্দো দা ভিঞ্চির, মিকালেঞ্জেলোর বা পিকো দেলা মিরান্দোলার

কালের আলোক-দীপ্তির কোনো চিহ্ন দেখতে পাব ? উপনিবেশের ক্ষেত্রে যে এই চিন্তা-বিপ্লব ও অনুভব-বিপ্লবের ব্যাপ্তি গভীরতা এবং স্থায়িত্ব কম হবে তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই। রেনেসাঁস নাম না ব্যবহার করতে পারি, কিন্তু সীমিত হলেও সেদিন যে জাগরণটা ঘটেছিল, শৌখিন আত্মনিন্দার ঝোঁকে তাকে যদি দেখেও না দেখি তাহলে সমাজের মধ্যে নিজেকে অতিক্রম করার যে শক্তি সব সময় কাজ করে তাকে অবহেলা করা হবে। সেটা অনৈতিহাসিক।

উনিশ শতকের এই জাগরণকে পুনর্জাগরণও বলা যাবে না। তা পূর্বের কোনো অবস্থার পুনরাবির্ভাব নয়। তা নতুন এবং সেই নতুনত্বের কারণেই তা আধুনিকতার সূচনা-পর্ব। এই সামাজিক ও সাংস্কৃতিক নতুনত্ব যদি না আসত তাহলে আমরা রবীন্দ্রনাথকে পেতাম না। ধ্যান-ধারণায় এই নতুনত্ব না এলে আমরা ধর্মভাবনার ক্ষেত্রে ধর্মসাধনার ক্ষেত্রে কৃষ্ণনন্দ আগম বাগীশকে কি রামপ্রসাদ সেন কিংবা অজু গোঁসাইকে হয়তো পেতাম, কিন্তু রামমোহনকে পেতাম না। রামকৃষ্ণ পরমহংসকে পেতাম কি না জানি না, যদি পাইও, বিবেকানন্দকে পেতাম না, রামকৃষ্ণ মিশনকে পেতাম না। ডিরোজিও বিদ্যাসাগর বঙ্কিমচন্দ্র একটা সাংস্কৃতিক পালা-বদলেরই প্রমাণ। একথা কেমন ক'রে অস্বীকার করা যাবে যে, একই সঙ্গে মননেও অনুভবে একেবারে গোড়া-ঘেঁষা বদল যদি না ঘটত, তাহলে ধর্মচিন্তার এলাকাতে রামমোহন থেকে শুরু করে রবীন্দ্রনাথ বিবেকানন্দ অরবিন্দ পর্যন্ত যে স্থির-বিদ্যুতের দীপ্তি দেখতে পাই, তা দেখা সম্ভব হত না।

মধ্যযুগের অবসানের কিছু আভাস আমরা ভারতচন্দ্রের (১৭১২-৬০) রচনাতেই দেখতে পাই। কিন্তু তার মধ্যে নতুনের কোনো পূর্বাভাস স্পষ্ট নয়। ১৮ শতকের কোথাও সেই নতুনের আভাস মিলবে না। যার মধ্যে মিলবে আমাদের সেই প্রথম আধুনিকের জন্ম হয়েছে পলাশীর যুদ্ধের সতেরো বছর এবং ভারতচন্দ্রের মৃত্যুর চোদ্দবছর পরে ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দে। তিনি রামমোহন রায়। নতুনকে প্রথম পাওয়া যাবে ১৯ শতকের গোড়ায় রামমোহনের ধর্মজিজ্ঞাসাতে। ১৮০৩-০৪ সালে আরবী ভূমিকা সম্বলিত রামমোহনের ফার্সী পুস্তিকা 'তুহ্ফাৎ-উল-মুয়োহাহিদিন' প্রকাশিত হয়। এর মধ্যে পুরানো খানিকটা নতুন মেজাজ এবং নতুন চেহারা নিয়ে দেখা দিয়ে নতুনের পথ পরিষ্কার করেছে। বইটি রামমোহনের একেশ্বরবাদী ধর্মভাবনার প্রথম ঘোষণা। রামমোহনের যুক্তিবাদী মনেরও প্রথম প্রকাশ এইখানেই। পৌত্তলিকতা ও বহুদেবদেবীর পূজার প্রতিবাদ, অদ্বৈত ঈশ্বরতত্ত্ব, ধর্মের ক্ষেত্রে বিচারবুদ্ধির প্রয়োগ, শাস্ত্রের গুরুত্ব অস্বীকার না করেও যুক্তিবিচারকে সর্বোচ্চ মূল্য দেওয়া, এর কোনোটিই হয়তো একান্ত অভিনব নয়, ইসলামের ইতিহাসে এ সবেরই সাক্ষাৎ পাওয়া যাবে, যা অভিনব তা হল রামমোহনের সন্ধান এবং প্রস্তুতি। যথার্থ-অভিনব, যাকে আধুনিক বলতে পারি, তা আসবে আরো পরে। বইটিতে নবম শতকের বিচারবাদী 'মুতাজিলা' সম্প্রদায়ের চিন্তাভাবনার প্রভাব প্রত্যক্ষ। পাশ্চাত্য রেনেসাসের যুক্তিবাদের কোনো প্রত্যক্ষ প্রভাব এ বই-এ পড়বার কথা নয়। পাশ্চাত্য সংস্কৃতির সঙ্গে রামমোহনের ঘনিষ্ঠ পরিচয় ঘটেছে প্রায় প্রৌঢ় বয়সে।

রামমোহনের পরিণত বয়সের মূল্যবোধ মোটামুটি পাশ্চাত্য রেনেসাঁসের মূল্যবোধ।

তাঁর যুক্তির উপর আস্থা, ব্যক্তির মূল্যে বিশ্বাস, তাঁর স্বাধীনতার আদর্শে শ্রদ্ধা এর সবেরই সাক্ষাৎ রেনেসাঁসের চিন্তাভাবনায় মিলবে, ফরাসী-বিপ্লবের আদর্শের মধ্যে পাওয়া যাবে। এই কারণেই তিনি উৎসাহের সঙ্গে ফরাসীবিপ্লবকে অভিনন্দিত করেছিলেন। কিন্তু এইখানেই শেষ নয়। আরো অনেকখানি এগিয়ে গিয়ে তিনি তখনকার নব-অঙ্কুরিত সমাজতান্ত্রিক চিন্তাভাবনাকেও আত্মস্থ করার চেষ্টা করেছেন।

রামমোহন হিন্দু হয়েও সাম্প্রদায়িক ভাবের হিন্দু নন, গভীরভাবে ইস্‌লাম-প্রভাবিত হয়েও—'জবরদস্ত মৌলবী' হয়েও সাম্প্রদায়িক অর্থে মুসলমান নন, বাইবেলে অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা সত্ত্বেও এবং খৃষ্টান-সংসর্গে ডুবে থেকেও তিনি খৃষ্টান নন। রামমোহনের উপর মুতাজিলা-প্রভাব যেমন সত্য, সুফী প্রভাবও তেমনি সত্য। আবার মধ্যযুগের অসাম্প্রদায়িক সন্ত কবীর নানক দাদূ, এঁদের প্রভাবও সমান সত্য। আমরা জানি খৃষ্টান ইউনিটেরিয়ানদের সঙ্গে তাঁর গভীর মতৈক্য আরো গভীর মতৈক্য বেদান্তের অদ্বৈতবাদের সঙ্গে। একদিক থেকে তিনি আচায শঙ্করের মতোই অদ্বৈতবাদী, কিন্তু শঙ্করের মায়াবাদকে তিনি গ্রহণ করেন নি। তিনি গ্রহণ করেছেন তন্ত্রের মায়াতত্ত্বকে, যদিও তান্ত্রিক শক্তিসাধনা থেকে তাঁর অবস্থান বহু দূরে। শুধু তা-ই নয়, মায়ার শাক্ত ব্যাখ্যা গ্রহণ করার ফলে, রামমোহনের অদ্বৈতবাদ আর শঙ্করের অদ্বৈতবাদের মতো বিশুদ্ধ থাকে নি, বেদান্তের ভক্তিবাদী-ধারাগুলির খুব কাছাকাছি চলে এসেছে, সে ধারা শাক্তই হোক আর বৈষ্ণবই হোক।

প্রভাব দিয়ে রামমোহনকে মাপা যাবে না। পরিণত চিন্তায় প্রভাব বড়ো কথা নয়, বড়ো হল রামমোহনের সমন্বয়চেষ্টা। এই সমন্বয়চেষ্টা লক্ষণীয় হয়ে উঠেছে শুধু হিন্দু দর্শন ও হিন্দুশাস্ত্রগ্রন্থাদির অনুশীলনের ফলেই নয়, বিশেষ ক'রে পাশ্চাত্য সংস্কৃতির সঙ্গে গভীর পরিচয়ের ফলে। রামমোহন বিভিন্ন ধর্ম থেকে নিজের বিচার-বুদ্ধি অনুযায়ী, নিজের উপলব্ধি অনুযায়ী এবং নিজের প্রয়োজনমতো অবাধে গ্রহণ করেছেন। বোধকরি ভেবেছেন, এইভাবেই অসাম্প্রদায়িক সর্বধর্মসমন্বয় সম্ভব। রামমোহনের দুই শতাধিক বছর আগে আকবরও এই রকম ভেবেছিলেন। পৈত্রিক ধর্মে তিনি সুন্নী মুসলমান, তাঁর মা শিয়া মুসলমান। বাল্যে তিনি সূফী সংস্পর্শে আসেন, হিন্দু যোগীদের সংস্পর্শেও আসেন। পরিণত বয়সে ইসলাম খৃষ্টান ও ইহুদী ধর্মের একেশ্বরবাদের সঙ্গে হিন্দু ও জরথ্রুষ্ট ধর্মের নানান উপাদান মিলিয়ে, বৌদ্ধ ও জৈনদের অহিংসা এবং সূফী সাধকদের প্রেমভক্তি মিলিয়ে আকবরও এই রকম গ্রহণের মধ্যে দিয়েই তাঁর 'দীন-ই-ইলাহী' ধর্ম প্রচার ক'রে (১৫৫২ খৃঃ) ধর্মসমন্বয়ের চেষ্টা করেছিলেন। রামমোহনের সমন্বয়চেষ্টা আরো বিদগ্ধ এবং যুগধর্মসম্মত। ইসলামের, বেদান্তের এবং খৃষ্টধর্মের একেশ্বরবাদকে নিয়ে অগ্রসর হয়ে রামমোহন এসে পৌছন মানবমৈত্রীতে, মানবভ্রাতৃত্বে। সমন্বয় কতদূর সফল হয়েছে, সে কথা আলাদা, কিন্তু এটা ঠিক মানবভ্রাতৃত্বের আদর্শ বহুদূরগামী—ভাবীকালের হয়তো সব থেকে বড়ো সত্য। একথা ঠিক যে রামমোহন আমাদের দেশের প্রথম বিশ্বনাগরিক, রেনেসাঁস এবং এন্‌লাইটেন্‌মেন্টের আদর্শে উদ্বুদ্ধ প্রথম আধুনিক মানুষ।

মানবভ্রাতৃত্ব বা মানবপ্রেমের পেছনে যদি কোনো তত্ত্ব থাকে তাহলে সেই তত্ত্বকে

নিয়েই গড়ে উঠেছে মানবধর্ম। রামমোহনের পরে সেই কালের একাধিক মনীষী মানবধর্মের কথা বলেছেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁদের একজন। রামমোহন থেকে যে তরঙ্গের আরম্ভ, রবীন্দ্রনাথে এসে সেই তরঙ্গ শীর্ষকে স্পর্শ করেছে।

কথাটা সংস্কৃতি সম্বন্ধে সাধারণভাবে যে রকম সত্য, সংস্কৃতির সব শাখা সম্পর্কে আলাদা করে হয়তো তেমন বলা সম্ভব নয়। ধর্মচিন্তা সম্পর্কেই কি সে রকম বলা সম্ভব? বিশেষত যেখানে দেখি, রবীন্দ্রনাথ রামমোহনের বা দয়ানন্দের বা শ্রদ্ধানন্দের মতো ধর্ম-সংস্কারক নন, বিবেকানন্দের মতো ধর্ম-প্রচারকও নন, কেশবচন্দ্রের মতো কোনো অভিনব ধর্মীয় 'বিধান'ও আমাদের সামনে উপস্থিত করছেন না, সেখানে এ প্রশ্ন উঠতেই পারে। কিন্তু এ প্রশ্নের উত্তর এখানে সম্ভব নয়। প্রথমেই আমাদের জানা দরকার, রবীন্দ্রনাথের পূর্বে এবং রবীন্দ্রনাথের কালে দেশের ধর্মীয় আবহাওয়াটি কেমন ছিল। জানা দরকার, রামমোহন থেকে রবীন্দ্রনাথ, আরো নির্দিষ্ট ক'রে বললে, রামমোহনের 'তুহ্‌ফাৎ-উল্‌-মুয়োহাহিদিন' প্রকাশের কাল (১৮০৩-০৪) থেকে রবীন্দ্রনাথের মৃত্যু (১৯৪১) পর্যন্ত এই কিঞ্চিদধিক সোয়া শ' বছর সময়ে সাধারণভাবে ভারতবর্ষে এবং বিশেষভাবে বঙ্গদেশে ধর্ম-আন্দোলন কোন্ কোন্ খাতে কী ভাবে প্রভাবিত হয়েছিল।

রামমোহনের ঠিক আগে আমাদের সংস্কৃতির প্রবাহ যেমন বেগ হারিয়ে একেবারে তলানিতে এসে পৌঁছেছিল, আমাদের ধর্মভাবনাও তেমনি এই সময় তার জীবনীশক্তি হারিয়ে একেবারে বদ্ধ জলাতে পরিণত হয়েছিল। হিন্দুধর্ম তখন ধর্মচেতনাকে বিসর্জন দিয়ে কতকগুলি অন্ধ আচারের মধ্যে নিজেকে আবদ্ধ করেছিল, ইসলামও তখন জাতিভেদ গুরুবাদ ইত্যাদি অমুসলমানী ব্যবস্থার প্রশ্রয়ে রুদ্ধগতি হয়ে পড়েছিল। সেই সময়ের কথায় রবীন্দ্রনাথ বলেছেন (ভারতপথিক রামমোহন, র/১১.৩৮৩-৮৪), 'শত শত বৎসর চলে গেল—ইতিহাসের পুরোগামিনী গতি হল নিস্তব্ধ, ভারতবর্ষের মনোলোকে চিন্তার মহানদী গেল শুকিয়ে। তখন দেশ হয়ে পড়ল স্থবির, আপনার মধ্যে আপনি সংকীর্ণ, তার সজীব চিত্তের তেজ আর বিকীর্ণ হয় না দূরদূরান্তরে। শুকনো নদীতে যখন জল চলে না তখন তলাকার অচল পাথরগুলো পথ আগলে বসে; তারা অসংলগ্ন, তারা অর্থহীন, পথিকদের তারা বিঘ্ন।...

"তেমনি ছিল অর্থহারা আচারের স্বপ্নজালে জড়িত ভারতবর্ষ, তার আলো এসেছিল নিবে। তার আপনার কাছে আপন সত্যপরিচয় ছিল আচ্ছন্ন। এমন সময় রামমোহন রায়ের আবির্ভাব হল এই দেশে, সেই আত্মবিস্মৃত প্রদোষের অন্ধকারে।"

ঠিক এই অবস্থারই বর্ণনা পাই—এই শুকনো নদীর তলাকার গতিরোধকারী শৈবালের, অচল পাথরের বাধারই বর্ণনা পাই রবীন্দ্রনাথের 'চৈতালি'-র 'দুই উপমা' কবিতায় (র/১/৫৬২)–

> "যে নদী হারায়ে স্রোত চলিতে না পারে,
> সহস্র শৈবালদাম বাঁধে আসি তারে;
> যে জাতি জীবনহারা অচল অসাড়
> পদে পদে বাঁধে তারে জীর্ণ লোকাচার।
> সর্বজন সর্বক্ষণ চলে যেই পথে,

তৃণগুল্ম সেথা নাহি জন্মে কোনোমতে;
যে জাতি চলে না কভু, তারি পথ 'পরে
তন্ত্র-মন্ত্র-সংহিতায় চরণ না সরে।"

'ভারতপথিক রামমোহন রায়' প্রবন্ধেই আর একটা অংশে (৩৯০ পৃঃ) বিশদ ক'রে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, "যখন আমাদের আর্থিক, মানসিক, আধ্যাত্মিক শক্তি ক্ষীণতম, যখন আমাদের দৃষ্টিশক্তি মোহাবৃত, সৃষ্টিশক্তি আড়ষ্ট, বর্তমান যুগের কোনো প্রশ্নের নূতন উত্তর দেবার মতো বাণী যখন আমাদের ছিল না, আপন চিত্তদৈন্য সম্বন্ধে লজ্জা করবার মতো চেতনাও যখন দুর্বল, সেই দুর্গতির দিনেই রামমোহন রায়ের এদেশে আবির্ভাব। প্রবল শক্তিতে তিনি আঘাত করেছিলেন সেই দুরবস্থার মূলে, যা মানুষের পরম সম্পদ স্বাধীনবুদ্ধিকে অবিশ্বাস করেছে।"

উদ্ধৃতির দুটো বাক্যাংশের দিকে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। এক হল— 'বর্তমান যুগের কোনো প্রশ্নের নূতন উত্তর', আর দ্বিতীয় হল—'মানুষের পরম সম্পদ স্বাধীনবুদ্ধি'। রবীন্দ্রনাথ এখানে না-বলেও যে-কথা বলছেন তা হল এই যে বর্তমান যুগের সব প্রশ্নের না হলেও বেশির ভাগ প্রশ্নেরই উত্তর মিলবে স্বাধীনবুদ্ধির কাছে এবং সজাগ স্বাধীনবুদ্ধির মানুষ বলেই রবীন্দ্রনাথ রামমোহনের আবির্ভাবকে এদেশের সমাজ ও সংস্কৃতির পক্ষে একটা যুগান্তর বলে গণ্য করেছেন। এই স্বাধীনবুদ্ধিই রামমোহনের আধুনিকতার প্রথম ও প্রধান অভিজ্ঞান।

মানুষের পরম সম্পদ যে স্বাধীনবুদ্ধি, ধর্মের ক্ষেত্রে—নিছক ধর্মভাবনার ক্ষেত্রে নয়, ধর্মাচরণের ক্ষেত্রে—অনেক সময়ই তার প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী হল একদিকে যেমন শাস্ত্রগ্রন্থ, অন্যদিকে তেমনি আধ্যাত্মিক উপলব্ধি। বস্তুত প্রতিদ্বন্দ্বিতা ত্রিমুখী—শাস্ত্রগ্রন্থ আর আধ্যাত্মিক উপলব্ধির মধ্যেও কঠিন প্রতিদ্বন্দ্বিতা ঘটতে পারে। সব ক্ষেত্রেই প্রতিদ্বন্দ্বিতা ঘটবে এমন কোনো কথা নেই। স্বাধীনবুদ্ধি বা যুক্তি, ধর্মগ্রন্থ বা শাস্ত্রবাক্য আব ব্যক্তির উপলব্ধি বা স্বানুভূতি, এই তিনের কিছুদূর পর্যন্ত সহযোগিতাও ঘটতে পারে, আরো কিছু দূর শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানও ঘটতে পারে, কিন্তু তিনের স্বভাব এমন পৃথক যে শেষ মাল্যটি কার গলায় পড়বে এ নিয়ে তিনের মধ্যে মতান্তর শুধু নয়, মনান্তরও ঘটতে পারে। যদি সেই বিরোধ ঘটে তাহলে ধর্মজিজ্ঞাসু এবং ধর্মপিপাসু ব্যক্তি কার গলায় মালা দেবে, কার আদেশকে সর্বোচ্চ বলে গ্রহণ করবে?

যুক্তির, না শাস্ত্রের, না স্বানুভূতির? প্রশ্নটা জরুরি সন্দেহ নেই, কিন্তু আলোচনার বর্তমান পর্যায়ে সে প্রসঙ্গে প্রবেশ করার সুযোগ আমাদের নেই। আপাতত আমাদের লক্ষ্য রবীন্দ্রনাথের পূর্বের অবস্থা, উনিশ শতকের প্রথমে এদেশে যে ধর্ম-আন্দোলন শুরু হয় তার বিভিন্ন ধারার সংক্ষিপ্ত—এবং অনিবার্যভাবে সরলীকৃত পরিচয়।

রামমোহনের আগের অবস্থার কথা রবীন্দ্রনাথ নিজেই আমাদের কিছু শুনিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের যখন কৈশোর ও যৌবন, আমাদের সংস্কৃতির মান তখন আগের তুলনায় অনেক উন্নত, আমাদের ভাবনা-বেদনা তখন অনেক পরিণত। এখানে 'আমাদের' বলতে বোঝাচ্ছে ইংরেজি-শিক্ষিত শহুরে বাঙালির। বাকি দেশকে—দেশের জনসাধারণকে তখনো জীর্ণ লোকাচার কঠিনভাবে বেঁধে রেখেছে।

ধর্মভাবনার কথাই যদি ধরি, তাহলে রবীন্দ্রনাথে এসে পৌঁছতে পৌঁছতে ভাবনার

অনেক তরংগ আমরা পার হয়ে এসেছি। রামমোহনের পরেই, প্রায় সংগে সংগেই সাক্ষাৎ পেয়েছি 'নব্যবংগের' (Young Bengal) তরুণদের প্রখর যুক্তি ও উদ্ধত অবিশ্বাসের। তার অল্প পরে সাক্ষাৎ পেয়েছি একদিকে বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়কুমার দত্তের মুক্তবুদ্ধির, অন্যদিকে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'আত্মপ্রত্যয়সিদ্ধ জ্ঞানোজ্জ্বলিত বিশুদ্ধ হৃদয়ের' অন্তরংগ স্বানুভূতির। ততদিনে সাক্ষাৎ পেয়েছি বংকিমচন্দ্রের সীমিতভাবে যুক্তিবাদী ধর্মসংস্কারের। ততদিনে সাক্ষাৎ পেয়েছি দেশীয় পজিটিভিজ্‌মের, বাংলায় যাকে বলা হয় ধ্রুববাদ বা প্রত্যক্ষবাদ, সাক্ষাৎ পেয়েছি তাঁদের কোঁৎ-প্রভাবিত নাস্তিক্য, বিজ্ঞানমুখিতা এবং মানবধর্মের। ব্রাহ্মধর্মের কয়েকটা ছোটোবড়ো তরংগ ততদিনে আমরা পার হয়ে এসেছি। অন্যদিকে হিন্দু-রিভাইভ্যাল বা হিন্দু-পুনরুজ্জীবনের একাধিক ধারার সংগেও আমাদের পরিচয় ঘটে গিয়েছে। নাস্তিকতা যদিও ধর্ম নয়, অধর্মও নয়, ঈশ্বরবিশ্বাসের উল্টো পিঠ, তবু ধর্মের আলোচনায় নাস্তিকতার কথা উঠবেই। রামমোহন থেকে রবীন্দ্রনাথ পৌঁছতে নাস্তিকতারই বা কত রকমের ধারার মুখোমুখি আমাদের হতে হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ 'জীবনস্মৃতি' গ্রন্থে তাঁর প্রথম যৌবনের দিনের ভাবপরিমণ্ডলের একটি সুন্দর বর্ণনা দিয়েছেন। লিখেছেন (র/১০.৮৬), "তখনকার কালের য়ুরোপীয় সাহিত্যে নাস্তিকতার প্রভাবই প্রবল। তখন বেন্থাম মিল ও কোঁতের আধিপত্য। তাহাদেরই যুক্তি লইয়া আমাদের যুবকেরা তখন তর্ক করিতেছিলেন। য়ুরোপে এই মিল্-এর যুগ ইতিহাসের একটি স্বাভাবিক পর্যায়। মানুষের চিত্তের আবর্জনা দূর করিয়া দিবার জন্য স্বভাবের চেষ্টা রূপেই এই ভাঙিবার ও সরাইবার প্রলয়শক্তি কিছুদিনের জন্য উদ্যত হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু, আমাদের দেশে ইহা পড়িয়া পাওয়া জিনিস। ইহাকে আমরা সত্যরূপে খাটাইবার জন্য ব্যবহার করি নাই। ইহাকে আমরা শুদ্ধমাত্র একটা মানসিক বিদ্রোহের উত্তেজনারূপেই ব্যবহার করিয়াছি। নাস্তিকতা আমাদের একটা নেশা ছিল। এইজন্য তখন আমরা দুই দল মানুষ দেখিয়াছি। একদল ঈশ্বরের অস্তিত্ববিশ্বাসকে যুক্তি-অস্ত্রে ছিন্নভিন্ন করিবার জন্য সর্বদাই গায়ে পড়িয়া তর্ক করিতেন।...

"আর-একদল ছিলেন তাঁহারা ধর্মকে বিশ্বাস করিতেন না, সম্ভোগ করিতেন। এইজন্য ধর্মকে উপলক্ষ্য করিয়া যত কলা-কৌশল, যতপ্রকার শব্দগন্ধরূপরসের আয়োজন আছে, তাহাকে ভোগীর মতো আশ্রয় করিয়া তাঁহারা আবিষ্ট হইয়া থাকিতে ভালোবাসিতেন; ভক্তিই তাঁহাদের বিলাস। এই উভয়দলেই সংশয়বাদ ও নাস্তিকতা সত্যসন্ধানের তপস্যাজাত ছিল না; তাহা প্রধানত আবেগের উত্তেজনা ছিল।

"যদিও এই ধর্মবিদ্রোহ আমাকে পীড়া দিত, তথাপি ইহা যে আমাকে একেবারে অধিকার করে নাই তাহা নহে। যৌবনের প্রারম্ভে বুদ্ধির ঔদ্ধত্যের সংগে এই বিদ্রোহিতা আমার মনেও যোগ দিয়াছিল। আমাদের পরিবারে যে-ধর্মসাধনা ছিল আমার সংগে তাহার কোনো সংস্রব ছিল না—আমি তাহাকে গ্রহণ করি নাই। আমি কেবল আমার হৃদয়াবেগের চুলাতে হাপর করিয়া মস্ত একটা আগুন জ্বালাইতেছিলাম। সে কেবলই অগ্নিপূজা...।"

পিতার ধর্মসাধনার সংগে যুবক রবীন্দ্রনাথের কিছুমাত্র সংস্রব ছিল না এমন বোধকরি মেনে নেওয়া কঠিন হবে। আরো কঠিন হবে এই কথা মেনে নেওয়া যে যৌবনে রবীন্দ্রনাথ

কেবল হৃদয়াবেগের আগুন জ্বালিয়ে ভাবোন্মত্তভাবে সেই আগুনেরই পূজা করেছেন।

রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ বাদ দিয়ে তাঁর বক্তব্যের অন্য দিকটা দেখা যাক। রবীন্দ্রনাথ এখানে ধর্ম নিয়ে দু'রকম উত্তেজনার কথা বলেছেন। এক, ধর্মবিদ্রোহের উত্তেজনা, অর্থাৎ নাস্তিক্যের উত্তেজনা। আর দুই হল ধর্মকে অবলম্বন ক'রে আবেগ-সম্ভোগের উত্তেজনা। দ্বিতীয় গোত্রে যাদের কথা রবীন্দ্রনাথ এখানে বলেছেন, তাদের হল ধর্মকে বিশ্বাস না করেও তার সম্ভোগের উত্তেজনা, ধর্ম যেখানে নিছক ছলনা মাত্র। আর একটি দলও আছে, তাদের কথা রবীন্দ্রনাথ এখানে বলেন নি, কিন্তু অন্যত্র বলেছেন। তাদের ক্ষেত্রে ধর্ম ছলনা নয়, কিন্তু ধর্ম উপলক্ষ। অবিশ্বাস ক'রে নয়, ধর্মকে বিশ্বাস করেই আসল লক্ষ্যে গিয়ে পৌঁছনো। সে লক্ষ্য হল হৃদয়াবেগের সম্ভোগ। এই রকম হৃদয়াবেগবহুল ভক্তির উত্তেজনা সম্পর্কে 'নৈবেদ্যে'র ৪৫ নং কবিতায় (র/১/৮৮১, বর্তমান সংকলনের ১৫ নং রচনা) রবীন্দ্রনাথ তাঁর সুস্পষ্ট অনাস্থা জানিয়েছেন।

> "যে ভক্তি তোমারে লয়ে ধৈর্য নাহি মানে,
> মুহূর্তে বিহ্বল হয় নৃত্যগীতগানে
> ভাবোন্মাদমত্ততায়, সেই জ্ঞানহারা
> উদ্‌ভ্রান্ত উচ্ছলফেন ভক্তিমদধারা
> নাহি চাহি নাথ।"

কেউ কেউ বলেছেন, বাংলার উনিশ শতকীয় নবজাগরণের সব থেকে উল্লেখযোগ্য দিক হল ধর্ম-জাগরণের দিক। এ কথা উড়িয়ে দেওয়া যায় না। গোটা উনিশ শতক জুড়েই দেখি, গ্রামের লোকধর্মের কথা বাদ দিয়েই বলি—কলকাতা এবং কাছাকাছি অঞ্চলে কত রকম ধর্মসম্প্রদায়, কত রকম প্রচার, কত রকম ধর্মবিতর্ক। এই কারণেই উনিশ শতকের ধর্মীয় প্রেক্ষাপটটিকে আমাদের আর-একটু বিস্তৃত ক'রে দেখা দরকার।

আমরা দেখেছি, আদি-পর্বে অর্থাৎ তুহফাৎ-উল-মুয়োহহিদিনের সময় রামমোহন প্রখর যুক্তিবাদী। যদিও সে-যুক্তি শেষ পর্যন্ত ঈশ্বরে সমর্পিত, তা হলেও ধর্মের ক্ষেত্রে তার ভূমিকা খুব বড়ো। তার কাজ ধর্মীয় সংকীর্ণতা ও অন্ধরক্ষণশীলতাকে আঘাত করা। পরের দিকেও রামমোহন ধর্ম-সংস্কারক নিঃসন্দেহে, কিন্তু তখন তাঁর প্রধান কাজ ধর্ম-সমন্বয়ের। ভেবেছেন, সব ধর্মের যা মূল আদর্শ, সব ধর্মের যা সারকথা, সেই ভূমিতে এসে দাঁড়ালে সেখানে সকলকেই স্পর্শ করা যাবে, সেখানে সব সম্প্রদায়ই একে অপরের সঙ্গে মিলতে পারবে। এই রকম একটি মিলনের কেন্দ্র মনে রেখেই ১৮২৮ সালে রামমোহন ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত করেন। ১৮30 সালে ব্রাহ্মসমাজের ন্যাসপত্রে তিনি ঘোষণা করেন যে, ব্রাহ্মসমাজের উপাসনাগৃহে জাতিবর্ণনির্বিশেষে সকলের প্রবেশ অবারিত থাকবে, উপাসনাগৃহে কোনো বিশেষ ধর্মের বা সম্প্রদায়ের বা কোনো ধর্মগুরুর নিন্দা করা চলবে না। রামমোহন চেয়েছিলেন হিন্দু হিন্দু থেকেই, মুসলমান মুসলমান থেকেই, খৃষ্টান খৃষ্টান থেকেই এখানে এসে মিলবে, ব্রাহ্মসমাজ সর্বধর্মের মিলনকেন্দ্র হয়ে উঠবে, হয়তো এর মধ্যে দিয়েই অলক্ষ্যে মানবভ্রাতৃত্ব এবং ধর্ম সমন্বয় সাধিত হবে। সম্ভবত রামমোহন স্বপ্ন দেখেছিলেন এমন ধর্মের যা কোনো বিশেষ ধর্ম নয় কিন্তু সব ধর্মের সারাৎসার—যা প্রাতিষ্ঠানিক নয়, যা সম্প্রদায়-সম্পর্কশূন্য, নিরালম্ব আধ্যাত্মিক চেতনা। মধ্যযুগের সন্তরা কেউ কেউ খুব নিরালম্ব না হলেও এই রকম উদার ও অসাম্প্রদায়িক ধর্মের দিকে

ঝুঁকেছিলেন। রামমোহনের প্রয়াস আরো সচেতন, সুচিন্তিত এবং যুগোপযোগী।

কার্যত অবশ্য ব্রাহ্মসমাজ সর্বধর্মের মিলনকেন্দ্র হয়ে ওঠে নি, কার্যকর ও সজীব কোনো ধর্মসমন্বয়ও সাধিত হয় নি। প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের পেছনে যে প্রবল এবং প্রায় জৈব সংহতির শক্তি ক্রিয়া করে, ব্রাহ্মসমাজের উদার কিন্তু নিরালম্ব তত্ত্ব সেই রকম বাঁধভাঙা জৈবশক্তির সঞ্চার করতে পারে নি। রামমোহনের মৃত্যুর পর (১৮৩৩) কালক্রমে ব্রাহ্মসমাজ একটি প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মসমাজেরই চেহারা নিয়েছে। ১৮৪৭ সালে তত্ত্ববোধিনী সভার নাম পরিবর্তনের প্রসংগে আত্মজীবনীতে দেবেন্দ্রনাথ লিখেছেন, 'পূর্বে ব্রাহ্মসমাজ ছিল, এখন ব্রাহ্মধর্ম হইল।' ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠার ৫০ বছরের মধ্যে ব্রাহ্মসমাজ প্রধান তিনটি শাখায় বিভক্ত হয়: এক, আদি ব্রাহ্মসমাজ; দুই, ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ বা নববিধান; তিন, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ। ছোট একটি চতুর্থ শাখারও নাম করা যায়, নিরপেক্ষ ব্রাহ্মসমাজ। মূল সমাজ ভেঙে আদি ও ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৬৬ সালে, ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ ভেঙে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠা হয় ১৮৭৮ সালে। ১৮৮০ সালে কেশবচন্দ্র ব্রাহ্মধর্মকে 'নববিধান' বলে ঘোষণা করেন। নববিধানের অন্যতম প্রধান আদর্শ সর্বধর্মের সমন্বয়, সেই আদর্শেই কেশবচন্দ্র একে বলেছেন 'সার্বভৌমিক নববিধান।' বলেছেন (আচার্য কেশবচন্দ্র, ৩য় খন্ড), "হিন্দুস্থানের ব্রহ্ম এখন সমস্ত জগতের ব্রহ্ম হইলেন, বেদান্তের সংগে এখন বেদ, পুরাণ, বাইবেল, কোরাণ, ললিতবিস্তর প্রভৃতি সমুদয় ধর্মশাস্ত্র মিলিল।...ইহাতে সমস্ত নীতি ও সমস্ত ধর্ম একীভূত।"

মূল ব্রাহ্মসমাজ যখন আদি ও ভারতবর্ষীয় এই দুইভাগে বিভক্ত হয় (১৮৬৬), তখন রবীন্দ্রনাথ পাঁচ বছরের বালক–নিজের অগোচরেই তিনি রক্ষণশীল আদি ব্রাহ্মসমাজের সভ্য। কেশবচন্দ্রের নববিধান বা New Dispensation যখন ঘোষিত হল, রবীন্দ্রনাথ তখন উনিশ বছরের নবযুবক। এর ৪ বছর পরে, রবীন্দ্রনাথের বয়স যখন তেইশ (১৮৮৪) তখন তিনি আদি ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক হন এবং তারপর বেশ দীর্ঘকাল তিনি আদি ব্রাহ্মসমাজের সেক্রেটারি ছিলেন। এই সময়ই ধর্ম নিয়ে, বিশেষ করে সত্য নিয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের সংগে রবীন্দ্রনাথের তর্কযুদ্ধ হয়। যে মত-সংঘর্ষ ও বিতর্কের উত্তেজনা ধর্ম-আন্দোলনের নিত্য সহগামী, আদি ব্রাহ্মসমাজের তরুণ সম্পাদক রবীন্দ্রনাথ তখন খানিকটা সম্পাদকীয় দায়িত্ববোধে আর খানিকটা স্রোতের টানে অনিবার্যভাবে সেই উত্তেজনার শরিক হয়ে পড়লেন।

সময়টা ছিল তখন হিন্দুত্বের নবজাগরণের–যাকে বলা হয় হিন্দু-রিভাইভ্যাল, তার। আদি ব্রাহ্মসমাজ অবশ্য তার মূল স্রোত নয়, কিন্তু সে-ও সমান্তরাল একটি ধারা। রিভাইভ্যাল-চেষ্টার যেটি মূল ধারা তার রক্ষণশীল ও একান্ত শাস্ত্রানুগামী কোটিতে আছেন শশধর তর্কচূড়ামণি আর তাঁর অনুগামীবৃন্দ আর তার বিপরীত দিকের কোটিতে অর্থাৎ ইংরেজি শিক্ষা ও পশ্চিমী চিন্তাভাবনার দ্বারা প্রভাবিত যুক্তিবাদী ও হিতবাদী কোটিতে–বলা যেতে পারে, কোঁৎ–প্রভাবিত ভাবাদর্শের কোটিতে আছেন বঙ্কিমচন্দ্র। এই ধারার সন্নিকটে কিন্তু একটু বাইরে, ধর্ম নিয়ে এবং হিন্দুত্ব বা যথার্থ হিন্দুত্ব নিয়ে সমান উৎসাহী অপর একটি ধারা হল আদি ব্রাহ্মসমাজের এবং তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার ভাবনাচিন্তার ধারা।

সকলেই জানেন, দেবেন্দ্রনাথের সামাজিক রক্ষণশীলতার কারণে সনাতনী হিন্দু আচারের অনুগামিতার কারণে এবং সেই সঙ্গে কিছু ক্ষমতার দ্বন্দ্বের কারণেও, সেদিনের অনেক ব্রাহ্ম যুবক কেশবচন্দ্রের নেতৃত্বে দেবেন্দ্রনাথকে পরিত্যাগ ক'রে নতুন ব্রাহ্মসমাজ গঠন করেছিলেন এবং তদবধি আদি ব্রাহ্মসমাজের পক্ষে হিন্দুধর্মের অভিমুখিতা বাধাহীন হয়ে উঠেছিল। আদি ব্রাহ্মসমাজের সভ্যেরা নিজেদের ধর্মত্যাগী বলে বিবেচনা করতেন না, নিজেদের শ্রেষ্ঠ হিন্দু ব'লে, পরিশীলিত হিন্দুত্বের শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি বলেই গণ্য করতেন। কিন্তু হিন্দুত্বের অ-ব্রাহ্ম প্রতিনিধি বা প্রবক্তা বা ব্যাখ্যাকার তখন অনেক, কেননা সময়টা হিন্দু-রিভাইভ্যালের। শশধর তর্কচূড়ামণি যেমন আছেন, তেমনি বঙ্কিমচন্দ্রও আছেন। হিন্দুসমাজের এইসব বিভিন্ন ধারার নেতারা সাধারণভাবে ব্রাহ্মদের স্বধর্মত্যাগী বলেই গণ্য করতেন। বঙ্কিমচন্দ্র এবং দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর পরস্পরের বন্ধু, কিন্তু তাঁদের শাস্ত্রব্যাখ্যা ভিন্ন রকমের। এবং ধর্ম নিয়ে দ্বিজেন্দ্রনাথ পত্রিকায় বঙ্কিমচন্দ্রের মতের প্রতিবাদও করেছেন। গীতার তত্ত্ব, কোঁৎ-এর ধ্রুববাদ (পজিটিভিজম্) এবং নিজের অসামান্য যুক্তি-বুদ্ধি ও সমন্বয়-প্রতিভার সংযোগে বঙ্কিমচন্দ্র হিন্দুত্বের যে সুসংস্কৃত রূপ সেদিন সকলের সামনে তুলে ধরেছিলেন, তখনকার অধিকাংশ শিক্ষিত হিন্দু তাকেই আসল হিন্দুধর্ম বলে গণ্য করেছিলেন। এ ক্ষেত্রে কিছু ভাব-সংঘর্ষ, কিছু মতান্তর এবং মনান্তর অনিবার্য। আদি ব্রাহ্মসমাজের সেক্রেটারি হিসেবে রবীন্দ্রনাথ যে এর মধ্যে জড়িয়ে পড়বেন এটা খুবই স্বভাবিক। বয়সে নিতান্ত তরুণ ব'লে তাঁর তর্কের মধ্যে কিছু অবিনয় যে প্রকাশ পাবে, এ-ও বোধকরি অস্বাভাবিক নয়। তিনি যে বেশি রকম জড়িয়ে পড়ার আগেই নিঃশব্দে এর থেকে বেরিয়ে এলেন এইটেই বিস্ময়ের। এবং এইখানেই রবীন্দ্রনাথের নিজত্বের প্রকাশ।

ঘটনাটা সকলেরই সুবিদিত। রবীন্দ্রনাথ যে বছর আদি ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক হলেন (১৮৮৪), সেই বছরই 'ধর্মজিজ্ঞাসা' ও 'হিন্দুধর্ম' নামে বঙ্কিমচন্দ্রের দুটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। শেষোক্ত প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র সত্য সম্পর্কে যে অভিমত প্রকাশ করেন, রবীন্দ্রনাথ 'একটি পুরাতন কথা' প্রবন্ধে(ভারতী, অগ্রহায়ণ, ১২৯১) সেই অভিমতের তীব্র প্রতিবাদ করেন। আদি-ব্রাহ্মসমাজের তরফ থেকে বঙ্কিমচন্দ্রের হিন্দুধর্ম বিষয়ক অভিমতের প্রতিবাদ এই প্রথম নয়। এই সব পরিস্থিতির কারণেই এই বিতর্ক খানিকটা সাম্প্রদায়িক চেহারা—অর্থাৎ হিন্দু-ব্রাহ্ম বাদানুবাদে চেহারা নিয়েছিল।

'হিন্দুধর্ম' প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র বলেছিলেন, সত্য সব সময় লোকহিতের সঙ্গে যুক্ত। যা লোকসমাজের পক্ষে অহিতের, বাইরের চেহারায় সত্য হলেও আসলে তা সত্য নয়। যা লোকের হিতকর, বাইরের চেহারায় মিথ্যা হলেও আসলে তা সত্য। রবীন্দ্রনাথ প্রতিবাদ করে বলেছিলেন, সত্য কোন-কিছুর সাপেক্ষ নয়, তা প্রসঙ্গক্ষেত্র অনুযায়ী বদলায় না—সত্য হল শুভ্র, নিরঞ্জন এবং অপরিবর্তনীয়। মিথ্যা কোনো অবস্থায় সত্য হয় না, সত্যও কখনো মিথ্যা হয় না। রবীন্দ্রনাথের এই প্রতিবাদের প্রত্যুত্তরে কিছু বেদনা এবং একটু উত্তাপের সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র লিখলেন 'আদি ব্রাহ্মসমাজ ও নব্য হিন্দু সম্প্রদায়' প্রবন্ধটি (প্রচার, অগ্রহায়ণ ১২৯১)। যা তলায় চাপা ছিল, এইবারে সেই হিন্দু-ব্রাহ্ম সাম্প্রদায়িক চেহারাটি বেরিয়ে এল। বঙ্কিমচন্দ্র লিখলেন যে এর আগে আদি ব্রাহ্মসমাজ তাঁকে তিনবার আক্রমণ করেছে, তরুণ রবীন্দ্রনাথের এই প্রবন্ধটি হল চতুর্থ আক্রমণ।

লিখলেন, 'আক্রমণের তীব্রতা পরদায় পরদায় উঠিতেছে।' এর পরেই রবীন্দ্রনাথ 'কৈফিয়ৎ' নামে একটি স্নিগ্ধ প্রবন্ধ লিখলেন (ভারতী, পৌষ ১২৯১)।

বঙ্কিমচন্দ্র আর কোনো পাল্‌টা প্রবন্ধ লিখলেন না, কিন্তু রবীন্দ্রনাথকে একটি ব্যক্তিগত চিঠি দিলেন। 'জীবনস্মৃতি'-তে সে কথা রবীন্দ্রনাথ এই ভাবে বলেছেন (র/১০/১১৬), "এই বিরোধের অবসানে বঙ্কিমবাবু আমাকে যে একখানি পত্র লিখিয়াছিলেন আমার দুর্ভাগ্যক্রমে তাহা হারাইয়া গিয়াছে—যদি থাকিত তবে পাঠকেরা দেখিতে পাইতেন বঙ্কিমবাবু কেমন সম্পূর্ণ ক্ষমার সহিত এই বিরোধের কাঁটাটুকু উৎপাটন করিয়া ফেলিয়াছিলেন।"

রবীন্দ্রনাথ-বঙ্কিম বিরোধের অবসান ঘটল, কিন্তু তত্ত্বগত মতভেদ কি এইভাবে মুছে ফেলা যায়? সত্য সম্বন্ধে—এবং সেই সঙ্গে ধর্ম সম্বন্ধেও—বঙ্কিমচন্দ্রের দৃষ্টি স্পষ্টতই মিল্ বেন্হামের দৃষ্টি—উপযোগিতাবাদ বা ইউটিলিটেরিয়ানিজমের দৃষ্টি, কিন্তু আরো প্রত্যক্ষভাবে মহাভারতের পিতামহ ভীষ্মের দৃষ্টি, অর্থাৎ মহাভারতকারের দৃষ্টি। এ দৃষ্টি সত্যকে এবং ধর্মকেও দেখে লোকসংসারের মাঝখানে রেখে। রবীন্দ্রনাথ এখনো সত্যকে এই রকম মানবিক ক'রে, এই রকম ব্যাবহারিক মাপে দেখতে অভ্যস্ত নন, তিনি এখনো সত্যকে নির্বস্তুকভাবে, অবচ্ছিন্ন বা এ্যাবস্ট্রাক্টভাবে দেখতেই অভ্যস্ত।

মতান্তর থেকে যেটুকু ব্যক্তিগত গ্লানি তা মুছে গেল, কিন্তু হিন্দু-ব্রাহ্ম সাম্প্রদায়িক মনান্তরও কি নিঃশেষে মুছে গেল? তা মোছে নি। তার প্রমাণ 'নৌকাডুবি' এবং 'গোরা' উপন্যাসে (যথাক্রমে ১৯০৬ এবং ১৯১০) পাওয়া যাবে। 'গোরা' উপন্যাসের রচনাকালে (১৯০৭-১০) এ মনান্তর সজীব। শরৎচন্দ্রের 'দত্তা' (১৯১৮) বা 'গৃহদাহ' (১৯২০) রচনার কালেও যে সাম্প্রদায়িক মনোভাবের অবসান ঘটে নি তা তো আমরা প্রত্যক্ষই দেখতে পাই। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের মন থেকে সাম্প্রদায়িকতার ভাব আগে থেকেই কাটতে শুরু করেছিল, 'গোরা' রচনার কালে তা সম্পূর্ণ মুছে গিয়েছে, তা না হলে 'গোরা' রচনা সম্ভব হত না। এই সময়ে রবীন্দ্রনাথের মনোভাবের প্রসঙ্গে 'রবীন্দ্রজীবনী'তে (১ম খন্ড, ১৯৬১ সং, পৃ ২৩৭) প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় বলেছেন, 'রবীন্দ্রনাথ ব্রাহ্মসমাজভুক্ত হইলেও ব্রাহ্মসমাজের গন্ডি ধীরে ধীরে কাটিয়া ফেলিতেছিলেন। তাঁহার কাছে স্বাদেশিকতার উগ্রতা যেমন ব্যর্থ, ব্রাহ্মসমাজের গন্ডিকাটা ধর্মও আজ তেমনি নিরর্থক।...গন্ডিমাত্রই তাঁহার কাছে অসত্য...।...গন্ডি—যতই মোহন নামে মানুষের কাছে আসুক—দেশের নামে, ধর্মের নামে—কবির মনে তাহা সায় পায় না।"

হিন্দু-ব্রাহ্ম পরিস্থিতির নিরপেক্ষ পরিচ্ছন্ন এবং সংবেদনশীল চিত্র যেমন 'গোরা' উপন্যাসে পাওয়া যাবে, তেমনি আর একটা জিনিসও এই উপন্যাসে পাওয়া যাবে। সেহল রবীন্দ্রনাথের মানবতা-অভিমুখী ধর্মভাবনার অনতি-প্রচ্ছন্ন পূর্বাভাস, বহুজন পূজিত গন্ডি-দেবতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ।

ভিন্ন আধুনিকতর সভ্যতার সঙ্গে দ্বন্দ্বে যে জাগরণ ঘটে, তার একটা মুখ যেমন আধুনিকতার দিকে, অন্য একটা মুখ তেমান অবধারিত ভাবেই ঐতিহ্যের অভিমুখী। সাংস্কৃতিক আক্রমণের ক্ষেত্রে ঐতিহ্যই হয় প্রতিরোধের পাদপীঠ, আত্মতার আশ্রয়। আমাদের ক্ষেত্রেও তাই ঘটেছে। তার মধ্যে অনেকখানি যেমন প্রয়োজনীয় এবং সুস্থ, তেমনি অনেক আছে যা অসুস্থ, যা মিথ্যা আত্মাভিমান, যা অন্ধ লোকাচারের প্রশ্রয়।

সেদিনের হিন্দু-পুনরুজ্জীবনে সুস্থ অসুস্থ নানা রকম ধারাই ছিল। এক দিকে বঙ্কিমচন্দ্র বিবেকানন্দ অরবিন্দ যেমন এই পুনরুজ্জীবনের শরিক, অন্য প্রান্তে তেমনি শশধর তর্কচূড়ামণিও ছিলেন এর শরিক। তখন দেশে থিয়োসফির চর্চা শুরু হয়েছিল। হিন্দু-রিভাইভ্যালের কোনো কোনো শাখার সংগে অলৌকিকতার সূত্রে থিয়োসফির বেশ হৃদ্যতাও ঘটেছিল। প্রসংগটা 'জীবনস্মৃতি' থেকে রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলি (র/১১/১১৫),

'এই সময়ে [নবজীবন ও প্রচার পত্রিকায় বঙ্কিমচন্দ্রে হিন্দুধর্ম নিয়ে প্রবন্ধ রচনার কালে অর্থাৎ ১৮৮৪ সাল নাগাদ] কলিকাতায় শশধর তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের অভ্যুদয় ঘটে। বঙ্কিমবাবুর মুখেই তাঁহার কথা প্রথম শুনিলাম। আমার মনে হইতেছে, প্রথমটা বঙ্কিমবাবুই সাধারণের কাছে তাঁহার পরিচয়ের সূত্রপাত করিয়া দেন। সেই সময় হঠাৎ হিন্দুধর্ম পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞানের সাক্ষ্য দিয়া আপনার কৌলীন্য প্রমাণ করিবার যে অদ্ভুত চেষ্টা করিতেছিল তাহা দেখিতে দেখিতে চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। ইতিপূর্বে দীর্ঘকাল ধরিয়া থিয়সফিই আমাদের দেশে এই আন্দোলনের ভূমিকা প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছিল।

"কিন্তু বঙ্কিমবাবু যে ইহার সংগে সম্পূর্ণ যোগ দিতে পারিয়াছিলেন তাহা নহে। তাঁহার 'প্রচার' পত্রে তিনি যে ধর্মব্যাখ্যা করিতেছিলেন তাহার উপর তর্কচূড়ামণির ছায়া পড়ে নাই, কারণ তাহা একেবারেই অসম্ভব ছিল।"

নব্য-হিন্দুত্বের আন্দোলন ও শশধর তর্কচূড়ামণির প্রসংগে রবীন্দ্রনাথ থিয়োসফির কথা তুলেছেন। তা একদিকে যেমন হিন্দু-রিভাইভ্যাল থেকে একটু আলাদা, অন্য দিকে তেমনি তারই শরিক। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'ইতিপূর্বে দীর্ঘকাল ধরিয়া থিয়সফিই আমাদের দেশে এই আন্দোলনের [নব্য হিন্দুত্বের আন্দোলনের] ভূমিকা প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছিল।'— এখানে আমাদের দুটি মন্তব্য আছে। এক, 'ইতিপূর্বে দীর্ঘকাল ধরিয়া' আসলে খুব দীর্ঘকাল নয়, প্রায় একই সময়, বলা যায়, ১৮৭৯ সালে মাদাম ব্লাভাৎস্কি ও কর্ণেল অলকটের ভারতবর্ষে আগমনের পর থেকে। দ্বিতীয়, থিয়োসফি যত না নব্য হিন্দুত্বের আন্দোলনের ভূমিকা প্রস্তুত করেছে, নব্য হিন্দুত্বের আন্দোলন তার থেকে বেশি থিয়োসফিকে পুষ্টি দিয়েছে। কিন্তু সে-পুষ্টিও যৎসামান্য।

থিয়োসফি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের যে বিশেষ আগ্রহ ছিল এমন মনে হয় না। 'ক্ষুধিত পাষাণ' গল্পে (১৩০২ শ্রাবণ, ১৮৯৫) রেলগাড়ির রহস্যময় সহযাত্রীর কথায় ঈষৎ কৌতুক - বিজল্পিত সুরে বলেছেন, "এমন কি, আমার থিয়সফিস্ট আত্মীয়টির মনে দৃঢ় বিশ্বাস হইল যে, আমাদের এই সহযাত্রীর সহিত কোনো এক রকমের অলৌকিক ব্যাপারের কিছু একটা যোগ আছে—কোনো একটা অপূর্ব ম্যাগনেটিজম্ অথবা দৈবশক্তি, অথবা সূক্ষ্ম শরীর, অথবা ঐ ভাবের একটা কিছু।" অতি প্রাকৃত ও অলৌকিকে আস্থা, রহস্যপূর্ণ গূঢ় বিদ্যার অনুশীলন, এ-সব দীর্ঘকালের তাতে সন্দেহ নেই। জাদুশক্তি, প্রেতচর্চা, এ-ও দীর্ঘকালের, নানা দেশেই এর সন্ধান পাওয়া যাবে, থিয়োসফির অনেক দিনের চর্চা। কিন্তু প্রাচ্য গুপ্তবিদ্যা এবং শশধরীয় কায়দায় বৈজ্ঞানিক বুকনির সংগে মিলিত হয়ে যে নতুন থিয়সফি গড়ে উঠেছিল, উনিশ শতকের শেষের দিকে ভারতবর্ষে হঠাৎ যার আবির্ভাব ঘটে, তার ইতিহাস দীর্ঘকালের নয়। যে-থিয়োসফি নব্য হিন্দুত্বের আন্দোলনের ভূমিকা প্রস্তুত করেছিল বলে রবীন্দ্রনাথ আমাদের জানিয়েছেন, তা বেশি

দিন আগের নয়, নব্য হিন্দুত্বের আন্দোলনেরই সমকালের।

এই নব্য থিয়োসফির ইতিহাস অনেকেরই সুবিদিত। স্বামীর সঙ্গে বিচ্ছিন্ন হবার পর রাশিয়ান মহিলা মাদাম ব্লাভাৎস্কি নানা জায়গা ঘুরে আমেরিকায় উপস্থিত হয়ে কর্ণেল অল্‌কটের সহযোগিতায় নিউ ইয়র্কে থিয়োসফিক্যাল সোসাইটির প্রতিষ্ঠা করেন। তারপর ভারতবর্ষকেই উপযুক্ত জায়গা বিবেচনা করে ১৮৭৯ সালে দুজনে ভারতে চলে আসেন এবং থিয়োসফির প্রচার শুরু করেন। পরে ১৮৮৩ সালে তাঁরা মদ্রাজের কাছে আদিয়ারে থিয়োসফিক্যাল সোসাইটির আন্তর্জাতিক কর্মকেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত করেন। ভারতে থিয়োসফি প্রভাবশালী হয়ে ওঠে খানিকটা এ্যানি বেশান্ট, ওয়াদিয়া, অরুণডেল প্রমুখদের চেষ্টায় যেমন, ঠিক তেমনি অলৌকিকতা, প্রেতচর্চা, গুপ্তবিদ্যা, সূক্ষ্ম শরীর ইত্যাদি রহস্যময় ব্যাপারের প্রতি হিন্দুমনের স্বাভাবিক টানের কারণেও। সেদিন নব্য হিন্দুত্বের ঝোঁক আর থিয়োসফির ঝোঁক অনিবার্যভাবেই একে অপরের সহায়তা করেছে। তবে একথা মানতেই হবে যে নব্য হিন্দুত্বের আন্দোলন অতি বিস্তৃত ও বহুশাখান্বিত ও বহুস্তরান্বিত প্রবাহ, এবং তার দু' একটি ধারা যথেষ্ট গভীর। সেই তুলনায় থিয়োসফির ধারা অগভীর ও শীর্ণ, জাতীয় জীবনে তার শিকড় প্রবেশ করতে পারি নি।

রবীন্দ্রনাথ 'জীবনস্মৃতিতে' ধর্মের ব্যাপারে নিজের অল্প বয়সের কালের দু-রকম উন্মাদনায় কথা বলেছেন। এক, নাস্তিক্যের বা নিরীশ্বরবাদের উন্মাদনা। দুই, বিশ্বাসহীনের রসসম্ভোগের উন্মাদনা। এই প্রসঙ্গে আরো যে দুটি ধারার নাম আনেন নি, তার একটি হল উন্মাদনাহীন নিরাবেগ যুক্তিবাদী-নাস্তিকতা। আর অন্য ধারাটি হল বিশ্বাসীর রসসম্ভোগের উন্মাদনা। দুটির কথাই রবীন্দ্রনাথ বলেছেন শিল্পের ভাষায়, 'চতুরঙ্গ' উপন্যাসে (১৯১৬)। 'চতুরঙ্গে'র শচীশের জ্যাঠামশাই জগমোহন চরিত্রে রবীন্দ্রনাথ নাস্তিকতার একটি উন্মাদনা বর্জিত স্থির বিচারশীল মহিমান্বিত রূপ তুলে ধরেছেন। দেখিয়েছেন, গভীরভাবে আত্মসচেতন এবং কর্তব্যসচেতন নাস্তিকও থাকতে পারে, যে নাস্তিক বলেই নিজের স্বনির্বাচিত কর্মসাধনায় বেশি নিষ্ঠাবান। দেখিয়েছেন, নাস্তিকেরও একটা ধর্ম থাকতে পারে। সে ধর্ম হল, লোকহিত, ধনী দরিদ্র উচ্চনীচ জাতিবর্ণ নির্বিশেষে লোকসেবা। জ্যাঠামশাইয়ের কাছে আর্ত মানুষ মাত্রেই দেবতা। ভাইয়ের উত্তেজিত প্রশ্নের উত্তরে জগমোহন বলেছেন, "হাঁ, আমার এই চামার মুসলমান দেবতা।" হিন্দুরা সাকারকে মানে, ব্রাহ্মরা নিরাকারকে মানে আর জগমোহন মানেন সজীবকে। এই সজীব অত্যন্ত প্রত্যক্ষ। জগমোহন প্রত্যক্ষবাদী। উপন্যাসের গোড়াতেই যে রকম বলা হয়েছে তাতে বুঝতে পারি, শচীশ পজিটিভিজম সংক্রান্ত বই পড়েছে এবং তার জ্যাঠামশাই তত্ত্বগতভাবে পজিটিভিজ্‌মের দ্বারাই উদ্বুদ্ধ। নাস্তিকতার উন্মাদনা যে জগমোহনের কিছুমাত্র ছিল না তা নয়, কেননা দেখতে পাচ্ছি তিনি প্রচন্ড তার্কিক। কিন্তু নিছক উন্মাদনা তাঁর লক্ষ্য একেবারেই নয়, তাঁর লক্ষ্য মানবকল্যাণ।

'চতুরঙ্গ' উপন্যাসে কেবল পজিটিভিস্ট গোত্রের নাস্তিকের কথাই নেই, একেবারে বিপরীত গোত্রের এক আস্তিক গুরুর কথাও আছে। তিনি হলেন লীলানন্দ স্বামী। তাঁর সাধনা হল রসের সাধনা, কীর্তনানন্দে মাতোয়ারা হবার সাধনা। এ হল প্রেমভক্তির উন্মাদনা। ভারতবর্ষে রসসাধনা অনেক দিনের, কিন্তু যে বিশেষ ধরণের গুরু ও তাঁর বিশেষ ধরণের রসসাধনার ব্যাপার 'চতুরঙ্গ' উপন্যাসে দেখতে পাই, তা নব্য গুরুবাদ

এবং নব্য রসসাধনা। তার সংগে যোগ হিন্দু-রিভাইভ্যাল আন্দোলনের। কিন্তু নব্য রসসাধনার আগে পজিটিভিস্টদের প্রসংগ এবং তাঁদেরও আগে প্রথম পর্বে নাস্তিক তরুণদের প্রসংগ। সেইটে আগে সেরে নেওয়া দরকার।

রামমোহনের কালের শেষভাগে উনিশ শতকের কুড়ির দশকের শেষে এবং তিরিশের দশকের গোড়ায় এই বিদ্রোহী তরুণদের আবির্ভাব ঘটেছিল। এঁরা যুক্তিবাদী—সবার উপর যুক্তিই সত্য তাহার উপর নাই, এই ছিল এদের মন্ত্র। এঁরা নাস্তিক, লোকাচার ও ঐতিহ্যে আস্থাহীন এবং শাস্ত্রবিরোধী। ডিরোজিও এঁদের নেতা। গোষ্ঠী হিসেবে এঁদের বলা হয় ইয়ং বেংগল বা নব্যবংগ।

এঁরা ছিলেন অনেকটা দার্শনিকপ্রবর ডেভিড হিউমের মতো সন্দেহবাদী, স্কেপটিক। তার্কিক এঁরাও, এঁদের ছিল অবিশ্বাসের উন্মাদনা, ভাঙবার উন্মাদনা। আসল উন্মাদনা তারুণ্যের, দুঃসাহসের। মনে রাখতে হবে, ডিরোজিও, তারাচাঁদ চক্রবর্তী প্রমুখ দু-তিন জনকে বাদ দিলে এই গোষ্ঠীর সকলেরই জন্ম শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে। ডিরোজিওর জন্ম ১৮০৯ সালে, তারাচাঁদ চক্রবর্তীর ১৮০৬ সালে। যে-সময়ে নাস্তিকতা ও দুর্নীতিপ্রচারের অভিযোগে হিন্দু কলেজ থেকে ডিরোজিওর চাকরি যায় (১৮৩১), সে সময়ে তাঁর বয়স মাত্র বাইশ। এই বয়সটাই উন্মাদনার। তা সত্ত্বেও ডিরোজিওর নাস্তিকতা ঠিক উন্মাদনার নাস্তিকতা নয়, দার্শনিক গোত্রের নাস্তিকতা। আমরা জানি, ডিরোজিও যত্ন ক'রে হিউমের দর্শন পড়েছেন। কান্টের দর্শনের খন্ডন প্রয়াসে তিনি যে প্রবন্ধ লিখেছিলেন তৎকালে তা অনেকের কাছে উচ্চ প্রশংসা পেয়েছিল। রামমোহনকে যদি বাদ দিই, তাহলে এই ইয়ং বেংগল তরুণরাই ছিলেন নতুন কালের প্রথম অগ্রণী বুদ্ধিজীবী, বিপ্লবী ইনটেলিজেন্টসিয়া, যাঁরা নতুনের পথ ক'রে দিতে এগিয়ে আসেন। এঁরা গতানুগতিককে আঘাত ক'রে পথ পরিষ্কার ক'রে না দিলে হয়তো পজিটিভিস্টদের আবির্ভাব আরো বিলম্বিত হত। হয়তো রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাবও বিলম্বিত হত। রবীন্দ্রনাথ 'জীবনস্মৃতি'তে দার্শনিক সন্দেহবাদ বা দার্শনিক নাস্তিক্যের কথা কিছু বলেন নি। সম্ভবত 'জীবনস্মৃতি'র কালে (গ্রন্থাকারে প্রকাশ ১৯১২ সালে, রচনাকাল আনু ১৯১১) অর্থাৎ গীতাঞ্জলি-পর্বে রবীন্দ্রনাথের মন যে-রকম রসনিমগ্ন ছিল, যে-কোনো রকম সন্দেহবাদ বা নাস্তিক্য তার থেকে বহুদূরবর্তী। কোনো রকম নিমগ্ন অবস্থাই যুক্তির জন্য অবকাশ রাখে না। মগ্নতাই যখন আস্বাদ্য তখন জ্ঞানও বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে। বৈষ্ণব সাধক কৃষ্ণদাস কবিরাজ 'চৈতন্যচরিতামৃত' সেই কথাই বলেছেন : রসজ্ঞ কোকিল যখন প্রেমাম্রমুকুলের আস্বাদন করে, তখন অরসজ্ঞ কাক চোষে জ্ঞাননিম্বফল।

যুক্তিবাদ যে অবধারিতভাবে নাস্তিকতাতেই পৌঁছবে তা অবশ্য বলা যায় না। অথবা ঈশ্বরবিশ্বাস যে সব সময় যুক্তিবিনাশী, তা-ও সব সময় বলা যায় না। কার্যক্ষেত্রে আস্তিক্যবাদ ও যুক্তি পাশাপাশি রফা ক'রেও থাকতে পারে। যেমন মুতাজিলা-সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রে ছিল। কিংবা যেমন রেনেসাঁসের অনেক মনীষীর ক্ষেত্রেই ছিল। কিংবা যেমন রামমোহনে ছিল। কিংবা ডী-ইস্ট যাঁরা তাঁদের ক্ষেত্রে থাকে। ডী-ইস্টদের কথায় একটু পরেই আমরা আসব, আপাতত এইটুকুই শুধু বলার যে আস্তিক্যবাদের সংগে যুক্তির বিরোধ না থাকতে পারে, কিন্তু মগ্নতার সংগে আছে। গভীর বিশ্বাসের মধ্যে, নিবিড় প্রেম বা ভক্তির মধ্যে যে একটা সর্বসমর্পণের ভাব আছে তা যুক্তির অপেক্ষা রাখে

না। ধর্ম বলতে আমরা পরম এক মগ্নতাকেই বুঝি। তা বিচারের অধিকারের বাইরে। যতক্ষণ বিচার বা বুদ্ধি বা জ্ঞানের এলাকায় আছি, ততক্ষণ সন্দেহও আছে, প্রশ্নও আছে—ততক্ষণ খোঁজার শেষ নেই, কোনো পাওয়াতেই পাওয়ার সমাপ্তি নেই। ভক্তিতে সব প্রশ্নের, সব অন্বেষার অবসান।

আমরা দেখেছি কার্যক্ষেত্রে ধর্মের ও যুক্তির চমৎকার রফা ঘটে যায়। অনেকে সেই রকম রফা-পরায়ণ যুক্তিকে যুক্তি বলে মানবেন না। অন্যদিকে রফা-পরায়ণ হিসেবী ধর্মকেও অনেকে ধর্ম বলে মানতে কুণ্ঠিত হবেন। ধর্ম বলতে কেউ বোঝেন শাস্ত্রবাক্যের অনুসরণ, কেউ বোঝেন অন্তরের, অন্তরঙ্গ উপলব্ধি। বিবেকানন্দ বলেছেন, যে শাস্ত্রবাক্য যুক্তির দ্বারা সমর্থিত হয় না, খণ্ডিত হয়, তা গ্রহণীয় নয়। এ কথা রেনেসাঁসের আদর্শপুষ্ট মন যেমন সহজে বলতে পারে সনাতনী আদর্শের মানুষ তা পারে না। তাছাড়া শাস্ত্রবাক্যকে যদি অযৌক্তিক বিধায় পরিত্যাগ করা যায়, উপলব্ধিকেও কি এইভাবে বাতিল করা যায়? শাস্ত্রবাক্যের দাবি নিঃশর্ত স্বীকৃতি, ধর্মভাবেরও স্বাভাবিক দাবি তাই। অন্যদিকে যুক্তির দাবিও শর্তহীন। এক্ষেত্রে দ্বন্দ্ব অনেক সময়ই অনিবার্য হয়ে পড়ে। যুক্তি চিরবিদ্রোহী। যুক্তি যখন মাথা নিচু করে অন্যের সহযোগিতা করে, বুঝতে হবে সে আর যুক্তি নয়। তাহলে দুয়ের বিরোধের ক্ষেত্রে ধর্মবিশ্বাস বা ভক্তিই কি মাথা নিচু ক'রে যুক্তির পিছনে পিছনে চলবে? অথবা, দুয়ের এলাকা কি ভাগ ক'রে দেওয়া হবে, যেমন রামমোহন বলেছেন? শাস্ত্রবাক্যের জন্য আধ্যাত্মিক এলাকা আর যুক্তির জন্য ব্যবহারিক জগৎ—সংসার বা কর্মক্ষেত্র? জীবনের এ-রকম দ্বিখণ্ডীকরণ কি স্বাভাবিক বা সম্ভব?

যাঁরা 'প্রাকৃতিক-ধর্মে' বা natural religion-এ আস্থাশীল, বুদ্ধির নিজের মধ্যেই যে স্বাভাবিক ঈশ্বরবিশ্বাস ও ধর্মবোধ আছে মানুষের সেই সহজাত ধর্মবোধে যাঁরা বিশ্বাসী, ধর্মবোধ যাঁদের কাছে যুক্তির স্বধর্ম, তাঁদের কোনো উভয়সংকট নেই। তাঁরা ভৌত-বিজ্ঞানের কঠিন কার্যকারণের ছাঁচের মধ্যে জগৎকে আর ছাঁচের বাইরে – একেবারে ধরাছোঁয়ার বাইরে ঈশ্বরকে বসিয়ে দিতে পারেন, তাঁদের ক্ষেত্রে যুক্তি আর ধর্মকে নিয়ে তেমন কোনো সংকট নেই। এখানে এলাকাভাগ বা দ্বিখণ্ডীকরণ ঘটছে না, কেননা ঈশ্বর এই মতে এত দূরবর্তী যে জীবনের ক্ষেত্রে তাঁর কোনো এলাকাই নেই। এই হল ডী-ইস্ট মতের সার কথা যে জগৎটা যন্ত্র। তার জন্য আছে বিজ্ঞান, আছে যুক্তি। ধর্ম তারই স্বাভাবিক সম্প্রসারণ। সুতরাং ডী-ইস্ট যুক্তিবাদী থেকেই ঈশ্বরবিশ্বাসী হতে পারেন।

ডী-ইজম্ অবশ্য কোনো সুগ্রথিত সুসংবদ্ধ ঈশ্বরতত্ত্ব নয়। এর সীমারেখা খুব সুস্পষ্ট নয়, এবং আমরা নানা গোত্রের ডী-ইস্টের সাক্ষাৎ পাব। তবু মোটামুটি বলা যায় যে, হারবার্ট থেকে, বিশেষ ক'রে জন লক্ থেকে এই তত্ত্ব একটা মতবাদের রূপ নিয়েছে। রুশো ভল্‌তেয়ার নিউটন হিউম মোটামুটি এঁরা সকলেই ডী-ইস্ট বলে গণ্য। অনেকে অবশ্য ডী-ইজম্‌কে ছদ্মবেশী নাস্তিকতা বলেই মনে করেন। ডী-ইস্টদের মতে ঈশ্বর এবং জগৎ পরস্পরের বাইরে। ঈশ্বরের কাজ শুধুই সৃষ্টি করা, আর কোনো ভূমিকা জগৎ ব্যাপারে ঈশ্বরের নেই। সৃষ্টিকার্যের পর জগতের পক্ষে ঈশ্বর থেকেও নেই। সৃষ্টির পরে – জগৎ চলে আপন স্বাধীন নিয়মে, অর্থাৎ বিজ্ঞানের ব্যতিক্রমহীন নিয়মে

কার্যকারণের পরম্পরায়। জগৎ যেন একটি বিশুদ্ধ যন্ত্র, যেন চিরকালের জন্য দম-দেওয়া একটি বিশাল ঘড়ি, চলছে নিজের মতো যান্ত্রিকভাবে। এর মধ্যে ঈশ্বরের কোথাও কোনো হস্তক্ষেপ নেই। সুতরাং ডী-ইস্টদের মতে – অন্তত অধিকাংশ ডী-ইস্টদের মতে – ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা জানানো অর্থহীন। জগতে বিজ্ঞানই সত্য, যুক্তিই সত্য, ধর্ম এরই সহগামী। এই বিজ্ঞানে সমর্পিত ধর্ম আদৌ ঈশ্বরকে কেন মানে ? মানে জগৎকে দেখে। ঈশ্বরকে মানে সৃষ্ট-জগতের বিচিত্র কলাকৌশলকে দেখে, তার জটিলতা ও বৈচিত্র্যকে দেখে, জগতের সামঞ্জস্য ও সংগতিকে দেখে। ডী-ইস্টের যুক্তিতে ঈশ্বরকে ডেকে লাভ নেই, প্রার্থনায় ফল নেই। আমাদের দেশের প্রখর যুক্তিবাদী ডী-ইস্ট অক্ষয়কুমার দত্ত (১৮২০) তো স্পষ্টই বলেছেন যে, ঈশ্বর কখনো কারো স্তবে বা প্রার্থনায় প্রাকৃতিক নিয়ম লংঘন ক'রে কিছু করেন না।

ডী-ইস্টরা যেভাবে জগতের সত্তা আর ঈশ্বরের সত্তাকে পৃথক ক'রে রাখেন তাতে তাঁদের দ্বৈতবাদী বললে ভুল হয় না। রামমোহন যেভাবে শঙ্করের মায়াবাদকে অস্বীকার ক'রে মায়িক জগৎকে সত্তাবান বলে বিবেচনা করেছেন, তাতে তাঁর অদ্বৈতবাদের মধ্যে দ্বৈতের স্বীকৃতি স্থান পেয়ে গেছে। এই দ্বৈততা না থাকলে ভক্তির অবকাশ থাকে না। রামমোহনের শিষ্য দেবেন্দ্রনাথ সে কথা জোর দিয়ে বলেছেন। রবীন্দ্রনাথেও অনেক জায়গাতেই তার প্রতিধ্বনি পাব। রামমোহন একই সংগে অদ্বৈতবাদী এবং ভক্তিবাদী, তদুপরি প্রখর যুক্তিবাদী। রামমোহনের অদ্বৈতবাদ যদি আর-একটু দুর্বল হত, তাঁর ঈশ্বর যদি আরো দূরবর্তী হত, তাহলে অনায়াসে তাঁকে আমরা ডী-ইস্ট বলতে পারতাম।

রামমোহন যেমন যুক্তিবাদী হয়েও আস্তিক, তেমনি যুক্তিবাদী নাস্তিকও অনেক আছেন। আবার অনেক যুক্তিবাদী আছেন, যাঁরা অজ্ঞেয়তাবাদী (Agnostic)। প্রাকৃতিক সমস্ত কিছুর ক্ষেত্রে আছে বিজ্ঞান, কিন্তু ঈশ্বর কেউ আছেন কি না জানি না, জানা যায় না, জানার প্রয়োজনও নেই এই হল অজ্ঞেয়তাবাদীর কথা। যা জানা যায় না সেখানে নীরব থাকাই ভালো, এই হল অজ্ঞেয়তাবাদীর অভিমত। আমাদের দেশে অজ্ঞেয়তাবাদ প্রসংগে অনেকেই ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০) ও তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় তাঁর সহকর্মী সুহৃদ অক্ষয়কুমার দত্তের নাম ক'রে থাকেন। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার পরিচালক দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর তো দুজনকেই সরাসরি নাস্তিক বলেছেন। যুক্তিবাদী এঁরা দুজনেই। যে-ঈশ্বর যুক্তির অতীত তেমন ঈশ্বরে এঁরা বিশ্বাস করেন না। যুক্তির রাজ্যে যে ঈশ্বরের কোনো হস্তক্ষেপ নেই, এঁরা তেমন ঈশ্বরকে মানতে প্রস্তুত। প্রকৃতপক্ষে এঁরা দুজনেই ডী-ইস্ট।

রামমোহনের একটা দিক যুক্তিবাদী, শেষের দিকে সেই যুক্তিবাদের সংগে ক্রমশই পাশ্চাত্য রেনেসাঁসের মানব-অভিমুখিতা এসে যুক্ত হয়েছে। এই সংযোগের ফলেই তিনি বুদ্ধি দিয়ে ফরাসীবিপ্লবকে সমর্থন করতে পেরেছিলেন। এইখানেই শেষ নয়, এই মানবপ্রেমের আদর্শের টানেই তিনি আরো অনেকখানি এগিয়ে গিয়েছিলেন। রবার্ট ওয়েন প্রমুখ সমাজতান্ত্রিক নেতাদের সংগে তাঁর প্রীতির সম্পর্ক ছিল। তাঁদের সমাজতন্ত্রকেও রামমোহন পুরোপুরি সমর্থন করতে পারতেন যদি তা নিরীশ্বরবাদী ও ধর্মবিরোধী না হত। এ সব সত্ত্বেও তিনি সমাজতন্ত্রের সাফল্য কামনা করেছেন (রবার্ট ওয়েনের পুত্র ডেল

ওয়েনকে লিখিত রামমোহনের ১৯ এপ্রিল ১৮৩৩-এর পত্র, "রামমোহন সমীক্ষা" দিলীপকুমার বিশ্বাস পৃ ৬২২-২৩)। ঠিক এই রকমই দেখতে পাই এক শতাব্দী পরে রবীন্দ্রনাথের রুশবিপ্লবের ও তৎপরবর্তী সাম্যবাদী প্রয়াসের সাফল্য কামনা, "...সর্বমানবের তরফে তাকিয়ে যখন ভাবি তখন একথা মনে আপনি আসে যে, নব্যরাশিয়া মানবসভ্যতার পাঁজর থেকে একটা বড়ো মৃত্যুশেল তোলবার সাধনা করচে যেটাকে বলে লোভ। এ প্রার্থনা মনে আপনিই জাগে যে, তাদের এই সাধনা সফল হোক।" (অমিয় চক্রবর্তীকে লেখা রবীন্দ্রনাথের ৭ মার্চ ১৯৩৫-এর চিঠি, চিঠিপত্র-১১, পৃ ১৪৬)।

রামমোহনকে শুধু যুক্তিবাদী বললে, অথবা শুধু শাস্ত্রপন্থী বললে, অথবা শুধু ভক্তিবাদী বা উপলব্ধিপন্থী বললে ভুল হবে। অনেক দিক থেকে অনেক রকম উপাদান এসে রামমোহনে মিলিত হয়েছে। কতদূর সুসমন্বিত হয়েছে, সে কথা স্বতন্ত্র। একেশ্বরবাদ যে রামমোহন ইসলামের কাছ থেকেই নিয়েছেন, এমন হয়তো বলা সংগত হবে না। কিন্তু তাঁর যৌবনের একেশ্বরবাদ যে ইসলামের সমর্থনে পুষ্টি পেয়েছে তাতে সন্দেহ নেই। রামমোহনের স্বাভাবিক প্রবণতাই হয়তো যুক্তি-অভিমুখী, কিন্তু একথা মানতেই হবে যে, অন্তত প্রথম দিকে রেনেসাঁসের যুক্তিবাদ নয়, মুতাজিলা যুক্তিবাদই তাকে প্রেরণা দিয়েছে. যদিও রামমোহনের পরিণত চিন্তায় রেনেসাঁসের প্রভাবই প্রবলতর হয়ে উঠেছিল। রামমোহনের ধর্মচিন্তায় প্রেম-ভক্তির ভাবটি পুষ্টি পেয়েছে সূফীবাদের প্রভাব থেকে, অর্থাৎ মূলত ইসলামী সূত্রে। রামমোহনের ধর্মচিন্তায় বাউল-সংযোগের কিছু ছাপ পড়েছে, খানিকটা সূফীবাদের সূত্রে, খানিকটা হয়তো বাউলদের সংগে সাক্ষাৎ পরিচয়ের সূত্রে। এমনও জানা গিয়েছে যে ঘোষপাড়ার কর্তাভজা-সম্প্রদায়ের তখনকার গুরু দুলালচাঁদের সংগে এবং রংপুরের মীরগঞ্জ দেওয়ানতলার ফকির-দরবেশের সংগে রামমোহনের সাক্ষাৎ পরিচয় ছিল, কিছু আলাপ-আলোচনাও হয়েছিল। হিন্দু সূত্র বেদ, উপনিষদ, বেদান্ত এবং তন্ত্র, এরা প্রভাব নয়, রামমোহনের পক্ষে এরা সরাসরি উত্তরাধিকার। কিন্তু এই উত্তরাধিকার ছিল বিস্মৃতির অন্ধকারে, একে রামমোহনের অর্জন করতে হয়েছে। সেই সংগে অর্জিত হয়েছে বাইবেল, খৃষ্টান ধর্মতত্ত্বের মূল্যবান উপাদান। নানা উৎস থেকে আহরণ সম্ভব হয়েছে যে উদারতার ফলে, এই আহরণই আবার সেই উদারতাকে পুষ্টি দিয়েছে, মন থেকে সব রকম সাম্প্রদায়িকতার চিহ্ন মুছে ফেলে সব ধর্মের মিলনের জন্য দরজা খুলে রেখেছে। সব থেকে যা রামমোহনের চিন্তায় শেষ পর্যন্ত বেশি গুরুত্ব পেয়েছে তা হল রেনেসাঁসের এবং এন্‌লাইটেনমেন্টের ভাবসম্পদ – যুক্তি ও বুদ্ধিতে আস্থা, বিজ্ঞানের অগ্রগতিতে বিশ্বাস, মানুষে আস্থা, মানুষের শুভবুদ্ধিতে বিশ্বাস। এইখানেই শেষ নয়, এই উদার মানবিকতা বা হিউম্যানিজমের টানেই ফরাসীবিপ্লবের সাম্য মৈত্রী ও স্বাধীনতার আদর্শে অকুণ্ঠ আস্থা। এই বলিষ্ঠ মানবিকতাই রামমোহনের চিন্তাকে খানিকটা সমাজতন্ত্রমুখীও ক'রে তুলেছে।

এসব কথা বার বার উল্লেখ করছি রবীন্দ্রনাথকে মনে রেখেই। রামমোহনের এই যে বহু উৎসের তীর্থবারি দিয়ে ঘট ভরা, এইটের উপর জোর দিতে চাইছি বিশেষ ক'রে এই কারণে যে, রবীন্দ্রনাথের ধর্মচিন্তাতেও আমরা এই রকম নানা দিক থেকে আহরণ দেখতে

পাব। আরম্ভ হয়েছে উপনিষদে, সে যেন সহজ উত্তরাধিকার। তারপর দীর্ঘ পথ-পরিক্রমা, শেষ হয়েছে মানবধর্মে। চলতে চলতে উপনিষদের সংগেই নানা উৎস থেকে নানান ভাবসম্পদ এসে মিশেছে। রামমোহনের মতো রবীন্দ্রনাথও যুক্তিবাদী, রবীন্দ্রনাথও রেনেসাঁসের আদর্শে উদ্বুদ্ধ। দুজনেরই জিজ্ঞাসা প্রবল, মানবমুখিতাও প্রবল। রবীন্দ্রনাথ উপনিষদকে নিজের মতো ক'রে ব্যাখ্যা করে নিজের মনের মতো করে নিয়েছেন, গীতা থেকে নিয়েছেন, রামায়ণ মহাভারত থেকে নিয়েছেন, বুদ্ধদেবের জীবন ও সাধনা থেকে নিয়েছেন, কালিদাসের শৈব জীবনদর্শন থেকে নিয়েছেন, বৈষ্ণবের প্রেমভক্তি থেকে নিয়েছেন, তাতে মিশেছে সূফীবাদের ধারা, মধ্যযুগের সন্তদের সাধনার ধারা, সহজিয়াদের, বাউলদের, ফকির-দরবেশদের সাধনার ধারা। চলতে চলতে কখন যে উপনিষদের ব্রহ্ম সহজিয়া রস-সাধনার সংগে মিশে গিয়েছে, মানবধর্মে মিশেছে, তার হদিশ করা কঠিন। রামমোহনকে বুঝলে রবীন্দ্রনাথের এই অবিরত সন্ধান, নিরন্তর আহরণ এবং নিজের সংগে অন্তহীন বোঝাপড়ার তাৎপর্য আমাদের কাছে অনেক স্পষ্ট হবে। যে বলিষ্ঠ হাঁ-ধর্মী মন আমরা রামমোহনে দেখতে পাই, যার জন্য রামমোহনকে রেনেসাঁসের প্রতিনিধিস্থানীয় পুরুষ বলে গণ্য করতে পারি, রবীন্দ্রনাথেও আমরা সে হাঁ-ধর্মী সর্বভুক মনের সাক্ষাৎ পাব। একটি জিনিস রামমোহনে দেখতে পাব না, রবীন্দ্রনাথে পাব, তা হল এই যে, রবীন্দ্রনাথ সমস্ত আহরিত সম্পদকে পরিপাক ক'রে সম্পূর্ণ রবীন্দ্রায়িত করে নিয়েছেন। সৃজনের এই আগুন রামমোহনে ছিল না।

আরো একটা তফাতের সূত্র এইখানেই – রবীন্দ্রনাথের সৃজনশীলতার মধ্যেই পাওয়া যাবে। রামমোহন রবীন্দ্রনাথ দুজনেই ঐতিহ্যপ্রেমিক। কিন্তু রামমোহন অনেক দিক থেকে খাঁটি জ্ঞানমার্গী, যাকে বলা যেতে পারে স্কলার – ঐতিহ্যের পুনরুদ্ধারে সতত সচেষ্ট। রবীন্দ্রনাথ যে একেবারেই জ্ঞানমার্গী নন তা বলা যাবে না, কিন্তু তিনি স্কলার নন, তিনি শিল্পী। ঐতিহ্যের পুনরুদ্ধার তাঁর কাজ নয়। তিনি যা করেছেন তা ঐতিহ্যের পুনর্নির্মাণ, নতুন সৃষ্টি। তাঁর উপনিষদও তাই, রামায়ণ মহাভারত ও তাই, তাঁর বৈষ্ণবতাও তাই। সূফী থেকে, বাউল দরবেশ থেকে তাঁর আহরণ, সে-ও তাই, নতুন সৃষ্টি।

পরবর্তী ধর্ম-আন্দোলনের দিক থেকে দেখলে, অর্থাৎ ঐতিহাসিকভাবে দেখলে রামমোহনের কয়েকটি বিশেষ দিক আলাদা তাৎপর্য পাবে। মনে হবে রামমোহনই যেন পরবর্তীদের জন্য কয়েকটি পথ তৈরী ক'রে দিয়েছেন। আসলে তা নয়, পথ ইতিহাসের তৈরি, রামমোহনে প্রথম অর্ধস্ফুট রূপ নিয়েছে। যেমন রামমোহনের যুক্তিবাদ। কিংবা যেমন রামমোহনের প্রাচ্যাভিমান, তাঁর ঐতিহ্য-সন্ধান। তৃতীয় যেমন তাঁর সূফীবাদী ঝোঁক, তাঁর প্রেম-ভক্তির দিক। চতুর্থ তাঁর গণমুখিতা। এবং সব থেকে বড়ো বা সব থেকে তাৎপর্যপূর্ণ—তাঁর মানবমুখিতা। এর প্রত্যেকটিই যেন ধর্মসাধনার এক-একটা আলাদা আলাদা ভাব, আলাদা-আলাদা পথ। পরের এক-এক দল পথিক যেন এর এক-একটা পথ বেছে নিয়ে সেই পথ ধরে এগিয়ে গিয়েছেন।

প্রথমে ধরা যাক যুক্তিবাদের পথ। রামমোহনের অব্যবহিত পরে এই পথেই পাব ডিরোজিও ও নব্যবংগ-সম্প্রদায়কে—তাঁদের তর্ক, তাঁদের অবিশ্বাস, তাঁদের ঐতিহ্যে অবজ্ঞা, তাঁদের জ্ঞানান্বেষণ, তাঁদের নাস্তিক্যকে। পরের ধাপের অক্ষয়কুমার ও

বিদ্যাসাগরের যুক্তিবাদ। প্রত্যক্ষের প্রতি তাঁদের আগ্রহ, বিজ্ঞানে আগ্রহ, তাঁদের অজ্ঞেয়তাবাদ, মতান্তরে তাঁদের ডী-ইজ্‌ম্‌। সময়টা উনিশ শতকের মাঝামাঝি।

তার পরের ধাপে, উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে, বিশেষ ক'রে মিল-এর— 'Utilitarianism' (১৮৬১) এবং 'Auguste Comte and Positivism' (১৮৬৫) প্রকাশের পর আমরা সাক্ষাৎ পাব মিল-এর উপযোগবাদ (ইউটিলিটেরিয়ানিজম্‌)-প্রভাবিত এবং কোঁৎ-এর ধ্রুববাদ (পজিটিভিজ্‌ম্‌)-প্রভাবিত বঙ্কিমচন্দ্রের। এটা হল বঙ্গদর্শন প্রকাশের কাল (১৮৭২)। বঙ্কিমচন্দ্র অবশ্য উপযোগবাদ এবং পজিটিভিজ্‌মের সংগে খুব বেশি দূর যান নি। যান নি বা যেতে পারেন নি প্রধানত দুই কারণে। প্রথম কারণ তাঁর প্রবল নিজত্ব। দ্বিতীয় কারণ সময়ের সংগে সংগে বঙ্কিমচন্দ্র ক্রমেই বেশি রকম ঐতিহ্যভক্ত ও প্রাচ্যাভিমানী হয়ে উঠেছেন, ক্রমেই চারপাশের 'বাবু'দের কলোনিয়াল আধুনিকতার প্রতি বিরূপ হয়ে উঠেছেন এবং ক্রমেই বিশিষ্ট অর্থে 'হিন্দু' ও হিন্দুধর্মের প্রবক্তা হয়ে উঠেছেন। যাকে হিন্দু-পুনরভ্যুত্থান বা হিন্দু-রিভাইভ্যাল বলে, ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক, তার সংগে বঙ্কিমচন্দ্র খানিকটা নিজেকে মিলিয়ে দিয়েছেন, যদিও সম্পূর্ণ নিজের কায়দায়, যুক্তিবাদের সংগে যথাসম্ভব সংগতি রাখার চেষ্টার মধ্যে দিয়ে। সে যা-ই হোক, বঙ্কিমচন্দ্রের পরিণত চিন্তাকে পজিটিভিস্ট-গোত্রে না ফেলাই সংগত। সুতরাং বঙ্কিমচন্দ্রের কথা পরে।

পজিটিভিজম্‌ বা ধ্রুববাদ আসলে এম্‌পিরিসিজ্‌মের—লক-বার্কলে-হিউমের ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষবাদী চিন্তাধারারই বিশেষ ধরণের সম্প্রসারণ। এর প্রধান প্রেরণা সমাজকল্যাণ, সমাজ-মনের উন্নতিবিধান, কুসংস্কারমুক্তি। এই মতবাদ সব রকম অতীন্দ্রিয়তাবাদের বিরোধী, সুস্পষ্টভাবে সব রকম অলৌকিকতাবাদের বিরোধী। ইন্দ্রিয়জ্ঞানই সব জ্ঞানের মূল উৎস, যা প্রত্যক্ষগোচর, যা আছে বলে নিশ্চিত জানি, বিজ্ঞান যাকে সমর্থন করে, যা ধ্রুব—পজিটিভ, একমাত্র তা-ই সত্য, এই হল পজিটিভিজ্‌মের মূল বক্তব্য। এই বক্তব্যের ক্ষেত্রে ভাবনাসূত্রে কোঁৎকে হিউম দিদেরো প্রভৃতি প্রভাবশালী দার্শনিকদের সংগে সহজেই মিলিয়ে নেওয়া যায়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের সংগে মেলানো যাবে না।

পজিটিভিজম্‌-কে যদি সুগঠিত দর্শন-প্রস্থান হিসেবে না দেখে একটি প্রত্যক্ষতা বা অভিজ্ঞতা-অভিমুখী বিজ্ঞান-অভিমুখী এবং অলৌকিকতা-বিরোধী প্রবণতা হিসেবে দেখি, তাহলে দর্শনের ইতিহাসে একাধিকবার এই রকম পজিটিভিষ্ট প্রবণতার সাক্ষাৎ পাব। পজিটিভিজমের পুরনো তরংগগুলি এখানে আমাদের লক্ষ্য নয়, ঠিক যেমন পরবর্তীকালের অর্থাৎ বিংশ শতকের লজিক্যাল পজিটিভিজম্‌ও আমাদের লক্ষ্য নয়। এখানে যে পজিটিভিজম্‌ আমাদের লক্ষ্য তা উনিশ শতকের পজিটিভিজম্‌। এর প্রথম প্রবক্তা জনকল্যাণকামী, জনসাধারণের– বিশেষ ক'রে শ্রমিকের মুক্তিকামী সমাজতন্ত্রী ভাবুক এবং সমাজতত্ত্ববিদ সাঁৎ সিমোঁ, মার্কসের উপর যাঁর প্রভাব নিয়ে অনেকেই আলোচনা করেছেন। উনিশ শতকীয় পজিটিভিজ্‌মের পরবর্তী এবং আরো বেশি পরিচিত নেতা হলেন অগ্যুস্ত কোঁৎ (১৭৯৭-১৮৫৮)। মিল্‌ বেন্থাম প্রমুখ উপযোগবাদী দার্শনিকেরা অনেকেই কোঁৎ-এর দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত। এঁরা সকলেই উনিশ শতকের বাঙালি বুদ্ধিজীবী মহলে বিশেষ প্রভাবশালী হয়ে উঠেছিলেন। বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে পজিটিভিজ্‌মের প্রতিষ্ঠা খুব বিস্তৃত এলাকায় ছিল না, কিন্তু তার

অলক্ষ্য প্রভাব বহুদূরগামী।

পজিটিভিজম্ বিজ্ঞান-প্রভাবিত এবং বৈজ্ঞানিক মেজাজের দর্শন। একে সুগঠিত দর্শন না বলে বিজ্ঞানমুখী দৃষ্টিভঙ্গী বা জীবনদর্শন বলাই বোধকরি বেশি সংগত। দর্শন-প্রস্থান হিসেবে পজিটিভিজমের যতখানি স্বীকৃতি, দৃষ্টিভঙ্গী হিসেবে, মানস-প্রবণতা হিসেবে তার প্রভাব আরো অনেক বেশি বিস্তৃত। যুবক রবীন্দ্রনাথ পজিটিভিজ্‌মকে সমর্থন করেন নি। সেই সময়টাতে রবীন্দ্রনাথ গভীরভাবে ঈশ্বর-বিশ্বাসী এবং অধ্যাত্মবাদী ব্রাহ্মকর্মী। তা সত্ত্বেও পজিটিভিজ্‌মের মানবপ্রেম সম্বন্ধে তিনি যথেষ্ট শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। পজিটিভিজ্‌মের বৈজ্ঞানিক মানস-প্রবণতাও তাঁর শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছিল। এমন কি এঁদের নাস্তিক্যকেও তিনি ভিতর থেকে দেখবার চেষ্টা করেছেন, দেবেন্দ্রনাথ দ্বিজেন্দ্রনাথ প্রমুখের দ্বারা বহুনিন্দিত পজিটিভিস্ট নাস্তিক্যও রবীন্দ্রনাথের সহানুভূতি থেকে বঞ্চিত হয় নি। এর প্রমাণ পাই 'চতুরঙ্গ' উপন্যাসের জ্যাঠামশাই জগমোহনের চরিত্রচিত্রণে।

কোঁৎ বলেছেন, বিজ্ঞানই জ্ঞানের আসল পথ, অন্য কোনো পথ নেই। এই পথকে খুঁজে পেতে মানুষের অনেক সময় লেগেছে, অজ্ঞানতা বা অর্ধ-জ্ঞানের একাধিক স্তরকে পেরিয়ে আসতে হয়েছে। কোঁৎ সমাজ-বিবর্তনে সমাজের তিনটি ধাপের, সেই সংগে নরনারীর মানসিকতারও তিনটি ধাপের কথা বলেছেন। প্রথম ধাপটি ধর্মীয়, ঈশ্বর-তত্ত্ব দেবতত্ত্ব-মূলক—থিয়োলজিক্যাল ধাপ, মিথ্যা কল্প-কথার স্তর। এই ধাপে মানুষের মনের প্রভু হল পাদ্রী পুরোহিত ইত্যাদি। এই স্তরে মানুষের কল্পনা দেবদেবীর জন্ম দেয়। দ্বিতীয় ধাপটিকে কোঁৎ বলেছেন অধিবিদ্যার ধাপ, মেটাফিজিক্যাল ধাপ, বিমূর্ত ভাবনার ধাপ। এই ধাপে বুদ্ধি নিজেকে ছাড়িয়ে বিশৃংখলার রাজত্বের প্রতিষ্ঠা করে, মানুষের সামাজিক দায়িত্ববোধ নষ্ট হয়ে যায়। তৃতীয় ধাপটি হল কোঁৎ-এর নিজের কালের ধাপ যখন মানুষ বিজ্ঞানকে যথার্থভাবে গ্রহণ করতে শিখেছে। এই হল নিশ্চিতি বা ধ্রুবত্বের ধাপ—পজিটিভ ধাপ। সমস্ত ধোঁয়াটে ভাবমার্গী কথা, সমস্ত পুরাণ-কল্পনা, সমস্ত অলৌকিকতাকে বিসর্জন দেওয়ার মধ্যে দিয়েই মানুষ এই প্রত্যক্ষজ্ঞানের ধ্রুবত্বের ধাপে এসে উপনীত হয়।

পজিটিভিস্টরা সাধারণভাবে নিরীশ্বরবাদী। কিন্তু এঁদের অনেকের মনেই একটা অখন্ডতা ও পূর্ণতার প্রত্যয়ও লালিত হয়েছে, এমন সত্যের প্রত্যয় যা ব্যক্তিবিশেষের থেকে অনেক বড়ো। সেই সংগে এঁদের মনে আছে মানব-কল্যাণের আদর্শ। এই পূর্ণতার আদর্শ ও মানব-কল্যাণের আদর্শ দুইকেই এঁরা মিলিয়ে দিয়েছেন মানব-সমগ্রতার সংগে। এই মানব-সমগ্রতাতেই অলক্ষে আরোপিত হয়েছে মহিমা। এই মানব-সমগ্রতাকে সামনে রেখেই এঁদের মানবধর্ম বা religion of humanity-র কথা বলেছেন। একেবারে পরিণত বয়সে রবীন্দ্রনাথ যে Religion of Man- এর কথা বলেছেন তা এর থেকে নিঃসন্দেহে দূরবর্তী, কিন্তু সে দূরত্ব দুস্তর নয়।

কোঁৎ-এর ঈশ্বরবর্জিত মানবধর্মে ঈশ্বরের স্থান নিয়েছে মানব আর ধর্মের স্থান নিয়েছে মানব কল্যাণ। কোঁৎ এক সময় রোমান ক্যাথলিক ছিলেন। সেই কথা স্মরণ করে টি. এইচ. হাক্স্‌লে কোঁৎ-এর মানবধর্ম প্রসংগে ঠাট্টা করে বলেছেন, এ হচ্ছে খৃষ্টানীবর্জিত ক্যাথলিক ধর্ম, "Catholicism minus Christianity." মানবধর্ম বিষয়ে কোঁৎ-কে

নিয়ে নয়, বন্ধু হ্যারিসনকে নিয়ে আরো কঠিন পরিহাস করেছেন বিয়াত্রিস ওয়েব। বলেছেন, মানবধর্মের প্রয়াস হচ্ছে "a valiant effort to make religion out of nothing; a pitiful attempt by poor humanity to turn its head round and worship its own tail." এই পরিহাস রবীন্দ্রনাথের মানবধর্মকে স্পর্শ করে কি না তা বিবেচনা করার স্থান আপাতত এটা নয়, আমাদের দৃষ্টি এখন উনিশ শতকের ধর্ম-আন্দোলনের ধারাগুলির দিকে নিবদ্ধ রাখতে চাই।

ভারতবর্ষে পজিটিভিজ্‌মের ঢেউ এসেছে প্রধানত মিল বেন্হামের সঙ্গ ধরে। অবশ্য কিছু ফরাসী ভাষা জানা ভারতবাসীও ছিলেন, তাঁরা সাক্ষাৎভাবেই কোঁৎ-এর বই পড়েছেন। সে সময়ে হেনরি কটন প্রমুখ কয়েকজন ইংরেজ রাজকর্মচারীও এদেশে পজিটিভিজম্ প্রচারে উদ্যোগী হন। কলকাতার বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের মধ্যে যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ, দ্বারকানাথ মিত্র, কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য, রামকমল ভট্টাচার্য, এঁদের নাম উল্লেখযোগ্য। কলকাতায় সে সময়ে একটি পজিটিভিস্ট ক্লাবও প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। পজিটিভিজ্‌মের অন্যতম প্রধান বিরোধী তখন আদি ব্রাহ্মসমাজ এবং ঠাকুরবাড়ীর ভারতী ও তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা। এই দুই পত্রিকাতেই তখন পজিটিভিজ্‌ম নিয়ে কিছু বিতর্কও শুরু হয়েছিল। এই বিতর্কে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরও যোগ দিয়েছিলেন। আদি ব্রাহ্ম-সমাজের সেক্রেটারি রবীন্দ্রনাথ তখন চব্বিশ-পঁচিশ বছরের যুবক। এইখানেই যোগ করা দরকার যে এই সব তর্ক-বিতর্কে পজিটিভিজ্‌মের বিশেষ ক্ষতিবৃদ্ধি কিছু হয় নি। যাতে ক্ষতি হয়েছে, যার জন্য বেশি গভীরে বা বেশি দূরে শিকড় চালাতে পারে নি সে হল সম্পূর্ণ বিপরীত গোত্রের জোরালো একটি আন্দোলন। যুক্তিবাদের পেছনে যেমন ছিল রেনেসাঁসের শক্তি, অর্থাৎ আধুনিকতার শক্তি, এই বিপরীত আন্দোলনের পেছনেও ছিল তেমনি হিন্দুত্বের শক্তি বা ঐতিহ্যের শক্তি। এই বিপরীত-আন্দোলনই হল হিন্দু-রিভাইভ্যাল, হিন্দু-পুনরভ্যুত্থান।

পজিটিভিজ্‌মের বেগ ক্রমে মন্দীভূত হল বটে, কিন্তু পজিটিভিজম্ দুটি মূল্যবান দান রেখে গেল। একটি তার বিজ্ঞানমুখিতা, অপরটি তার মানবমুখিতা। এই দান থেকে রবীন্দ্রনাথও বঞ্চিত হন নি। 'জীবনস্মৃতি' গ্রন্থে (১৯১২) নাস্তিকতা নিয়ে রবীন্দ্রনাথ কিছু কটাক্ষ করেছেন বটে, কিন্তু তার চার বছরে পরে 'চতুরঙ্গ' উপন্যাসে (১৯১৬) তিনি নাস্তিক কিন্তু মানবপ্রেমী মানুষের উজ্জ্বল ছবি এঁকেছেন জ্যাঠামশাই জগমোহনে। এই গোত্রের মানবপ্রেমিক নাস্তিকদের উদ্দেশ্য করেই আরো ষোলো বছর পরে 'পরিশেষ' কাব্যগ্রন্থের (১৯৩২) 'ধর্মমোহ' কবিতায় রবীন্দ্রনাথ দ্ব্যর্থহীন ভাষায় উচ্চারণ করেছেন (র/২/৯৬৪, সংকলনের ১২১ নং রচনা)—

"নাস্তিক সেও পায় বিধাতার বর,
ধার্মিকতার করে না আড়ম্বর।
শ্রদ্ধা করিয়া জ্বালে বুদ্ধির আলো,
শাস্ত্রে মানে না, মানে মানুষের ভালো।"

যুক্তিবাদী প্রধান ধারাগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় এইখানেই শেষ করে, এইবারে স্বাভাবিকভাবেই আমরা ভক্তিবাদী ধারার প্রসঙ্গে আসতে পারতাম। কিন্তু তার আগেই আমাদের রামমোহনের অন্য একটি দিকের প্রসঙ্গ সেরে নেওয়া দরকার। সে হল তাঁর নিজেদের শিকড় খোঁজার দিক, অর্থাৎ তাঁর ঐতিহ্যমুখী দিক, প্রাচ্যধর্মদর্শনের

পুনরাবিষ্কারের দিক। হিন্দুধর্মের সংস্কার এবং শুদ্ধ হিন্দুত্বের পুনঃপ্রতিষ্ঠা এরই সঙ্গে যুক্ত। এই সূত্রে অনেক বিদেশী ভারতবিদ্যার সাধকদের নাম এসে পড়বে। অনেক নাম বাদ দিয়ে কয়েকটি নাম বলি। যেমন উইলিয়াম জোন্স, চার্লস উইলকিন্স, হেনরি টমাস কোলব্রুক, হোরেস হেম্যান উইলসন। অথবা যেমন, মানিয়ার উইলিয়ামস্, থিওডোর গোল্ডসট্যুকার, ফ্রীডরিখ ম্যাক্সমুলার। আরো অনেক স্মরণীয় বিদেশী ভারতবিদ্যার সাধকদের নাম করা যেত, কিন্তু তা এখানে খানিকটা অপ্রাসঙ্গিক হবে। এখানে আমাদের লক্ষ্য বিদেশীদের প্রয়াস নয়, নিজেদের ঐতিহ্যের উদ্ধারে বাঙালির প্রয়াস। সেই ক্ষেত্রে রামমোহন যেমন স্মরণীয়, তেমনি রামমোহনের শাস্ত্রচর্চা শাস্ত্রগ্রন্থ পুনরুদ্ধারের পথে পরবর্তী পথিক হিসেবে বিশেষ ক'রে রাধাকান্তদেব, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, বিদ্যাসাগর, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, বঙ্কিমচন্দ্র, কালীপ্রসন্ন সিংহ, রমেশচন্দ্র দত্ত প্রমুখের নাম করতে পারি। পরের দিকে আরো নাম পাওয়া যাবে উত্তর ভারতে, মহারাষ্ট্রে। কিন্তু আমাদের লক্ষ বঙ্গসংস্কৃতি। আমাদের নব-জাগরণ যেহেতু ঔপনিবেশিক ব্যবস্থার সঙ্গে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়ানো, তাই দুই সংস্কৃতির সংঘর্ষে আলো যা জ্বলে উঠেছিল, তার পাশাপাশি কালিমাও অনেক ছিল। আমাদের আধুনিকতার অভিযানেও তাই, ঐতিহ্যের অভিযানেও তাই, দুই ক্ষেত্রেই আলো এবং কালিমা পাশাপাশি বিরাজিত। যুক্তিবাদ, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী, গতানুগতিক আচার ও প্রথার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ এই আধুনিকতার গৌরবের দিক। তেমনি এর পাশাপাশিই ছিল পাশ্চাত্য চিন্তার কাছে বংশবদ আত্মসমর্পণ, অন্ধ পরানুকরণ, যুক্তিকে সুবিধাবাদের হাতিয়ার ক'রে তোলা, নাস্তিক্যকে ফ্যাশান ক'রে তোলা, নিজেদের ঐতিহ্যের প্রতি অন্ধ অজ্ঞতা। এই ফ্যাশন-দুরস্ত নাস্তিকতার কথাই রবীন্দ্রনাথ 'জীবনস্মৃতি'-তে বলেছিলেন। ঐতিহ্যমুখিতার ক্ষেত্রেও তেমনি কিছু আছে যা গৌরবের, কিছু আছে যা লজ্জার। অতীতকে ফিরিয়ে আনা নয়, কিন্তু অতীতের যা স্থায়ী সম্পদ মূল্যবান উত্তরাধিকার তাকে উদ্ধার করা, রক্ষা করা, তার উপর নিজের আত্মতাকে প্রতিষ্ঠিত করা নিশ্চয়ই গৌরবের। যে কোনো রেনেসাঁসের এটা একটা বড়ো দিক। কিন্তু সারা দুনিয়ায় আমরাই শ্রেষ্ঠ, আমাদের তুলনায় সকলেই অধম, আমরা যখন বেদ-বেদান্তের চর্চা করি ইউরোপ তখন গাছের ডালে জীবন কাটায়, পৃথিবীর তাবৎ জ্ঞান আমাদের বেদেই ছিল, এই মনোভাব সুস্থও নয়, গৌরবেরও নয়। সংস্কৃতির দ্বন্দ্বে পরাজিত জাতি অনেক সময়ই এই রকম মিথ্যা অহমিকার আশ্রয় নেয়। আত্মপ্রত্যয় যখন টলে যায়, তখনি এই রকম ফাঁপানো আত্মম্ভরিতা জেগে ওঠে। তখন যা চাই সে হল অতীতকে ফিরিয়ে আনা।

তা যায় না, সেই বৃথা চেষ্টায় বর্তমানকেও হারাতে হয়। এই হল ঐতিহ্যমুখিতার কালিমার দিক। আধুনিকতার সহগামী পাশ্চাত্য-ভক্তি ও পরাণুকরণের মধ্যে যেমন হীনমন্যতা ও দাসমনোভাবের ক্রিয়া থাকে, ঐতিহ্যমুখিতার সহগামী অন্ধ প্রাচ্যাভিমানের ও অতীতচারিতার মধ্যেও তেমনি হারানো দিনের গরিমায় সান্ত্বনা খোঁজার প্রয়াস থাকে। আত্মপ্রত্যয়ের অভাব এখানেও সুস্পষ্ট। এ-ও এক ধরণের ছদ্মবেশী হীনমন্যতা।

যাকে আমরা হিন্দু-পুনরভ্যুত্থানের আন্দোলন বলি, তার পেছনে প্রধানত দু'-রকমের মনোভাব ক্রিয়া করছে। এক হল প্রাচ্যের লুপ্ত বা বিস্মৃত ঐশ্বর্যের পুনরুদ্ধারের ইচ্ছা, হিন্দুর আত্মতাবোধের প্রতিষ্ঠা, যাকে বলা যায় ঐতিহ্যের পুনরুদ্ধারের আকাঙ্ক্ষা। আর

দ্বিতীয় হল এক ধরণের বিপন্নতাবোধ: প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দুই বিরোধী সাংস্কৃতিক ও সামাজিক আদর্শের দ্বন্দ্বে রাজনৈতিক দিক থেকে পরাভূত প্রাচ্যের ভেসে যাওয়ার ভয়, বিজয়ী খৃষ্টান ধর্মের চাপে বিজিত হিন্দুজাতির আত্মতা লুপ্ত হয়ে যাবার ভয়। তখনকার অবস্থায় এই দুই মনোভাবই স্বাভাবিক, সীমার মধ্যে থাকলে সুস্থ এবং নির্দোষ। কিন্তু ঔপনিবেশিক পরিস্থিতিতে দুই মনোভাবের কোনোটাই সীমা মেনে চলে নি, দুই মনোভাবই অসুস্থ ভাবালুতার দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে। দুই মনোভাবের মধ্যে কিছু সুস্থ ও স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া দেখতে পাওয়া যাবে। কিন্তু তেমনি অসুস্থ অস্বাভাবিক ইতিহাসবিরোধী প্রতিক্রিয়াও দেখতে পাওয়া যাবে। এরই ফলে আমরা হিন্দু-রিভাইভ্যাল আন্দোলনে অনেক রকম স্বভাবের অনেক ধারা দেখতে পাব। যদি একটু ব্যাপক দৃষ্টিতে দেখি তাহলে বুঝতে পারব, তখনকার দিনের হিন্দুধর্মের বা হিন্দুসমাজের যে-কোনো সংস্কারের চেষ্টাই এই আন্দোলনের সঙ্গে মানসিকভাবে যুক্ত। তলিয়ে দেখলেই বুঝব যে রামমোহন এবং ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা কিংবা বঙ্কিমচন্দ্র অথবা রবীন্দ্রনাথ বিবেকানন্দ অরবিন্দ যেমন এর একদিকের প্রান্ত, তেমনি শশধর তর্কচূড়ামণি চন্দ্রনাথ বসু অথবা এখানে ওখানে গজিয়ে-ওঠা গুরু ও অবতারেরাও এর অন্যদিকের প্রান্ত। এর মধ্যে যুক্তিবাদী এবং অপযুক্তিবাদী ধারা যেমন আছে, তেমনি এর মধ্যে ভক্তিবাদী এবং অপভক্তিবাদী ধারাও অনেক আছে। এবং সব ধারার মধ্যে মিত্রতাও তেমন নেই। এই একই বৃহৎ প্রবাহের মধ্যে যারা গোঁড়া তারা সংস্কারকামীদের আক্রমণ করেছে, আবার অপেক্ষাকৃত সুশিক্ষিত সংস্কারকামীরা গোঁড়াদের আক্রমণ করেছে। তখনকার দিনের যে হিন্দু-ব্রাহ্ম দ্বন্দ্ব, বঙ্কিমচন্দ্র বনাম দ্বিজেন্দ্রনাথ-রবীন্দ্রনাথের যে দ্বন্দ্ব, তা হিন্দু-রিভাইভ্যালের বৃহৎ প্রবাহের মধ্যেই ছোট আকারের একটি অন্তর্দ্বন্দ্ব—অন্তত প্রথম দিকটাতে তাই ছিল। ব্রাহ্মরা প্রবাহ থেকে সরে দাঁড়াবার কথা ভেবেছেন অনেক পরে। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, মানসী-সোনারতরী পর্বে শশধর তর্কচূড়ামণি, চন্দ্রনাথ বসু প্রমুখ গোঁড়া রক্ষণশীলদের অপবৈজ্ঞানিক হিন্দুধর্মব্যাখ্যাকে লক্ষ্য ক'রে রবীন্দ্রনাথ 'মানসী'র 'দেশের উন্নতি', 'বঙ্গবীর', 'ধর্মপ্রচার' অথবা 'সোনার তরী'র 'হিং টিং ছট্'-এ যে কঠিন ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করেছেন তা মোটেই বাইরের লোক হিসেবে নয়, বৃহৎ হিন্দুসমাজের একজন, এই হিসেবেই করেছেন। হিন্দুসমাজ কিন্তু অনেক সময়ই তাঁকে বাইরের আক্রমণকারী বলে মনে করেছে। রবীন্দ্রনাথের 'অচলায়তন' নাটক (১৯১২) প্রকাশের পর হিন্দুসমাজের দিক থেকে যে প্রতিবাদ ওঠে, তা থেকে এর প্রমাণ পাওয়া যাবে। পরে যথাস্থানে আমরা সেই প্রসঙ্গে আসব।

স্থূলভাবে বলা যায়, উনিশ শতকীয় নব-জাগরণের একটা বড়ো প্রবণতা ঐতিহ্যমুখী, আর একটা বড়ো প্রবণতা আধুনিকতামুখী। যুক্তিবাদের প্রসঙ্গে বলা যায়, সীমিত ও নিয়ন্ত্রিত যুক্তি ঐতিহ্যমুখী ধারাতেও মিলবে, কিন্তু যুক্তিবাদ নয়। সচেতনভাবে যুক্তিচর্চা যাকে বলা যায়, নিরঙ্কুশ যুক্তিচালনা আধুনিকতামুখী প্রবণতার সঙ্গেই যুক্ত। ঐতিহ্যমুখী ধারাতে অগ্রাধিকার শাস্ত্রগ্রন্থের, পরম্পরার, ভক্তির। আধুনিকতার ধারাতেই এসেছে প্রশ্ন, সন্দেহ, তর্ক যাচাই করার প্রবৃত্তি, বিজ্ঞানমুখিতা। এই আধুনিকতার টানেই এসেছে রফাহীন চূড়ান্ত যুক্তিবাদ, উদ্ধত নাস্তিকতা, সন্দিগ্ধ অজ্ঞেয়তাবাদ। এই আধুনিকতার টানেই এসেছে বিলেতি ডী-ইজম্ যাকে কেউ কেউ

বলেছেন প্রচ্ছন্ন নাস্তিক্য। এই আধুনিকতার ধারাতেই এসেছে বিলেতি উপযোগবাদ, এসেছে পজিটিভিজম্, মানবতাবাদ, মানবধর্ম। অন্যদিকে তেমনি ঐতিহ্যমুখিতার টানে এসেছে হিন্দুত্বের পুনরাবিষ্কার, লুপ্তপ্রায় শাস্ত্রগ্রন্থের পুনরুদ্ধার, এসেছে বেদ-উপনিষদের চর্চা, নানা গোত্রের বেদান্তচর্চা, গীতা-পুরাণ-তন্ত্রশাস্ত্র ইত্যাদি চর্চা।

বললে ভুল হবে না যে প্রথম দিকের ব্রাহ্ম-আন্দোলনও এসেছে এই ঐতিহ্যমুখী ধারাতেই। এই হিন্দুত্বের সন্ধানের টানেই এসেছে বঙ্কিমচন্দ্রের অনুশীলনধর্ম, যাকে বলতে পারি বঙ্কিমচন্দ্রের নব্যহিন্দুধর্ম, অথবা অন্য দিক থেকে বলতে পারি বঙ্কিমচন্দ্র-প্রচারিত গীতা-পরিশোধিত, ভক্তি-মুকুটিত, দেশি ইউডিমোনিজম্ (Eudaemonism)। লক্ষণীয় যে, 'ধর্মতত্ত্ব' গ্রন্থে (১৮৮৮) বঙ্কিমচন্দ্র জীবনের পরম লক্ষ্য হিসেবে যে শুদ্ধ এবং স্থায়ি সুখের কথা বলেছেন, যাকে আমরা মুক্ত অপাপবিদ্ধ আনন্দও বলতে পারি, তা এ্যারিস্টটল-কথিত ইউডিমেনিয়া (Eudaemonia, ইংরেজি অনুবাদে happiness বা blessedness—পূর্ণতার সাধনেই যার সিদ্ধি), তা থেকে মূলত পৃথক নয়। সে যা-ই হোক, উপনিষদ-নির্ভর ব্রাহ্ম ধর্মতত্ত্ব আর গীতা নির্ভর বঙ্কিমী ইউডিমোনিজ্ম বা অনুশীলনতত্ত্ব, এই দুই সুসংস্কৃত ও পরিমার্জিত কিন্তু কার্যত ছিন্নমূল এলিট্ হিন্দুত্ব হিন্দু-রিভাইভ্যালের প্রান্তের দিকের ছোট এলাকা। এই দুয়ের বাইরে, ঐতিহ্যমুখী প্রবাহের বড়ো ধারাগুলি সবই অল্পবিস্তর সনাতনী ভক্তিবাদী হিন্দুধর্মের ধারা। তার দুটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। দুটিরই মূল হিন্দুমানসের গভীরে, তাদের মূল হিন্দু লোকজীবনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে বিসর্পিল শাখা-প্রশাখায় প্রসারিত। একটি হল বৈষ্ণব ভক্তিবাদ এবং তার সংলগ্ন সহজিয়া রসসাধনার ধারা। আউল-বাউল-সাঁই সবই কম-বেশি এই ধারার সঙ্গে যুক্ত। আর দ্বিতীয়টি হল শাক্ত ভক্তিবাদ—মাতৃমুখী উপাসনার ধারা, কালীসাধনার ধারা।

শক্তি সাধনার অনেক শাখা অনেক উপশাখা সারা দেশময় বিস্তৃত। মন্দিরে মন্দিরে তার কেন্দ্র। তারই একটি অপেক্ষাকৃত পরিচিত কেন্দ্র দক্ষিণেশ্বরের মন্দির বিখ্যাত হয়েছে রামকৃষ্ণ পরমহংসের খ্যাতিতে। এইখানে আমরা শক্তিসাধনার, শুধু সুসংস্কৃত নয়, একটি যুগোপযোগী রূপও দেখতে পাই। যুগোপযোগী বলছি এই কারণে যে [illegible] সেদিন সহজেই আমাদের উনিশ শতকীয় জাগরণের সঙ্গে নিজেকে মিলিয়ে দি[illegible] পেরেছিল, যার ঢেউ বিবেকানন্দ মারফৎ আমেরিকার তটে, রোমাঁ রলাঁ মারফৎ ইউরোপের তটে ছড়িয়ে পড়েছিল। শাক্ত ভক্তিবাদ বা মাতৃমুখী সাধনার এই বিশেষ ধারাটি সেদিন শহুরে ভদ্রলোকদের যতখানি প্রভাবিত করেছিল, গ্রামে গঞ্জে সাধারণ মানুষদের ততখানি করে নি।

বৈষ্ণব ভক্তিবাদেরও কেন্দ্র অনেক, উপকেন্দ্র আরো বেশি। গ্রামে গঞ্জে দেশের সর্বত্রই এই সব কেন্দ্র আখড়া আশ্রম ছড়ানো। যত লোকজীবনের কাছাকাছি, তত তার মধ্যে সূফী উপাদান সহজিয়া উপাদান—যাদের নেড়া-নেড়ি বলা হয় তাঁদের এবং আউল-বাউল-সাঁইদের সংমিশ্রণ বেশি। কয়েকটি ধারা অবশ্য শহরেও ঠাঁই নিয়েছিল। তাদের সঙ্গে শহরের শিক্ষিতদের যোগ অপেক্ষাকৃত বেশি। এই ধারাকে বলতে পারি নব্য বৈষ্ণবতার ধারা। নানা ঘাট ঘুরে ঘুরে সেদিন বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী অবশেষে বৈষ্ণবতার যে-ঘাটে এসে পৌঁছেছিলেন, তা ঠিক সহজ দেশজ গ্রাম্য বৈষ্ণবতার ঘাট নয়, নেড়া-নেড়ীর

ঘাট নয়, তা সূক্ষ্ম শিক্ষিত এবং আত্মসচেতন বৈষ্ণবতা। এই গোত্রের বৈষ্ণবতায় ভক্তির কাছে, অথবা রসের সাধনার কাছে বিচারবুদ্ধির সচেতন আত্মসমর্পণের ভাবটা প্রবল। যেন বুদ্ধির শুষ্ক তর্কাতর্কির প্রতিক্রিয়ায় এ এক বিগলিত নিমজ্জিত সমর্পিত অবস্থা। শেষের দিকে কেশবচন্দ্র ও তাঁর নববিধানের অনুগামীদের মধ্যে ভক্তিভাবে যে বিহ্বল রসাবেশ দেখতে পাই তা এই নব্য-বৈষ্ণবীয় রসসাধনার খুব কাছাকাছি। ব্রাহ্মসমাজের এক সময়ের উৎসাহী সভ্য চিত্তরঞ্জন দাশ, বিপিনচন্দ্র পাল, এঁরাও শেষের দিকে নব্য-বৈষ্ণবতার সমর্থক ও প্রচারক হয়ে উঠেছিলেন।

'জীবনস্মৃতি'-তে রবীন্দ্রনাথ সেই সময়ের উদ্ধত নাস্তিকতার কথাই বলেছেন, কিন্তু প্রথা ও অন্ধ গতানুগতিক ক্রিয়াকর্মের চাপে হিন্দুধর্ম যে কী অচল এক আচারের কারাগারে পরিণত হয়েছে সে সম্বন্ধে আলাদা ক'রে কিছু বলেন নি। কিন্তু সেই বছরই (১৯১২) প্রকাশিত হয়েছে 'অচলায়তন' নাটক। এই নাটকে হিন্দু-সমাজের অন্ধ গতানুগতিকতা, তাসের দেশের মতো তার মূঢ় নিয়মবদ্ধতা, তন্ত্রমন্ত্রসংহিতার নাগপাশে জড়ানো তার বিপুল অচলতার উদ্‌ভট রূপটিই রবীন্দ্রনাথ উদ্‌ঘাটিত ক'রে দেখিয়েছেন। 'অচলায়তনে'র প্রসঙ্গে আমরা পরে আসব। উনিশ শতকের শেষের দিকের এবং বিশ শতকের প্রথম দিকে বঙ্গসংস্কৃতির ধর্মীয় পরিস্থিতির, তখনকার ধর্মভাবনা বা ধর্মাচরণে একাধিক ধারার উজ্জ্বল ছবি পাওয়া যাবে 'জীবনস্মৃতি' বা 'অচলায়তনে' নয়, এদের চার বছর পরে প্রকাশিত 'চতুরঙ্গ' উপন্যাসে (১৯১৬)। তখন গীতাঞ্জলিপর্ব রবীন্দ্রনাথ সবে পার হয়ে এসেছেন।

'চতুরঙ্গ' উপন্যাসের জ্যাঠামশাই জগমোহন ইংরেজি-শিক্ষিত পরম বিদ্বান ব্যক্তি, সেদিনকার এক শ্রেণীর বিজ্ঞান-মনস্ক হৃদয়বান বিদ্বানদের প্রতিনিধি। তিনি প্রখর যুক্তিবাদী এবং প্রচন্ড নাস্তিক। তিনি মিল-বেন্হাম-পড়া মানুষ—'প্রচুরতম লোকের প্রভূততম সুখসাধনে' ব্রতী। তাঁকে উপযোগবাদী বললে হয়তো ভুল হয় না, কিন্তু অনেকখানি কমিয়ে বলা হয়। আসলে যে তিনি পজিটিভিস্ট সে কথা লেখকই আমাদের জানিয়ে দিয়েছেন। তাঁর ধর্ম-মানবসেবা, সরাসরি বলা যায় মানবধর্ম।

'চতুরঙ্গে' এই যেমন এক মহিমান্বিত নাস্তিকের রূপ, তেমনি আর-এক কেন্দ্রে দেখতে পাই ভক্তিবাদী, কীর্তন-পরায়ণ, তলে-তলে হিসেবী একজন বৈষ্ণব রসসাধকের রূপ লীলানন্দ স্বামীর মধ্যে। তাঁর আশ্রমে অবিরাম ভক্তির ঢেউ-এর ওঠা-পড়া, সবাই ভক্তির নেশায় বিহ্বল। এই ভক্তির উদ্দেশেই 'নৈবেদ্য'-র (১৯০১) কবিতায় রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন—

> 'উদভ্রান্ত উচ্ছলফেন' ভক্তিমদধারা
> নাহি চাহি নাথ।'

—লীলানন্দ স্বামীর আশ্রমে সব সময় অনেকটা এই রকম 'উচ্ছলফেন ভক্তিমদধারা' প্রবাহিত। এখানে যা লক্ষ করার মতো তা হল এই যে, জ্যাঠামশাই যেমন যুগের ধর্মীয় পরিস্থিতির একদিকের প্রতিনিধি, লীলানন্দস্বামীও কতকটা তাই। বৈষ্ণবতায় লীলানন্দ লৌকিক গোত্রের নেড়া-নেড়ীদের একজন নন। তিনিও নব্য-গোত্রের শিক্ষিত বৈষ্ণব। এই ছবি আঁকার অন্তত পনেরো বছর আগেই রবীন্দ্রনাথ এই নৃত্যগীতগানে বিহ্বল সাধনার প্রতি তাঁর অনীহা জ্ঞাপন করেছেন। মাঝখানে গীতাঞ্জলি-পর্বে রবীন্দ্রনাথ রসসাধনার

পথ ধরে যেখানে এসেছিলেন তা মোটেই লীলানন্দ স্বামীর পথ নয়, কিন্তু মানতেই হবে যে সেই সাধনারই বিকার হল লীলানন্দ স্বামীদের আশ্রমের সাধনা। 'চতুরঙ্গে' জ্যাঠামশাইয়ের প্রতি রবীন্দ্রনাথের শ্রদ্ধা যেমন স্পষ্ট, রসসাধক লীলানন্দস্বামীর প্রতি অশ্রদ্ধাও তেমনি অনতিপ্রচ্ছন্ন।

শচীশের প্রথম গুরু পজিটিভিস্ট নাস্তিক জ্যাঠামশাই, তখন শচীশেরও ধর্ম মানবসেবা। জ্যাঠামশাইয়ের মৃত্যুর পর শুরু হল আস্তিক্যের সাধনা। গুরু হল লীলানন্দস্বামী। সে মোহ তার কাটবার আগেই প্রকৃতি-কন্যা দামিনী এল তাকে জীবনধর্মে দীক্ষা দিতে—এই কথা জানাতে যে, বৈরাগ্যসাধনে মুক্তি, শচীশ, সে তোমার নয়। প্রকৃতির এই আহ্বান যে বিফল হল তা আমরা জানি, কিন্তু পরে কোনো প্রকৃতির প্রতিশোধ শচীশের জীবনে নেমে এসেছিল কি না তা আমরা জানি না। তৃতীয় পর্বে বাইরে শচীশের কোনো গুরু নেই, এখন তার গুরু তার আপন অন্তর। এ এক নতুন সন্ধান: কোথায় পাব তারে। শচীশের এই মরমীয়া পর্বের কোনো স্পষ্ট পরিচয় 'চতুরঙ্গে' মিলবে না। কেননা এর পর 'চতুরঙ্গ' শচীশকে অনুসরণ করে নি। সেই দুর্লক্ষ্য সন্ধানের অনুসরণ সম্ভব নয়। এর পর 'চতুরঙ্গের' দৃষ্টি অনুসরণ করেছে প্রকৃতি-কন্যা জীবনধর্মের সাধিকা দামিনীকে আর সাধারণ-মানুষের মধ্যে যে অসাধারণ-মানুষ সেই শ্রীবিলাসকে। 'চতুরঙ্গে' মিলবে শচীশের সাধনার কিছু ইশারা আর কিছু ইঙ্গিত। সেই ইশারা আর ইঙ্গিত থেকে বুঝতে পারি গীতাঞ্জলি-পর্বের রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তার কোথায় একটা মিল আছে। কিন্তু মিলের থেকে অমিল গভীরতর। কেননা কোনো পর্বেই রবীন্দ্রনাথ বৈরাগ্যসাধক নন তিনি জীবনরসিক। শচীশের মতন ক'রে রবীন্দ্রনাথ কখনোই বলবেন না, "ওগো। আমার প্রলয়, আপনাকে আমি তোমার মধ্যে চুরমার করিতে থাকিব— চিরকাল ধরিয়া।...থাকো, আমার রূপ লইয়া তুমি থাকো আমি তোমার অরূপের মধ্যে ডুব মারিলাম।" (র/৯/৩৯৭)। এ আর্তি রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠে বেমানান। শচীশের মতো বিশেষকে ছেড়ে নির্বিশেষের দিকে যাত্রা, রূপনারানের কূল-কে ছেড়ে অরূপ অকূলের দিকে নিরুদ্দেশ হওয়া, কান্নাহাসির ঘরদোরকে ছেড়ে—"অসীম, তুমি আমার, তুমি আমার" বলতে বলতে নদীপাড়ের অন্ধকারে মিলিয়ে যাওয়া, এমন কোনো পর্ব রবীন্দ্রনাথের ধর্মভাবনার ইতিহাসে পাওয়া যাবে না। বোধকরি রবীন্দ্রনাথের মতো রূপদ্রষ্টা রূপমুগ্ধ ও রূপস্রষ্টার পক্ষে তা স্বাভাবিকও নয়। শচীশের পথে যদি রবীন্দ্রনাথের পদপাত কখনো ঘটে থাকে, জানতে হবে তা ক্ষণিকের সহযাত্রা। তবু, শচীশ যে রবীন্দ্রনাথের অচেনা নয়, শচীশের মধ্যে যে সন্ধানের আগুন তার উত্তাপ যে রবীন্দ্রনাথের অজানা নয়, রবীন্দ্রনাথের ধর্মচিন্তায় 'চতুরঙ্গ' তারই স্বাক্ষর রেখে গিয়েছে।

অপর ভক্তিবাদী অর্থাৎ শাক্ত ভক্তিবাদী ধারার কথা রবীন্দ্রনাথে খুব বেশি পাওয়া যাবে না। 'বাল্মীকি প্রতিভার' (১৮৮১) কথা বা 'রাজর্ষি' (১৮৮৭) কি 'বিসর্জন'-এর (১৮৯০) কথাও ওঠে না, সাধনাধারার পরিচয় হিসেবে এরা উল্লেখ করার মতো নয়। 'কালান্তর' গ্রন্থে (১৯৩৭) প্রকাশিত দুটি বিখ্যাত প্রবন্ধে, 'বাতায়নিকের পত্র' (১৯১২) এবং 'শক্তিপূজা',(১৯১৯) রবীন্দ্রনাথ শক্তিপূজা বিষয়ে তাঁর প্রতিকূল বক্তব্য বেশ স্পষ্ট ক'রেই বলেছেন। অবশ্য কবিতায় গানে, বিশেষ ক'রে নানান রকমের ইমেজ বা

রূপকল্পে রবীন্দ্রনাথের মাতৃকেন্দ্রিক সংবেদনার সাক্ষাৎ পাওয়া যাবে। সংখ্যা গণনায় তা অল্প নয়। কিন্তু বাঙালির স্বভাবসিদ্ধ মাতৃমুখী ভাবনাবেদনার তুলনায় তা নিতান্তই কম। বাঙালির ধ্যানধারণায় কোনো সুদূর অতীতের মাতৃতান্ত্রিকতার ছায়াপাত ঘটেছে কি না জানি না, কিন্তু অনেক ব্যাপারেই—বিশেষত ধর্মব্যাপারে রবীন্দ্রনাথের দেবকল্পনা বৈদিক আর্যের মতো মোটামুটি পিতৃতান্ত্রিক. ঈশ্বরকে তিনি বেশির ভাগ সময়ই পিতা বলে' জেনেছেন। কিন্তু যেহেতু আমাদের বর্তমান আলোচনা সরাসরি রবীন্দ্রনাথের সময়ের ধর্ম-আন্দোলনের ধারাগুলিকে নিয়ে, সেই হেতু শাক্তসাধনার কথাও এখানে অপ্রাসঙ্গিক নয়।

উনিশ শতকের শেষের দিকে রামকৃষ্ণ পরমহংস বাঙালি শিক্ষিত সমাজে ভক্তিবাদী মাতৃসাধনার যে জোয়ার এনেছিলেন তা সকলেরই সুবিদিত। বিবেকানন্দ তাতে শুধু যে সর্বভারতীয় ব্যাপ্তি এনে দিলেন তাই নয়, পাশ্চাত্য দেশেও তাকে তিনি বিস্তৃত করে দিলেন। শাক্তসাধনার এই ধারার কথা আগেই বলা হয়েছে। বিংশ শতকের প্রথম ভাগে এই ধারার সঙ্গেই যুক্ত আর একটি নতুন ব্যাপারের সাক্ষাৎ আমরা পেলাম। সে হল তন্ত্রশাস্ত্রের পুনরাবিষ্কার।

বিখ্যাত তান্ত্রিক পন্ডিত শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণবের কাছে তন্ত্রশাস্ত্র অধ্যয়ন ক'রে কলকাতা হাইকোর্টের অন্যতম বিচারপতি স্যার জন উডরুফ তন্ত্র বিষয়ে অনেকগুলি গ্রন্থ রচনা করেন। গ্রন্থগুলি-'দি সার্পেন্ট পাওয়ার' (১৯১৪), 'প্রিন্সিপল্‌স অব তন্ত্র' দুই খন্ড (১৯১৪ এবং ১৯১৬), 'শক্তি এ্যান্ড শাক্ত' (১৯১৮) ইত্যাদি-প্রকাশিত হয় আর্থার এ্যাভ্যালন এই ছদ্মনামে। এর আগে এক সময় হরিহরানন্দ তীর্থস্বামীর প্রভাবে রামমোহন তন্ত্রের দিকে আকৃষ্ট হয়েছিলেন এবং 'মহানির্বাণ তন্ত্র' থেকে কিছু সাহায্যও নিয়েছেন। তন্ত্রের কিছু সাহায্য দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরও নিয়েছিলেন। কিন্তু তন্ত্রের সামগ্রিক চর্চা এঁরা কেউ-ই করেন নি। উডরুফ সাহেব যে তন্ত্রকে জনপ্রিয় ক'রে তুলতে পেরেছিলেন, একটি তান্ত্রিক সাধনার ধারা সৃষ্টি করতে পেরেছিলেন এমন বলা যায় না। তবে তিনি যে শিক্ষিত সমাজের অনেকেরই দৃষ্টি তন্ত্রের দিকে আকৃষ্ট করতে পেরেছিলেন তাতে সন্দেহ নেই। তান্ত্রিক সাধনার প্রতি রবীন্দ্রনাথের অপ্রীতি তিনি কখনো গোপন করেন নি। উড্‌রুফের গ্রন্থগুলি প্রকাশের বেশ কয়েক বছর আগেই রবীন্দ্রনাথ 'গোরা' উপন্যাসের কৃষ্ণদয়াল চরিত্রে অপধার্মিক তান্ত্রিকতার একটি বিকর্ষণকারী চেহারা ফুটিয়ে তুলেছেন। 'অচলায়তন' নাটকে তন্ত্রের ছায়াপাত অনুভব করা যায়। সে-ও অপধর্মের কালো ছায়া। এ নাটকটিও উড্‌রুফের গ্রন্থপ্রকাশের কিছু আগেই প্রকাশিত হয়েছে (১৯১২)। 'অচলায়তনের' জন্য রবীন্দ্রনাথকে অনেক সমালোচনা সহ্য করতে হয়েছে। হিন্দুসমাজে তন্ত্র ও শক্তিসাধনা বরাবরই প্রভাবশালী, কিন্তু তা প্রধানত লৌকিক তন্ত্র ও লৌকিক শক্তিসাধনা, বিশুদ্ধ শাস্ত্রীয় উপাদান বা শাস্ত্রসম্মত আচার-অনুষ্ঠান তার মধ্যে তেমন প্রাধান্য পায় নি। উড্‌রুফ সাহেবের তন্ত্রশাস্ত্র-প্রচার আরো সফল হলে, শিক্ষিত ভদ্রসমাজ তন্ত্রে আরো উৎসাহী হয়ে উঠলে, তান্ত্রিক শক্তিসাধনাকেও আমরা তৎকালীন ধর্ম-আন্দোলনের একটা বড়ো ধারা বলে' গণ্য করতে পারতাম। এবং সেক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের 'অচলায়তন' নাটকের বিরুদ্ধে হিন্দুসমাজের তরফের সমালোচনা নিশ্চয়ই আরো অনেক তীব্র হয়ে উঠত।

সরাসরি ধর্ম হিসেবে না হলেও, উদ্দীপনার উৎস হিসেবে কালীমাতাকে আশ্রয় ক'রে সেদিনের শক্তিসাধনা একটি বিচিত্র ক্ষেত্রে ঈষৎ তির্যকভাবে নিজের প্রতিষ্ঠা খুঁজে পেয়েছিল। এই বিচিত্র ক্ষেত্রটি হল সেদিনের বিপ্লবী-সন্ত্রাসবাদী বাঙালি তরুণদের মন। আমরা জানি, কালী একদিকে যেমন স্নেহময়ী মাতা, অন্যদিকে তেমনি করালবদনী খর্পরধারিণী শ্মশানচারিণী ভয়ংকরী। এই শ্মশানচারিণী ভয়ংকরী হিসেবেই ডাকাতদের দ্বারা পূজিতা। কালী অসুর নিধনকারিণী, দেশবৈরী বিদেশী অসুরদের নিধনেও তিনি নিশ্চয়ই সহায় হবেন। আত্মত্যাগব্রতী অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত তরুণদের ভাবনা কোন পথে কোন্ দিকে গিয়েছিল তা স্বতন্ত্র বিবেচনার বিষয়, আমরা কেবল এখানে এইটুকু দেখতে পাই যে, বিশ শতকের প্রথম দশক থেকে তৃতীয়-চতুর্থ দশক অবধি বিপ্লববাদী-সন্ত্রাসবাদী ক্রিয়া কলাপে বিপ্লববাদ-প্রচার, ইংরেজ রাজকর্মচারীনিধন, পুলিশ-কর্মচারীনিধন, স্বদেশী ডাকাতি, বোমা-পিস্তলের আহরণ ও ব্যবহার—এই সব দুঃসাহসী ক্রিয়াকলাপে বাংলার তরুণদের উদ্বুদ্ধ করেছিল যে-মাতৃমন্ত্র, তার মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্রের বন্দেমাতরম্ গান, আনন্দমঠের ত্যাগ ও ভক্তির ডাক, বিবেকানন্দের বীরত্বের পথে আহ্বান, নৃমুণ্ডমালিনী সর্বনাশিনী ভয়ংকরীর সাধনা, সব যেন মিলে-মিশে একাকার হয়ে গিয়েছিল। এর একদিকে যেমন সাহস ও ত্যাগ, অন্যদিকে তেমনি ভাবাবেগ ও উত্তেজনা।

প্রাসঙ্গিকভাবে এখানে উল্লেখ করা যায় যে রবীন্দ্রনাথের স্বদেশসাধনার পরিকল্পনা নিরাবেগ, সুচিন্তিত, গণমুখী, দীর্ঘমেয়াদী কর্মকাণ্ডের উপর প্রতিষ্ঠিত। তরুণদের সাহসকে বা আত্মোৎসর্গকে তিনি শ্রদ্ধা করতে পারেন, কিন্তু তাঁদের আবেগ-বিহ্বল আত্মসম্মোহিত ঈষৎ পৌত্তলিক ধর্মীয় স্বদেশসাধনাকে যে রবীন্দ্রনাথ কখনোই সমর্থন করতে পারেন না, তা আমরা সহজেই বুঝতে পারি। শুধু আবেগ-উত্তেজনাই নয়, স্বদেশকর্মে সাম্প্রদায়িক ধর্মের মিশ্রণকে রবীন্দ্রনাথ সব সময়ই আপত্তিকর এবং বিপজ্জনক বলে মনে করেন। বঙ্গভঙ্গের কালে স্বদেশী-আন্দোলনে এ শিক্ষা তাঁর ভালোভাবেই হয়েছে। আর আবেগ-উত্তেজনার কথাটা রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গে আলাদা ক'রে বলা দরকার। যদিও রবীন্দ্রনাথ কবি এবং ভাবুক, তবু এমন কি ধর্মের ক্ষেত্রেও আবেগ উত্তেজনা বা রসাবেশকে তিনি প্রশ্রয় দিতে ইচ্ছুক নন। কেননা তা নেশার সৃষ্টি করে, সম্মোহনের বিস্তার করে। উপায় তখন উপেয়কে ছাড়িয়ে যায়। ভক্তির ক্ষেত্রেও সেই একই কথা। ভক্তির আবেগটাই যেন বড়ো হয়ে না ওঠে। ভক্তিবাদে রবীন্দ্রনাথের আপত্তি নেই, আপত্তি ভক্তির নেশায়, আপত্তি ভক্তির সম্মোহনে। তর্ক উঠতে পারে, ভক্তের নিজের পক্ষে কি কোন্টা ভক্তি আর কোন্টা ভক্তির সম্মোহন তা তফাৎ করা সম্ভব? ভক্তের কাছে কি এই ধরণের সতর্ক হিসেব প্রত্যাশিত? যিনি ভক্ত নন—বাইরের লোক, তার তো ভক্তি বিষয়ে কথা বলারই অধিকার নেই? তাহলে কেমন করে বোঝা যাবে কোথায় সংযত ভক্তির শেষ আর কোথায় অসংযত কূলপ্লাবী ভক্তির আরম্ভ? ভক্তিকে বিচার করবে, ভক্তিকে সংযত রাখবে কোন্ বৃত্তি? ভক্তি কি নিজেই নিজের কৈফিয়ৎ নয়? নিজেই নিজের প্রভু নয়? যুক্তি যদি না হয়, তাহলে কি শাস্ত্রগ্রন্থের নির্দেশ অথবা পরম্পরার নির্দেশ ভক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করবে? ভক্তি কি স্বয়ংসম্পূর্ণ, স্বতন্ত্র নয়? নিজের পথ নিজে দেখায় না? এ রকম তর্ক অনেক উঠেছে এবং সঙ্গতভাবেই উঠতে

পারে। কিন্তু এখানে আমাদের এই তর্কে প্রবেশের অবকাশ নেই। এখানে আপাতত আমাদের লক্ষ্য ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট, সেদিনের ধর্ম-আন্দোলনের বিভিন্ন ধারা।

হিন্দুধর্মের ধারাগুলির সকলের গুরুত্ব সমান না হতে পারে, সকলের প্রভাব সমান না হতে পারে, কিন্তু একটা জায়গায় এদের সকলের মিল আছে। এদের সকলেরই একটা সাধারণ ভাবনা আছে, সাধারণ উৎকণ্ঠা আছে, সাধারণ ভূমিকা আছে। রাজনৈতিক পরাজয় ঘটেছে ঘটুক, ধর্মের ক্ষেত্রে যেন বিজিত না হই, প্রভু-জাতির ধর্ম যেন হিন্দুধর্মকে ভাসিয়ে নিয়ে না যায়।সকলের সাধারণ ভূমিকা হল মিশনারিদের ধর্মপ্রচারের প্রতিরোধ, খৃষ্টানধর্মের দিগ্বিজয়ী অগ্রগতির প্রতিরোধ। এই প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে, সেদিনের ধর্ম-আন্দোলনে খৃষ্টানধর্মেরও একটা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল। ধর্মের প্রশ্নে সেদিন আধুনিকতা যেমন কয়েকটি আলাদা আলাদা ধারায় আত্মপ্রকাশ করেছিল, নতুন অবস্থার প্রতিক্রিয়ায় সেদিন হিন্দুধর্মের যেমন কয়েকটি ধারা আত্মপ্রকাশ করেছিল, তেমনি সেদিনের ধর্মীয় পরিস্থিতিতে খৃষ্টানধর্মও একটি সমান্তরাল ধারা। খৃষ্টান-বিরোধিতা যে সেদিনের হিন্দুর একটি মনস্তত্ত্বসম্মত স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া একথা সহজেই বোঝা যায়।

এই প্রসঙ্গে ১৯১০ সালের ডিসেম্বর মাসে খৃষ্টোৎসবে রবীন্দ্রনাথ যে ভাষণ দিয়েছিলেন, যা পরে 'যিশুচরিত' নামে প্রকাশিত হয় ('খৃষ্ট', র/১১/৫০৩-১০, সংকলনের ৭৫নং রচনা), সেই ভাষণে যা বলেছেন, এখানে তা উদ্‌ধৃত করা যায়। ওই প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন যে, মিশনারিদের খৃষ্ট-মহিমা প্রচারের ধাক্কায় এবং সেই সঙ্গে হিন্দুধর্ম বিষয়ে তাঁদের অপপ্রচারের ধাক্কায় সেদিন আমরা এমন কি খৃষ্ট সম্বন্ধেও বীতশ্রদ্ধ হয়ে উঠেছিলাম। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলি (পৃ. ৫০৩)—

"মহাত্মা যিশুর প্রতি আমরা অনেক দিন এইরূপ একটা বিদ্বেষভাব পোষণ করিয়াছি।...

"কিন্তু এজন্য একলা আমাদিগকেই দায়ী করা চলে না। আমাদের খৃষ্টের পরিচয় প্রধানত সাধারণ খৃষ্টান মিশনারিদের নিকট হইতে। খৃষ্টকে তাঁহারা খৃষ্টানি-দ্বারা আচ্ছন্ন করিয়া আমাদের কাছে ধরিয়াছেন। এ পর্যন্ত বিশেষভাবে তাঁহাদের ধর্মমতের দ্বারা আমাদের ধর্ম-সংস্কারকে তাঁহারা পরাভূত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। সুতরাং আত্মরক্ষার চেষ্টায় আমরা লড়াই করিবার জন্যই প্রস্তুত হইয়া থাকি।

"লড়াইয়ের অবস্থায় মানুষ বিচার করে না। সেই মত্ততার উত্তেজনায় আমরা খৃষ্টানকে আঘাত করিতে গিয়া খৃষ্টকেও আঘাত করিয়াছি।."

এই সূত্রেই রবীন্দ্রনাথ সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় দিক থেকে কিছুটা কোনঠাসা হিন্দুর স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়ার কথা আর-একটু খুলে বলেছেন।—

"সকলেই জানেন ইংরাজি শিক্ষার প্রথমাবস্থায় আমাদের সমাজে একটা সংকটের দিন উপস্থিত হইয়াছিল। তখন সমস্ত সমাজ টলমল, শিক্ষিতের মন আন্দোলিত। ভারতবর্ষে পূজার্চনা সমস্তই বয়ঃপ্রাপ্ত শিশুর খেলামাত্র—এ দেশে ধর্মের কোনো উচ্চ আদর্শ, ঈশ্বরের কোনো সত্য উপলব্ধি কোনো কালে ছিল না—এই বিশ্বাসে তখন আমরা নিজেদের সম্বন্ধে লজ্জা অনুভব করিতে আরম্ভ করিয়াছিলাম। এইরূপে হিন্দু

সমাজের কূল যখন ভাঙিতেছিল, শিক্ষিতদের মন যখন ভিতরে ভিতরে বিদীর্ণ হইয়া দেশের দিক হইতে ধসিয়া পড়িতেছিল, স্বদেশের প্রতি অন্তরের অশ্রদ্ধা যখন বাহিরের আক্রমণের সম্মুখে আমাদিগকে দুর্বল করিয়া তুলিতেছিল, সেই সময় খৃষ্টান মিশনারি আমাদের সমাজে যে বিভীষিকা আনয়ন করিয়াছিল তাহার প্রভাব এখনও আমাদের হৃদয় হইতে সম্পূর্ণ দূর হয় নাই।

"কিন্তু সেই সংকট আজ আমাদের কাটিয়া গিয়াছে। সেই ঘোরতর দুর্যোগের সময় রামমোহন রায় বাহিরের আবর্জনা ভেদ করিয়া আমাদের দেশের নিত্য সম্পদ সংশয়াকুল দেশবাসীর নিকট উদ্‌ঘাটিত করিয়া দিলেন।...এখন হিন্দুধর্ম কেবলমাত্র কতকগুলি অদ্ভুত কাহিনী এবং বাহ্য আচার-রূপে আমাদের নিকট প্রকাশমান নহে।...

"কিন্তু দুর্গতির দিনে মানুষ যখন দুর্বল থাকে তখন সে এক দিকের আতিশয্য হইতে রক্ষা পাইলে আর-এক দিকের আতিশয্যে গিয়া উত্তীর্ণ হয়। বিকারের জ্বরে মানুষের দেহের তাপ যখন উপরে চড়ে তখনও ভয় লাগাইয়া দেয় আবার যখন নিচে নামিতে থাকে তখনও সে ভয়ানক। আমাদের দেশের বর্তমান বিপদ আমাদের পূর্বতন বিপদের উল্টাদিকে উন্মত্ত হইয়া ছুটিতেছে।" (তদেব, ৫০৩-০৪)

বাইরের আবর্জনা ভেদ করে হিন্দুধর্মের নিত্য সম্পদ উদ্‌ঘাটিত করার চেষ্টা একা রামমোহন করেন-নি, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র এবং পরে রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ, অরবিন্দ—এঁরাও করেছেন। এই চেষ্টায়—অথবা অনুরূপ চেষ্টায় যাদের আতিশয্য ঘটেছিল, যাঁরা আবর্জনাকেও যথার্থ হিন্দু বলে আঁকড়ে ধরেছিলেন, কেবল তাঁদেরই আমরা নিন্দাত্মক ব্যঞ্জনায় হিন্দু-রিভাইভ্যালিস্ট বলি। এই গোঁড়া রক্ষণশীলদের মধ্যে যাঁদের অতিশয়তা উগ্র, যাঁরা যোদ্ধৃভাবাপন্ন, তাঁরাই রবীন্দ্রনাথের বর্ণনায় 'উল্টাদিকে উন্মত্ত হইয়া ছুটিতেছে।' শশধর তর্কচূড়ামণি তাঁর শাস্ত্রজ্ঞানের সঙ্গে অপ-বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা যুক্ত করে এঁদেরই নেতৃস্থানীয় হয়ে উঠেছিলেন। তবু এই কথাটা মনে রাখতে হবে যে, যথার্থ হিন্দুত্বের সন্ধান আর হিন্দুধর্মের উগ্র রিভাইভ্যালের চেষ্টা একই ঐতিহাসিক ক্রিয়ার দুই প্রান্তের দুই রূপ।

এক সময় রবীন্দ্রনাথের যৌবনে বঙ্গদেশে, বিশেষ ক'রে কলকাতায় খৃষ্টান বিরোধিতার একটা ঢেউ এসেছিল। 'স্যালভেশন আর্মি' নামের খৃষ্টান প্রচারকদের একজন পাদ্রী এই ধর্মধ্বজীদের দ্বারা প্রকাশ্য রাজপথে আক্রান্তও হয়েছিল। এই অন্ধ উগ্রতার প্রতিবাদেই রবীন্দ্রনাথের 'মানসী' কাব্যগ্রন্থের বিখ্যাত ব্যঙ্গকবিতা 'ধর্মপ্রচার (১৮৮৮) প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্রনাথ জানেন ধর্মীয় উগ্রতা ধর্ম নয়। জানেন যে অতিশয়তা সহজেই উগ্র হয়ে ব্যাধির চেহারা নেয়, শুধু ধর্মের ক্ষেত্রে নয়, সমস্ত ক্ষেত্রেই। রবীন্দ্রনাথ বেদনার সঙ্গে লক্ষ করেছেন কী ভাবে অন্ধ আচার-অনুষ্ঠান, গতানুগতিক প্রথাবদ্ধতা ধর্মকে অর্থহীন অনুশাসনে এবং ধর্মীয় নিয়মকে কারাগারে পরিণত করে। তিনি দেখেছেন মন্ত্র-তন্ত্র আচার-অনুষ্ঠানের সম্মোহন কীভাবে হিন্দুসমাজকে একটি অচলায়তন বানিয়ে ফেলেছে।

"ধর্মপ্রচার (১৮৮৮) রচনার সময় যা-ই হোক না কেন, যে 'যিশুচরিত' ভাষণ থেকে এখানে দীর্ঘ উদ্‌ধৃতি দেওয়া হল, সেই ভাষণের সময় (১৯১০ সালের খৃষ্টোৎসব) বা তার আগে থেকেই রবীন্দ্রনাথ নিজেকে ব্রাহ্ম হিসেবে স্বতন্ত্র বলে অথবা হিন্দুসমাজের

বাইরে বলে বিবেচনা করতেন না। উক্ত ভাষণের মাস ছয়েক পরে (জুন ১৯১১) লিখিত হয় 'অচলায়তন' নাটক। তা প্রকাশিত হয় ১৯১১ সালের পূজাসংখ্যার প্রবাসীতে। সেখানেও হিন্দুসমাজের অন্ধ আচারনিষ্ঠা এবং যান্ত্রিক প্রথানুগত্যের কারণে সেই সমাজকে বলা হয়েছে অচল এক কারাগার—'অচলায়তন'। বলেছেন, হিন্দু হিসেবেই, বাইরের লোক হিসেবে নয়। কিন্তু হিন্দু সমাজ সেদিন একে বাইরের লোকের সমালোচনা হিসেবে নিয়ে উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল। 'অচলায়তন' গ্রন্থাকারে প্রকাশিত (১৯১২) হবার আগেই, পত্রিকায় প্রকাশের সংগে সংগেই নানা জায়গায় সমালোচনা ও প্রতিবাদ হতে শুরু করে। এই সব প্রতিবাদ ও আক্রমণের প্রসংগে রবীন্দ্রনাথ অমল হোমকে যে চিঠি দেন তা এখানে উদ্‌ধৃত করা যেতে পারে।

অমল হোমকে লেখা রবীন্দ্রনাথের ৭ অগ্রহায়ণ ১৩১৮ (১৯১১)' তারিখের চিঠি—

"কল্যাণীয়েষু—

অচলায়তন নিয়ে বাংলাদেশে যে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে তার উত্তাপ তোমাদের ছাত্রমহলেও সঞ্চারিত হয়েছে দেখচি। তোমার ইনষ্টিটিয়ুটের বন্ধুদের বোলো যে ভারতের ধর্ম-সাধনাকে ছোট করবার জন্য শোণপাংশুদের বড় করা হয়েছে একথা ভুল। ধর্মের নামে, সমাজের নামে, আচারের নামে যে বিরাট কারাগার আমরা আমাদের চারপাশে গড়ে তুলেছি সেই বন্দীশালা থেকে আমাদের সংস্কারকে, অভ্যাসকে, বুদ্ধিকে মুক্তি দেবার আহ্বানই অচলায়তনের আহ্বান।

অধ্যাত্মসাধনায় মন্ত্রের স্থান আমি কোনদিনই অস্বীকার করি নি—আমার পিতৃদেবের ও পরিবারের দীক্ষা ও শিক্ষা উপনিষদের মন্ত্রেই। কিন্তু সে মন্ত্র যখন নিরর্থক আবৃত্তিচক্রে তার নিহিতার্থ লুপ্ত করে দেয়, তখন সে মুক্তির নামে বন্ধনই করে সৃষ্টি। প্রাচীনের জয়-ঘোষণার করতালি লাভ আমার পক্ষে কঠিন নয়, একদিন তা পেয়েওছি, কিন্তু মনকে আর দেশকে সনাতনের চুষিকাঠি হাতে ধরিয়ে ছেলেভোলানোর প্রবৃত্তি নেই আর। দেশের তরুণদের কাছেও প্রিয়বচন ছড়িয়ে প্রিয় হতে চাই নে—আঘাত দিতে ও নিতে প্রস্তুত, যত দুঃখই পাই না কেন।

ইতি ৭ অগ্র, ১৩১৮
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সত্যেনকে চিঠিখানি দেখিও। শুনেছি সেও নাকি ক্ষুব্ধ হয়েছে।"

'অচলায়তন' প্রবাসীতে প্রকাশিত হলে যে সব আলোচনা বা প্রতিবাদ শুরু হয় তার মধ্যে অধ্যাপক ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমালোচনাকে (আর্যাবর্ত ২য় বর্ষ, ১৩১৮ কার্তিক) রবীন্দ্রনাথ বেশ গুরুত্ব দিয়েছিলেন। এই সমালোচনার প্রত্যুত্তরে রবীন্দ্রনাথ ললিতকুমারকে ৩ অগ্রহায়ণ ১৩১৮ তারিখে একটি দীর্ঘ চিঠি দেন (চিঠিটি আর্যাবর্ত পত্রিকায় ১৩১৮ অগ্রহায়ণে প্রকাশিত হয়)। চিঠিটি বর্তমান সংকলনের সংযোজন-২-এর শেষে স্থান পেয়েছে (ক্রমিক সংখ্যা ১৮৭)। ললিতকুমার অভিযোগ করেছেন যে 'অচলায়তন' ভাঙার কথা বলেছে, কিন্তু তাহলে সমাজ কি শূন্যের উপর দাঁড়াবে। উত্তরে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'অচলায়তন' কেবল ভাঙার কথা বলে নি, গড়ার কথাও বলেছে। এই চিঠির চব্বিশ দিন পরে ২৭ অগ্রহায়ণ রবীন্দ্রনাথ ললিতকুমারকে আর-একখানি চিঠি

লেখেন। তাতে তিনি লেখেন, "অচলায়তন লেখায় যদি কোনো চঞ্চলতাই না আনে তবে উহা বৃথা লেখা হইয়াছে বলিয়া জানিব।...নিজের দেশের আদর্শকে যে ব্যক্তি যে-পরিমাণে ভালোবাসিবে সে'ই তাহার বিকারকে সেই পরিমাণেই আঘাত করিবে, ইহাই শ্রেয়স্কর।"

'আর্যবর্ত' পত্রিকার অগ্রহায়ণ সংখ্যাতেই ললিতকুমারের 'ফোয়ারা' বইয়ের আলোচনা প্রসঙ্গে অক্ষয়কুমার সরকার 'অচলায়তন' সম্পর্কে কিছু বিরূপ মন্তব্য প্রকাশ করেন। ললিতকুমারকে রবীন্দ্রনাথের দ্বিতীয় পত্রটি তারই প্রতিবাদ। এই চিঠিতে তিনি আরো লিখেছেন—

"যদি কেহ এমন অদ্ভুত সৃষ্টিছাড়া কথা বলেন ও বিশ্বাস করেন যে, জগতের মধ্যে কেবল আমাদের দেশেই ধর্মে ও সমাজে কোথাও কোনো কৃত্রিমতা ও বিকৃতি নাই, অথচ বাহিরের দুর্গতি আছে, তবে সত্যের সংঘাত তাঁহার পক্ষে সুখকর হইবে না, তিনি সত্যকে আপনার শত্রু বলিয়া গণ্য করিবেন। তাঁহাদের মন রক্ষা করিয়া যে চলিবে হয় তাহাকে মূঢ় নয় তাহাকে ভীরু হইতে হইবে।...ভালোমন্দ সমস্তকেই সমান নির্বিচারে সর্বাঙ্গে মাখিয়া নিশ্চল হইয়া বসিয়া থাকাকেই প্রেমের পরিচয় বলিতে পারি না। দেশের মধ্যে এমন অনেক আবর্জনা স্তূপাকার হইয়া উঠিয়াছে যাহা আমাদের বুদ্ধিকে শক্তিকে ধর্মকে চারিদিকে আবদ্ধ করিয়াছে; সেই কৃত্রিম বন্ধন হইতে মুক্তি পাইবার জন্য এ দেশে মানুষের আত্মা অহরহ কাঁদিতেছে—সেই কান্নাই ক্ষুধার কান্না, মারীর কান্না, অকালমৃত্যুর কান্না, অপমানের কান্না।...আমরা কেবলই আপনাকে ভুলাইতে চেষ্টা করিতেছি যে, সমস্ত অপরাধ বাহিরের দিকেই। আপনার মধ্যে যেখানে সকলের চেয়ে বড়ো শত্রু আছে, যেখানে সকলের চেয়ে ভীষণ লড়াই প্রতীক্ষা করিতেছে, সেদিকে কেবলই আমরা মিথ্যার আড়াল দিয়া আপনাকে বাঁচাইবার চেষ্টা করিতেছি।...আমাদের সমস্ত দেশব্যাপী এই বন্দীশালাকে একদিন আমিও নানা মিষ্ট নাম দিয়া ভালোবাসিতে চেষ্টা করিয়াছি; কিন্তু তাহাতে অন্তরাত্মা তৃপ্তি পায় নাই...।...দোহাই আপনাদের, মনে করিবেন না, অচলায়তনে আমি গালি দিয়াছি বা উপদেশ দিয়াছি। আমি প্রাণের ব্যাকুলতায় শিকল নাড়া দিয়াছি, সে শিকল আমার এবং সে শিকল সকলের"।

সমস্ত ধর্মেই বাইরের আবর্জনা ঢোকে, অনেক সময় আবর্জনাই বড়ো হয়ে ওঠে এবং সমস্ত ধর্মেই মাঝে মাঝে আবর্জনা-বর্জনের প্রয়াস দেখা যায়। আবর্জনা-বর্জনের ঝোঁকেই প্রয়োজন হয় কোন্‌টা সারবস্তু আর কোনটা আবর্জনা সে সম্পর্কে নিশ্চিত হবার—অর্থাৎ সেই ধর্মের মূলে পৌঁছবার। কোন্‌টি মূল, কোন্‌টি ধর্মবিশেষের বিশুদ্ধতম রূপ তা নিয়ে স্বভাবতই তর্ক ও কলহের অবধি থাকে না। ধর্মবিশেষের মূলে পৌঁছনো এবং মূল থেকে যাত্রা করার প্রয়াস সবসময় শান্তিপূর্ণ হয় না, তার কারণ ধর্ম-সংস্কারের চেষ্টা অবধারিতভাবে নতুন সম্প্রদায়ের জন্ম দেয় এবং তা থেকে সমান অবধারিতভাবেই সাম্প্রদায়িক শত্রুতার শুরু হয়, তার সঙ্গে নানাদিক থেকে নিহিত ক্ষমতাদ্বন্দ্ব মিশে যায় এবং সেই দ্বন্দ্বে রাজনীতি এসে অনুপ্রবিষ্ট হয়ে পড়ে।

ধর্মসংস্কার স্বাভাবিক, কিন্তু তার ঐতিহাসিক ফল-পরিণাম অনেক ক্ষেত্রেই ঘোর দ্বন্দ্বকলহ-সংকুল। খৃষ্টধর্মের অনেক আভ্যন্তরীণ অন্তর্দ্বন্দ্ব, অনেক রক্তপাতই নির্দোষ ধর্মসংস্কার-প্রয়াসেরই বীভৎস পরিণতি। এর জের আজও মেটে নি। আয়র্ল্যান্ডের দিকে

তাকালেই তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ মিলবে। তবু, ধর্মসম্প্রদায় যখন আছে তখন ধর্মসংস্কারের চেষ্টা থাকবেই, বড়ো সম্প্রদায়ের মধ্যে উপসম্প্রদায়ের জন্ম ঘটবেই, দ্বন্দ্বকলহও থাকবে, হয়তো রক্তপাতও থাকবে। এবং একথাও বলা চলবে না যে ধর্মসংস্কার পন্ডশ্রম।

সে যা-ই হোক, যে ধর্ম যত প্রাচীন, যত বহুশাখায়িত, যে ধর্ম রিলিজন অর্থে ধর্ম নয়, যাতে দশদিগন্তের তাবৎ উপাদান স্থান করে নিয়েছে, আবর্জনা অনুপ্রবেশের সুযোগ সেখানে তত বেশি। যেমন হিন্দুধর্মেও ঘটেছে। তবে মূলে পৌঁছবার কথাটা খুব বেশি ওঠে নি। তার কারণ যে জটিল বিশাল বহুরূপী এবং বহুবিচিত্র জীবনচর্যাকে আমরা হিন্দু নামের সঙ্গে যুক্ত করি, তার যথার্থ মূলে কে পৌঁছবে?

বৃহৎ পরিধির ধর্মগুলির মধ্যে যেটি সব থেকে নবীন—ইসলাম—মূলে পৌঁছবার প্রয়াস আমরা সেখানেও দেখতে পাই। ধর্মসংস্কার নানান রকমের চেহারা নিতে পারে, ঠিক যেমন নানান রকমের প্রয়াস ধর্ম-আন্দোলনের ছদ্মবেশ পরতে পারে। ইসলামের যে সংস্কার-চেষ্টার ঢেউ সুদূর বঙ্গদেশেও এসে পৌঁছেছিল, সেই ওয়াহাবি আন্দোলন আমাদের আলোচনার পক্ষে খানিকটা প্রাসঙ্গিক। তার কথাটা এখানে সেরে নেওয়া যেতে পারে।

ইসলামের বিশিষ্ট ধর্মসংস্কারক আবদুল ওয়াহাব (১৭০৩-৮৭)-কর্তৃক প্রচারিত মতবাদ, যাকে বলা হয় ওয়াহাবি মতবাদ, তা হল আচার-অনুষ্ঠান এবং সব রকমের পৌত্তলিক অনুষঙ্গ বর্জন ক'রে, সমস্ত বহিরঙ্গ বর্জন ক'রে, পুরোহিততন্ত্রের প্রভাবকে প্রতিহত ক'রে কোরাণের বাণীর শুদ্ধতায় প্রতিষ্ঠিত হবার প্রয়াস। এ মতবাদ যে মক্কার সে সময়ের শাসক সম্প্রদায়ের মনঃপূত হবে না তা সহজেই বোঝা যায়। কিন্তু আরবদেশের কথা এখানে আমাদের প্রসঙ্গের বাইরে, এখানে আমরা ভারতবর্ষের—বিশেষ ক'রে বঙ্গদেশের, কথাতেই আবদ্ধ থাকব।

ভারতবর্ষে ওয়াহাবি মতবাদ প্রচারের ক্ষেত্রে বেরেলির সৈয়দ আহ্মদের (১৭৮৬-১৮৩১) নাম উল্লেখযোগ্য। সৈয়দ আহমদ ছিলেন দিল্লীর পীর শাহ ওয়ালিউল্লার (১৭০২-৬২) দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত এবং এই পীর সাহেবের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েই তিনি এই আন্দোলনকে গড়ে' তোলেন। আন্দোলন শুরু হয় পশ্চিম-ভারতে কিন্তু পরে প্রসারলাভ করে পূর্ব-ভারতে, বিশেষ করে বঙ্গদেশে। বঙ্গদেশে এই আন্দোলনের প্রচলিত নাম ফরাজি। শুরু থেকেই এই আন্দোলন কিছু পরিমাণে রাজনীতি-মিশ্রিত ছিল, ক্রমে এর মধ্যে রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক দিক স্পষ্ট হয়ে উঠতে থাকে। নামে ওয়াহাবি-ফরাজি আন্দোলন হলেও, ক্রমেই তা ধর্মীয় বিশুদ্ধির প্রয়াস থেকে অনেক বেশি পরিমাণে হয়ে দাঁড়াল কৃষক-আন্দোলন। এই আন্দোলনের নেতা হিসেবেই তিতুমীর ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে উঠলেন। এ হয়ে উঠল দরিদ্র কৃষকদের আত্মপ্রতিষ্ঠার আন্দোলন, জমিদার, নীলকর ও ইংরেজ রাজপুরুষের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রাম। রাজনৈতিক অর্থনৈতিক আন্দোলন বলেই, কৃষিবিদ্রোহ বলেই ওয়াহাবি-ফরাজি আন্দোলন আমাদের বর্তমান আলোচনায় অল্প-বিস্তর অপ্রাসঙ্গিক। অন্যদিকে এর ব্যর্থতা যে ত্বরান্বিত এবং চূড়ান্ত হল তা-ও কিন্তু এর ধর্মীয় গোঁড়ামির কারণেই। সাম্প্রদায়িক ধর্ম যে কেমন ভাবে অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক আন্দোলনকে পথভ্রষ্ট করতে পারে ভারতবর্ষের ওয়াহাবি আন্দোলন তার একটি দৃষ্টান্ত হয়ে রইল।

ওয়াহাবি-ফরাজি আন্দোলনকে নিছক ধর্মসংস্কারের আন্দোলন হিসেবে দেখলে তা অনৈতিহাসিক হবে, কিন্তু আর্যসমাজের প্রতিষ্ঠাতা গুজরাতের দয়ানন্দ সরস্বতী (১৮২৪-৮৩) নিঃসন্দেহে ধর্মসংস্কারক, এবং তাঁর অক্লান্ত চেষ্টা ছিল বৈদিক ধর্মে অথবা বেদসম্মত হিন্দুধর্মের প্রচার ও প্রতিষ্ঠা। কী আর্যসমাজের প্রতিষ্ঠা, কী তাঁর বিশুদ্ধ হিন্দুত্বে ফিরে যাওয়ার চেষ্টা, সবই সেদিনের—অর্থাৎ উনিশ শতকের ধর্মআন্দোলনের সংগে, বস্তুত উনিশ শতকের নব-জাগরণের সংগে যুক্ত, যদিও তিনি রামমোহনের মতো ইংরেজি-শিক্ষিত নন, পাশ্চাত্য সভ্যতার সংস্পর্শেও আসেন নি। বোধকরি তা আসেন নি বলেই তিনি রামমোহনের তুলনায় অনেক বেশি রক্ষণশীল, অনেক বেশি দক্ষিণপন্থী। সেই জন্যই ১৮৭৩-৭৪ সালে প্রচারের জন্য তিনি যখন বংগদেশে আসেন এবং যখন দেবেন্দ্রনাথ কেশবচন্দ্র দ্বিজেন্দ্রনাথ এঁদের সংগে তাঁর সাক্ষাৎ হয়, তখন আন্দোলনের দিকে থেকে তা ফলপ্রসূ হয়ে উঠতে পারে নি। পরবর্তী-কালেও আদি ব্রাহ্মসমাজের সংগে দয়ানন্দের আর্যসমাজের যোগ সিদ্ধ হয়ে উঠতে পারে নি। এই প্রসংগে আরো একটা জিনিস লক্ষণীয়—বিবেকানন্দ যেমন নিজে বিপ্লবী আন্দোলনের সংগে যুক্ত না হয়েও নিজের অজান্তেই বাংলার বিপ্লবী বা সন্ত্রাসবাদী তরুণদের প্রেরণা জুগিয়েছেন, দয়ানন্দও সেই রকম উত্তর ভারতের চরমপন্থী রাজনীতিতে পরোক্ষভাবে অনেকখানি প্রেরণা জুগিয়েছেন। দয়ানন্দের মৃত্যুর পর আর্যসমাজের নেতা হন স্বামী শ্রদ্ধানন্দ (১৮৫৫-১৯২৬)। অন্যধর্মের লোক যাতে ইচ্ছা করলে হিন্দুধর্ম-গ্রহণ করতে পারে এই অধিকার দেবার জন্য শ্রদ্ধানন্দ 'শুদ্ধি' আন্দোলন শুরু করেন এবং এই কারণে তিনি মুসলমান আততায়ীর হাতে প্রাণ হারান। এই ঘটনার পর রবীন্দ্রনাথ 'স্বামী শ্রদ্ধানন্দ' প্রবন্ধে (মাঘ ১৩৩৩, ইং ১৯২৭) আবার আমাদের স্মরণ করিয়ে দিলেন, দেশের মংগলপ্রচেষ্টায় মুসলমানকে বাদ দিয়ে চলতে গেলে আমরা বড়ো ভুল করব এবং তার বড়ো দাম দিতে হবে। (র/১২/৩৫৮-৬২)... অন্যত্র বলেছেন (হিন্দু-মুসলমান, কালান্তর, র/১৩/৩৬২-৬৭) যে, হিন্দু-মুসলমানে মিলনের একটা বড়ো বাধা হল হিন্দুধর্মে আচারের একাধিপত্য। বলেছেন,—

"মানুষ বলেই মানুষের যে মূল্য সেইটেকেই সহজ প্রীতির সংগে স্বীকার করাই প্রকৃত ধর্মবুদ্ধি। যে দেশে ধর্মই সেই বুদ্ধিকে পীড়িত করে রাষ্ট্রিক স্বার্থবুদ্ধি কি সে দেশকে বাঁচাতে পারে ?

"হিন্দুসমাজে আচার নিয়েছে ধর্মের নাম। এই আচারের পার্থক্যে পরস্পরের সংগে কঠিন বিচ্ছেদ ঘটায়।"

কালিদাস নাগকে লেখা একটি চিঠিতে (৭ আষাঢ় ১৩২৯ ইং ১৯২২, কালান্তরে এটিও 'হিন্দুমুসলমান' নামে প্রকাশিত, র/১৩/৩৫৬-৫৮) রবীন্দ্রনাথ হিন্দুর এই ধর্মকে অধর্ম ক'রে তোলার কথাটা আরো স্পষ্ট ক'রে বলেছেন। বলেছেন,—

..."পৃথিবীতে দুটি ধর্মসম্প্রদায় আছে অন্য সমস্ত ধর্মমতের সংগে যাদের বিরুদ্ধতা অত্যুগ্র—সে হচ্ছে খৃষ্টান আর মুসলমান ধর্ম। তারা নিজের ধর্মকে পালন করেই সন্তুষ্ট নয়, অন্য ধর্মকে সংহার করতে উদ্যত। এইজন্যে তাদের ধর্ম গ্রহণ করা ছাড়া তাদের সংগে মেলবার জন্য কোনো উপায় নেই।...অপর পক্ষে হিন্দুজাতিও এক হিসেবে মুসলমানদেরই মতো। অর্থাৎ তারা ধর্মের প্রাকারে সম্পূর্ণ পরিবেষ্টিত। বাহ্য প্রভেদটা

হচ্ছে এই যে, অন্য ধর্মের বিরুদ্ধতা তাদের পক্ষে সকর্মক নয়—অহিন্দু সমস্ত ধর্মের সংগে তাদের non-violent non-cooperation। হিন্দুধর্ম মুখ্যভাবে জন্মগত ও আচারমূলক হওয়াতে তার বেড়া আরো কঠিন।"

হিন্দু ও মুসলমান সুদীর্ঘ কাল পাশাপাশি বাস করেও কেন যে পরস্পরের খুব কাছাকাছি আসতে পারে নি সে সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ এখানে যা বলেছেন তা ভেবে দেখবার মতো। মেলে নি একথা ঠিক, বিশেষ ক'রে উপরের দিকের স্তরে। কিন্তু অলক্ষ্য প্রভাব বলেও একটা কথা আছে। অলক্ষ্যভাবে উভয় ধর্মই যে পরস্পরকে অল্প-বিস্তর প্রভাবিত করেছে এটা অনেকেই লক্ষ করেছেন।

বংগদেশের নবজাগরণের কালের ধর্মআন্দোলন মূলত ধর্ম-সংস্কারের আন্দোলন। এই সংস্কার হল পুরনো ধর্মকে আবর্জনামুক্ত ক'রে নেবার চেষ্টা, তাকে যুগোপযোগী করার চেষ্টা অথবা তার মধ্যে নতুন প্রাণের সঞ্চার করার চেষ্টা। সেদিনের নবজাগরণের ক্ষেত্রে এই সব চেষ্টার প্রত্যেকেরই একটা নিজস্ব ভূমিকা আছে। এখানে হিন্দুধর্ম কি ইসলামধর্ম এই রকম কোনো মূল প্রবাহ যা পরম্পরা-বাহিত, যা সম্পূর্ণ গতানুগতিক তা আমাদের ততটা লক্ষ্য নয়, যতটা লক্ষ্য তাদের অন্তর্গত সেই সব ধারাগুলি যারা সাক্ষাৎভাবে বা পরোক্ষভাবে যুগের সংগে যুক্ত, যা তৎকালীন নব্যতার সংগে কোনো-না-কোনোভাবে সম্পর্কিত. আমরা আগেই দেখেছি, এই সব ধারার প্রত্যেকটিই বর্তমানে পা রেখে হয় ঐতিহ্যের দিকে আর না-হয় আধুনিকতার দিকে হাত বাড়িয়েছে। এই সব ধারার প্রত্যেকটিই হয় প্রাচীন কোনো প্রতিষ্ঠিত শাস্ত্রগ্রন্থকে—যেমন বেদ কি উপনিষদ কি গীতা কি পুরাণ এদের কাউকে অবলম্বন ক'রে ধর্মসংস্কারের প্রয়াস করেছে। না হয় কোনো সাম্প্রদায়িক ধারাকে—যেমন ভক্তিবাদী বৈষ্ণব বা শাক্ত ধারাকে অবলম্বন ক'রে পুরনোকে নতুন চেহারা দিয়েছে। কিংবা নতুন চেহারাব দার্শনিক তত্ত্ব বা থিয়োলজির মতবাদকে বা তার নতুনতর কোনো ভাষ্যকে—যেমন, ধরা যাক, নাস্তিক্য কি পজিটিভিজ্‌ম কি ডী-ইজ্‌ম কি অনুশীলনতত্ত্বকে আশ্রয় করে ধর্মসংগঠনের কাজে অগ্রসর হয়েছে। অথবা শুদ্ধতার দাবি নিয়ে ওয়াহাবিদের মতো কোরাণকে অথবা আর্যসমাজীদের মতো বেদকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে চেষ্টা করেছে।

একমাত্র থিয়োসফিই বোধহয় এর ব্যতিক্রম। কিন্তু থিয়োসফিকে, পরলোকতত্ত্বকে, প্ল্যানচেট চর্চাকে সরাসরি ধর্ম-আন্দোলন বলা কঠিন। কেমন ক'রে বলা যাবে? থিয়োসফি কি কোনো ধর্মবিশেষের সংগে অচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত? তা না হতে পারে, থিয়োসফির একটা নিজস্ব পরিমন্ডল আছে, কিছু জাদুধর্মী আচরণ ও বৈজ্ঞানিক বাক্যবন্ধ সেই পরিমন্ডলকে বিশিষ্টতা দিয়েছে; থিয়োসফির একটা আধা-অলৌকিক জগৎতত্ত্ব আছে, কখনো শরীরী কখনো বিদেহী আত্মার তত্ত্ব আছে, এরা পরোক্ষভাবে এক ধরণের ধর্মতত্ত্বের দিকে মনকে আকর্ষণ করে। করুক না-করুক, এ কথা মানি যে আমাদের বিশেষ কালপর্বের ধর্ম আন্দোলনে তার কোনো ভূমিকা নেই। সুতরাং থিয়োসফি পরলোকতত্ত্ব প্ল্যানচেট ইত্যাদির আলোচনা এখানে আমাদের পক্ষে নিষ্প্রয়োজন। শুধু প্রসংগক্রমে এইটুকু আমরা স্মরণ করতে পারি যে থিয়োসফি এক সময় জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতেও ঢুকে পড়েছিল—একেবারে যে খেলাচ্ছলেই তা বলতে পারি না। আশ্চর্য নয়, কেননা ভগবদ্‌বিশ্বাসী লোকের থেকে প্রেতাত্মায় বিশ্বাসী লোকের সংখ্যা অনেক বেশি। সে

যাই হোক, এক সময় ঠাকুরবাড়িতে প্রচুর প্ল্যানচেটের চর্চা চলত। বড়ো কথা হল এই যে, স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও প্ল্যানচেট সম্পর্কে উদাসীন থাকেন নি, বিশেষ বিশেষ মানসিক অবস্থায় তিনিও পরলোকচর্চায় আগ্রহী হয়ে উঠেছিলেন। এই সব ব্যাপারকে তিনি যেমন ঠাট্টা করেছেন, তেমনি কৌতূহলীও হয়েছেন, মাঝে মাঝে নিজে এর সংগে যুক্তও হয়েছেন—শুধু অবিশ্বাসের প্রত্যাহার বললে হয়তো একটু কমিয়ে বলা হবে।—এরই নাম মানুষের মন!

উনিশ শতকের ধর্ম-আন্দোলন মূলত হিন্দুধর্মকে আশ্রয় ক'রেই ঘটেছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। সুতরাং হিন্দুধর্মের মূল প্রবাহের সম্পর্কে আমাদের কৌতূহল হতেই পারে। কিন্তু যেহেতু তৎকালীন সংস্কার এবং আন্দোলন আমাদের লক্ষ্য—মূল প্রবাহ যেহেতু গতানুগতিক খাতেই বয়ে চলেছে, সেই হেতু মূল হিন্দুধর্ম সম্পর্কে এখানে কিছু বলা সম্ভব হবে না। হিন্দুধর্মকে রিলিজন বলা যায় না, যদি একে ধর্ম বলি তাহলে সম্পূর্ণ ভিন্ন অর্থে ধর্ম। অতি-সরলীকরণের অপরাধ হবে, তা না হলে বলতে পারতাম হিন্দুধর্ম একটা ঢিলে ক'রে-বাঁধা আচরণ সমষ্টি, একটা জীবনচর্চা, যাকে বলে way of life। ধর্ম নয়, একটা উত্তরাধিকার। হিন্দুধর্মের অনেক আকার, অনেক প্রকার, অনেক সম্প্রদায়, উপসম্প্রদায় ধরলে আরো অনেক। রিলিজনের চেহারা বরং খানিকটা দেখতে পাব সম্প্রদায়ে, মূল প্রবাহে নয়। প্রধান যে পাঁচটি সম্প্রদায়ের কথা মনে রেখে সাধারণভাবে এবং সামগ্রিকভাবে হিন্দুকে বলা হয় পঞ্চোপাসক, সেই পঞ্চ সম্প্রদায় দানা বেঁধে উঠেছে পৃথক পৃথকভাবে পাঁচজন উপাস্য দেবতা বা দেবীকে নিয়ে: সূর্যকে নিয়ে সৌর, গণেশকে নিয়ে গাণপত্য, শিবকে নিয়ে শৈব, শক্তিকে নিয়ে—কালী দুর্গা যে-দেবীই হোন, তাঁকে নিয়ে শাক্ত আর বিষ্ণুকে নিয়ে বৈষ্ণব। হিন্দুত্বের পুনরুজ্জীবনের ক্ষেত্রে, বিশেষ ক'রে ভক্তির ক্ষেত্রে বঙ্গদেশে দুটি সম্প্রদায়ই সেদিন প্রভাবশালী হয়ে উঠেছিল। একটি হল শাক্ত আর অন্যটি হল বৈষ্ণব। উনিশ শতকের নব্য-ভক্তিবাদ প্রধানত এই দুটি ধারাকেই আশ্রয় করেছিল। আমাদের আলোচনায় স্বাভাবিকভাবেই এই দুটি সম্প্রদায়ের কথা এসেছে, গোটা হিন্দুধর্মের কথা নয়। সকলেই জানেন খৃষ্টের চরিত্রের প্রভাব এবং বুদ্ধের চরিত্রের প্রভাব রবীন্দ্রনাথের ধর্মচিন্তায় সুপ্রচুর। কিন্তু যাকে প্রাতিষ্ঠানিক ভাবে খৃষ্টধর্ম বা বৌদ্ধধর্ম বলা হয়, রবীন্দ্রনাথে সেই প্রাতিষ্ঠানিক খৃষ্টধর্ম বা বৌদ্ধধর্মের প্রভাব মোটেই লক্ষণীয় নয়। উনিশ শতকের সমাজে বিজয়ী জাতির বা রাজার ধর্ম হিসেবে খৃষ্টধর্মের প্রতিপত্তি ছিল প্রচুর, আগ্রাসী মনোভাবও কম ছিল না। কিন্তু ধর্মতত্ত্বের দিক থেকে দেখলে প্রভাব যা ছিল তা মোটেই গভীর নয়। বৌদ্ধধর্মের প্রভাব প্রায় সম্পূর্ণই অন্তঃসলিলা। সূফী সাধনায় অবশ্য এই দুই ধর্মেরই প্রভাবপাত ঘটেছে। কিন্তু সরাসরি খৃষ্টধর্মকে নিয়ে বা বৌদ্ধধর্মকে নিয়ে আলোচনার প্রয়োজন এখানে আমাদের হয় নি।

কিন্তু ইসলামের কথা আলাদা। সম্প্রদায় কালক্রমে ইসলামেও অনেক হয়েছে। সূফী এবং ওয়াহাবি এঁদের যদি সম্প্রদায় বলে ধরি, তাহলে এদের কথা বাদ দিলে আর কারো কথাই এখানে প্রাসঙ্গিক নয়। এমন কি ওয়াহাবিদের কথাও বিশেষ নয়। কিন্তু মূল ইসলামধর্মের কথা আসবেই, কেননা, মনে হয় শুধু রামমোহনের মধ্যে দিয়ে নয়, নানা পথেই ইসলামের একেশ্বরবাদ, ইসলামের সাম্যের আদর্শ এবং ইসলামের

জীবনমুখিতা—বলিষ্ঠ হাঁ-ধর্মী জীবনদৃষ্টি—উনিশ শতকের চিন্তানায়কদের অনেককেই প্রভাবিত করেছে। তবে সবটাই সরাসরি ইসলাম থেকে, পাশ্চাত্য রেনেসাঁসের ধ্যান-ধারণা থেকে নয়, এমন বলা কঠিন। তবে এও আমরা জানি আইডিয়ারা অলক্ষিত পথে উড়ে উড়ে চলে। জানি যে, গ্রীক দার্শনিকদের অনেক চিন্তাভাবনা এক সময় মধ্যপ্রাচ্যে আশ্রয় পেয়েছিল, ক্রুসেডের পরে সেই সব এবং আরো অনেক ধ্যান-ধারণা মুসলমান পন্ডিতদের কাছ থেকে ইওরোপে উড়ে এসেছে—রেনেসাঁসে ইসলামের দান নিতান্ত কম হবে না।

ইসলামের মূল কথাগুলি অতি সরল। ঈশ্বর এক এবং অদ্বিতীয়। ঈশ্বর বিশ্বময় এবং বিশ্বাতীত। তিনি স্রষ্টা, সেই কারণেই সৃষ্টির সবই যুক্তিসিদ্ধ। সব মানুষ ঈশ্বরের সৃষ্টি, তাঁর কাছে সব মানুষ সমান। মানুষে মানুষে উঁচু-নিচু কি ছোটো-বড়োর কোনো ভেদ নেই। এর থেকেই এসেছে মুসলমানের সৌভ্রাত্রের আদর্শ, যৌথতার আদর্শ—যৌথ ধর্মাচরণের আদর্শ। প্রেরিত পুরুষ মোহম্মদ ছাড়া ইস্‌লামে গুরুর স্থান নেই। জ্ঞান ভক্তি ও কর্ম—মুসলমান দাঁড়াবে এই তিন সত্যের উপর। ইসলাম কর্মবিমুখ বৈরাগ্যের ধর্ম নয়, সংসারত্যাগী সন্নাসীর ধর্ম নয়, সংসারীর ধর্ম। কোরাণের বাণী ঈশ্বরের বাণী, তার উপর ইসলামে আর কিছু নেই।

প্রেরিত পুরুষ, কোরাণ বা যৌথ ধর্মাচরণের কথা আমরা রবীন্দ্রনাথে পাব না। কিন্তু ইসলামের মূল কথার অনেকগুলিই আমরা রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠে রবীন্দ্রায়িত উচ্চারণে শুনতে পাব। সে গুলি যে ইসলাম থেকেই এসেছে, অন্য কোনো উৎস থেকে আসে নি, এমন কথা বলার মতো তথ্য আমাদের হাতে নেই। রেনেসাঁসের ধ্যান-ধারণা থেকেও আসতে পারে। যেটা লক্ষণীয় তা হল এই যে, এই রকম বলিষ্ঠ ইহজগৎ-মুখিতা, এই রকম সাম্য ও সৌভ্রাত্রের আদর্শ হিন্দু ঐতিহ্যে মিলবে না। হিন্দু দর্শনে যা আছে তা সূক্ষ্ম এবং বায়বীয় তত্ত্ব, কাজের মধ্যে তার প্রকাশ মিলবে না; তা উচ্চ ভাবমার্গের বিষয়, বাস্তব ক্ষেত্রের বিষয় নয়, নিত্য আচরণের সত্য নয়।

প্রভাব সুবিস্তৃত এবং সুগভীর সূফী ধর্মসাধনার। তা যে শুধু রবীন্দ্রনাথেই তা নয়, বা তা যে রামমোহন থেকেই আরম্ভ হয়েছে তা-ও নয়। অথবা চৈতন্য থেকেই সূফী প্রভাবের সূত্রপাত কিংবা লোকজীবন কি লৌকিক সাধনাতেই যে তা সীমাবদ্ধ এমনও বলা যাবে না। মধ্যযুগের গোড়া থেকে ভারতবর্ষের সাংস্কৃতিক পরিমন্ডলে সূফীবাদ ও সূফীসাধনার প্রভাব সর্বত্র পরিব্যাপ্ত হয়ে আছে। যে রূপ নিয়ে এবং যে স্বভাব নিয়ে সূফীবাদ ভারতবর্ষের এ প্রান্ত থেকে ওপ্রান্ত অবধি তার স্থূল, সূক্ষ্ম এবং অনতিসূক্ষ্ম প্রভাব বিস্তার করেছে, সেই রূপ এবং সেই স্বভাবকে খাঁটি ইসলাম বলা কঠিন।

যে মরমিয়া (mystic) ভাবের জন্য সূফী সাধনা বিশ্বের তাবৎ মরমিয়া সাধনার সগোত্র, ঠিক সেই অতি-মরমিয়া আকুলতা ও উৎকেন্দ্রিকতার কারণেই সূফীবাদ ইসলামের মূল ধারা থেকে কিছু দূরে সরে গিয়েছে। ইসলামের সরল জীবনমুখিতা, ইসলামের সহজ সমাজচেতনা ও যৌথতা, ইসলামের প্রখর ব্যবহারিক বুদ্ধি সূফীবাদে মিলবে না। যদিও সূফীরা কোরাণকে শিরোধার্য করে নেন এবং মোহম্মদকেই তাঁদের আদিগুরু বলে মনে করেন, কিন্তু ইসলামের মূল ধারা—বিশেষ ক'রে তার শুদ্ধতাবাদী ধারা সূফীবাদকে অনাত্মীয় বলেই গণ্য করে।

সূফী সাধনা বা সূফী মতবাদ যে যৌগিক স্বভাবের তা বোঝার জন্য খুব খুঁটিয়ে দেখার প্রয়োজন করে না। বলা বাহুল্য, সূফীরা কোরাণকেই তাঁদের মূল উৎস বলে' দাবি করেন। তবে যে-কোনো ভক্তিবাদী পন্থায় ভক্তি তেমন প্রবল হলে শাস্ত্র স্বাভাবিকভাবেই কিছু গৌণ হয়ে পড়ে। এখানেও তাই ঘটেছে। কিন্তু এইটুকুই সব নয়, মিশ্রণও প্রচুর ঘটেছে। আরব থেকে ইসলাম যত বাইরের দিকে বিস্তৃত হয়েছে, তত তার মধ্যে মিশ্রণের সম্ভাবনা বেড়েছে। এরই একটা চূড়ান্ত চেহারা দেখতে পাই ভারতে, বিশেষ ক'রে পূর্ব-ভারতে, বঙ্গদেশে।

সূফীবাদে বেদান্তের অদ্বৈতবাদের প্রভাব সহজেই লক্ষ করা যায়। নবম-দশম শতকের হুসায়েন বিন মনসুর হাল্লাজ যে 'আনাল্ হক্' বাণী প্রচার করেছিলেন, যার অর্থ আমিই সত্য, আমিই ঈশ্বর বা আমিই ব্রহ্ম, সেই 'আনাল্ হক্' উপনিষদের 'অহং ব্রহ্মাস্মি' (বৃহদারণ্যক ১/৪/১০), 'তত্ত্বমসি' (ছান্দোগ্য ৬/৮/৭), 'অয়মাত্মা ব্রহ্ম' (মাণ্ডূক্য ২), কিংবা 'ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি' (মুণ্ডক ৩/২/৯)-এই সব মহাবাক্যের খুবই কাছাকাছি। এই রকম দুর্বিনীত উচ্চারণের জন্য মনসুর হাল্লাজকে শহীদ হতে হয়েছিল। প্রসঙ্গক্রমে এখানে উল্লেখ করা যায় মনসুর হাল্লাজ একবার ভারতে এসেছিলেন। উপনিষদের সঙ্গে তাঁর সংযোগ ঘটেও থাকতে পারে।

শুধু বিশুদ্ধাদ্বৈতবাদী ভাবনা নয়, নানা রকমের দ্বৈতাদ্বৈতবাদী ভাবনার প্রভাবও সূফীবাদে দেখতে পাওয়া যাবে। কেবল বেদান্ত নয়, বৌদ্ধ-প্রভাবের কথাও অনেকেই বলেছেন। নবম শতকের বায়েজিদ আল্ বিস্তামী যে 'ফানা'-র কথা বলেছেন, যা হল চরম আত্মসমর্পণ, সম্পূর্ণ আত্ম-বিগলন, নিজেকে নিঃশেষে মিলিয়ে দেওয়া, জ্যান্তে-মরা, অনেকেই তাকে বৌদ্ধদের নির্বাণের প্রভাবজাত বলে' মনে করেন। এইখানেই শেষ নয়। ইরাণের প্রাচীন অগ্নিপূজার প্রভাবের কথা যেমন উঠেছে, তেমনি উঠেছে নিও-প্লেটোনিক মতের প্রভাবের কথা। খৃষ্টান মরমিয়া সাধকদের প্রভাবের কথা তো সহজেই উঠতে পারে।

সূফীরা ভারতে প্রবেশ করার পর, ভারতের নানা দিকে ছড়িয়ে পরার পর, স্থায়িভাবে ভারতবাসী হবার পর, নানারকম সহজিয়া তন্ত্রের, নানা রকমের ভক্তিবাদের সান্নিধ্যে এসে এর স্বভাবের যৌগিকতা আরো বৃদ্ধি পেয়েছে।

সূফীরা সব রকম গোঁড়ামির বিরোধী, সব রকম সাম্প্রদায়িক মনোভাবের বিরোধী। এঁদের কাছে শাস্ত্রের থেকে মানুষ বড়ো, মানুষের স্বানুভূতি বড়ো। ইসলামের মতো সুসংবদ্ধ ধর্ম এই ধরণের স্বানুভূতিকে প্রশ্রয় দেয় না। ফলে জালালুদ্দিন রুমির মতো কবি ও মরমিয়া সাধককেও মৌলবাদীদের বিরাগভাজন হতে হয়েছে।

সূফীরা সহজ মার্গে বিশ্বাসী। অন্যান্য সহজমার্গের সাধকদের মতো এঁরাও মনে করেন, দেহভাণ্ডই ব্রহ্মাণ্ডের আধার। তাঁরা মনে করেন মানুষের হৃদয়ই ঈশ্বরের আসন। মানুষ ঈশ্বরের অংশ, সেইজন্য সে ঈশ্বরের সঙ্গে মিলবার আকাঙ্ক্ষায় ব্যাকুল, সতত তাঁকে সন্ধান করে ফেরে। এই মিলনেই মানুষের পরম প্রাপ্তি। এই প্রাপ্তি ঘটাতে পারে—শাস্ত্র নয়, গুরু। সূফীসাধনা বিশেষভাবে গুরুবাদী সাধনা। ইসলাম কোনো রকম গুরুবাদকেই সমর্থন করে না। দুয়ের মধ্যে এ বৈপরীত্যও অসংশোধনীয়।

সূফী সাধনায় সাধকের সঙ্গে ঈশ্বরের সম্পর্ক প্রেমের, যেমন দেখতে পাই দক্ষিণ

ভারতের আলোয়ারদের সাধনায়, খৃষ্টান মরমিয়াদের সাধনায়, চৈতন্যের নিজস্ব সাধনায়, সহজিয়াদের রূপে স্বরূপ আরোপ করার সাধনমার্গে। যেমন দেখতে পাই মীরাবাইয়ের আকূতির মধ্যে, যেমন দেখতে পাই বাউলদের সহজিয়া ধরণের সাধনার মধ্যে—অথবা যেমন দেখতে পাই গীতাঞ্জলি পর্বে এবং তার আগেরপর্বেও রবীন্দ্রনাথের অনেক গানে।

গীতাঞ্জলির প্রেমোৎকণ্ঠার গানগুলিকে বুঝবার জন্য কি সূফীদের প্রেমতত্ত্ব বুঝবার কোনো প্রয়োজন আছে? তা নেই, তার কারণ অনুরূপ প্রেমোৎকণ্ঠা আরো অনেক দেখতে পাব। শুধু আলোয়ার সাধক সাধিকা বা শুধু মীরাবাই কেন, মিলনের আকুলতা কি বৈষ্ণবসাহিত্যে রাধার জবানিতে আমরা কম পেয়েছি? বৈষ্ণব সাহিত্যে বা সাধনায় একাধিক ক্ষেত্রে ভক্তি প্রেম বা শৃংগারের রূপ নিয়েছে, যেমন দেখতে পাই গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের ক্ষেত্রে। ভক্তির এই যে শৃংগারে রূপান্তর, সূফী সাধনায় অনুরূপ রাগানুগা ভক্তিই আমরা দেখতে পাই। গীতাঞ্জলির সমুৎসুক প্রতীক্ষার গান গুলিতে, বিরহের গানগুলিতে আমরা এই শৃংগারেরই সাক্ষাৎ পাই।

রবীন্দ্রনাথের আধ্যাত্মিক বিরহবেদনাকে আমরা সূফী সাধনার তত্ত্ব ছাড়াই বুঝতে পারব। সূফীদের তত্ত্ব আমাদের একটা বিস্তৃত পটভূমির সন্ধান দেয়। সূফীদের তত্ত্ব এবং তার দীর্ঘ পথ পরিক্রমা আমাদের বুঝতে সাহায্য করে আইডিয়া এবং অনুভব এক আকাশ থেকে অন্য আকাশে উড়ে যায়, আবার কেমন করে বারে বারে নতুন হয়ে ফিরে আসে।

চূড়ান্ত অদ্বৈতে প্রেমের অর্থ থাকে না। কেবল ব্রহ্মই যদি সৎ হয়, আর কিছুই সত্য না হয়, তাহলে কার বিরহ, কার জন্য বিরহ? আবার দ্বৈত যদি চূড়ান্ত হয়, তাহলেও প্রেম তার ভিত্তি হারায়। দুই যদি চূড়ান্ত রকমের দুই হয় তাহলে মিলনের ভিত্তিও থাকবে না, মিলনের আকাঙ্ক্ষাও থাকবে না। দুই যদি ফুল আর পাথরের মতো হয়, আগুন আর জলের মতো হয়, সত্য আর মিথ্যার মতো হয় তাহলে প্রেম সম্ভব নয়। সেই জন্যেই ভক্তিবাদী সাধকদের বা রাগানুগা পথের সাধকদের অদ্বয়কেও চাই, দ্বৈতকেও চাই।

রামমোহন অদ্বৈতবাদী, কিন্তু জীব তাঁর কাছে মিথ্যা নয়। শংকরের মায়াবাদ দেবেন্দ্রনাথও গ্রহণ করেন নি। রবীন্দ্রনাথও তাই। তিনি একের মধ্যেই দুয়ের কথা বলবেন। বৈষ্ণব সাধকের মতো বলবেন, 'হিয়ার ভিতর হৈতে কে কৈল বাহির'। রবীন্দ্রনাথ মনসুর হাল্লাজের মতো বলবেন না, 'আমিই সত্য' তিনি বলবেন, 'আমিও সত্য'। রবীন্দ্রনাথ বলবেন, 'আমার প্রাণের মানুষ আছে প্রাণে,/তাই হেরি তায় সকল খানে' (সংকলনের ৮৫ নং)। অথবা বলবেন, 'আমার হিয়ার মাঝে লুকিয়ে ছিলে দেখতে আমি পাই নি' (১০১ নং)। কিংবা বলবেন, 'আপনি আমার কোন্‌খানে/বেড়াই তারি সন্ধানে' (১২৩ নং)। 'আমিই সত্য' বা 'অহং ব্রহ্মাস্মি'—একথা সব সূফী বলবেন না; কিন্তু অনেক সূফীই রবীন্দ্রনাথের সংগে সুর মিলিয়ে বলবেন, 'আপনি আমার কোন্‌খানে/বেড়াই তারি সন্ধানে'। আবার রবীন্দ্রনাথও তেমান সূফী-দরবেশ-বাউলদের গান নিজের ক'রে নিয়ে গাইতে পারেন, 'আমি কোথায় পাব তারে/আমার মনের মানুষ যে রে'।

সাধারণভাবে বলা যায়, সূফীরা গৃহী নন, তাঁরা ঈশ্বরপ্রেমে মাতোয়ারা—সমাজ-সংসারবন্ধ বাইরে। সূফী দরবেশেরা 'বে-শারা'—নিয়ম বহির্ভূত। অনেক সূফীই দাবি করেছেন যে লৌকিক নিয়মপালনের দায়িত্ব সূফীদের নেই। ঈশ্বরপ্রেমে তাঁরা এমন মগ্ন

যে কোনো কোনো সূফী কবি—যেমন ওমর খৈয়াম সুরাপানের উপমায় নিজের মত্ত অবস্থাকে বোঝাতে চেষ্টা করেছেন। ক্ষেত্রবিশেষে এই মগ্নতা বা মত্ততার কাছে এমন কি কোরাণ বা মোহম্মদও যেন গৌণ। মোহম্মদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করায় সূফী সাধিকা রাবিয়া নাকি বলেছিলেন যে আল্লার প্রেমে তাঁর হৃদয় এমন পরিপূর্ণ যে সেখানে অন্য-কিছু বা অন্য-কারো জন্য স্থান নেই।

জানা যায় যে রামমোহন সূফীদের সম্পর্কে আগ্রহী ছিলেন, অনেক সময়ই তিনি সূফীদের গান গাইতেন। কিন্তু সূফীবাদকে তিনি কতখানি গ্রহণ করেছিলেন বলা কঠিন। খুব যে গ্রহণ করেছেন মনে হয় না। রামমোহন যুক্তিবাদী, ভক্তিবাদী হয়েও বিশেষভাবে যুক্তিবাদী। সূফী মেজাজের সঙ্গে তাঁর মিল হবার কথা নয়। বিখ্যাত সূফী-কবি জালালুদ্দীন রুমি জোর দিয়েই বলেছেন, "যুক্তি শয়তানের, মানুষের মূলধন হল প্রেম।" ঈশ্বরের প্রেমে মশগুল হয়ে নাচ গান এবং তারপরে ভাব সমাধি, যার নাম 'হাল', এই হল সাধকের যথার্থ পথ। এই রকম ঘোর-লাগানো নাচ থেকেই 'নাচিয়ে-দরবেশ', 'তুর্কি নাচন' এই কথাগুলো এসেছে। কেউ কেউ এমনও বলেন যে চৈতন্যের প্রবর্তিত সাধনায় নৃত্য গীত এবং দশ-ধরা—ভাব-সমাধি এসব সূফী সাধকদের কাছ থেকেই পাওয়া।

দেবেন্দ্রনাথের হাফিজ-প্রীতির কথা আমরা সকলেই জানি। কিন্তু তাঁরও সূফীসাধনার প্রতি আকর্ষণ যে গভীর এমন মনে হয় না। সাধনার ক্ষেত্রে নৃত্যগীতে বিহ্বল হওয়া, ঘোর-লাগা তুর্কি-নাচন, এ সব কোনোটাই তাঁর মেজাজের সঙ্গে মেলে না। কেউ যে ধর্মাচরণ করে বলেই একেবারে 'বে-শারা' হতে পাববে, তা-ও মেনে নেওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। নৃত্য-পরায়ণ ভক্তির প্রকাশ ব্রাহ্মসমাজে ঢুকেছে পরের দিকে, আদি ব্রাহ্মসমাজে নয়।

সূফী কবিদের রচনা এবং বাউলদের দরবেশদের গান রবীন্দ্রনাথকে আকর্ষণ করেছে। শিলাইদহ বাসকালে বাউলদের এবং লোকসমাজের ব্রাত্য সাধকদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের কিছু যোগাযোগও ঘটেছে। কিন্তু প্রথম দিকে রবীন্দ্রনাথের ধর্মজীবনে এই সব ব্রাত্য সাধকদের সাধনা বা নাচগান কোনো প্রভাব ফেলতে পারে নি। 'নৈবেদ্য'র (১৯০১) 'যে ভক্তি তোমারে লয়ে ধৈর্য নাহি মানে' কবিতায় সাধনার ক্ষেত্রে নৃত্যগীতগানে ভাবোন্মাদ-মত্ততার প্রতি যেভাবে অসন্তোষ ব্যক্ত করেছেন, তা এই কথার সত্যতা প্রমাণ করে। ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ ও স্বদেশী আন্দোলনের সময় যে গান রচনার জোয়ার আসে, মনে হয় সেই সময় হাওয়ার বদল ঘটে গিয়েছে। লোকজীবন, লোকসংগীত এবং লৌকিক সাধনাধারাগুলির সঙ্গে কিছু পরিচয় আগেই ঘটেছিল। গানগুলিতে তার কিছু নিদর্শন মেলে। 'গোরা' উপন্যাসের রচনা আরম্ভ হয় ১৯০৭ থেকে। উপন্যাসের প্রথম পৃষ্ঠাতেই দেখি আলখাল্লা-পরা এক বাউল এক দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে গান গাইছে—খাঁচার ভিতর অচিন পাখি কমনে আসে যায়,/ধরতে পারলে মনোবেড়ি দিতেম পাখির পায়। 'গোরা' রচনা যখন শেষ হয়ে এসেছে, সেই সময় (১৯০৯) শুরু হল 'গীতাঞ্জলি'-র গান রচনা। অধিকাংশ গানই ঈশ্বরপ্রেমের। 'নৈবেদ্য'র কবিতায় যা ছিল পরমাপতার প্রতি, দূরস্থিত ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি, 'গীতাঞ্জলি' তে তা শৃঙ্গার রসে রূপান্তরিত। ভক্তিরস কোনো গানেই নেই তা নয়, কিন্তু পিতৃভাব কম গানেই, বেশি সংখ্যক গানেই প্রণয়ীর প্রতি প্রণয়িণীর ভাব—প্রতীক্ষা, মিলনোৎকন্ঠা, বিরহ। এই বিপ্রলম্ভ শৃঙ্গার কিছু নতুন

নয়। এভাব আমরা বৈষ্ণব কবিতার রাধাতে দেখেছি, মীরাবাইয়ের ভজনে দেখেছি, চৈতন্যে দেখেছি, আলোয়ার সাধক-সাধিকাদের মধ্যে দেখেছি, সূফীদের মধ্যে দেখেছি খৃষ্টান মরমিয়া সাধক-সাধিকাদের মধ্যেও দেখেছি।

'গীতাঞ্জলি'র পর থেকেই একটা ভিন্নতর সুর একটু একটু ক'রে স্পষ্ট হয়ে উঠতে লাগল। এ সুর শিষ্ট সাহিত্যে অনেকটাই নতুন। এ হল সন্ধানের গান: আমি কোথায় পাব তারে। 'গোরা' উপন্যাসে সেই আলখাল্লা-পরা বাউল যে অচিন পাখির গান গেয়েছিল, এ সেই অচিন পাখির গান। রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠে সেই যে শুনলাম—'আমি তারেই খুঁজে বেড়াই যে রয় মনে আমার মনে' (১১৫ নং), কিংবা শুনলাম 'আপনি আমার কোন্‌খানে/বেড়াই তারি সন্ধানে' (১২৩ নং), এ হল সেই জাতের গান। মনের মানুষকে খুঁজে ফেরার গান। এ গান মাঝে মাঝে শোনা গিয়েছে সূফীদের কণ্ঠে, পরে আরো বেশি শোনা গিয়েছে বাউলদের কণ্ঠে। আরো পরে এই ব্রাত্য গানই আমরা শুনতে পেলাম রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠে।

আমরা জানি, সূফী কি বাউলদের মতো রবীন্দ্রনাথ খ্যাপাও নন, বে শারাও নন। কিন্তু এ-ও জানি, তিনিই গেয়েছেন—

'পাগল যে তুই, কণ্ঠ ভরে
জানিয়ে দে তাই সাহস করে।
দেয় যদি তোর দুয়ার নাড়া
থাকিস কোণে, দিস নে সাড়া—
বলুক সবাই 'সৃষ্টিছাড়া',
বলুক সবাই 'কী কাজ তোরে'।
(গীতবিতান, র/৪/৪২৫)

বুঝতে পারি, মনে মনে রবীন্দ্রনাথের কোথাও হারিয়ে যাবার মানা নেই। বাউল হতেও তাঁর মানা নেই। কিন্তু হবেন নিজের মতো ক'রে।

আমরা জান, সূফীরা যেমন গুরুবাদী, বাউলরা যেমন গুরুবাদী, ভারতীয় সাধনার ধারায় অনেক যেমন গুরুবাদী সম্প্রদায় আছে , ইসলাম—বিশেষ ক'রে ইসলামের মূল প্রবাহ সে অর্থে গুরুবাদী নয়। শুধু সে অর্থে কেন, কোনো অর্থেই গুরুবাদী নয়। ঠিক তেমনি রেনেসাঁসের মানবতন্ত্রী মনও গুরুবাদী মন নয়। উনিশ শতকের নবজাগ্রত মনও—ভক্তিবাদের দিকে না ঝুঁকলে, আধুনিকতার অভিমুখী হলে—নবজাগ্রত বাঙালির মনও গুরুবাদী মন নয়। এখানে বাউল ধর্মসাধনার সংগে রবীন্দ্রনাথের মৌলিক ভেদ।

শিক্ষাগুরু ব্যাপারটিকে রবীন্দ্রনাথ অবশ্যই মানেন। মূল্যবান অভিজ্ঞতা মাত্রেই যে এক অর্থে গুরু–শিক্ষাগুরু–তা-ও তিনি মানতে পারেন। কিন্তু ধর্ম তাঁর কাছে অন্তরের জিনিস। ধর্মের ক্ষেত্রে দীক্ষাগুরুই বলি, বা প্রাতিষ্ঠানিক অন্য যে-কোনো রকম গুরুর কথাই ধরি, তা রবীন্দ্রনাথ মানেন বলে মনে হয় না। তবে প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের সংগে বহুদিন পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। শান্তিনিকেতনে একটি ধর্মীয় আশ্রমেই তিনি তাঁর বিদ্যালয় স্থাপন করেন। বিদ্যালয়কে তিনি আশ্রমের সংগে এক ক'রেই দেখেছেন। আশ্রমের আশ্রমিক দায়িত্বও তিনি বরাবর শ্রদ্ধার সংগে পালন করে

এসেছেন। আশ্রম, আশ্রমের উপদেশ বা ভাষণ, মন্দির, দীক্ষা, আচার্য, গুরু—এই সবের ভাবানুষঙ্গ তাঁর চিন্তায় রচনায় এবং কিছু কিছু কর্মেও অব্যাহত ছিল। মাত্র সেই কারণেই তাঁকে গুরুবাদী বলা সংগত হবে না।

পারিবারিক উত্তরাধিকারে বা সাধারণ অভ্যস্ত আচরণে যা-ই হোক না কেন, পরিণত চিন্তায় রবীন্দ্রনাথ ধর্ম-সাধনার ক্ষেত্রে নিজের অন্তরের আলোতেই পথ দেখে চলতে চান। 'ফাল্গুনী' নাটকে এক জন অন্ধ বাউল পথ দেখিয়েছে বটে, কিন্তু এ হল বহু-প্রচলিত দূরায়ত মিথ, বা লোকপুরাণের ভাষা। আসলে এই অন্ধ বাউল মানুষের নিজের অন্তরেই বিরাজ করে। শেষ কাব্যগ্রন্থ 'শেষ লেখা'র (১৯৪১, মৃত্যুর পরে প্রকাশিত) একটি বিখ্যাত কবিতায় রবীন্দ্রনাথ দৃঢ় প্রত্যয়ের সঙ্গে বলেছেন, সত্য কঠিন, তার পথ সহজিয়া পথ নয়, বলেছেন, সত্যকে এবং নিজেকে জানি আঘাতে আঘাতে, বেদনায় বেদনায়। বোঝা যায়, আর-কেউ সেখানে সহায় হতে পারে না। জীবনের একেবারে শেষতম কবিতাতেও (শেষলেখার ১৫নং কবিতা) রবীন্দ্রনাথ নিজের অন্তরের পথ ধরে চলার কথা বলেছেন, ভগবান বুদ্ধের মতো নিজেকেই নিজের দীপ হতে বলেছেন। বলেছেন, বিচিত্র অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে, বিচিত্র ছলনাজালে আকীর্ণ সৃষ্টির পথ দিয়ে চলতে চলতে মানুষ যে পথের সন্ধান পায় সে তার নিজেরই পথ—নিজের অন্তরের পথ। বলেছেন—

"সত্যেরে সে পায়
আপন আলোকে ধৌত অন্তরে অন্তরে।"

(র/৩/৯০৪)

বুঝতে পারি, এই গুরু-হারা ব্রাত্যকে কেউ হাত ধরে পার ক'রে দেবে না, অনন্ত অম্বরে এই বিহঙ্গের কোনো সঙ্গী নেই।

তবু যে মাঝে মাঝেই আমরা রবীন্দ্রনাথের মুখে গুরুর কথা শুনতে পাই, নাটকের সংকট-ক্ষণে গুরুর আবির্ভাব ঘটে, তার মূলে খানিকটা আছে পরম্পরার টান, ভারতীয় গুরুবাদী সাধনার অলক্ষ্য টান, কিছু হয়তো বাউলের গুরুবাদের প্রভাব, আবার অনেক সময় ভিতরের আলোকেই বাইরে টেনে নিয়ে আসা। ভিতরের বলেই তার বাইরের দৃষ্টি নেই। বাইরের দৃষ্টি নেই বলেই সে পথ দেখাতে পারে। 'ফাল্গুনী' নাটকের (১৯১২) অন্ধ বাউল যেমন। গানের ভাষায় সেই বাউল বলে—

"চোখের আলোয় দেখেছিলাম
চোখের বাহিরে।
অন্তরে আজ দেখব, যখন
আলোক নাহি রে।"

(র/৬/৪৮৪)

অথবা বলে—

"ধীরে বন্ধু, ধীরে ধীরে
চলো তোমার বিজন মন্দিরে
জানি নে পথ, নাই যে আলো,

ভিতর বাহির আলোয় ক'লে,
তোমার চরণশব্দ বরণ করেছি
আজ এই অরণ্য গভীরে।"

([illegible] ৫–৬)

খট্‌কা লাগে কোন্ বাউলের এ ভাষা? আমাদের [illegible] বাউল যখন গায়

"তোমায় নতুন করে পাব ব'লে
হারাই ক্ষণে ক্ষণ
ও মোর ভালোবাসার ধন।
তোমার শেষ নাহি, তাই শূন্য সেজে
শেষ করে দাও আপনাকে যে,
ঐ হাসি রে দেয় ধুয়ে মোর
বিরহের রোদন
ও মোর ভালোবাসার ধন।"

(তদেব, ৪৮৭)

তখন স্পষ্টই বুঝতে পারি এ ভাষা এ ভাব বাইরের বাউলের নয়, এ ভাব বাইরের গুরুরও নয়। বুঝতে পারি, এ বাউল বাউলের দংগলেও পঙ্‌ক্তি হারা। আরো বুঝতে পারি, রবীন্দ্রনাথ বাউলের অনেক কিছুই গ্রহণ করেন নি, যতটুকু গ্রহণ করেছেন, তাকে সম্পূর্ণ রবীন্দ্রায়িত করেই গ্রহণ করেছেন। এ ও বোঝা কঠিন নয় যে, এই রকম পরিসৃত এবং গোত্রান্তরিত ক'রে নিয়েছেন বলেই রবীন্দ্রনাথের মুখে বাউলের মাটির কাছের ভাষাই উপনিষদের সূক্ষ্ম সমুন্নত ভাবগম্ভীর মন্ত্রের সংগে এমন অনায়াসে মিলে যেতে পেরেছে। রবীন্দ্রনাথের ভাবনাচিন্তায় বাউলের প্রভাব যে গভীর এ কথা অস্বীকার করি না। অস্বীকার করার প্রশ্নই ওঠে না, কেননা শেষের দিকে একাধিক কবিতায় রবীন্দ্রনাথ নিজেই সে কথা বলেছেন। বাউল ভাবনার ঈষৎ গোত্রান্তরিত বা রূপান্তরিত সংস্করণ দেখতে পাব 'The Religion of Man' (১৯৩১) এবং 'মানুষের ধর্ম' (১৯৩৩) গ্রন্থে।

'ভারতবর্ষীয় দার্শনিক সংঘের সভাপতির অভিভাষণে' (সংকলনের ১৮৬নং রচনা) রবীন্দ্রনাথ যেভাবে উপনিষদের আলোতে মধ্যযুগীয় সন্তদের এবং পরবর্তীকালের বাউলদের সাধনতত্ত্বকে ব্যাখ্যা করেছেন তার সুন্দর পরিচয় দেখতে পাব। এই ব্যাখ্যা সংগত কি সংগত নয় সে কথার মধ্যে এখানে আমরা যেতে চাই না। এখানে শুধু লক্ষণীয় এই যে, বাউলের যা যা রবীন্দ্রনাথের মনের সংগে সংগতি রক্ষা করে না, যেমন দেহভাণ্ডের উপর জোর, সাধন সঙ্গিনী বা গুরুভজনা, এর কিছুই এই অভিভাষণে নেই।

ইসলাম যে অর্থে গুরুবাদ বিরোধী, হিন্দুধর্ম বা হিন্দুসমাজ সে অর্থে গুরুবাদ-বিরোধী নয়। সূফী বা বাউল যেমন একান্তভাবে গুরুবাদী, তেমন না হলেও, মোটামুটিভাবে হিন্দুসমাজ গুরুবাদী। হিন্দুধর্মে আমরা সাধারণত তিন রকম গুরু দেখতে পাই: কুলগুরু, দীক্ষাগুরু আর সদ্‌গুরু। পথ-প্রদর্শক হিসেবে সদ্‌গুরুর স্থান অতি উচ্চে, তার পরে

দীক্ষাগুরু। সদ্‌গুরু মেলে ভাগ্যগুণে, বা ঈশ্বরের কৃপায়। রবীন্দ্রনাথের সাধনা সম্পূর্ণ অন্তর্মুখী সাধনা, সেখানে কোনো বাইরেব 'গুরুর স্থান নেই। খৃষ্টকে রবীন্দ্রনাথ অত্যন্ত শ্রদ্ধা কবেন, রামমোহনকেও করেন, ববীন্দ্রনাথের বুদ্ধভক্তি অপরিসীম। কিন্তু এঁদেব কাউকেই রবীন্দ্রনাথ মনে মনে গুরুম্বরণ করেন নি। গুরু তাঁর নিজেব অন্তরে, যাকে বলা হয়েছে চৈত্যগুরু।

আমরা জানি, ব্রাহ্ম হয়েও রবীন্দ্রনাথ নিজেকে অহিন্দু গণ্য করতেন না। এক সময় শান্তিনিকেতন আশ্রম-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার (১৯০১) পর, বঙ্গদর্শন পর্বে, 'গোরা' রচনা আরম্ভ করার (১৯০৭) আগে রবীন্দ্রনাথ রক্ষণশীল হিন্দু হয়ে উঠেছিলেন। 'গোরা' রচনার সময় থেকেই তাঁর হিন্দুত্বের ঝোঁক কেটে গিয়েছিল। ক্রমে প্রাতিষ্ঠানিক ধর্ম ব্যাপাবটার থেকে তাঁর আস্থা চলে যায়। তখনো তিনি হিন্দুসমাজের একজন, কিন্তু প্রাতিষ্ঠানিক অর্থে হিন্দু নন। এখনো অবশ্য তিনি উপনিষদ-ভক্ত, কিন্তু বঙ্গদর্শন পর্বে যেমন সংহিতা-ভক্ত হয়ে উঠেছিলেন, এখন আর তিনি তা নন। ধর্মপথের প্রশ্নে স্বানুভূতি উপব জোর, অন্তরের আলোর উপর একান্ত নির্ভর এই সময় থেকেই শুরু হয়।

প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মে যাঁর আস্থা নেই, বাহ্য আচার-অনুষ্ঠান যিনি পালনীয় মনে করেন না, যাঁব যৌথ-ধর্মাচরণের কোনো পথ নেই, যাঁর গুরু নেই, গুরু শিষ্য পবম্পরায় আস্থা নেই, তিনি যদি সংসাবত্যাগী সাধু-সন্ন্যাসী না হন, যদি গৃহী হন, তাঁর ধর্মে—তাঁর একান্ত ব্যক্তিগত ধর্মে হিন্দুসমাজ খুব বিশ্বাস কবে না। এ বকম প্রশ্ন সহজেই উঠতে পারে, যাকে অন্তবের আলো বলছি তা যে নির্ভরযোগ্য কেমন ক'রে জানি, তা যে আলেয়া নয় কেমন করে বুঝি। দ্বিতীয়ত, প্রত্যেকের ক্ষেত্রে যদি তার অন্তরের আলোই নির্ভর হয়, তাহলে যত ব্যক্তি তত ধর্ম হয়ে দাঁড়াতে পাবে। ধর্মের যদি যৌথ আবেদন কিছুমাত্র না থাকে, তাহলে সহজেই তার প্রাণশক্তির উৎস শুকিয়ে যেতে পারে। আরো বড়ো কথা, অন্তরের আলো অর্ধ-সত্য, বাকি অর্ধেক আলো আসে বহির্বিশ্ব থেকে।

এই সব প্রশ্নের আলোচনা এখানে আমাদের কাজ নয়। রবীন্দ্রনাথের ধর্মসাধনা সম্পর্কে বিখ্যাত বাগ্মী ও দেশনেতা মনীষীবিপিনচন্দ্র পাল(১৮৫৮-১৯৩২), যিনি একসময় উৎসাহী ব্রাহ্ম ছিলেন কিন্তু পরে কিঞ্চিৎ ব্রাহ্মবিদ্বেষী বৈষ্ণবভাবাপন্ন গোঁড়া হিন্দু হয়ে ওঠেন, যিনি এক সময় রবীন্দ্রনাথেব বন্ধুস্থানীয় কিন্তু পরে কঠোর সমালোচক হয়ে ওঠেন, সেই বিপিনচন্দ্র রবীন্দ্রনাথেব অন্তর্মুখী ধর্মসাধনার বিষয়ে তাঁর "চরিত-চিত্র' বইয়ে জোর দিয়ে বলেছেন যে, একান্তভাবে সাবজেকটিভ বলেই, গুরু নেই বলেই রবীন্দ্রনাথের ধর্মসাধনা একপেশে এবং বস্তুতন্ত্রতা বর্জিত। এই প্রসঙ্গে বিপিনচন্দ্রের কিছু কথা তাঁর 'রবীন্দ্রনাথ' প্রবন্ধ ('চরিত-চিত্র') থেকে (পৃ ২৪০-৪১) উদ্‌ধৃত করা যায়।

"এই ঐকান্তিকী অন্তর্মুখীনতা রবীন্দ্রনাথের পৈত্রিক বস্তু। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথেরও ইহা প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান ছিল। আধুনিক যুগের ধর্ম-সংস্কারকদিগের ইহা একরূপ সাধারণ ধর্ম বলিলেও হয়। যে ব্যক্তিত্বাভিমান আমাদের দেশে ও অন্যত্র শাস্ত্রগুরুর প্রয়োজন ও প্রামাণ্য অস্বীকার করিয়া, অপনাব ধর্মের প্রামাণ্যকে একান্তভাবে প্রাকৃত বুদ্ধিবিচারের উপরে প্রতিষ্ঠিত করিতে অগ্রসর হয়, তাহা এই ঐকান্তিকী অন্তর্মুখীনতার ফল। এই অন্তর্মুখীনতার আতিশয্য হইতে, ইংরেজীতে যাহাকে Subjective

individualism বলে, তাহার উৎপত্তি হয়। এই নিঃসংগ স্বানুভূতির উপরে বহুদিন হইতে আমাদের ব্রাহ্মসমাজের ধর্মের প্রামাণ্য প্রতিষ্ঠিত হইয়া আসিয়াছে। যাঁরা শাস্ত্র-গুরু বর্জন করিয়া ধর্মসাধনে প্রয়াসী হইবেন, তাঁহাদের পক্ষে এই subjective individualism বা ব্যক্তিগত অনুভূতির হস্ত হইতে আত্মরক্ষা করা অসম্ভব ও অসাধ্য। ব্রাহ্মসমাজের প্রবর্তক রাজর্ষি রামমোহন শাস্ত্র মানিতেন, গুরু-গ্রহণও করিয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহার নিজের ধর্মের প্রামাণ্য শুদ্ধ স্বানুভূতির উপর প্রতিষ্ঠিত হয় নাই।... কিন্তু রাজার পরবর্তী ব্রাহ্ম আচার্যগণ ঠিক এই পথ ধরিয়া চলেন নাই। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ এবং ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র উভয়েই শাস্ত্রের প্রামাণ্য ও সদ্‌গুরুর প্রয়োজন অস্বীকার করিয়া, প্রথমে শুদ্ধ স্বানুভূতির উপরে ধর্মকে প্রতিষ্ঠিত করিতে চান। আর শুদ্ধ স্বানুভূতির উপরে ধর্মকে প্রতিষ্ঠিত করিলে, ব্যক্তিগত মতামত ও সার্বভৌমিক সত্যে, প্রবৃত্তির প্ররোচনাতে ও ধর্মের প্রেরণাতে যে বস্তুত কোনো প্রভেদ রক্ষা অসম্ভব হইয়া দাঁড়ায়, মহর্ষি ও ব্রহ্মানন্দ উভয়েই ক্রমে ইহা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। তাই তাঁহারা উভয়েই পরে আপনাদের সম্প্রদায়কে নিঃসংগ ও নিরংকুশ স্বানুভূতির অরাজকতা হইতে রক্ষা করিবার জন্য আপনারাই শাস্ত্রপ্রবর্তক হইয়া পড়েন। কিন্তু এই সকল চেষ্টা সত্ত্বেও ব্রাহ্ম সম্প্রদায় মধ্যে নিঃসংগ স্বানুভূতি বা subjective individualism-এর প্রভাব এখনো অপ্রতিহত রহিয়াছে।"

যে-কথাটা বিপিনচন্দ্র রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে বলতে চাইছেন, রামমোহন-পরবর্তী গোটা ব্রাহ্মসমাজ সম্পর্কেও তিনি সেই কথাই বলছেন। কথাটা হল ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য। ধর্মের ক্ষেত্রে এই রকম ব্যক্তিস্বাতন্ত্রের আতিশয্য, এই রকম নিঃসংগ স্বানুভূতিকে একান্ত ক'রে ধরা, বিপিনচন্দ্র একে আধুনিক যুগের ঐতিহ্য-ছুট্ ধর্মসংস্কারকদের সাধারণ ধর্ম বলেই মনে করেছেন। বিপিনচন্দ্রের এই অভিমতই হল সেদিনের আধুনিকদের ধর্মপ্রয়াস সম্পর্কে সেদিনের 'ঐতিহ্যবাদী' অভিমত। শুধু ঐতিহ্যবাহী বললে কম বলা হবে। ব্রাহ্মধর্ম পরিত্যাগ ক'রে হিন্দু হবার পর লোকমান্য টিলকের বন্ধু ও সহকর্মী বিপিনচন্দ্র একটু বেশি রকম হিন্দুই হয়ে উঠেছিলেন। তাঁর অভিমত তখন সেই সময়ের হিন্দু-রিভাইভ্যালিস্টের প্রতিনিধি স্থানীয় অভিমত বলে গণ্য করতে পারি।

একই প্রবন্ধে এর ঠিক পরেই বিপিনচন্দ্র বলেছেন (পৃ. ২৮২-৮৮)–

"রবীন্দ্রনাথের ঐকান্তিকী অন্তর্মুখীনতা এই নিঃসংগ স্বানুভূতি বা subjective-individualism-এর রূপান্তর মাত্র। এ বস্তু তাঁর পৈত্রিক ও সাম্প্রদায়িক। যে শিক্ষা ও সাধনাতে এই অন্তর্মুখীনতাকে বস্তুসংস্পর্শে সংযত ও শোধিত করিতে পারিত, রবীন্দ্রনাথ সে সুযোগ ও শিক্ষা প্রাপ্ত হ'ন নাই। কলিকাতার আধুনিক অভিজাত সমাজ একটা সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে বাস করেন।...ইঁহাদের জীবনের অন্তঃপুরে জনসাধারণের প্রবেশাধিকার নাই; জনসাধারণের জীবনের অন্ত:পুরেও ইঁহাদের কোনো প্রবেশ পথ নাই।...

"রবীন্দ্রনাথ এই ধনী সমাজে জন্মিয়া, তাহারই মধ্যে বাড়িয়া উঠেন। তাহার উপর মহর্ষি আপনার ধর্মমতের জন্য সমাজচ্যুত হওয়াতে তাঁহার পরিবারবর্গের জীবন কলিকাতার সাধারণ ধনী-সম্প্রদায়ের জীবন অপেক্ষাও সংকীর্ণতর হইয়া পড়ে। রবীন্দ্রনাথের উদার প্রাণ এই সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ হইয়া আপনার স্বাভাবিক

মুক্তভাব আস্বাদন করিবার জন্য, আশৈশব এক সুবিশাল কল্পিত জগৎ রচনা করিয়া, তাহার মধ্যে বিচরণ করিয়াছে। তাঁহার আপনার পরিবারের দুচারটি মানুষের সঙ্গেই রবীন্দ্রনাথের প্রাণের প্রত্যক্ষ যোগ ছিল।...স্নেহের, প্রেমের, ভক্তির এইগুটিকয়েক প্রত্যক্ষ সম্বন্ধের উপরে রবীন্দ্রনাথ আপনার বিচিত্র রসজগৎ নির্মাণ করিয়াছেন। এর বাহিরে তিনি যাহা গড়িতে গিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার অলোকসামান্য প্রতিভার ঐন্দ্রজালিক প্রভাবই প্রকাশিত হইয়াছে।

"অলৌকিক কবিপ্রতিভার এ 'অঘটন-ঘটন-পটীয়সী' মায়িক প্রভাব সর্বত্র থাকে।...

"রবীন্দ্রনাথের অনেক সৃষ্টি এইরূপ মায়িক।...আশৈশব রবীন্দ্রনাথের ধর্মের রচনায় ও উপদেশে এই মায়ার প্রভাব বিদ্যমান ছিল। তাঁর স্বাদেশিকতা কেবল শৈশবে নয়, আজি পর্যন্ত বহুল পরিমাণে বস্তুতন্ত্রতাহীন হইয়া আছে। আর আজ তিনি যে এক বিশাল বিশ্বমানব কল্পনা করিতেছেন–তাহারও প্রতিষ্ঠা তাঁহার অলৌকিক কবিপ্রতিভার অঘটনঘটনপটীয়সী মায়াশক্তিতে।

"আর মায়ার মোহিনী শক্তিই আছে, তৃপ্তিদানের অধিকার নাই।...রবীন্দ্রনাথের অলৌকিক সৃষ্টিও পাঠকের প্রাণে এই নিত্য অতৃপ্ত ভাবের সঞ্চার করে। রবীন্দ্রনাথ একবার "ততঃ কিম্?" [অগ্রহায়ণ ১৩১৩, ইং ১৯০৬, সংকলনের ২৮ নং রচনা] নামে একটি উপাদেয় প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন। তাঁহার নিজের লেখাতেও প্রায় সর্বদা ওই দুর্দমনীয় প্রশ্নটা জাগিয়া রহে। রবীন্দ্রনাথের রচনা সর্বদা বড় মিষ্ট লাগে, কিন্তু তার সঙ্গে সঙ্গে আবার একটা অপূর্ণতা ও অতৃপ্তিবোধ জাগিয়া ওঠে। ইহাও মায়ার ধর্ম।"

আভিজাত্য, ধন এবং দেবেন্দ্রনাথের ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ যে ঠাকুর পরিবারে বিচ্ছিন্নতার মূলে ছিল, তা নিয়ে তর্কের কিছু নেই। কিন্তু শিক্ষিত বাঙালি সমাজের বিচ্ছিন্নতার আর একটা ব্যাপক ও গভীর কারণও আছে। তা হল ঔপনিবেশিকতা–বিশেষত ঔপনিবেশিক শিক্ষা। দেশের সঙ্গে বিচ্ছেদ শুধু আধুনিকদেরই হয় নি, শিক্ষিত ঐতিহ্যবাদীদের হয়েছে। বিপিনচন্দ্রের নিজেরও তা হয়েছিল। ইংরেজি-শিক্ষিত ঐতিহ্যবাদীদেরও ডঙ্কা-বাজানো হিন্দুত্বের মধ্যে অনেক সময়ই যে সূক্ষ্ম একটা মেকিত্বের আভাস পাওয়া যায়, হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদনের চেষ্টার মধ্যে বিপিনচন্দ্রের রচনাতে মাঝে মাঝে তা পাঠকের নজরে পড়ে যায়। এই ঔপনিবেশিকতার সত্যটির মর্ম বিপিনচন্দ্র তলিয়ে দেখেন নি।

রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য কতখানি মায়িক কতখানি বস্তুতান্ত্রিক সে আলোচনা এখানে অপ্রাসঙ্গিক। রবীন্দ্রনাথের ধর্মভাবনা কতটা মায়িক, কতটা বস্তুতন্ত্রহীন সে প্রশ্ন উঠতে পারে। কিন্তু এখানে আমাদের তর্কেরও অবকাশ নেই। রবীন্দ্রনাথের ধর্মবিষয়ে ঐতিহ্যবাদী হিন্দুর মার্জিততম প্রতিক্রিয়ার পরিচয় আমরা বিপিনচন্দ্রের এই প্রবন্ধে পাই, সেই কারণেই এই প্রবন্ধ থেকে এখানে বিস্তৃত উদ্ধৃতি দেওয়া হল।

এখানে শুধু একটি মন্তব্যই আমরা রাখতে পারি। বিপিনচন্দ্র ঠিকই ধরেছেন, যিনি বাহ্য আচারে-অনুষ্ঠানে বিমুখ, যিনি গুরুর হাত ধ'রে চলেন না, যিনি প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মে বিশ্বাস করেন না, শুধ চলেন নিজের অন্তরঙ্গ ভাবনা-বেদনার নির্দেশে, তাঁর ধর্মে ঐকান্তিক অন্তর্মুখিতা, প্রাতিস্বিকতা এবং নিঃসঙ্গতা থাকবেই। ব্যক্তিক ধর্মের দুর্বলতার দিকগুলি বিপিনচন্দ্র ঠিকই দেখিয়েছেন, কিন্তু প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের মধ্যেও যে অনেক

মানুষকে দুর্বলতার বীজ থাকে, এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সেই বীজ থেকে যে বিষবৃক্ষের মহীরুহ এই জাজ্বল্যমান সত্য তার সম্পর্কে বিপিনচন্দ্র একটি কথাও বলেন নি। ব্যক্তিগত বা নিঃসঙ্গ ধর্মের পথ কন্টকাকীর্ণ হলেই যে প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের পথ কুসুমাস্তীর্ণ হবে এমন তো ধরে নেওয়া যায় না। ধর্মের নামে এতাবৎ যত নিষ্ঠুরতা হয়েছে, যত রক্তপাত হয়েছে, তার একটু হিসেব নিতে গেলেই স্তম্ভিত হয়ে যেতে হয়। আর এর সবই হয়েছে প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মকে অবলম্বন ক'রে। প্রাতিষ্ঠানিক ধর্ম অতি সহজে রাজনীতির সঙ্গে মিলে শক্তির হাতিয়ার হয়ে ওঠে। ধর্মবিশেষের আত্মপ্রসারের দিগ্বিজয়ী অভিযান, ক্রুসেডের দীর্ঘকালব্যাপী যুদ্ধ, ক্যাথলিক প্রোটেস্টান্ট দ্বন্দ্ব, ইনকুইজিশন, এমন কি হিটলারের ইহুদি নিধন, সমস্ত ক্ষেত্রে স্বার্থ, রাজনীতি আর ধর্ম প্রতিষ্ঠান একযোগে কাজ করেছে। গত একশ' বছরে হিন্দু মুসলমানে যত সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয়েছে, তার সবই হয়েছে ধর্ম আর রাজনীতির মিশ্রণে। বলা বাহুল্য, ধর্ম এখানে প্রাতিষ্ঠানিক ধর্ম, ব্যক্তিগত ধর্ম নয়।

প্রাতিষ্ঠানিক ধর্ম হলে তার শাস্ত্র থাকবেই, নিয়ম-কানুন থাকবেই। ব্যক্তির বুদ্ধিকে যদি শাস্ত্রের উপরে স্থান দিই তাহলে প্রতিষ্ঠান টেকে না। সুতরাং জাতিভেদ যদি শাস্ত্রসম্মত হয়, তাহলে তা অবশ্যমান্য; শাস্ত্র যদি বলে শূদ্র অধম এবং চিরদাস তাহলে তা-ই মানতে হবে। স্বামীর মৃত্যুর পর বিধবা বাঁচবে, না তার জীবন্ত দাহক্রিয়া ঘটবে তা নির্ভর করে শাস্ত্রবাক্যের উপর। পুরুষের বহুবিবাহ যদি শাস্ত্রসম্মত হয়, তাহলে অবশ্যই পুরুষ ইচ্ছামতো সংখ্যায় বিবাহ করতে পারবে। যুক্তি থেকে, বুদ্ধির থেকে প্রতিষ্ঠানের নিয়মকানুন শাস্ত্রব্যাখ্যা বা চিরাচরিত আচার যদি বড়ো হয়ে ওঠে তাহলে সেই অবুদ্ধিলোকে কী যে ঘটতে পারে আর কী যে ঘটতে পারে না তা কোনো সীমানা নেই।

যুক্তি সর্বগত হয়েও, ব্যক্তিগত সেই কারণে নিঃসঙ্গ। যুক্তিকে প্রাধান্য দিলে শাস্ত্রপ্রাধান্য খর্ব হয়। তাতে প্রতিষ্ঠানের খর্বতা। হৃদয়কে প্রাধান্য দিলেও তাই। নরবলিই হোক আর ছাগবলিই হোক, তা হবে কি হবে না নির্ভর করে ব্যক্তিবিশেষের হৃদয়বৃত্তির উপর নয়, প্রচলিত ধর্মবিধির উপর। সেই যে 'বিসর্জন' নাটকে ক্রুদ্ধ রঘুপতি রাজা গোবিন্দমাণিক্যকে বলেছিল (র/৫/৩৭৬), "শাস্ত্রবিধি তোমার অধীন নহে", এ কথার নিহিতার্থ হল, শাস্ত্রবিধি যুক্তির অধীন নয়, ব্যক্তি মানুষের অধীন নয়, মানুষই শাস্ত্রের অধীন-জীবনে মরণে। যে মানুষ তা নয়, সে ধর্মবিরোধী-নাস্তিক। রঘুপতি গোবিন্দমাণিক্যকে নাস্তিক বলেই ধিক্কার দিয়েছে।

রবীন্দ্রনাথের ধর্মচিন্তা শাস্ত্র অনুগামী নয় বলেই, গুরু-নির্দেশিত নয় বলেই, তা তাঁর একান্তভাবে নিজের অনুভূতি নির্ভর বলেই বিপিনচন্দ্র তাকে মায়িক অর্থাৎ মায়ার সৃষ্টি বলেছেন। এই রকম স্বানুভূতিলব্ধ নিঃসঙ্গ ধর্ম মায়িক হোক না হোক, নিজে খুব বেশি মায়ার বিস্তার করতে পারে না, তার সম্মোহনী শক্তি খুব গাঢ় নয়। কিন্তু সব প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মই ঘন সম্মোহনের সৃষ্টি করে; এবং করতে পারে বলেই তার যৌথতা প্রবল হয় এবং সাধারণের মনে তার বিধি-বিধানের স্থান হয় সবার উপরে-প্রশ্নের উপরে, যুক্তির উপরে, ব্যক্তির সুখদুঃখের উপরে, ন্যায়-নীতিরও উপরে। তার মাননীয়তা নিঃশর্ত এবং নিঃসপত্ন।

বিধির সম্মোহন বিধির যৌক্তিকতার ধার ধারে না, বিধির কেন কে জানে না, সুতরাং তা ইতিহাসের গতিকে স্বীকার করে না। এক সময়ের প্রয়োজনীয় বিধান কালের বদলে শিলীভূত হয়ে পড়ে। তখন বিধিই মানুষের বাধা হয়ে দাঁড়ায়। হিন্দুসমাজের এই অচল কারাগারের রূপটিই রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'অচলায়তন' নাটকে আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন ।

কালাতিক্রান্ত হলে ধর্মের নিয়মও অধর্মের নিগড় হয়ে উঠতে পারে, এ কথা যদি মেনেও নিই, তাতেই কি প্রমাণ হয় যে প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মমাত্রেই কালাতিক্রান্ত, অচলায়তনে পরিণত ? 'অচলায়তন' প্রকাশের অল্প পরে ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 'আর্যাবর্ত' পত্রিকায় তার যে সমালোচনা প্রকাশ করেন (কার্তিক ১৩১৮), তাতে তিনি প্রশ্ন তুলেছিলেন, নিয়ম-কানুন আচার-অনুষ্ঠান, বিধি-বিধান যদি না থাকে, তাহলে মানুষ ধর্মাচরণে অবলম্বন কোথায় পাবে। তার কী উপায় ? শুধু আলো, শুধু প্রীতি নিয়েই কি মানুষের পেট ভরবে? রবীন্দ্রনাথ এই প্রশ্নের যে উত্তর দিয়েছেন (ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়কে পত্র, সংকলনের ১৮৭ নং রচনা), তা যুক্তির সপক্ষে নিশ্চয়ই, কিন্তু প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মমাত্রেরই বিরুদ্ধে নয়। তা শিলীভূত ধর্ম-বিধির প্রভুত্বের বিরুদ্ধে, ধর্মের বা সমাজের অচলায়তন হয়ে ওঠার বিরুদ্ধে। রবীন্দ্রনাথ এখানে কেবল ভাঙার কথাই বলেন নি, গড়ার কথাও বলেছেন। যা গ'ড়ে তোলা হবে, তা একান্ত নিঃসংগ কিছু নয়, তা একটা কালোপযোগী নতুন প্রতিষ্ঠান–সম্ভবত পুরনো ভিতের উপরেই। কিন্তু প্রতিষ্ঠানের প্রতি এইটুকু বক্ষণের মনোভাবও রবীন্দ্রনাথের খুব বেশি দিন ছিল না। 'অচলায়তনে'র কালে (১৯১১) প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মেরপ্রতি যদি-বা কিছু রক্ষণের মনোভাব থের থেকে থাকে, এর পর থেকেই তা কমতে শুরু করে। পরবর্তীকালে াথের ধর্মভাবনা সম্পূর্ণই তাঁর নিজস্ব ধর্মভাবনা, তা যে-কেউ গ্রহণ করতে পারে, কিন্তু তার মধ্যে কোথাও প্রাতিষ্ঠানিকতার চিহ্ন দেখতে পাওয়া যাবে না। তা ললিতকুমারের ভাষায় শুধুই আলো, শুধুই প্রীতি। কিন্তু আলো আর প্রীতি কি বস্তুতন্ত্র-বিরোধী ? ব্যক্তিগত ধর্ম তো আচার অনুষ্ঠান বিধি-বিধানের উপর দাঁড়ায় না, দাঁড়ায় ব্যক্তির উপলব্ধির উপর। রবীন্দ্রনাথ বলবেন, প্রেমের উপর।

এইবারে আমরা উপনিষদের প্রসংগে আসতে পারি। উনিশ শতক বিশ শতকের ধর্ম-আন্দোলনের অনেক ধারার সম্পর্কে এখানে সংক্ষেপে বলা হয়েছে। উপনিষদকে কিন্তু সেই রকম একটা আলাদা ধারা বলে গণ্য করা যায় না। ঠিক কথা, কিন্তু আলাদা ধারা না হলেও বর্তমান প্রসংগে তার একটা আলাদা গুরুত্ব আছে। প্রথমে রামমোহনের চেষ্টায়, তার পরে দেবেন্দ্রনাথ ও ব্রাহ্মসমাজের কারণে এবং তার পরে বিশেষভাবে রবীন্দ্রনাথের কারণে উপনিষদ সেদিনকার বংগসমাজে একটা গুরুত্বপূর্ণ শক্তি হয়ে উঠেছিল। সেই জন্যেই উপনিষদের কথা এখানে একটু স্বতন্ত্রভাবেই বলা দরকার।

উপনিষদকে বলা হয় বেদের অন্তিম অংশ। এই জন্যেই একে বলা হয় বেদান্ত। বাদরায়ণের বেদান্তসূত্র বা ব্রহ্মসূত্র উপনিষদের সার-সংগ্রহ এবং এই ব্রহ্মসূত্রই বেদান্ত-দর্শনের মূল গ্রন্থ। গীতাকেও উপনিষদের সার ও ভাষ্য বলে ধরা হয়। এই দিক থেকে উপনিষদ, ব্রহ্মসূত্র ও গীতা, এই তিনকে একত্রে 'প্রস্থানত্রয়' বলা হয়ে থাকে। উপনিষদ শ্রুতিপ্রস্থান, ব্রহ্মসূত্র ন্যায়প্রস্থান আর গীতা স্মৃতিপ্রস্থান। বিরোধস্থলে উপনিষদই

গ্রাহ্য, কারণ শ্রুতি স্বতঃপ্রমাণ।

উপনিষদ কথাটার অর্থ হল গুরুর কাছে বসে' তাঁর কাছ থেকে পাওয়া ব্রহ্মবিদ্যা। অন্য অর্থে রহস্য। এ বিদ্যা দুর্লভ রহস্য, অধিকারী না হলে কেউ পায় না। এককথায় বললে উপনিষদের বিষয় হল আত্মজ্ঞান—উপনিষদ হল আত্মবিদ্যার আলোচনা। আত্মাই ব্রহ্ম, তাই আত্মবিদ্যাই ব্রহ্মবিদ্যা।

উপনিষদ সংখ্যায় অনেক, কেউ বলেন ১০৮ খানা, কেউ বলেন ১২০ খানা। তার মধ্যে কোনো কোনোটি অত্যন্ত অর্বাচীন কালের। আল্লোপনিষদ রচিত হয়েছে আকবরের (১৫৪২-১৬০৫) কালে। অনেকেরই মতে উপনিষদ সমূহের মধ্যে ১৩টিই প্রধান—ঐতরেয়, বৃহদারণ্যক, ছান্দোগ্য, তৈত্তিরীয়, কৌষীতকি, কেন, ঈশা, কঠ, শ্বেতাশ্বেতর, মুন্ডক, প্রশ্ন, মৈত্রী ও মান্ডূক্য।

উপনিষদের ব্যাখ্যা থেকে—আরো নির্দিষ্ট ক'রে বললে ব্রহ্মসূত্র বা বেদান্তসূত্রের ভাষ্য থেকে পরবর্তীকালে অনেকগুলি মতবাদের সৃষ্টি হয়েছে। প্রাথমিক বিবেচনায় তাদের দু ভাগে ভাগ করা যায়। এক, নিষ্প্রপঞ্চ ব্রহ্মবাদ, ব্রহ্ম দ্বিতীয়-রহিত, কারো সংগেই যুক্ত নয়, কেননা আর-কিছুই নেই—ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা, এই মতবাদ। এই মতবাদই শংকরের কেবলাদ্বৈতবাদ বা মায়াবাদ। শংকরের মতে ব্রহ্ম নির্গুণ, বাক্য ও মনের অগোচর। ঈশ্বর বলতে আমরা যে সগুণ ব্যক্তিস্বভাবী সত্তাকে বুঝি, শংকরের মতে তা মিথ্যা। শঙ্কর ব্রহ্মবাদী, কিন্তু ঈশ্বরবাদী নন; জ্ঞানবাদী, কিন্তু ভক্তিবাদী নন। দ্বিতীয় ভাগ হল সপ্রপঞ্চ ব্রহ্মবাদ—ব্রহ্ম জগতের সংগে যুক্ত, ব্রহ্ম সত্য জগৎ-ও মিথ্যা নয়। এই মতটি ব্রহ্মবাদী হয়েও ঈশ্বরবাদী এবং ভক্তিবাদী।

অনেক বৈষ্ণব সম্প্রদায় এবং শৈব ও শাক্ত সম্প্রদায় সপ্রপঞ্চ ব্রহ্মবাদী এবং ভক্তিবাদী। রামকৃষ্ণ পরমহংস ছিলেন এই রকম শাক্ত ভক্তিবাদী। বিবেকানন্দের বেদান্তব্যাখ্যা এই গোত্রেরই, কিন্তু আর-একটু স্বকীয় দার্শনিকতায় পরিমার্জিত। ব্রহ্মসূত্রের ভক্তিবাদী ব্যাখ্যা থেকে অনেকগুলি বৈষ্ণব সাম্প্রদায়িক মতবাদের সৃষ্টি হয়েছে। যেমন রামানুজের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ। রামানুজের মতে ব্রহ্ম ও ঈশ্বর অভিন্ন। ঈশ্বর বিশেষ্য, জীব ও জগৎ তাঁর গুণ, অতএব মিথ্যা নয়। ঈশ্বর ও জীবের (বা জগতের) ভেদ ও অভেদ দুই-ই স্বীকার্য, কিন্তু অভেদেরই গুরুত্ব বেশি। অন্য বৈষ্ণব মতগুলিও এর কাছাকাছি, পার্থক্য ভেদের উপর কে কতটা গুরুত্ব দিয়েছেন প্রধানত তাই নিয়ে। একটি হল নিম্বার্কের ভেদাভেদবাদ বা দ্বৈতাদ্বৈতবাদ। নিম্বার্কের মতে ভেদ ও অভেদ সমান গুরুত্বপূর্ণ। তেমনি মধ্বাচার্যের দ্বৈতবাদ বা কেবলভেদবাদ। মধ্বের মতে ঈশ্বর ও জীবের (এবং জগতের) ভেদ নিত্য। ঈশ্বর কারণহীন—স্বয়ম্ভূ। জড়জগতের নিমিত্ত-কারণ ঈশ্বর, উপাদান-কারণ প্রকৃতি। বল্লভাচার্যের শুদ্ধাদ্বৈতবাদ। বল্লভের মতে ঈশ্বর কারণ এবং জগৎ কার্য কার্য মিথ্যা নয়। গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের হল অচিন্ত্য-ভেদাভেদবাদ। বলা যায় যে এ মত চৈতন্যের, কিন্তু নির্দিষ্টতা পেয়েছে জীব গোস্বামীর লেখায়। ব্রহ্মসূত্রের স্বীকৃত ভাষ্য-গ্রন্থ ধ'রে বললে বলতে হবে বলদেব বিদ্যাভূষণের 'গোবিন্দভাষ্যে'র নাম। ভাস্করের মতবাদের নাম ঔপাধিক ভেদাভেদবাদ। ভাস্করের মতে অভেদ স্বাভাবিক, ভেদ উপাধিগত। উপাধি মিথ্যা নয়।

শাক্ত বৈদান্তিকেরা যেমন ব্রহ্ম, ঈশ্বর ও শক্তিকে—কালী বা দুর্গাকে এক ক'রে

দেখেছেন,—বৈষ্ণব বৈদান্তিকেরা যেমন ব্রহ্ম, ঈশ্বর এবং বিষ্ণুকে অথবা শ্রীকৃষ্ণকে এক ক'রে দেখেছেন, শৈব বৈদান্তিকেরাও ব্রহ্ম, ঈশ্বর এবং শিবকে এক ক'রে দেখেছেন।

রবীন্দ্রনাথে বৈষ্ণব-প্রভাবের কথা সকলেরই সুবিদিত। বিশেষ ক'রে কালিদাসের মধ্যে দিয়ে শৈব-প্রভাবও রবীন্দ্রসাহিত্যে অনেক এসেছে। কিছু কিছু কবিতায় ও গানে, কিছু কিছু বাক্-প্রতিমায় এবং অল্পস্বল্প কিছু প্রবন্ধে দেবীকল্পনার সাক্ষাৎও পাওয়া যাবে। কিন্তু বৈষ্ণবতা আরো অনেক ব্যাপক এবং গভীর। তা তাঁর কাব্যে বা সাহিত্যে নিবদ্ধ নয়, তা তাঁর ধর্মচিন্তার মধ্যেও অনেকখানি জায়গা জুড়ে আছে। বিশেষ ক'রে মধ্যজীবনের পর্বে। এ প্রশ্ন মনে জাগতেই পারে যে রবীন্দ্রনাথের বৈষ্ণবতা কোন্ গোত্রের বৈষ্ণবতা। রবীন্দ্রনাথ কোন্ বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের কোন্ মতবাদের সমর্থক ? প্রশ্নটি সংগত, কিন্তু এ প্রশ্ন নিয়ে এখানে বিস্তৃত আলোচনার অবকাশ নেই। আমাদের লক্ষ্য এখন উনবিংশ-বিংশ শতকের ধর্ম-আন্দোলন এবং উপনিষদ। রবীন্দ্রনাথের কথা যথাস্থানেই আসবে।

শুধু বৈষ্ণবতা নিয়ে দু-একটি প্রাসঙ্গিক কথা এইখানেই একটু তুলে রাখতে চাই। আমরা জানি রবীন্দ্রনাথ দীক্ষিত বৈষ্ণব নন, প্রাতিষ্ঠানিকভাবে বৈষ্ণব নন, ইচ্ছাসুখে বৈষ্ণব। সুতরাং রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে বৈষ্ণবতার কথা যখন বলব, তখন সেই বৈষ্ণবতার সঙ্গে কোনো সাম্প্রদায়িক অনুষঙ্গ জড়িয়ে ফেললে চলবে না। এবং কোনো দীক্ষিত বৈষ্ণব রবীন্দ্রনাথের কোনো পর্বের ধর্মসাধনাকেই বৈষ্ণব-ধর্মসাধনা বলে' মনে করবেন না। প্রাতিষ্ঠানিকভাবে তিনিই বৈষ্ণব, বিষ্ণু বা কৃষ্ণ যাঁর উপাস্য। অথবা ক্ষেত্রবিশেষে রাধাকৃষ্ণ যুগলে যাঁর উপাস্য। অথবা আরো বিশেষ ক্ষেত্রে যিনি রাধার মধ্যে দিয়েই যুগলের উপাসক। রবীন্দ্রনাথের মানসিকতায় কিছু মিল পাওয়া যায়, উপাসনার পদ্ধতি প্রকরণে কিছুমাত্র মিল পাওয়া যাবে না।

রবীন্দ্রনাথ অবশ্য তাঁর 'রাজা' নাটকে(১৯১০) খানিক বৈষ্ণব ভাবানুষঙ্গেই সখ্য, দাস্য, শৃঙ্গার এই রকম নানান রসের মধ্যে দিয়ে সাধনার ইঙ্গিত দিয়েছেন। তাঁর গানের মধ্যেও এই রকম নানা রসের সাধনপথের ইঙ্গিত পাওয়া যাবে, সেখানেও এই রকম প্রায় বৈষ্ণবোচিত নানা রসের আভাস পাওয়া যাবে। কিন্তু প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষেত্রে ভাবের সুস্পষ্টতা ও নির্দিষ্টতা থাকে, রবীন্দ্রনাথে তা নেই। রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধে বা ভাষণে যা-ই হোক না কেন, তাঁর গানে শৃঙ্গারেরই আধিপত্য, দাস্য বা সখ্য যেন একটা বর্ণবৈচিত্র্য সম্পাদন করে মাত্র। সে শৃঙ্গার কিন্তু রাধা-কৃষ্ণের নয়, তা রবীন্দ্রনাথেরই স্বকীয় প্রেমানুভূতি। ভানুসিংহের পদাবলীর কথা বাদ দিতে পারি, সহজেই বলতে পারি, আসলে বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস জ্ঞানদাসের মতো রবীন্দ্রনাথ মোটেই রাধার জবানিতে কথা বলেন নি। বলছেন নিজের কথা, নিজের জবানিতেই। নিজের জবানিতে সরাসরি নিজের প্রেমের প্রতিষ্ঠা দীক্ষিত বৈষ্ণব কখনোই করেন না। তা করেন সহজিয়া বৈষ্ণবেরা, আর করেন সূফীরা—আর করেন তাঁদের দুই সম্প্রদায়ের উত্তরাধিকারী বাউলেরা।

উপনিষদের কথায় ফিরে আসা যাক। আমরা জানি রামমোহন কোনো নতুন ধর্মের প্রবর্তন করতে চান নি। হিন্দুধর্মের একটি পরিশোধিত সংস্করণ, এই হল তাঁর নিজের ধর্ম। পরিশোধনটা তাঁর নিজের করা। পরিশোধন এমন হয়েছে যে তিনি মনে করেন কোনো সম্প্রদায়েরই এতে আপত্তির কিছু নেই। এই পরিশোধনের ব্যাপারে সব থেকে

বেশি নির্ভর করেছেন তিনি উপনিষদের উপরে। কিছু তন্ত্রের উপরেও। রামমোহন বেদ, উপনিষদ, ব্রহ্মসূত্র (বা বেদান্তসূত্র), পুরাণ, তন্ত্র—প্রত্যেকটি শাস্ত্রগ্রন্থকেই প্রামাণ্য বলে স্বীকার করেন। কিন্তু সকলকে নিয়ে তাঁর সমান উৎসাহ নয়। অনুবাদ ও আলোচনার মধ্যে দিয়ে তিনি প্রচার করেছেন উপনিষদের আর বেদান্তসূত্রের। কিন্তু বেদান্তসূত্র যেহেতু উপনিষদেরই সংক্ষিপ্তসার, সেই হেতু বলা যায় যে রামমোহনের মূল অবলম্বন উপনিষদ।

সব উপনিষদেও রামমোহনের সমান উৎসাহ নয়। তিনি ঈশ, কেন, কঠ, মুন্ডক,ও মান্ডূক্য, এই পাঁচখানি উপনিষদের মূল ও অনুবাদ প্রকাশ ও প্রচার করেন। বহুদেবদেবীর পূজক পৌত্তলিক সাধারণ হিন্দুকে একেশ্বরবাদের অভিমুখী করার এবং তার মনকে পৌত্তলিকতার মোহ থেকে মুক্ত করার পক্ষে এই পাঁচখানি উপনিষদের প্রচারই সম্ভবত তিনি যথেষ্ট বলে মনে করেছেন। খৃষ্টান প্রমুখ অন্যান্য একেশ্বরবাদী ধর্মের অনুগামী যাঁরা, তাঁরাও এ থেকেই দেখতে পাবেন হিন্দুধর্মের আসল রূপটি কী—রামমোহন যাকে আসল বা উচ্চতর রূপ বলে মনে করেন।

এই প্রসঙ্গে একটা কথা এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। উপনিষদই হোক কি অন্য শাস্ত্রই হোক, রামমোহন যা নিয়েছেন, তার মধ্যে কোনো হস্তক্ষেপ করেন নি। তাঁর অনুবাদের বাংলা আজ একটু সেকেলে বা কঠিন ঠেকতে পারে, কিন্তু অনুবাদ মোটামুটি বিশ্বস্ত। যা কিনা শ্রুতিপ্রস্থান সুতরাং স্বতঃপ্রমাণ, তার বাক্যবন্ধ তিনি ইচ্ছামতো বদলান নি। রামমোহন জানেন হিন্দুধর্মে নানা উৎস থেকে অনেক আবর্জনা এসে জড়ো হয়েছে, অর্থহীন অন্ধ মূঢ় লোকাচার ধর্মের আসনে এসে বসেছে, যথার্থ হিন্দুশাস্ত্রের সঙ্গে অধিকাংশ হিন্দুরই কিছুমাত্র পরিচয় নেই। রামমোহন যাকে অসার বা আবর্জনা বলে মনে করেছেন তাকে সরিয়ে তিনি চেষ্টা করেছেন যাকে তিনি হিন্দুধর্মের সার-সত্য বলে মনে করেন, হিন্দুধর্মের সর্বজনীন সত্য বলে মনে করেন, তারই প্রতিষ্ঠা করতে। তিনি চেয়েছিলেন সংস্কার। আর চেয়েছিলেন সম-মনাদের একটি মিলনকেন্দ্র—একটি সভা বা সমাজ। ব্রাহ্মসমাজের ট্রাস্টডীডে পরিষ্কার বলেছেন যে এই সভা হবে—"a place of public meeting of all sorts and descriptions of people without distinction...", যেখানে সম্পূর্ণ অসাম্প্রদায়িকভাবে সকলে ব্রহ্মের উপাসনা করতে পারবেন। যেহেতু রামমোহন কোনো নতুন ধর্মের প্রতিষ্ঠা করতে চান নি, যেহেতু উপনিষদ ইত্যাদির উপর তাঁর পূর্ণ আস্থা, তাই শাস্ত্রের—তা বেদই হোক কি উপনিষদই হোক, তার কোনো অংশের বা শ্লোকের কোনো অদল-বদল তিনি করেন নি। বস্তুত অদল-বদল করার প্রয়োজনও তাঁর হয় নি।

রামমোহন শাস্ত্রের উপর নির্ভর করেছেন, কিন্তু সেই শাস্ত্রগ্রন্থ তাঁর বিচার-বুদ্ধির দ্বারা নির্বাচিত। আসলে রামমোহনের নির্ভর শাস্ত্র এবং যুক্তি দুয়ের উপর—মিলিতভাবে। দেবেন্দ্রনাথের (১৮১৭-১৯০৫) কিন্তু ঠিক সে রকম নয়। দেবেন্দ্রনাথ রামমোহনের দ্বারাই উদ্‌বোধিত, কিন্তু তাঁর আসল নির্ভর শাস্ত্রও নয়, বিচার-বুদ্ধি বা যুক্তিও নয়, নিজের হৃদয়ের সায়ে। বলতে পারি, বোধি বা ইনটুইশনের সায়, অনুভবের সায়। তবে এ অনুভব জ্ঞান বর্জিত নয়। এ হল—'আত্মপ্রত্যয়সিদ্ধ জ্ঞানোজ্জ্বলিত বিশুদ্ধ হৃদয়'।

মনে রাখতে হবে, প্রাচ্য পাশ্চাত্য দুই দেশের দর্শনের সংগেই দেবেন্দ্রনাথের পরিচয় ঘটেছিল। দুই থেকেই তিনি ইচ্ছামতো গ্রহণ এবং বর্জন করেছেন। যেখানে রামমোহনের গ্রহণ বর্জনের সীমা বিশেষ বিশেষ গ্রন্থ, সেখানে দেবেন্দ্রনাথের গ্রহণ-বর্জনের সীমা গ্রন্থের বিশেষ বিশেষ অংশ, ঐতিহ্যসিদ্ধ ভাষ্য, শ্লোকের অংশ। প্রথম দিকে দেবেন্দ্রনাথ বেদের অপৌরুষেয়ত্বে বিশ্বাসী ছিলেন। তত্ত্ববোধিনী-সভা বা তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা প্রতিষ্ঠার মতো বেদ-প্রচারও দেবেন্দ্রনাথের একটি উল্লেখযোগ্য কর্ম। পরে তিনি বেদের অপৌরুষেয়ত্বে বিশ্বাস হারান। উপনিষদের সম্পর্কেও তাঁর মনোভাবের 'কিছু বদল ঘটে' যায়। ১৮৪৯ সালে বেদ ও উপনিষদ থেকে যখন তিনি তাঁর আত্মপ্রত্যয়সিদ্ধ তত্ত্বগুলিকে বেছে নিয়ে 'ব্রাহ্ম ধর্মঃ' গ্রন্থটি সংকলন করলেন, তখন তার মধ্যে দেবেন্দ্রনাথের ধর্মমতের এই বিবতনের ছাপ স্পষ্ট লক্ষ করা যায়। এই সম্পর্কে 'আত্মজীবনী'-তে (১৮৯৮) দেবেন্দ্রনাথ যা লিখেছেন (পৃ.১৮০-৮১) তা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য।—

" ইহা কেহ মনে করিবেন না যে, আমাদের বেদ ও উপনিষদ্‌কে আমি একেবারে পরিত্যাগ করিলাম, ইহার সংগে আমাদের আর কোন সংস্রব রহিল না। এই বেদ ও উপনিষদের যে সকল সার সত্য, তাহা লইয়াই " ব্রাহ্মধর্ম" সংগঠিত হইল এবং আমার হৃদয় তাহারই সাক্ষী হইল।...

"এই উপনিষদ হইতেই প্রথমে আমার হৃদয়ে আধ্যাত্মিক ভাবের প্রতিধ্বনি পাইয়াই আমি সমগ্র বেদ এবং সমস্ত উপনিষদকে ব্রাহ্মধর্মের প্রতিষ্ঠা করিতে যত্ন পাইয়াছিলাম; কিন্তু তাহা করিতে পারিলাম না ইহাতেই আমার দুঃখ। কিন্তু এ দুঃখ কোন কার্যের নহে, যেহেতুক সমস্ত খনি কিছু স্বর্ণ হয় না। খনির অসার প্রস্তর চূর্ণ করিয়াই তাহা হইতে স্বর্ণ নির্গত করিতে হয়।... বেদ-উপনিষদ-রূপ খনির মধ্যে এখনও কত সত্য কত স্থানে গভীর রূপে নিহিত আছে। ভগবদ্ভক্ত বিশুদ্ধ-সত্ত্ব সত্যকাম ধীরেরা যখনই অনুসন্ধান করিবেন, তখনই ঈশ্বরপ্রসাদে তাঁহাদের হৃদয়-দ্বার উদ্‌ঘাটিত হইবে, এবং তাঁহারা সেই খনি হইতে সেই সকল উদ্ধার করিয়া লইতে পারিবেন।"

উপনিষদ-রূপ খনির দেবেন্দ্রনাথ-নির্বাচিত অংশ সোনা আর বাকি 'অসার প্রস্তর', এমন কথা কোনো নিষ্ঠাবান বা প্রাতিষ্ঠানিক হিন্দু স্বীকার করবেন না, বোধকরি রামমোহনও স্বীকার করবেন না। ব্যক্তিগত ধর্ম নিয়ে কোনো প্রশ্ন নেই। প্রশ্ন প্রাতিষ্ঠানিক ধর্ম নিয়ে। প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের ক্ষেত্রে নাম জিনিসটা তুচ্ছ নয়। ১৮৪৭ সালের মে মাসে তত্ত্ববোধিনী সভার অধিবেশনে স্থির হয়, অতঃপর বেদান্ত-প্রতিপাদ্য সত্যধর্ম নামের পরিবর্তে ব্রাহ্মধর্ম নামই গ্রহণ করা হবে। এই সম্পর্কে 'আত্মজীবনী'-তে দেবেন্দ্রনাথ লিখেছেন, 'পূর্বে ব্রাহ্মসমাজ' ছিল, এখন ব্রাহ্মধর্ম হইল।"—প্রাতিষ্ঠানিক হিন্দু এ রকম ভাবতেই পারেন যে এই আলাদা নামের নিশ্চয়ই কোনো গভীর তাৎপর্য আছে: বৈষ্ণব বা শাক্তের মতো সম্প্রদায় নয়, এ নিশ্চয়ই আলাদা ধর্ম।

দেবেন্দ্রনাথ কিন্তু ব্রাহ্মধর্মকে আলাদা ধর্ম বলে দাবী করেন নি। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার (অগ্রহায়ণ ১৭৮৯ শক) 'হিন্দুধর্মের সহিত ব্রাহ্মধর্মের সম্পর্ক' প্রবন্ধে তিনি লিখেছেন—

"ব্রাহ্মধর্ম হিন্দুধর্মের বিরোধী বা বিসম্বাদী নহে; প্রত্যুত ইহা হিন্দুধর্মেরই সার।...

"হিন্দু জাতির মান, সম্ভ্রম ও গৌরব কেবল ব্রাহ্মধর্মের দ্বারাই পরিরক্ষিত হইবে; ইহার প্রধান কারণ এই যে ব্রাহ্মধর্ম হিন্দু জাতিরই পুরাতন ধর্ম।"

মাত্র একেশ্বরবাদের প্রচারের জন্যই ব্রাহ্মধর্মকে হিন্দুধর্মের থেকে স্বতন্ত্র মনে করার কোনো যুক্তি নেই, স্বতন্ত্র মনে করার কারণ অন্যত্র। সে হল এইখানে যে দেবেন্দ্রনাথ মনে করেন যে, হিন্দুধর্মের যে-অংশটুকু দেবেন্দ্রনাথের হৃদয়ের কাছে গ্রাহ্য সেইটুকুই যথার্থ হিন্দুধর্ম—এবং সেইটেই ব্রাহ্মধর্ম। এই একই প্রবন্ধে দেবেন্দ্রনাথ বলেছেন—

"যদি আমাদের পুরাতন শাস্ত্র-সকলের মধ্যে ব্রাহ্মধর্ম না পাইতাম, তাহা হইলেও ব্রাহ্মধর্ম আমাদের আশ্রয়-স্থান হইতেন সন্দেহ নাই ; কিন্তু সেরূপ হইলে হিন্দুধর্মের সহিত বিরোধে প্রবৃত্ত হইয়া আমাদিগকে অত্যন্ত ক্ষোভ পাইতে হইত। এক্ষণে আর সে ক্ষোভের সম্ভাবনা নাই।"

—এর মধ্যে যে একটা প্রচ্ছন্ন বিদ্রোহের সুর আছে স্বাতন্ত্র্যের বীজ সেইখানে। দেবেন্দ্রনাথ নিজে তা অনুভব না করলেও পরবর্তীকালে যে সেই বীজ অংকুরিত হয়ে উঠেছিল তা আমরা সকলেই জানি। কিন্তু তা হয়েছে আদি ব্রাহ্মসমাজের বাইরে।

শুধু প্রাতিষ্ঠানিক স্বাতন্ত্র্য নয়, হৃদয়ের উপর জোর দেওয়াতে এর মধ্যে সম্পূর্ণ নতুন একটা ঝোঁক লক্ষ করা যাবে। সকলেই জানেন, বুদ্ধি বা যুক্তির মধ্যে একটা সর্বজনীনতাও আছে, কিন্তু অনুভূতি যার-যার তার-তার, আত্মপ্রত্যয়সিদ্ধ হৃদয় যার-যার তার-তার। অর্থাৎ এর মধ্যে যে ঝোঁক আছে তা হল ব্যক্তিগত ধর্মের দিকে ঝোঁক। দেবেন্দ্রনাথে তা অনতিপ্রচ্ছন্ন। রবীন্দ্রনাথে তা দিবালোকের মতো স্পষ্ট।

'ব্রাহ্মধর্মঃ' গ্রন্থের ভিত্তি যে দেবেন্দ্রনাথের স্বানুভূতি সেই কথাটি স্পষ্ট করে বলেছেন ওই গ্রন্থের ৯ম সংস্করণের সম্পাদক সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী। লিখেছেন (ব্রাহ্মধর্মঃ ১০ম সং, পৃ. ২২৬), "প্রথম খন্ড দেবেন্দ্রনাথ-কৃত সংকলন গ্রন্থ মাত্র নহে, তাঁহার হৃদয় নিঃসৃত নূতন 'ব্রাহ্মী উপনিষৎ'।" দেবেন্দ্রনাথের গৃহীত বা স্বীকৃত উপনিষদ যেমন 'ব্রাহ্মী উপনিষৎ', রবীন্দ্রনাথের গৃহীত উপনিষদ ও তার ভাষ্যও তেমনি 'রাবীন্দ্রিক উপনিষদ'। সে প্রসঙ্গ যথাস্থানে, দেবেন্দ্রনাথের সংকলনের বিশেষত্বের কথায় ফিরে আসা যাক।

'ব্রাহ্মধর্মঃ' গ্রন্থের ১ম খন্ডের ১২শ অধ্যায়ের ১০৯নং বচনটি উক্ত গ্রন্থে (পৃ. ৮৫) নিম্নলিখিতভাবে পরিবেশিত হয়েছে [বিরতিচিহ্ন সংশোধিত করা হল। স.]–

"যেনাহং নামৃতা, স্যাং কিমহং তেন কুর্যাম্। অসতো মা সদ্গময় তমসো মা জ্যোর্তির্গময় মৃত্যোর্মামৃতং গময়। আবিরাবীর্ম এধি। রুদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যম্।"

এই বচনের প্রথম অংশ, 'যেনাহং...কুর্য্যাম্' বৃহদারণ্যক উপনিষদের ২য় অধ্যায়ের, ৪র্থ ব্রাহ্মণের–'সা...মে ব্রুহীতি'–এই ৩য় বচনের মাঝখানের অংশ। উদ্ধৃতির ২য় অংশ, 'অসতো মা...গময়' ওই বৃহদারণ্যকেরই ১ম অধ্যায়ের ৩য় ব্রাহ্মণের ২৮নং বচনমালার– 'অথাতঃ' পরমানানামেবাভ্যারোহঃ' ইত্যাদির একটি অংশ। 'আবিরাবীর্ম এধি' ঐতরেয় উপনিষদের শান্তিপাঠের–'ওঁ বাঙ্মে' ইত্যাদির মাঝখানের একটি টুকরো। উদ্ধৃতির শেষ অংশ–'রুদ্র যত্তে...পাহি নিত্যম্' শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের ৪র্থ অধ্যায়ের ২১নং– 'অজাত ইত্যেব'–এই শ্লোকের ২য় বাক্য।

যে সব বচনগুচ্ছ সুপরিচিত, রবীন্দ্রনাথও যা বার বার ব্যবহার করেছেন, দেবেন্দ্রনাথের 'ব্রাহ্মধর্মঃ' থেকে সেই রকম চূর্ণীকৃত এবং যদৃচ্ছ-মিশ্রিত আরো দুটি বিখ্যাত বচনগুচ্ছের দৃষ্টান্ত দিচ্ছি।–

'ব্রাহ্মধর্মঃ' গ্রন্থের আরম্ভে ব্রহ্মোপাসনা-ভাগের অর্চনাটি এইভাবে পরিবেশিত হয়েছে(পৃ ২৭)–

"ওঁ পিতা নোহসি, পিতা নো বোধি,
নমস্তেহস্তু মা মা হিংসীঃ।
বিশ্বানি দেব সবিতর্দুরিতানি পরাসুব,
যদ্ভদ্রং তন্ন আসুব।
নমঃ সম্ভবায় চ ময়োভবায় চ।
নমঃ শংকরায় চ ময়স্করায় চ।
নমঃ শিবায় চ শিবতরায় চ।"

–এর প্রথম অংশ 'পিতা নোহাসি... হিংসীঃ' শুক্লযজুর্বেদের ৩৭/২০ থেকে নেওয়া; দ্বিতীয় অংশ 'বিশ্বানি... তন্ন আসুব' ওই শুক্লযজুর্বেদেরই ৩০/৩ থেকে নেওয়া; শেষ অংশ 'নমঃ সম্ভবায়... শিবতরায় চ' একই উৎসের ভিন্ন জায়গা থেকে-১৬/৪১ থেকে নেওয়া।

'ব্রাহ্মধর্মঃ' গ্রন্থের ওই আরম্ভ অংশেরই 'সমাধান' শিরোনাম থেকে তৃতীয় দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। বচনটি বা বচনগুচ্ছটি পরিবেশিত হয়েছে এইভাবে (পৃ. ২৮)–

"ওঁ সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম
আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি
শান্তং শিবমদ্বৈতম্।"

—এর প্রথম পঙ্‌ক্তি 'ওঁ সত্যং...ব্রহ্ম' তৈত্তিরীয় উপনিষদের ২য় অধ্যায়ের ১ম অনুবাকের ৩য় বচনের অংশ। এর দ্বিতীয় পঙ্‌ক্তি 'আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি' মুন্ডক উপনিষদের ২/২/৭ শ্লোকের শেষ অংশ থেকে নেওয়া। আর উদ্ধৃতির তৃতীয় পঙ্‌ক্তি—'শান্তং শিবমদ্বৈতম্'—এটি হল মান্ডূক্য উপনিষদের ৭ সংখ্যক দীর্ঘ বচনমালার মাঝখানের একটি খন্ডাংশ।

রামমোহন বেদান্তকে স্বীকার করেছেন খানিকটা নিজের মতো ক'রে, শঙ্করের মায়াবাদী. ভাষ্যকে পাশ কাটিয়ে। দেবেন্দ্রনাথ বেদান্তকে সরাসরি বাতিল করেছেন। 'আত্মজীবনী'-তে এ প্রসঙ্গে বলেছেন(পৃ. ৩৭)—

"বেদান্তদর্শনকে আমরা শ্রদ্ধা করিতাম না, যে-হেতুক, তাহাতে শংকরাচার্য জীব ও ব্রহ্মকে এক করিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছেন। আমরা চাই ঈশ্বরকে উপাসনা করিতে। যদি উপাস্য উপাসক এক হইয়া যায়, তবে কে কাহার উপাসনা করিবে?"

এখানে বলা দরকার যে মায়াবাদী শঙ্কর ছাড়াও রামানুজ, নিম্বার্ক, মধ্ব, বল্লভ প্রমুখ আরো কয়েক জন বহুখ্যাত ভক্তিবাদী বৈষ্ণব ভাষ্যকার আছেন, যাঁরা উপাস্য এবং উপাসককে শঙ্করের মতো সম্পূর্ণ এক ক'রে দেখেন নি। দেবেন্দ্রনাথ তাঁদের সম্পর্কে নীরব। শঙ্করকে সরবে এবং বাকি বৈদান্তিকদের তিনি নীরবে পাশ কাটিয়ে গিয়েছেন।

এখানে উল্লেখ করা যায় যে, রবীন্দ্রনাথও ঠিক তাই করেছেন, এমন কি তাঁর লক্ষণীয় রকমের বৈষ্ণব বা ভক্তিবাদী পর্বেও।

আগেই বলেছি, রবীন্দ্রনাথের বৈষ্ণবতা বৈষ্ণব ঐতিহ্যের সঙ্গে যুক্ত নয়, দীক্ষিত বৈষ্ণবের সাধনার সঙ্গে তার সাযুজ্য নেই। এর প্রধান আশ্রয় তার গান, সেই গানের বৈষ্ণবীয় রূপকল্প। এর মধ্যে যে প্রেম, যে আকুলতা ও যে আত্ম-নিবেদন, তার উৎস রবীন্দ্রনাথের স্বানুভূতিতে। 'গীতাঞ্জলি'-র গানে প্রেমের আকুলতার মধ্যে কবির 'আমি' যে-ভাবে প্রেমাস্পদের সমভূমিতে এসে দাঁড়িয়েছে, দীক্ষিত বৈষ্ণব মহাজনের কাছে তা স্পর্ধা বলে মনে হতে পারে। তাঁরা নিজের প্রেমের কথা বলেন না, বলেন রাধার প্রেমের কথা। নিজেকে সামনে এনে তাঁরা কখনোই বলবেন না—

"আমার মিলন লাগি তুমি আসছ কবে থেকে।"

(সংকলনের ৭২ নং রচনা)

নিজেকে পিছনে সরিয়ে রেখে মঞ্জরী-ভাবে-ভাবিত হয়ে তারা রাধার প্রেমের পুষ্টি সাধন করবেন। রবীন্দ্রনাথ বৈষ্ণবীয় বিনয়ে মঞ্জরী হবার কথা ভাবেন নি, প্রেমিকার স্পর্ধা নিয়ে সরাসরি বলেছেন—

"তোমায় আমায় মিলন হবে বলে ।"

(সংকলনের ৯৫নং রচনা)

বলেছেন—

"আমি নইলে ত্রিভুবনেশ্বর
তোমার প্রেম হত যে মিছে।"

(সংকলনের ৮৩নং রচনা।)

এ ভাষা বৈষ্ণব মহাজনের নয়, রূপ গোস্বামী বা জীব গোস্বামী বা কৃষ্ণদাস কবিরাজের নয়, কান পাতলে এ ভাষা হয়তো রাধার কণ্ঠে শুনতে পাব। পুনরুক্তি ক'রেই বলি, অনুরূপ ভাষা দক্ষিণী আলোয়ার কবিদের কণ্ঠে, রাধা-ভাবে-ভাবিত দিব্যোন্মাদ চৈতন্যের কণ্ঠে, কিংবা হয়তো মীরাবাইয়ের কণ্ঠে শুনতে পাব। আরো শুনবো সূফীদের কণ্ঠে, সহজিয়া বৈষ্ণবের কণ্ঠে, বাউলের কণ্ঠে। এঁরা সকলেই অল্পবিস্তর প্রাতিষ্ঠানিক, কিন্তু ভিতরে-ভিতরে তার থেকেও বেশি স্বানুভূতি মার্গের। রবীন্দ্রনাথ অবশ্য প্রাতিষ্ঠানিক পথে কমই হেঁটেছেন। প্রথম দিকে কিছুকাল প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সঙ্গে, পরে একেবারে স্বানুভূতির পথে।

দেবেন্দ্রনাথের ধর্ম হিন্দুধর্ম কি হিন্দুধর্ম নয় সে কথা স্বতন্ত্র, কিন্তু তিনি প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মেরই পক্ষপাতী। তিনি প্রতিষ্ঠানকেও চান, আবার স্বানুভূতির আধিপত্যও চান। এ দুয়ের সহাবস্থান যে স্বাভাবিক নয় এমন তিনি মনে করেন নি। রবীন্দ্রনাথের প্রেমধর্ম তাঁর নিজের, তা আর কারো দান নয়। তাঁর স্বানুভূতি, বলা বহুল্য তাঁর নিজের অনুভূতি। দেবেন্দ্রনাথের দান নয়। কিন্তু নিজের ধর্মসাধনার ক্ষেত্রে স্বানুভূতির একাধিপত্য – প্রতিষ্ঠার মধ্যে দিয়ে দেবেন্দ্রনাথ যে পরবর্তী পথিকদের ব্যক্তিগত ধর্মের পথ কিছুটা সুগম ক'রে দিয়েছেন তাতে সন্দেহ নেই।

ধর্মসাধনায় দেবেন্দ্রনাথ নিঃসন্দেহে খানিকটা বিপ্লবী, কিন্তু সমাজ-ব্যাপারে তিনি রক্ষণশীল হিন্দু। হিন্দুর ধর্ম ও সামাজিক আচরণ অচ্ছেদ্য, এই অচ্ছেদ্য বন্ধনকে

দেবেন্দ্রনাথ কাটতে পারেন নি, কাটার কথা ভাবেনও নি। আদি ব্রাহ্মসমাজে এই ধর্মীয় প্রগতিশীলতা এবং সামাজিক রক্ষণশীলতা একে অপরের সংগে দুর্মোচ্যভাবে মিশে গিয়েছিল। সেই কারণেই আদি ব্রাহ্মসমাজের ব্রাহ্মধর্মকে কেউ হিন্দুধর্ম থেকে খুব আলাদা ক'রে দেখেন না।

আমরা জানি একেবারে প্রথম দিকে সামাজিক প্রশ্নে রবীন্দ্রনাথ মোটেই রক্ষণশীল ছিলেন না, বরং কিছুটা বিদ্রোহী এবং বিপ্লবী ধরণেরই ছিলেন। এ-ও জানি যে সে সময়ে তিনি ধর্ম-ব্যাপারে বিশেষ আগ্রহীও ছিলেন না। সেই বাল্য কৈশোর বা কাঁচা যৌবনকালকে যদি বাদ দিই, তাহলে দেখব, যখন থেকে রবীন্দ্রনাথ ধর্ম-ব্যাপারে খানিকটা সজাগ হয়ে উঠেছেন, যখন তিনি আদি ব্রাহ্মসমাজের সেক্রেটারি হলেন (১৮৮৪), তখন থেকেই সামাজিক ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের বিদ্রোহের ভাব খানিকটা প্রশমিত হতে শুরু করেছে। ক্রমে দেশ সম্পর্কে যত সচেতন হয়েছেন, জাতীয় ঐতিহ্য সম্পর্কে যত সচেতন হয়েছেন মনের ভারকেন্দ্র ততই প্রাচ্যতার দিকে—এবং আমাদের শ্রদ্ধেয় অতীতের দিকে একটু একটু ক'রে সরে এসেছে। ক্রমে ব্রাহ্মত্বের বৈশিষ্ট্যটুকুও শিথিল হয়ে পড়েছে। তারপর—যে টানে ব্রাহ্ম বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, বিপিন চন্দ্র পাল, চিত্তরঞ্জন দাশ গোঁড়া হিন্দু হয়ে উঠেছেন, যে টানে অরবিন্দ ঘোরতর হিন্দু হয়ে উঠলেন, সেই টানটা মর্মের মধ্যে রবীন্দ্রনাথও অনুভব করলেন। এক সময় হিন্দু-পুনরুজ্জীবনবাদীদের রবীন্দ্রনাথ পরিহাস করেছেন। এইবারে যেন শুরু হল তারই প্রতিশোধ, প্রকৃতির প্রতিশোধ বলব না, বলব—অতীতের প্রতিশোধ। বলতে পারি, প্রাচ্য আত্মতার প্রতিশোধ, রক্তের মধ্যের দূরপ্রসারিত-মূল হিন্দুত্বের প্রতিশোধ।

সময়টা হল উনিশ ও বিশ শতকের সন্ধিকাল, বয়স যখন রবীন্দ্রনাথের চল্লিশের উপান্তে। এ হল 'নৈবেদ্যে'র কাল, এর পরেই শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মচর্য-আশ্রমের প্রতিষ্ঠা (ডিসেম্বর ১৯০১)। এর পর কয়েক বছরের জন্য রবীন্দ্রনাথের জীবনে ক্রমশই হিন্দুত্বের এবং সামাজিক রক্ষণশীলতার প্রভাববৃদ্ধি ঘটেছে। এই সময়ই তিনি ঘোষণা করেছেন (মনোরঞ্জন বন্দোপাধ্যায়কে লেখা ১৯ অগ্রহায়ণ, ১৩০৯ ইং ১৯০২ তারিখের চিঠি)—

"যাহা হিন্দুসমাজবিরোধী তাহাকে এ বিদ্যালয়ে [আশ্রম-বিদ্যালয়] স্থান দেওয়া চলিবে না; সংহিতায় যেরূপ উপদেশ আছে ছাত্ররা তদনুসারে ব্রাহ্মণ অধ্যাপকদিগকে পাদস্পর্শপূর্বক প্রণাম ও অন্যান্য অধ্যাপকদিগকে নমস্কার করিবে এই নিয়ম প্রচলিত করাই বিধেয়।" (স্মৃতি, মনোরঞ্জন বন্দোপাধ্যায়, পৃ. ১৪-১৫ দ্রষ্টব্য।)

গোটা বংগদর্শন পত্রিকার কালটাই (নবপর্যায়, ১৯০১-০৫) এই রকম। এই সময় রবীন্দ্রনাথ প্রায় প্রাতিষ্ঠানিকভাবেই হিন্দু, তবে পৌত্তলিকতার সমর্থক কি-না তা বলা কঠিন। পৌত্তলিক না হতে পারেন, কিন্তু দেবেন্দ্রনাথের মতোই ঐতিহ্যবাদী এবং রক্ষণশীল। এ যেন পরিবর্তন-পূর্ব গোরা, কেবল গোরার যোদ্ধৃভাবটাই অনুপস্থিত। এই রকম চলেছে দেবেন্দ্রনাথের মৃত্যুর (১৯০৫) পরেও কিছুকাল। তারপর 'গোরা' - উপন্যাস রচনার সূত্রপাত (১৯০৭)। 'গোরা' প্রকাশের পর (১৯১০) অথবা বলতে পারি তার কিছুকাল আগেই শুরু হয়েছে যাকে আমরা বলি গীতাঞ্জলি পর্ব। সেই সময়ের কথায় রবীন্দ্রনাথ এক চিঠিতে (১৪ কার্তিক ১৩২৮, ইং ১৯২১) ব্রজেন্দ্রনাথ শীলকে লিখেছেন—

"বৈষ্ণব সাহিত্য ও উপনিষৎ বিমিশ্রিত হইয়া আমার মনের হাওয়া তৈরি করিয়াছে।

নাইট্রোজেন এবং অক্সিজেন যেমন মেশে তেমনি করিয়াই মিশিয়াছে।" এই সময়ের আগে থেকেই মন থেকে সমস্ত প্রাতিষ্ঠানিকতার টান কাটতে শুরু করেছে। শান্তিনিকেতন ভাষণাবলীর মধ্যেও প্রাতিষ্ঠানিকতার বিশেষ ছাপ নেই। এই সময় থেকেই রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত প্রেমধর্মের সূচনা–সে প্রেমধর্মকে বৈষ্ণবতাই বলি আর সহজিয়া ভাবই বলি। বাউল প্রভাব ক্রমে বেড়েছে ছাড়া কমে নি। সেই বাউল ভাব এবং সেই মনের মানুষের সন্ধানের মধ্যে উপনিষদের মিশ্রণ–নাইট্রোজেন অক্সিজেনের উপমা ঠিক-ঠিক খাটবে কি না জানি না। তার পরে মানবধর্মের কাল। তার মধ্যেও বৈষ্ণবতা, বাউলভাব এবং উপনিষদ্ সব দেখতে পাব। কিন্তু মানুষই সেখানে প্রধান।

রবীন্দ্রনাথের ধর্মভাবনা, ধর্মানুভূতি বা ধর্মসাধনা যা-ই বলি, তার মধ্যে কয়েকটি বড়ো বিশেষত্ব আমরা দেখতে পাব। এক, প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মকে পাশ কাটিয়ে ব্যক্তিগত ধর্ম বা স্বানুভূতি-নির্ভর ধর্মকে একান্ত মূল্য দেওয়া। ব্যক্তিগত ধর্মের যোগ ব্যক্তি-স্বাতন্ত্রের সঙ্গে, ব্যক্তির আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে। দ্বিতীয় বিশেষত্ব তাঁর ধর্মভাবনার জঙ্গমতা। আর একটি দুঃখবোধ। তেমনি মূল্যচেতনা। তেমনি সৃজনশীলতা।

রামমোহন চেয়েছিলেন সর্বজনীন ধর্ম, ঔপনিষদিক ব্রহ্ম উপাসনাকে সর্বজনীন চেহারা দিতে। প্রতিষ্ঠানকে ছুঁয়ে থেকেই তিনি প্রতিষ্ঠানকে অতিক্রম করেছেন উদার অসাম্প্রদায়িকতায়, সর্বধর্মসমন্বয়ে। এক অর্থে, অর্থাৎ তত্ত্বগতভাবে রবীন্দ্রনাথের ধর্মও সর্বজনীন, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে তা তাঁর একলার। যতই রবীন্দ্রনাথ প্রতিষ্ঠান থেকে দূরে সরেছেন, ততই তাঁর ধর্ম উত্তরোত্তর রাবীন্দ্রিক হয়ে উঠেছে। অনন্য বলেই রবীন্দ্রনাথের ধর্ম আকর্ষ-হীন, সম্মোহন-রিক্ত। শত্রুহীন বলেই যেন তাঁর ধর্ম বন্ধুহীন। রবীন্দ্রনাথ চলেছেন একেবারে নিজের পথে–সম্পূর্ণ সঙ্গীহীন। বুদ্ধদেব যাকে বলেছেন আত্মদীপ, সেই রকম–তিনিই তাঁর পথের আলো।

ধর্মের পথে রবীন্দ্রনাথ, বুদ্ধদেবের ভাষায় আত্মশরণ। আত্মনির্ভরশীল বলেই রবীন্দ্রনাথের ধর্ম শাস্ত্রনির্ভর নয়। উপনিষদ্ আছে, কিন্তু তা রবীন্দ্রনাথের নির্ভর নয়। উপনিষদ রবীন্দ্রনাথের কাছে শিরোধার্য শাস্ত্র নয়। উপনিষদ তাঁর সমধর্মী ও সহমর্মী। বৈষ্ণব-ভাবনা যেমন, অথবা বাউল-ভাবনা যেমন।

ধর্ম ব্যক্তিগত বলেই তার চারপাশে জ্বলন্ত নীতিবোধের বলয়, যেমন ছিল নাস্তিক জগমোহনের ("চতুরঙ্গ")। প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের সে বালাই নেই। সেখানে শাস্ত্র নীতির ঊর্ধ্বে, স্বীকৃত মোহান্তের শাস্ত্রব্যাখ্যা নীতির ঊর্ধ্বে, মোহান্ত নিজেও নীতির ঊর্ধ্বে–এবং বলা বাহুল্য প্রতিষ্ঠানের আত্মরক্ষা ও শ্রীবৃদ্ধির বিবেচনা নীতির ঊর্ধ্বে। যেমন এক সময় হয়ে উঠেছিল ইন্‌কুইজিশন নীতির ঊর্ধ্বে, প্রেম, করুণা ও মানবতার ঊর্ধ্বে।

ব্যক্তিগত ধর্মে যেমন হয়, বিশ্ববিধানের তাবৎ দায়িত্ব ব্যক্তির ধর্মবোধের উপরে এসে পড়ে, সমস্ত সংশয়, সমস্ত প্রশ্নের দায় তখন ব্যক্তির এবং তার ধর্মের। সংসারের সমস্ত অসম্পূর্ণতা, সমস্ত অবিচার, যন্ত্রণা, রোগশোকমৃত্যু–সমস্ত আধিভৌতিক আধিদৈবিক আধ্যাত্মিক দুঃখ, বিশ্বের সমস্ত পাপ সমস্ত অশুভ সমস্ত কলুষ ধর্মের কাছে মীমাংসার দাবি করে। বিশ্ববিধানের নিষ্ঠুর মৌনের হাত থেকে রবীন্দ্রনাথের ধর্মবোধের নিষ্কৃতি নেই, আছে শুধু নিজের মধ্যের থেকে সান্ত্বনার প্রয়াস। দুঃখবোধ, কখনো কখনো অশুভের বোধ রবীন্দ্রনাথের ধর্মভাবনার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত।

ধর্মের পথ-ব্যক্তিগত ধর্মের পথ মাধুর্যের পথ নয়, সেখানে নিজের রূপ আঁকা হয় রক্তের অক্ষরে।–

"নয় এ মধুর খেলা-...
বারে বারে বাঁধ ভাঙিয়া বন্যা ছুটেছে।
দারুণ দিনে দিকে দিকে কান্না উঠেছে।"

(র/৪/৭৯)

রক্তের অক্ষরে খোদিত, মধুর নয়, কঠিন।–

"সত্য যে কঠিন
কঠিনেরে ভালোবাসিলাম।"

(শেষ লেখা, র/৩/৯০২)

–দুঃখের মধ্যেই দুঃখের সান্ত্বনা, দুঃখের অবসানে নয়, দুঃখই দুঃখের সান্ত্বনা-

"সহসা দারুণ দুখতাপে সকল ভুবন যবে কাঁপে,
সকল পথের ঘোচে চিহ্ন, সকল বাঁধন যবে ছিন্ন,
মৃত্যু আঘাত লাগে প্রাণে-
তোমার পরশ আসে কখন কে জানে।"

(র/৪/১৭৪, সংকলনের ১২৬ নং রচনা)

–এই গভীর দুঃখবোধের স্থান প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মে নেই। সংসারে আছে, কিন্তু ধর্মচেতনার মধ্যে তা অনুস্যূত নয়। বৌদ্ধধর্মের যাত্রা দুঃখ থেকে, কিন্তু ধর্ম নিজে দুঃখ-বিনাশী। দুঃখের তাপে সকল ভুবন যদি কাঁপেও, সে দুঃখের নিবৃত্তি আছে। দুঃখ সেখানে ঈশ্বরের স্পর্শ নয়। আধুনিক কালে প্রাতিষ্ঠানিক বলে চিহ্নিত কিন্তু আসলে দলছুট্ কোনো কোনো ধর্মপীড়াগ্রস্তের মধ্যে এই রকম নিত্য-দুঃখের সাক্ষাৎ পাই। কীয়ের্কেগার্ডের কথা স্মরণ করা যায়। খৃষ্টানধর্মকে ছুঁয়ে থেকেই অলক্ষ্যে কীয়ের্কেগার্ড রবীন্দ্রনাথের মতোই ব্যক্তিগত ভূমিতে এসে দাঁড়িয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ ধর্মপীড়াগ্রস্ত নন, কিন্তু অত্যন্ত সংবেদনশীল কবি। গভীর সংবেদনশীলতাই তাঁকে এমন বেদনার গহনে নিয়ে এসেছে যেখানে বেদনার শরিক নেই, দুঃখের অবসান নেই।

ব্যক্তিগত ধর্মে পায়ের তলায় প্রতিষ্ঠানের সুদৃঢ় কোনো মঞ্চ নেই, যৌথতার কোনো সমর্থন নেই, পরম্পরার কোনো আশ্রয় নেই। এখানে কিছুই প'ড়ে-পাওয়া নয়, তাই কোনো পাওয়াতেই পাওয়ার শেষ নয়। পাওয়া নয়, পাবার আশা।–

"আছি পাবার আশা নিয়ে, তারে হয় নি আমার পাওয়া"।

(র/৪/১০)

–এর মধ্যে খোঁজাটাই সব, তৃপ্তির থেকে অতৃপ্তিটাই সত্যতর। গীতাঞ্জলি-পর্বের সন্ধান, প্রতীক্ষা এবং ঐশী অতৃপ্তির গানগুলির কথা, পারাপারহীন বিরহের কথা সর্বজনবিদিত।

চির-সন্ধানী বলেই রবীন্দ্রনাথ চির-পথিক। নিজেকে তিনি বলেছেন পান্হজন, ঈশ্বরকে বলেছেন পান্হজনের সখা। বলেছেন, "পথের সাথি, নমি বারম্বার" (র/৪/১৭২)। জীবনের পথে ঈশ্বর সব সময় আমাদের সঙ্গে সঙ্গে চলেছেন। জীবনের

পথে আমরা সবাই পথিক, এ নতুন কথা নয়। কিন্তু ধর্মের পথে রবীন্দ্রনাথ যে চির-সন্ধানী, চির-পথিক সে একটু ভিন্ন অর্থে। ধর্মের পথ তো বলে সেই পথকে যে-পথ ঈশ্বরে পৌঁছে দেয়, যে-পথ হয়তো-বা ঈশ্বরেই আচ্ছাদিত। রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে কিন্তু ব্যাপারটা মোটেই এমন নয় যে, সেই ঈশ্বরে-আচ্ছাদিত বা ঈশ্বর-উদ্দিষ্ট নির্দিষ্ট পথে রবীন্দ্রনাথ ক্রমাগত এগিয়ে এগিয়ে চলেছেন—এবং সেই চলার কারণেই তিনি পথিক। চলেছেন তিনি ক্রমাগতই, কিন্তু নির্দিষ্ট একটা মাত্র পথে নয়। তা যদি হত, তাহলে তাঁর সন্ধান হত সীমিত, তাঁর চলা হত উত্তরোত্তর পাওয়া। কিন্তু তা নয়, রবীন্দ্রনাথ বার বার নতুন নতুন পথে পা বাড়িয়েছেন। সে পথ পাওয়া দিয়ে আচ্ছাদিত নয়, পাওয়ার আশা দিয়ে আচ্ছাদিত। এবং হয়তো ঐশী অতৃপ্তি দিয়েই আচ্ছাদিত।

কোনো নতুন পথই আগেকার পথটাকে একেবারে বাতিল ক'রে দেয় নি। কিন্তু কত নতুন পথ, কত নতুন পাওয়ার আশা। কখনো রবীন্দ্রনাথ সেই পথ ধরেছেন যে পথ পিতার, প্রভুর, যাঁর দক্ষিণ মুখ প্রসন্ন, যিনি 'নিজ হস্তে নির্দয় আঘাত' ক'রে মানুষকে জাগিয়ে তুলতে পারেন—'তোমায় পিতা বলে' যেন জানি'। আবার কখনো ধরেছেন নৈর্ব্যক্তিক লিঙ্গহীন নামরূপ-বর্জিত বাক্ ও মানসের অগোচর ব্রহ্মের পথ।

কখনো দেখি তিনি শিবের উপাসক যে শিব শান্ত সমাহিত সুদূর কল্যাণমূর্তি। আবার বলেন তিনি নটরাজের চ্যালা, সব কবি সব শিল্পীই যেমন নটরাজের চ্যালা। 'নটরাজ ঋতুরঙ্গশালা'-র সূচনায় তিনি নটরাজের নৃত্যের প্রসঙ্গে বলেছেন (র/৫/৬২০)—

"নটরাজের তান্ডবে তাঁহার এক পদক্ষেপের আঘাতে বহিরাকাশে রূপলোক আবর্তিত হইয়া প্রকাশ পায়, তাঁহার অন্য পদক্ষেপের আঘাতে অন্তরাকাশে রসলোক উন্মথিত হইতে থাকে। অন্তরে বাহিরে মহাকালের এই বিরাট নৃত্যচ্ছন্দে যোগ দিতে পারিলে জগতে ও জীবনে অখন্ড লীলারস উপলব্ধির আনন্দে মন বন্ধনমুক্ত হয়।"

ওই বইয়েরই 'মুক্তিতত্ত্ব' কবিতায় বলেছেন (তদেব, ৬২১)—

"আমি নটরাজের চেলা
চিত্তাকাশে দেখছি খেলা
বাঁধন খোলার শিখছি সাধন
মহাকালের বিপুল নাচে।

দেখছি, ও যার অসীম বিত্ত
সুন্দর তার ত্যাগের নৃত্য
আপনাকে তার হারিয়ে প্রকাশ
আপনাতে যার আপনি আছে।

যে নটরাজ নাচের খেলায়
ভিতরকে তার বাইরে ফেলায়
কবির বাণী অবাক মানি
তারি নাচের প্রসাদ যাচে।"

এক সময় তিনি যেমন খুঁজেছেন প্রভুকে, পিতাকে, ঈষৎ দূরস্থিত মহৎ গম্ভীরকে, আর-এক সময় তেমনি দেখি, তিনি আকুল হয়ে খুঁজছেন তাঁর প্রেমিককে, অতি কাছে, অতি নিবিড়ভাবে, প্রেমের স্পর্ধায় একেবারে নিজের মাটির ঘরের সামনে পথের ধূলোয় নামিয়ে এনে।

কখনো রবীন্দ্রনাথ ভুবনকে দেখেছেন গানের ভিতর দিয়ে। শুধু ভুবনকে নয়, ভুবনেশ্বরকেও। তাঁরি জন্যে–'গানের সুরের আসনখানি পাতি পথের ধারে।' সেই তিনি সুর দিয়ে যাঁকে ছোঁওয়া যায়।–

"আমার সুরের রসিক নেয়ে
তারে ভোলাব গান গেয়ে,"

(র/৪/৯৩)

সেই তিনি গানকে সম্বল করেই রবীন্দ্রনাথ যাঁর কাছে যেতে চান–
"কণ্ঠে নিলেম গান, আমার শেষ পারানির কড়ি–"।

(তদেব)

রবীন্দ্রনাথের মতো 'সুরের রসিক নেয়ে' নিশ্চয়ই বলতে পারেন, "বন্দনা মোর ভঙ্গীতে আজ সংগীতে বিরাজে" (র/৪/৪১৭)। এখানে 'ভঙ্গীতে' অর্থই হল ছন্দে, ছন্দোময় ভঙ্গীতে–নৃত্যে। নইলে নটরাজের চ্যালা বলব কেন? আমরা কি জানি না যে নাচ একেবারে রবীন্দ্রনাথের রক্তের মধ্যে।–

"মম চিত্তে নিতি নৃত্যে কে যে নাচে
তাতা থৈ থৈ, তাতা থৈ থৈ, তাতা থৈ থৈ।"

(র/৪/৪১৯)

সূফীদের নাচের কথা আমরা সকলেই জানি। বাউলদের নাচ তো রবীন্দ্রনাথ নিজেই অনেক দেখেছেন, নিজেও সুযোগ তৈরি ক'রে নিয়ে বাউল সেজে নেচেছেন। সে কি কিছুই নয়? সূফী সাধক জালালুদ্দীন রুমি বলেছেন, ঈশ্বরের কাছে পৌঁছবার সরলতম, হ্রস্বতম পথ হল নৃত্য। 'নৈবেদ্যে'র কবিতায়, যখন রবীন্দ্রনাথের পিতার ভাব–অর্থাৎ সন্তানের দৃষ্টি, তখন বিহ্বল নৃত্যগীতের যতই নিন্দা করুন ওর অনেকটাই তাৎক্ষণিক। সে পথ এক সময়ের পথ, এ পথ অন্য সময়ের পথ।

'নটীর পূজা'র শ্রীমতীর নৃত্যই ছিল সম্বল, তার সাধনাও ছিল নাচ। রবীন্দ্রনাথও শ্রীমতীর মতে বলতে পারেন–

"...নমো হে নমো, তোমায় স্মরি, হে নিরুপম,
নৃত্যরসে চিত্ত মম উছল হয়ে বাজে..."

(র/৪/৪১৭)

ডাইনে বাঁয়ে সব সময় তিনি কালের মন্দিরা শুনতে পান, যিনি দেখেন–"সৃপ্তি ছুটে নৃত্য উঠে নিত্য নূতন সংঘাতে।"

(র/৪/৪১৮)

তিনি নিজেকে বলেন–

"তালে তালে সাঁঝ-সকালে রূপ-সাগরে ঢেউ লাগে।

সাদা-কালোর দ্বন্দ্বে যে ওই ছন্দে নানান রঙ জাগে।
এই তালে তোর গান বেঁধে নে —কান্নাহাসির তান সেধে নে,
ডাক দিল শোন্ মরণ-বাঁচন নাচন-সভার ডঙ্কাতে।"

(তদেব ৪১৯/

তিনি ঠিক শ্রীমতীর মতোই বলতে পারেন–

"আমার তনু তনুতে বাঁধনহারা হৃদয় ঢালে অধরা ধারা–
তোমার চরণে হোক তা সারা পূজার পুণ্য কাজে।"

(তদেব)

নৃত্যপর নটরাজ তাঁর নাচের সঙ্গী। সেই সুন্দরকে, সেই ভয়ংকরকে তিনি বলেছেন–

"মোর সংসারে তান্ডব তব কম্পিত জটাজালে।
লোকে লোকে ঘুরে এসেছি তোমার নাচের ঘূর্ণিতালে।'

(তদেব)

বলেছেন–

"জীবন-মরণ নাচের ডমরু বাজাও জলদমন্দ্রে হে।"

(তদেব)

বলেছেন–

"নৃত্যে তোমার মুক্তির রূপ, নৃত্যে তোমাব মায়া,
বিশ্বতনুতে অণুতে অণুতে কাঁপে নৃত্যের ছায়া "

(তদেব ৪১৭)

নাচন-সভার ডঙ্কা যাকে ডাক দেয়, রক্তের মধ্যে তিনি অনুভব করেন নাচের তরঙ্গভঙ্গ। তখন–

"সে তরঙ্গে ছুটি রঙ্গে পাছে পাছে
তাতা থৈথৈ, তাতা থৈথৈ, তাতা থৈথৈ।"

(তদেব, ৪১৯)

কোথায় সেই বাক্‌পথাতীত, নামরূপের অতীত, লিঙ্গ-বর্জিত নিষ্কল পরমব্রহ্মের শান্ত সমাহিত ভাব-গম্ভীর উপাসনা, আর কোথায় এই নাচন-সভা, কম্পিত জটাজাল, এই নাচের ঘূর্ণিতাল, এই লাজলজ্জাহীন স্বীকৃতি যে, "আমার ঘুর লেগেছে--তাধিন্ তাধিন্"! জানি, নটরাজের নৃত্য একটা প্রতীকী ব্যাপার; 'নৃত্যের বশে সুন্দর হল বিদ্রোহী পরমাণু', সে-ও প্রতীক; 'তালে তালে সাঝ-সকালে রূপ-সাগরে ঢেউ লাগে' অবশ্যই প্রতীক। কিন্তু শুধুই কি প্রতীক? তাহলে সাধন ভজন, সে-ও তো ভিতরের অনুভবের প্রতীকী প্রকাশ। এই যে রবীন্দ্রনাথ বলছেন–

"আমার লাজের বাঁধন সাজের বাঁধন খসে গেল ভজন সাধন-
তাধিন্ তাধিন্."

(তদেব)

এর সবটাই প্রতীক নয়, অনেকটাই আক্ষরিক। যেমন জালালুদ্দীন রুমির। যেমন সেই whirling বা dancing dervish-দের। তবে এ-ও বলব যে, ভজন সাধন খসে নি। এই

নাচেই ভজন, নাচেই সাধন। শ্রীমতীর যেমন।

এক এক পর্বে এক-এক রকমের ভাবনা-বেদনা, এক-এক ভাবের সাধনা। তা যদি হয়, তাহলে ঐক্য থাকল কী করে? রবীন্দ্রনাথের ধর্মজীবন কি নানা পরস্পরবিরোধী ভাবনা-বেদনার একটা বিশৃংখল বিসংগত পারম্পর্য? তা নয়। নয় এই জন্য যে ভাবনাগুলির মধ্যে ভিন্নতা আছে কিন্তু আতান্তিক কোনো বিরোধ নেই। এই জটিল পারম্পর্যে ঐক্য--বলা বাহুল্য সরল ঐক্য নয়--সে যা-ই হোক, ঐক্য রক্ষিত হয়েছে এই জন্যে যে কোনো পর্বই আগের পর্বকে খন্ডন করে না, সব পর্বেই অতীতের পর্বের অনুরণন পাওয়া যায়, ভাবী পর্বের পূর্বাভাস পাওয়া যায়। প্রত্যেক পর্বই আগের পর্বের তুলনায় বিচিত্রতরের ঐক্য রচনা করে, এবং পরের পর্বের প্রস্তুতি রচনা করে। গীতাঞ্জলির নিবিড় অন্তরংগ প্রেমভাবনার মধ্যে আগের পর্বের উপনিষদ যেমন উপস্থিত, পরের পর্বের বাউল সাধনার ভাবানুষংগও তেমনি উপস্থিত। এত অজস্রবিধ বৈচিত্র্যের এরকম মসৃণ শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান রবীন্দ্রনাথের ভাবনার জগতে আর কোনো এলাকায় বোধকার এমন দেখতে পাওয়া যাবে না। দীর্ঘ নদী চলতে চলতে নানা ভূমিতে পৌঁছে নানা নদীর জল গ্রহণ করতে করতে, নাম গোত্র অপরিবর্তিত রেখেই, স্বভাবকে একই সংগে এক রেখে এবং বদলাতে বদলাতে সমুদ্রে গিয়ে পড়ে, এ যেন অনেকটা সেই রকম।

বাউলের সংগে রবীন্দ্রনাথের পরিচয় ঘটেছে শিলাইদহ পর্বে। গানের মধ্যে দিয়ে সেই পরিচয় ফলপ্রসূ হয়েছে বংগভংগের সময় (১৯০৫) স্বদেশী গানে। ধর্মের ক্ষেত্রে নয়, প্রধানত সুরের ক্ষেত্রে-গণসংযোগের মাধ্যম হিসেবে। পরে গীতাঞ্জলি পর্বের অনেক গানেই আমরা বাউলের কন্ঠ শুনতে পেলাম। এ হল ধর্মের ক্ষেত্রে বাউলের মৃদু পদপাত। গীতাঞ্জলি-পর্বটি খাঁটি বাউল ভাবের পর্ব নয়। বাউল মাঝে মাঝে এলেও আসলে পর্বটি লীলারসের, আমি আর তুমি-র লুকোচুরির, নিবিড় প্রেমানুভূতির, গভীর বিরহের। কখনো তুমি, আবার কখনো সেই তুমিই সে। তারই আসার প্রতীক্ষা। মনের মধ্যে গভীরে তারই পায়ের শব্দ।-

"তোরা শুনিস নি কি শুনিস নি তার পায়ের ধ্বনি,
ওই যে আসে, আসে, আসে।
যুগে যুগে পলে পলে দিন-রজনী
সে যে আসে, আসে, আসে।"

(তদেব ৪৫)

বলাকা পর্বে পৌঁছতে পৌঁছতে কিন্তু রঙের বদল ঘটে গিয়েছে। একটু পরেই 'ফাল্গুনী' নাটকের (১৯১৬) অন্ধ বাউলের সাক্ষাৎ পেলাম। সে গানের উপলক্ষমাত্র নয়, অন্ধও সে অকারণে নয়। নতুন পালা শুরু হয়েছে, এই পালাতে সত্যকে চোখ দিয়ে বাইরে খুঁজতে হবে না। এখন খুঁজতে হবে নিজেরই ভিতরের দিকে, কান পাততে হবে আপন হৃদয়ের গহন-দ্বারে।

"আমি তারেই খুঁজে বেড়াই যে রয় মনে আমার মনে।"

(তদেব, ১৬৬, সংকলনের ১১৫ নং)

কিংবা–

"আপনি আমার কোন্‌খানে
বেড়াই তারি সন্ধানে।"

(তদেব, ১৭৭, সংকলনের ১২৩ নং)

বাউলের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের যোগাযোগ আরো ঘনিষ্ঠ হয়েছে বীরভূমে রাঙামাটির পথে নেমে, পল্লীসংগঠন-কর্মের মধ্যে দিয়ে, শ্রীনিকেতন প্রতিষ্ঠার (১৯২২) পর থেকে। গ্রামজীবনের সঙ্গে সংযোগ রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিকে ক্রমেই গণজীবনমুখী করে তুলেছে। আমরা জানি, গীতাঞ্জলির পর্বটি আপেক্ষিক বিচারে রবীন্দ্রনাথের অন্তর্মুখিতার কাল। এ-ও জানি, বলাকার সময় থেকেই এই অন্তর্মুখিতার ঝোঁক কাটতে শুরু করেছে, ধর্মচিন্তায় বাউল-ভাবের রঙ লাগতে শুরু করেছে, মন ক্রমশ জনজীবনমুখী হতে শুরু করেছে, গ্রামজীবন সম্পর্কে বোধ ক্রমশ গভীরে যেতে শুরু করেছে। শ্রীনিকেতন-প্রতিষ্ঠার বছরই 'মুক্তধারা' নাটক (১৯২২)। এই নাটকের ধনঞ্জয় বৈরাগী শুধু গানই গায় না, শুধু বৈরাগীই নয়, সে একজন জননেতাও বটে। ভাবনাটা পুরনো, কিন্তু 'মুক্তধারা'য় যে বেগটা এসেছে তা নতুন। অন্যদিকে বাউলের ভাবও ক্রমশ একটা রাবীন্দ্রিক তত্ত্ব রূপে দানা বাঁধতে শুরু করেছে। এই তত্ত্বের সাক্ষাৎ পাব ক্ষিতিমোহন সেনের 'দাদূ'–গ্রন্থের রবীন্দ্রনাথ-রচিত (১৯২৫) ভূমিকায় (সংকলনের ১২০ নং রচনা) অথবা 'ভারতবর্ষীয় দার্শনিক সঙ্ঘের সভাপতির অভিভাষণে' (১৯২৫, সংকলনের ১৮৬ নং রচনা)।

বলাকার সময় থেকেই বহির্জীবনমুখিতা এবং সঙ্গে সঙ্গে সমাজমুখিতা বাড়তে শুরু করেছে। উল্লেখযোগ্য রকমের প্রবলতা এসে বিজ্ঞানমুখী চিন্তাভাবনাতে, গোটা জীবনদর্শনেরই রঙ পালটাতে শুরু করেছে। নিষ্কল ব্রহ্মের ভাবনাকে পাশে ঠেলে, তুমি-আমির মধুর বেদনাকে ডিঙিয়ে মনের সামনে এসেছে এখন মহাজাগতিক অভিব্যক্তির তত্ত্ব, ভাবনার মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হচ্ছে চৈতন্যের অভিব্যক্তিতে বিশ্বাস। একটু একটু ক'রে আবার একটা পালা-বদলের সাক্ষাৎ পেলাম। যা ছিল বাউল-ভাবের মনের মানুষের সাধনা, শুধু রঙ নয় স্বভাব পালটিয়ে সে-ই যেন হয়ে উঠল সকল মানুষের সাধনা। বলতে পারি, মানবধর্মের সাধনা। বদলটা ঘটেছে অলক্ষ্যে, একটু একটু ক'রে, কিন্তু যা ঘটেছে তার তাৎপর্য গভীর। কত গভীর তা দেখতে পাব–১৯৩০ সালে অক্সফোর্ডে প্রদত্ত হিবার্ট বক্তৃতায়–অর্থাৎ The Religion of Man গ্রন্থে (১৯৩০) এবং পরে 'মানুষের ধর্ম' গ্রন্থে (১৯৩৩)।

এই যে মানুষের ধর্ম বা মানবধর্ম, এ যে শুধু মানুষের আচরণীয় ধর্ম তা নয়, এর লক্ষ্যও মানুষ, যদি উপাস্য না বলি, যদি বন্দনীয় বলি, তাহলে এর বন্দনীয়ও মানুষ–সকল মানুষের মানুষ, চিরকালের মানুষ। কখনো বলেছেন, মানবব্রহ্ম। রবীন্দ্রনাথ জানেন, মানবতার পূজার কথা নাস্তিক পজিটিভিস্টরাও বলেছেন। 'চতুরঙ্গ' উপন্যাসের পরম নাস্তিক জ্যাঠামশায়ের ধর্মই ছিল মানবসেবা। কিন্তু তার পরেও অনেক দিন পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের নিজের ধর্মভাবনার সঙ্গে তার সাক্ষাৎ কোনো যোগ ছিল না। এই বারে যোগ ঘটল। কিন্তু দেখতে পেলাম, এটা মোটেই পজিটিভিস্টদের মানবধর্ম নয়। এর মধ্যে সূক্ষ্মভাবে নাস্তিকতা আছে কি না তা ভেবে দেখবার মতো। কিন্তু একটা জিনিস পরিষ্কার। রবীন্দ্রনাথের বাউলতা যেমন উপনিষদের দ্বারা শোধিত বাউলতা এবং সে উপনিষদ্

রবীন্দ্রভাবে-ভাবিত উপনিষদ্ , রবীন্দ্রনাথের মানবধর্মও তেমনি বাউলতা ও রাবীন্দ্রিকতায় অভিসিঞ্চিত মানবধর্ম।

মূল প্রসঙ্গ থেকে আমরা কি একটু দূরে সরে এসেছি ? আমাদের মূল প্রসঙ্গ হল রবীন্দ্রনাথের ধর্মভাবনার কয়েকটি বিশেষত্ব এবং সেই সূত্রে রবীন্দ্রনাথের বার বার পথের বদল, বলতে পারি ধর্মভাবনায় পালাবদল। 'মানুষের ধর্ম'–ইত্যাদিতে যে মানবধর্মের কথা পাই, এইটেই কি অন্তিম পালা ? 'The Religion of Man' (১৯৩০) বা 'মানুষের ধর্ম ' (১৯৩৩) ইত্যাদির পরে আর কি কোনো নতুন পালা নেই ?

তা বলা যাবে না। 'পত্রপুট'-এর (১৯৩৬) পনেরো সংখ্যক কবিতাটি–'ওরা অন্ত্যজ, ওরা মন্ত্রবর্জিত' (র/৩/৩৭৬-৮১, সংকলনের ১৫৫ নং রচনা),এটি রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন আরো বছর দুই পরে, ১৮ই বৈশাখ ১৩৪৩, ইং ১৯৩৬ সালে যখন তাঁর বয়স ৭৫ বছর। এ কবিতায় গ্রাম্য সাধকদের কথা, বিশেষ ক'রে বাউলদের কথা লিখেছেন। আবার চিরকালের মানুষের কথাও লিখেছেন। সেই সঙ্গে আরো কিছু নতুন কথাও লিখেছেন। কবিতার প্রথম দিকে বলেছেন–

"কবি আমি ওদের দলে–
আমি ব্রাত্য, আমি মন্ত্রহীন...।"

বলেছেন ওদের দলে, কিন্তু বলেন নি যে ওদের সাধনাই তাঁর নিজের সাধনা, বাউলের ধর্মই তাঁর নিজের ধর্ম। ওদের দলে এই জন্য যে ওদের মতো তিনিও ব্রাত্য এবং মন্ত্রহীন। এই কবিতায় চিরকালের মানুষের বন্দনাও আছে, যাকে বলতে পারি মানববন্দনা।–

"হে চিরকালের মানুষ হে সকল মানুষের মানুষ,...
হে মহান্ পুরুষ, ধন্য আমি দেখেছি তোমাকে
তমসার পরপার হতে...।"

চিরকালের মানুষ অথবা মন্ত্রহীন বাউল, কোনোটাই নতুন কথা নয়। কবিতায় আসল জোরটা পড়েছে অন্যত্র। তাকে একেবারে নতুন যদি না-ও বলি, ধর্মসাধনার প্রসঙ্গে তা অবশ্যই নতুন। এখানে তিনি দুটি মন্ত্রের কথা বলেছেন : এক, আলোর মন্ত্র, আর দুই হল ভালোবাসার মন্ত্র। আলোকের প্রকাশকে কবি দেখেছেন অসীম কালের যাত্রার সঙ্গে মিলিয়ে। এ হল জ্যোতির মহাযাত্রা–

"সৃষ্টির আলোকতীর্থে
সেই জ্যোতিতে আমি আজ জাগ্রত
যে জ্যোতিতে অযুত নিযুত বৎসর পূর্বে
সুপ্ত ছিল আমার ভবিষ্যৎ।"

–এর মধ্যে যেমন একটা মহাজাগতিক অভিব্যক্তির কথা আছে, তেমনি আছে সেই অভিব্যক্তির প্রধান পালা হিসেবে চৈতন্যের অভিব্যক্তির কথা। আর দ্বিতীয় ? সে হল প্রেম–ভালোবাসার অমৃতমন্ত্র। তত্ত্বগত প্রেম নয়, নারীপ্রেম, বিশেষ নারীর প্রতি বিশেষ প্রেম।–

"একদিন বসন্তে নারী এল সঙ্গীহারা আমার বনে
প্রিয়ার মধুর রূপে।"

একে কি ধর্ম বলতে পারি ? না কেন, সহজিয়া ধর্মে কি নারীপ্রেমকে আমরা ধর্ম বলি না ? প্রেম যদি রবীন্দ্রনাথের ধর্ম হয়, তাহলে তা বাস্তবের বিশিষ্টতাই বা কেন পাবে না ? বিশেষত যখন এ ধর্ম প্রাতিষ্ঠানিক নয়, রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত ধর্ম ? কবিতার উপান্তে এসে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন–

"আমার গানের মধ্যে সঞ্চিত হয়েছে দিনে দিনে
সৃষ্টির প্রথম রহস্য, আলোকের প্রকাশ,
আর সৃষ্টির শেষ রহস্য, ভালোবাসার অমৃত।"

লক্ষ করার মতো যে, এই কবিতায় রবীন্দ্রনাথ যে-তিনটি বন্দনীয় সত্যের নাম করেছেন, মানুষ, সৃষ্টির ক্রমবিকাশ আর প্রেম, এর কোনোটিই তূরীয় বা অতীন্দ্রিয় সত্তা নয়। যে কোনো নাস্তিক এই তিন সাক্ষাৎ-সত্যকে অনায়াসে শিরোধার্য ক'রে নিতে পারে। তাহলে কি জ্যাঠামশায়ের এক-সময়ের শিষ্য ছদ্মবেশে শেষ পর্যন্ত সেই জ্যাঠামশায়ের বন্দরেই ফিরে এল ? তা বলা যাবে না। মানুষের কথা জ্যাঠামশায়ও বলেছেন, তা মানবসমগ্রতা নয়, ইতিহাসের মানুষ নয়, আর্ত মানুষ। অভিব্যক্তির কথা জ্যাঠামশায়ও বলতে পারতেন, কিন্তু তা বিশেষ ক'রে চৈতন্যের বা জ্যোতির অভিব্যক্তি নয়। সব থেকে বড়ো কথা নারীপ্রেম। নারীতে যদি দেবত্বারোপ না করি, নারীর এ্যাপোথিয়সিস (apotheosis) যদি না করি, তাহলে এর আশ্রয় ব্যক্তিবিশেষ। এখানে প্রতিষ্ঠানের স্থান নেই। এখানে জ্যাঠামশায় আসবেন না সে তো বোঝাই যায়, সহজিয়ারাও আসবে না। কেননা তারাও রূপে স্বরূপের আরোপ করে।

'বিশ্বপরিচয়' (১৯৩৭) বইটির রবীন্দ্রনাথ যে ভূমিকা লেখেন রাজশেখর বসুকে চিঠির (২ আশ্বিন ১৩৪৪, ইং ১৯৩৭) আকারে। সেই ভূমিকাতে তিনি বলেছেন (র/১৪/৮২৩),

"আজ বয়সের শেষ পর্বে মন অভিভূত নব্য প্রকৃতিতত্ত্বে—বৈজ্ঞানিক মায়াবাদে।"

অভিব্যক্তির কথা রবীন্দ্রনাথ অনেক দিন থেকেই ভেবে আসছেন। নব্য প্রকৃতিতত্ত্বের যে বিশেষ কথাটি রবীন্দ্রনাথকে এই শেষ বয়সে সব থেকে বেশি নাড়া দিয়েছে, তা খানিকটা তাঁর আগের চিন্তারই সমর্থনের মতো। তা থেকে রবীন্দ্রনাথ চৈতন্যের অভিব্যক্তির একটা তত্ত্ব নিজের মতো ক'রে তৈরি ক'রে নিয়েছেন।—

"আমরা জড়বিশ্বের সংগে মনোবিশ্বের মূলগত ঐক্য কল্পনা করতে পারি সর্বব্যাপী তেজ বা জ্যোতিঃপদার্থের মধ্যে। অনেক কাল পরে বিজ্ঞান আবিষ্কার করেছে যে, আপাতদৃষ্টিতে যে সকল স্থূল পদার্থ জ্যোতিহীন তাদের মধ্যে প্রচ্ছন্ন আকারে নিত্যই জ্যোতির ক্রিয়া চলছে। এই মহাজ্যোতিরই সূক্ষ্ম বিকাশ প্রাণে এবং আরো সূক্ষ্মতর বিকাশ চৈতন্যে ও মনে। বিশ্বসৃষ্টির আদিতে মহাজ্যোতি ছাড়া আর কিছুই যখন পাওয়া যায় না, তখন বলা যেতে পারে চৈতন্যে তারই প্রকাশ। জড় থেকে জীবে একে একে পর্দা উঠে মানুষের মধ্যে এই মহাচৈতন্যের আবরণ ঘোচাবার সাধনা চলেছে। চৈতন্যের এই মুক্তির অভিব্যক্তিই বোধ করি সৃষ্টির শেষ পরিণাম।"

(উপসংহার, বিশ্বপরিচয়, র/ ১৪/৮৭১)

'বিশ্বপরিচয়' বিজ্ঞানশিক্ষার বই, কিন্তু এর উপসংহারটি বিজ্ঞানের পরীক্ষিত বা

নিশ্চিত তথ্যের মধ্যে আবদ্ধ নয়। বিজ্ঞানের তথ্যের উপর ভিত্তি ক'রে এখানে— বিশেষ ক'রে উপরের উদ্ধৃতিটিতে রবীন্দ্রনাথ জগৎ-তত্ত্ব বিষয়ে একটি প্রকল্প উপস্থিত করছেন। তার মধ্যে তাঁর বিশ্বাস আভাসিত হয়েছে। বিজ্ঞানের সিদ্ধান্তে ঈশ্বর অনুপস্থিত থাকতেই পারেন, কিন্তু শেষ বয়সের এই বিশ্বাসের জবানবন্দীতেও ঈশ্বর সম্পূর্ণ অনুপস্থিত, এতে কি অবাক হওয়ার কিছু নেই ?

ঈশ্বর বলতে যদি একটি ব্যক্তিপুরুষকে বুঝি, তাহলে রবীন্দ্রনাথের এই বিশ্বাসের জবানবন্দীতে ঈশ্বর যে অনুপস্থিত তাতে সন্দেহ নেই, কিন্তু এই উদ্ধৃতিতে যে মহাজ্যোতির বিকাশের কথা রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, মানুষের মধ্যে যে মহাচৈতন্যের আবরণ ঘোচাবার কথা বলেছেন, তা কি কট্টর জড়বাদীর মতো কথা ? বরং বলতে পারি, তা চৈতন্যবাদীরই কথা। যে চৈতন্যের ক্রমিক মুক্তি ঘটছে, যে মানবচৈতন্য ধাপে ধাপে অভিব্যক্তির পথে এগিয়ে চলেছে, তাকে যদি ঈশ্বর বলি, তাহলে কিন্তু সেই মানবিক ঈশ্বর এখানে অনুপস্থিত নয়।

তাকে নিয়ে কি ধর্ম হয় ? তার কি উপাসনা হয় ? রবীন্দ্রনাথ মনে করেন চৈতন্যের অভিব্যক্তি নিঃসন্দেহে সমস্ত মানবিক আদর্শের, সমস্ত মহৎ মূল্যের অভিব্যক্তি। তাকে নিয়ে যে ধর্ম সেইটেই যথার্থ ধর্ম। অন্তত রবীন্দ্রনাথের নিজের ধর্ম সেইটেই।

একটা কথা এখানে পরিষ্কার ক'রে ব'লে রাখা দরকার, নইলে ভুল বোঝার সম্ভাবনা থাকবে। কথাটা ব্যক্তিগত ধর্ম-সম্পর্কে। ব্যক্তিগত ধর্মের অর্থ এ নয় যে তা মাত্র একজনেরই পালনীয় বা আচরণীয়, তা আর কারো নয়। তা অনায়াসে সকলেরও হতে পারে, আবার কার্যক্ষেত্রে না-হতেও পারে। সব ধর্মেরই দাবি সর্বজনীনতা, সকলের স্বীকৃতি, ব্যক্তিগত ধর্মেরও তাই। ব্যক্তিগত ধর্মের প্রধান উৎস ব্যক্তির চিত্ত, কোনো অপৌরুষেয় শ্রুতি নয়, কোনো প্রেরিত-পুরুষের নির্দেশ, নয়, বেদ-বাইবেল কোরান নয়। ব্যক্তিগত ধর্মের প্রধান অবলম্বনও ব্যক্তির অনুভব চিন্তা ও আচরণ— প্রতিষ্ঠান নয়, কোন রকম যৌথতা নয়।

যখন বলি রবীন্দ্রনাথের ধর্ম ব্যক্তিগত ধর্ম, তখন সে কথার মূল অর্থ এই যে তা শাস্ত্র-নির্ভর নয়, আচার-অনুষ্ঠান নির্ভর নয়, যৌথ ক্রিয়াকর্ম-নির্ভর নয়— এবং, বড়ো কথা, তা কোনো প্রতিষ্ঠানের সংগে একান্তভাবে যুক্ত নয়। তা একান্তভাবে হিন্দু নয়, ব্রাহ্মও নয়, তা ইসলাম, খৃষ্টধর্ম, বৌদ্ধ-জৈন-শিখ কারো সংগে প্রতিষ্ঠানিকভাবে যুক্ত নয়। কিন্তু তাঁর প্রধান প্রামাণিকতা ব্যক্তির বাইরে নেই, তার প্রধান প্রামাণিকতা রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব বিচার-বুদ্ধিতে, নিজস্ব অনুভূতিতে উপলব্ধিতে। তার নানা উৎস থাকতে পারে, থাকতে পারে কেন, আছেও, যেমন উপনিষদ্ কিংবা যেমন বৈষ্ণব প্রেমভাবনা, কিংবা সূফী সাধনা এবং আরো অনেক। অথবা উৎস কথাটা যদি না বলি, তার উপর অনেক প্রভাব থাকতে পারে, কিন্তু সকলকেই রবীন্দ্রনাথের নিজের বিচার-বুদ্ধি নিজের অনুভূতির সমর্থন পেতে হবে। তা না পেলে সে গ্রহণীয় নয়।

যেমন বহুদেবদেবী পূজা— এক যেখানে বহুতে প্রকাশ সে রকম বহু নয়, লোকধর্মে যে রকম খাঁটি বহুদেবদেবীর পূজা দেখা যায়, তাতে রবীন্দ্রনাথের অনুভূতির বা বিচারবুদ্ধির সমর্থন নেই, তা তাঁর কাছে গ্রহণীয় নয়। 'স্বর্গীয় প্রহসন' অবশ্য কেবল প্রহসনই। ওই প্রহসনে শীতলা-ঘেঁটু প্রমুখ লৌকিক দেবদেবীর হিন্দু দেবমণ্ডলীতে প্রবেশে তিনি

তির্যক দৃষ্টিপাত করেছেন, জানেন তাতে কারো মনে আঘাত লাগবার ভয় নেই। ইন্দ্র চন্দ্র বরুণ নিয়ে প্রহসন হয়তো তেমন নেই। কিন্তু ইন্দ্রচন্দ্রবরুণে যে তাঁর বিশ্বাস নেই, তাঁর ধর্মভাবনায় যে এঁদের ভূমিকা নেই, একথা তর্কাতীত। কবিতায় অবশ্য এরা সম্পূর্ণ অনুপস্থিত নয়, কিন্তু এখানে কথা হচ্ছে রবীন্দ্রনাথের ধর্মবিশ্বাস নিয়ে।

অন্য একটি দৃষ্টান্ত পৌত্তলিকতা। মনে রাখতে হবে প্রতীক ব্যবহার মাত্রেই পৌত্তলিকতা নয়, পৌত্তলিকতা ঘটে প্রতীকের স্বচ্ছতা চলে গেলে, প্রতীক স্বয়ংসিদ্ধ হয়ে উঠলে, প্রতীকের সম্মোহনে পড়লে। খাঁটি পৌত্তলিকতায় রবীন্দ্রনাথের বিচারবুদ্ধির কিছুমাত্র সমর্থন নেই, বরং গভীর বিতৃষ্ণা আছে। সূক্ষ্ম প্রতীকোপাসনার কথা এখানে বলছি না, প্রতীককে প্রতীক জেনে, তাকে নিছক অবলম্বন রূপে গ্রহণ ক'রে যে প্রতীকোপাসনা তার কথা এখানে আমরা ধরছি না, যদিও তাতেও রবীন্দ্রনাথের আপত্তি আছে (সংকলনের ৮১নং রচনা, কাদম্বিনী দেবীকে লিখিত পত্র দ্রষ্টব্য), কিন্তু আপাতত সে কথা না তুললেও চলবে। এখানে কথা হচ্ছে সেই প্রতীকোপাসনার যেখানে প্রতীক আর প্রতীকায়িত এক হয়ে যায়। বলা বাহুল্য, কবির স্বাভাবিক বা সহজাত প্রতীকধর্মিতার কথাও এখানে আসছে না। বাস্তব ক্ষেত্রে অধিকাংশ সময় যে খাঁটি বিগ্রহ উপাসনা আমরা দেখতে পাই, সেই সরল অকুণ্ঠ অলজ্জ এবং বহু-আচরিত পৌত্তলিকতায় রবীন্দ্রনাথের এক বিন্দু সমর্থন নেই— রবীন্দ্রনাথের ধর্মভাবনায় তার স্থান নেই।

তেমনি শক্তিপূজা। নাটকবিশেষ বা দু-চারখানা গানের সাক্ষ্য এখানে নির্ভরযোগ্য হবে না। কবিতায় গানে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ মাতৃ-বিগ্রহ আমরা অনেক দেখি। সে-ও কাব্যগত উপায়, ধর্মগত উপেয় নয়। বৈষ্ণব সাধনা ও শৈব সাধনার না হোক শৈব মঙ্গল-আদর্শের কথা, শিব-নটরাজের কথা রবীন্দ্রনাথ নিজেই অনেক বলেছেন, রবীন্দ্রনাথের মুখে আলোর মন্ত্রের কথা (সংকলনের ১৫৫নং রচনা, 'ওরা অন্ত্যজ ওরা মন্ত্রহীন' দ্রষ্টব্য), আলোকবন্দনার কথা আমরা বার বার শুনেছি। পূরবী কাব্যগ্রন্থের 'সাবিত্রী' কবিতাটির কথা সকলেই জানেন। গণেশ বা গণপতির সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ কখনো আগ্রহ দেখান নি, টিলকের দৃষ্টান্ত বা সরলাদেবীর নির্বন্ধ কিছু তাঁকে গণপতির দিকে ঘেঁষাতে পারে নি। বরং মহারাষ্ট্র দেশে জঙ্গী হিন্দুবাদের সঙ্গে গণপতির সংযোগ দেখে রবীন্দ্রনাথ সচেতন ভাবেই গণপতিকে এড়িয়ে গিয়েছেন। প্রকাশ্যে বিতৃষ্ণা প্রকাশ করেছেন শক্তিপূজার বিষয়ে। এখানে কোনো রফা নেই। রবীন্দ্রনাথের জীবন-দর্শনে শক্তি ও প্রেম পরস্পরের বিরোধী। প্রেমই রবীন্দ্রনাথের কাছে ঈশ্বর, সুতরাং শক্তিপূজার প্রশ্নই ওঠে না। কালান্তর গ্রন্থের 'বাতায়নিকের পত্র' এবং 'শক্তিপূজা' প্রবন্ধে (দুটিই ১৯১৯ সালে রচিত) এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ বিস্তৃত বলেছেন। প্রথম প্রবন্ধের সাময়িক পত্রে যে প্রতিবাদ বের হয় তার উত্তরে দ্বিতীয় প্রবন্ধ। এতে তিনি স্বীকার করেছেন যে শক্তির একটা উচ্চমার্গের ব্যাখ্যা সম্ভব। "শক্তির যে শাস্ত্রিক ও দার্শনিক ব্যাখ্যা দেওয়া যায় তা আমি স্বীকার করে নিচ্ছি" (র/১৩/২৮৯)। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে শক্তিসাধনা অনেক স্থূল ব্যাপার, ক্ষেত্রবিশেষে কদর্য ব্যাপারও বটে। "প্রচন্ড দেবতার যথেচ্ছাচারের বিভীষিকা মানবজাতির প্রথম পূজার মূলে দেখতে পাওয়া যায়। তার কারণ মানুষ তখনো বিশ্বের মূলে বিশ্বনিয়মকে দেখতে পায় নি এবং তখন সে সর্বদাই ভয়বিপদের দ্বারা বেষ্টিত"

(তদেব)। ভারতবর্ষে প্রচলিত শক্তিপূজাকে রবীন্দ্রনাথ যথেচ্ছাচার ও বিভীষিকার প্রতি নৈবেদ্য-প্রদান হিসেবেই দেখেছেন। তিনি প্রচলিত অর্থাৎ জীবন্ত শক্তিপূজার কথাই বলেছেন, ভূমিস্পর্শীবিযুক্ত দার্শনিক তত্ত্বের কথা বলেন নি।—

'আমাদের দেশে সাধারণত শক্তিধর্মসাধনা এবং বৈষ্ণবধর্মসাধনার মধ্যে দুই স্বতন্ত্র ভাব প্রাধান্য লাভ করেছে। এক সাধনায় পশুবলি এবং মাংসভোজন, অন্য সাধনায় অহিংসা এবং নিরামিষ আহার— এটা নিতান্ত নিরর্থক নয়। বিশেষ শাস্ত্রে এই 'পশু' এবং অপরাপর মকারের যে ব্যাখ্যাই থাক্, সাধারণ ব্যবহারে তা প্রচলিত নেই। এইজন্যেই 'শক্তি' শব্দের সাধারণ যে অর্থ, নানা চিহ্নে অনুষ্ঠানে ও ভাবে শক্তিপূজার মধ্যে ওতপ্রোত এবং বাংলাদেশের মংগলকাব্যে যে অর্থ প্রচলিত হয়েছে, আমি সেই অর্থই আমার রচনায় গ্রহণ করেছি।"

(তদেব, ২৯০)

যেখান থেকে যা নিয়েছেন, রবীন্দ্রনাথ নিজের মতো ক'রে বেছে নিয়েছেন। বুদ্ধকে তিনি শ্রেষ্ঠ মানব মনে করেন। বুদ্ধের কল্যাণের আদর্শ, বুদ্ধের করুণার আদর্শ তাঁকে উদ্বুদ্ধ করে। কিন্তু বৌদ্ধদর্শন বা বৌদ্ধধর্ম থেকে আর প্রায় কিছু নেন নি। তিনি প্রভাবিত হয়েছেন বুদ্ধজীবনের সত্যের দ্বারা, যেমন প্রভাবিত হয়েছেন খৃষ্টজীবনের সত্যের দ্বারা। কী বৈষ্ণবতা, কী শৈব-আদর্শ সর্বত্রই এই তাঁর গ্রহণের অপরিহার্য শর্ত, যা গৃহীত হবে তাকে রবীন্দ্রনাথের বিচারবুদ্ধির এবং রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব ধর্মানুভূতির সমর্থন পেতে হবে। এমন কি উপনিষদের ক্ষেত্রেও তাই— ততটুকুই নিয়েছেন যতটুকুতে তাঁর প্রয়োজন, সেইভাবেই নিয়েছেন যেভাবে তিনি নিতে পারেন।

শাস্ত্রের উপর নির্ভর নেই, তাঁর নিজেরই উপর শাস্ত্রের নির্ভর, কী গৃহীত হবে, কী গৃহীত হবে না, রবীন্দ্রনাথ তা নিরূপণ করার ভার দিয়েছেন নিজের বুদ্ধি এবং অনুভূতির উপর। কিন্তু সমানভাবে নয়। কারণ ধর্ম প্রধানত অনুভূতির এলাকা। কেবল বুদ্ধির উপর নির্ভর করলে রস শুকিয়ে যায়, প্রেম জাগে না। রবীন্দ্রনাথের ধর্মসাধনার পথ রসের পথ, তার লক্ষ্যই হল প্রেম। কেবল অনুভূতির উপর নির্ভর করলে শৃংখলা হারিয়ে যায়, সংযম ভেঙে যায়। তখন বাঁধ-ভাঙা উন্মাদনায় নিজেরই ঘোর লেগে যায়। তখন ভর হয়, দশা ধরে। যেমন দশা ধরে প্রহরব্যাপী কীর্তনে। কিংবা যেমন দশা ধরে whirling dervish-দের, সূফীদের কিংবা যেমন দশা ধরে LSD বা mescalin বা ওইজাতীয় মাদকের প্রভাবগ্রস্তদের। মাঝে মাঝে দিব্যোন্মাদ দশায় বাস্তবের যে বিগলন ঘটতে থাকে, বলা কঠিন তার শেষ কোথায়। ভর যে শয়তানের ভর নয়, সম্মোহন যে মারের সম্মোহন নয়, তারই বা নিশ্চয়তা কোথায়? ধর্মের যৌথ সম্মোহন যে মানুষকে কত অধর্মে টেনে নিয়ে যেতে পারে ইতিহাসে তা রবীন্দ্রনাথ অনেক দেখেছেন, এমন কি নিজের কালেও দেখেছেন। আত্মসম্মোহনও মানুষকে অনেক দূরে নিয়ে ফেলতে পারে, তা রবীন্দ্রনাথ জানেন। সেই জন্যেই 'চতুরংগে' লীলানন্দ স্বামীর আশ্রমের উপাখ্যান। মনে প্রশ্ন জাগে, লীলানন্দ স্বামীর ঘোর কাটিয়ে এসে শচীশ আবার কোন্ ঘোরের মধ্যে গিয়ে পড়ল যাতে মাটির পৃথিবী, বাস্তব ঘর-সংসার, দামিনীর নিরুদ্ধ ভালোবাসার টান, সব তার কাছে মিথ্যে হয়ে গেল? প্রশ্নটা যে খুব অবান্তর তা নয়। এ প্রশ্ন জড়িত আর-একটা প্রশ্নের সংগে: শচীশের সন্ধান কি রবীন্দ্রনাথেরও সন্ধান? কিন্তু আমরা তো

জানি, রবীন্দ্রনাথ বন্ধনের মধ্যেই মুক্তিকে খুঁজেছেন। বন্ধন এড়িয়ে বৈরাগ্যসাধন, আর রূপকে এড়িয়ে অরূপের সন্ধান, সে তো রবীন্দ্রনাথের ধর্ম নয়।

কিন্তু আপাতত আমাদের প্রসংগ স্বতন্ত্র। আমরা জানি, ধর্মানুভূতি মূলত অনুভূতিই। তবু দেখতে পেলাম, রবীন্দ্রনাথের ধর্মভাবনায় অনুভূতির স্থান উচ্চে হলেও তা বাঁধ-ভাঙা উন্মাদনা নয়। আমরা দেখলাম, রবীন্দ্রনাথের ধর্মসাধনায় বিচারবুদ্ধির আসন সুরাক্ষত। সুরক্ষিত নিশ্চয়, কিন্তু সর্বোচ্চ নয়। প্রধান স্থান, সর্বোচ্চ স্থান কিন্তু শেষ পর্যন্ত স্বানুভূতিরই।

তাহলে শাস্ত্র? স্বানুভূতিই যদি সর্বোচ্চ আদালত হয়, তাহলে রবীন্দ্রনাথের ধর্মভাবনায় শাস্ত্রের স্থান কোথায়?

হিন্দুধর্মে শ্রুতি অর্থাৎ বেদ মূল শাস্ত্র। তাকে অনুসরণ ক'রেই আসছে গীতা এবং পরে স্মৃতি। সাধারণভাবে বলা যায় শ্রুতি-স্মৃতির নির্দেশিত পথই হিন্দুর পথ। শ্রুতি-স্মৃতির সুস্পষ্ট নির্দেশ যেখানে নেই সেখানে বিচারবুদ্ধির অবকাশ অবশ্যই আছে। কিন্তু সেখানে শাস্ত্রের পথ-নির্দেশ আছে : মহাজনেরা যে পথে গিয়ে থাকেন, সেই পথই ধর্মের পথ। তেমনি বৌদ্ধধর্মের পথ হল বুদ্ধবাণী—চতুরার্যসত্য ও অষ্টাঙ্গিক মার্গ, বৌদ্ধশাস্ত্র—ত্রিপিটক। খৃষ্টধর্মের নির্দেশিত পথ হল খৃষ্টের উপদেশ –বাইবেল। ইসলামের তেমনি কোরান-নির্দেশিত পথ। সব প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মেই সেই ধর্মের শাস্ত্র-নির্দেশিত পথই যথার্থ ধর্মপথ।

দেবেন্দ্রনাথ কিন্তু শাস্ত্রকে নিজের অভিপ্রেত পথে চালিয়েছেন, জোর দিয়েছেন স্বানুভূতির উপর, 'আত্মপ্রত্যয়সিদ্ধ জ্ঞানোজ্জ্বলিত বিশুদ্ধ হৃদয়'-এর উপর। শুধু অনুভূতি বা হৃদয়ধর্মের উপর নয়, জ্ঞানের উপরেও। রবীন্দ্রনাথেরও ঠিক তাই। হৃদয়ধর্ম, কিন্তু সেই সংগে বিচারবুদ্ধিও, জ্ঞানও। শাস্ত্র এই দুয়ের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। তার অর্থ অবশ্য এ নয় যে দেবেন্দ্রনাথ আর রবীন্দ্রনাথের ধর্মসিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ অভিন্ন। যেটুকু শাস্ত্র এবং যেটুকু বিচারবুদ্ধি সেখানে অনেক সাধারণ-তত্ত্বের সাক্ষাৎ পাব। কিন্তু স্বানুভূতি যার-যার তার-তার। সেখানে মিল না-ও থাকতে পারে। স্বানুভূতিই যেখানে প্রধান, সেখানে ধর্মও যার-যার তার-তার। এই জন্যই বিপিনচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যকে বলেছেন মায়িক সৃষ্টি। শুধু সাহিত্য নয়, রবীন্দ্রনাথের ধর্মও তাঁর কাছে মায়িক সৃষ্টি।

এটা স্বাভাবিক। কারণ প্রাতিষ্ঠানিকতার বিশুদ্ধতম রূপ মৌলবাদিতা। মৌলবাদী কথাটার সাম্প্রতিক কদর্থ অর্থবিস্তারের ফলে ঘটেছে, তা না হলে নিষ্ঠাবান প্রাতিষ্ঠানিক অবশ্যই মৌলবাদী। সে কথা যাক। আমরা দেখতে পাই, প্রতিষ্ঠান-নিষ্ঠ হিন্দুর বিবেকানন্দকে নিয়েও খট্‌কা উপস্থিত হয়। খট্‌কার কারণ যে একটুও নেই তা নয়, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে যতখানি, বিবেকানন্দের ক্ষেত্রে ততখানি নয়। সমাজচিন্তায় বিবেকানন্দ প্রায় বিপ্লবী। সমাজের আচার-অনুষ্ঠানই যাঁদের কাছে ধর্ম, বিবেকানন্দকে তাঁরা কোথায় স্থান দেবেন? তবে এটা নিশ্চিতই বলা যায় যে, চিন্তানায়ক হিসেবে বিবেকানন্দের স্বাধীনচিন্তা বহুদূরগামী হলেও, সন্ন্যাসী হিসেবে বিবেকানন্দের স্বাধীনতা সম্পূর্ণ পরোয়াহীন হলেও, ধর্মচিন্তায় বিবেকানন্দ শেষ পর্যন্ত যার-যার তার-তার নন। নির্ভর ব্যক্তিগত, কিন্তু আবেদন সকলের কাছে। এবং প্রতিষ্ঠানগত

দেবেন্দ্রনাথ প্রাতিষ্ঠানিক হিন্দুধর্মকে ছুঁয়ে থেকেই প্রাতিষ্ঠানিকভাবে ব্রাহ্ম। এই

ব্রাহ্মত্বের অনেকটাই তাঁর নিজের রচনা। সমাজচিন্তায় না হলেও ধর্মচিন্তায় দেবেন্দ্রনাথের ঝোঁক ব্যক্তিগত ধর্মের দিকেই। রবীন্দ্রনাথে এই দোটানা নেই। প্রথম দিকে যা ও বা ছিল, শেষের দিকে একেবারেই নেই। শেষ পর্যন্ত কী হিন্দু কী ব্রাহ্ম কোনো প্রতিষ্ঠানেই নিজেকে স্থান ক'রে দিতে পারেন নি। তাই তিনি ব্রাত্য, তিনি মন্ত্রহীন।

অনুভূতির বাইরে যার কোনো নিশ্চিত নির্ভর নেই, অবজেক্টিভ আশ্রয় নেই, দৃঢ় পাদপীঠ নেই, সেই হেতুই তার সম্পর্কে অনেকের সংশয় জাগে। রবীন্দ্রনাথ মূল হিন্দুশাস্ত্রের সারাংসারকে বিশেষ লঙ্ঘন করেন নি। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের শৈব-প্রত্যয় সাম্প্রদায়িক কোনো শৈব শাস্ত্রগ্রন্থের ধার ধারে না। রবীন্দ্রনাথের বৈষ্ণবতাও স্বাধীন বৈষ্ণবতা, গৌড়ীয় বা বৃন্দাবনের গোস্বামীদের কোনো শাস্ত্রগ্রন্থের সঙ্গে—কী 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু', কী 'উজ্জ্বলনীলমণি', কী 'গোবিন্দভাষ্য', কারো সঙ্গেই তার মিল নেই। রবীন্দ্রনাথের চৈতন্যের অভিব্যক্তির তত্ত্ব, বাউল-ভাবনা, তাঁর মানবধর্ম, তাঁর আলোকের প্রকাশ আর ভালোবাসার অমৃতের তত্ত্ব—এর কোনোটাই কোনো শাস্ত্রের ধার ধারে না।

বিপিনচন্দ্র যদি একে মায়িক বলতে চান, বলুন। শুধু এই কথাটা মনে রাখতে হবে যে, হিন্দুধর্ম ছাড়া সব বৃহৎ ধর্মই প্রথম আরম্ভ হয়েছে ব্যক্তিবিশেষের স্বানুভূতির উপর নির্ভর ক'রে। প্রতিষ্ঠান এসেছে অনেক পরে। আর হিন্দুধর্মের উদ্ভব হয়েছে যেমন ক'রে আদিম অরণ্যের জন্ম হয়, স্বাভাবিকভাবে, অপৌরুষেয়ভাবে, যেমন ক'রে অধিকাংশ আদিম ধর্মের জন্ম হয়েছে। ব্যক্তিগত ধর্ম যদি মায়িক হয়, তবে সেই মায়িকতার উপাদান অধিকাংশ বৃহৎ প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মেই আছে। আর হিন্দুধর্ম নামক হিমালয়তুল্য বিশাল সমাহারে কী নেই?

'ব্যক্তিগত ধর্ম' কথাটি প্রচলিত নয়, অর্থ-বিভ্রাট হতেও পারে। প্রসঙ্গ শেষ করার আমাদের অভিপ্রেত অর্থটি আবার নিবেদন করি।—

যে ধর্মে ব্যক্তির মনের বাইরে আর কোনো অবলম্বন নেই, যার কোনো প্রতিষ্ঠান নেই, কোনো শাস্ত্র রিচুয়াল কল্প-কাহিনী নেই, তাঁকেই এখানে ব্যক্তিগত ধর্ম বলা হচ্ছে। ব্যক্তির বাইরে তার কোনো আবেদন নেই, এ কথা বলছি না। যে মূল্যগুলি রবীন্দ্রনাথের অন্তরে পরমতা লাভ ক'রে রবীন্দ্রনাথের ধর্মের রূপ নিয়েছে, তা যে একা রবীন্দ্রনাথেই আবদ্ধ থাকবে এমন কোনো কথা নেই। এক দিপশিখা থেকে অনেক দীপ জ্বলতে পারে, কিন্তু যখন যে দীপ জ্বলছে, তখন শিখাটি একান্তভাবে তারই। এই অর্থেই ব্যক্তিগত ধর্ম যার-যার তার-তার। এই অর্থেই রবীন্দ্রনাথের দীপশিখা রবীন্দ্রনাথেরই দীপশিখা।

খ. রচনা-পরিক্রমা

রবীন্দ্রনাথের ধর্মচিন্তা প্রথম লক্ষণীয় রকমের স্পষ্ট চেহারা নিয়েছে 'নৈবেদ্য' কাব্যগ্রন্থ (১৯০১) রচনার কালে, অর্থাৎ ১৩০৭ অগ্রহায়ণ-ফাল্গুনে (১৯০০-০১)। এর আগে যার সাক্ষাৎ পাই, চেহারার দিকে থেকে তা খুব নির্দিষ্ট নয়, তার মধ্যে

ধারাবাহিকতাও বিশেষ লক্ষ করা যায় না। তবু, ইতিহাসের দিকে থেকে দেখলে তাকে বাদ দেওয়া সংগত হবে না। এই সময়ের অর্ধোস্ফুট ধর্মভাবনা যাকে ঘিরে মাঝে মাঝে দানা বেঁধে উঠেছে তা হল এমন এক উপলব্ধি যা আমাদের প্রতিদিনের বাস্তবের বোধকে ছাড়িয়ে যায়, যার মধ্যে একটা গভীরের স্পর্শ আছে। তাকে বলতে পারি ঈশ্বরের ভাব। এই ভাবের সীমারেখা খুব স্পষ্ট নয় এবং এর মধ্যে কোনো স্পষ্ট আধ্যাত্মিকতারও ছাপ পাওয়া যাবে না। 'নৈবেদ্য'-র পূববর্তী এই পর্বটিকে ধর্মচিন্তার সূচনা বলা যেতে পারে। নানান টুক্‌রো টুক্‌রো রচনায়, যেমন অধুনা-অপ্রচলিত 'আলোচনা' বইটিতে (১৮৮৫) খানিকটা ছেঁড়া-ছেঁড়াভাবে এই সময়ের ভাবনার সাক্ষাৎ পাওয়া যাবে। আরো স্পষ্টভাবে পাওয়া যাবে কিছু পরের রচনায় যেমন 'ছিন্নপত্রাবলী'-র কিছু চিঠিপত্র, কিংবা 'মালিনী' নাট্যকাব্যে (১৮৯৬) কিংবা 'চিত্রা' কাব্যগ্রন্থের (১৮৯৬) 'এবার ফিরাও মোরে' কবিতার শেষের অর্ধাংশে। এই সব রচনা বা রচনাংশ নিয়ে যে কালটি, তা মোটামুটি ১৮৮৪ সাল থেকে ১৯০০ সাল পর্যন্ত বিস্তৃত। এখানে এই কালটিকে বলা হয়েছে উন্মেষের কাল। এর পরেই 'নৈবেদ্য', যার জন্ম দুই শতাব্দীর সন্ধিলগ্নে।

রবীন্দ্র জীবনীকার প্রভাতকুমার বিংশ শতকের প্রারম্ভের সময়কার ধর্ম-আন্দোলনের ধারার প্রসংগে বলেছেন যে, এই সময়ে "ভারতের তিন জন মনীষী ভারতের তিনটি সাধনাকে তিনটি পীঠস্থানে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন" (রবীন্দ্রজীবনী, ২য় খন্ড, ১৯৬১ সং পৃ ৯)। তার একটি হল বৈদিক সাধনা, প্রতিষ্ঠা দিয়েছেন স্বামী শ্রদ্ধানন্দ, পীঠস্থান হল হরিদ্বারে, গুরুকুল বিশ্ববিদ্যালয় । দ্বিতীয়টি হল পৌরাণিক-বৈদান্তিক সাধনা, প্রতিষ্ঠা দিয়েছেন স্বামী বিবেকানন্দ, কেন্দ্র হল বেলুড়মঠ। আর তৃতীয়টি হল ঔপনিষদিক সাধনা, প্রতিষ্ঠা দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ, পীঠস্থান হল শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রম। প্রভাতকুমার বলেছেন (তদেব, ৯-১০), "...এই ত্রিবিধ আন্দোলনকে ভারত-ইতিহাসের তিনটি যুগের সাধন-প্রতীক বলা যাইতে পারে। বৈদিক, ঔপনিষদিক ও পৌরাণিক যুগের তিনটি ধারা স্বামী শ্রদ্ধানন্দ, রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দ যথাক্রমে প্রচার ও করিয়াছিলেন।"

এই তিনটি ধারাই হিন্দুধর্মাশ্রিত। প্রভাতকুমার হিন্দুধর্মের বাইরের আর-একটি আন্দোলনের কথা বলেছেন। তা হলঅনাগারিক ধর্মপালের বৌদ্ধধর্ম পুনঃপ্রতিষ্ঠার আন্দোলন।

প্রভাতকুমারের দেওয়া এই ছবিটি মোটামুটিভাবে নির্ভুল। প্রভাতকুমারের বক্তব্য গ্রহণীয়, কিন্তু গ্রহণ করতে হবে একটু সাবধানতার সংগে। প্রভাতকুমারের দেওয়া এই অতি সরলীকৃত প্রায় কাটা- কাটা বর্ণনা থেকে এমন যেন আমরা মনে না করি যে, যে শ্রদ্ধানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ এই তিন মনীষী সুদূর অতীতের তিন যুগ থেকে জীবন্ত কালাতিক্রমণের মতো নেমে এসেছেন। আসলে এঁরা তিন জনই আধুনিক কালের সন্তান। কোনো সাধনাই ইতিহাস ডিঙিয়ে ফিরে আসে না, সব প্রতিষ্ঠাই পুনঃপ্রতিষ্ঠা, এবং সব পুনঃপ্রতিষ্ঠাই ঐতিহ্যের আধুনিকীকরণ। অনেকগুলি দিকে শ্রদ্ধানন্দ যেমন
।
প্রাচীনপন্থী, তেমনি সমাজ-সংস্কারের ক্ষেত্রে আর্যসমাজী শ্রদ্ধানন্দ অনেকের থেকেই বেশি আধুনিক।

আরো একটু কথা আছে। এমন যেন আমরা মনে না করি যে, বিবেকানন্দ যখন বৈদান্তিক, তখন তিনি ঔপনিষদিক নন। কে কোন্ পন্থী বৈদান্তিক হবেন, শংকরপন্থী কি রামানুজপন্থী কি আত্মপন্থী সে আলাদা কথা, কিন্তু বেদান্ত উপনিষদেরই পরিণত রূপ। অনেকে এ-ও বলবেন যে বেদান্ত উপনিষদ দুই-ই বৈদিক সাধনার সম্প্রসারণ।এটা অবশ্য তর্কসাপেক্ষ, কিন্তু উপনিষদ আর বেদান্তের মধ্যে আত্যন্তিক ভেদ-কল্পনা যুক্তিসিদ্ধ নয়। দ্বিতীয় কথা, বিবেকানন্দকে পৌরাণিকতার প্রতিনিধি হিসেবে দেখলে অবশ্যই ভুল করা হবে। অনেকে বিবেকানন্দকে আদৌ হিন্দু বলেই মনে করেন না। তাঁদের দাবি যে খুবই যুক্তিহীন এমন বলা যায় না। আরো একটা কথা, এমন যেন আমরা মনে না করি যে, রবীন্দ্রনাথ যখন ঔপনিষদিক তখন তিনি আর কিছুই নন। আসলে রবীন্দ্রনাথের মধ্যে বৈদিকতা—রবীন্দ্রনাথের নিত্যব্যবহৃত মন্ত্রাদিতে বৈদিক উপাদান প্রচুর, সেই সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের চিন্তায় বেদান্তও আছে আবার বৌদ্ধধর্মের প্রভাবও আছে—এবং আরো অনেক কিছুই আছে। তবে একথা স্বীকার করতে হবে যে, উপনিষদের প্রভাব খুবই উল্লেখযোগ্য। তাছাড়া একথাও মানতে হবে যে, রবীন্দ্রনাথের ধর্মচিন্তার বিশেষ একটা পর্বে উপনিষদ এবং অবিমিশ্র উপনিষদই একান্ত হয়ে উঠেছিল। সে হল বিশ শতকের প্রথম সাত বছর, যে সময়ের কথা প্রভাতকুমার বলেছেন।

বিশ শতকের এই প্রথম সাত বছরের গোড়ার প্রান্তে 'নৈবেদ্য' (১৯০১) আর এর শেষের প্রান্তে 'ধর্ম' বইটির (১৯০৯) 'দুঃখ' প্রবন্ধ (১৯০৮, সংকলনের ৩০ নং রচনা)। এই সাত বছরের পর্বের রচনাগুলি গৃহীত হয়েছে প্রধানত দুটি বই থেকে, একটি 'নৈবেদ', অন্যটি 'ধর্ম'। 'ধর্ম' বইটির প্রবন্ধগুলির রচনাকাল ১৯০২ সাল থেকে ১৯০৮ সালের প্রথম পাদ, অর্থাৎ সংকলনে যাকে দ্বিতীয় পর্ব বলা হয়েছে তার প্রায় সবটাই। পর্বটি নিঃসন্দেহে ঔপনিষদিক। এখানে খানিকটা পরম্পরা অনুসরণে ব্রহ্মকে দেখা হয়েছে পিতা রূপে, যেমন আমরা দেবেন্দ্রনাথের সাধনায় পাই। এই পর্বের ব্রহ্মভাবনায় রবীন্দ্রনাথের স্বকীয়তার স্থান খুব বেশি নয়। এই সময়ের ধর্মচিন্তায় নিরাবেগ তত্ত্বের প্রাধান্য, তুলনায় অনুভূতি বা উপলব্ধি তত প্রধান নয়। পর্বের শেষ প্রবন্ধ 'দুঃখ' সম্বন্ধে অবশ্য এ কথাটা পুরোপুরি খাটবে না, 'দুঃখ' দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্বের মাঝখানে সেতুর মতন। রচনাটিকে পরের পর্বেও স্থান দেওয়া যেত। সাধারণভাবে বলা যায়, এই পর্বের প্রবন্ধগুলির মধ্যে মগ্নতা—যদি আধ্যাত্মিকতা বলি তাহলে আধ্যাত্মিকতা কিছু কম। এ যেন রবীন্দ্রনাথের খানিকটা পারিবারিক উত্তরাধিকারেরই সম্প্রসারণ। 'ধর্ম' গ্রন্থেরই একটি প্রবন্ধের নাম অনুসরণ ক'রে এই দ্বিতীয় পর্বটির নাম দেওয়া হয়েছে—'ধর্মের সরল আদর্শ'।

এই সময়ের অনেক পরে 'জীবনস্মৃতি' গ্রন্থে (১৯২২) রবীন্দ্রনাথ নিজের অল্প বয়সের ধর্মচিন্তার প্রসঙ্গে লিখেছেন (র/১০/৮৬), "আমাদের পরিবারে যে-ধর্মসাধনা ছিল আমার সঙ্গে তাহার কোনো সংস্রব ছিল না—আমি তাহাকে গ্রহণ করি নাই।" এই উক্তি দ্বিতীয় পর্ব পর্যন্ত অর্থাৎ ১৯০৭ সাল পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের রচনায় তেমন সত্য হয়ে ওঠে নি। সত্য হয়ে উঠেছে এই পর্বের শেষ প্রান্ত থেকে ('দুঃখ') একটু একটু ক'রে।

বিশেষ ক'রে তৃতীয় পর্ব থেকে। এই পর্বের সরল ঔপনিষদিক আদর্শ যে অনেকখানিই পারিবারিক তাতে সন্দেহ নেই।

দেবেন্দ্রনাথের ধর্মচিন্তায় উপনিষদের স্থান যে কত উঁচুতে তা আমরা সকলেই জানি। রবীন্দ্রনাথের ধর্মচিন্তাতেও যে উপনিষদের স্থান অতি উচ্চে তা-ও কারো অজানা নয়। উপনিষদ আমাদের জাতীয় উত্তরাধিকার, তাকে উচ্চে স্থান দেওয়াতে কোনো প্রভাবের প্রশ্ন ওঠে না। প্রশ্ন ওঠে ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে। রবীন্দ্রনাথের পারিবারিক উপনিষদ-ব্যাখ্যা দেবেন্দ্রনাথ-কৃত 'ব্রাহ্মধর্ম' গ্রন্থের এবং দেবেন্দ্রনাথের উপদেশাবলীর অনুগামী ব্যাখ্যা। প্রথমদিকে রবীন্দ্রনাথ নিজের উপনিষদ-ভাবনাকেও এই ব্যাখ্যার সীমানার মধ্যেই রেখেছেন। কিন্তু খুব বেশি দিন নয়। 'আত্ম-পরিচয়' বইয়ে এই প্রসঙ্গে যা বলেছেন তার মধ্যেই রবীন্দ্রনাথের গ্রহণ এবং উত্তরণের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। তিনি বলেছেন (র/১০/২৯৬), "ঈশোপনিষাদের প্রথম যে মন্ত্রে পিতৃদেব দীক্ষা পেয়েছিলেন সেই মন্ত্রটি বার বার নতুন নতুন অর্থ নিয়ে আমার মনে আন্দোলিত হয়েছে, বার বার নিজেকে বলেছি: তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ, মা গৃধঃ। আনন্দ করো তাই নিয়ে যা তোমার কাছে সহজে এসেছে; যা রয়েছে চারিদিকে, লোভ কোরো না।...আসক্তি যাকে মাকড়সার মতো জালে জড়ায়, তাকে জীর্ণ করে দেয়; তাতে গ্লানি আসে, শ্রান্তি আনে। কেননা, আসক্তি তাকে সমগ্র থেকে উৎপাটন করে নিজের সীমার মধ্যে বাঁধে...। রাবণের ঘরে সীতা লোভের দ্বারা বন্দী, রামের ঘরে সীতা প্রেমের দ্বারা মুক্ত, সেইখানেই তাঁর সত্যপ্রকাশ। প্রেমের কাছে দেহের অপরূপ রূপ প্রকাশ পায়, লোভের কাছে তার স্থূল মাংস।"

এ ব্যাখ্যায় যে রাবীন্দ্রিক বর্ণবিচ্ছুরণ তা সকলেরই চোখে পড়বে। এই যে একই মন্ত্রের বার বার নতুন নতুন অর্থ নিয়ে মনের মধ্যে আন্দোলিত হওয়া, এই স্বভাবের শক্তিতেই রবীন্দ্রনাথ বার বার নিজেকে অতিক্রম করে এগিয়ে গিয়েছেন। 'নৈবেদ্য'র কবিতায় বা 'ধর্ম' বইয়ের প্রবন্ধে, অর্থাৎ আমাদের সংকলন নির্দেশিত দ্বিতীয় পর্বে এই চলিষ্ণুতা ও স্বকীয়তা ধর্মচিন্তার ক্ষেত্রে স্পষ্ট হয়ে ওঠে নি। এই সাত-আট বছরের অপেক্ষাকৃত রক্ষণশীল কালটিকে ছাড়িয়ে যখন রবীন্দ্রনাথ বহুদূরে চলে এসেছেন, তখন এটি আর তাঁর স্মৃতির মধ্যেও তেমন সক্রিয় নেই। সেই জন্যেই হেমন্তবালা দেবীকে একটি চিঠিতে (২৬ জুলাই ১৯৩১ঃ চিঠিপত্র-৯, পৃ. ৭১) তিনি অনায়াসে বলতে পেরেছেন, "...আমি যে গৃহে জন্মেছি সেখানকার ধর্মেই দীক্ষা পেয়েছিলুম। সে ধর্মও বিশুদ্ধ। কিন্তু আমার মন তারই মাপে নিজেকে ছেঁটে নিতে কোনোমতেই রাজি ছিল না।"

মনে রাখতে হবে যে এই দ্বিতীয় পর্বের গোড়াতেই ব্রহ্মচর্যাশ্রম-বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা (১৯০১)। এই সময় রবীন্দ্রনাথ শুধু যে তাঁর পারিবারিক ব্রাহ্মধর্মের মাপেই নিজেকে ছেঁটে নিয়েছিলেন তা নয়, হিন্দুধর্মের সংহিতার বিধানের মাপেও নিজেকে ছেঁটে নিতে প্রস্তুত ছিলেন। ব্রহ্মচর্য-বিদ্যালয়ের কোনো ব্রাহ্ম শিক্ষক, যিনি এক সময় কায়স্থ ছিলেন, পরে ব্রাহ্ম হয়েছেন, তাঁকে বিদ্যালয়ের ব্রাহ্মণ ছাত্র প্রণাম করবে না, এ অনুশাসন রবীন্দ্রনাথের এই সময়ের। অধ্যক্ষ মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়কে লেখা (১৯ অগ্র. ১৩০৯) চিঠি (পৃ. ৬৭ দ্রষ্টব্য) থেকে আবার উদ্ধৃত করি, "যাহা হিন্দুসমাজবিরোধী তাহাকে এ বিদ্যালয়ে স্থান দেওয়া চলিবে না; সংহিতায় যেরূপ উপদেশ আছে ছাত্ররা তদনুসারে ব্রাহ্মণ অধ্যাপকদিগকে পাদস্পর্শপূর্বক প্রণাম ও অন্যান্য অধ্যাপকদিগকে

নমস্কার করিবে এই নিয়ম প্রচলিত করাই বিধেয়।"...আমরা জানি, এই পর্বেই রবীন্দ্রনাথ সব থেকে বেশি ঐতিহ্যনিষ্ঠ এবং সব থেকে বেশি হিন্দু। এই সময়ে রবীন্দ্রনাথের চোখে ভারতীয়ত্ব আর হিন্দুত্ব প্রায় অভিন্ন হয়ে উঠেছিল, যেমন হয়েছিল 'গোরা' উপন্যাসে উত্তরণ-পূর্ব অবস্থায় নায়ক গোরার। রবীন্দ্রনাথের পক্ষে এ এক বিষম ঐতিহ্য-সম্মোহনের কাল।

এই বিষম ঘোর রবীন্দ্রনাথের কেটে গিয়েছে 'গোরা' উপন্যাসে হাত দেবার অব্যবহিত আগে। বস্তুত, রবীন্দ্রনাথের উত্তরণ ঘটেছিল বলেই উপন্যাসে গোরার উত্তরণ সম্ভব হয়েছিল—সুচরিতার প্রতি প্রেম, গ্রামের অভিজ্ঞতা, জন্মরহস্যের উদ্‌ঘাটন, এগুলি হল সেই উত্তরণের উপন্যাসগত আলম্বন।

সে যাই হোক, এই ঘোর কাটার পরের কয়েকটা মাসের চিন্তাকে—১৩১৫ অগ্রহায়ণ (১৯০৮) থেকে ১৩১৬ বৈশাখ (১৯০৯), এই মাস ছয়েকের চিন্তাকে অবলম্বন করেই রবীন্দ্রনাথের ধর্মচিন্তার তৃতীয় পর্ব। সংকলনে এই পর্বের সব ক'টি রচনাই গৃহীত হয়েছে 'শান্তিনিকেতন' গ্রন্থের প্রথম ছ'মাসের ভাষণ থেকে।

দ্বিতীয় পর্বের মতো এ পর্বটিও সন্দেহাতীতভাবে ঔপনিষদিক। কিন্তু এ পর্বে রবীন্দ্রনাথের স্বকীয় ব্যাখ্যার ভূমিকা মোটেই গৌণ নয়। আগের পর্বটিকে যদি বলি তত্ত্বপ্রধান, তাহলে এই তৃতীয় পর্বটিকে বলতে হয় উপলব্ধি-প্রধান। পর্বটিকে এখানে বলা হয়েছে—'ব্রহ্মভাবনা: উপলব্ধির আলোকে'। এই উপলব্ধির মধ্য রবীন্দ্রনাথের স্বভাবের বিশেষত্বের—বা বলতে পারি রবীন্দ্রনাথের স্বধর্মের ছাপ পড়েছে। 'আত্মপরিচয়' গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ নিজে যে রকম বলেছেন, তা থেকে আমরা তাঁর স্বধর্ম সম্পর্কে খানিকটা ধারণা পেতে পারি। 'আত্মপরিচয়ে' রবীন্দ্রনাথ 'আমার ধর্ম' প্রসঙ্গে বলেছেন (র/১০/১৮৫)—

"সকল মানুষেরই 'আমার ধর্ম' বলে একটা বিশেষ জিনিস আছে। কিন্তু সেইটাকে সে স্পষ্ট করে জানে না। সে জানে আমি খৃষ্টান, আমি মুসলমান, আমি বৈষ্ণব, আমি শাক্ত ইত্যাদি। কিন্তু সে নিজেকে যে ধর্মাবলম্বী বলে জন্মকাল থেকে মৃত্যুকাল পর্যন্ত নিশ্চিন্ত আছে সে হয়তো সত্য তা নয়।...

"কোন্ ধর্মটি তার? যে ধর্ম মনের ভিতরে গোপনে থেকে তাকে সৃষ্টি করে তুলেছে। জীবজন্তুকে গড়ে তোলে তার অন্তর্নিহিত প্রাণধর্ম।...

...মানুষের আর-একটি প্রাণ আছে, সেটা শারীরপ্রাণের চেয়ে বড়ো...। এই প্রাণের ভিতরকার সৃজনীশক্তিই হচ্ছে তার ধর্ম।...মানুষের ধর্মটি হচ্ছে তার অন্তরতম সত্য।"

প্রসঙ্গ এখানে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যসৃষ্টি। এক্ষেত্রে সৃজনীশক্তির উপর জোর পড়াটা স্বাভাবিক। কিন্তু তলিয়ে দেখলে বোঝা যাবে, অন্তত রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে এই সৃজনীশক্তির লীলা, এই রস ও আনন্দের অভিব্যক্তি, এটা কেবল সাহিত্যের ক্ষেত্রেই আবদ্ধ নয়, সব ক্ষেত্রেই এর প্রকাশ দেখতে পাওয়া যাবে। তার কারণ এর মধ্যেই রবীন্দ্রনাথের স্বধর্মের স্বাক্ষর।

রবীন্দ্রনাথের স্বভাব-সম্মত যে ধর্ম, তা বৈরাগীর ধর্মও নয়, আবার ভোগীর ধর্মও নয়। তা আসক্তিহীন প্রেমের ধর্ম, যার কথা তিনি তাঁর পিতার সমাদৃত 'তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ' মন্ত্রের ব্যাখ্যায় আমাদের শুনিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ যাকে রস বলেছেন, আনন্দ

বলেছেন, সৃজনলীলা বলেছেন, সে এই রকম আসক্তিহীন ভালোবাসারই প্রকাশ। এখানে এই উপলব্ধি বা ভাবকে, বা বলতে পারি স্বভাবকে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—'আমর ধর্ম', অন্যত্র একেই তিনি বলেছেন—কবির ধর্ম, 'The Religion of An Artist'।

'আত্মপরিচয়'-এর উদ্‌ধৃত অংশের একটু পরেই রবীন্দ্রনাথ তাঁর স্বভাবের গোড়াকার সত্যের দিকে তাকিয়েছেন। বলেছেন (র/১০/১৮৯)—

"যখন বয়স অল্প ছিল তখন নানা কারণে লোকালয়ের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল না, তখন নিভৃতে বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গেই ছিল আমার একান্ত যোগ। এই যোগটি সহজেই শান্তিময়, কেননা এর মধ্যে দ্বন্দ্ব নেই...। তেমনি এই বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে প্রচ্ছন্ন অবস্থায় ধর্মবোধের যে আভাস মেলে সে হচ্ছে বৃহতের আস্বাদনে।...

"বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে নিজের প্রকৃতির মিলটা অনুভব করা সহজ, কেননা সে দিক থেকে কোনো চিত্ত আমাদের চিত্তকে কোথাও বাধা দেয় না। কিন্তু এই মিলটাতে আমাদের তৃপ্তির সম্পূর্ণতা কখনোই ঘটতে পারে না। কেননা আমাদের চিত্ত আছে, সেও আপনার একটি বড়ো মিল চায়। এই মিলটা বিশ্বপ্রকৃতির ক্ষেত্রে সম্ভব নয়, বিশ্বমানবের ক্ষেত্রেই সম্ভব। সেইখানে আপনাকে ব্যাপ্ত করে আপনার বড়ো-আমির সঙ্গে মিলতে চাই।"

আমরা সকলেই জানি, একটি গানে রবীন্দ্রনাথ ভুবনকে গানের দৃষ্টি দিয়ে দেখার কথা বলেছেন। বলেছেন, এই দেখাই সত্য দেখা। আরো ব্যাপক হল রসের দৃষ্টি দিয়ে দেখা। এই হল আসক্তিহীন প্রেমের দৃষ্টি। এই দৃষ্টিই রবীন্দ্রনাথের স্বভাবসম্মত দৃষ্টি, বলতে পারি স্বধর্ম। রসই বলি আর প্রেমই বলি, এই-চোখেদেখাই হল সৌন্দর্যে দেখা, সামঞ্জস্যে দেখা। এই দেখাই নান্দনিক দৃষ্টি দিয়ে দেখা, ইস্থেটিক দৃষ্টি দিয়ে দেখা। বিশ্বের সঙ্গে এই যে আসক্তিহীন মিলনের আকাঙ্ক্ষা, এর কারণেই রবীন্দ্রনাথের ধর্মকে নান্দনিক ধর্ম বলা যায়। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—কবির ধর্ম। এই মিলনের একটা দিক হল বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে মিলন, অন্য দিক হল বিশ্বমানবের সঙ্গে মিলন। দুয়ের সঙ্গে আলাদাভাবে মিলন নয়, একই সঙ্গে সামঞ্জস্যসূত্রে মিলন। এই গভীর মিলনাকাঙ্ক্ষাই রবীন্দ্রনাথের ধর্মবোধকে ধাপে ধাপে নিজের পথে চালিয়ে নিয়ে গিয়েছে। নিজের পথে অর্থই হল স্বধর্মসাধনের পথে।

এই স্বধর্মসাধনের পথে যাত্রার সূচনা বিশেষভাবে তৃতীয় পর্ব থেকে। তার আগের পর্বে অর্থাৎ দ্বিতীয় পর্বে ছিল পিতার বোধ—ঈশ্বরের প্রতি বিনীত কুণ্ঠিত শ্রদ্ধাবনত দীন ভক্তের ভাব। চতুর্থ পর্বে এল প্রেমের বোধ, শৃঙ্গারের ভাব, রসের সাধনা। তৃতীয় পর্ব এই দুয়ের মাঝখানে যোজকের মতো। এখানে দূরের যিনি, মহৎ ও বৃহৎ যিনি তাঁকেও পাব, আবার কাছের যে, প্রেমিক যে—আমি নইলে যার প্রেম মিথ্যা হয়ে যায়, তাকেও পাব।

চতুর্থ পর্ব বিশেষভাবে মগ্নতার পর্ব। পর্বটির কেন্দ্রে আছে গীতাঞ্জলির গান। পর্বটিকে আধ্যাত্মিক বলা যাবে কি না, তা বিতর্কের বিষয়, হয়তো বলা যাবে। পর্বটিকে মরমিয়া ভাবে ভাবিতে বলা যাবে কি না, তা-ও বিতর্কের বিষয়, হয়তো বলা যাবে না। কিন্তু তত্ত্ব যে এখানে বড়ো নয়, অনুভব-উপলব্ধিই বড়ো, সে বিষয়ে কোনো তর্কের অবকাশ নেই। সংকলনের এই পর্বে 'শান্তিনিকেতন' গ্রন্থ থেকে অল্প কয়েকটি রচনা স্থান পেয়েছে, যেমন তা স্থান পেয়েছে এর পরের পর্বেও অর্থাৎ পঞ্চম পর্বেও। অন্য দু-

একটি গদ্য রচনাও এখানে স্থান পেয়েছে। তাহলেও এই পর্বে গানই প্রধান অবলম্বন। পর্বটির ব্যাপ্তি ১৯০৯ সাল থেকে ১৯১৬ সাল, নাম দেওয়া হয়েছে—'তোমায় আমায় মিলন হবে বলে,: রসের সাধনা'। যাকে সাধারণত গীতাঞ্জলি পর্ব বলা হয়, তারই অনেকখানি জুড়ে বর্তমান সংকলনের এই চতুর্থ পর্বটি।

আমাদের দেশে রসসাধনা প্রধানত বৈষ্ণবের সাধনা। এই বিবেচনায় রবীন্দ্রনাথের এই পর্বের ভাবনাবেদনাসাধনাকে অনায়াসে বৈষ্ণবীয় বলা যায়। পুনরুক্তি হলেও এই প্রসঙ্গে কথাটা আবার বলা দরকার যে, মাত্র রাগাত্মিকা বলেই এ সাধনাকে বৈষ্ণবী সাধনা বলা যায়, কিন্তু দীক্ষিত বৈষ্ণবের সাধনার সঙ্গে, সম্প্রদায়গত বৈষ্ণবসাধনার সঙ্গে এর মিল নেই। দীক্ষিত বৈষ্ণবের ভক্তির মধ্যে দাস্যের মিশ্রণ আছে, মনে হয় যে দাস্যেরই প্রাধান্য। এখানে তা নয়। এখানে শৃঙ্গার-রস অমিশ্র। এ ভাবটি স্বয়ং রাধার। এ ভাব প্রেমের গরবে প্রেমাস্পদকে তাঁর সিংহাসন থেকে নামিয়ে নিজের আধো-আঁচরে বসাতে পারে। এর মিল পাওয়া যাবে দিব্যোন্মাদ চৈতন্যের নিজের সাধনার সঙ্গে। আর মিল পাওয়া যাবে সহজিয়া বৈষ্ণবের সাধনার সঙ্গে। আগেই বলেছি আবার বলি, মিল পাওয়া যাবে দক্ষিণভারতের আলোয়ারদের সঙ্গে, মিল পাওয়া যাবে রাজস্থানের মীরাবাইয়ের সাধনার সঙ্গে, ভাবোন্মত্ত সূফীদের সাধনার সঙ্গে।

এই শৃঙ্গার সম্ভোগের নয়, এ শৃঙ্গার নিত্যবিরহের। পাওয়া নয়, শুধু পাবার আশা।—"আছি পাবার আশা নিয়ে, তারে হয় নি আমার পাওয়া"—(র/৪/১০)। মিলন নয়, শুধু মিলন হবে বলে—। শুধু প্রতীক্ষা, শুধু এই মিনতি—

> "হে একা সখা, হে প্রিয়তম রয়েছে খোলা এ ঘর মম—
> সমুখ দিয়ে স্বপন-সম যেয়ো না মোরে হেলায় ঠেলে"।
> (র/৪/৩৫৭)

শুধু গানে গানে বিরহের আকাশকে ভরিয়ে রাখা। প্রেমে যে অহংকার, সে কি তাহলে মিথ্যা? তা নয়। কিন্তু এ পর্বের মুখ্য ভাব সেইটে নয়। 'রয়েছে খোলা এ ঘর মম'—এই হল এ পর্বের রসসাধনার স্বরূপ।

রাধা-ভাব যদি বলি, হয়তো ভুল হবে না, কিন্তু সাম্প্রদায়িক বৈষ্ণবের ভাব নয়। সাম্প্রদায়িক অর্থে রবীন্দ্রনাথ যেমন শৈব বা শাক্ত বা সৌর নন, তেমনি সাম্প্রদায়িক অর্থে তিনি বৈষ্ণবও নন।

কিন্তু সাম্প্রদায়িক অর্থে রবীন্দ্রনাথকে ব্রাহ্মই কি বলা যায়? এক সময় যেত, পরের দিকে আর যেত না। 'গোরা' উপন্যাসের পাত্রপাত্রী এবং নানা উপলক্ষ্যের সংলাপ ইত্যাদি থেকে মনে হতে পারত যে, এর পর রবীন্দ্রনাথ নিজেকে ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে যুক্ত রাখবেন না। তা কিন্তু ঘটে নি। 'গোরা' উপন্যাস প্রকাশের এক বছর পরে ১৯১১ সালে রবীন্দ্রনাথ যখন তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সম্পাদক হন, সে সময় তিনি উৎসাহী ব্রাহ্ম, ষোলো-আনা আদি-ব্রাহ্মসমাজী। তৎসত্ত্বেও কিন্তু তখন তিনি নিজেকে ষোলো-আনা হিন্দুই মনে করেন। ১৯১১ সালে সেন্সাসের সময় যখন ধর্ম নিয়ে প্রশ্ন ওঠে তখন অনেক ব্রাহ্ম দাবি করেন যে, ব্রাহ্মরা হিন্দু নন, ব্রাহ্মধর্ম হিন্দুধর্মের শাখাবিশেষ বা সম্প্রদায় বিশেষ নয়, ব্রাহ্মধর্ম স্বতন্ত্র ধর্ম। এর প্রতিবাদ করে রবীন্দ্রনাথ লিখলেন (প্রভাতকুমারের রবীন্দ্রজীবনী, ২য় খন্ড, ১৯৬১ সং, পৃ. ২৯৩), "আমি হিন্দুসমাজে জন্মিয়াছি এবং ব্রাহ্মসম্প্রদায়কে গ্রহণ করিয়াছি।...আমরা যে-ধর্মকে গ্রহণ করিয়াছি তাহা বিশ্বজনীন

তথাপি তাহা হিন্দুরই ধর্ম। এই বিশ্বধর্মকে আমরা হিন্দুর চিত্ত দিয়াই চিন্তা করিয়াছি, হিন্দুর চিত্ত দিয়াই গ্রহণ করিয়াছি।"

পরের বছর তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় 'হিন্দু ব্রাহ্ম' প্রবন্ধে (১৯১২) রবীন্দ্রনাথ একই অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে ব্রাহ্ম হিন্দুধর্মের একটা সম্প্রদায় মাত্র। রামমোহন যেমন ভেবেছিলেন, ব্রাহ্মসমাজ সু-সংস্কৃত হিন্দুদের সমাজ, রবীন্দ্রনাথও ঠিক সেই রকমই ভেবেছেন। 'গোরা' বা 'গীতাঞ্জলি' প্রকাশের দু-তিন বছর পরেও অর্থাৎ ১৯১২-১৩ সাল পর্যন্ত দুটো ভাবনা তাঁর মনে পাশাপাশি প্রবাহিত ছিল। একটা হচ্ছে তাঁর অন্তরের ধর্ম, তাঁর স্বকীয় উপলব্ধির ধর্ম, যাকে তিনি বলেছেন–'আমার ধর্ম'। আর-একটা হচ্ছে–সুসংস্কৃত হিন্দুধর্ম, পৌরাণিক হিন্দুধর্ম নয়, সাংখ্য-প্রভাবিত যে হিন্দুধর্মের কথা বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন সে হিন্দুধর্ম নয়, সংহিতার হিন্দুধর্ম নয়, পঞ্চোপাসকের হিন্দুধর্মও নয়, ঔপনিষদিক হিন্দুধর্ম।

আমরা জানি, সাম্প্রদায়িক ধর্মের প্রতি রবীন্দ্রনাথের বরাবরই আগ্রহের অভাব। শেষের দিকে তা বিতৃষ্ণার চেহারা নিয়েছে। হিন্দুধর্ম যখন religion অর্থে ধর্মই নয়, তখন তাকে সাম্প্রদায়িক ধর্ম বলা যাবে কি না এ তর্ক উঠতেই পারে না। কিন্তু যখন আমরা হিন্দুধর্মকে অন্য ধর্মসম্প্রদায়ের পাশাপাশি রেখে দেখি, যখন ধর্মকলহ বা সাম্প্রদায়িক দ্বন্দ্বের প্রেক্ষাপটে দেখি, যখন আদমসুমারির হিসেব হয়, বা রাষ্ট্রযন্ত্রে আসন ভাগাভাগির প্রশ্ন ওঠে, সেই সব প্রখরভাবে বাস্তব ক্ষেত্রে হিন্দুধর্ম অবশ্যই একটি সাম্প্রদায়িক ধর্ম। রবীন্দ্রনাথের স্বকীয় উপলব্ধির 'আমার ধর্ম' তাঁর নিজের মধ্যে যতই জেগে উঠতে থাকবে, সাম্প্রদায়িক হিন্দুধর্মের প্রতি অনাগ্রহ যে তাঁর মনে ততই প্রবল হয়ে উঠতে থাকবে, এটা প্রায় অনিবার্য।

১৯১৩ সালের নভেম্বরে যখন নোবেল পুরস্কার ঘোষিত হল, ততদিনে বহির্বিশ্ব রবীন্দ্রনাথের খুব কাছাকাছি চলে এসেছে। বহির্বিশ্বের সঙ্গে এই নৈকট্যের তাৎপর্য সুগভীর। কয়েক মাস পরেই নতুন চিন্তার বাহন সবুজপত্র (১৩২১ বৈশাখ, ১৯১৪) প্রকাশিত হল। সবুজপত্রের প্রথম সংখ্যায় যখন 'বলাকা' কাব্যগ্রন্থের 'সবুজের অভিযান' কবিতাটি প্রকাশিত হল, তখনি বোঝা গেল রবীন্দ্রবিশ্বে একটা বড়ো পালা বদলের সূচনা দেখা যাচ্ছে। স্বাভাবিক যে ধর্মচিন্তাতেও এই বদলের ঢেউ লাগবে। প্রথমে মনে হয়, অন্যত্র যা-ই হোক না কেন, বদলটা ধর্মচিন্তায় খুব বড়ো নয়। পরে অল্পে অল্পে বোঝা যায়, এ ধারণা ভুল। বোঝা যায়, এই যে শুরু হল 'আমার ধর্মের' অগ্রগতি–স্বানুভূতির জয়যাত্রা, মৃত্যুর আগে তার শেষ নেই। তরী একাধিক ঘাটে ভিড়বে, কিন্তু এই যাত্রা আর থামবে না। যাকে বলি সাম্প্রদায়িক ধর্ম, যৌথ ধর্মাচরণ, সে আর ফিরে আসবে না।

'বলাকা' কবিতারচনা শুরু হবার মুখ থেকেই আমাদের সংকলনে-নির্দেশিত পঞ্চম পর্বের শুরু। সংকলিত প্রথম রচনাটির ('জানি নাই গো', ১০০নং রচনা) প্রকাশিত হয়েছে ১৩২০ চৈত্র (১৯১৪) মাসে, আর সবুজপত্র প্রকাশিত হয়েছে তার এক মাস পরে ১৩২১ বৈশাখ (১০১৪) মাসে। এতদিন ছিল বাইরে খোঁজা, যিনি আসছেন তাঁর জন্য প্রতীক্ষা করা, ঘরের দরজা খুলে রাখা। এখন শুরু হল, বাইরে নয়, ভিতরে খোঁজা। এখন–"আমি তাঁরেই খুঁজে বেড়াই যে রয় মনে আমার মনে" (১১৫ নং রচনা)। অথবা, "আপনি আমার কোন্‌খানে/বেড়াই তারি সন্ধানে" (১২৩ নং রচনা)। এই সন্ধান দূরস্থিত কোনো পরম পিতার নয়, এ সন্ধান নিজের মনের মধ্যে, এ সন্ধান মনের মানুষের। যে অন্তরে আছে

তাকে সন্ধান সেইখানে যেখানে অন্তরে অন্তরে যোগ, দেবালয়ে নয়, তীর্থস্থানে নয়, মানুষের সীমানায়, সহজ প্রেমে।

এই যে মনের মানুষকে খোঁজার ভাব , এ ভাবটা যে আগে একেবারেই ছিল না, তা বলা যায় না। চতুর্থ পর্বের অর্থাৎ 'গীতাঞ্জলির সময়ের কোনো কোনো গানে তার আভাস মেলে। দু-একটি গানে তার প্রত্যক্ষ সাক্ষাৎ-ও পাওয়া যায়। যেমন, 'প্রাণের মানুষ আছে প্রাণে, তাই হেরি তায় সকল খানে'' (৮৫ নং রচনা)। এর দোসর যে-সব গান তাদের অধিকাংশই আছে পঞ্চম পর্বে, যেপর্বের নাম দেওয়া হয়েছে–'আপনি আমার কোন্‌খানে': সহজের সধনা।

ধর্মচিন্তাকে মানুষের সীমানায় নামিয়ে নিয়ে আসা, এরও আভাস চতুর্থ পর্বে কিছু কিছু মিলবে। যেমন, ''যেথায় থাকে সবার অধম দীনের হতে দীন'' (৮০ নং রচনা), অথবা,''ভজন পূজন সাধন আরাধনা/সমস্ত থাক্ পড়ে'' (৮২ নং রচনা), কিংবা যেমন, ''বিশ্ব সাথে যোগে যেথায় বিহারো'' (৮৭ নং রচনা)। এই যে মানুষের সাযুজ্য, এ ভাবটিও চতুর্থের তুলনায় পঞ্চম পর্বেই যথার্থ প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। চতুর্থ পর্বটি কোনো কোনো দিক থেকে পঞ্চম পর্বের পূর্বাভাস বলে ধরলে খুব ভুল হয় না। এইটুকু ভুল হয় যে পঞ্চম পর্বে যেন একটা গুণগত ভিন্নতা এসে গিয়েছে।

পঞ্চম পর্বটির ভাবে এক দিক আছে সহজের সাধনা, মনের মানুষের সন্ধান। অন্যদিকে তেমনি আছে সেই প্রেমের সাধনা যা সহজ অনুভূতিতে প্রত্যক্ষ। যা জীবনে সত্য সেই প্রেমের সাধনা। বলতে পারি ঘরোয়া জীবনের মধ্যে সাধনা। বলতে পারি, মানুষের সাধনা। অনেক আগে এক সময় রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, বিশ্বপ্রকৃতি আর বিশ্বমানব (আত্মপরিচয়, র/১০/১৮৯), এ হল সেই বিশ্বমানবের দিকে পদক্ষেপ সহজ মানুষের মধ্যে দিয়ে, সাধারণ মানুষের মধ্যে দিয়ে। এই সাধনা বাউলদের স্মরণ করায় দুটো কারণে। এক হল, বাউলদের সাধনা সহজের সাধনা, মনের মানুষের সাধনা। আর দুই হল, বাউলরা সহজ মানুষ, সাধারণ মানুষ, মাটির কাছাকাছি এলাকার মানুষ, ভেদচিহ্নবর্জ্জিত মানুষ।

এই পঞ্চম পর্বের প্রথম দিকের সীমা 'বলাকা'র (১৯১৬) প্রাক্‌কালে আর শেষের দিকের সীমা অক্স্‌ফোর্ডে হিবার্ট বক্তৃতার (১৯৩০, The Religion of Man) প্রাক্‌কাল, অর্থাৎ মোটামুটি ১৯২৯ সাল অবধি। এর ব্যাপ্তিকাল পনেরো বছর। রবীন্দ্রনাথের ধর্মচিন্তার ইতিহাসে দীর্ঘতম পর্ব। এর পরের পর্ব, অর্থাৎ ষষ্ঠ পর্ব বা শেষ পর্বটি হল মানবধর্মের পর্ব। সকল মানুষের সূত্রে পঞ্চম পর্বের সংগে ষষ্ঠ পর্বের যোগ ঘনিষ্ঠ।

ষষ্ঠ পর্বের স্থায়িত্বকাল ১৯৩০ সালে অক্স্‌ফোর্ডে হিবার্ট বক্তৃতার (The Religion of Man) সময় থেকে রবীন্দ্রনাথের প্রায় মৃত্যুকাল–'ঐ মহামানব আসে' গান (১৬৬ নং রচনা,) এই এগারো-বারো বছর ব্যাপ্ত। আভ্যন্তরীণ যোগের সূত্র ধরে' পঞ্চম ও ষষ্ঠ পর্বকে যদি যুক্ত করি, তাহলে এদের ব্যাপ্তি হয় রবীন্দ্রনাথের জীবনের শেষ সাঁইত্রিশ বছর। সময়টা বড়ো কম নয়। সবুজপত্র প্রকাশ অথবা 'বলাকা' কাব্যের রচনার আরম্ভ (১৯১৪), একে যদি আমরা রবীন্দ্রনাথের চিন্তার, বর্তমান ক্ষেত্রে বিশেষ ক'রে ধর্মচিন্তার একটা গভীর বিভাজন-রেখা বলে' কল্পনা করি, তাহলে তার আগে পড়বে প্রথম চারটি পর্ব, পরিণত ও অপরিণত চিন্তা মিলিয়ে মোট ত্রিশ বছর, আর বিভাজন-রেখার এপারে পড়বে পরিণত চিন্তার সাঁইত্রিশ বছর।

ষষ্ঠ পর্বের নাম দেওয়া হয়েছে–'সকল মানুষের মানুষ: মানবধর্মের সাধনা'। পর্বটির মূল বিষয় মানবধর্ম। মানবধর্মের তত্ত্বটি রবীন্দ্রনাথের মনে রূপ নিয়েছে ধীরে ধীরে, একটু একটু ক'রে। সুস্পষ্ট চেহারা নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে প্রথমে হিবার্ট বক্তৃতায় (১৯৩০), পরে ওই বক্তৃতার গ্রন্থরূপে, 'The Religion of Man'-এ (১৯৩১)। একই চিন্তা আরো সুসংবদ্ধ চেহারায় দেখতে পাওয়া যাবে 'মানুষের ধর্ম' বইয়ে (১৯৩৩, সংকলনের ১৪২, ১৪৩, ১৪৪ এবং ১৪৫ নং রচনা), যে বইখানি অনেক দিক থেকেই 'The Religion of Man-'এর পরিণততর বঙ্গীয় সংস্করণ। মানবধর্ম অথবা মানুষের ধর্ম যা-ই বলি, তত্ত্বটি খুব সহজ নয়। রবীন্দ্রনাথের উপস্থাপনা যে খুব সুপরিচ্ছন্ন এবং স্বচ্ছ তা-ও বলা যায় না। সুতরাং ব্যাখ্যা প্রয়োজন। হেমন্তবালা দেবীকে মানবধর্ম বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ যে সব চিঠি লিখেছেন (চিঠিপত্র-৯) তার মধ্যে রবীন্দ্রনাথের বেশ সরলীকৃত ব্যাখ্যার সাক্ষাৎ পাওয়া যাবে। যেমন ২৩ জুন ১৯৩১-এর চিঠিতে লিখেছেন–

"আমি সহরের মানুষ, একদিন হঠাৎ এক পল্লীবাসী বাউল ভিখারীর মুখে গান শুনলুম, 'আমি কোথায় পাব তারে, আমার মনের মানুষ যে রে।' আমি যেন চমকে উঠলুম, বুঝতে পারলুম, এই মনের মানুষকে, এই সত্য মানুষকেই আমরা দেবতায় খুঁজি, মানুষে খুঁজি, কল্পনায় খুঁজি, ব্যবহারে খুঁজি, 'হৃদা মনীষা'–হৃদয় দিয়ে মন দিয়ে, কর্ম দিয়ে।" (পৃ. ৪৮-৪৯)

২৭ জুন ১৯৩১-এর চিঠিতে লিখেছেন–"তুমি মনে কোরো না বিচ্ছিন্ন ব্যক্তিগত মানুষ আমার সাধনার লক্ষ্য। চিরন্তন বিরাট মানবকে আমি ধ্যানের দ্বারা আপনার মধ্যে গ্রহণ করবার চেষ্টা করি–...।"(পৃ: ৫৬)

২০ জুলাই ১৯৩১-এর চিঠিতে–"তোমার প্রশ্ন এই তিনি[মহামানব] কি সর্বমানবের সমষ্টি। সমষ্টি কথাটায় ভুল বোঝার আশঙ্কা আছে।... মানুষের সজীব দেহ লক্ষকোটি জীবকোষের সমষ্টি, কিন্তু সমগ্র মানুষ জ্ঞানে প্রেমে কর্মে আত্মানুভূতিতে জীবকোষসমষ্টির চেয়ে অসীমগুণ-বড়। ব্যক্তিগত মানব মহামানব থেকে বিচ্ছিন্ন নয়, তারি মধ্যেই তার জন্ম ও বিলয় কিন্তু তাই বলে সে তাঁর সমান হতে পারে না। ব্যক্তিগত মানব মহামানবকে উপলব্ধি করে আনন্দিত হয়, মহিমালাভ করে যখন সে নিজের ভোগ নিজের স্বার্থকে বিস্মৃত হয়..." (পৃ.৬৭-৬৮)

২৭ জুলাই ১৯৩১-এর চিঠিতে–

"মানবের পরিপূর্ণতার শাশ্বত আদর্শ শাশ্বত মানবের মধ্যে আছে...।" (পৃ. ৭২)

২৬ অক্টোবর ১৯৩১-এর চিঠিতে–"ধর্ম মানেই মনুষ্যত্ব–যেমন আগুনের ধর্মই অগ্নিত্ব, পশুর ধর্মই পশুত্ব। তেমনি মানুষের ধর্ম মানুষের পরিপূর্ণতা।" (পৃ. ১০৬)

হেমন্তবালা দেবীকে লেখা মোট ১৬টি চিঠি বর্তমান সংকলনে স্থান পেয়েছে। অধিকাংশের মধ্যেই নর-দেবতা, মনের মানুষ ইত্যাদির ব্যাখ্যা পাওয়া যাবে। বলা বাহুল্য অনুরূপ ব্যাখ্যা 'মানুষের ধর্ম' গ্রন্থেও অনেক মিলবে। যেমন (মানবসত্য, র/১২/৬১২, সংকলনের ১৪৬ নং রচনা দ্রষ্টব্য)–

"বিশ্বদেবতা আছেন, তাঁর আসন লোকে লোকে, গ্রহচন্দ্রতারায়। জীবনদেবতা বিশেষভাবে জীবনের আসনে, হৃদয়ে হৃদয়ে তাঁর পীঠস্থান, সকল অনুভূতি সকল

অভিজ্ঞতার কেন্দ্রে। বাউল তাঁকেই বলেছে মনের মানুষ। এই মনের মানুষ, এই সর্বমানুষের জীবনদেবতার কথা বলবার চেষ্টা করেছি Religion of Man বক্তৃতাগুলিতে।"

শেষ পর্বের ধর্মচিন্তার দিক থেকে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ রচনা একদিকে যেমন 'মানুষের ধর্ম' বইটি (১৯৩৩), অন্যদিকে তেমনি 'পত্রপুট' কাব্যগ্রন্থের ১৫ সংখ্যক কবিতাটি–'ওরা অন্ত্যজ, ওরা মন্ত্রবর্জিত' (১৩৪৩ বৈশাখ, ১৯৩৬, সংকলনের ১৫৫ নং রচনা)। এই বিখ্যাত কবিতাটি রবীন্দ্রনাথের ধর্মজীবনের শেষ জবানবন্দীর মতো। আগেই বলেছি এ কবিতার বক্তব্য নিঃসন্দেহে অপ্রত্যাশিত। এই কবিতায় রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, সারা জীবন যাঁকে তিনি বরণীয় প্রমার্ন করতে চেয়েছেন, তা প্রমাণিত হয় নি তাঁর নিজের জীবনে। বলেছেন তিনি ব্রাত্য, তিনি মন্ত্রহীন। কবিতার কেন্দ্রের কাছে এসে তিনি বলেছেন, তাঁর জীবন সার্থক হয়েছে দুটি মন্ত্রে, তাঁর জীবনের দুটি সর্বোত্তম প্রাপ্তি। এক হল–

"বালক ছিলেন যখন
পৃথিবীর প্রথম জন্মদিনের আদি মন্ত্রটি
পেয়েছি আপন পুলক কম্পিত অন্তরে
আলোর মন্ত্র।"

আর দুই হল–

"একদিন বসন্তে নারী এল সংগীহারা আমার বনে
প্রিয়ার মধুর রূপে।"

বুঝতে অসুবিধা নেই, আলোর মন্ত্র যে রূপজগৎ-কে প্রকাশিত করে দেয় তা যেমন প্রত্যক্ষ সত্য, একদিন বসন্তে যে নারী এল জীবনে, সে-ও তেমনি প্রত্যক্ষ-সত্য–প্রশ্নতীত সত্য।

এইবারে কবিতার শেষ স্তবকটি, যা এই কবিতার সারাৎসারের মতো, সেইটি উদ্‌ধৃত করি–

"আমার গানের মধ্যে সঞ্চিত হয়েছে দিনে দিনে
সৃষ্টির প্রথম রহস্য, আলোকের প্রকাশ,
আর সৃষ্টির শেষ রহস্য, ভালোবাসার অমৃত।
আমি ব্রাত্য, আমি মন্ত্রহীন,
সকল মন্দিরের বাহিরে
আমার পূজা আজ সমাপ্ত হল
দেবলোক থেকে
মানবলোকে,
আকাশে জ্যোতির্ময় পুরুষে
আর মনের মানুষে আমার অন্তরতম আনন্দে।"

(র/৩/৩৭৬-৮১)

কিন্তু রবীন্দ্রনাথ এখানে কী বলতে চাইছেন? রবীন্দ্রনাথ কি এই কথাটিই এখানে বলতে চাইছেন যে, তাঁর জীবনে প্রমাণিত হয় নি ব্রহ্মসাধনা? প্রমাণিত হয় নি তাঁর জীবনে পিতার বোধ, সখার বোধ? ঝড়ের রাতে যাঁর অভিসার, শ্রাবনের অন্ধকার রাত্রে

সকলের দৃষ্টি এড়িয়ে যিনি আসবেন, তাঁর জন্য রবীন্দ্রনাথের যে ব্যাকুল প্রতীক্ষা, তা তাঁর জীবনে প্রমাণিত হয় নি? প্রমাণিত হয় নি তাঁর জীবনে রাধার আর্তি? রবীন্দ্রনাথ কি বলতে চাইছেন যে, তাঁর এতকালের পূজা শূন্যের প্রতি উদ্দিষ্ট হয়েছে? তাহলে তিনি কি বলতে চাইছেন, সব মিথ্যে হয়ে গেল?

না, তা তিনি বলতে চাইছেন না। "জীবন হয় নি ফাঁকি, ফলে ফুলে ছিল ঢাকি।" এই যা তাঁর জীবনে প্রমাণিত হয়েছে, তার কথাই এই কবিতায় তিনি বলতে চাইছেন। বলতে চাইছেন যে, তাঁর জীবনে প্রমাণিত হয়েছে আলোকের প্রকাশ, প্রমাণিত হয়েছে রূপজগতের বিপুল রহস্য। আর প্রমাণিত হয়েছে তাঁর জীবনে নারীর প্রেম, একদিন বসন্তে যে নারী এসেছিল সংগীহারা তাঁর বনে, প্রমাণিত হয়েছে ভালোবাসার অমৃত।

উপনিষদের সাধনা প্রমাণিত হয় নি রবীন্দ্রনাথের জীবনে? এ বিষয়ে বলবার অধিকারী তিনি নিজে, একা তিনিই। আমরা শুধু বিস্ময় প্রকাশ করতে পারি এই কথা ভেবে যে, পাঁচ বছরও হয় নি হেমন্তবালাকে তিনি চিঠিতে (৮ নভেম্ভবর ১৯৩১, ১৩৮ নং রচনা) লিখেছেন, "...আমি উপনিষদকে সর্বধর্মের ভিত্তি বলে মানি।"

একটা কথা এখানে মনে রাখা ভালো। ব্যক্তিগত ধর্মের ক্ষেত্রে এই রকম দিক-পরিবর্তন খুব অকল্পনীয় ব্যাপার নয়। সৃষ্টির এবং মননের নানা ক্ষেত্রে যিনি বার বার নিজেকে ছাড়িয়ে ছাড়িয়ে গিয়েছেন, বিশেষ করে' সৃষ্টির ক্ষেত্রে, তাঁর পক্ষে এইটেই বোধকরি স্বধর্ম। সৃষ্টি কথাটার উপর জোর দিচ্ছি এই কারণে যে, রবীন্দ্রনাথের ধর্মভাবনাও মূলত সৃষ্টিধর্মী, অনুভবে-সমর্পিত ভাবনা।

৩. বিষয়গত পরিচয় : ধর্মজিজ্ঞাসা

ধর্ম কথাটাকে আমরা নানা প্রসংগে নানারকম অর্থে ব্যবহার করে থাকি। যেমন, ক্ষাত্রধর্ম শূদ্রধর্ম লোকধর্ম রাজধর্ম। এই ধর্ম আর 'যতো ধর্ম স্ততো জয়' এই বাক্যের ধর্ম আলাদা। ধার্মিক আর ধর্মাবলম্বী এ-দুটো কথারও অর্থ আলাদা।

প্রত্যেক ধর্মই ধর্ম-ব্যাপারটাকে নিজের মতো ক'রে বোঝে, নিজের মতো ক'রে ধর্মের পরিচয় দেয়, সংজ্ঞা দিতে চেষ্টা করে। বিশেষ ক'রে যে-সব ধর্ম দর্শনের সংগে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। যেমন হিন্দুধর্ম। আমরা জানি, প্রথম দিকে অনেক দিন পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ নিজেকে হিন্দু বলেই বিবেচনা করতেন, নিজেকে ব্রাহ্ম গণ্য করতেন নিছক সম্প্রদায়গত ভাবে। ততদিন পর্যন্ত কি রবীন্দ্রনাথ ধর্ম-ব্যাপারটাকে নিষ্ঠাবান হিন্দুর চোখ দিয়েই, খাঁটি হিন্দু-ঐতিহ্য অনুযায়ীই দেখতেন? তা বলা কঠিন। কিন্তু, রবীন্দ্রনাথ ধর্মকে যে চোখেই দেখুন, ধর্ম-ব্যাপারটিকে হিন্দুধর্ম কী চোখে দেখে, কী ভাবে তার পরিচয় দেয়, সেটা একটা প্রশ্ন হতে পারে বটে। হিন্দুধর্মের কাছে কি আমরা ধর্মের একটা সর্বজনগ্রাহ্য পরিচয়, একটা সর্বজনীন সংজ্ঞা প্রত্যাশা করতে পারি? হিন্দুধর্মে ধর্ম কথাটার অর্থ কী?

সকলেই জানেন, হিন্দুধর্মের শাস্ত্রীয় চৌহদ্দির মধ্যেই ধর্ম কথাটির একাধিক অর্থ আছে। তার মধ্যে অন্তত দুটো আলাদা অর্থ সকলেরই পরিচিত। এক অর্থে ধর্ম মানুষের প্রতিদিনের ব্যাবহারিক ক্ষেত্রের সংগে, মানুষের আচরণের সংগে, মানুষের করণীয়

অকরণীয়ের নির্দেশের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত, সাক্ষাৎ ভাবে যুক্ত। এই অর্থে ধর্ম মানুষের অন্যতম পুরুষার্থ—চার বর্গের বা চার শ্রেণীর পুরুষার্থের প্রথমটি। পুরুষার্থ কী? পুরুষার্থ হল পুরুষের বা মানুষের চরম প্রয়োজন, চরম অভীষ্ট, যার জন্য মানুষ আদৌ ক্রিয়াশীল হয়। পুরুষার্থ—মানুষের চরম চাওয়া—হল চার শ্রেণীর। এদেরই বলা হয় চতুর্বর্গ। ধর্ম তার একটি।

ধর্ম কথাটার দ্বিতীয় অর্থের পরিধি অনেক ব্যাপক। এই ব্যাপকতর অর্থে ধর্ম কথাটি প্রযুক্ত হয় ধম অর্থ কাম মোক্ষ এই চারটি বর্গকে একসঙ্গে জড়িয়ে নিয়ে। ধর্ম হল সমস্ত পুরুষার্থের সমাহার। এই অর্থে ধর্মের বাইরে মানুষের আর-কোনো প্রয়োজন নেই, আর কোনো অভীষ্ট নেই, আর-কোনো প্রাপ্তি নেই, অতএব প্রাপ্তিজনিত আর-কোনো রকম সুখও নেই। প্রথমোক্ত ক্ষেত্রের অর্থাৎ ব্যাবহারিক ক্ষেত্রের ধর্ম—চতুর্বর্গের প্রথম বর্গ যে-ধর্ম, সেই ছোট পরিধির ধর্ম এই বৃহৎ পরিধির ধর্মের অন্তর্গত। অবশ্য এ কথাও মনে রাখতে হবে যে, অন্তর্গত বটে, কিন্তু গুরুত্ব খাটো নয়।

চতুর্বর্গ কথাটি বা পুরুষার্থ কথাটি হিন্দুর কাছে সুপরিচিত হতে পারে, কিন্তু পাঠকসাধারণের কাছে সম্ভবত একটু ব্যাখ্যাসাপেক্ষ। সুতরাং বিষয়টা আর একটু খুলে বলা ভালো।—

আমরা জানি, মানুষের অনেক রকম প্রয়োজন আছে, অনেক রকম চাওয়া আছে, অনেক রকম সুখের আকর্ষণ আছে, যা মানুষকে কর্মে প্রবৃত্ত করে। সংখ্যা গণনায় অন্তহীন, কিন্তু তলিয়ে দেখলে বোঝা যাবে, তারা মূলত চার জাতের। চতুর্বর্গ হল এই চার জাতের চরম প্রয়োজন, চার গোত্রের চরম সুখের আকর। এই চার গোত্রের চাওয়া ছাড়া মানুষের আর কোনো চাওয়া নেই, আর কোনো কর্মপ্রবর্তক নেই, অন্য কোনো রকম প্রাপ্তি নেই, অন্য কোনো জাতের সুখ নেই। এই চার বর্গের প্রাপ্তিই মানুষের চরম লক্ষ্য।

এদের প্রথমটিকে বলা হয়েছে ধর্ম। এই অর্থে ধর্ম হল বেদবিহিত কর্মের অনুষ্ঠান থেকে উৎপন্ন উত্তম সংস্কার। গৌণার্থে বেদবিহিত কর্ম বা আচরণ। আর অধর্ম হল বেদনিষিদ্ধ কর্ম থেকে উৎপন্ন অধম সংস্কার। গৌণার্থে বেদনিষিদ্ধ কর্ম। ধর্ম ছাড়া অর্থাৎ বৈদিক সংস্কার এবং বেদবিধিপালন ছাড়া কোনো পুরুষার্থই সাধিত হয় না। এই জন্যই বর্গের তালিকায় এর নাম প্রথমে এসেছে।

দ্বিতীয় বর্গের নাম অর্থ, তৃতীয় বর্গের নাম কাম। আগে তৃতীয় বর্গের কথাই বলি। কাম হল ইন্দ্রিয়ের দ্বারা সরাসরি বিষয়ভোগ, অব্যবহিতভাবে ঐহিক সুখভোগ। ভোগ বলতে সাধারণত আমরা এই বর্গটিকেই বুঝে থাকি। দ্বিতীয় বর্গ হল অর্থ। যা অবলম্বন ক'রে কামের সিদ্ধি, যা না থাকলে ভোগ সম্ভব নয়, তাকেই এইগোত্রে ফেলা যেতে পারে। যা কিছু বিষয়ভোগের সাধন, যা কিছু ইন্দ্রিয়গত সুখভোগের সাধক বা সহায়ক, বিষয়ভোগের উপায়-উপকরণ, তা-ই হল অর্থ। বলা যায় যে কাম হল বৈষয়িক বা ঐহিক সুখের অব্যবহিত সাধন, আর অর্থ হল বৈষয়িক বা ঐহিক সুখের ব্যবহিত সাধন। মনে রাখতে হবে যে, এই দুই গোত্রের ঐহিক সুখসাধনই বেদবিধির নিয়ন্ত্রণাধীন।

চতুর্থ বর্গ হল মোক্ষ। মোক্ষ বলতে বুঝি মুক্তি। মুক্তি অর্থে বন্ধন থেকে মুক্তি। বিভিন্ন ভারতীয় দর্শনপ্রস্থানে মোক্ষকে কিছু ভিন্ন ভিন্ন ভাবে দেখা হয়েছে। সেই জটিলতার মধ্যে না গিয়ে সাধারণভাবে বলা যায়, মোক্ষ বা মুক্তি হল সংসারের বদ্ধাবস্থা থেকে পরিত্রাণ; কর্মচক্র থেকে, জন্মচক্র থেকে, আসক্তিপাশ থেকে, অজ্ঞানতা জনিত

দুঃখক্লেশ থেকে উদ্ধারলাভ। কার উদ্ধার? বলা বাহুল্য, আত্মার। কিন্তু আত্মা তো নিত্যমুক্ত? আত্মাও অজ্ঞানাবৃত হয়, নানা বিষয়ের সঙ্গে সংসর্গের ফলে আত্মাও বিষয়াবৃত হয়, তখন আত্মার স্বরূপ নিজের কাছে অনুপলব্ধ থাকে। এই অবস্থার থেকে চির-অব্যাহতির নাম মোক্ষ। মোক্ষ হল আত্মার নিত্য-সুখের কারণীভূত অবস্থা।

এইবারে হিন্দুশাস্ত্রের মতে ধর্ম কী সেই মূল প্রসঙ্গে ফিরে আসি। আমরা দেখলাম, এক অর্থে ধর্ম হল বৈদিক সংস্কার এবং বেদবিহিত কর্মানুষ্ঠান। এটি অপেক্ষাকৃত সংকীর্ণ পরিধির, অপেক্ষাকৃত নির্দিষ্ট এবং স্পর্শযোগ্য। আর ব্যাপকতর অর্থে ধর্ম হল চতুর্বর্গসাধন—সমগ্র পুরুষার্থ মন্ডলীর সাধন। এই ব্যাপক অর্থে ধর্ম হল তাই যা থেকে অভ্যুদয় আর নিঃশ্রেয়স সিদ্ধ হয়, অর্থাৎ যা থেকে ঐহিক এবং পরমার্থিক দু'রকমেরই প্রাপ্তি ঘটে। ঐহিক প্রাপ্তি হল ধর্ম অর্থ ও কামের সাধন। আর পরমার্থিক প্রাপ্তি হল সংসারবন্ধন থেকে মুক্তিলাভ, আধিভৌতিক আধিদৈবিক ও আধ্যাত্মিক ত্রিবিধ দুঃখ থেকে মুক্তিলাভই মোক্ষলাভ।

ধর্ম কথাটার এই যে দুটো আলাদা অর্থ, একটি সংকীর্ণ পরিধির, আর-একটি বিস্তৃত পরিধির, এদের কি আমরা দুটো আলাদা শব্দ, আলাদা দু রকমের ধর্ম, এইভাবে গ্রহণ করতে পারি? যদি আলাদা শব্দ রূপেই গ্রহণ করি, তাহলে এদের কোন্‌টি আমাদের ধর্মজিজ্ঞাসার উত্তর? কোন্‌টি ধর্মের সংজ্ঞা বা পরিচয় হিসেবে সর্বজনীন স্বীকৃতি দাবি করতে পারে? সহজেই মনে হয় দ্বিতীয়োক্তিটি, বিস্তৃত পরিধির শব্দটি। যা ঐহিক এবং পারমার্থিক প্রাপ্তি ঘটায় তাই ধর্ম। আমরা জানি, বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর 'ধর্মতত্ত্ব' গ্রন্থে ধর্মের এই রকম একটা বিস্তৃত পরিচয়পত্রই আমাদের সামনে উপস্থিত করেছেন।

ঐহিক সিদ্ধি আর পারমার্থিক সিদ্ধি, ইন্দ্রিয়গত বিষয়ভোগ আর কর্মচক্র থেকে মুক্তি, এরা এত আলাদা যে এদের সহাবস্থান কল্পনা করা কঠিন। এদের মেলাবে কে? বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন, এদের মেলাবে ভক্তি। ভক্তি কথাটা আনার সঙ্গে সঙ্গেই কিন্তু ধর্মের পরিচয়পত্রটি আর নির্বিশেষ রইল না, ধর্ম কথাটার অর্থের পরিধি অনেকখানি সংকুচিত হয় গেল। ধর্মের সংজ্ঞা হিসেবে এর সর্বজনীন স্বীকৃতি আর স্বতঃসিদ্ধ রইল না।

ভক্তির বদলে যদি বৈদিক সংস্কার বলি, বেদবিধি বলি? তা বললে কথাটা আরো বেশি শাস্ত্রানুগ এবং ঐতিহ্যসম্মত হবে। কিন্তু তাতে ধর্মের সংজ্ঞা আরো অনেক বেশি বিশিষ্টতা পাবে, সংজ্ঞার্থের ব্যাপকতাও অনেক কমে যাবে। দেখা যাবে যে, ধর্ম কথাটার সংকীর্ণ এবং ব্যাপক এই যে দুই অর্থ, তারা পরস্পরের খুব কাছাকাছি চলে এসেছে। সঙ্গে সঙ্গে ধর্মের সংজ্ঞাটিও তার সর্বজনীন স্বীকৃতি অনেকখানি হারিয়ে ফেলেছে। কেননা এখন পুরুষার্থসাধনে পরিচালকের ভূমিকায় এসেছে বেদবিধি।

আগেই দেখেছি, চতুর্বর্গের প্রথম বর্গ যে-অর্থে ধর্ম, বেদবিধি সেই অর্থেই ধর্ম। লক্ষ করতে হবে যে, ব্যাপক অর্থে যাকে ধর্ম বলা হচ্ছে, তা কোনো আলাদা প্রবর্তনা পরিচালনা নেই। চার বর্গের সাধনেই তার সাধন। আরো লক্ষ করতে হবে যে, প্রথম বর্গ ছাড়া, অর্থাৎ বৈদিক সংস্কার এবং বেদবিহিত কর্মানষ্ঠান ছাড়া অন্য কোনো পুরুষার্থই সাধিত হতে পারে না। লক্ষ্য যা-ই হোক, পৌঁছুবার পথ কিন্তু বেদের বিধিবাক্যের নির্দেশিত। মোক্ষ যদিও পরম পুরুষার্থ, তবু তারও পথ বেদবিধির অনুগমন। এই কারণেই হিন্দুশাস্ত্রে বৈদিক সংস্কার ও বেদবিহিত কর্মানুষ্ঠানই প্রাথমিকভাবে ধর্ম বলে গণ্য।

উপায় বা পথ হিসেবে যদি বলি, তাহলে আর কোনো দ্বিতীয় ধর্ম নেই।

মীমাংসকেরা ধর্ম বিষয়ে আলোচনা শুরু করেছেন 'অথাতো ধর্মজিজ্ঞাসা' বলে। আর সঙ্গে সঙ্গেই উত্তর দিয়েছেন, বেদের ক্রিয়াপ্রবর্তক বাক্যই ধর্ম। বলেছেন, বেদবিহিত কর্ম আর ধর্ম অভিন্ন, যজ্ঞ আর ধর্ম সমার্থক।

বৈদিক সংস্কার এবং বেদবিহিত কর্মই ধর্ম—ধর্মের এই সংজ্ঞা বা এই পরিচয় ঠিক কি ভুল, বা কেন ঠিক কি কেন ভুল, তা এখানে আমাদের বিবেচ্য বিষয় নয়, আমাদের বিবেচ্য হল ধর্মের এমন কোনো পরিচয় আছে কি না যা অন্তত মোটামুটিভাবে সব ধর্মাবলম্বীর কাছেই গৃহীত হতে পারে। সহজেই বোঝা যায়, বেদবিহিত কর্মানুষ্ঠান অনেকের কাছে ধর্ম বলে গৃহীত হবে না। কোনো বৌদ্ধ বা জৈন, কোনো কনফুসিয়াস-পন্থী বা তাও-পন্থী একেই ধর্ম বলে মেনে নিতে পারবেন না। বেদের অনুগমনই যদি ধর্ম হয়, তাহলে মানতে হবে যে, ইহুদীধর্ম খৃষ্টানধর্ম ইসলামধর্ম শিখধর্ম অথবা ব্রাহ্মধর্ম কি উপজাতীয়দের ধর্ম, এরা নামেই ধর্ম, আসলে ধর্ম নয়।

ধর্মের এই পরিচয়কে গ্রহণ করলে আরো মানতে হবে যে, ব্যক্তিগত ধর্ম যাকে বলা হয়, তা মোটেই ধর্ম নয়। ধর্মের ব্যাপারে ব্যক্তির পছন্দ-অপছন্দের, ইচ্ছা-অনিচ্ছার প্রশ্নই ওঠে না। কেননা বেদ অপৌরুষের এবং ধর্মবিধি শাশ্বত।

আরো মানতে হবে যে ধর্ম মূলত কর্মাত্মক। এখানে স্বাধীন চিন্তা বা স্বকীয় উপলব্ধির কোনো ভূমিকা নেই।

ধর্মের ক্ষেত্রে স্বাধীন চিন্তা, ও স্বকীয় উপলব্ধির স্থান আছে কি না, ব্যক্তিগত ধর্ম আদৌ ধর্ম কি না, এ প্রশ্ন অতি বিতর্কসংকুল। আমাদের আলোচনায় এ প্রসঙ্গটি বার বার আসবে। আপাতত এ প্রসঙ্গ এখানে স্থগিত রাখা ভালো, অন্যথায় প্রসঙ্গচ্যুতি ঘটবে। আপাতত আমাদের প্রশ্ন ধর্মের সাধারণ পরিচয় নিয়ে।

ধর্ম কথাটার একটা ব্যুৎপত্তিগত অর্থ আছে: যা ধারণ করে, যা পোষণ করে। মানুষের ধর্ম হল তাই যা মানুষকে যথার্থ মানুষ করে, যা ব্যক্তির এবং সমাজের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ করে। এর পরেই প্রশ্ন আসে, মানুষকে কে ধারণ করে, কে পোষণ করে, কে মানুষের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ করে? কাকে বলব মানুষের কল্যাণ? যদি বলি মনুষ্যত্ব, যেমন রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, তাহলেও ব্যাখ্যা দরকার। মনুষ্যত্ব যদি ধর্মের সমার্থক শব্দ মাত্র হয়, তাহকে কিছুই বলা হল না। তা যদি না হয় তাহলে মনুষ্যত্বের ব্যাখ্যা চাই। রবীন্দ্রনাথ নানা রচনায় সে ব্যাখ্যা দিতে চেষ্টা করেছেন। তাঁর প্রথম দিকের ব্যাখ্যা, যেমন 'ধর্ম' বইয়ের 'মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধে (২২ নং রচনা) যে ব্যাখ্যা পাই, তার সঙ্গে শেষের দিকে ব্যাখ্যা, যেমন 'মানুষের ধর্ম' বইয়ের (১৪২-৪৬ নং রচনা) ব্যাখ্যা হুবহু মিলবে না।

ধর্ম কথাটার একটা অর্থ হল কোনো কিছুর নিজত্ব, তার স্ব-ভাব, তার প্রকৃতির সারাৎসার, যাকে বলতে পারি তার essence। যখন মানুষের ধর্ম মনুষ্যত্ব বলি, তখন এই অর্থেই তা বলি। যেমন বলি আগুনের ধর্ম অগ্নিত্ব বা দাহিকাশক্তি। জড়বস্তুর স্বভাব কী তা ধরা বিজ্ঞানে হয়তো সম্ভব, বিজ্ঞান তার ভার নিতে পারে। প্রাণীর স্বভাব ধরা সহজ নয়। আরো অনেক কঠিন মনযুক্ত প্রাণীর স্বভাব ধরা। প্রশ্নটা যখন মানুষের স্বভাবকে নিয়ে তখন খট্‌কা লাগে। শুধু স্বভাবকে ধরা নয়, আজকাল অনেকে প্রশ্ন তুলেছেন, মানুষ যে ধরণের সৃজনশীল প্রাণী, যেভাবে মানুষ অনবরত নিজের বেড়া ছাড়িয়ে যায়, তাতে তার কোনো নির্ধারিত স্থির অপরিবর্তনীয় স্বভাব আছে বলে মনে হয় না। মানুষ তো শুধু

সৃজনশীল নয়, মানুষ আত্মসৃজনশীল–সে নিয়ত নিজেকে নতুন করে' গড়তে গড়তে চলেছে। মানুষ জৈবতার বেড়া দিয়ে ঘেরা, কিন্তু তার আত্মসৃজনের কোনো বেড়া নেই। সব সৃজনের মতোই মানুষের আত্মসৃজনও মুক্ত ক্রিয়া, সে যে কোন্ পথ নেবে তা পূর্ব-নির্ধারিত নয়। প্রাণের যাত্রাপথে প্রতি মুহূর্তে চলতে চলতে মানুষ নতুন হয় এবং নতুন হতে হতে মানুষ চলে। পদে পদে তার স্বধর্ম পালটে যায়। আদিম গুহামানবের স্বভাব আর আইনস্টাইনের স্ব-ভাব কি এক? সেই আদিম মানবের সঙ্গে সক্রেটিস কি বুদ্ধ কি রবীন্দ্রনাথের স্বধর্মগত মিল কতটুকু? মিল যেটুকু পাব সে হয়তো শুধু জৈবতাতে এবং তার উত্তরণের প্রথম পদক্ষেপেই সীমাবদ্ধ।

যা ধারণ করে বা যা স্ব-ভাব, এই সব ব্যুৎপত্তিগত বিচার এক জিনিস আর কার্যক্ষেত্রের পরিচয় অন্য জিনিস। ধর্ম কথাটার একটা কার্যক্ষেত্রের অর্থ বা প্রতিদিনের ব্যবহারের অর্থ আছে, সেইটেই সুপরিচিত। যে অর্থে আমরা বলি ইহুদীধর্ম, খৃষ্টানধর্ম, কিংবা ইসলাম ধর্ম। এরা প্রত্যেকেই রিলিজন অর্থে ধর্ম। এদের প্রত্যেকেরই নিজ নিজ মত অনুযায়ী কিছু বিশ্বাস-সমাহার আছে, অর্থাৎ নির্দিষ্ট ক্রীড আছে, নির্দিষ্ট কতকগুলি বিষয়ে অনমনীয় রকমের আস্থা আছে। এই রকম বিশ্বাস-সমাহার, তর্কতীত স্বীকৃতি বা ক্রীড না থাকলে রিলিজন হয় না। হিন্দুধর্মে এই রকম কোনো অবশ্যমান্য বিষয়-সমাহার নেই, তাই হিন্দুধর্ম রিলিজন নয়। খৃষ্টান ধর্ম, ইসলাম ধর্ম, এরা সুসংবদ্ধ প্রাতিষ্ঠানিক ধর্ম। হিন্দুধর্ম প্রতিষ্ঠানিক কিন্তু সুসংবদ্ধ নয়। বরং বৈষ্ণবধর্ম শাক্তধর্মকে খানিকটা সুসংবদ্ধ বলা যায় এবং কিছু ক্রীড আছে বলে রিলিজনও বলা যায়। হিন্দুধর্ম ততটাই রিলিজন যতটা সে প্রতিষ্ঠানিক এবং প্রকাশ্যে না হোক প্রচ্ছন্নভাবে ক্রীড-শাসিত। বৌদ্ধধর্ম, জৈনধর্ম, শিখধর্ম, এমন কি হালের ব্রাহ্মধর্মও তাই, প্রাতিষ্ঠানিক, মোটামুটি সংবদ্ধ, ক্রীড-কেন্দ্রিক এবং সেই কারণে রিলিজন অর্থে ধর্ম। রিলিজন অর্থে ধর্মের ক্ষেত্রে সংস্কার সম্ভব, স্বাধীন ধর্মচিন্তা স্বম্ভব নয়, স্বানুভূতিমূলক ধর্মবোধের স্ফূর্তিও কঠিনভাবে সীমিত।

রবীন্দ্রনাথ ধর্মসংস্কারক নন। তাঁর ধর্মচিন্তার উৎস তাঁর নিজস্ব ধর্মবোধ। উপনিষদ তাঁর আশ্রয় হতে পারে, কিন্তু উপনিষদ ক্রীড নয়। উপনিষদ থেকে দোহন করে ব্রাহ্মধর্ম যদি কোনো ক্রীড রচনা ক'রে থাকে, রবীন্দ্রনাথ তাকে শাস্ত্রীয় বিধিবাক্য হিসেবে শিরোধার্য করে নেন নি। সহজেই বোঝা যায়, রবীন্দ্রনাথের ধর্মচিন্তা রিলিজন নিয়ে চিন্তা নয়।

কিন্তু আপাতত আমরা রিলিজন অর্থে ধর্মের কথাই বলছি। এখানে একটা কথা পরিষ্কার ক'রে নেওয়া দরকার। ধর্ম তো অনেক। বৌদ্ধধর্ম, খৃষ্টানধর্মও ধর্ম, আদিম নরগোষ্ঠীর ধর্মও ধর্ম, এদেশের যে কোনো উপজাতির ধর্মও ধর্ম। তাহলে ধর্ম কি একটা জাতিবাচক নাম, আর বৌদ্ধধর্ম, খৃষ্টানধর্ম, ইসলামধর্ম এরা কি বৃহৎ জাতির এক একটি সভ্য? যেমন পর্বত এই জাতিতে পড়ে হিমালয়, হিন্দুকুশ, কারাকোরাম, কি আল্পস্, কি আন্ডিস। কিংবা যেমন নদী এই জাতির মধ্যে পড়ে গঙ্গা যমুনা কৃষ্ণা কাবেরী ভলগা কি জাম্বেসী। পর্বতের মধ্যে আয়তনের পার্থক্য থাকতে পারে, কিন্তু সবাই নিঃসংশয়ে পর্বত। নদীর মধ্যে দৈর্ঘ্যে বা জলপ্রবাহে ফারাক থাকতে পারে, কিন্তু একথা বলি না যে গঙ্গাই আসল নদী, আর বাকি কোনোটাই যথার্থ নদী নয়, অন্তত কোনোটাই নিজের নদীত্বে সার্থক নয়। ধর্ম কিন্তু এই অর্থে জাতিবাচক নয়। ধর্ম জাতিবাচক তখন যখন

আমরা একেবারে বাইরের থেকে ধর্মকে দেখি। যেমন ধর্ম জাতিবাচক ধর্মবিজ্ঞানীর কাছে। কিন্তু অধিকাংশ লোকই যেহেতু কোনো-না-কোনো ধর্ম-অবলম্বী, তাই সাধারণভাবে আমরা ধর্মগুলিকে ধর্মবিজ্ঞানীর মতো নিরাসক্ত দৃষ্টিতে বাইরের থেকে দেখি না। যেহেতু আমাদের ধর্মকে দেখা বিশেষ ধর্মের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা, তাই তা পর্বত বা নদীকে দেখার মতো অবজেকটিভ দেখা নয়।

তাই ধর্মের ক্ষেত্রে দেখা যায় ধর্মের বাইরের চেহারাটাই জাতিবাচক শব্দের মতো, ব্যবহারে তা নয়। ধর্মের ক্ষেত্রে এক ধর্মের লোক অন্য ধর্মকে প্রায়ই ষোলো আনা ধর্ম বলে বা যথার্থ ধর্ম বলে গণ্য করেন না। তাঁর মতে ধর্ম আসলে একটাই, বাকিগুলি ভ্রান্ত, মিথ্যা, অথবা ছলনা। অথবা নিতান্ত অপরিণত একটা স্থূল প্রয়াস। অন্য ধর্মাবলম্বীকে মুসলমান বলবেন কাফের, খৃষ্টান বলবেন হীদেন, হিন্দু বলবেন ম্লেচ্ছ। শব্দগুলি অধমত্বসূচক। বেশির ভাগ সময়ই কার্যক্ষেত্রে ঘৃণাসূচক। 'যত মত তত পথ'—বলার উদার ভংগীটি হালের আমদানী। এটি সাধারণ মনোভাব নয়, ব্যতিক্রমস্থানীয় মনোভাব। এটি ইতিহাসের সত্য নয়, দু-একটি সাধুলোকের স্বপ্ন। বিধর্মীকে শত্রু গণ্য করা, পরধর্মকে উচ্ছেদযোগ্য মনে করা, এর নিদর্শনেই মানবজাতির এতকালের ইতিহাস পরিপূর্ণ। আমরা জানি, অনেক সময়ই ধর্মের সংগে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক স্বার্থ জড়িয়ে যায়, সেই স্বার্থ পরধর্মবিদ্বেষের মূলে ক্রিয়া করে। কিন্তু সেই সংগে এই দৃঢ় বিশ্বাসও সব সময় মনের মধ্যে ক্রিয়া করে যে, পরধর্ম তত্ত্বগতভাবেও অধর্ম, ব্যবহারিকভাবেও অধর্ম, তা মানবজাতির পক্ষে অবশ্য-পরিহার্য পথ। আমরা পেগনধর্মী রোমানদের খৃষ্টানবিরোধিতার কথা জানি। খৃষ্টানদের পরধর্মবিরোধ, বিভিন্ন উপনিবেশে স্থানীয় ধর্মের উচ্ছেদচেষ্টা, এমন কি নিজেদের মধ্যে ক্যাথলিক-প্রোটেস্টান্ট বিরোধ, ইনকুইজিশন, এ সব দীর্ঘ রক্তাক্ত ইতিহাস সর্বজনবিদিত। তেমনি সর্বজনবিদিত ইসলামের পরধর্ম অসহিষ্ণুতা, পরধর্মবিদ্বেষ, তার রক্তকর্দম-চিহ্নিত ধর্মজিয়ের ইতিহাস। হিন্দুধর্মকে সচরাচর তৃণভোজী জাতের নিরীহ ধর্ম বলে গণ্য করা হয়। কিন্তু হিন্দু-বৌদ্ধ সক্রিয় এবং সহিংস বিরোধ যে সুদীর্ঘকাল ভারতবর্ষের ইতিহাসকে কীভাবে কলংকিত করেছে তা-ই বা আজ কার অবিদিত?

ধর্মগুলির পরস্পর-অসহিষ্ণুতা বা-সহিষ্ণুতার বিষয়ে হিন্দু-মুসলমান প্রসংগে রবীন্দ্রনাথ যে মন্তব্য করেছেন তা এখানে প্রণিধানযোগ্য। ১৩২৯ (১০২২) সালের ৭ আষাঢ় তারিখে কালিদাস নাগকে লেখা চিঠিতে (কালান্তর, 'হিন্দু-মুসলমান' ১নং প্রবন্ধ, র/১৩/৩৫৬-৫৮) রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—

"...পৃথিবীতে দুটি ধর্মসম্প্রদায় আছে অন্য সমস্ত ধর্মমতের সংগে যাদের বিরুদ্ধতা অত্যুগ্র—সে হচ্ছে খৃষ্টান আর মুসলমান ধর্ম। তারা নিজের ধর্মকে পালন করেই সন্তুষ্ট নয়, অন্য ধর্মকে সংহার করতে উদ্যত। এইজন্য তাদের ধর্ম গ্রহণ করা ছাড়া তাদের সংগে মেলবার অন্য কোনো উপায় নেই। খৃষ্টানধর্মাবলম্বীদের সম্বন্ধে একটা সুবিধার কথা এই যে, তারা আধুনিক যুগের বাহন; তাদের মন মধ্যযুগের গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ নয়। ধর্মমত একান্তভাবে তাদের সমস্ত জীবনকে পরিবেষ্টিত করে নেই। এইজন্য অপর ধর্মাবলম্বীদের তারা ধর্মের বেড়ার দ্বারা সম্পূর্ণ বাধা দেয় না।...হিন্দুজাতিও এক হিসাবে মুসলমানদেরই মতো। অর্থাৎ তারা ধর্মের প্রাকারে সম্পূর্ণ পরিবেষ্টিত। বাহ্য প্রভেদটা হচ্ছে এই যে, অন্য ধর্মের বিরুদ্ধতা তাদের পক্ষে সকর্মক নয়—অহিন্দু সমস্ত

ধর্মের সঙ্গে তাদের non-violent non-cooperation। হিন্দুর ধর্ম মুখ্যভাব জন্মগত ও আচারমূলক হওয়াতে তার বেড়া আরো কঠিন। মুসলমান ধর্ম স্বীকার করে মুসলমানের সঙ্গে সমানভাবে মেলা যায়, হিন্দুর সে পথও অতিশয় সংকীর্ণ। আহারে ব্যবহারে মুসলমান অপর সম্প্রদায়কে নিষেধের দ্বারা প্রত্যাখ্যান করে না, হিন্দু সেখানেও সতর্ক।...ভারতবর্ষের এমনি কপাল যে, এখানে হিন্দু মুসলমানের মতো দুই জাত একত্র হয়েছে–ধর্মমতে হিন্দুর বাধা প্রবল নয়, আচারে প্রবল; আচারে মুসলমানের বাধা প্রবল নয়, ধর্মমতে প্রবল। এক পক্ষের যে দিকে দ্বার খোলা, অন্য পক্ষের সে দিকে দ্বার রুদ্ধ। এরা কী করে মিলবে? এক সময়ে ভারতবর্ষে গ্রীক পারসিক শক নানা জাতির অবাধ সমাগম ও সম্মিলন ছিল। কিন্তু মনে রেখো, সে 'হিন্দু' যুগের পূর্ববর্তী কালে। হিন্দুযুগ হচ্ছে একটা প্রতিক্রিয়ার যুগ–এই যুগে ব্রাহ্মণ্যধর্মকে সচেষ্টভাবে পাকা করে গাঁথা হয়েছিল। দুর্লঙ্ঘ আচারের প্রাকার তুলে একে দুষ্প্রবেশ্য করে তোলা হয়েছিল।"

এর পর হিন্দু মুসলমান কেমন করে কোন্ অবস্থায় মিলতে পারে সেই কথা তুলেছেন। আপাতত আমাদের সে প্রসঙ্গে প্রয়োজন নেই। আমাদের প্রসঙ্গ ধর্মবিশেষের সত্য পন্হা হিসেবে অদ্বিতীয়ত্বের দাবী এবং সেই সূত্রে অন্য ধর্মের প্রতি অসহিষ্ণুতা। শুধু খৃষ্টান মুসলমান নয়, পরধর্মের হীনতা তত্ত্বগতভাবে সব ধর্মেই স্বীকৃত, পরধর্মবিদ্বেষ কোথাও সকর্মক কোথাও অকর্মক।

আমরা কালান্তরের 'হিন্দুমুসলমান' প্রবন্ধ থেকে যে অংশটি উদ্ধৃত করেছি তার পরের আর একটি বাক্য হল–'হিন্দুমুসলমানের মিলন যুগ-পরিবর্তনের অপেক্ষায় আছে।' কথাটার তাৎপর্য এই যে যুগপরিবর্তন ঘটলে হিন্দু আর আচার-সর্বস্ব অসহযোগী হিন্দু থাকবে না, মুসলমান আর অন্য ধর্মকে সংহারে উদ্যত থাকবে না, তখন মিলন সম্ভব হবে। যুগপরিবর্তনের কথায় রবীন্দ্রনাথ আশ্বাস দিয়ে বলেছেন (তদেব), "কিন্তু একথা শুনে ভয় পাবার কারণ নেই–কারণ, অন্য দেশে মানুষ সাধনার দ্বারা যুগপরিবর্তন ঘটিয়েছে...।" এই একই প্রবন্ধের গোড়ার দিকে খৃষ্টান ধর্মাবলম্বীদের সম্পর্কে বলেছেন যে যুগপরিবর্তনের ফলে খৃষ্টানরা বদলে গিয়েছে। বলেছেন, 'তারা আধুনিক যুগের বাহন।' বলেছেন যে, আধুনিক যুগচেতনার শরিক বলে তাদের ক্ষেত্রে অপর ধর্মের প্রতি বিদ্বেষ নেই অথবা হ্রাস পেয়েছে।

বোঝা কঠিন নয় যে, শুধু হিন্দুর ক্ষেত্রে বা মুসলমানের ক্ষেত্রে নয়, শুধু খৃষ্টানের ক্ষেত্রে নয়, রবীন্দ্রনাথ মনে করেন যে, সব ধর্মের মানুষই যদি আধুনিক যুগচেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে ওঠে, তাহলে ধর্মদ্বন্দ্বের বীভৎস উগ্রতা হ্রাস পাবে, হয়তো ক্রমে লুপ্তও হবে। এটা কোনো ধর্মবিশেষের কথা নয়, যেখানে মনোভাব মধ্যযুগীয় সেখানে আত্মধর্মে আস্থা এবং সমানুপাতিকভাবে পরধর্মে সন্দেহ ও বিতৃষ্ণা প্রায় তত্ত্বগতভাবেই অনিবার্য। প্রাতিষ্ঠানিক বা সাম্প্রদায়িক ধর্মে এটা আপাতিক নয়। মধ্যযুগে যেখানেই এর ব্যতিক্রম দেখতে পাব, যেখানেই ধর্মের ক্ষেত্রে উদারতা দেখতে পাব, তা সে কবীর রজ্জব যার ক্ষেত্রেই হোক না কেন, যেখানেই দেখব রিলিজন আর ঠিক রিলিজন নেই, তা অসাম্প্রদায়িক এবং উপলব্ধি-প্রধান চেহারা নিয়েছে।

ধর্ম অর্থাৎ রিলিজন স্বার্থের কাজেও লাগে, আবার পরমার্থের কাজেও লাগে। পরধর্মদ্বেষী ধার্মিক যদি গোপন স্বার্থান্বেষী না হয় তাহলে বুঝতে হবে তাঁর মন মধ্যযুগে পড়ে আছে। স্বার্থের কথাটা রবীন্দ্রনাথ এখানে বলেন নি, কিন্তু মধ্যযুগীয় বা অনাধুনিক

মনের কথাটা রবীন্দ্রনাথ স্পষ্ট করেই বলেছেন। রবীন্দ্রনাথের কথা থেকে আমরা কি এই রকম সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে, সাম্প্রদায়িক ধর্মের, নির্দিষ্ট ক্রীড-আশ্রিত এবং ভিন্ন-ক্রীডে-বিমুখ রিলিজনের অবলম্বন হল মধ্যযুগীয় মন? এবং যতক্ষণ এই মন অপরিবর্তিত থাকবে, যতক্ষণ গভীর অর্থে যুগপরিবর্তন না ঘটবে, ততক্ষণ ধর্মদ্বন্দ্বের অবসান হবে না?

হিন্দুধর্ম রিলিজন নয়, তাই হিন্দুর পক্ষে অপরকে ধর্মান্তরিত করার কোনো স্বাভাবিক আকর্ষণ নেই। কিন্তু রিলিজন মাত্রেরই তা আছে, এবং থাকাই স্বাভাবিক। প্রতিষ্ঠানের লজিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে বড়ো হওয়া, সম্প্রদায়ের লজিক সম্প্রদায় হিসেবে শক্তিশালী হওয়া, ধার্মিকের লজিক অপরকে ধর্মপথে টেনে আনা। আসতে অনিচ্ছুক হলে তার কল্যাণের জন্যই তার এই দূষিত অনিচ্ছাকে প্রশ্রয় না দেওয়া। যে-কোনো প্রতিষ্ঠান, বা সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রেই তাই। ইসলামের এই মনোভাব, এই অলজ্জিত ও অকপট মিশনারী উৎসাহ বহু-বিজ্ঞাপিত। কিন্তু এই উৎসাহ খৃষ্টান মিশনারীদেরও আছে, অন্যান্য রিলিজনেরও আছে। রিলিজন যদি একটাই থাকত, সমস্যা ছিল না। কিন্তু রিলিজন অনেক। সেক্ষেত্রে এই স্বাভাবিক ইচ্ছাই ধর্মদ্বন্দ্বের রাজপথ হয়ে দাঁড়ায়। বোধকরি এই জন্যই রবীন্দ্রনাথ মনের বদলের কথা বলেছেন, এবং তার অপরিহার্য শর্ত হিসেবে যুগের বদলের কথা বলেছেন।

কিন্তু মনের বদল হলে রিলিজনের কাছে কি আমাদের চাওয়া এবং পাওয়া বদলে যাবে না? মনের বদল হলে ধর্মের (রিলিজনের) চেহারা বদলে যাবে না? ধর্মের চরিত্র বদলে যাবে না? মনের বদলে যখন ধর্মের সাম্প্রদায়িক ও প্রাতিষ্ঠানিক বিশেষত্বগুলির জোর কমে যাবে, তখন কি আর ধর্ম সঠিক অর্থে রিলিজন থাকবে? তাহলে রবীন্দ্রনাথ কি এই ইঙ্গিত করছেন যে, প্রাতিষ্ঠানিক ধর্ম মধ্যযুগের, আধুনিক কালে তা কালাতিক্রান্ত, অতীতের জের? রবীন্দ্রনাথের ইঙ্গিত খুব অস্পষ্ট নয়, কিন্তু এ বিষয়ে বিস্তৃত করে কিছু বলেন নি। যিনি মানবসভ্যতার ঐক্যে আস্থাশীল, কোনো ক্ষেত্রেই মূলগত ভিন্নতায় তাঁর আস্থা থাকতে পারে না। ধর্ম রবীন্দ্রনাথের কাছে যেমন ব্যক্তিগত, তেমনি সর্বগত, কিন্তু সম্প্রদায়গত মোটেই নয়। পরিণত বয়সে সাম্প্রদায়িক ধর্মের বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথের অভিমত ক্রমশই তীব্র হয়ে উঠেছে তা আমরা সকলেই জানি। যদিও এক সময় রবীন্দ্রনাথ খানিকটা সাম্প্রদায়িকভাবেই নিজেকে ব্রাহ্ম বলে গণ্য করেছিলেন, কিন্তু তা তাঁর স্বভাববিরুদ্ধ এবং নিতান্তই সাময়িক। কম বয়সের অনেক রচনাতেও সাম্প্রদায়িক ধর্মের সম্পর্কে তাঁর অকুণ্ঠ বিরুদ্ধতা দেখতে পাওয়া যাবে। যেমন 'ধর্ম' বইয়ের 'ধর্মের সরল আদর্শ' প্রবন্ধে (১৩০৯ মাঘ, ১৯০৩, সংকলনের ১৯ নং রচনা)কিংবা ওই বইয়ের 'ধর্মপ্রচার' প্রবন্ধে(১৩১০ ফাল্গুন, ১৯০৪ সংকলনের ২৩ নং রচনা)। এই শেষোক্ত প্রবন্ধটিতে রবীন্দ্রনাথ জোর দিয়ে বলেছেন (র/১২/৪১), "...ধর্মও যখন সম্প্রদায়বিশেষে বদ্ধ হইয়া পড়ে তখন তাহা সম্প্রদায়স্থ অধিকাংশ লোকের কাছে, হয় অভ্যস্ত অসাড়তায় নয় অভ্যস্ত সম্মোহনে পরিণত হইয়া থাকে।...ধর্মরক্ষা ও ধর্মপ্রচারের ভার তাহারাই গ্রহণ করে।"

এক সময় যখন মানুষে মানুষে যোগাযোগ বাধাগ্রস্ত ছিল, মানুষের কাছে পর্বত যখন দুর্লঙ্ঘ এবং সমুদ্র যখন দুস্তর ছিল, অপরিচিত মাত্রেই যখন শত্রু ছিল, সেই সময় হয়তো সাম্প্রদায়িক ধর্মের কিছু উপযোগিতা ছিল। আজ কেন, অনেক আগেই সে উপযোগিতা

হারিয়ে গিয়েছে, সাম্প্রদায়িক ধর্ম এখন সন্দেহ অবিশ্বাস ঈর্ষা ও লোভের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েছে। নেশনের ক্ষেত্রে যেমন হয়েছে। বিশেষ স্থানিক ও কালগত কারণে নেশন হয়তো একদিন সত্য ছিল। রবীন্দ্রনাথ মনে করেন, এখন নেশন কালাতিক্রান্ত, এবং ক্রমেই তা দানবিক হয়ে উঠছে। নেশন খুব দূর অতীতের প্রেত নয়, নিকট অতীতের প্রেত। কিন্তু সাম্প্রদায়িক ধর্ম বহুদূর-অতীতের সম্মোহন।

প্রাতিষ্ঠানিক ধর্ম যে প্রতিষ্ঠানকে অবলম্বন করে, সেই প্রতিষ্ঠানকে অবলম্বন করেই সম্প্রদায় গড়ে ওঠে। কাজেই প্রাতিষ্ঠানিক ধর্ম আর সম্প্রদায়িক ধর্ম অচ্ছেদ্যভাবে সম্পর্কিত। সাম্প্রদায়িক ধর্মে অনাস্থা বলেই কি রবীন্দ্রনাথ ব্যক্তিগত ধর্মের দিকে ঝুঁকেছেন? এ রকম বললে খুব ভুল হবে না। কিন্তু বিষয়টাকে যেন আমরা অতিসরলীকৃত করে না দেখি। কেননা, এর উল্টো দিকটাও সত্য। অর্থাৎ এ-ও সমান সত্য, সম্ভবত আরো বেশি সত্য যে, ব্যক্তিগত ধর্মের প্রতি আকর্ষণ অতি গভীর বলেই সাম্প্রদায়িক বা প্রাতিষ্ঠানিক ধর্ম রবীন্দ্রনাথের মনকে কখনোই তেমনভাবে টানতে পারে নি।

হয়তো বাল্যের পরিবেশও তার অনুকূল ছিল। 'আত্মপরিচয়' গ্রন্থে পরিবেশ সম্পর্কে তিনি নিজেই বলেছেন (র/১০/২০৭)–

"যে সংসারে প্রথমে চোখ মেলেছিলুম সে ছিল অতি নিভৃত।...

"আমাদের পরিবার আমার জন্মের পূর্বেই সমাজের নোঙর তুলে দূরে বাঁধাঘাটের বাইরে এসে ভিড়েছিল। আচার অনুশাসন ক্রিয়াকর্ম সেখানে সমস্তই বিরল।"

কিছুকাল পরে 'পত্রপুট'-এর ১৫ সংখ্যক কবিতায় এই পরিবেশের সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে নিয়ে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন (র/৩/৩৭৯, সংকলনের ১৫৫ নং রচনা)–

"যখন বালক ছিলেম ছিল না কেউ সাথি,
দিন কেটেছে একা একা
চেয়ে চেয়ে দূরের দিকে।
জন্মেছিলেম অনাচারের অনাদৃত সংসারে,
চিহ্ন-মোছা, প্রচীরহারা।
প্রতিবেশীর পাড়া ছিল ঘন বেড়ায় ঘেরা,
আমি ছিলেম বাইরের ছেলে, নাম-না-জানা।
ওদের ছিল তৈরি বাসা, ভিড়ের বাসা–
ওদের বাঁধা পথের আসা-যাওয়া
দেখেছি দূরের থেকে
আমি ব্রাত্য, আমি পঙ্‌ক্তিহারা।"

এক সময় রবীন্দ্রনাথের মনে এই আস্থা ছিল যে প্রাতিষ্ঠানিকতা, সাম্প্রদায়িকতা এ সব থেকে হিন্দুধর্ম মুক্ত। উৎসাহের সঙ্গে তিনি ঘোষণা করেছিলেন (ধর্মপ্রচার, ধর্ম, র/১২/৪১, ৩২ নং রচনা), "আমাদের ধর্ম রিলিজন নহে।" কিন্তু সত্যিই কি হিন্দুধর্ম প্রাতিষ্ঠানিকতা থেকে মুক্ত, সাম্প্রদায়িকতা থেকে মুক্ত? হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা কিংবা হিন্দু-রাজনীতি কি তার ভূরি ভূরি বিপরীত প্রমাণ আমাদের সামনে উপস্থিত করে না?

পরের দিকে হিন্দুধর্মের উদার সর্বজনীনতা সম্পর্কে এই মোহ আর রবীন্দ্রনাথের ছিল

না। একটু আগেই আমরা দেখেছি, ''কালান্তর'-এর 'হিন্দুমুসলমান'(১) প্রবন্ধে জোর দিয়ে বলেছেন, ''...হিন্দুজাতিও এক হিসাবে মুসলমানদেরই মতো।...বাহ্য প্রভেদটা হচ্ছে এই যে, অন্য ধর্মের বিরুদ্ধতা তাদের সকর্মক নয়।''

হিন্দুধর্মকে অনেক সময় ব্রাহ্মণ্যধর্ম বলা হয়। আসলে হিন্দুধর্ম অনেক রিলিজনের একটা অবিন্যস্ত ও শিথিল-গ্রথিত সমাহার। ব্রাহ্মণ্যধর্ম কতটা এই বিচিত্র সমাহারে অন্যতম সভ্য, কতটা-বা এই সমাহারের সর্বঘটে বিস্তৃত একটি প্রভাব-বলয়, কোথায় প্রবলভাবে সক্রিয় কোথায়-বা মৃদু এবং নিস্তেজ, তা স্পষ্ট ক'রে নির্ধারণ করা অতি কঠিন কাজ। এই বিস্তৃত প্রভাব-বলয়ের মধ্যে যে-মিথলজিপুঞ্জের এলাকায় যার আবস্থান, তাকে নিয়েই তার সম্প্রদায়িকতা। হালে যে এলাকার সঙ্গে যার অর্থনৈতিক রাজনৈতিক বা সামাজিক স্বার্থ জড়ানো, সেই এলাকাকে নিয়েই তার সাম্প্রদায়িকতা।

একথা স্বীকার করতে হবে যে, রিলিজন বা প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মকে এইভাবে দেখাটা বাইরের থেকে দেখা, ভিতর থেকে দেখা নয়। ঐতিহাসিক, নৃতত্ত্ববিদ, সমাজবিজ্ঞানী, মনোবিজ্ঞানী,এঁরা হয়তো ধর্মকে এই রকম বাইরের থেকে দেখতেই অভ্যস্ত। কিন্তু এই দেখাই যে একমাত্র দেখা তা কেমন করে বলা যাবে? রিলিজনে যিনি স্থিত তিনি বলবেন, আমার ধর্মে অর্থাৎ সত্যধর্মে স্থিত হলে তবেই ধর্মকে চেনা যায়, নইলে যায় না।

বাঁধা-পথের ধর্মকে যিনি বাহ্য আচার বলে মনে করেন, আচার-অনুষ্ঠান পূজা-উপাসনাকে যিনি ধর্মের খোলস বলে মনে করেন, ধর্মকে যিনি একান্তভাবে মনের জিনিস বলেই জানেন, যূথবদ্ধ রিলিজন-চর্চায় তাঁর অনাগ্রহ স্বাভাবিক। তাঁর কাছে ধর্ম একেবারে নিভৃতের জিনিস। তিনি বলবেন, ধর্ম হল একলার সাধনা। খানিকটা এই বোধ থেকেই বোধকরি হোয়াইটহেড বলেছিলেন, ধর্ম মানুষের নিজেকে নিয়ে, নিজের একাকিত্বকে নিয়ে। হোয়াইটহেড বলেছেন, ধর্ম হল মানুষের নিজের নিঃসঙ্গতার সঙ্গে বোঝাপড়া।

কথাটা যে সর্বৈব ভুল এমন বলা যায় না। নিঃসঙ্গতার ভার বড়ো সহজ ভার নয়। এ কথা ঠিক যে নিঃসঙ্গতা সব সময়ই বধির, সব সময়ই গহন, যেন পারাপারের আশ্বাসহীন। কিন্তু বোঝাপড়া তো পার হবারই চেষ্টা। বোঝাপড়া হল সেতুনির্মাণ, নিঃসঙ্গতাকে অতিক্রম করার চেষ্টা, অপরের সঙ্গে মেলার চেষ্টা। ধর্ম মানুষের অনেক রকম পিপাসাকে মেটাবার প্রতিশ্রুতি বহন করে। তার মধ্যে একটা বড়ো প্রতিশ্রুতি হল মিলিয়ে দেবার প্রতিশ্রুতি। সঙ্গকে খোঁজে বলেই হয়তো মানুষ ধর্মকে খোঁজে। কিন্তু সে ধর্ম কি একলার ধর্ম?

বিভিন্ন রিলিজনের মধ্যে কি কোনো সাধারণ সত্য নেই? তা না থাকলে এদের সকলকেই রিলিজন বলি কেন? সকলকেই ধর্ম বলি কেন? রিলিজন আর ব্যক্তিগত ধর্ম এদের মধ্যেও নিশ্চয়ই কোনো সাধারণ সত্য আছে এবং আছে বলেই এই দুই ব্যাপারকে আমরা অনেক সময়ই গুলিয়ে ফেলি, অথবা মিলিয়ে দেখি। নানা দেশের নানা কালের নানা সাধকের ব্যক্তিগত ধর্মচিন্তা বা ধর্মসাধনার মধ্যেও আমরা সাধারণ সত্য খুঁজে পেতে চাই। এই সাধারণ সত্যকেই যদি আমরা ধর্মের মৌল ভূমি বলে ধরি?

এই মূল সত্যের প্রশ্নে আবার আমরা ধর্ম কথাটার ব্যুৎপত্তিগত অর্থের প্রসঙ্গে এবং স্ব-ভাব-এর প্রসঙ্গে এসে পড়ব। এই বিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁরা 'ধর্মতত্ত্ব' গ্রন্থে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। তাঁর সারকথা হল এই যে, মানুষের মধ্যে শারীরিকী, জ্ঞানার্জনী,

চিত্তরঞ্জিনী ও কার্যকারিণী যে সব বৃত্তি আছে তাদের অনুশীলন, সর্বাঙ্গীণ বিকাশ, তাদের সামঞ্জস্যসাধন, ও তাদের ঈশ্বরমুখিতা, এই হল মানুষের ধর্ম। বলেছেন যে, মনুষ্যত্ব হল অনুশীলনের দ্বারা মানুষের সর্বাঙ্গীণ পরিণতি। এই পরিণতিতে পৌঁছনোর প্রয়াসই মানুষের ধর্মচেষ্টা। বলেছেন (বঙ্কিমরচনাবলী, ২য় খন্ড, সাহিত্য সংসদ, পৃ. ৫৯১), "উদ্ভিদের পক্ষে কর্ষণ যাহা, মানুষের পক্ষে স্বীয় বৃত্তিগুলির অনুশীলন তাই।... 'মানববৃত্তির উৎকর্ষণেই ধর্ম'।" ধর্মের প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র স্বাস্থ্যচর্চা জ্ঞানচর্চা শিল্পচর্চা ও কর্মচর্চার কথা বলেছেন, মনুষ্যপ্রীতি পশুপ্রীতি স্বজনপ্রীতি স্বদেশপ্রীতি এমন কি আত্মপ্রীতির কথাও বলেছেন, দয়ার কথা বলেছেন এবং সকলের উপরে ঈশ্বরভক্তির কথা বলেছেনে।

বঙ্কিমচন্দ্র নিঃসন্দেহে হিন্দু এবং প্রাতিষ্ঠানিকভাবেই হিন্দু। কিন্তু তাঁর অনুশীলনধর্মই কি হিন্দুধর্ম বা হিন্দুধর্মের সারাৎসার? বঙ্কিমচন্দ্রের প্রচারিত ধর্মতত্ত্বে হিন্দুধর্মের অনেক মূল্যবান কথা পাওয়া যাবে। কিন্তু বেদবিধির কথা বা হিন্দুর কৃত্যাদির কথা কিছু নেই। প্রতিষ্ঠান থাকলেই নানা রকম সংগঠন থাকবে, মন্দির মসজিদ গীর্জা থাকবে, বিহার মঠ আখড়া থাকবে, নানা রকম কৃত্যাদি থাকবে। এ সব বিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্র নীরব। বঙ্কিমচন্দ্রের অনুশীলন-ধর্মে পূজা-পার্বন নেই, পুরোহিত-তন্ত্র নেই, আচার-অনুষ্ঠান নেই, মন্দির-মঠ নেই। যদি একে হিন্দুধর্ম বলি, তো এ হল reformed, পরিশোধিত পরিমার্জিত হিন্দুধর্ম। পরিমার্জনা সাধিত হয়েছে যত-না শাস্ত্রবাক্যের দ্বারা, তার থেকে ঢের বেশি বঙ্কিমচন্দ্রর বিচারবুদ্ধির দ্বারা।

আসলে বঙ্কিমচন্দ্র হলেন ইংরেজি-শিক্ষিত, মিল্ এবংকোঁৎ-পড়া নব্য-হিন্দু। তাঁর বৃত্তি-কর্ষণাতত্ত্বের সঙ্গে স্মৃতি-অনুসারী ব্যবহারিক অর্থাৎ জীবিত হিন্দুধর্মের যোগ যৎসামান্য। আপাতদৃষ্টিতে যা-ই মনে হোক না কেন, বঙ্কিমচন্দ্রের অনুশীলন-ধর্মও মর্মগতভাবে ব্যক্তিগত ধর্ম, ঠিক যেমন রবীন্দ্রনাথের ঔপনিষদিক ধর্মসাধনা, বা তাঁর বৈষ্ণবীয় রাগাত্মিকা সাধনা, কিংবা তাঁর ব্রাত্য বাউলিয়া মনের-মানুষের সন্ধান, অথবা তাঁর মানবধর্ম। সুসংগঠিত ধর্মের বা রিলিজনের একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল যৌথতা, সেই যৌথতার অবকাশ বঙ্কিমন্দ্রেও নেই, রবীন্দ্রনাথেও নেই। একালের ভারতীয় ধর্মভাবুকদের মধ্যে সব থেকে বেশি যৌথতা মিলবে বিবেকানন্দে, যদিও তা আধুনিক যৌথতা, ঈষৎ ভিন্ন গোত্রের যৌথতা। ব্যক্তিগত কথা বিবেকানন্দের ধর্মভাবনায় প্রচুর, কিন্তু বিবেকানন্দের ধর্ম সংগঠিত ধর্ম,প্রতিষ্ঠান-কেন্দ্রিক মিশনারী ধর্ম, ব্যক্তিগত ধর্ম নয়। খাঁটি হিন্দুধর্ম কি না সে প্রশ্ন অবশ্যই উঠতে পার, কিন্তু সে আলোচনা দীর্ঘ এবং বিতর্কসংকুল, আমাদের পক্ষে তত প্রয়োজনীয়ও নয়।

বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর অনুশীলন-তত্ত্ব ব্যাখ্যাকালে কতকগুলি আদর্শের কথা বলেছেন। যেমন মনুষ্যপ্রীতি, পশুপ্রীতি, স্বদেশপ্রীতি, দয়া, ঈশ্বরভক্তি। মনে হয়, এই সব আদর্শকে অনেকেই সব ধর্মের সাধারণ সত্য গণ্য করবেন। শুধু সংগঠিত ধর্মের নয়, ব্যক্তিগত, ধর্মেরও। অনেকে হয়তো অন্যান্য নৈতিক আদর্শকেও এর সঙ্গে যুক্ত করে নেবেন। এই যদি হয় সব ধর্মের, সব রিলিজনের সাধারণ সত্য, তাহলে এইখানেই কি আমাদের ধর্ম-জিজ্ঞাসার উত্তর মিলতে পারে? পারে কি না সেইটেই বড়ো প্রশ্ন।

ঈশ্বরভক্তি অবশ্য অন্যান্য মানবিক আদর্শের থেকে গুণগতভাবেই পৃথক। তা হলেও ধর্মের প্রসঙ্গে আগে ঈশ্বরভক্তির কথাটাই মনে হয়। অনেকে তো

ঈশ্বরভক্তিকেই ধর্ম বলে দাবী করবেন। কিন্তু সেখানেও সমস্যা আছে। বৌদ্ধধর্মে জৈনধর্মে ঈশ্বরভক্তি নেই। পরবর্তীকালে মহাযানী বৌদ্ধধর্মে অনেক দেবদেবী আছে, কিন্তু ঈশ্বর নেই। গোড়ার দিকের বৈদিক ধর্মবিশ্বাসে, ম্যাক্স্মূলার যাকে Henothesim বা Kathenotheism, যার পরিচয় তিনি বলেছেন–the belief in individual gods alternately regarded as the highest, সেখানেও ঈশ্বরভক্তির অবকাশ নেই, আদৌ ভক্তির অবকাশ আছে কি না তাও বলা কঠিন। মীমাংসকেরা বেদ মানেন, যজ্ঞ মানেন, ঈশ্বর মানেন না। ঈশ্বরভীতি অনেক ধর্মে আছে, কিন্তু ভীতি আর ভক্তি আলাদা। ভক্তি বলতে যে প্রসন্ন পবিত্র বিগলিত আত্মসমর্পণ বোঝায়, ভক্তিতে যে আধ্যাত্মিক উপলব্ধি, ভয়ে তা নেই। অনেক ধর্মে দেবদেবীর সঙ্গে মানুষের অনেক স্বার্থের সম্বন্ধ আছে, কিন্তু ঈশ্বরও নেই, ভক্তিও নেই। অনেক ধর্মে অপদেবতা আছে, কোথাও-বা অপদেবতা দেবতার ছদ্মবেশ পরেছে, ভয় প্রচুর আছে, ভয় প্রশমনের জন্য অনেক জাদুধর্মী প্রয়াসও আছে, কিন্তু ভক্তির কথা ওঠে না। এ রকম ক্ষেত্রে কেমন করে ঈশ্বরভক্তিকে ধর্মের সার্বভৌম সত্য বলে, ধর্মমাত্রের অপরিহার্য লক্ষণ বলে গ্রহণ করা যায়?

ঈশ্বরভক্তিকে যদি বাদ দিই, তাহলে ধর্মের সার্বভৌম সত্য বলা যায় এমন আর কোনো লক্ষণ বা আদর্শ কি নেই? উন্নত নৈতিক আদর্শ অনেক সময়ই ধর্মের সহগামী। কিন্তু সব ধর্মেই যে তাকে পাওয়া যাবে তা নয়। বরং অনেক ধর্মের মধ্যে এই রকম দাবি দেখতে পাওয়া যায় যে ধর্ম সুনীতি-দুর্নীতির ঊর্ধ্বে। অনেক সময়ই দেখা যায়, ধর্ম শিল্পের প্রসার ঘটায়। তা থেকে মনে হয় সৌন্দর্য, নান্দনিক রস, সৃষ্টিশীলতা, এরা শুধু ধর্মের সহগামী নয়, এরা ধর্মের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে সম্পর্কিত। কেউ হয়তো বলবেন যে, নান্দনিকতা ধর্মের সার্বভৌম সত্যেরই অঙ্গ। ব্যক্তিগত ধর্ম সম্পর্কে কেউ যদি এ রকম বলেন, যেমন রবীন্দ্রনাথ কখনো কখনো বলেছেন, তা নিয়ে তর্ক করার কিছু নেই। কিন্তু চালু রিলিজনসমূহের প্রত্যেকটির মধ্যেই যে এই সৌন্দর্যবোধ বা নান্দনিকতার উৎস খুঁজে পাওয়া যাবে তা বলা যায় না। একথা মানি যে ধর্মের মধ্যে জ্ঞান ভাব কর্ম সবেরই স্থান আছে, কিন্তু এদের প্রত্যেকেরই আলাদা আলাদা ক্ষেত্র আছে। বিজ্ঞান শিল্প কর্মকান্ড এরা প্রত্যেকেই ধর্ম ছাড়া দাঁড়াতে পারে, প্রত্যেকেই স্বনির্ভর। আমাদের প্রশ্ন, ধর্মের নিজস্ব ভূমি কোন্‌টা যে ভূমিতে ব্যতিক্রমহীনভাবে সব ধর্মই পা রেখেছে? নৈতিকতাকে বা নান্দনিকতাকে তা বলা যায় না।

অনেকে আরো অনেক গুণ বা আদর্শের কথা বলেছেন। যেমন, ধরা যাক, মনুষ্যপ্রীতি, পশুপ্রীতি, মৈত্রী, করুণা, প্রেম ইত্যাদি। এর প্রত্যেকটিই যে সর্বধর্মে উপস্থিত তা নয়। এমন কি এর কোনো একটিও যে সর্বধর্মে অনিবার্যভাবে উপস্থিত এমনও বলা যায় না। অনেক ধর্ম আছে যা রিচুয়ালের অজস্রতায় অভাবিত সম্মোহনের সৃষ্টি করে, মিথ্-এর বৈভবে ভাবের আকাশকে বিচিত্র বর্ণে রঞ্জিত করে রাখে। যেমন হিন্দুধর্ম। অন্য দিকে নিস্তরঙ্গ বর্ণবিরল ধর্মও অনেক আছে। ব্যক্তিগত ধর্মের প্রবণতাই এই রকম বর্ণবর্জনের দিকে, রূপরসগন্ধস্পর্শের কুহকবর্জনের দিকে। বলা বাহুল্য, রবীন্দ্রনাথের ধর্ম এর ব্যতিক্রম। কিন্তু সেটা এখানে আমাদের প্রশ্ন নয়। প্রশ্ন ধর্মের বিচিত্র, সীমাহীন বহুবিধতা।

হিন্দুধর্মে পরলোক আছে, জন্মান্তর আছে, পাপমোক্ষণ ও পুণ্যার্জনের ব্যবস্থা

আছে, অনেক দেবদেবী আছে। এর কোন্‌টিকে বলব ধর্মের সার্বভৌম লক্ষণ? কোনোটিই না। কোনো ধর্মে বহু দেবদেবী, যেমন গ্রীক পেগান ধর্ম বা পৌরাণিক হিন্দুধর্ম। কোনো ধর্মে আবার দেবীর কোনো স্থান নেই, যেমন ইহুদী ধর্ম; খৃষ্টান ধর্ম,' মেরী-উপাসক শাখাকে যদি না ধরি। কিংবা যেমন ইসলাম ধর্ম। কোনো কোনো প্রাচীন ধর্মে দেবীই সব: কোথাও একজন মহামাতৃকা (Great Mother বা Mother Goddess), কোথাও-বা বহু মাতৃকার পূজা। পৃথিবীর সমস্ত ধর্মকে যদি ধরি, তথাকথিত সভ্যের ধর্ম এবং তথাকথিত অসভ্য সকলের ধর্মকেই যদি ধর্ম বলে গণ্য করি, যদি আদিম Animism, আদিম Totemism ও নানা গোত্রের জাদুবিশ্বাস-নির্ভর ধর্মকে গণনায় আনি, তাহলে দেখতে পাব, ধর্মের সংখ্যা গুণে শেষ করা যাবে না। তাদের স্বভাব এত বিচিত্র, তাদের চর্যা এত পরস্পরবিরোধী যে একমাত্র অবশ্যমান্যতার দাবি ছাড়া তাদের মধ্যে বোধ করি আর কোনো সাধারণ উপাদান নেই।

অনেকে অবশ্য বলবেন, ধর্ম হল যাকে বলতে পারি spirituality। স্পিরিচুয়াল কাকে বলব স্থির করা কঠিন। স্পিরিটে বিশ্বাস? ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষের আড়ালে বা ঊর্ধ্বে কোনো একটা অদৃশ্য মহত্তর সত্তায় আস্থা? ঐহিকতা থেকে উত্তরণ? এরই নাম কি আধ্যাত্মিকতা? অথবা অধ্যাত্মিকতা কি পরমাত্মায় বিশ্বাস এবং সেই বিশ্বাসের দ্বারা ঐহিক জীবনের নিয়ন্ত্রন? সত্তাকে স্থূল এবং পবিত্র, Profane এবং Sacred দুইভাগে ভাগ করে নিয়ে, পবিত্র বা Sacred-এর স্তরে উত্তীর্ণ বা অধিষ্ঠিত থাকা? ধর্মের ক্ষেত্রে স্পিরিচুয়ালিটি বা অধ্যাত্মিকতার দাবি অস্বীকার করি না, কিন্তু সে দাবি ব্যক্তিগত ধর্মের ক্ষেত্রে যতটা জোরালো, প্রতিষ্ঠানিক ধর্মের ক্ষেত্রে ততটা জোরালো নয়, তার বড়ো কারণ এই যে প্রতিষ্ঠান নিজেই একটা স্থূল ব্যাপার, তার শিকড়গুলোর বেশির ভাগই ঐহিকতাতে প্রবিষ্ট। তা ছাড়া, আমরা সকলেই জানি পৃথিবীতে বহু রিলিজন আছে যেখানে স্পিরিচুয়ালিটি কিংবা আধ্যাত্মিকতার নামগন্ধও খুঁজে পাওয়া যাবে না। স্পিরিচায়ালিটি খুঁজতে হলে তাকে খুঁজতে হবে ব্যক্তিবিশেষের হৃদয়ে, মন্দিরে মসজিদে গীর্জায় সিন্যাগগে নয়।

আগেই বলেছি, ধর্ম আমাদের নানা ক্ষেত্রের নানা রকম পিপাসা মেটায়, অথবা মেটাবে বলে আশ্বাস দেয়। যার কাছে যে পিপাসাটা বড়ো, ইচ্ছাপূরণ কল্পনার সহায়তায় ধর্ম তার কাছে সেই চেহারা নিয়ে দেখা দেয়। তাই ধর্মের এত রকম পরিচয়-পত্র, এত রকম সংজ্ঞা। সে যা-ই হোক, আমরা যদি মানুষের পিপাসার দিক থেকে ধর্মসন্ধানে অগ্রসর হই? আমরা যদি মানুষের মনের মধ্যে ধর্মের উৎস-সন্ধান করি? ধর্মের জন্মরহস্য আবিষ্কার করতে পারলে, সেইখানেই কি আমরা ধর্মের পরিচয়কে ধরে' ফেলতে পারব না?

পারব, কিন্তু সেইটেই যে ধর্মের একমাত্র পরিচয় বা আসল পরিচয়, তা না-ও হতে পারে। তবু জন্মসূত্রসন্ধানের, যাকে জেনেটিক সন্ধান বলতে পারি, তার অবশ্যই একটা মূল্য আছে। সেই পথে অনেক তাৎপর্যপূর্ণ সত্যও আবিষ্কৃত হয়ে যেতে পারে। শুধু এই কথাটা মনে রাখতে হবে যে, ধর্মের জেনেটিক পরিচয় অর্থাৎ জন্মরহস্যের পরিচয় আর ধর্মের স্বনির্ভর পরিচয় এক নয়।

নৃতত্ত্বের দিক থেকে দেখলে ধর্মের উৎস খানিকটা হয়তো ভয়ে আর খানিকটা হয়তো জাদুবিশ্বাসে। সেই ভয় যখন আজ অনেকটাই অপগত, সে জাদুবিশ্বাস যখন নেই,

এখনো কিন্তু তার সংস্কার রূপান্তরিতভাবে আমাদের জীবনে ক্রিয়া করছে। আর যদি মনস্তত্ত্বের দিক থেকে দেখি, মনের পিপাসা আকাঙ্ক্ষা উৎকণ্ঠার দিক থেকে দেখি? মনোবিজ্ঞানী ফ্রয়েড ধর্মকে এই দিক থেকেই দেখেছেন। নৃবিজ্ঞানী যে মৌল ভয়ের কথা বলেন, ফ্রয়েডও সেই ভয়কে স্বীকার করেন। কিন্তু স্বীকার করেন আদিম যুগের প্রেক্ষাপটে মনুষকে রেখে নয়, মানুষকে তার শৈশবের পরিস্থিতির মধ্যে রেখে। মানুষের উত্তর-জীবনে তার শৈশবপরিস্থিতির যে প্রক্ষেপ ঘটে, ফ্রয়েডের মতে সেইখানেই ধর্মের উৎস। শৈশবে মানুষ নিজের চূড়ান্ত অসহায় অবস্থা থেকে বাঁচবার জন্য–ভয় থেকে অভয়ে যাবার জন্য মনে মনে যে প্রয়াস করে, সেই প্রয়াসের মধ্যে পিতৃকল্পনা, রক্ষকশক্তির কলপনা একটা বড়ো ব্যাপার হয়ে ওঠে। এই মানসিক প্রয়াসই উত্তরজীবনে তার ধর্মভাবে রূপান্তরিত হয়। শৈশবের পিতৃকল্পনা সীমাহীনভাবে বিস্ফারিত হয়ে, নানা অপূর্ণতার সম্পূরক হয়ে মহারক্ষক ঈশ্বর রূপে উত্তরজীবনে আক্ষিপ্ত হয়, ফ্রয়েড মনে করেন পিতার এই ঈশ্বর হয়ে ওঠাই ধর্মের মূল। এই প্রসঙ্গে 'Civilization and its Discontents' বইয়ে ফ্রয়েড বলেছেন (১৯৩০, Hogarth Press, পৃ.৯), "The derivation of religious needs from the infant's helplessness and the longing for the father aroused by it seems to me incontrovertible, especially since the feeling is not simply prolonged from childhood days, but is permanently sustained by fear of the superior power of Fate."

ফ্রয়েডের এই ধর্মসিদ্ধান্ত ঠিক কি বেঠিক তা নিরূপণ করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়, তা আমাদের দায়িত্বও নয়। মাত্র দুটি মন্তব্য এখানে উপস্থিত করতে চাই। ফ্রয়েডের এই কথাটা তর্কাতীত যে, মানুষের আত্মশক্তি অতি সীমিত, ভাগ্যই বলি আর ঘটনাচক্রই বলি তার কাছে মানুষ নিতান্ত অসহায়। শৈশব উত্তীর্ণ হলেই এই অসহায়তা, এই অনিশ্চয়তা, এই ভয়ের অবসান হয় না। রোগ জরা প্রিয়বিচ্ছেদ অপ্রিয়সংযোগ মৃত্যু এদের কারো হাত থেকে মানুষের মুক্তি নেই। যেহেতু মানুষের আশা অসীম তাই তার আশাভঙ্গও অসীম। দুর্বল মানুষ যে সবল রক্ষকের কল্পনা করবে এটা খুবই স্বাভাবিক। এই অসহাতার বোধ, অনিশ্চয়তার বোধ ও ভয়, জন্মথেকে মৃত্যু পর্যন্ত আদিম অন্ধ দুরন্ত মৃত্যুভয়, যত ভালোবাসা তত আশঙ্কা, এই অন্ধকার অনুভূতি এতই সর্বজনীন ও সর্বকালিক যে, ফ্রয়েডের আরোপ-তত্ত্ব যদি সত্য হয় তাহলে এইখানে আমরা সর্বধর্মের একটা সাধারণ উৎস পেলেও পেতে পারি।

দ্বিতীয় মন্তব্য ফ্রয়েডের পিতৃতান্ত্রিক দৃষ্টি নিয়ে। পিতৃতান্ত্রিক সমাজে পিতা শক্তির কেন্দ্র হতে পারে, তাও সব সময় নয়। ফ্রয়েড কৃচিৎ-কখনো পিতামাতা দুজনের কথাই বলেছেন বটে, কিন্তু আসল জোরটা পিতার উপরেই। অথচ অনেক সময় মাতাই শক্তিমতী, মাতাই রক্ষয়িত্রী। মাতৃতান্ত্রিক সমাজের রক্ষয়িত্রী মাতাই হয়তো বিস্ফারিত হয়ে মাতৃকাদেবী হয়ে উঠেছিলেন। বৈদিক সমাজের দৃষ্টি পিতৃতান্ত্রিক, উপনিষদের ঈশ্বর পিতা, কিন্তু যে-কোন কারণেই হোক, পরবর্তী হিন্দুসমাজের দৃষ্টি অনেক বেশি মাতৃমুখী। দুই সমাজের দেবকল্পনায়, দুই সমাজের ধর্মভাবনায় দুই ভিন্ন সমাজ-সংগঠনের ছাপ স্পষ্ট।

ফ্রয়েড মনে করেন, শিশুর পিতৃকল্পনা, তার বিস্ফার এবং বয়স্কের ঈশ্বরকল্পনা

কোনোটাই কোনো বাস্তব সত্যে আমাদের পৌঁছে দেয় না। এর মধ্যে যে আশ্বাস এবং সান্ত্বনা তা মিথ্যা আশ্বাস, মিথ্যা সান্ত্বনা। মিথ্যাকে নিয়ে যে লাভ, সে লাভে বয়স্ক-শিশুর মন ভুলতে পারে, তাতে ফ্রয়েডের মনকে টানে না, পরিণত-বুদ্ধির মানুষের পক্ষে তা অনুপযুক্ত। ফ্রয়েড মনে করেন ধর্ম একটা বৃহৎ ভ্রান্তি, একটা রঙিন বুদ্বুদ, একটা মরীচিকা– ধর্ম একটা ইলিউশন। 'The Future of an Illusion'-বইয়ে (১৯২৭) এ বিষয়ে ফ্রয়েড নিজের বক্তব্য খুব পরিষ্কার করে বলেছেন।

ফ্রয়েডের সিদ্ধান্তের যথার্থ্যবিচার এখানে আমাদের কাজ নয়। কিন্তু এর অল্প কাল পরেই যে বইটি ফ্রয়েড প্রকাশ করলেন, 'Civilization and its Discontents' যা থেকে একটু আগেই উদ্‌ধৃত করা হয়েছে, সেই বইয়ে অসীমের অনুভব নিয়ে এমন প্রশ্ন ধর্মের প্রসঙ্গে উত্থাপিত হয়েছে যা আমাদের বর্তমান আলোচনায় খুবই প্রাসঙ্গিক। কেননা রবীন্দ্রনাথ ভূমা-র কথা, অসীমের কথা নানা উপলক্ষে বার বার বলেছেন। মনস্তত্ত্বের, বিশেষ করে ফ্রয়েডীয় মনোবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে এই ভূমার অনুভব ব্যাপারটা কী?

'The Future of an Illusion' বইটি প্রকাশের পর ফ্রয়েড এক কপি বই রমাঁ রল্যাঁকে পাঠিয়ে দেন। বই পড়ে রল্যাঁ ফ্রয়েডকে যে চিঠি দেন তাতে তিনি ফ্রয়েডের মূল বক্তব্যকে অকুণ্ঠিতভাবে সমর্থন করেন। ধর্ম যে মিথ্যার ছলনা, ইলিউশন, তাতে রল্যাঁর প্রশ্ন নেই, রল্যাঁর প্রশ্ন ধর্মের উৎপত্তি নিয়ে। মানুষের যে গভীর নামহীন পিপাসা তার ধর্মভাবনার মূলে, মানুষের যে গহন অনুভব ধর্মানুভবের রূপ পরিগ্রহ করে, রল্যাঁর মনে হয়েছে ফ্রয়েড মানুষের সেই মৌল পিপাসা ও মৌল অনুভবের কথা কিছুই বলেন নি। সে হল একটা চিরন্তনতা বা অসীমতার অনুভব, একটা মহাসাগরতুল্য অন্তহীন বিশালতার অনুভব। রল্যাঁ এই অনুভবকে বলেছেন–'oceanic'। রল্যাঁ মনে করেন, মানুষের মধ্যে এই যে মহাসমুদ্রবৎ বিস্তারের অনুভব, শেষহীন বৃহত্ত্বের অনুভব, এই অনুভবই সর্ব ধর্মের সাধারণ উপাদান। এই অনুভব নিছক মানসিক ব্যাপার হতে পারে, অনুরূপ কোনো বিশালতা বা চিরন্তনত্ব বা অমরতা বাস্তবে না থাকতে পারে, কিন্তু সমস্ত রিলিজনের এইটেই মূল। রল্যাঁ মনে করেন, ব্যক্তিবিশেষের ক্ষেত্রে একথা বলা যায় যে, তাঁর যদি আর কোনো পিপাসা বা আর কোনো ইলিউশন নাও থাকে, কেবল এই ভূমা-র অনুভবের জোরেই তাঁকে ধর্মাত্মা বলে' দাবি করা যেতে পারে।

ফ্রয়েড এই রকম ভূমার অনুভবকে সর্বজনীন বলে স্বীকার করেন নি। বলেছেন, তাঁর নিজের মধ্যেই এরকম চিরন্তনতা বা অসীমতার অনুভব নেই। তবে কারো কারো মনে যে এ রকম অনুভব থাকতে পারে, বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে যে এরকম অনুভব জন্মাতে পারে, তা ফ্রয়েড অস্বীকার করেন নি। তিনি তাঁর নিজের মতো ক'রে মানুষের মনের এই ভূমাবোধের ব্যাখ্যা করেছেন, এর জন্মকথা বিবৃত করেছেন। ফ্রয়েডের বর্ণনাকে সংক্ষেপে অথচ অবিকৃতভাবে উপস্থিত করা সম্ভব নয়। অতিসরলীকরণের অপরাধ ঘটবে জেনেও এই কাজে অগ্রসর হতে হচ্ছে বিশেষ করে এই কারণে যে রবীন্দ্রনাথের ধর্মালোচনায় ভূমার সঙ্গে আমাদের বার বার সাক্ষাৎ ঘটেছে। জানি না মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা এখানে কতদূর সুপ্রযুক্ত, তবু কথাটাকে মাঝখানে হঠাৎ থামিয়ে দেওয়া যায় না।

আমাদের কৌতূহলের একটা বিশেষ কারণও আছে। ফ্রয়েড বলেছেন, কোনো কোনো বিশেষ ক্ষেত্রে এই ভূমাবোধ সকলেরই হতে পারে। কোথায়? যেখানে আমি-র

স্বাতন্ত্র্যবোধের বিগলন ঘটে। যেমন প্রেমের ক্ষেত্রে, যেখানে আমি-তুমির ভেদ ঘুচে যায়, যেখানে বোধের মধ্যে আমি আর না-আমি একাকার হয়ে যায়। কথাটা তাৎপর্যপূর্ণ এবং রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

জীব হিসেবে মানুষ এত দুর্বল, এত অক্ষম, এত ক্ষুদ্র, এত ক্ষণস্থায়ী—এবং এত প্রতিকূলতাবেষ্টিত যে, তার মধ্যে বিশ্বজগতের সঙ্গে একটা একাত্মতার অনুভব থাকবে, একটা অমরত্বের বিশ্বাস থাকবে, জৈবতার দিক থেকে একে ফ্রয়েড খুব স্বাভাবিক মনে করেন না। তবু যখন কারো কারো মধ্যে এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে এটা আছে, তখন এর একটা মনস্তাত্ত্বিক বা মনোবিশ্লেষণমূলক ব্যাখ্যা প্রয়োজন বলে ফ্রয়েড অনুভব করেন। ব্যাখ্যাটা সংক্ষেপে এই রকমের:–

শিশুর আদিম অনুভব অখন্ড অভঙ্গ অনুভব। তা আমি-তুমিতে বা আমি না-আমিতে বিশ্লিষ্ট নয়, সে অনুভবের কোনো সু-উচ্চারিত সীমারেখা নেই। সীমারেখা তৈরী হয় অভিজ্ঞতার আঘাতে আঘাতে, একটু একটু ক'রে। বয়স্কের অনুভব এ রকম একাকার অনুভব নয়, বয়স্কের অহং সুস্পষ্ট সীমানাযুক্ত অহং। একদিকে অহং আছে, অন্যদিকে তার বিপরীতে বহুবিচিত্র না-আমি আছে, এ দুয়ের নিত্য-সংঘর্ষ আছে। বয়স্কের আমি চারপাশে উঁচু পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। একটি দুটি এমন ক্ষেত্র আছে যেখানে এলে অহং-এর পাঁচিল ধ্বসে যায়, সব বাধা ভেসে যায়, বিশ্ব এসে অবাধে আমি-র সঙ্গে কোলাকুলি করে। ফ্রয়েড বলেছেন প্রেম একটা সেই রকম অহং বিগলনের ক্ষেত্র। তখন বলা যায় যেন শৈশবের বাধাহীন একাত্মতা, শৈশবের একাকার বিশ্বাত্মবোধ কম-বেশি পুনরুজ্জীবিত হয়ে উঠেছে। অনুরূপভাবে বলতে পারি, সময় যেন তখন কম-বেশি থমকে দাঁড়িয়েছে। ধরণটা ভূমা-অনুভবের খুব কাছাকাছি।

এই যে আমি না-আমির একাকার হয়ে যাওয়া, কোনো কোনো মানসিক ব্যাধির ক্ষেত্রেও অল্প-বিস্তর এ রকম হতে পারে। প্রেমে যে রকম হয়, ব্যাধিতে যে রকম হয়, আরো অনেক অন্য ক্ষেত্রেও এ রকম বিশ্বের মধ্যে আত্মবিগলন এবং নিজের মধ্যে বিশ্ব-বিগলন ঘটতে পারে। যদি ঘটে তাহলে যা পাব তাই হল ভূমার অনুভব।

ফ্রয়েড মনে করেন শৈশবের প্রায় কিছুই একেবারে হারিয়ে যায় না, প্রায় সবই অবচেতনায় ভীড় করে থাকে। যোগ্যমতো উপলক্ষ্য পেলে নির্জ্ঞান মন থেকে সজ্ঞান মনে উঠে আসে। মানুষের ভূমাবোধ এই রকম শৈশবে-সৃজিত বিশালতার বোধ। কারো ক্ষেত্রে তা অবচেতন মন থেকে উঠে আসে, আবার কারো ক্ষেত্রে তা উঠে আসার ব্যাপার নয়, সজ্ঞান মনেই তা স্থান পেয়ে গিয়েছে, মনের মধ্যে সীমার বোধের পাশাপাশিই অসীমতার বোধ হয়ে বিরাজ করছে।

ফ্রয়েডের কাছ থেকে ইঙ্গিত নিয়ে আমরা কি এ রকম বলতে পারি যে, রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রটি এই রকম সীমা-বোধ আর অসীমতার বোধের সহাবস্থানের ক্ষেত্র? এ রকম বলা আমাদের পক্ষে নিরাপদ হবে না। কিন্তু এ কথা ঠিক যে, রবীন্দ্রনাথ রূপদ্রষ্টা এবং রূপমুগ্ধ কবি, যা-কিছু আছে সব তাঁর কাছে আনন্দরূপ। তাঁর কবিতা প্রেমের কবিতা, তাঁর ধর্ম প্রেমধর্ম। ফ্রয়েডের মনস্তত্ত্বের সাহায্য ছাড়াই এ কথা নিশ্চয় ক'রে বলা যাবে যে, রবীন্দ্রনাথের মতো যিনি ভালোবাসার কবি, ভালোবাসার আকাঙ্ক্ষার কবি, যাঁর ধর্ম প্রেমের ধর্ম, প্রেমাস্পদকে নিরন্তর খুঁজে ফেরার ধর্ম, ক্ষণে ক্ষণে অহং বিগলন তাঁর পক্ষে স্বধর্মের মতো। কূল ছাপিয়ে যাবার বেগ তাঁর অন্তর্জীবনে সব সময় ক্রিয়াশীল।

এই ক্রিয়াশীলতার ছোট দু-একটা দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। শৈশবে শিক্ষারম্ভের প্রসঙ্গে 'জীবনস্মৃতি'তে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন (র/১০/৭) যে, 'জল পড়ে পাতা নড়ে'—এই হল তাঁর জীবনের প্রথম কবিতা। লিখেছেন—

"মিল আছে বলিয়াই কথাটা শেষ হইয়াও শেষ হয় না—তাহার বক্তব্য যখন ফুরায় তখনো তাহার ঝংকারটা ফুরায় না, মিলটাকে লইয়া কানের সঙ্গে মনের খেলা চলিতে থাকে। এমনি করিয়া ফিরিয়া ফিরিয়া সেদিন আমার সমস্ত চৈতন্যের মধ্যে জল পড়িতে ও পাতা নড়িতে লাগিল।"

সহজেই দেখতে পাচ্ছি, একটি ছোট অভিজ্ঞতা এবং তার সহগামী একটি ছোট অনুভব কেমন ক'রে নিজের কূল ছাপিয়ে রবীন্দ্রনাথের সমস্ত চৈতন্যে অনুরণন তুলেছে। কিন্তু এইটুকুই কূল ছাপানোর পুরো ইতিবৃত্ত নয়। অনেক কাল পরে অক্স্ফোর্ডে হিবার্ট বক্তৃতার সময়ে একই ঘটনার উল্লেখ ক'রে অনুভবের তরঙ্গ কূল ছাপিয়ে কোন্ ভাবলোকে গিয়ে পৌঁছতে পারে তা আমাদের শোনালেন (The Vision, The Religion of Man, Unwin Books, পৃ. ৫৯)। অভিজ্ঞতা সেই প্রথম কবিতাপাঠেরই।–"At once I came to a world wherein I recovered my full meaning.... ...The rhythmic picture of the tremulous leaves beaten by the rain opened before my mind the world which does not merely carry information, but a harmony with my being. The unmeaning fragments lost their individual isolation and my mind revelled in the unity of a vision."

'জীবনস্মৃতি'র 'প্রভাতসংগীত' অংশে একদিন প্রথম বয়সে—অবশ্য 'জল পড়ে পাতা নড়ে'–পড়ার অনেক পরে, সদর স্ট্রীটে সূর্যোদয় দেখার যে অভিজ্ঞতার কথা রবীন্দ্রনাথ ব'লেছেন (র/১০/১০০), তা সকলেরই সুপরিচিত।–

"চাহিয়া থাকিতে থাকিতে হঠাৎ এক মুহূর্তের মধ্যে আমার চোখের উপর হইতে যেন একটা পর্দা সরিয়া গেল। দেখিলাম, একটি অপরূপ মহিমায় বিশ্বসংসার সমাচ্ছন্ন, আনন্দে এবং সৌন্দর্যে সর্বত্রই তরঙ্গিতে।"

এর পর এ বিষয়ে আর কিছু বলা বোধকরি নিষ্প্রয়োজন। কেননা এই রকম কূল ছাপিয়ে যাবার দৃষ্টান্ত রবীন্দ্রনাথের কবিতায় গানে অজস্র ছড়িয়ে আছে।

ফ্রয়েড ভূমাবোধকে অস্বীকার করেন নি, শুধু তিনি একে সর্বজনীন বলে মানেন নি। উপরন্তু তিনি একে ধর্মভাবের উৎস বলেও স্বীকার করেন নি। তাঁর মতে মানুষের সর্বজনীন ও সর্বকালিক অসহায়তা এবং তার ভয় থেকে অভয়ে যাবার আকাঙ্ক্ষার মধ্যেই মানুষের ধর্মভাবের উৎস। এই অসহায়তা মানুষের—মানুষ মাত্রেরই নিত্যসঙ্গী এবং ভয় থেকে রক্ষা পাবার, আক্ষরিক অর্থেই ভয় থেকে অভয়ে যাবার আকাঙ্ক্ষা, এ-ও মানুষের নিত্য-ধর্ম।

ফ্রয়েডের মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যাকে গ্রহণ করি আর না-ই করি, ফ্রয়েড যে মানুষের নিত্য-সংকট এবং চিরন্তর আকাঙ্ক্ষার কথা বলেছেন, তাকে অস্বীকার করা যায় না। তাহলে এইখানেই কি আমরা সর্বধর্মের অপরিহার্য সাধারণ সত্যকে পাচ্ছি না?

সর্বধর্মের সাধারণ উৎসকে পাচ্ছি, কিন্তু উৎস আর পরিণাম এক নয়, যেমন শিকড়

আর গাছের ফুল এক নয়। আমাদের প্রশ্ন শিকড়কে নিয়ে নয়, আমাদের প্রশ্ন গাছের ফুলফুলকে নিয়ে। শিকড়-বিজ্ঞান অনেক মূল্যবান নেপথ্য-কাহিনী বলতে পারবে, কিন্তু ফুলের গন্ধের বা ফলের স্বাদের হদিশ দিতে পারবে না। অতএব? অতএব দেখা যাচ্ছে, সব রিলিজনের সাধারণ সত্যকে আমরা খুঁজে পেলাম না।

রিলিজনের না হোক, ব্যক্তিগত ধর্মেরই কি সর্বধর্মের সাধারণ-সত্যের সন্ধান পাওয়া যাবে?

ব্যক্তিগত ধর্ম অগণ্য। সেখানে সাধারণ-সত্য খুঁজে পাওয়া আরো কঠিন। যিনি ব্যক্তিগত ধর্মে আস্থাশীল তিনি যা-ই বলুন, যিনি রিলিজনে স্থিত তিনি বলবেন, ধর্ম ব্যক্তিগত হলে যত ব্যক্তি তত ধর্ম হতে কোনো বাধা থাকে না। যার-যার ধর্ম তার-তার যদি হয়, তাহলে অধার্মিক বলতে পারেন সেইটেই তাঁর ধর্ম, কবি বলতে পারেন কবিত্বই তাঁর ধর্ম। এতে ধর্ম তার অর্থ এবং উপযোগিতা দুই-ই হারায়। প্রতিষ্ঠান   ন্থী আরো বলবেন, ধর্ম নিছক সাব্‌জেক্টিভ ব্যাপার নয়। ধর্মকে তুমি সৃষ্টি করো নি, ধর্ম তোমার ইচ্ছা-অনিচ্ছার অধীন নয়। শিরীষকুসুমকে আলগোছে ছুঁয়ে-থাকা শিশিরবিন্দুর মতো স্পর্শকাতর নয় ধর্ম। তাকে হাটের মধ্যেও নেমে আসতে হয়। বিজনে নয়, লোকালয়েই তার আপন স্থান।

যিনি রিলিজনে বিশ্বাসী এবং আপন প্রতিষ্ঠানে স্থিত, ধরা যাক একজন শাস্ত্রবাক্যে-শ্রদ্ধাশীল ভারতীয়, তিনি ব্যক্তিগত ধর্মকে কী চোখে দেখবেন? মনে রাখতে হবে, তিনি দীর্ঘকালের ঐতিহ্যে স্থিত, ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য তাঁর কাছে কোনো মহৎ মূল্য নয়। ব্যক্তিগত ধর্মকে তাঁর কাছে ব্যক্তির আত্মরতি বলে মনে হওয়া কিছুমাত্র আশ্চর্য নয়। ব্যক্তিগত ধর্মের প্রতি অবিশ্বাস এবং অশ্রদ্ধা তাঁর স্বাভাবিক। তিনি বলবেন, এই তথাকথিত ধর্ম কোনো দিক থেকেই ধর্ম নয়, এ হল আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত ধর্মহীন মানুষের আধুনিকতা। রবীন্দ্রনাথকেও অনেকবার এ রকম অভিযোগ শুনতে হয়েছে।

অধিকাংশ মানুষই রিলিজন-পন্থী, ধর্ম বলতে প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মকেই বোঝেন। তাঁরা বলবেন, যা নিজের মধ্যেই বদ্ধ তার আসল চেহারাটা কেমন ক'রে বোঝা যাবে? তা যে শয়তানের পরামর্শ নয় কেমন করে ধরা যাবে? এই জন্যই তো প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের সমর্থকেরা, শাস্ত্রবাক্যের অনুগামীরা ব্যক্তিগত ধর্মকে ধর্ম বলেই স্বীকার করেন না।

ধর্মের সংজ্ঞা দেওয়া যায় না, ধর্মসমূহের মধ্য থেকে সাধারণ-সত্য নিষ্কাশিত ক'রে তাকেই ধর্ম বলে দাবি করা, কার্যক্ষেত্রে তাও সম্ভব নয়।

কিন্তু তার অর্থ এ নয় যে, ধর্ম বলে কিছু নেই, ব্যক্তির জীবনে ধর্মের কোনো ভূমিকা নেই, সমাজে ধর্মের কোনো প্রভাব নেই। এ-ও সত্য নয় যে, ধর্ম সম্পর্কে আমাদের সমস্ত ধারণাই অর্থহীন। আমাদের সাধারণ অনুভবে ধর্মের সঙ্গে পবিত্রতার ভাব যুক্ত, ধর্মের সঙ্গে মৈত্রী এবং প্রীতি যুক্ত, প্রেম যুক্ত। রল্যাঁ যাকে বলেছেন গভীরতার বা বিশলতার অনুভব, ব্যাখ্যা ক'রে ফ্রয়েড যাকে বলেছেন বিশ্বের সঙ্গে সংযোগের অনুভব, তাও যুক্ত। স্বার্থকে, কঠিন অহং ভাবকে অতিক্রম করা, অনেকে একেই আধ্যাত্মিকতা বলে মনে করেন। উন্নত ধর্ম বলতে সাধারণত যা আমরা বুঝি, এর প্রত্যেকটিই তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। ব্যক্তিগত ধর্ম বা সাধারণভাবে যাকে আমরা ধর্মভাব বলি, তা মোটামুটি এদের উপর ভর দিয়েই দাঁড়ায়।

প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মেও হয়তো এরা প্রত্যাশিত, কিন্তু প্রাতিষ্ঠানিক ধর্ম এদের কারো উপরেই ভর ক'রে দাঁড়ায় না। শুধু ভাব নিয়ে প্রতিষ্ঠানের চলে না। প্রাতিষ্ঠানিক ধর্ম দাঁড়ায় শাস্ত্রবাক্যের উপর, সে শাস্ত্রবাক্য যা-ই হোক না কেন। প্রাতিষ্ঠানিক ধর্ম দাঁড়ায় সংগঠনের জোরে, দাঁড়ায় ঐতিহ্যের সম্মোহন শক্তির সাহায্যে। প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের প্রথম এবং শেষ কথা শাস্ত্রবিধি। মীমাংসা যেমন বলেছেন, কর্ম-প্রবর্তক বাক্য, বেদবিধি, যজ্ঞ। সেখানে প্রশ্নের অবকাশ নেই, নিজের বুদ্ধিপ্রয়োগের কথা উঠতেই পারে না। সেখানে অনুভবের প্রশ্রয় নেই, আছে বিধিবাক্য আর তদনুযায়ী আচরণ।

সব প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মেরই স্বভাবসিদ্ধ গতি এই মুখে। সেখানে স্বাধীন বুদ্ধি, কি স্বাধীন অনুভব কারোই প্রবেশের সুযোগ নেই। ব্যক্তি-মানুষ কতটুকু যে সে নিজে কথা বলবে? বাক্য অর্থই হল শাস্ত্রবাক্য; বৈদিক ধর্মে বেদবাক্য।

প্রতিষ্ঠান, সংগঠন, প্রশ্নহীনভাবে ক্রীডের অনুগমন, প্রশ্নহীন স্বীকৃতি, চিন্তাহীন অবশ্যমান্যতা, এই যেখানে দাবি, সেখানে অচিরেই যে অচলায়তন গড়ে উঠবে এ কথা সহজেই বোঝা যায়। রিলিজন-নিষ্ঠ ব্যক্তি যেমন ব্যক্তিগত ধর্মকে স্বাতন্ত্র্যের বিলাস বলে মনে করেন, ব্যক্তিগত ধর্মে স্থিত ব্যক্তিও তেমনি প্রাতিষ্ঠানিকতাকে বন্ধন বলে মনে করেন, প্রাতিষ্ঠানিক আয়তনকে কারাগার মনে করেন। হয়তো মনুষ্যত্ব-বিরোধী বলেও মনে করেন। মনুষ্যত্ব-বিরোধী যদি হয়, তাহলে তিনি একে নিশ্চয়ই ধর্মবিরোধীও বলবেন, অধর্মপথও বলবেন।

প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের কোনো কোনোটির জন্ম সম্ভবত প্রাগৈতিহাসিক কালে, অনেকের জন্ম ইতিহাসপূর্ব না হলেও যথেষ্ট প্রাচীন কালে। কোনো কোনোটির জন্ম দূরবর্তী মধ্যযুগে, কৃচিৎ এক-আধটির উদ্ভব আধুনিক কালে। অতীতের অনেক ব্যক্তিগত ধর্ম আদি প্রবক্তার অনুরাগীদের উৎসাহে প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে, আজ তাদের কাউকেই আর ব্যক্তিগত বলা চলবে না। ব্যক্তিগত ধর্মের শ্রীবৃদ্ধি আধুনিক কালে, যখন থেকে মানুষের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধ ক্রমশ শক্তিশালী হতে আরম্ভ করেছে। আধুনিক মনের কাছে প্রাতিষ্ঠানিক ধর্ম মধ্যযুগীয় ভাবনার জের, তার অবলম্বন মধ্যযুগীয় মন, তা কালাতিক্রান্ত, সুতরাং তা প্রতিক্রিয়াশীল। অপর পক্ষ মনে করেন, ব্যক্তিগত ধর্ম আদৌ ধর্ম নয়, ভালোর সীমায় হলে তা কবিত্ব, খারাপের সীমায় তা ব্যক্তির স্বেচ্ছাচার। রিলিজনপন্থী বলবেন, ধর্ম কালের মাপে তৈরী নয়, ধর্ম চিরন্তন, ধর্মের ক্ষেত্রে কালাতিক্রান্ত কথাটা অর্থহীন। অন্যপক্ষে ব্যক্তিগত ধর্মের সমর্থক বলবেন, নিছক আজ্ঞানুবর্তিতা মনুষ্যস্বভাবের বিরোধী। মানুষ আজ্ঞাপালনের যন্ত্র নয়, রোবোটের ধর্ম কখনোই মানুষের ধর্ম নয়।

এ তর্কে প্রবেশের সুযোগ আমাদের নেই। আমরা শুধু দেখতে পেলাম, প্রাতিষ্ঠানিক আর ব্যক্তিগত এই দুই জাতের ধর্মের কোনোটিই তর্কাতীত নয়।

ব্যক্তিগত ধর্মের সামূহিক শক্তি যৎসামান্য, তা একসঙ্গে বহু মানুষকে স্পর্শ করে না বলেই তা পাইকেরি মাপে মানুষের ক্ষতি করতেও পারে না, ভালো করতেও পারে না। ধর্মের নামে যা কিছু রক্তপাত সব প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মকে ঘিরে। একালে প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের প্রতিপত্তি অনেক হ্রাস পাবারই কথা। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে ঠিক তা হয় নি। একটু জটিলতা এসেছে। প্রাতিষ্ঠানিক ধর্ম চিরকালই শক্তিমানের স্বার্থসিদ্ধির হাতিয়ার রূপে ব্যবহৃত হয়। প্রাতিষ্ঠানিক ধর্ম বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই আজ রাজনীতি-অর্থনীতির ছদ্মবেশ। যাকে

ধর্মচিন্তা: ভূমিকা

আজ আমরা প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের শক্তি বলে মনে করছি, তা আসলে ছদ্মবেশী রাজনৈতিক স্বার্থগোষ্ঠীর শক্তি। আধুনিক কালে যাঁরা প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মে উৎসাহী, বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই তাঁরা আসলে প্রতিষ্ঠান ও সংগঠনের শক্তিতে উৎসাহী, ধর্মে নয়।

আজকের দিনে অধিকাংশ মানুষেরই ধর্ম বা রিলিজন নিছক পোষাকী ব্যাপার, যদি তা ব্যক্তিগত বা গোষ্ঠীগত স্বার্থের সঙ্গে জড়িত না হয়। ব্যক্তিগত ধর্ম কখনোই পোষাকী ব্যাপার হতে পারে না, ভুল হোক ঠিক হোক তা অন্তরঙ্গ ব্যাপার। আজকের দিনের অধিকাংশ মানুষের হয় আছে শুধু পোষাকী ধর্ম—রিলিজনের বহিরঙ্গ; আর না হয় আছে বাইরে পোষাকী ধর্ম, ভিতরে আত্মগত অন্তরঙ্গ ধর্ম—মূল্য তার যা-ই হোক।

প্রথম থেকেই রবীন্দ্রনাথের মন প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের প্রতি অল্পবিস্তর বিরূপ। প্রথম থেকেই রবীন্দ্রনাথের মনে স্বাধীন ধর্মচিন্তার উন্মেষ হয়েছে। কিন্তু গোড়ার দিকে রবীন্দ্রনাথের স্বকীয় ধর্মচিন্তা একান্ত হয়ে ওঠে নি, প্রতিষ্ঠান পোষাকী হয়ে পড়ে নি। স্বাধীন চিন্তা যতই মনের মধ্যে প্রতিষ্ঠা পেতে শুরু করেছে, রিলিজন ততই একটু একটু ক'রে পোষাকী হয়ে পড়েছে। এবং রিলিজন যতই পোষাকী হয়েছে, ততই তা তাঁর মন থেকে স্খলিত হয়ে পড়েছে। ঘরে আর বাইরে দুই ক্ষেত্রে দু-রকমের ভাবনার বিড়ম্বনাকে রবীন্দ্রনাথ নিজের মধ্যে প্রশ্রয় দেন নি।

আমরা জানি, নৃবিজ্ঞানীর মনোবিজ্ঞানীর ধর্মজিজ্ঞাসা সাধারণত অগ্রসর হয় ধর্মের উৎস-সন্ধানের পথ ধরে। ধর্ম কী এই প্রশ্নের উত্তর তাঁরা খোঁজেন ধর্মের জন্মরহস্যে। নৃবিজ্ঞানীর জিজ্ঞাসা, আদিম মানুষ কেমন ক'রে প্রথম ধর্মকে পেল। এবং এ বিষয়ে নৃবিজ্ঞানীর সিদ্ধান্ত হল এই যে, আদিম মানুষকে প্রথম ধর্মমুখী করেছে প্রাকৃতিক শক্তিসমূহের ভীষণতা। ধর্মের জন্ম আদিম বিভীষিকায়, আদিম জাদুবিশ্বাসে, মিথ্-ধর্মী কল্পনার উপকথা-নির্মাণে। কোনো কোনো মনোবিজ্ঞানী তেমনি বলেন, শুধু আদিম মানুষের নয়, ধর্মের জন্ম সব কালের মানুষের অসহায়তার বোধের মধ্যে। এ অসহায়তার বোধ মানুষের সত্তাগত। এই নিত্য-অসহায়তার কল্পিত প্রতিষেধক হিসেবেই ধর্মের জন্ম। এই সব নৃবিজ্ঞানী মনোবিজ্ঞানীর কারো কথাই হয়তো ভুল নয়। কিন্তু কারো কথার মধ্যেই ধর্মের পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যাবে না।

সমাজবিজ্ঞানীরা ধর্মকে বুঝতে চান তাকে ইতিহাসের ফ্রেমের মধ্যে রেখে। সমাজবিজ্ঞানীদের কেউ কেউ ধর্মকে দেখেছেন তার সমাজিক ভূমিকায়, ধর্মকে বুঝতে চেষ্টা করেছেন সমাজে বা ইতিহাসে ধর্ম যেভাবে ক্রিয়া করে তার মধ্যে দিয়ে। সমাজবিজ্ঞানীর জিজ্ঞাসা, সামাজিক বলক্রিয়ার রঙ্গমঞ্চে ধর্ম কোন্ ভূমিকায় অবতীর্ণ? মার্ক্স সিদ্ধান্ত করেছেন, ধর্মের, ভূমিকা হল প্রতিষ্ঠিত শক্তিকে সাহায্য করা, শোষণযন্ত্রকে মসৃণভাবে চালু রাখা, সম্ভাব্য প্রতিরোধকে বিপথে চালিত করা, শোষিতদের ঘুম পাড়িয়ে রাখা। ধর্ম হল জনসাধারণের আফিম। 'রক্তকরবী' নাটকে রবীন্দ্রনাথ গোঁসাই চরিত্রের মধ্যে দিয়ে, সর্দার ও গোঁসাইয়ের অন্তরঙ্গ আঁতাতের মধ্যে দিয়ে ধর্মের এই ডান-হাত বাঁ-হাতের খেলাকে আমাদের সামনে উদ্‌ঘাটিত করে দিয়েছেন।

ধর্মের যে এই রকম একটা ঘুম-পাড়ানি ভূমিকা আছে, ধর্ম যে অনেক সময়ই শক্তিমান শোষকের হাতিয়ার, এ কথা অস্বীকার করা যায় না, ইতিহাসে এর ভূরি ভূরি প্রমাণ মিলবে। কিন্তু এইটেই যে ধর্মের একমাত্র ভূমিকা, অথবা এই ঘুম-পাড়ানি ভূমিকা যে সব

রকম ধর্মেরই স্বভাবগত, তার কোনো নিশ্চিত প্রমাণ নেই। কেবল সামাজিক ভূমিকা দিয়ে ধর্মের যে পরিচয়, তা আংশিক পরিচয়—সত্য হলেও আংশিক। ধর্মের যেমন অনেক উৎস, তেমনি ধর্মের অনেক ভূমিকা। ধর্ম নিঃসংগকে সংগ দেয়, পরিচয়হীনকে পরিচয় দেয়, অসীম শূন্যতার বিপুল ভারকে লাঘব ক'রে দেয়, প্রতিকারযোগ্য দুঃখকে যেমন ভোলায়, প্রতিকারহীন দুঃখেও তেমনি সান্ত্বনা যোগায়। ক্ষেত্রবিশেষে ধর্ম যেমন বলহরণ করে, ক্ষেত্রবিশেষে ধর্ম তেমনি বলসঞ্চারও করে।

শোষণহীন সমাজে কি ধর্ম বেকার হয় পড়বে? এ রকম সিদ্ধান্ত একটু অতিরিক্ত সরল বলে মনে হয়। সমাজবিজ্ঞানী যা-ই বলুন, মনোবিজ্ঞানী জানেন, যতদিন মানুষের মনে অসহায়তার বোধ থাকবে, যতদিন মানুষের ত্রিবিধ দুঃখতাপ থাকবে, যতদিন মানুষের জীবনে কালের দুরন্ত প্রতাপ অব্যাহত থাকবে, যতদিন মানুষ প্রকৃতির সংগে বিচ্ছেদের বোধে, নিজের সংগে বিচ্ছেদের বোধে, মানবসমগ্রতার সংগে বিচ্ছেদের বোধে পীড়িত হবে, যতদিন মানুষের বিরহভয় মৃত্যুভয় থাকবে, শূন্যতার ভার অসহ মনে হবে, ততদিন, ভ্রান্তি হোক ছলনা হোক আফিম হোক যা-ই হোক—ততদিন পর্যন্ত মানুষের জীবন থেকে ধর্মের মূলকে সম্পূর্ণ উৎপাটিত করা যাবে না। সেটা কত দিন তা বলা যাবে না। জ্ঞানের সীমাহীন বিস্তারের ফলে সুদূর ভবিষ্যতে কী ঘটতে পারে না-পারে, তা এখন কল্পনা ক'রে লাভ নেই।

ধর্মের যে দিকটা তথ্যগত দিক, বিজ্ঞান তার পরিচয় দিতে পারে, কিন্তু যেটা ভিতরের দিক, গভীরের দিক, ধর্মের যেটা আদর্শ বা মূল্যের দিক কিংবা ধর্মের যেটা আধ্যাত্মিকতার দিক, সে দিকগুলো বিজ্ঞানের আওতার বাইরে। যেমন বিজ্ঞানের আওতার বাইরে কবিতা, শিল্প, যে-কোনো উপলব্ধির সত্য। যেমন বিজ্ঞানের আওতার বাইরে প্রেম। ধর্মের ভিতরের সত্যও তেমনি বিজ্ঞানের আওতার বাইরে। যা-কিছু আমাদের মূল্যবোধকে উদ্‌বোধিত করে, তা সবই বিজ্ঞানের অনধিগম্য।

সত্য শিব সুন্দর, এই যে সব মহৎ মূল্য, মানুষের পরম অন্বিষ্ট, যে কোনো কারণেই হোক ধর্মের ধারণার সংগে অনেক সময়ই এরা এক হয়ে মিলে থাকে। যদিও জানি, সত্যের নিজস্ব ক্ষেত্র দর্শন-বিজ্ঞান, শিবের নিজস্ব ক্ষেত্র নীতিশাস্ত্র, সুন্দরের নিজস্ব এলাকা শিল্প, তবু সাধারণ ভাবে আমরা এদের ধর্মের সংগে মিলিয়ে দেখতে অভ্যস্ত। একথা অবশ্য ঠিক যে অনেক প্রতিষ্ঠানিক ধর্মেই কার্যক্ষেত্রে এই সব আদর্শ, এই সব মূল্য বা ভ্যালু অবহেলিত। এ-ও ঠিক যে কোনো কোনো প্রাতিষ্ঠানিক ধর্ম দ্বিধাহীনভাবে ঘোষণা করে যে, ধর্ম জাগতিক ভালো-মন্দের, জাগতিক ন্যায়-অন্যায় সত্য-মিথ্যা সুন্দর-অসুন্দরের অনেক ঊর্ধ্বে। দ্বিধাহীনভাবে ঘোষণা করে যে, মূল্যের বা ভ্যালুর জন্য ধর্ম নয়, ধর্ম আছে বলেই ভ্যালু তার অর্থ পেয়েছে। অর্থাৎ ভ্যালুকে ধর্মের সংগে মিলিয়ে দেখার পক্ষে কোনো অকাট্য যুক্তি নেই। হতেও তো পারে যে, ভ্যালু সবই মানুষের অলস কল্পনা। তার ব্যাবহারিক উপযোগিতা থাকলেও থাকতে পারে, কিন্তু তা নিত্য নয়। এমন খুবই হতে পারে। এ বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধন্তের সুযোগ মানুষের নেই। তা যখন নেই তখন ভ্যালু নিয়ে প্রশ্ন আসবেই এবং অনেক সময় ধর্মভাবনার সংগে তা মিশেও যাবে। তাকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করারও কোনো যুক্তি নেই।

যিনি ধর্মকে উত্তরাধিকার হিসেবে পেয়েই সন্তুষ্ট, যিনি ঐতিহ্যনিষ্ঠাভাবে ধর্মে স্থিত, ধর্মকে যিনি অর্জন করেন নি, ধর্ম নিয়ে তাঁর মনে প্রকৃত কোনো জিজ্ঞাসা নেই। তাঁর

ধর্মসিদ্ধান্ত তৈরি হয়েই আছে। রবীন্দ্রনাথ তাঁদের সঙ্গে তর্ক করেন নি। আমরা শুধু দেখতে পাই, ক্রমশই রবীন্দ্রনাথ প্রতিষ্ঠানিক ধর্মের টান কাটিয়ে দূরে সরে গিয়েছেন এবং ক্রমশই মূল্য আদর্শ উপলব্ধি এরা রবীন্দ্রনাথের ধর্মভাবনায় প্রাধান্য অর্জন করেছে। অনেক ভাবুকের ক্ষেত্রেই এই রকম হয়েছে। দেখা যায়, পরম্পরা-গত আচরণ-বিধি থেকে সরে গিয়েই, আদর্শ অধ্যাত্মিকতা স্বানুভূতি ইত্যাদির উপর জোর দিতে গিয়েই ধর্মবোধ ব্যক্তিগত হয়ে ওঠে, ক্রমশ মূল্যকেন্দ্রিক হয়ে ওঠে। ধর্মীয় ঐতিহ্য তাকে নীতিবোধ ব'লে বা ক্ষেত্রবিশেষে সৌন্দর্যবোধ ব'লে মানতে পারে, কিন্তু ধর্ম ব'লে মানতে কখনোই রাজি হবে না।

ব্যক্তিগত ধর্মে কোনো কোনো ক্ষেত্রে দেখা যায়, মূল্যবোধটাই একান্ত, ঈশ্বর যে এসেছেন তা তাঁর নিজের জোরে নয়, এসেছেন আমাদের মহৎ আদর্শগুলোর আধার হিসেবে, আমাদের গভীর আকাঙ্ক্ষাগুলোর কল্পিত সিদ্ধি হিসেবে। অনেক সময় মনে হয় যেন সত্য শিব সুন্দর এই সব পরম অন্বিষ্টেরই অন্য নাম ঈশ্বর। মনে হয় যেন মানুষের এই সব অতি প্রিয় আদর্শেরাই ঘনীভূত হয়ে উঠেছে এবং দেবত্বারোপের ফলে সেই ঘনীভূত আদর্শই ঈশ্বরের শূন্যস্থান পূর্ণ করেছে। তখনি শুনতে পাই, Truth is God, অথবা শুনতে পাই, Love is God। এমন নয় যে ঈশ্বরের মধ্যেই আমরা সত্যকে আবিষ্কার করলাম, বা ঈশ্বরকেই আমরা প্রেম রূপে দেখতে পেলাম। বরং এমন যে, আলাদা কোনো ঈশ্বর নেই, সত্যকেই আমরা ঈশ্বর ব'লে গ্রহণ করলাম, প্রেমকেই আমরা ঈশ্বর নামে বন্দিত করলাম। ঈশ্বরকে প্রেমময় ব'লে জানা নয়, প্রেমকেই পরম ব'লে জানা। আমরা জানি, প্রথম দিকে অনেক দূর অবধি রবীন্দ্রনাথ ঈশ্বরকে প্রেমময় ব'লেই দেখেছেন। তার পর একটু একটু করে তাঁর ধর্মভাবনার ভারকেন্দ্র সরে গিয়েছে। শেষের দিকে যা ঘটেছে সে হল প্রেমের ঈশ্বরীভবন, মানবমূল্যের ঈশ্বরীভবন।

সত্য, কল্যাণ, সুন্দর সৃজনশীলতা, প্রেম, এই সব মানবিক আদর্শের ঈশ্বরীভবনের জন্যই রবীন্দনাথের ধর্ম মানবধর্ম। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, মানুষের ধর্ম। আবার বলেছেন, Religion of an Artist—আর্টিষ্টের ধর্ম।

আর্টিষ্টের ধর্ম কথাটা ইঙ্গিতপূর্ণ। মানবতাকে মানুষ থেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে, মানবিক গুণ বা মানব-মহত্ত্বকে মানুষ থেকে আলাদা ক'রে, তাকে ঊর্ধ্বায়িত ক'রেই সম্ভবত মানুষ ঈশ্বরকে রচনা করেছে। অন্য কী ভাবেই বা মানুষ, ক্ষণকালের খেলনা, brief candle, ভালো ক'রে চোখ মেলবার আগেই যার নয়নে অন্তিম নিমেষ প'ড়ে যায়, সেই মানুষ আর কী ভাবেই বা তার ভঙ্গুর মস্তিষ্ক-ভাণ্ডে ঈশ্বরকে ধারণ করতে পারবে? সব ধর্মই এইভাবে মানুষের নিজের চাওয়াকে ঊর্ধ্বায়িত ক'রে থাকে। এক সময় রবীন্দ্রনাথও তা ক'রে থাকবেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে এই ঊর্ধ্বায়ন প্রথম দিকের সত্য হলেও, তা শেষের সত্য নয়। মানুষ থেকে বিশ্লিষ্ট, ভাবলোকে-ভাসমান মানবতাকে রবীন্দ্রনাথ আবার মানুষে ফিরিয়ে এনেছেন, এইখানেই রবীন্দ্রনাথের নিজত্ব। মানুষের ইচ্ছাপূরণ-কল্পনা অনেক সময়ই 'দেবেরে মানব করি আনে'। রবীন্দ্রনাথ তা করেন নি। রবীন্দ্রনাথ মানুষকেই মানবমহিমায় প্রতিষ্ঠিত করেছেন। ক'রে বলেছেন, মানবব্রহ্ম।

যে শক্তি এই অঘটন ঘটিয়েছে, সে হল মহাকবির সৃজনীকল্পনা। বিমূর্ততা-অভিমুখী কল্পনা নয়, এ হল মূর্তি-অভিমুখী কল্পনা, রূপাত্মক কল্পনা। রূপ থেকে ভাবে যাওয়া নয়, ভাব থেকে রূপে ফিরে আসা। যা ঘটল তা ধর্মগুরুর সাধন নয়, তা আর্টিস্টের সাধন।

রবীন্দ্রনাথের আত্মগত ধর্ম কবির ধর্ম, শিল্পীর ধর্ম—প্রধানত ইস্থেটিক বা নান্দনিক ধর্ম। তার অন্যতম প্রধান বিশেষত্ব তার সৃষ্টিশীলতা, নিরন্তর নিজেকে নতুন ক'রে সৃষ্টি করে চলা। একে যদি কেউ বলেন কবিত্ব, যেমন বিপিনচন্দ্র পাল কিংবা পরে রমাপ্রসাদ চন্দ এবং আরো অনেকে বলেছেন, তর্ক করার কিছু নেই। কবির ধর্ম তো অবশ্যই কবিত্ব হতে পারে, কিন্তু তার মানেই তা ধর্ম নয় এমন বলা যাবে না। কেননা, ব্যক্তিগত ধর্মের ক্ষেত্রে কী যে ধর্ম আর কী যে ধর্ম নয় তা তর্কের বিষয় নয়। যিনি সমভাবী ও সহমর্মী তিনি হয়তো তাকে অনুভব করতে পারবেন।

শেষের দিকে রবীন্দ্রনাথ কি ঈশ্বরে বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছিলেন? রবীন্দ্রনাথের দু-এক জন কাছের মানুষ এই রকম বলেছেন দেখতে পাই। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের নিজের লেখায় এর কোনো নিশ্চিত প্রমাণ পাই না। নানা রকম প্রশ্ন নানা সংশয় রবীন্দ্রনাথের মনে বার বার হানা দিয়েছে। শেষের দিকে সংশয়ের আক্রমণ অনেক বেশি, বিশেষ ক'রে বিশ্ব-রাজনীতিতে লোভ ও হিংসার একাধিপত্য দেখে, বিশ্বযুদ্ধে পাপ বা অশুভশক্তির বিশ্বরূপদর্শনের পর থেকে। যিনি মানবধর্মে বিশ্বাসী তাঁর মানুষের উপর বিশ্বাস টলে গেলে আর কী-ই বা বাকি থাকে? টলে গিয়েছিল নিঃসন্দেহে কিন্তু বিধ্বস্ত হয়ে যায় নি।

বিধ্বস্ত হয় নি মানুষের ভবিষ্যৎ, মানুষের অন্তহীন সম্ভাবনা। বিধ্বস্ত হয় নি রূপলোক, রসলোক, ভালোবাসার অমৃত। না, মানুষ এখনো সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হয় নি।

কিন্তু ঈশ্বর?

পরিণত বয়সে অনেক বেশি বিচলিত হয়েছে রবীন্দ্রনাথের ঈশ্বরভাবনা। ঈশ্বর নেই তা তিনি স্পষ্ট ক'রে বলেন নি, কিন্তু শেষ বেলাতে যাকে তিনি ওই ঐশী আসনে এনে বসালেন, সে কে? সে কি আমাদের চির-চেনা ঈশ্বর? সাকার বা নিরাকার, সগুণ কি নির্গুণ, সে কি আদৌ ঈশ্বর? তেমন কথা রবীন্দ্রনাথ নিজে কিন্তু উচ্চারণ করেন নি। মনে হয়, সত্তা-জিজ্ঞাসায় যেমন, তাঁর ঈশ্বর-জিজ্ঞাসাতেও তেমনি, শেষ কথা—'মেলে নি উত্তর'।

নিয়ত আত্মসৃজনশীল যিনি তাঁর ধর্ম যে বার বার নতুন ঘাটে গিয়ে পৌঁছুবে এটাই স্বাভাবিক। এ কথা ঠিকই যে রবীন্দ্রনাথের ঈশ্বর আমাদের প্রচলিত কল্পনার ঈশ্বর নন। অনন্ত-বিস্ফারিত কোনো নরমূর্তি বা নারীমূর্তির সঙ্গে তাকে মেলানো যাবে না। কখনো তাঁর ঈশ্বর নৈর্ব্যক্তিক, আবার কখনো তিনি ব্যক্তিস্বভাবী। কখনো তিনি প্রেমিক। কখনো তিনি মানুষের দ্বিতীয় সত্তা, তার alter ego। কখনো তিনি সমস্ত মানবিক গুণ, মানবিক আদর্শ, মানবিক ভ্যালু-র পরিপূর্ণতা। কখনো তিনি প্রেম, কখনো মানবব্রহ্ম। এই বহুরূপী ঈশ্বরকে কেউ যদি অনীশ্বর মনে করেন, ঈশ্বর-কল্পনার এই রকম পালাবদলকে কেউ যদি নাস্তিক্যের লক্ষণ বলে মনে করেন, কিছু বলার নেই। কবির ধর্ম এই রকমই সজীব ধর্ম। রূপজগৎ রসজগৎ আমাদের কবির চিত্তে যখন যে তারে ঘা দিয়ে সুর তুলেছে, রবীন্দ্রনাথের ঈশ্বর তখন সেই রাগিনী হয়ে রবীন্দ্রনাথের মনের আকাশকে ভরে রেখেছে। যে আলোছায়ার পথ গিয়েছে সেই ধ্বনিত ও অনুরণিত সুরলোকের অভিমুখে, সেই পথকেই রবীন্দ্রনাথ বলেছেন ধর্ম।

জানি না এই গানের মতো ধর্মকে ধর্ম বলা যাবে কি না। এই ধর্ম কি কাউকে ধারণ করতে পারে, কাউকে পোষণ করতে পারে? এই ধর্ম কি প্রজাগণের সর্বাঙ্গীণ মঙ্গল করতে পারে?

কিন্তু নিজে ছাড়া কে-ই বা আছে মানুষের যে তাকে ধারণ করবে? ভগবান বুদ্ধ বলেছিলেন, আত্মদীপ হও, আত্মশরণ হও। 'স্ফুলিঙ্গের' একটি কবিতা-কণায় রবীন্দ্রনাথও আমাদের সেই কথা বলেছেন (র/৪/৮৮০)—

"আপনারে দীপ করি জ্বালো,
আপনার যাত্রাপথে
আপনিই দিতে হবে আলো।"

রবীন্দ্রনাথের চিন্তাজগৎ

ধর্মচিন্তা ঃ

রবীন্দ্ররচনা-সংকলন

এক । উন্মেষ: ছিন্নপত্রের কাল

১। ধর্ম

ভারতী, ১২৯০ চৈত্র (১৮৮৩)

প্রেমের যোগ্যতা

একেবারেই প্রেমের যোগ্য নহে এমন জীব কোথায়! যত বড়ই পাপী অসাধু কুশ্রী সে হউক না কেন, তাহার মা ত তাহাকে ভালবাসে। অতএব দেখিতেছি, তাহাকেও ভালবাসা যায়, তবে আমি ভালবাসিতে না পারি সে আমার অসম্পূর্ণতা।

পথ

যেমন, জড়ই বল আর প্রাণীই বল সকলেরই মধ্যে এক মহা চৈতন্যের নিয়ম কার্য করিতেছে, যাহাতে করিয়া উত্তরোত্তর প্রাণ অভিব্যক্ত হইয়া উঠিতেছে, তেমনি পাপীই বল আর সাধুই বল সকলেরই মধ্যে অসীম পুণ্যের এক আদর্শ বর্তমান থাকিয়া কার্য করিতেছে। স্বর্গের পাথেয় সকলেরই কাছে রহিয়াছে, কেহই তাহা হইতে বঞ্চিত নহে। তবে কেহ বা সোজা রাজপথে চলিয়াছে, কেহ বা নির্বুদ্ধিতাবশতই হউক, কৌতূহলবশতই হউক, একবার মোড় ফিরিয়া গলির মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে, অবশেষে বহুক্ষণ ধরিয়া এ-গলি ও-গলি সে-গলি করিয়া পুনশ্চ সেই রাজপথে বাহির হইয়া পড়িতেছে, মাঝের হইতে পথ ও পাথের কষ্ট বিস্তর বাড়িয়া যাইতেছে। কিন্তু জগতের সমুদয় পথই একই দিকে চলিয়াছে, তবে কোনটার বা ঘোর বেশী, কোনটার বা ঘোর কম এই যা তফাৎ।

পাপ পুণ্য

অতএব পাপ বলিয়া যে একটা স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আছে তাহা নহে। পাপীর যে ধার্মিকের চেয়ে বেশী কিছু আছে তাহা নহে, ধার্মিকের যতটা আছে পাপীর ততটা নাই এই পর্যন্ত। পাপীর ধর্মবুদ্ধি অচেতন অপরিণত। পাপ অভাব, পাপ মিথ্যা, পাপ মৃত্যু। অতএব আর সকলই থাকিবে, কেবল পাপ থাকিবে না—যেমন অন্ধকার-ঈথর কম্পনপ্রভাবে উত্তরোত্তর আলোক হইয়া উঠে, তেমনি পাপ চৈতন্যের প্রভাব উত্তরোত্তর পুণ্যে পরিণত হইতে থাকিবে।

চেতনা

যাহা ধ্রুব তাহাই ধর্ম। এই ধ্রুবের আশ্রয়ে আছে বলিয়াই জগতের মৃত্যুভয় নাই। একটি ধ্রুবসূত্রে এই সমস্ত বিশ্বচরাচর মালার মতন গাঁথা রহিয়াছে। ক্ষুদ্রতম হইতে বৃহত্তম কিছুই সেই সূত্র হইতে বিচ্ছিন্ন নহে, অতএব সকলেই ধর্মের বাঁধনে বাঁধা। তবে, সেই বন্ধন সম্বন্ধে কেহ বা সচেতন কেহ বা অচেতন। অচেতনের বন্ধনই দাসত্ব, আর সচেতনের বন্ধনই প্রেম।

অচৈতন্য

আমরা যতখানি অচেতন, ততখানি সচেতন নহি ইহা নিশ্চয়ই। আমাদের শরীরের মধ্যে কোথায় কোন্ যন্ত্র কিরূপে কাজ করিতেছে, তাহার কিছুই আমরা জানি না। একটুখানি যেখানে জানি, সেখানে অনেকখানিই জানি না। শরীরের সম্বন্ধে যাহা খাটে, মনের সম্বন্ধেও ঠিক তাহাই খাটে। আমাদের মনে যে কি আছে তাহা অতি যৎসামান্য পরিমাণে আমরা জানি মাত্র, যাহা জানি না তাহাই অগাধ। কিন্তু যাহা জানি না তাহাও যে আছে, ইহা অনেকেই বিশ্বাস করিতে চাহেন না। তাঁহারা বলেন, মনের কার্য জানা, মনে আছে অথচ জানিতেছি না, এ কথাটাই স্বতোবিরুদ্ধ কথা—এমন স্থলে, না-হয় বলাই গেল যে তাহা নাই।

বিজ্ঞান-গ্রন্থে নিম্নলিখিত ঘটনা অনেকেই পড়িয়া থাকিবেন। একজন মূর্খ দাসী বিকারের অবস্থায় অনর্গল লাটিন আওড়াইতে লাগিল। সহজ-অবস্থায় লাটিনের বিন্দুবিসর্গও সে জানে না। ক্রমে অনুসন্ধান করিয়া জানা গেল, পূর্বে সে একজন লাটিন পন্ডিতের নিকট দাসী ছিল। যদিও লাটিন শিখে নাই ও জাগ্রত অবস্থায় তাহার লাটিনের স্মৃতি সম্পূর্ণ নিদ্রিত থাকে, তথাপি উক্ত পন্ডিত-কর্তৃক উচ্চারিত লাটিন পদগুলি তাহার মনের মধ্যে সমস্তই বাস করিতেছিল। সকলেই জানেন বিজ্ঞান-গ্রন্থে এরূপ উদাহরণ বিস্তর আছে।

বিস্মৃতি

আমাদের স্মরণশক্তি অতি ক্ষুদ্র, বিস্মৃতি অতিশয় বৃহৎ। কিন্তু বিস্মৃতি অর্থে ত বিনাশ বুঝায় না। স্মৃতি বিস্মৃতি একই জাতি। একই স্থানে বাস করে। বিস্মৃতির বিকাশকেই বলে স্মৃতি, কিন্তু স্মৃতির অভাবকেই যে বিস্মৃতি বলে তাহা নহে। এই অতি বিপুল বিস্মৃতি আমাদের মনের মধ্যে বাস করিতেছে। বাস করিতেছে মানে কি নিদ্রিত আছে, তাহা নহে। অবিশ্রাম কাজ করিতেছে, এবং কোন কোনটা স্মৃতিরূপে পরিস্ফুট হইয়া উঠিতেছে। আমাদের রক্তচলাচল অনুভব করিতেছি না বলিয়া যে রক্ত চলিতেছে না, তাহা বলিতে পারি না। পুরুষানুক্রমবাহী কতশত গুণ আমাদের মধ্যে অজ্ঞাতসারে বাস করিতেছে। তাহার অনেকগুলিই হয়ত আমাতে বিকশিত হইল না, আমার উত্তর পুরুষে বিকশিত হইয়া উঠিবে। এইগুলি, এই অতি নিকটের সামগ্রীগুলিই যদি আমরা না জানিতে পারিলাম, তবে সমস্ত জগতের আত্মা যে আমার মধ্যে গূঢ়ভাবে বিরাজ করিতেছে তাহা আমি জানিব কি করিয়া! জগতের হৃদয়ের মধ্য দিয়া আমার হৃদয়ে যে একই সূত্র চলিয়া গিয়াছে তাহা অনুভব করিব কি করিয়া! কিন্তু সে অবিশ্রাম তাহার কার্য করিতেছে। আমি কি জানি বিশ্ব-সংসারের প্রত্যেক পরমাণু অহর্নিশি আমাকে আকর্ষণ করিতেছে এবং আমিও বিশ্ব-সংসারের প্রত্যেক পরমাণুকে অবিশ্রাম আকর্ষণ করিতেছি? কিন্তু জানি না বলিয়া কোন্ কাজটা বন্ধ রহিয়াছে!

জগতের বন্ধন

বিশ্ব-জগতের মধ্য দিয়া আমাদের মধ্যে যে দৃঢ়সূত্র প্রবাহিত হইয়া গিয়াছে ইহাই ছিন্ন করিয়া ফেলা মুক্তি, এইরূপ কথা শুনা যায়। কিন্তু ছিন্ন করে কাহার সাধ্য! আমি আর জগৎ কি স্বতন্ত্র? কেবল একটা ঘরগড়া বাঁধনে বাঁধা? সেইটে ছিঁড়িয়া ফেলিলেই

আমি বাহির হইয়া যাইব? আমি ত জগৎ-ছাড়া নই, জগৎ আমা-ছাড়া নয়। আমরা সকলেই জগৎকে গণনা করিবার সময়, আমাকে ছাড়া আর সকলকেই জগতের মধ্যে গণ্য করি, কিন্তু জগৎ ত সে গণনা মানে না।

জগৎ দিনরাত্রি অনন্তের দিকে ধাবমান হইতেছে, কিন্তু তথাপি অনন্ত হইতে অনন্ত দূরে। তাহাই দেখিয়া অধীর হইয়া আমি যদি মনে করি, জগতের হাত এড়াইতে পারিলেই আমি অনন্ত লাভ করিব, তাহা হয়ত ভ্রম হইত পারে। অনন্তের উপরে লাফ দেওয়া ত চলে না। আমাদের সমস্ত লম্ফঝম্প এইখানেই। এই জগতের উপরেই লাফাইতেছি, এই জগতের উপরেই পড়িতেছি। আর, এই জগতের হাত হইতে অব্যাহতিই বা পাই কি করিয়া? ক'ড়ে আংগুলটা হঠাৎ যদি একদিন এমনতর স্থির করে যে, অসুস্থ শরীরের প্রান্তে বাস করিয়া আমিও অসুস্থ হইয়া পড়িতেছি, অতএব এ শরীরটা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া আমি আলাদা ঘরকন্না করিগে—সে কিরূপ ছেলেমানুষের মত কথাটা হয়! সে যতই বাঁকিতে থাকুক, যতই গা-মোড়া দিক, খানিকটা পর্যন্ত তাহার স্বাধীনতা আছে কিন্তু তাই বলিয়া একেবারে বিচ্ছিন্ন হইবার ক্ষমতা তাহার হাতে নাই। সমস্ত শরীরের স্বাস্থ্য তাহার সহিত লিপ্ত, এবং তাহার স্বাস্থ্য সমস্ত শরীরের সহিত লিপ্ত। জগতের এই পরমাণুরাশি হইতে একটি পরমাণু যদি কেহ সরাইতে পারিত তবে আর এ জগৎ কোথায় থাকিত! তেমনি এক জনের খেয়ালের উপরে মাত্র নির্ভর করিয়া জগতের হিসাবে একটি জীবাত্মা কম পড়িতে পারে এমন সম্ভাবনা যদি থাকে, তাহা হইলে সমস্ত জগৎটা 'ফেল' হইয়া যায়। কিন্তু জগতের খাতায় এরূপ বিশৃংখলা এরূপ ভুল হইবার কোন সম্ভাবনা নাই। অতএব আমাদের বুঝা উচিত জগতের বিরোধী হওয়াও যা, নিজের বিরোধী হওয়াও তা, জগতের সহিত আমাদের এতই ঐক্য।

যে পথে তপন শশী আলো ধরে আছে,
সে পথ করিয়া তুচ্ছ; সে আলো ত্যজিয়া,
ক্ষুদ্র এই আপনার খদ্যোত-আলোকে
কেন অন্ধকারে মরি পথ খুঁজে খুঁজে!

পাখী যবে উড়ে যায় আকাশের পানে,
সেও ভাবে এনু বুঝি পৃথিবী ত্যজিয়া।
যত ওড়ে, যত ওড়ে, যত ঊর্ধ্বে যায়
কিছুতে পৃথিবী তবু পারে না ত্যেজিতে
অবশেষে শ্রান্ত দেহে নীড়ে ফিরে আসে।

জগতের ধর্ম

অতএব প্রকৃতির মধ্যে যে ধ্রুব বর্তমান, স্বেচ্ছাপূর্বক সচেতনে সেই ধ্রুবের অনুগামী হওয়াই ধর্ম। ধর্ম শব্দের অর্থই দেখ না কেন। যাহাতে আবরণ বা নিবারণ করে তাহাই বর্ম, যাহাতে ধারণ করে তাহাই ধর্ম। দ্রব্যবিশেষের ধর্ম কি? যাহা অভ্যন্তরে বিরাজ করিয়া সেই দ্রব্যকে ধারণ করিয়া আছে ; অর্থাৎ যাহার প্রভাবে সেই দ্রব্যের দ্রব্যত্ব খাড়া

হইয়াছে। জগতের ধর্ম কি? জগৎ যে অচল নিয়মের উপর আশ্রয় করিয়া বর্তমান রহিয়াছে তাহাই জগতের ধর্ম, এবং তাহাই জগতের প্রত্যেক অনুকণার ধর্ম।

উদাহরণ

একটি উদাহরণ দিই। জগতের একটি প্রধান ধর্ম পরার্থপরতা। স্বার্থপরতা জগতের ধর্ম-বিরুদ্ধ। এই নিমিত্ত জগতের কোথাও স্বার্থপর নাই। পরের জন্য কাজ করিতেই হইবে তা ইচ্ছা কর আর না কর। জগতের প্রত্যেক পরমাণু তাহার পরবর্তী ও তাহার নিকটবর্তীর জন্য, তাহার নিজের মধ্যে তাহার বিরাম নাই; তাহার প্রত্যেক কার্য অনন্ত জগতের লক্ষকোটি স্নায়ুর মধ্যে তরঙ্গিত হইতেছে। একটি বালুকণা যদি কেহ ধ্বংস করিতে পারে তবে নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের পরিবর্তন হইয়া যায়। তুমি স্বার্থপরভাবে বিদ্যা উপার্জন ও মনের উন্নতি সাধন করিলে, কিন্তু জানিতেও পারিলে না, সে বিদ্যার ও সে উন্নতির লক্ষকোটি উত্তরাধিকারী আছে। তুমি দাও না-দাও তোমার সন্তানশ্রেণীর মধ্যে সে উন্নতি প্রবাহিত হইবে। তোমার আশেপাশে চারি দিকে সেই উন্নতির ঢেউ লাগিবে। তুমি ত দুই দিনে পৃথিবী হইতে সরিয়া পড়িবে, কিন্তু তোমার জীবনের সমস্তটাই পৃথিবীর জন্য রাখিয়া যাইতে হইবে—তুমি মরিয়া গেলে বলিয়া তোমার জীবনের এক মুহূর্ত হইতে ধরণীকে বঞ্চিত করিতে পারিবে না, প্রকৃতির আইন এমনি কড়াক্কড়।

সচেতন ধর্ম

অতএব এ জগতে স্বার্থপর হইবার জো নাই। পরার্থপরতাই এ জগতের ধর্ম। এই নিমিত্তই মানুষের সর্বোৎকৃষ্ট ধর্ম পরের জন্য আত্মোৎসর্গ করা। জগতের ধর্ম আমাদিগকে আগে হইতেই পরের জন্য উৎসৃষ্ট করিয়া রাখিয়াছে, সে বিষয়ে আমরা জগতের জড়াদপি জড়ের সমতুল্য। কিন্তু আমরা যখন স্বেচ্ছায় সচেতনে সেই মহাধর্মের অনুগমন করি তখনই আমাদের মহত্ত্ব, তখনই আমরা জড়ের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। কেবল তাহাই নয়, তখনই আমরা মহৎ সুখ লাভ করি। তখনই আমরা দেখিতে পাই যে, স্বার্থপরতায় সমস্ত জগৎকে এক পার্শ্বে ঠেলিয়া তাহার স্থানে অতি ক্ষুদ্র আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাই। কিন্তু পারিব কেন? অহর্নিশি অশান্তি, অসুখ, হৃদয় ক্লান্ত হইয়া পড়ে, কিছুতেই তাহার আরাম থাকে না। যতই সে উপার্জন করিতে থাকে, যতই সে সঞ্চয় করিতে থাকে, ততই তাহার ভার বৃদ্ধি হইতে থাকে মাত্র। কিন্তু যখনি আপনাকে ভুলিয়া পরের জন্য প্রাণপণ করি তখনি দেখি সুখের সীমা নাই। তখনি সহসা অনুভব করিতে থাকি সমস্ত জগৎ আমার স্বপক্ষে। আমি ছিলাম ক্ষুদ্র, হইলাম অত্যন্ত বৃহৎ। চন্দ্র সূর্যের সহিত আমার বন্ধুত্ব হইল।

জগতস্রোতে ভেসে চল
যে যেথা আছ ভাই,
চলেছে যেথা রবিশশী
চল রে সেথা যাই!

অপক্ষপাত

জগৎ ত কাহাকেও একঘরে করে না, কাহারো ধোপা নাপিত বন্ধ করে না। চন্দ্র সূর্য রৌদ্র বৃষ্টি, জগতের সমস্ত শক্তি সমগ্রের এবং প্রত্যেক অংশের অবিশ্রাম সমান দাসত্ব করিতেছে। তাহার কারণ এই জগতের মধ্যে যে কেহ বাস করে কেহই জগতের বিরোধী নহে। পাপী অসাধুরা জগতের নীচের ক্লাসে পড়ে মাত্র, কিন্তু তাই বলিয়া ত তাহাদিগকে ইস্কুল হইতে তাড়াইয়া দিতে পারা যায় না। বাইবেলের অনন্ত নরক একটা সামাজিক জুজু বই ত আর কিছু নয়। পাপ নাকি একটা অভাব মাত্র, এই নিমিত্ত সে এত দুর্বল যে তাহাকে পিষিয়া মারিয়া ফেলিবার জন্য একটা অনন্ত জাঁতার আবশ্যক করে না। সমস্ত জগৎ তাহার প্রতিকূলে তাহার সমস্ত শক্তি অহর্নিশি প্রয়োগ করিতেছে। পাপ পুণ্যে পরিণত হইতেছে, আত্মম্ভরিতা বিশ্বম্ভরিতার দিকে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িতেছে।

সকলে আত্মীয়

নিতান্ত ঘৃণা করিয়া আর কাহাকেও একেবারে পর মনে করা শোভা পায় না। সকলেরই মধ্যে এত ঐক্য আছে। ঘুঁটে মহাশয় মস্ত লোক হইতে পারেন, তাই বলিয়া যে গোবরের সঙ্গে সমস্ত আদান প্রদান একেবারেই বন্ধ করিয়া দিবেন ইহা তাঁহার মত উন্নতিশীলের নিতান্ত অনুপযুক্ত কাজ।

জড় ও আত্মা

পূর্বেই ত বলিয়াছি আমাদের অধিকাংশই অচেতন, একটুখানি সচেতন মাত্র। তবে তার জড়কে দেখিয়া নাসা কুঞ্চিত করা কেন? আমরা একটা প্রকান্ড জড়, তাহারই মধ্যে একরত্তি চেতনা বাস করিতেছে। আত্মায় ও জড়ে যে বাস্তবিক জাতিগত প্রভেদ আছে তাহা নহে। অবস্থাগত প্রভেদ মাত্র। আলোক ও অন্ধকারে এতই প্রভেদ যে মনে হয় উভয়ে বিরোধীপক্ষ। কিন্তু বিজ্ঞান বলে, আলোকের অপেক্ষাকৃত বিশ্রামই অন্ধকার এবং অন্ধকারের অপেক্ষাকৃত উদ্যমই আলোক। তেমনি আত্মার নিদ্রাই জড়ত্ব এবং জড়ের চেতনাই আত্মার ভাব।

বিজ্ঞান বলে, সূর্যকিরণে অন্ধকার-রশ্মিই বিস্তর, আলোক-রশ্মি তাহার তুলনায় ঢের কম; একটুখানি আলোক অনেকটা অন্ধকারের মুখপাতের স্বরূপ। তেমনি আমাদের মনেও একটুখানি চৈতন্যের সহিত অনেকখানি অচেতনতা জড়িত রহিয়াছে। জগতেও তাহাই। জগৎ একটি প্রকান্ড গোলাকার কুঁড়ি, তাহার মুখের কাছটুকুতে একটুখানি চেতনা দেখা দিয়াছে। সেই মুখটুকু যদি উদ্ধৃত হইয়া বলে আমি মস্তলোক, জগৎ অতি নীচ, উহার সংসর্গে থাকিব না, আমি আলাদা হইয়া যাইব, তবে সে কেমনতর শোনায়?

মৃত্যু

ধর্মকে আশ্রয় করিলে মৃত্যুভয় থাকে না। এখানে মৃত্যু অর্থে ধ্বংসও নহে, মৃত্যু অর্থে অবস্থাপরিবর্তনও নহে। মৃত্যু অর্থে জড়তা। অচেতনতাই অধর্ম। ধর্মকে যতই আশ্রয় করিতে থাকিব, ততই চৈতন্য লাভ করিতে থাকিব, ততই অনুভব করিতে থাকিব, যে মহাচৈতন্যে সমস্ত চরাচর অনুপ্রাণিত হইয়াছে, আমার মধ্য দিয়া এবং আমাকে প্লাবিত করিয়া সেই চৈতন্যের স্রোত প্রবাহিত হইতেছে। যথার্থ জগৎকে জ্ঞানের দ্বারা জানিবার কোন সম্ভাবনা নাই, চৈতন্য দ্বারা জানিতে হইবে।

জগতের সহিত ঐক্য

জগৎকে কাঠগড়ায় দাঁড় করাইয়া সওয়াল-জবাব করাইলে সে খুব অল্প কথাই বলে, জগতের ঘরে বাস করিলে তবে তাহার যথার্থ খবর পাওয়া যায়। তাহা হইলে জগতের হৃদয় তোমার হৃদয়ে তরঙ্গিত হইতে থাকে; তখন তুমি যে কেবলমাত্র তর্কদ্বারা জ্ঞানকে জান তাহা নহে, হৃদয়ের দ্বারা জ্ঞানকে অনুভব কর। আমরা যে কিছুই জানিতে পারি না তাহার প্রধান কারণ আমরা নিজেকে জগৎ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখি; যখনি হৃদয়ের উন্নতি-সহকারে জগতের সহিত অনন্ত ঐক্য মর্মের মধ্যে অনুভব করিতে থাকিব, তখনি জগতের হৃদয়-সমুদ্র সমস্ত বাঁধ ভাঙ্গিয়া আমার মধ্যে উথলিত হইয়া উঠিবে, আমি কতখানি জানিব কতখানি পাইব তাহার সীমা নাই। একটুখানি বুদ্বুদের মত অহঙ্কারে ফুলিয়া উঠিয়া স্বাতন্ত্র্য-অভিমানে জগতের তরঙ্গে তরঙ্গে ভাসিয়া বেড়াইলে মহত্ত্বও নাই, সুখও নাই। জগতের সহিত এক হইবার উপায় জগতের অনুকূলতা করা, অর্থাৎ ধর্ম আশ্রয় করা। ধর্ম, জগতের প্রাণগত চেতনা; তিনি নহিলে তোমার অসাড়তা কে দূর করিবে?

মূল ধর্ম

একজন বলিতেছেন, যখন প্রকৃতির মধ্যে সর্বত্রই নৃশংসতা দেখিতেছি, তখন নিষ্ঠুরতা যে জগতের ধর্ম নহে এ কে বলিতেছে? জগতের অস্তিত্বই স্বয়ং বলিতেছে। নিষ্ঠুরতাই যদি জগতের মূলগত নিয়ম হইত, হিংসাই যদি জগতের আশ্রয়স্থল হইত, তবে জগৎ এক মুহূর্ত বাঁচিত না। উপর হইতে যাহা দেখি তাহা ধর্ম নহে। উপর হইতে আমরা ত চতুর্দিকে পরিবর্তন দেখিতেছি, কিন্তু জগতের মূল ধর্ম কি অপরিবর্তনীয় নহে? আমরা চারি দিকেই ত অনৈক্য দেখিতেছি, কিন্তু তাহার মূলে কি ঐক্য বিরাজ করিতেছে না? তাহা যদি না করিত, তাহা হইলে এ জগৎ বিশৃঙ্খলার নরকরাজ্য হইত, সৌন্দর্যের স্বর্গরাজ্য হইত না। তাহা হইলে কিছু হইতেই পারিত না, কিছু থাকিতেই পারিত না।

একটি রূপক

অনেক লোক আছেন, তাঁহারা জগতের সর্বত্রই অমঙ্গল দেখেন। তাঁহাদের মুখে জগতের অবস্থা যেরূপ শুনা যায়, তাহাতে তাহার আর এক মুহূর্ত টিকিয়া থাকিবার কথা নহে। সর্বত্রই যে শোক-তাপ দুঃখ-যন্ত্রণা দেখিতেছি এ কথা অস্বীকার করা যায় না, কিন্তু তবুও ত জগতের সঙ্গীত থামে নাই! তাহার কারণ, জগতের প্রাণের মধ্যে গভীর আনন্দ বিরাজ করিতেছে। সে আনন্দ-আলোক কিছুতেই আচ্ছন্ন করিতে পারিতেছে না, বরঞ্চ যত কিছু শোক তাপ সেই দীপ্ত আনন্দে বিলীন হইয়া যাইতেছে। শিবের সহিত জগতের তুলনা হয়। অসীম অন্ধকার-দিক্-বসন পরিয়া ভূতনাথ-পশুপতি জগৎ কোটি কোটি ভূত লইয়া অনন্ত তান্ডবে উন্মত্ত! কণ্ঠের মধ্যে বিষ পূর্ণ রহিয়াছে, তবু নৃত্য। বিষধর সর্প তাঁহার অঙ্গের ভূষণ হইয়া রহিয়াছে, তবু নৃত্য। মরণের রঙ্গভূমি শ্মশানের মধ্যে তাঁহার বাস, তবু নৃত্য। মৃত্যুস্বরূপিণী কালী তাঁহার বক্ষের উপর সর্বদা বিচরণ করিতেছেন; তবু তাঁহার আনন্দের বিরাম নাই। যাঁহার প্রাণের মধ্যে অমৃত ও আনন্দের অনন্ত প্রস্রবণ, এত হলাহল এত অমঙ্গল তিনিই যদি ধারণ করিতে না পারিবেন তবে আর কে পারিবে! সর্পের ফণা, হলাহলের নীলদ্যুতি বাহির হইতে দেখিয়া আমরা শিবকে দুঃখী মনে

করিতেছি, কিন্তু তাঁহার জটাজালের মধ্যে প্রচ্ছন্ন অমৃতনিস্যান্দিনী পুণ্য-ভাগীরথীর আনন্দ-কল্লোল কি শুনা যাইতেছে না ? নিজের ডমরুধ্বনিতে, নিজের অস্ফুট হর্ষগানে উন্মত্ত হইয়া নিজে যে অবিশ্রাম নৃত্য করিতেছেন, তাহার গভীর কারণ কি দেখিতে পাইতেছি ? বাহিরের লোকে তাঁহাকে দরিদ্র বলিয়া মনে করে বটে, কিন্তু তাঁহার গৃহের মধ্যে দেখ দেখি, অন্নপূর্ণা চিরদিন অধিষ্ঠান করিতেছেন। আর ঐ যে মলিনতা দেখিতেছ, শ্মশানের ভস্ম দেখিতেছ, মৃত্যুর চিহ্ন দেখিতেছ, ও কেবল উপরে—ঐ শ্মশানভস্মের মধ্যে আচ্ছন্ন রজতগিরিনিভ চারুচন্দ্রাবতংস অতি সুন্দর অমর বপু দেখিতেছ না কি ? উনি যে মৃত্যুঞ্জয়। আর, মৃত্যুকে কি আমরা চিনি ? আমরা মৃত্যুকে করালদশনা লোলরসনা মূর্তিতে দেখিতেছি, কিন্তু ঐ মৃত্যুই ইহাঁর প্রিয়তমা, ঐ মৃত্যুকে বক্ষে ধরিয়া ইনি আনন্দে বিহবল হইয়া আছেন। কালীর যথার্থ স্বরূপ আমাদের জানিবার কোন সম্ভাবনা নাই, আমাদের চক্ষে তিনি মৃত্যু-আকারে প্রতিভাত হইতেছেন, কিন্তু ভক্তেরা জানেন কালীও যা গৌরীও তাই। আমরা তাঁহার করালমূর্তি দেখিতেছি, কিন্তু তাঁহার মোহিনীমূর্তি কেহ কেহ বা দেখিয়া থাকিবেন। শিবকে সকলে যোগী বলে। ইনি কাহার যোগে নিমগ্ন রহিয়াছেন ?

যোগী হে, কে তুমি হৃদি-আসনে,
বিভূতিভূষিত শুভ্রদেহ, নাচিছ দিক্-বসনে!
মহা আনন্দে পুলককায়,
গঙ্গা উথলি উছলি যায়,
ভালে শিশু শশী হাসিয়া চায়,
জটাজুট ছায় গগনে।

আলোচনা, র/১৪/৫৯৭-৬০৪

টীকা ঃ

ধর্ম—প্রবন্ধটি 'আলোচনা' গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত। ১৮৮৫ খৃঃ গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়েছিল। এর পরবর্তী আর কোন সংস্করণ প্রকাশিত হয়নি। এখন এটি রবীন্দ্ররচনাবলীর অচলিতসংগ্রহে বি: ভা: গৃহীত হয়েছে।

২। আত্মা

তত্ত্ববোধিনী, শ্রাবণ ১৮৮৪ (১২৯১)

আত্মগঠন

সকল দ্রব্যই যাহা-কিছু নিজের অনুকূল উপযোগী তাহাই আপন শক্তিপ্রভাবে চারি দিক হইতে আকর্ষণ করিতে থাকে, বাকী আর সকলের প্রতি তাহার তেমন ক্ষমতা নাই।

নিজেকে যথাযোগ্য আকারে ব্যক্ত ও পরিপুষ্ট করিবার পক্ষে যে-সকল পদার্থ সর্বাপেক্ষা উপযোগী উদ্ভিদশক্তি কেবল তাহাই জল বায়ু মৃত্তিকা হইতে গ্রহণ করিতে পারে, আর কিছুই না। মানুষের জীবনীশক্তিও কিছুতেই আপনাকে উদ্ভিদ্‌শরীরের মধ্যে ব্যক্ত করিতে পারে না। সে নিজের চারি দিকে এমন সকল পদার্থই সঞ্চয় করিতে পারে যাহা তাহার নিজের প্রকাশের পক্ষে সর্বাপেক্ষা অনুকূল। মনের মধ্যে একটা পাপের সংকল্প তাহার চারি দিকে সহস্র পাপের সংকল্প আকর্ষণ করিয়া আপনাকে আকারবদ্ধ করিয়া তুলে ও প্রতিদিন বৃহৎ হইতে থাকে। পুণ্যসংকল্পও সেইরূপ। সজীবতার ইহাই লক্ষণ। আমরা যখন একটি প্রবন্ধ লিখি, তখন কিছু সেই প্রবন্ধের প্রত্যেক ভাব প্রত্যেক কথা ভাবিয়া লিখিতে বসি না। একটা মুখ্য সজীব ভাব যদি আমার মনে আবির্ভূত হয়, তবে সে নিজের শক্তি-প্রভাবে আপনার অনুকূল ভাব ও শব্দগুলি নিজের চারি দিকে গঠিত করিতে থাকে। আমি যে-সকল ভাব কোনকালেও ভাবি নাই তাহাদিগকেও কোথা হইতে আকর্ষণ করিয়া আনে। এইরূপে সে একটি পরিপূর্ণ প্রবন্ধ-আকার ধারণ করিয়া আপনাকে আপনি মানুষ করিয়া তুলে। এই জন্য, প্রবন্ধের মর্মস্থিত মুখ্য ভাবটি যত সজীব হয় প্রবন্ধ ততই ভাল হয়; নির্জীব ভাব আপনাকে আপনি গড়িতে পারে না, বাহির হইতে তাহার কাঠামো গড়িয়া দিতে হয়। এ নিমিত্ত ভাল লেখা লেখকের পক্ষেও একটি শিক্ষা। তিনি যতই অগ্রসর হইতে থাকেন ততই নূতন জ্ঞান লাভ করিতে থাকেন।

আত্মার সীমা

আমার মনে হয়, মানুষের আত্মাও এইরূপ ভাবের মত। ভাব নিজেকে ব্যক্ত করিতে চায়। যেটি তাহার নিজের সর্বশ্রেষ্ঠ বাহ্য বিকাশ তাহাই আশ্রয় করিতে করিতেই তাহার ক্রমাগত পুষ্টিসাধন হয়। আমরা মনের মধ্যে যাহা অনুভব করি, কার্যই তাহার বাহ্য প্রকাশ। এই জন্য আমাদের অধিকাংশ অনুভাব কাজ করিবার জন্য ব্যাকুল, আবার কাজ যতই সে করিতে থাকে ততই সে বাড়িয়া উঠিতে থাকে। আমাদের আত্মাও সেইরূপ সর্বাপেক্ষা অনুকূল অবস্থায় নিজেকে প্রকাশ করিতে চায়। এবং সেই প্রকাশ-চেষ্টা-রূপ কার্যেতেই তাহার উত্তরোত্তর পুষ্টিসাধন হইতে থাকে। চারি দিকের বাতাস হইতে সে আপনার অনুরূপ ভাবনা কামনা প্রবৃত্তি আকর্ষণ করিয়া নিজের আবরণ, নিজের সীমা নিজে রচনা করিতে থাকে। অবশিষ্ট আর কিছুরই উপরে তাহার কোন প্রভুত্ব নাই। আমরা সকলেই বন্ধু বান্ধব ও অবস্থার দ্বারা বেষ্টিত হইয়া একটি যেন ডিম্বের মধ্যে বাস করিতেছি, ঐটুকুর মধ্য হইতেই আমাদের উপযোগী খাদ্য শোষণ করিতেছি। একটি ব্যক্তিবিশেষকে যখন আমরা দেখি তখন তাহার চারিদিকের মন্ডলী আমরা দেখিতে পাই না। কিন্তু তাহার সেই খাদ্যাধারমন্ডলী তাহার সংগে সংগে অলক্ষিত ভাবে ফিরিতেছে। যে ব্যক্তি সৌন্দর্যপ্রিয় সে তাহার দেহের মধ্যে, তার চর্মাবরণটুকুর মধ্যে বাস করে না। সে তাহার চারিদিকের তরুলতার মধ্যে আকাশের জ্যোতিষ্কমন্ডলীর মধ্যে বাস করে। সে যেখানেই যায় চন্দ্রসূর্যময় আকাশ তাহার সংগে সংগে ফিরে, তৃণ-পত্র-পুষ্প-ময়ী বনশ্রী তাহাকে ঘিরিয়া রাখে। ইহারা তাহার ইন্দ্রিয়ের মত। চন্দ্র-সূর্যের মধ্য দিয়া সে কি দেখিতে পায়; কুসুমের সৌগন্ধ ও সৌন্দর্যের সাহায্যে তাহার হৃদয়ের ক্ষুধা নিবৃত্ত হইতে থাকে। এই মন্ডলীর বিস্তার লইয়া মানুষের ছোটবড়ত্ব। মনুষ্যের যে দেহ মাপিতে পারা যায় সে দেহ গড়ে প্রায় সকলেরই সমান। কিন্তু যে দেহ দেখা যায় না, মাপা যায় না, তাহার ছোট

বড় সামান্য নহে। এই দেহ, এই মন্ডলী, এই বৃহৎ দেহ, এই অবস্থাগোলক, যাহার মধ্যে আমাদের শাবক আত্মার খাদ্য সঞ্চিত ছিল, ইহাই ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া সে পরলোকে জন্মগ্রহণ করে।

মানুষ চেনা

যেমন মানুষের বৃহৎ দেহটি আমরা দেখিতে পাই না, তেমনি যথার্থ মানুষ যে তাহাকেও দেখিতে পাই না। এই জন্য কাহারও জীবনচরিত লেখা সম্ভব নহে। কারণ, লেখকেরা মানুষের কাজ দেখিয়া তাহার জীবনচরিত্‌ লেখেন। কিন্তু যে গোটাকতক কাজ মানুষ করিয়াছে তাই তিনি দেখিতে পান, লক্ষ লক্ষ কাজ যাহা সে করে নাই তাহা ত তিনি দেখিতে পান না। আমরা তাহার কতকগুলা কাজের টুকরা এখান ওখান হইতে কুড়াইয়া জোড়া দিয়া একটা জীবন চরিত খাড়া করিয়া তুলি, কিন্তু তাহার সমগ্রটি ত দেখিতে পাই না। তাহার মধ্যস্থিত যে মহাপুরুষ অসংখ্য অবস্থায় অসংখ্য আকার ধারণ করিতে পারিত, তাহাকে ত দেখিতে পাই না। তাহার কাজ-কর্মের মধ্যে বরঞ্চ সে ঢাকা পড়িয়া যায়; আমরা কেবলমাত্র উপস্থিতটুকু দেখিতে পাই; যত কাজ হইয়া গিয়াছে, যত কাজ হইবে, এবং যত কাজ হইতে পারিত, উপস্থিত কার্যখন্ডের সহিত তাহার যোগ দেখিতে পাই না। আমরা মুহূর্তে মুহূর্তে এক-একটা কাজ দেখিয়া সেই কার্য-কারকের মুহূর্তে মুহূর্তে এক-একটা নাম দিই। সেই নামের প্রভাবে তাহার ব্যক্তি-বিশেষত্ব ঘুচিয়া যায়, সে একটা সাধারণ শ্রেণী-ভুক্ত হইয়া পড়ে, সুতরাং ভিড়ের মধ্যে তাহাকে হারাইয়া ফেলি। আমরা রামকে যখন খুনী বলি, তখন সে পৃথিবীর লক্ষ লক্ষ খুনীর সহিত এক হইয়া যায়। কিন্তু রাম-খুনী ও শ্যাম-খুনীর মধ্যে এই খুন সম্বন্ধেই এমন আকাশ পাতাল প্রভেদ যে উভয়কে এক নাম দিলে বুঝিবার সুবিধা হওয়া দূরে থাকুক, বুঝিবার ভ্রম হয়। আমরা প্রত্যহ আমাদের কাছের লোকদিগকে এইরূপে ভুল বুঝি। তাড়াতাড়ি তাহাদের এক-একটা নামকরণ করিয়া ফেলি ও নামের কৃত্রিম খোলসটার মধ্যেই সেই ব্যক্তি ঢাকা পড়িয়া যায়। অনেক সময়ে মানুষ অনুপস্থিত থাকিলেই তাহাকে ঠিক জানিতে পারি। কারণ, সকল মানুষই বৃহৎ। বৃহৎ জিনিসকে দূর হইতে দেখিলেই তাহার সমস্তটা দেখা যায়, কিন্তু তাহার অত্যন্ত কাছে লিপ্ত থাকিয়া দেখিলে তাহার খানিকটা অংশ দেখা যায় মাত্র, সেই অংশকেই সমস্ত বলিয়া ভ্রম হয়। মানুষ অনুপস্থিত থাকিলে আমরা তাহার দুই চারি বর্তমান মুহূর্ত মাত্র দেখি না, যতদিন হইতে তাহাকে জানি, ততদিনকার সমষ্টিস্বরূপে তাহাকে জানি। সুতরাং সেই জানাটাই অপেক্ষাকৃত যথার্থ। পৃথিবীর অধিবাসীরা পৃথিবীকে কেহ বলিবে উঁচু, কেহ বলিবে নীচু, কেহ বলিবে উঁচু-নীচু। কিন্তু যে লোক পৃথিবী হইতে আপনাকে তফাত করিয়া সমস্ত পৃথিবীটা কল্পনা করিয়া দেখে, সে এই সামান্য উঁচুনীচুগুলিকে গ্রাহ্য না করিয়া বলিতে পারে যে পৃথিবী সমতল গোলক। কথাটা খাঁটি সত্য নহে, কিন্তু সর্বাপেক্ষা সত্য।

শ্রেষ্ঠ অধিকার

আত্মার উপরে শ্রেষ্ঠ অধিকার কাহার জন্মিয়াছে? যে আত্ম-বিসর্জন করিতে পারে। নাবালক যে, তাহার বিষয় আশয় সমস্তই আছে বটে, কিন্তু সে বিষয়ের উপর তাহার অধিকার নাই—কারণ, তাহার দানের অধিকার নাই। এই দানের অধিকারই

সর্বশ্রেষ্ঠ অধিকার। যে ব্যক্তি পরকে দিতে পারে সেই ধনী। যে নিজেও খায় না পরকেও দেয় না, কেবলমাত্র জমাইতে থাকে, তাহার নিজের সম্পত্তির উপর কতটুকুই বা অধিকার! যে নিজে খাইতে পারে, কিন্তু পরকে দিতে পারে না, সেও দরিদ্র—কিন্তু যে পরকে দিতে পারে, নিজের সম্পত্তির উপরে তাহার সর্বাঙ্গীণ অধিকার জন্মিয়াছে। কারণ, ইহাই চরম অধিকার।

আমাদের পুরাণে যে বলে, যে ব্যক্তি ইহজন্মে দান করে নাই সে পরজন্মে দরিদ্র হইয়া জন্মিবে, তাহার অর্থ এইরূপ্ হইতে পারে যে, টাকা ত আর পরকালে সঙ্গে যাইবে না, সুতরাং টাকাগত ধনিত্ব বৈতরণীর এপার পর্যন্ত। যদি কিছু সঙ্গে যায় ত সে হৃদয়ের সম্পত্তি।

যাহার সমস্ত টাকা কেবল নিজের জন্য—নিজের গাড়িটি ঘোড়াটির জন্যই লাগে, তাহার লাখ টাকা থাকিলেও তাহাকে দরিদ্র বলা যায় এই কারণে যে, তাহার এত সামান্য আয় যে তাহাতে কেবল তাহার নিজের পেটটাই ভরে, তাও ভরে না বুঝি! তাহার কিছুই বাকী থাকে না—যতই কিছু আসে তাহার নিজের অতি মহৎ শূন্যতা পূরাইতে, অতি বৃহৎ দুর্ভিক্ষদারিদ্র দূর করিতেই খরচ হইয়া যায়। সুতরাং যখন সে বিদায় হয় তখন তাহার সেই প্রকান্ড শূন্যতা ও হৃদয়ের দুর্ভিক্ষই তাহার সঙ্গে সঙ্গে যায়, আর কিছুই যায় না। লোকে বলে, ঢের টাকা রাখিয়া মরিল! ঠিক কথা, কিন্তু এক পয়সাও লইয়া মরিল না।'

নিষ্ফল আত্মা

সুতরাং, আত্মাকে যে দিতে পারিয়াছে আত্মা সর্বতোভাবে তাহারই। আত্মা ক্রমশই অভিব্যক্ত হইয়া উঠিতেছে। জড় হইতে মনুষ্য-আত্মার অভিব্যক্তি; মধ্যে কত কোটি কোটি বৎসরের ব্যবধান। তেমনি স্বার্থসাধনতৎপর আদিম মনুষ্য ও আত্মবিসর্জনরত মহদাশয়ের মধ্যে কত যুগের ব্যবধান। একজন নিজের আত্মাকে ভালরূপ পায় নাই, আর-একজনের আত্মা তাহার হাতে আসিয়াছে। আত্মার উপরে যাহার অধিকার জন্মে নাই, সে যে আত্মাকে রক্ষা করিতে পারিবে তাহা কেমন করিয়া বলিব? সকল মনুষ্য নহে—মনুষ্যদের মধ্যে যাঁহারা সর্বশ্রেষ্ঠ, যথার্থ হিসাবে তাঁহাদেরই আত্মা আছে। যেমন গুটিকতক ফল ফলাইবার জন্য শতসহস্র নিষ্ফল মুকুলকে আবশ্যক, তেমনি গুটিকতক অমর আত্মা অভিব্যক্ত হয়, এবং লক্ষ লক্ষ মানবাত্মা নিষ্ফল হয়।

আত্মার অমরতা

আত্মবিসর্জনের মধ্যেই আত্মার অমরতার লক্ষণ দেখা যায়। যে আত্মায় তাহা দেখা যায় না সে আত্মার যতই বর্ণ থাকুক ও যতই গন্ধ থাকুক তাহা বন্ধ্যা। একজন মানুষ কেনই বা আত্মবিসর্জন করিবে! পরের জন্য নিজেকে কেনই বা কষ্ট দিবে। ইহার কি যুক্তি আছে! যাহার সহিত নিতান্তই আমার সুখের যোগ, তাহাই আমার অবলম্ব্য আর কিছুর জন্যই আমার মাথাব্যথা নাই, এই ত ইহসংসারের শাস্ত্র। জগতের প্রত্যেক পরমাণুই আর সমস্ত উপেক্ষা করিয়া নিজে টিকিয়া থাকিবার জন্য প্রাণপণে যুঝিতেছে, সুতরাং স্বার্থপরতার একটা যুক্তিসঙ্গত অর্থ দেখা যাইতেছে। কিন্তু এই স্বার্থপরতার উপরে মরণের অভিশাপ দেখা যায়, কারণ ইহা সীমাবদ্ধ। ঐহিকের নিয়ম ঐহিকেই অবসান, সে নিয়ম কেবল এইখানেই খাটে। সে নিয়মে যাহারা চলে তাহারা ঐহিক

অতিক্রম করিয়া আর কিছুই দেখিতে পায় না, আর কিছুর উপরেই বিশ্বাস স্থাপন করে না। কেনই বা করিবে ? তাহারা দেখিতেছে এইখানেই সমস্ত হিসাব মিলিয়া যায়, অন্যত্র অনুসন্ধানের আবশ্যকই করে না। কিন্তু অমরতা কখন্ দেখিতে পায় ? পৃথিবীর মাটি হইতে উদ্ভূত হইয়া পৃথিবীতেই মিলাইয়া যাইব, এ সন্দেহ কখন্ দূর হয় ? যখন দেখিতে পাই, আমাদের মধ্যে এমন একটি পদার্থ আছে যে ঐহিকের সকল নিয়ম্ মানে না। আমরা আপনার সুখ চাই না, আমরা আনন্দের সহিত আত্মবিসর্জন করিতে পারি, আমরা পরের সুখের জন্য নিজেকে দুঃখ দিতে কাতর হই না। কোথাও ইহার "কেন" খুঁজিয়া পাই না। কেবল হৃদয়ের মধ্যে অনুভব করিতে পারি যে, নিজের-ক্ষুধায়-কাতর সংগ্রামপরায়ণ সেই জগৎ অতিক্রম করিয়া আর এক জগৎ আছে, ইহা সেইখানকার নিয়ম। সুতরাং এইখানেই পরিণাম দেখিতেছি না। চারি দিকে এই যে বস্তুজগতের ঘোর কারাগারভিত্তি উঠিয়াছে, ইহাই আমাদের অনন্ত কবর-ভূমি নহে। অতএব যখনি আমরা আত্মবিসর্জন করিতে শিখিলাম তখনি আমাদের গুরুভার ঐহিক দেহের উপরে দুটি পাখা উঠিল। পৃথিবীর মাটিতে চলিবার সময় সে পাখা দুটির কোন অর্থ বুঝা গেল না। কিন্তু ইহা বুঝা গেল যে ঐ পাখা দুটি কেবলমাত্র তাহার শোভা নহে, উহার কার্য আছে। তবে যাহাদের এই পাখা জন্মায় নাই তাহাদেরও কি আকাশে উঠিবার অধিকার আছে ?

স্থায়িত্ব

আমাদের মধ্যে যে-সকল উচ্চ আশা যে-সকল মহত্ত্ব বিরাজ করিতেছে তাহারাই স্থায়ী; আর যাহারা তাহাদিগকে বাধা দিয়াছে, তাহাদিগকে কার্যে পরিণত হইতে দেয় নাই, তাহারা নশ্বর। তাহারা এইখানকারই জিনিস, তাহারা কিছু সঙ্গে সঙ্গে যাইবে না। আমার মধ্যে যে-সকল নিত্য পদার্থ বিরাজ করিতেছে তাহা তোমরা দেখিতে পাইতেছ না; তাহাদের চারি দিকে যে জড়স্তূপ উত্থিত হইয়া কিছু দিনের মত তাহাদিগকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে, তাহাই তোমরা দেখিতেছ। আমার মনের মধ্যে যে ধর্মের আদর্শ বর্তমান রহিয়াছে তাহারই উপর আমার স্থায়িত্ব নির্ভর করিতেছে। যখন কাষ্ঠলোষ্ট্রের মত সমস্ত পড়িয়া থাকে তখন ধর্মই আমাদের অনুগমন করে। যাহার আত্মায় এ আদর্শ নাই, দেহের সহিত তাহার সম্পূর্ণ মৃত্যু হয়। জড়ত্বই তাহার পরিণাম। যে গেছে, সে তাহার জীবনের সার পদার্থ লইয়া গেছে, তাহার যা যথার্থ জীবন তাহাই লইয়া গেছে, আর তাহার দুদিনের সুখ দুঃখ, দুদিনের কাজকর্ম আমাদের কাছে রাখিয়া গেছে। তাহার জীবনে অনেক সময়ে আজিকার মতের সহিত কালিকার মতের অনৈক্য দেখিয়াছি; এমন-কি তাহার মত একরূপ শুনা গিয়াছে, তাহার কাজ আর একরূপ দেখা গিয়াছে—এই সকল বিরোধ অনৈক্য চঞ্চলতা তাহার আত্মার জড় আবরণের মত এইখানেই পড়িয়া রহিল, ইহাকে অতিক্রম করিয়া যে ঐক্য যে অমরতা অধিষ্ঠিত ছিল তাহাই কেবল চলিয়া গেল। যখন তাহার দেহ দগ্ধ করিয়া ফেলিলাম তখন এগুলিও দগ্ধ করিয়া শ্মশানে ফেলিয়া আসা যাক্। তাহার সেই মৃত অনিত্যগুলিকে লইয়া অনর্থক সমালোচনা করিয়া কেন তাহার প্রতি অসম্মান করি ? তাহার মধ্যে যে সত্য, যে দেবতা ছিল, যে থাকিবে, সেই আমাদের হৃদয়ের মধ্যে অধিষ্ঠান করুক্।

আলোচনা, র/১৪/৬১৫-২০

৩। ছিন্নপত্রাবলী-১

২০শে আশ্বিন ১২৯৮ (১৮৯১)

...পৃথিবীতে জানলার ধারে একলা বসে চোখ মেলে দেখলেই মনে নতুন নতুন সাধ জন্মায়—নতুন সাধ ঠিক নয়—পুরোনো সাধ নানা নূতন মূর্তি ধারণ করতে আরম্ভ করে। পরশুদিন অমনি বোটের জানলার কাছে চুপ করে বসে আছি, একটা জেলেডিঙিতে একজন মাঝি গান গাইতে গাইতে চলে গেল—খুব যে সুস্বর তা নয়—হঠাৎ মনে পড়ে গেল বহুকাল হল ছেলেবেলায় বাবামশায়ের সঙ্গে বোটে করে পদ্মায় আসছিলুম—একদিন রাত্তির প্রায় দুটোর সময় ঘুম ভেঙে যেতেই বোটের জানলাটা তুলে ধরে মুখ বাড়িয়ে দেখলুম নিস্তরঙ্গ নদীর উপরে ফুটফুটে জ্যোৎস্না হয়েছে, একটি ছোট্ট ডিঙিতে একজন ছোকরা একলা দাঁড় বেয়ে চলেছে, এমনি মিষ্টি গলায় গান ধরেছে গান তার পূর্বে তেমন মিষ্টি কখনো শুনি নি। হঠাৎ মনে হল, আবার যদি জীবনটা ঠিক সেইদিন থেকে ফিরে পাই! আর একবার পরীক্ষা করে দেখা যায়—এবার তাকে আর তৃষিত শুষ্ক অপরিতৃপ্ত করে ফেলে রেখে দিই নে—কবির গান গলায় নিয়ে একটি ছিপছিপে ডিঙিতে জোয়ারের বেলায় পৃথিবীতে ভেসে পড়ি, গান গাই এবং বশ করি এবং দেখে আসি পৃথিবীতে কোথায় কী আছে; আপনাকেও একবার জানান দিই, অন্যকেও একবার জানি; জীবনে যৌবনে উচ্ছ্বসিত হয়ে বাতাসের মতো একবার হু হু করে বেড়িয়ে আসি, তার পরে ঘরে ফিরে এসে পরিপূর্ণ প্রফুল্ল বার্ধক্য কবির মতো কাটাই। খুব যে একটা উঁচু আইডিয়াল তা নয়। জগতের হিত করা এবং যিশুখৃষ্টের মতো মরা এর চেয়ে ঢের বেশি বড়ো আইডিয়াল হতে পারে—কিন্তু আমি সব-সুদ্ধ যে রকম লোক আমার ওটা মনেও উদয় হয় না, এবং ও রকম করে শুকিয়ে মরতে ইচ্ছেও করে না।....উপবাস ক'রে, আকাশের দিকে তাকিয়ে, অনিদ্র থেকে, সর্বদা মনে মনে বিতর্ক ক'রে পৃথিবীকে এবং মনুষ্যত্বকে কথায় কথায় বঞ্চিত ক'রে, স্বেচ্ছারচিত দুর্ভিক্ষে এই দুর্লভ জীবন ত্যাগ করতে চাই নে। পৃথিবী যে সৃষ্টিকর্তার একটা ফাঁকি এবং শয়তানের একটা ফাঁদ তা না মনে ক'রে একে বিশ্বাস ক'রে, ভালোবেসে এবং যদি অদৃষ্টে থাকে তো ভালোবাসা পেয়ে, মানুষের মতো বেঁচে এবং মানুষের মতো মরে গেলেই যথেষ্ট—দেবতার মতো হাওয়া হয়ে যাবার চেষ্টা করা আমার কাজ নয়।

ছিন্নপত্রাবলী, র/১১/৪৩-৪৪

টীকা ঃ

ছিন্নপত্রাবলী—১৯১২ সালে রবীন্দ্রনাথের 'ছিন্নপত্র' বইটি প্রকাশিত হয়। বইটি পত্রসংকলন। এর অধিকাংশ চিঠিই ভ্রাতুষ্পুত্রী ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণীকে লেখা। রচনাকাল ১৮৮৫ থেকে ১৮৯৫। রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পরে ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণীকে লেখা আরো অনেক চিঠি সংযোজিত ও অপরকে লেখা চিঠি বাদ দিয়ে 'ছিন্নপত্রাবলী' বইটি প্রকাশিত হয়।

৪। মুক্তি (চন্দ্রনাথ বসুর ছোটগল্পের সমালোচনা প্রসঙ্গে)

সাধনা, পৌষ ১২৯৮

....মুক্তি যে সংসারের বাহিরে হিমালয়ের শিখরের উপরে প্রাপ্তব্য তাহা সংগত বোধ হয় না। মুক্তি অর্থে আত্মার স্বাধীনতা, কিন্তু স্বাধীনতা অর্থে শূন্যতা নহে। অধিকার যত বিস্তৃত হয় আত্মার ক্ষেত্র ততই ব্যাপ্ত হয়। সেই অধিকার বিস্তারের উপায় প্রেম। প্রেমের বিষয়কে বিনাশ করিয়া মুক্তি নহে, প্রেমের বিষয়কে ব্যাপ্ত করিয়াই মুক্তি। বৈষয়িক স্বার্থপরতায় আমরা সমস্ত সুখ সম্পদ কেবল নিজের জন্য সঞ্চয় করিতে চেষ্টা করি—কিন্তু সুখকে অনেকের মধ্যে বিভাগ করিয়া না দিলে সুখের প্রসারতা হয় না—এই জন্য কৃপণ প্রেমের বৃহত্তর সুখ হইতে বঞ্চিত হয়। আত্মসুখে বিশ্বসুখকে বাদ দিলে আত্মসুখ অতি ক্ষুদ্র হইয়া পড়ে। তেমনি আধ্যাত্মিক স্বার্থপরতায় আমরা আপনার আত্মাটি কক্ষে লইয়া অনন্ত বিশ্বকে লংঘন করিয়া একাকী মুক্তিশিখরের উপরে চড়িয়া বসিতে চাহি। কিন্তু প্রেমের মুক্তি সেরূপ নহে—যে বিশ্বকে ঈশ্বর ত্যাগ করেন নাই, সে বিশ্বকে সেও ত্যাগ করে না। যে দিন নিখিলকে আপনার ও আপনাকে নিখিলের করিতে পারিবে সেই দিনই তাহার মুক্তি। কিন্তু তাহার পূর্ব্বে অসংখ্য সোপান আছে তাহার কোনটিকে অবহেলা করিবার নহে। অধিকারের স্বাধীনতা এবং অধিকার হীনতার স্বাধীনতায় আকাশপাতাল প্রভেদ।

টীকা:

মুক্তি—চন্দ্রনাথ বসু 'মুক্তি' নামে একটি ছোটগল্প লিখেছিলেন। সাধনা পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথ সেই গল্পের সমালোচনা করেছেন। এই অংশটি ঐ সমালোচনা থেকে গৃহীত হয়েছে।

চন্দ্রনাথ বসু— বঙ্কিমচন্দ্রের আমলের প্রখ্যাত প্রবন্ধকার। হিন্দু-পুনরুজ্জীবনের চিন্তানায়কদের অন্যতম। শকুন্তলাতত্ত্ব, ত্রিধারা প্রভৃতি গ্রন্থের রচয়িতা। হিন্দুধর্ম ও সংস্কৃতি নিয়ে বঙ্গদর্শন, প্রচার প্রভৃতি পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখেছেন।

জন্ম—১৮৪৪, মৃত্যু—১৯১০।

৫। ছিন্নপত্রাবলী-২

৪ঠা জুলাই ১৮৯৩ (১৩০০)

.....সৃষ্টি কখনোই সুখের হতে পারে না। যতক্ষণ অপূর্ণতা, ততক্ষণ দুঃখ থাকবেই। জগৎ যদি জগৎ না হয়ে ঈশ্বর হত তা হলেই কোথাও কোনো খুঁত থাকত না—কিন্তু ততটা দূর পর্যন্ত দরবার করতে সাহস হয় না। ভেবে দেখলে সকল কথাই গোড়ায় গিয়ে ঠেকে যে, সৃষ্টি হল কেন। কিন্তু সেটা সম্বন্ধে কোনো আপত্তি যদি না করা যায়, তা হলে

জগতে দুঃখ রইল কেন এ নালিশ উত্থাপন করা মিথ্যা। সেইজন্যে বৌদ্ধেরা একেবারে গোড়া ঘেঁষে কোপ মারতে চায়; তারা বলে যতক্ষণ অস্তিত্ব আছে ততক্ষণ দুঃখের সংশোধন হতে পারে না, একেবারে নির্বাণ চাই। খৃষ্টানরা বলে দুঃখটা খুব উচ্চ জিনিষ, ঈশ্বর স্বয়ং মানুষ হয়ে আমাদের জন্যে দুঃখ বহন করেছেন। তাতে যতটা সান্ত্বনা হয়। কিন্তু নৈতিক দুঃখ এক, আর পাকা ধনে ডুবে যাওয়ার দুঃখ আর। আমি বলি যা হয়েছে বেশ হয়েছে; এই-যে আমি হয়েছি এবং এই আশ্চর্য জগৎ হয়েছে, বড়ো তোফা হয়েছে— এমন জিনিষটা নষ্ট না হলেই ভালো। বুদ্ধদেব তদুত্তরে বলেন, এ জিনিষটা যদি রক্ষা করতে চাও তা হলে দুঃখ সইতে হবে। আমি নরাধম তদুত্তরে বলি, ভালো জিনিষ এবং প্রিয় জিনিষ রক্ষা করতে যদি দুঃখ সইতেই হয় তা হলে দুঃখ সব—তা, আমি থাকি আর আমার জগৎটি থাকুক। মাঝে মাঝে অন্নবস্ত্রের কষ্ট, মনঃক্ষোভ, নৈরাশ্য বহন করতে হবে; কিন্তু সে দুঃখের চেয়ে যখন অস্তিত্ব ভালোবাসি এবং অস্তিত্বের জন্যই সে দুঃখ বহন করি, তখন তো আর কোনো কথা বলা শোভা পায় না।

ছিন্নপত্রাবলী, র/১১/১১৪-১১৫

৬। ছিন্নপত্রাবলী-৩

৩০শে আষাঢ় ১৩০০ (১৮৯৩)

...যখন কোণে বসে বসে কতকগুলো কৃত্রিম কল্পনার দ্বারা আপনার দেবতাকে আচ্ছন্ন করে নিজের মনটাকেও একটা অস্বাভাবিক সুতীব্র অবস্থায় নিয়ে যাওয়া গেছে এমন সময় যদি হঠাৎ একটা সংশয়বজ্র প'ড়ে সেই-সমস্ত সুদীর্ঘকালের কৃত্রিম প্রাচীর ভেঙে যায়, তখন হঠাৎ প্রকৃতির শোভা, সূর্যের আলোক এবং বিশ্বজনের কল্লোলগান এসে আমার তন্ত্রমন্ত্র ধূপধুনার স্থান অধিকার করে এবং তখন দেখতে পাই সেই যথার্থ আরাধনা এবং তাতেই দেবতার তুষ্টি। বোধ হয় উড়িষ্যার মন্দিরগুলো দেখে দেখে আমার এই রকম একটা ভাব মনে এসে থাকবে। ভুবনেশ্বরের একটা মন্দিরের ভিতরে যেখানে দেবতা সেখানে ভয়ানক অন্ধকার, বদ্ধ, ধূপের গন্ধে নিশ্বাসরোধ হয়—ঠাকুরের অভিষেক-জলে মেজে স্যাঁতসেতে, বাদুড় চামচিকে উড়ছে, সেখান থেকে বাইরের সুন্দর আলোতে হঠাৎ আসবামাত্র দেবতা যে কোন্‌খানে আছেন টের পাওয়া যায়।

ছিন্নপত্রাবলী, র/১১/১১৮-১২০

৭। এবার ফিরাও মোরে

২৩ ফাল্গুন ১৩০০, (১৮৯৩)

....বলো, মিথ্যা আপনার সুখ,
মিথ্যা আপনার দুঃখ। স্বার্থমগ্ন যেজন বিমুখ
বৃহৎ জগৎ হতে সে কখনো শেখেনি বাঁচিতে।
মহাবিশ্বজীবনের তরঙ্গেতে নাচিতে নাচিতে
নির্ভয়ে ছুটিতে হবে, সত্যেরে করিয়া ধ্রুবতারা,
মৃত্যুরে না করি শংকা। দুর্দিনের অশ্রুজলধারা
মস্তকে পড়িবে ঝরি—তারি মাঝে যাব অভিসারে
তার কাছে, জীবনসর্বস্বধন অর্পিয়াছি যারে
জন্ম জন্ম ধরি। কে সে? জানি না কে। চিনি নাই তারে-
শুধু এইটুকু জানি—তারি লাগি রাত্রি-অন্ধকারে
চলেছে মানবযাত্রী যুগ হতে যুগান্তর-পানে
ঝড়ঝঞ্ঝা-বজ্রপাতে, জ্বালায়ে ধরিয়া সাবধানে
অন্তরপ্রদীপখানি। শুধু জানি যে শুনেছে কানে
তাহার আহবানগীত, ছুটেছে সে নির্ভীক পরানে
সংকট আবর্তমাঝে, দিয়েছে সে বিশ্ব বিসর্জন,
নির্যাতন লয়েছে সে বক্ষ পাতি মৃত্যুর গর্জন
শুনেছে সে সংগীতের মতো। দহিয়াছে অগ্নি তারে,
বিদ্ধ করিয়াছে শূল, ছিন্ন তারে করেছে কুঠারে,
সর্ব প্রিয়বস্তু তার অকাতরে করিয়া ইন্ধন
চিরজন্ম তারি লাগি জ্বেলেছে সে হোম-হুতাশন—
হৃৎপিন্ড করিয়া ছিন্ন রক্তপদ্ম-অর্ঘ্য-উপহারে
ভক্তিভরে জন্মশোধ শেষ পূজা পূজিয়াছে তারে
মরণে কৃতার্থ করি প্রাণ। শুনিয়াছি তারি লাগি
রাজপুত্র পরিয়াছে ছিন্ন কন্হা, বিষয়ে বিরাগী
পথের ভিক্ষুক। মহাপ্রাণ সহিয়াছে পলে পলে
সংসারের ক্ষুদ্র উৎপীড়ন, বিঁধিয়াছে পদতলে
প্রত্যহের কুশাংকুর, করিয়াছে তারে অবিশ্বাস
মূঢ় বিজ্ঞজনে, প্রিয়জন করিয়াছে পরিহাস
অতিপরিচিত অবজ্ঞায়, গেছে সে করিয়া ক্ষমা
নীরবে করুণনেত্রে—অন্তরে বহিয়া নিরুপমা
সৌন্দর্যপ্রতিমা। তারি পদে মানী সঁপিয়াছে মান,
ধনী সঁপিয়াছে ধন, বীর সঁপিয়াছে আত্মপ্রাণ
তাহারি উদ্দেশে কবি বিরচিয়া লক্ষ লক্ষ গান
ছড়াইছে দেশে দেশে। শুধু জানি তাহারি মহান
গম্ভীর মংগলধ্বনি শুনা যায় সমুদ্রে সমীরে,

তাহারি অঞ্চলপ্রান্ত লুটাইছে নীলাম্বর ঘিরে,
তারি বিশ্ববিজয়িনী পরিপূর্ণা প্রেমমূর্তিখানি
বিকাশে পরমক্ষণে প্রিয়জনমুখে। শুধু জানি
সে বিশ্বপ্রিয়ার প্রেমে ক্ষুদ্রতারে দিয়া বলিদান
বর্জিতে হইবে দূরে জীবনের সর্ব অসম্মান;
সম্মুখে দাঁড়াতে হবে উন্নত মস্তক উচ্চে তুলি
যে মস্তকে ভয় লেখে নাই লেখা, দাসত্বের ধূলি
আঁকে নাই কলঙ্কতিলক। তাহারে অন্তরে রাখি
জীবনকণ্টকপথে যেতে হবে নীরবে একাকী,
সুখে দুঃখে ধৈর্য ধরি, বিরলে মুছিয়া অশ্রু-আঁখি,
প্রতিদিবসের কর্মে প্রতিদিন নিরলস থাকি,
সুখী করি সর্বজনে। তার পরে দীর্ঘপথশেষে
জীবযাত্রা-অবসানে ক্লান্তপদে রক্তসিক্ত বেশে
উত্তরিব এক দিন শ্রান্তিহরা শান্তির উদ্দেশে
দুঃখহীন নিকেতনে। প্রসন্নবদনে মন্দ হেসে
পরাবে মহিমালক্ষ্মী ভক্তকণ্ঠে বরমাল্যখানি,
করপদ্মপরশনে শান্ত হবে সর্ব দুঃখগ্লানি
সর্ব অমংগল। লুটাইয়া রক্তিম চরণতলে
ধৌত করি দিব পদ আজন্মের রুদ্ধ অশ্রুজলে।
সুচিরসঞ্চিত আশা সম্মুখে করিয়া উদ্‌ঘাটন
জীবনের অক্ষমতা কাঁদিয়া করিব নিবেদন,
মাগিব অনন্ত ক্ষমা। হয়তো ঘুচিবে দুঃখনিশা,
তৃপ্ত হবে এক প্রেমে জীবনের সর্বপ্রেমতৃষা।

চিত্রা, র/১/৪৭৩-৭৬

টীকা ঃ

এবার ফিরাও মোরে— কবিতাটি দেশাত্মমূলক হলেও এর শেষাংশে রবীন্দ্রনাথের ধর্মচিন্তার প্রভাব পড়েছে। এখানে কবিতাটির শেষঅংশ গৃহীত হলো।

৮। **অনুবাদকের প্রশ্ন** (বেদান্তের বিদেশীয় ব্যাখ্যা)

সাধনা, ১৩০১ ভাদ্র (১৮৯৪)

অধ্যাপক ডয়সেন্ বেদান্তমতের যে সুন্দর বিশদ ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহা উপরে প্রকাশিত হইল।

আমরা অনেক সময় এক রহস্যের হস্ত হইতে উদ্ধার পাইবার উদ্দেশ্যে অন্য রহস্যের হস্তে আত্মসমর্পণ করি।

ডয়সেন্ সাহেব বেদান্তমত অবলম্বন করিয়া দেখাইয়াছেন যে, নির্ব্বিকার ব্রহ্মকর্তৃক সৃষ্টি এবং অনন্ত স্বরূপ ব্রহ্মে ও জীবে বিভাগ কল্পনা করা মানব মুক্তির বিরোধী। সে কথা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু সেই রহস্য ভেদ করিতে চেষ্টা করিয়া যখন বেদান্ত বলেন যে, জগৎ নাই এবং ব্রহ্মে এবং জীবে যে প্রভেদ প্রতীয়মান হয় তাহা ভ্রম মাত্র তখন মানবের মনে যে সহজ দুই একটি প্রশ্ন উদয় হয়, তাহার পরিষ্কার উত্তর পাওয়া যায় না।

প্রশ্ন। ভ্রম কাহার?

উত্তর। জীবের।

ইহাকে মীমাংসা বলে না। কারণ, জীবের ভ্রমে জীব হইতে পারে না।

শংকর কহেন স্থূল সূক্ষ্ম এবং কারণ শরীর নামক উপাধিত্রয়ের দ্বারা আবৃত্ত হওয়াতেই আত্মাকে ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন জ্ঞান হয়। কিন্তু এই শরীর পরিগ্রহ কোথা হইতে হইল? শরীরপরিগ্রহ: কেন ভবতি?

শংকরাচার্য্যই এই প্রশ্ন উত্থাপন করিয়া তাহার উত্তর দিতেছেন।

কর্ম্মণা। কর্ম্ম দ্বারা শরীর পরিগ্রহ হয়।

কর্ম্ম বা কেন ভবতীতি চেৎ? কর্ম্মই বা কিসের দ্বারা হয়?

রাগাদিভ্যঃ। রাগ প্রভৃতি হইতে।

রাগাদিঃ কেন ভবতীতি চেৎ? রাগাদি কি করিয়া হয়?

অভিমানাৎ। অভিমান হইতে।

অভিমানঃ কেন ভবতীতি চেৎ। অভিমান কি জন্য হয়?

অবিবেকাৎ। অবিবেক হইতে।

অবিবেকঃ কেন ভবতীতি চেৎ? অবিবেক কি নিমিত্ত হয়?

অজ্ঞানাৎ। অজ্ঞান হইতে।

অজ্ঞানাং কেন ভবতীতি চেৎ। অজ্ঞান কাহার দ্বারা হয়?

ন কেনাপি ভবতীতি। অজ্ঞানমনাদ্যনির্ব্বচনীয়ম্। কাহার দ্বারাই হয় না। অজ্ঞান অনাদি অনির্ব্বচনীয়।

এক্ষণে দেখা যাইতেছে উপাধিপরিগ্রহ দ্বারা জীবব্রহ্মে ভেদ জ্ঞান হইবার পূর্ব্বকারণ অজ্ঞান, অবিদ্যা।

অজ্ঞান বলিতে আমরা যাহা বুঝি তাহার স্বাধীন সত্তা মনে করিতে পারি না; তাহা কাহাকেও অবলম্বন করিয়া আছে। সে অজ্ঞান যদি ব্রহ্মের হয় তবে ব্রহ্মকে নিরঞ্জন নির্ব্বিকার বলা যায় না। যদি তাহার পৃথক্ অনাদি অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হয় তবে ব্রহ্ম এবং অজ্ঞান এই দুই অস্তিত্ব মানিতে হয়। তবে ওটা কেবল একটা কথার কথা হইয়া দাঁড়ায়। অর্থাৎ ব্রহ্ম এবং অব্রহ্মের পৃথক্ অস্তিত্ব ভিন্ন নামে স্বীকার করা হয়। ব্রহ্মও অনাদি অনির্ব্বচনীয় এবং অজ্ঞানও অনাদি অনির্ব্বচনীয়, অথচ ব্রহ্মই অজ্ঞান নহেন এবং অজ্ঞান ব্রহ্মে নাই। ইহা স্বীকার করা যদি সহজ হয় তবে জীব এবং ব্রহ্ম, জগৎ এবং ঈশ্বর, বিভিন্ন রূপে স্বীকার করাও সহজ।

বেদান্তশাস্ত্রে জগৎভ্রমের যতগুলি উপমা দেওয়া হইয়াছে সমস্তই দ্বৈতমূলক। শুক্তিতে মুক্তাভ্রম। এ ভ্রম ঘটিতে অন্যূন তিনটি পদার্থের আবশ্যক হয়—শুক্তি এবং মুক্তা এবং ভ্রান্ত ব্যক্তি। মৃগতৃষ্ণিকাও এইরূপ। যাহাকে ভ্রম করা যায়, যাহা বলিয়া ভ্রম করা

যায় এবং যে ভ্রম করে এই তিন ব্যতীত ভ্রম কিরূপে সম্ভব হইতে পারে তাহা আমরা কিছুতেই কল্পনা করিতে পারি না!

ডয়সেন্ সাহেব তাঁহার প্রবন্ধের শেষে যে তুলনা প্রয়োগ করিয়াছেন সেই তুলনার দ্বারাই কথাটার আত্মবিরোধ প্রকাশ পায়। মূলের ভাষা উদ্ধৃত করা উচিত।

It is not the falling of the drop into the infinite ocean, it is the whole ocean, becoming free from the fetters of ice, returning from its frozen state to that what it is really and has never ceased to be, to its own all-pervading, eternal, almighty nature.

বস্তুতঃ ইহার অর্থ এই যে, নদী সমুদ্রে পড়িতেছে এ কথা বলা যায় না, কারণ, তাহা হইলে ভেদ স্বীকার করা হয়; কঠিন সমুদ্র গলিয়া স্বাভাবিক স্বরূপ প্রাপ্ত হইল তাহাও বলা যায় না, কারণ, তাহা হইলে স্বরূপের বিক্রিয়া স্বীকার করা হয়—বলিতে হয় সমুদ্র যাহা আছে যাহা ছিল তাহাই রহিল। কিন্তু ইহাতেও অর্থ পাওয়া যায় না, কারণ পূর্ব্বে বলা হইতেছিল জীবন্মুক্ত যখন মৃত্যুপ্রাপ্ত হন তখন তাঁহার কি দশা হয়—তিনি নদীর মত সমুদ্রে পড়েন অথবা কঠিনাবস্থাপ্রাপ্ত সমুদ্রের ন্যায় গ্রীষ্মোত্তাপে গলিয়া স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হন? তাহা হইলে দাঁড়ায় এই যে, যে জীবের মৃত্যুর কথা হইতেছিল সে জীব ছিল না এবং তাঁহার মৃত্যুও হয় নাই। তবে, সে জীব ছিল এ কথা উঠে কোথা হইতে? ভ্রম হইতে। কাহার ভ্রম? যদি ব্রহ্মের ভ্রম হয় তবে ত যথার্থই তাঁহার বিকার উপস্থিত হইয়াছিল। উত্তর, ভ্রম বটে কিন্তু কাহারও ভ্রম নহে। সে স্বতই ভ্রম, সে অনাদি অনির্ব্বচনীয়!

স্বীকার করিতে হয় যে, যদি দ্বৈতবাদ অবলম্বন করা যায় তাহা হইলেও মূলরহস্যের আবর্ত্ত মধ্যে বুদ্ধিতরণী হইয়া গেলেই এইরূপ গোলকধাঁধার মধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতে হয়। কিন্তু যখন কোন অদ্বৈতবাদী দ্বৈতবাদকে যুক্তির বিরোধী বলিয়া নিজ মত সমর্থন করিতে থাকেন তখন তাঁহাকেও কৈফিয়তের দায়িক না করিয়া থাকা যায় না। বোধ করি, অধ্যাত্মরাজ্যের মূল প্রদেশে দ্বৈত এবং অদ্বৈতের কোন এক আশ্চর্য সমন্বয় আছে যাহা আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধির নিকট রহস্যাচ্ছন্ন। সেখানে বোধ করি অংক এবং যুক্তিশাস্ত্রের সমস্ত নিয়ম অতিক্রম করিয়া এককে দুই বলা যায় এবং দুইকে এক বলিলেও অর্থের বিরোধ হয় না।

বেদান্তের ধর্ম্মনীতিবিষয়ে ডয়সেন্ সাহেব যে কথা কয়েকটি বলিয়াছেন তাহার সম্বন্ধেও আমাদের প্রশ্ন আছে।

ডয়সেন্ কহেন পুনঃ পুনঃ জন্মমরণ ও জগৎসৃষ্টির একটি moral necessity অর্থাৎ ধর্ম্মনিয়মগত আবশ্যকতা আছে। অর্থাৎ পুণ্যের পুরস্কার ও পাপের দন্ড বহনের জন্য জন্মলাভ অনন্তধর্ম্মনিয়মের অবশ্যম্ভব বিধান। কর্ম্মফল ফলিতেই হইবে।

কিন্তু অদ্বৈতবাদে ধর্ম্মনিয়মের অবশ্যম্ভবতার কোন অর্থ নাই। যেখানে এক ছাড়া দুই নাই সেখানে "মরল্" বলিয়া কিছু থাকিতেই পারে না।

শংকরাচার্য্যের আত্মানাত্মবিবেক গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত করিয়া পূর্ব্বেই দেখান হইয়াছে—যে, কর্ম্ম অজ্ঞান হইতে উৎপন্ন, এবং অজ্ঞান অনাদি। অজ্ঞান নামক এক অনির্ব্বচনীয় পদার্থ হইতে কর্ম্মনামক এক অনির্ব্বচনীয় পদার্থ উৎপন্ন হইয়া আমাদের

শরীর গ্রহণের কারণ হইয়াছে, এবং সেই অনির্ব্বচনীয় পদার্থের ফলস্বরূপে আমরা শরীরধারীগণ পুনঃ পুনঃ জন্ম ও দুঃখ ভোগ করিতেছি ইহাকে যে-কোন নিয়ম বলা যাক্ ধর্ম্মনিয়ম বলিবার কোন হেতু দেখি না। প্রথমতঃ, অজ্ঞান বলিতে কি বুঝায় আমরা জানি না, এবং জানিতেও পারি না, কারণ তাহা অনির্ব্বচনীয়। (তবে যে কেন তাহাকে অজ্ঞান নাম দেওয়া হইল বলা কঠিন; কারণ, উক্ত শব্দে একটা নির্ব্বাচন প্রকাশ পায়।) দ্বিতীয়তঃ, তাহা হইতে কর্ম্ম হইল বলিতে যে কি বুঝায় আমাদের বলা অসাধ্য, কারণ আমরা কর্ম্ম বলিতে যাহা বুঝি তাহার স্বাধীন সত্তা নাই। অবশেষে আরও কতকগুলি নিরালম্ব গুণপরম্পরা হইতে শরীরী জীবের জন্ম হইল। এ সকল কথা বলাও যা আর শরীরের প্রথম সৃষ্টি কি করিয়া হইল তাহা বলিতে পারি না এবং যদি কেহ বলিতে পারিত তথাপি আমরা বুঝিতে পারিতাম না এ কথা বলাও তা'— বরঞ্চ শেষোক্ত কথাটা অপেক্ষাকৃত সংক্ষেপ ও সরল।

পূর্ব্বোক্ত যুক্তি অনুসারে বেদান্ত যেমন আমাদের শরীর পরিগ্রহের কোন জ্ঞানগম্য কারণ দেখাইতেছেন না, তেমনি আমাদের দুঃখ ভোগেরও কোন কারণ নির্ণয় করিতেছেন না। যে হেতু কর্ম্ম নামক কোন অনির্ব্বচনীয় পদার্থকে আমাদের দুঃখভোগের কারণ বলাও যা, আর আমাদের দুঃখ ভোগের কারণ জানি না বলাও তা।

বেদব্যাসরচিত ব্রহ্মসূত্র গ্রন্থে এ তর্ক উত্থাপিত হইয়াছে। বেদব্যাস বলিতেছেন, ন কর্ম্মাবিভাগাদিতি চেন্ন অনাদিত্বাৎ। অর্থাৎ সৃষ্টির পূর্ব্বে কর্ম্মের বিভাগ ছিল না এ কথা বলা যায় না যেহেতু কর্ম্ম এবং সৃষ্টি কার্য্যকারণরূপে অনাদি। যেমন বীজ ও বৃক্ষ। বীজও বৃক্ষের কারণ এবং বৃক্ষও বীজের কারণ এই ভাবে কোন কালেও কাহারও আদি পাওয়া যায় না।

ইহা হইতে বুঝা যাইতেছে, কর্ম্মের ফল সৃষ্টি এবং সৃষ্টির ফল কর্ম্ম ইহার আর শেষ নাই। বোধ করি এস্থলে কর্ম্ম বলিতে যাহা বুঝায় ইংরাজি ফোর্স বলিতেও তাহা বুঝায়— অর্থাৎ এমন একটা কিছু বুঝায় যাহা আমরা ঠিক বুঝি না অথচ বুদ্ধিগম্য একটা ছবির আভাস আমাদের মনে আসে, কিন্তু সেটা মিলাইয়া দেখিতে গেলে মিলাইতে পারি না।

তথাপি যেমন করিয়াই দেখি এবং বেদান্তশাস্ত্রে যেমন ব্যাখ্যাই পাওয়া যায় শেষকালে দাঁড়ায় এই যে, আমরা কেন হইয়াছি এ প্রশ্নের কোন অর্থ নাই। আমরা হইয়াছি—আমাদের হওয়াটা অনাদি। এবং হওয়াটিই দুঃখভোগের কারণ—সুতরাং কেন দুঃখভোগ করিতেছি তাহারও কোন কেনত্ব নাই। অতএব এস্থলে "মরল্" অথবা অন্য কোন "নেসেসিটি" দেখা যায় না।

মুক্তিতত্ত্ব সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে, যখন অজ্ঞান অনাদি তখন সে অনন্ত। যতক্ষণ সে আছে ততক্ষণ কাহারো মুক্তি কল্পনা করা যায় না। কারণ, বেদান্ত মতে আমি সকলের অন্তর্গত এবং আমার অন্তর্গত সকলি, যতক্ষণ অজ্ঞান কোথাও আছে ততক্ষণ সে অজ্ঞান আমাকে বদ্ধ করিতেছে। এ যেন আপনার ছায়াকে আপনি লঙ্ঘন করিবার চেষ্টা করার মত।

কেন ব্রহ্ম জগতের সৃষ্টি করিলেন তদুত্তরে ব্রহ্মসূত্র কহেন, লোকবত্তু লীলাকৈবল্যং। লোকেতে যেমন বালকেরা রাজা প্রভৃতি নানারূপ ধারণ করিয়া লীলা করে জগৎও সেইরূপ ব্রহ্মের লীলামাত্র। এ মত অনুসারে, যাঁহার ইচ্ছাতেই জগৎ তাঁহার ইচ্ছা ব্যতীত

জগতের মুক্তি হইতে পারে না। অর্থাৎ তিনি ইচ্ছা করিলে, অথবা ইচ্ছা প্রতিসংহার করিলে তাঁহার জগৎরূপ দূর হইয়া তাঁহার শুদ্ধস্বরূপ প্রকাশ পাইতে পারে, অতএব এস্থলে সমস্ত জগতের বিলয় ব্যতীত ব্যক্তিবিশেষের মুক্তির কোন অর্থ থাকিতে পারে না। কারণ, ব্যক্তিবিশেষ হওয়া তাঁহার ইচ্ছা এবং ব্যক্তিবিশেষ না হওয়াও তাঁহার ইচ্ছা, এবং ব্যক্তিবিশেষ না হইলেও যতক্ষণ জগৎ আছে ততক্ষণ তিনি লীলারূপেই বিরাজ করিবেন।

ডয়সেন্ সাহেব অন্যত্র তাঁহার দর্শনগ্রন্থে প্রকৃতিসম্বন্ধীয় তত্ত্ববিদ্যা নামক পরিচ্ছেদে প্রথম দেখাইয়াছেন যে, কান্টের অকাট্যযুক্তি অনুসারে দেশকাল ও কার্য্যকারণতত্ত্ব আমাদের বুদ্ধির ধর্ম্ম, বাহিরের ধর্ম্ম নহে। অতএব বস্তুকে যে আমরা বস্তুরূপে দেখিতেছি তাহা আমাদের বুদ্ধির রচনা। এই বুদ্ধির আরোপ বাহির হইতে উঠাইয়া লইলে যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহাই বস্তুর যথার্থ স্বরূপ—সেই দেশকাল কারণাতীত সত্তাকে অধ্যাপক মহাশয় শোপেন্‌হোয়ারের মতে উইল (ইচ্ছা) এবং বেদান্ত মতে আত্মা বলিতেছেন। এই একমেবাদ্বিতীয়ং অনবচ্ছিন্ন "উইল" পদার্থের নেতি-আত্মক নির্গুণ ভাবই বিশুদ্ধভাব—তাহাতে পাপ নাই, দুঃখ নাই, অস্তিত্ব নাই।

এই বিশুদ্ধ, দুঃখ বিহীন কামনা বিহীন, নেতিত্বের আনন্দ মধ্যে একটা মোহ একটা পাপের সূচনা দেখা দিল—(কোন বিশেষকালে নহে, আজও বটে অনন্তকালও বটে অনন্তকালের পূর্ব্বেও বটে) এই উইল এই আত্মা ইতি-আত্মক সগুণ ভাব ধারণ করিল।

মূলের ভাষা উদ্ধৃত করি।—

Now there was formed,—not at any time, but before all eternity, today and for ever, like an inexplicable clouding of the clearness of the heavens, in the pure, painless, and will-less bliss of denial a morbid propensity, a sinful bent: the affirmation of the will to life. In it and with it is given the myriad host of all the sins and woes of which this immeasurable world is the revealer.

মানব বুদ্ধি চিরকাল প্রশ্ন করিতেছে সৃষ্টি হইল কেমন করিয়া? দুঃখের উৎপত্তি হইল কেন? শংকরাচার্য্য এবং ডয়সেন্ উত্তর দিতেছেন—এক অনাদি অনির্ব্বচনীয় পদার্থে এক অনাদি অনির্ব্বচনীয় ছায়া পড়িল তাহাই সৃষ্টি তাহাতেই দুঃখ। ইহার সরল অর্থ এই, সৃষ্টিই বা কি আর সৃষ্টির কারণই বা কি আর দুঃখ পাপইবা কেন তাহা কিছুই জানি না। এবং বেদান্ত মতে এই অনাদি অজ্ঞান হইতে মুক্তিই বা কিরূপে এবং মুক্তিই বা কাহার তাহাও সুস্পষ্টরূপে বলা যায় না।

বৌদ্ধ নাস্তিবাদীরা কিছুই মানে না। তাহারা এ কথাও স্বীকার করে না যে জগৎ প্রতিভাত হইতেছে। তাহাদের মতে ব্রহ্মও নাই জগৎও নাই, আমিও নাই তুমিও নাই—তাহাদের যুক্তি কিছুকাল পূর্ব্বে সাধনায় অনুবাদ করিয়া দেখান হইয়াছিল। যাহা অনাদিকাল আছে তাহা অনন্তকালে ধ্বংস হইতে পারে না, তাহাকে মায়াই বল আর সত্যই বল, অতএব তাহাকে একবার স্বীকার করিলে মুক্তি স্বীকার করা যায় না। কিন্তু নাস্তিবাদীরা কিছুই মানে না তাহাদের পক্ষে সকল কথাই সহজ। যদি বলি কিছুই যদি নাই তবে তুমি তাহা প্রমাণ করিতেছ কি করিয়া। তখন তাহারা প্রমাণ করিতে বসে যে

তাহারা প্রমাণ করিতেছে না। যদি বলি, কিছুই যদি নাই তবে তুমি মুক্তির কথা পাড় কেন—তখন সে বলে যখন আমিই নাই, তখন আমি কোন কথা বলিতেছি ইহাও হইতে পারে না। অতএব কোন কথাই স্বীকার না করিলে গায়ের জোর খাটানো সহজ হয়। কিন্তু যখনি এক স্বীকার করা গেল অমনি দুই প্রমাণ করা অসাধ্য হইয়া দাঁড়ায় এবং দুই স্বীকার করিলেই তাহাকে এক বলিয়া চালানো কাহারও সাধ্যায়ত্ত নহে।

যদি আমাকে জিজ্ঞাসা কর, তুমি কি বল ? আমি আদি অন্ত মধ্য কিছুই জানিনা, আমি কেবল এইটুকু জানি আমার হৃদয়ে যে প্রীতি ভক্তি দয়া স্নেহ সৌন্দর্যপ্রেম আছে তাহা অনন্ত চরিতার্থতা চায়—এমন কি আমার সেই সকল আকাঙ্ক্ষার মধ্যেই আমি অনন্তের আস্বাদ পাই—সেই আমার সর্ব্বসফলতা যিনিই হৌন্ যেখানেই থাকুন তিনিই আমার ব্রহ্ম তাঁহাতেই আমার মুক্তি।

সাধনা, ভাদ্র ১৩০১

টীকা ঃ

বেদান্তের বিদেশীয় ব্যাখ্যা— অধ্যাপক ডয়সেনের বেদান্তীয় ব্যাখ্যার সমালোচনা প্রসংগে রবীন্দ্রনাথ 'সাধনা' পত্রিকায় এই সমালোচনাটি প্রকাশ করেন।

সাধনা—পত্রিকাটি ১৮৯১ সালে সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সম্পাদনায় ঠাকুরবাড়ি থেকে প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্রনাথের অনেক রচনা সাধনা পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। পত্রিকার চতুর্থ বর্ষে রবীন্দ্রনাথ এর সম্পাদক হন। ১৮৯৫ সালে সাধনা বন্ধ হয়ে যায়।

অধ্যাপক ডয়সেন (Deussen, Paul)—জার্মান দার্শনিক ও সংস্কৃত পন্ডিত। ভারতীয় দর্শনের গবেষক।

জন্ম—১৮৪৫, মৃত্যু-১৯১৯।

শঙ্করাচার্য—অষ্টম শতকের শেষার্ধের প্রসিদ্ধ কেবলাদ্বৈতবাদী বা মায়াবাদী দার্শনিক। ব্রহ্মসূত্রের বিখ্যাত শারীরক ভাষ্যের প্রণেতা। অনেকে মনে করেন ভারতে বৌদ্ধবিপ্লবের প্রতিরোধে শঙ্করের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য।

ব্রহ্মসূত্র—উপনিষদের সারাংশ, বেদান্তের ভিত্তি। বাদরায়ণের দ্বারা রচিত বলে কথিত। ব্রহ্মসূত্রের অনেকগুলি বিখ্যাত ভাষ্য আছে—শঙ্করাভাষ্য তার মধ্যে অন্যতম প্রধান।

শোপেনহৌয়ার (Schopenhauer, Arthur)—জার্মান দার্শনিক, পাশ্চাত্যদর্শনে দুঃখবাদের প্রবক্তারূপে খ্যাত।

জন্ম—১৭৮৮, মৃত্যু—১৮৬০

কান্ট—জার্মান চিন্তানায়ক, বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ দার্শনিক। ক্রিটিক্যাল—দর্শনপ্রস্থানের (ক্রিটিক্যাল ফিলজফি) প্রতিষ্ঠাতারূপে বিখ্যাত।

জন্ম—১৭২৪, মৃত্যু—১৮০৪

৯। প্রভাত মুখোপাধ্যায়কে পত্র

৯ই অগ্রহায়ণ, ১৩০২, (১৮৯৫)

....বৈষ্ণবধর্মের মূলতত্ত্বটি আমি যেরূপ বুঝি তাহা সংক্ষেপে বলিতে চেষ্টা করিব। অধিকাংশ ধর্মশাস্ত্রেই ঈশ্বরের সহিত বাধ্যবাধকতার সম্বন্ধ উপলব্ধি করিবার উপদেশ আছে। তিনি পিতা আমি পুত্র অতএব তিনি আরাধ্য। তিনি সর্বশক্তিমান আমি সর্ববিষয়েই অক্ষম অতএব তিনি আমার উপাস্য। তিনি মঙ্গল সাধন করিতেছেন আমি মঙ্গল গ্রহণ করিতেছি অতএব তিনি আমার কৃতজ্ঞতাভাজন। ধর্মবুদ্ধির আরও নিম্নতম অবস্থায় তিনি ভীষণ আমি ভীত, তিনি যথেচ্ছাচারী দাতা, আমি স্তুতি-বাদক প্রার্থী।

বৈষ্ণবধর্মে এই বাধ্যবাধকতার সম্বন্ধ অতিক্রম করিয়া ঈশ্বরের সহিত একটি অহেতুকী সম্বন্ধ স্থাপন করিতে চাহে। আমি তাঁহাকে কেন চাহি তাহা আমি জানি না, তাহাকে নহিলে আমার চলে না—পৃথিবীতে আর কিছুতেই আমার চরম পরিতৃপ্তি নাই।

অতএব পৃথিবীতে যে ভালবাসার কোন যুক্তিসংগত হেতু দেখা যায় না—যাহার সহিত পূর্বকৃত কোন সম্বন্ধ-বন্ধন বিচ্ছিন্ন করিয়া দূরূহ দুরাশায় আত্মবিসর্জন করিতে যায় বৈষ্ণব কবিগণ পৃথিবীর সেই ভালবাসাকেই পরমাত্মার প্রতি আত্মার অনিবার্য নিগূঢ় ভালবাসার আদর্শ রূপক স্বরূপে ব্যবহার করিয়াছেন।

আমরা পৃথিবীর সহস্র বন্ধনে বিচিত্রভাবে আবদ্ধ হইয়া বাস করিতেছি তবু এই পার্থিব ব্যাপারের মধ্যে আমাদের সুখ নাই সন্তোষ নাই—তবু মাঝে মাঝে যখন বাঁশি বাজিয়া উঠে তখন আমাদের সংসারগত চিত্ত উতলা হইয়া উদ্দাম হইয়া পরিপূর্ণ প্রেম পরিপূর্ণ সৌন্দর্যের আকাঙ্ক্ষায় আকুল হইয়া গৃহত্যাগ করিতে চাহে।

এই যে অকারণ আকুলতা, এই যে অন্তর্নিহিত অনন্ত অসন্তোষ, এ কে আনয়ন করিল ? ইহার কি আবশ্যক ছিল ?

বৈষ্ণবধর্ম বলে ইহার মধ্যে আবশ্যকতার কোন কথাই নাই। ইহার মূল কথাটা এই, আমি যেমন তাঁহাকে চাই, তিনি তেমনি আমাকে চান আমাকে নহিলে তাঁহার চলে না সেই জন্য তিনি আমাকে এত করিয়া আকর্ষণ করিতেছেন। সেই জন্যই বিশ্বজগতের সর্বত্র তাঁহার বাঁশি আমার নাম ধরিয়া বাজিতেছে। সেইজন্যই আকাশ এমন নীল, শরতের চন্দ্র এমন সুন্দর, বসন্তের পুষ্পবন এমন মোহকর— সেইজন্যই প্রিয়ার মুখে আমরা স্বর্গের আভাস দেখি, শিশুর হাস্যে আমাদের স্নেহ প্রস্রবণ-উচ্ছলিত হইয়া উঠে। সমস্ত সুন্দর জিনিষই আমাকে আমার কাছ হইতে টানিতেছে—আমাকে যেখানে লইয়া গিয়া উত্তীর্ণ করিতেছে সেইখানেই আমার সেই পরম বন্ধু হাস্যমুখে বসিয়া আছেন। আমি যাহাকেই ভালবাসি না কেন, তাঁহাকেই ভালবাসি। সর্বপ্রকার ভাললাগা এবং ভালবাসার অর্থ ঈশ্বরকে ন্যূনাধিক পরিমাণে জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে হৃদয়ের মধ্যে উপলব্ধি করা। যখন একটা সুস্বাদু ফল খাই তখন ফলের মধ্যে চাকতের মত তাঁহাকে স্পর্শ করি—ফল তাহার বস্তুধর্ম লইয়া আমার উদরের শূন্যস্থান পূর্ণ করিতে পারে মাত্র কিন্তু ফলের সাধ্য কি আমাকে লেশমাত্র আনন্দ দেয়—আনন্দ তিনি ছাড়া আর কোথাও নাই; তিনিই একমাত্র আনন্দ জলে স্থলে আকাশে, ফলে ফুলে শস্যে, পিতা পুত্র ভ্রাতায়, পত্নী কন্যা মাতায় বিরাজ করিতেছেন। জগতে যাহা আমার পরম প্রিয় তাহাই আমার পরমেশ্বর—

মন্দিরে গিয়া শাস্ত্রমতে মন্ত্র পড়িয়া যাহার পূজা করিয়া আসি সে জড় পুত্তলিকা মাত্র।

মোট কথা এই, জগতে আমার পক্ষে যাহা কিছু প্রিয় যাহা কিছু সুন্দর সেইখানে বসিয়া আমার ঈশ্বর আমাকে ডাকিতেছেন সেইখানেই তাঁহাতে আমাতে মিলন।

যেখানে তিনি অসীম, আমি সসীম, যেখানে তিনি স্রষ্টা আমি সৃষ্ট, তিনি ঈশ্বর আমি দীন—সেখানে তাঁহাতে আমাতে অত্যন্ত ব্যবধান—সেখানে কিছুতেই তাঁহার নাগাল পাইবার কোন সম্ভাবনা নাই। যেখানে তিনি আমারই জন্য সুন্দর হইয়া প্রিয় হইয়া আমার পুত্র হইয়া বন্ধু হইয়া প্রেমিক হইয়া দেখা দিয়াছেন—সেইখানেই তিনি আমার সমান হইয়া আমার প্রেমপাশে আপনাকে ধরা দিয়াছেন। সেইখানেই তিনি মথুরার রাজত্ব ছাড়িয়া বৃন্দাবনের রাখাল বালকের দলে বাঁশ হাতে করিয়া আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন।

তুমি যদি আমাদের ক্ষুদ্র সমাজনিয়মের গন্ডীর মধ্যে বসিয়া বৈষ্ণবকাব্য পড়িতে প্রবৃত্ত হও, তবে পদে পদে ধিক্কার জন্মিবে—যদি অনন্ত দেশকালের ক্ষেত্রে মানুষের ঘরগড়া সমস্ত কৃত্রিমতা বিস্মৃত হইয়া নবীন শিশুর মত সরলভাবে পড়িয়া যাও তবে উহার অত্যন্ত সহজ অথচ গভীর অর্থ উপলব্ধি করিয়া নিবিড় আনন্দে নিমগ্ন হইবে—এবং জগতের সমস্ত সুখ সৌন্দর্য প্রেম স্বর্গীয় জ্যোতিতে উজ্জ্বল ও নির্মল হইয়া উঠিবে।

সব কথা বুঝানো হইল না—তর্কের বিষয় অনেক রহিয়া গেল—এবং সকল তর্কের মীমাংসা আমার দ্বারা সম্ভব নহে—যাহা হউক বৈষ্ণব ধর্মের আমি যে সার সংকলন করিয়াছি তাহা মোটামুটি শেষ করা গেল।

৯ই অগ্রহায়ণ, ১৩০২ 'দেশ'

টীকা ঃ

প্রভাত মুখোপাধ্যায়—রবীন্দ্রনাথের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে গদ্যরচনায় হাত দেন। কুন্তলীন পুরস্কার পান। তিনি বহুসংখ্যক গল্প ও কয়েকটি জনপ্রিয় উপন্যাসের লেখক। তাঁর সরল, স্নিগ্ধ বিশেষত হাস্যরসাত্মক রচনাগুলি স্মরণীয়। 'মানসী ও মর্মবাণী' পত্রিকার সহযোগী সম্পাদক ছিলেন। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : সিন্দুর কৌটা, রমাসুন্দরী, রত্নদীপ ইত্যাদি।

জন্ম—১৮৭৩, মৃত্যু—১৯৩২

১০। মালিনী

(১৮৯৬)

ক্ষেমংকর।

জানি জানি
ধর্ম কে তোমার।...

ধর্ম ওই তব।
ওই প্রিয়মুখে তুমি রচিয়াছ নব
ধর্মশাস্ত্র আজি।

সুপ্রিয়।

সত্য বুঝিয়াছ সখে।
মোর ধর্ম অবতীর্ণ দীন মর্ত্যলোকে
ওই নারীমূর্তি ধরি। শাস্ত্র এতদিন
মোর কাছে ছিল অন্ধ জীবনবিহীন;
ওই দুটি নেত্রে জ্বলে যে উজ্জ্বল শিখা
সে আলোকে পড়িয়াছি বিশ্বশাস্ত্রে লিখা—
যেথা দয়া সেথা ধর্ম, যেথা প্রেমস্নেহ,
যেথায় মানব, যেথা মানবের গেহ।
বুঝিলাম, ধর্ম দেয় স্নেহ মাতারূপে,
পুত্ররূপে স্নেহ লয় পুন; দাতারূপে
করে দান, দীনরূপে করে তা গ্রহণ;
শিষ্যরূপে করে ভক্তি, গুরুরূপে করে
আশীর্বাদ; প্রিয়া হয়ে পাষাণ-অন্তরে
প্রেম-উৎস লয় টানি, অনুরক্ত হয়ে
করে সর্বত্যাগ। ধর্ম বিশ্বলোকালয়ে
ফেলিয়াছে চিত্তজাল, নিখিল ভুবন
টানিতেছে প্রেমক্রোড়ে—সে মহাবন্ধন
ভরেছে অন্তর মোর আনন্দবেদনে
চাহি ওই উষারুণ করুণ বদনে।
ওই ধর্ম মোর।...

মালিনী, র/৫/৫১৩-১৪

টীকা ঃ

মালিনী—রবীন্দ্রনাথ 'মহাবস্তু অবদান' নামক বৌদ্ধগ্রন্থের অন্তর্গত এক উপাখ্যান অবলম্বনে 'মালিনী' নাট্যকাব্য রচনা করেন। তিনি উপাখ্যানটি সংগ্রহ করেছিলেন—রাজেন্দ্রলাল মিত্রের 'Sanskrit Buddhist Literature in Nepal'গ্রন্থটি থেকে।

১১। বৈরাগ্য

১৪ই চৈত্র ১৩০২

কহিল গভীর রাত্রে সংসারে বিরাগী
"গৃহ তেয়াগিব আজি ইষ্টদেব লাগি।
কে আমারে ভুলাইয়া রেখেছে এখানে?"
দেবতা কহিলা, "আমি।"—শুনিল না কানে।
সুপ্তিমগ্ন শিশুটিরে আঁকড়িয়া বুকে
প্রেয়সী শয্যার প্রান্তে ঘুমাইছে সুখে।
কহিল, "কে তোরা ওরে মায়ার ছলনা?"
দেবতা কহিলা, "আমি"।—কেহ শুনিল না।
ডাকিল শয়ন ছাড়ি, "তুমি কোথা প্রভু"?
দেবতা কহিলা, "হেথা"।—শুনিল না তবু।
স্বপনে কাঁদিল শিশু জননীরে টানি—
দেবতা কহিলা, "ফির।"—শুনিল না বাণী।
দেবতা নিশ্বাস ছাড়ি কহিলেন, "হায়,
আমারে ছাড়িয়া ভক্ত চলিল কোথায়?"

চৈতালি, ব/১/৫৪৫

১২। মহাবিশ্বে মহাকাশে

১৩০৬ মাঘোৎসব, ১৯০০

মহাবিশ্বে মহাকাশে মহাকাল মাঝে
আমি মানব একাকী ভ্রমি বিস্ময়ে, ভ্রমি বিস্ময়ে।।
তুমি আছ, বিশ্বনাথ, অসীম রহস্যমাঝে,
নীরবে একাকী আপন মহিমানিলয়ে।।
অনন্ত এ দেশকালে, অগণ্য এ দীপ্ত লোকে,
তুমি আছ মোরে চাহি— আমি চাহি তোমা-পানে
স্তব্ধ সর্ব কোলাহল, শান্তিমগ্ন চরাচর—
এক তুমি, তোমা মাঝে আমি একা নির্ভয়ে।।

গীতবিতান, ব/৪/১০৭ ১০৮

দুই। 'ধর্মের সরল আদর্শ': নৈবেদ্যের কাল

দুই। 'ধর্মের সরল আদর্শ': নৈবেদ্যের কাল

১৩। অমল কমল সহজে

১৩০৮ আষাঢ়,(১৯০১)

অমল কমল সহজে জলের কোলে
আনন্দে রহে ফুটিয়া;
ফিরিতে না হয় আলয় কোথায় বলে
ধূলায় ধূলায় লুটিয়া।
তেমনি সহজে আনন্দে হরষিত
তোমার মাঝারে রব নিমগ্নচিত,
পূজাশতদল আপনি সে বিকশিত
সব সংশয় টুটিয়া।

কোথা আছ তুমি পথ না খুঁজিব কভু,
শুধাব না কোনো পথিকে।
তোমারি মাঝারে ভ্রমিব ফিরিব প্রভু,
যখন ফিরিবে যে দিকে।
চলিব যখন তোমার আকাশগেহে
তব আনন্দপ্রবাহ লাগিবে দেহে;
তোমার পবন সখার মতন স্নেহে
বক্ষে আসিবে ছুটিয়া।

নৈবেদ্য, র/১/৮৬৩-৬৪

১৪। তোমার অসীমে প্রাণমন লয়ে

১৩০৮ আষাঢ়,(১৯০১)

তোমার অসীমে প্রাণমন লয়ে যত দূরে আমি ধাই—
কোথাও দুঃখ, কোথাও মৃত্যু, কোথা বিচ্ছেদ নাই।।
মৃত্যু সে ধরে মৃত্যুর রূপ, দুঃখ হয় হে দুঃখের কূপ,
তোমা হতে যবে হইয়ে বিমুখ আপনার পানে চাই।।
হে পূর্ণ, তব চরণের কাছে যাহা-কিছু সব আছে আছে আছে—
নাই নাই ভয়, সে শুধু আমারই, নিশিদিন কাঁদি তাই।
অন্তরগ্লানি সংসারভার পলক ফেলিতে কোথা একাকার

জীবনের মাঝে স্বরূপ তোমার রাখিবারে যদি পাই।

গীতবিতান-২৩৪, র/৪/১৮১

১৫। যে ভক্তি তোমারে লয়ে

আষাঢ় ১৩০৮,(১৯০১)

যে ভক্তি তোমারে লয়ে ধৈর্য নাহি মানে,
মুহূর্তে বিহবল হয় নৃত্যগীতগানে
ভাবোন্মাদমত্ততায়, সেই জ্ঞানহারা
উদ্‌ভ্রান্ত উচ্ছলফেন ভক্তিমদধারা
নাহি চাহি নাথ।

দাও ভক্তি শান্তিরস,
স্নিগ্ধ সুধা পূর্ণ করি মঙ্গলকলস
সংসারভবনদ্বারে। যে ভক্তি-অমৃত
সমস্ত জীবনে মোর হইবে বিস্মৃত
নিগূঢ় গভীর, সর্ব কর্মে দিবে বল,
ব্যর্থ শুভ চেষ্টারেও করিবে সফল
আনন্দে কল্যাণে। সর্বপ্রেমে দিবে তৃপ্তি,
সর্ব দুঃখে দিবে ক্ষেম, সর্ব সুখে দীপ্তি
দাহহীন।

সম্বরিয়া ভাব-অশ্রুনীর
চিত্ত রবে পরিপূর্ণ অমত্ত গম্ভীর।

নৈবেদ্য, র/১/৮৮১

১৬। বৈরাগ্যসাধনে মুক্তি

১৯০১

বৈরাগ্যসাধনে মুক্তি, সে আমার নয়।
অসংখ্য বন্ধন-মাঝে মহানন্দময়
লভিব মুক্তির স্বাদ। এই বসুধার
মৃত্তিকার পাত্রখানি ভরি বারম্বার
তোমার অমৃত ঢালি দিবে অবিরত
নানাবর্ণগন্ধময়। প্রদীপের মতো
সমস্ত সংসার মোর লক্ষ বর্তিকায়

জ্বালায়ে তুলিবে আলো তোমারি শিখায়
তোমার মন্দির-মাঝে।

ইন্দ্রিয়ের দ্বার
রুদ্ধ করি যোগাসন, সে নহে আমার।
যে কিছু আনন্দ আছে দৃশ্যে গন্ধে গানে
তোমার আনন্দ রবে তার মাঝখানে।

মোহ মোর মুক্তিরূপে উঠিবে জ্বলিয়া,
প্রেম মোর ভক্তিরূপে রহিবে ফলিয়া।

নৈবেদ্য, র/১/৮৭৪

১৭। হে দূর হইতে দূর

১৩০৮ (১৯০১)

হে দূর হইতে দূর, হে নিকটতম,
যেথায় নিকটে তুমি সেথা তুমি মম,
যেথায় সুদূরে তুমি সেথা আমি তব।
কাছে তুমি নানা ভাবে নিত্য নব নব
সুখে দুঃখে জনমে মরণে। তব গান
জল স্থল শূন্য হতে করিছে আহ্বান
মোরে সর্ব কর্ম মাঝে—বাজে গূঢ়স্বরে
প্রহরে প্রহরে চিত্ত-কুহরে কুহরে
তোমার মঙ্গল-মন্ত্র।

যেথা দূর তুমি
সেথা আত্মা হারাইয়া সর্ব, তটভূমি
তোমার নিঃসীম-মাঝে পূর্ণানন্দভরে
আপনারে নিঃশেষিয়া সমর্পণ করে।
কাছে তুমি কর্মতট আত্মা-তটিনীর,
দূরে তুমি শান্তিসিন্ধু অনন্ত গভীর।

নৈবেদ্য, র/১/৮৯৯

১৮। প্রাচীন ভারতের একঃ

বঙ্গদর্শন, ১৩০৮ ফাল্গুন,(১৯০২)

বৃক্ষ ইব স্তব্ধো দিবি তিষ্ঠত্যেকস্তেনেদং পূর্ণং পুরুষেণ সর্বম্।
বৃক্ষের ন্যায় আকাশে স্তব্ধ হইয়া আছেন সেই এক। সেই পুরুষে, সেই পরিপূর্ণে এ সমস্তই পূর্ণ।

যথা সৌম্য বয়াংসি বাসোবৃক্ষং সম্প্রতিষ্ঠন্তে।
এবং হ বৈ তৎ সর্বং পর আত্মনি সম্প্রতিষ্ঠতে।

হে সৌম্য, পক্ষিসকল যেমন বাসবৃক্ষে আসিয়া স্থির হয়, তেমনি এই যাহা-কিছু সমস্তই পরমাত্মায় প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকে।

নদী যেমন নানা বক্রপথে সরলপথে, নানা শাখা-উপশাখা বহন করিয়া, নানা নির্ঝরধারায় পরিপুষ্ট হইয়া, নানা বাধাবিপত্তি ভেদ করিয়া এক মহা-সমুদ্রের দিকে ধাবমান হয়—মনুষ্যের চিত্ত সেইরূপ গম্যস্থান না জানিয়াও অসীম বিশ্ববৈচিত্র্যে কেবলই এক হইতে আর-একের দিকে কোথায় চলিয়াছিল ? কুতূহলী বিজ্ঞান খন্ড খন্ড পদার্থের দ্বারে দ্বারে অণুপরমাণুর মধ্যে কাহার সন্ধান করিতেছিল ? স্নেহ-প্রীতি পদে পদে বিরহ-বিস্মৃতি-মৃত্যু-বিচ্ছেদের দ্বারা পীড়িত হইয়া, অন্তহীন তৃষ্ণার দ্বারা তাড়িত হইয়া পথে পথে কাহাকে প্রার্থনা করিয়া ফিরিতেছিল ? ভয়াতুরা ভক্তি তাহার পূজার অর্ঘ্য মস্তকে লইয়া অগ্নি-সূর্য-বায়ু-বজ্র-মেঘের মধ্যে কোথায় উদ্‌ভ্রান্ত হইতেছিল ?

এমন সময়ে সেই অন্তবিহীন পথপরম্পরায় ভ্রাম্যমাণ দিশাহারা পথিক শুনিতে পাইল, পথের প্রান্তে ছায়ানিবিড় তপোবনে গম্ভীর মন্ত্রে এই বার্তা উদ্‌গীত হইতেছে—

বৃক্ষ ইব স্তব্ধো দিবি তিষ্ঠত্যেকস্তেনেদং পূর্ণং পুরুষেণ সর্বম্।

বৃক্ষের ন্যায় আকাশে স্তব্ধ হইয়া আছেন সেই এক; সেই পুরুষে, সেই পরিপূর্ণে এ-সমস্তই পূর্ণ। সমস্ত পথ শেষ হইল, সমস্ত পথের কষ্ট দূর হইয়া গেল। তখন অন্তহীন কার্যকারণের ক্লান্তিকর শাখাপ্রশাখা হইতে উত্তীর্ণ হইয়া জ্ঞান বলিল—

একধৈবানুদ্রষ্টব্যমেতদপ্রমেয়ং ধ্রুবম্।

বিচিত্র বিশ্বের চঞ্চল বহুত্বের মধ্যে এই অপরিমেয় ধ্রুবকে একধা'ই দেখিতে হইবে। সহস্র বিভীষিকা ও বিস্ময়ের মধ্যে দেবতাসন্ধানশ্রান্ত ভক্তি তখন বলিল—

এষ সর্বেশ্বর এষ ভূতাধিপতিরেষ ভূতপাল
এষ সেতুর্বিধরণ এষাং লোকানামসম্ভেদায়।

এই একই সকলের ঈশ্বর, সকল জীবের অধিপতি, সকল জীবের পালনকর্তা—এই একই সেতুস্বরূপ হইয়া সকল লোককে ধারণ করিয়া ধ্বংস হইতে রক্ষা করিতেছেন। বাহিরের বহুতর আঘাতে আকর্ষণে ক্লিষ্ট বিক্ষিপ্ত প্রেম কহিল—

তদেতৎ প্রেয়ঃ পুত্রাৎ প্রেয়ো বিত্তাৎ
প্রেয়োজন্যস্মাৎ সর্বস্মাদন্তরতরং যদয়মাত্মা।

সেই যে এক, তিনি সকল হইতে অন্তরতর পরমাত্মা, তিনিই পুত্র হইতে প্রিয়, বিত্ত হইতে প্রিয়, অন্য-সকল হইতেই প্রিয়। মুহূর্তেই বিশ্বের বহুত্ববিরোধের মধ্যে একের ধ্রুব শান্তি পরিপূর্ণ হইয়া দেখা দিল—একের সত্য, একের অভয়, একের আনন্দ, বিচ্ছিন্ন

জগৎকে এক করিয়া অপ্রমেয় সৌন্দর্যে গাঁথিয়া তুলিল।

শিশিরনিষিক্ত শীতের প্রত্যূষে পূর্ব দিক যখন অরুণবর্ণ, লঘু-বাষ্পাচ্ছন্ন বিশাল প্রান্তরের মধ্যে আসন্ন জাগরণের একটি অখণ্ড শান্তি বিরাজমান—যখন মনে হয় যেন জীবধাত্রী মাতা বসুন্ধরা ব্রাহ্মমুহূর্তে প্রথম নেত্র উন্মীলন করিয়াছেন, এখনো সেই বিশ্বগেহিনী তাঁহার বিপুল গৃহের অসংখ্যজীব-পালনকার্য আরম্ভ করেন নাই, তিনি যেন দিবসারম্ভে ওঙ্কারমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া জগন্মন্দিরের উদ্‌ঘাটিত স্বর্ণতোরণদ্বারে ব্রহ্মাণ্ডপতির নিকট মস্তক অবনত করিয়া স্তব্ধ হইয়া আছেন—তখন যদি চিন্তা করিয়া দেখি তবে প্রতীতি হইবে সেই নির্জন নিঃশব্দ নীহারমণ্ডিত প্রান্তরের মধ্যে প্রয়াসের অন্ত নাই। প্রত্যেক তৃণদলের অণুতে অণুতে জীবনের বিচিত্র চেষ্টা নিরন্তর, প্রত্যেক শিশিরের কণায় কণায় সংযোজনবিযোজন-আকর্ষণবিকর্ষণের কার্য বিশ্রামবিহীন। অথচ এই অশ্রান্ত অপরিমেয় কর্মব্যাপারের মধ্যে শান্তি-সৌন্দর্য অচল হইয়া আছে। অদ্য এই মুহূর্তে এই প্রকাণ্ড পৃথিবীকে যে প্রচণ্ড শক্তি প্রবল বেগে শূন্যে আকর্ষণ করিয়া লইয়া চলিয়াছে সে শক্তি আমাদের কাছে কথাটি মাত্র কহিতেছে না, শব্দটি মাত্র করিতেছে না। অদ্য এই মুহূর্তে পৃথিবীকে পরিবেষ্টন করিয়া সমস্ত মহাসমুদ্রে যে লক্ষ লক্ষ তরঙ্গ সগর্জন তাণ্ডবনৃত্য করিতেছে, শতসহস্র নদনদীনির্ঝরে যে কল্লোল উঠিতেছে, অরণ্যে অরণ্যে যে আন্দোলন, পল্লবে পল্লবে যে মর্মরধ্বনি, আমরা তাহার কী জানিতেছি? বিশ্বব্যাপী যে মহাকর্মশালায় দিবারাত্রি লক্ষকোটি জ্যোতিষ্কদীপের নির্বাণ নাই তাহার অনন্ত কলরব কাহাকে বধির করিয়াছে, তাহার প্রচণ্ড প্রয়াসের দৃশ্য কাহাকে পীড়িত করিতেছে? এই কর্মজালবেষ্টিত পৃথিবীকে যখন বৃহদ্‌ভাবে দেখি, তখন দেখি তাহা চিরদিন অক্লান্ত অক্লিষ্ট প্রশান্ত সুন্দর—এত কর্মে, এত চেষ্টায়, এত জন্মমৃত্যু-সুখদুঃখের অবিশ্রাম চক্ররেখায় সে চিন্তিত চিহ্নিত ভারাক্রান্ত হয় নাই। চিরদিনই তাহার প্রভাত কী সৌম্যসুন্দর, তাহার মধ্যাহ্ন কী শান্তগম্ভীর, তাহার সায়াহ্ন কী করুণকোমল, তাহার রাত্রি কী উদার উদাসীন! এত বৈচিত্র্য এবং প্রয়াসের মধ্যে এই স্থির শান্তি এবং সৌন্দর্য, এত কলরবের মধ্যে এই পরিপূর্ণ সংগীত কী করিয়া সম্ভবপর হইল? ইহার এক উত্তর এই যে—

বৃক্ষ ইব স্তব্ধো দিবি তিষ্ঠত্যেকঃ।

মহাকাশে বৃক্ষের ন্যায় স্তব্ধ হইয়া আছেন সেই এক। সেইজন্যই বৈচিত্র্যও সুন্দর এবং বিশ্বকর্মের মধ্যেও বিশ্বব্যাপী শান্তি বিরাজমান।

গভীর রাত্রে অনাবৃত আকাশতলে চারি দিককে কী নিভৃত এবং নিজেকে কী একাকী বলিয়া মনে হয়! অথচ তখন আলোকের যবনিকা অপসারিত হইয়া গিয়া হঠাৎ আমরা জানিতে পাই যে, অন্ধকার সভাতলে জ্যোতিষ্কলোকের অনন্ত জগতের মধ্যে আমরা দণ্ডায়মান। এ কী অপরূপ আশ্চর্য, অনন্ত জগতের নিভৃত নির্জনতা! কত জ্যোতির্ময় এবং কত জ্যোতির্হীন মহাসূর্যমণ্ডল, কত অগণ্যযোজনব্যাপী চক্রপথে ঘূর্ণনৃত্য, কত উদ্দাম বাষ্পসংঘাত, কত ভীষণ অগ্নি-উচ্ছ্বাস, তাহারই মধ্যস্থলে আমি সম্পূর্ণ নিভৃতে, একান্ত নির্জনে রহিয়াছি—শান্তি এবং বিরামের সীমা নাই। এমন সম্ভব হইল কী করিয়া? ইহার কারণ: বৃক্ষ ইব স্তব্ধো দিবি তিষ্ঠত্যেকঃ।

নাহলে এই জগৎ, যাহা বিচিত্র, যাহা অগণ্য, যাহার প্রত্যেক কণা-কণিকাটিও

কম্পিত-ঘূর্ণিত, তাহা কী ভয়ংকর! বৈচিত্র্য যদি একবিরহিত হয়, অগণ্যতা যদি এক সূত্রে গ্রথিত না হয়, উদ্যত শক্তি-সকল যদি স্তব্ধ একের দ্বারা ধৃত হইয়া না থাকে, তবে তাহা কী করাল, তবে বিশ্বসংসার কী অনির্বচনীয় বিভীষিকা! তবে আমরা দুর্ধর্ষ জগৎপুঞ্জের মধ্যে কাহার বলে এত নিশ্চিন্ত হইয়া আছি? এই মহা-অপরিচিত যাহার প্রত্যেক কণাটিও আমাদের কাছে দুর্ভেদ্য রহস্য, কাহার বিশ্বাসে আমরা ইহাকে চিরপরিচিত মাতৃক্রোড়ের মতো অনুভব করিতেছি? এই-যে আসনের উপর আমি এখনই বসিয়া আছি, ইহার মধ্যে সংযোজন-বিযোজনের যে মহাশক্তি কাজ করিতেছে তাহা এই আসন হইতে আরম্ভ করিয়া সূর্যলোক-নক্ষত্রলোক পর্যন্ত অবিচ্ছিন্ন-অখন্ড-ভাবে চলিয়া গেছে, তাহা যুগযুগান্তর হইতে নিরন্তরভাবে লোকলোকান্তরকে পিন্ডীকৃত-পৃথক্কৃত করিতেছে; আমি তাহারই ক্রোড়ের উপর নির্ভয়ে আরামে বসিয়া আছি, তাহার ভীষণ সত্তাকে জানিতেও পারিতেছি না, সেই বিশ্বব্যাপী বিরাট ব্যাপার আমার বিশ্রামের লেশমাত্র ক্ষতি করিতেছে না। ইহার মধ্যে আমরা খেলিতেছি, গৃহনির্মাণ করিতেছি—এ আমাদের কে? ইহাকে প্রশ্ন করিলে এ কোনোই উত্তর দেয় না। ইহা দিকে দিকে আকাশ হইতে আকাশান্তরে নিরুদ্দেশ হইয়া শতধা-সহস্রধা চলিয়া গেছে—এই মূক মূঢ় মহাবহুরূপীর সঙ্গে কে আমাদের এমন প্রিয় পরিচিত আত্মীয় সম্বন্ধ বাঁধিয়া দিয়াছেন? তিনি, যিনি 'বৃক্ষ ইব স্তব্ধো দিবি তিষ্ঠত্যেকঃ'।

এই একক আমরা বিশ্বের বৈচিত্র্যের মধ্যে সুন্দর এবং বিশ্বের শক্তির মধ্যে শান্তিস্বরূপে দেখিতেছি। তেমনি মানুষের সংসারের মধ্যে সেই স্তব্ধ একের ভাবটি কী? সেই ভাবটি মঙ্গল। এখানে আঘাত-প্রতিঘাতের সীমা নাই, এখানে সুখদুঃখ বিরহমিলন বিপৎসম্পদ্ লাভক্ষতিতে সংসারের সর্বত্র সর্বক্ষণ বিক্ষুব্ধ হইয়া আছে। কিন্তু এই চাঞ্চল্য এই সংগ্রামের মধ্যে সেই এক নিয়ত স্তব্ধ হইয়া আছেন বলিয়া সংসার ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় না। সেইজন্যই নানা বিরোধবিদ্বেষের মধ্যেও পিতামাতার সহিত পুত্র, ভ্রাতার সহিত ভ্রাতা, প্রতিবেশীর সহিত প্রতিবেশী, নিকটের সহিত দূর, প্রত্যহ প্রতিমুহূর্তেই গ্রথিত হইয়া উঠিতেছে। সেই ঐক্যজাল আমরা ক্ষণিকের আক্ষেপে যতই ছিন্নবিচ্ছিন্ন করিতেছি ততই তাহা আপনি জোড়া লাগিয়া যাইতেছে। যেমন খন্ডভাবে আমরা জগতের মধ্যে অসংখ্য কদর্যতা দেখিতে পাই, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও সমস্ত জগৎ মহাসৌন্দর্যে প্রকাশিত—তেমনি খন্ডভাবে সংসারে পাপতাপের সীমা নাই, তথাপি সমস্ত সংসার অবিচ্ছিন্ন মঙ্গলসূত্রে চিরদিন ধৃত হইয়া আছে। ইহার অংশের মধ্যে কত অশান্তি কত অসামঞ্জস্য দেখিতে পাই, তবু দেখি ইহার সমগ্রের মঙ্গল-আদর্শ কিছুতে নষ্ট হয় না। সেইজন্য মানুষ সংসারকে এমন সহজে আশ্রয় করিয়া আছে। এত বৃহৎ লোকসংঘ, এত অসংখ্য অনাত্মীয়, এত প্রবল স্বার্থসংঘাত, তবু এ সংসার রমণীয়; তবু ইহা আমাদিগকে রক্ষা ও পালন করিবার চেষ্টা করে, নষ্ট করে না। ইহার দুঃখতাপও মহামঙ্গল-সংগীতের একতানে অপূর্ব ছন্দে মিলিত হইয়া উঠিতেছে, কেননা: বৃক্ষ ইব স্তব্ধো দিবি তিষ্ঠত্যেকঃ।

আমরা আমাদের জীবনকে প্রতি ক্ষণে খন্ড খন্ড করি বলিয়াই সংসারতাপ দুঃসহ হয়। সমস্ত ক্ষুদ্র বিচ্ছিন্নতাকে সেই মহান একের মধ্যে গ্রথিত করিতে পারিলে, সমস্ত আক্ষেপবিক্ষেপের হাত হইতে পরিত্রাণ পাই। সমস্ত হৃদয়বৃত্তি, সমস্ত কর্মচেষ্টাকে

তাঁহার দ্বারা সমাচ্ছন্ন করিয়া দেখিলে কোন্ বাধায় আমার অধীরতা, কোন্ বিঘ্নে আমার নৈরাশ্য, কোন্ লোকের কথায় আমার ক্ষোভ, কোন্ ক্ষমতায় আমার অহংকার, কোন্ বিফলতায় আমার গ্লানি! তাহা হইলেই আমার সকল কর্মের মধ্যেই ধৈর্য ও শান্তি, সকল হৃদ্‌বৃত্তির মধ্যেই সৌন্দর্য ও মঙ্গল উদ্‌ভাসিত হয়; দুঃখতাপ পুণ্যে বিকশিত এবং সংসারের সমস্ত আঘাত-বেদনা মাধুর্যে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে। তখন সর্বত্র সেই স্তব্ধ একের মঙ্গল-বন্ধন অনুভব করিয়া সংসারে দুঃখের অস্তিত্বকে দুর্ভেদ্য প্রহেলিকা বলিয়া গণ্য করি না—দুঃখের মধ্যে, শোকের মধ্যে, অভাবের মধ্যে নতমস্তকে তাঁহাকেই স্বীকার করি যাঁহার মধ্যে যুগযুগান্তর হইতে সমস্ত জগৎ-সংসারের সমস্ত দুঃখতাপের সমস্ত তাৎপর্য অখন্ড মঙ্গলে পরিসমাপ্ত হইয়া আছে।—

মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি য ইহ নানেব পশ্যতি।

মৃত্যু হইতে সে মৃত্যুকে প্রাপ্ত হয় যে ইঁহাকে নানা করিয়া দেখে।

খন্ডতার মধ্যে কদর্যতা, সৌন্দর্য একের মধ্যে; খন্ডতার মধ্যে প্রয়াস, শান্তি একের মধ্যে; খন্ডতার মধ্যে বিরোধ, মঙ্গল একের মধ্যে; তেমনি খন্ডতার মধ্যেই মৃত্যু, অমৃত সেই একের মধ্যে। সেই এককে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখিলে, সহস্রের হাত হইতে আপনাকে আর রক্ষা করিতে পারি না। তবে বিষয় প্রবল হইয়া উঠে, ধন-জন-মান বড়ো আকার ধারণ করিয়া আমাদিগকে ঘুরাইতে থাকে, অশ্বরথ ইষ্টককাষ্ঠ মর্যাদালাভ করে, দ্রব্যসামগ্রী-সংগ্রহ-চেষ্টার অন্ত থাকে না, প্রতিবেশীর সহিত নিরন্তর প্রতিযোগিতা জাগিয়া উঠে, জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত কাড়াকাড়ি-হানাহানির মধ্যে নিজেকে খন্ডন করিতে থাকি—এবং মৃত্যু যখন আমাদের এই ভান্ডারদ্বার হইতে আমাদিগকে অকস্মাৎ আকর্ষণ করিয়া লইয়া যায় তখন সেই শেষ মুহূর্তে সমস্ত জীবনের বহুবিরোধের সঞ্চিত স্তূপাকার দ্রব্যসামগ্রীগুলাকেই প্রিয়তম বলিয়া, আত্মার পরম আশ্রয়স্থল বলিয়া অন্তিমবলে বক্ষে আকর্ষণ করিয়া ধরিতে চাহি।—

মনসৈবেদমাপ্তব্যং নেহ নানাস্তি কিঞ্চন।

মনের দ্বারাই ইহা পাওয়া যায় যে, ইঁহাতে 'নানা' কিছুই নাই।

বিশ্বজগতের মধ্যে যে অপ্রমেয় ধ্রুব রহিয়াছেন তিনি বাহ্যত একভাবে কোথাও প্রতিভাত নহেন; মনই নানার মধ্যে সেই একেকে দেখে, সেই এককে প্রার্থনা করে, সেই এককে আশ্রয় করিয়া আপনাকে চরিতার্থ করে। নানার মধ্যে সেই এককে না পাইলে মনের সুখশান্তিমঙ্গল নাই, তাহার উদ্‌ভ্রান্ত ভ্রমণের অবসান নাই। সেই ধ্রুব একের সহিত মন আপনাকে দৃঢ়ভাবে যুক্ত করিতে না পারিলে সে অমৃতের সহিত যুক্ত হয় না, সে খন্ড খন্ড মৃত্যুদ্বারা আহত তাড়িত বিক্ষিপ্ত হইয়া বেড়ায়। মন আপনার স্বাভাবিক ধর্ম-বশতই কখনো জানিয়া কখনো না-জানিয়া, কখনো বক্রপথে কখনো সরলপথে, সকল জ্ঞানের মধ্যে, সকল ভাবের মধ্যে অহরহ সেই পরম ঐক্যের পরম আনন্দকে সন্ধান করিয়া ফিরে। যখন পায় তখন এক মুহূর্তেই বলিয়া উঠে, আমি অমৃতকে পাইয়াছি; বলিয়া উঠে—

বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তমাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।
য এতদ্‌বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি।

অন্ধকারের পারে আমি এই জ্যোতির্ময় মহান পুরুষকে জানিয়াছি। যাঁহারা ইঁহাকে

জানেন, তাঁহারা অমর হন।

পত্নী মৈত্রেয়ীকে সমস্ত সম্পত্তি দিয়া যাজ্ঞবল্ক্য যখন বনে যাইতে উদ্যত হইলেন তখন মৈত্রেয়ী স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, এ-সমস্ত লইয়া আমি কি অমর হইব? যাজ্ঞবল্ক্য কহিলেন, না, যাহারা উপকরণ লইয়া থাকে তাহাদের যেরূপ, তোমারও সেইরূপ জীবন হইবে। তখন মৈত্রেয়ী কহিলেন—

যেনাহং নামৃতা স্যাং কিমহং তেন কুর্যাম্।

যাহার দ্বারা আমি অমৃতা না হইব তাহা লইয়া আমি কী করিব! যাহা বহু, যাহা বিচ্ছিন্ন, যাহা মৃত্যুর দ্বারা আক্রান্ত, তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া মৈত্রেয়ী অখণ্ড অমৃত একের মধ্যে আশ্রয় প্রার্থনা করিয়াছিলেন। মৃত্যু এই জগতের সহিত, বিচিত্রের সহিত, অনেকের সহিত, আমাদের সম্বন্ধের পরিবর্তন করিয়া দেয়, কিন্তু সেই একের সহিত আমাদের সম্বন্ধের পরিবর্তন ঘটাইতে পারে না। অতএব যে সাধক সমস্ত অন্তঃকরণের সহিত সেই একেকে আশ্রয় করিয়াছেন তিনি অমৃতকে বরণ করিয়াছেন; তাঁহার কোনো ক্ষতির ভয় নাই, বিচ্ছেদের আশঙ্কা নাই। তিনি জানেন—জীবনের সুখদুঃখ নিয়ত চঞ্চল কিন্তু তাহার মধ্যে সেই কল্যাণরূপী এক স্তব্ধ হইয়া রহিয়াছেন, লাভক্ষতি নিত্য আসিতেছে যাইতেছে কিন্তু সেই এক পরমলাভ আত্মার মধ্যে স্তব্ধ হইয়া বিরাজ করিতেছেন, বিপৎসম্পদ্ মুহূর্তে মুহূর্তে আবর্তিত হইতেছে কিন্তু—

এষাস্য পরমা গতিঃ এষাস্য পরমা সম্পৎ
এষোহস্য পরমো লোকঃ এষোহস্য পরম আনন্দঃ

সেই এক রহিয়াছেন—যিনি জীবের পরমা গতি, যিনি জীবের পরমা সম্পৎ, যিনি জীবের পরম লোক, যিনি জীবের পরম আনন্দ।

রেশম-পশম আসন-বসন কাষ্ঠ-লোষ্ট্র স্বর্ণ-রৌপ্য লইয়া কে বিরোধ করিবে! তাহারা আমার কে? তাহারা আমাকে কী দিতে পারে? তাহারা আমার পরমসম্পৎকে অন্তরাল করিতেছে, তাহাতে দিবারাত্রির মধ্যে লেশমাত্র ক্ষোভ অনুভব করিতেছি না, কেবল তাহাদের পুঞ্জীকৃত সঞ্চয়ে গর্ববোধ করিতেছি। হস্তি-অশ্ব-কাচ-প্রস্তরেরই গৌরব, আত্মার গৌরব নাই—শূন্য হৃদয়ে হৃদয়েশ্বরের স্থান নাই। সর্বাপেক্ষা হীনতম দীনতা যে পরমার্থহীনতা তাহার দ্বারা সমস্ত অন্তঃকরণ রিক্ত, শ্রীহীন, মলিন; কেবল বসনে-ভূষণে উপকরণে-আয়োজনে আমি স্ফীত। জগদীশ্বরের কাজ করিতে পারি না; কেননা শয্যা-আসন-বেশভূষার কাছে দাসখত লিখিয়া দিয়াছি, জড়-উপকরণ-জঞ্জালের কাছে মাথা বিকাইয়া বসিয়াছি, সেই-সকল ধূলিময় পদার্থের ধুলা ঝাড়িতেই আমার দিন যায়। ঈশ্বরের কাজে আমার কিছু দিবার সামর্থ্য নাই, কারণ খট্টাপর্যঙ্ক-অশ্বরথে আমার সমস্ত দান নিঃশেষিত। সমস্ত মঙ্গলকর্ম পড়িয়া রহিল, কারণ পাঁচজনের মুখে নিজের নামকে ধ্বনিত করিয়া তুলিয়া আড়ম্বরে জীবনযাপন করিতেই আমার সমস্ত চেষ্টার অবসান। শতছিদ্র কলসের মধ্যে জলসঞ্চয় করিবার জন্য জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত ব্যাপৃত রহিয়াছি, অবারিত অমৃতপারাবার সম্মুখে স্তব্ধ হইয়া রহিয়াছে; যিনি সকল সত্যের সত্য, অন্তরে-বাহিরে জ্ঞানে-ধর্মে কোথাও তাঁহাকে দেখি না—এত বড়ো অন্ধতা লইয়া আমি পরিতৃপ্ত। যিনি আনন্দরূপমমৃতম্—যে আনন্দের কণামাত্র আনন্দে সমস্ত জীবজন্তুর প্রাণের চেষ্টা, মনের চেষ্টা, প্রীতির চেষ্টা, পুণ্যের চেষ্টা উৎসাহিত

রহিয়াছে—তাঁহাতে আমার আনন্দ নাই—আমার আনন্দ আমার গর্ব কেবল উপকরণ-সামগ্রীতে, এমন বৃহৎ জড়ত্বে আমি পরিবৃত। যাঁহার অদৃশ্য অঙ্গুলিনির্দেশে জীব-প্রকৃতি অজ্ঞাত অকীর্তিত সহস্র সহস্র বৎসরের মধ্য দিয়া স্বার্থ হইতে পরমার্থে, স্বেচ্ছাচার হইতে সংযমে, এককতা হইতে সমাজতন্ত্রে উপনীত হইয়াছে, যিনি মহদ্‌ভয়ং বজ্রমুদ্যতম্, যিনি দগ্ধেন্ধন ইবানলঃ, সর্বকালে সর্বলোকে যিনি আমার ঈশ্বর, তাঁহার আদেশবাক্য আমার কর্ণগোচর হয় না; তাঁহার কর্মে আমার কোনো আস্থা নাই; কেবল জীবনের কয়েকদিনমাত্র যে-কয়েকটি লোককে পাঁচজন বলিয়া জানি তাহাদেরই ভয়ে এবং তাহাদেরই চাটুবাক্যে চালিত হওয়াই আমার দুর্লভ মানবজন্মের একমাত্র লক্ষ্য—এমন মহামূঢ়তার দ্বারা আমি সমাচ্ছন্ন। আমি জানি না, আমি দেখিতে পাই না—

বৃক্ষ ইব স্তব্ধো দিবি তিষ্ঠত্যেকস্—
তেনেদং পূর্ণং পুরুষেণ সর্বম্।

আমার কাছে সমস্ত জগৎ ছিন্নবিচ্ছিন্ন, সমস্ত বিজ্ঞান খণ্ডবিখণ্ড, সমস্ত জীবনের লক্ষ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সহস্র অংশে বিভক্ত বিদীর্ণ।

হে অনন্ত বিশ্বসংসারের পরম এক পরমাত্মন্, তুমি আমার সমস্ত চিত্তকে গ্রহণ করো। তুমি সমস্ত জগতের সঙ্গে সঙ্গে আমাকেও পূর্ণ করিয়া স্তব্ধ হইয়া রহিয়াছ, তোমার সেই পূর্ণতা আমি আমার দেহে-মনে অন্তরে-বাহিরে জ্ঞানে-কর্মে-ভাবে যেন প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করিতে পারি। আমি আপনাকে সর্বতোভাবে তোমার দ্বারা আবৃত রাখিয়া নীরবে নিরভিমানে তোমার কর্ম করিতে চাই। অহরহ তুমি আদেশ করো, তুমি আহবান করো, তোমার প্রসন্নদৃষ্টিদ্বারা আমাকে আনন্দ দাও, তেমার দক্ষিণবাহুদ্বারা আমাকে বল দান করো। অবসাদের দুর্দিন যখন আসিবে, বন্ধুরা যখন নিরস্ত হইবে, লোকেরা যখন লাঞ্ছনা করিবে, আনুকূল্য যখন দুর্লভ হইবে, তুমি আমাকে পরাস্ত ভূলুণ্ঠিত হইতে দিয়ো না; আমাকে সহস্রের মুখাপেক্ষী করিয়ো না; আমাকে সহস্রের ভয়ে ভীত, সহস্রের বাক্যে বিচলিত, সহস্রের আকর্ষণে বিক্ষিপ্ত হইতে যেন না হয়। এক তুমি আমার চিত্তের একাসনে অধীশ্বর হও, আমার সমস্ত কর্মকে একাকী অধিকার করো, আমার সমস্ত অভিমানকে দমন করিয়া আমার সমস্ত প্রবৃত্তিকে তোমার পদপ্রান্তে একত্রে সংযত করিয়া রাখো। হে অক্ষরপুরুষ, পুরাতন ভারতবর্ষে তোমা হইতে যখন পুরাণী প্রজ্ঞা প্রসৃত হইয়াছিল তখন আমাদের সরলহৃদয় পিতামহগণ ব্রহ্মের অভয় ব্রহ্মের আনন্দ যে কী তাহা জানিয়াছিলেন। তাঁহারা একের বলে বলী, একের তেজে তেজস্বী, একের গৌরবে মহীয়ান হইয়াছিলেন। পতিত ভারতবর্ষের জন্য পুনর্বার সেই প্রজ্ঞালোকিত নির্মল নির্ভয় জ্যোতির্ময় দিন তোমার নিকটে প্রার্থনা করি। পৃথিবীতলে আর-একবার আমাদিগকে তোমার সিংহাসনের দিকে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে দাও। আমরা কেবল যুদ্ধবিগ্রহ-যন্ত্রতন্ত্র-বাণিজ্যব্যবসায়ের দ্বারা নহে, আমরা সুকঠিন সুনির্মল সন্তোষ-বলিষ্ঠ ব্রহ্মচর্যের দ্বারা মহিমান্বিত হইয়া উঠিতে চাহি। আমরা রাজত্ব চাই না, প্রভুত্ব চাই না, ঐশ্বর্য চাই না, প্রত্যহ একবার ভূর্ভুবঃস্বর্লোকের মধ্যে তোমার মহাসভাতলে একাকী দণ্ডায়মান হইবার অধিকার চাই। তাহা হইলে আর আমাদের অপমান নাই, অধীনতা নাই, দারিদ্র্য নাই। আমাদের বেশভূষা দীন হউক, আমাদের উপকরণ-সামগ্রী বিরল হউক, তাহাতে যেন লেশমাত্র লজ্জা না পাই—কিন্তু চিত্তে যেন

ভয় না থাকে, ক্ষুদ্রতা না থাকে, বন্ধন না থাকে, আত্মার মর্যাদা সকল মর্যাদার ঊর্ধ্বে থাকে, তোমারই দীপ্তিতে ব্রহ্মপরায়ণ ভারতবর্ষের মুকুটবিহীন উন্নত ললাট যেন জ্যোতিষ্মৎ হইয়া উঠে। আমাদের চতুর্দিকে সভ্যতাভিমানী বিজ্ঞানমদমত্ত বাহুবলগর্বিত স্বার্থনিষ্ঠুর জাতিরা যাহা লইয়া অহরহ নখদন্ত শাণিত করিতেছে, পরস্পরের প্রতি সতর্ক-রুষ্ট কটাক্ষ নিক্ষেপ করিতেছে, পৃথিবীকে আতঙ্কে কম্পান্বিত ও ভ্রাতৃশোণিতপাতে পঙ্কিল করিয়া তুলিতেছে, সেই-সকল কাম্যবস্তু এবং সেই পরিস্ফীত আত্মাভিমানের দ্বারা তাহারা কখনোই অমর হইবে না—তাহাদের যন্ত্রতন্ত্র, তাহাদের বিজ্ঞান, তাহাদের পর্বতপ্রমাণ উপকরণ তাহাদিগকে রক্ষা করিতে পারিবে না। তাহদের সেই বলমত্ততা ধনমত্ততা, সেই উপকরণবহুলতার প্রতি ভারতবর্ষের যেন লোভ না জন্মে। হে অদ্বিতীয় এক, তপস্বিনী ভারতভূমি যেন তাহার বল্কলবসন পরিয়া তোমার দিকে তাকাইয়া ব্রহ্মবাদিনী মৈত্রেয়ীর সেই মধুরকণ্ঠে বলিতে পারে—

যেনাহং নামৃতা স্যাম্
কিমহং তেন কুর্যাম্।

যাহা দ্বারা আমি অমৃতা না হইব, তাহা লইয়া আমি কী করিব!

কামান-ধূম এবং স্বর্ণধূলির দ্বারা সমাচ্ছন্ন তমসাবৃত রাষ্ট্রগৌরবের দিকে ভারতের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়ো না; তোমার সেই অনন্ধকার লোকের প্রতি দীন ভারতের নতশির উত্থিত করো।—

যদাহতমস্তন্ন দিবা ন রাত্রির্,—
ন সন্ন চার্সাঞ্ছিব এব কেবলঃ।

যখন তোমার সেই অনন্ধকার আবির্ভূত হয় তখন কোথায় দিবা কোথায় রাত্রি, কোথায় সৎ কোথায় অসৎ। শিব এব কেবলঃ। তখন কেবল শিব, কেবল মঙ্গল—

হে শম্ভব, হে ময়োভব, তোমাকে নমস্কার! হে শংকর, হে ময়স্কর, তোমাকে নমস্কার! হে শিব, হে শিবতর, তোমাকে নমস্কার!

ধর্ম, র/১২/২৮-৩৬

টীকা ঃ

ধর্ম—ধর্ম শীর্ষক গ্রন্থের যে রচনাগুলি বর্তমান সংকলনে নেওয়া হয়েছে, তাদের আকর বিশ্বভারতীর প্রকাশিত 'ধর্ম' গ্রন্থ।

বঙ্গদর্শন—১৮৭২ সালে বঙ্কিমচন্দ্রের সম্পাদনায় বঙ্গদর্শন প্রথম প্রকাশিত হয় এবং বঙ্কিমচন্দ্রের পরে এক সময়ে সঞ্জীবচন্দ্র ও শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের সম্পাদনার কালে বঙ্গদর্শন বন্ধ হয়ে যায়। ১৮ বছর পরে রবীন্দ্রনাথের সম্পাদনায় 'নবপর্যায় বঙ্গদর্শন' প্রকাশিত হয় ১৯০১ সালে। এতে রবীন্দ্রনাথের অনেক রচনা প্রকাশিত হয়েছিল। ১৯০৬ সালে রবীন্দ্রনাথ এই পত্রিকার সম্পাদকত্ব ত্যাগ করেন।

মৈত্রেয়ী—যাজ্ঞবল্ক্যপত্নী। প্রাচীন ভারতীয় শাস্ত্রজ্ঞ-নারীদের মধ্যে অন্যতমা।

যাজ্ঞবল্ক্য—যাজ্ঞবল্ক্য প্রসিদ্ধ বৈদিক ঋষি। শুক্ল যজুর্বেদের প্রথম প্রবক্তা।

১৯। ধর্মের সরল আদর্শ

বঙ্গদর্শন, ১৩০৯ মাঘ, ১৯০৩)

আমার গৃহকোণের জন্য যদি একটি প্রদীপ আমাকে জ্বালিতে হয় তবে তাহার জন্য আমাকে কত আয়োজন করিতে হয়—সেইটুকুর জন্য কত লোকের উপর আমার নির্ভর। কোথায় সর্ষপবপন হইতেছে, কোথায় তৈলনিষ্কাশন চলিতেছে, কোথায় তাহার ক্রয় বিক্রয়, তাহার পরে দীপসজ্জারই বা কত উদ্‌যোগ—এত জটিলতায় যে আলোকটুকু পাওয়া যায় তাহা কত অল্প। তাহাতে আমার ঘরের কাজ চলিয়া যায়, কিন্তু বাহিরের অন্ধকারকে দ্বিগুণ ঘনীভূত করিয়া তোলে।

বিশ্বপ্রকাশক প্রভাতের আলোককে গ্রহণ করিবার জন্য কাহারও উপরে আমাকে নির্ভর করিতে হয় না, তাহা আমাকে রচনা করিতে হয় না; কেবলমাত্র জাগরণ করিতে হয়। চক্ষু মেলিয়া ঘরের দ্বার মুক্ত করিলেই সে আলোককে আর কেহ ঠেকাইয়া রাখিতে পারে না।

যদি কেহ বলে প্রভাতের আলোককে দর্শন করিবার জন্য একটি অত্যন্ত নিগূঢ় কৌশল কোথাও গুপ্ত আছে, তবে তৎক্ষণাৎ এই কথা মনে হয়—নিশ্চয় তাহা প্রভাতের আলোক নহে, নিশ্চয় তাহা কোনো কৃত্রিম আলোক, সংসারের কোনো বিশেষ ব্যবহারযোগ্য কোনো ক্ষুদ্র আলোক। কারণ, বৃহৎ আলোক আমাদের মস্তকের উপরে আপনি বর্ষিত হইয়া থাকে, ক্ষুদ্র আলোকের জন্যই অনেক কল-কারখানা প্রস্তুত করিতে হয়।

যেমন এই আলোক, তেমনি ধর্ম। তাহাও এইরূপ অজস্র, তাহা এইরূপ সরল। তাহা ঈশ্বরের আপনাকে দান—তাহা নিত্য, তাহা ভূমা; তাহা আমাদিগকে বেষ্টন করিয়া, আমাদের অন্তর বাহিরকে ওতপ্রোত করিয়া স্তব্ধ হইয়া রহিয়াছে। তাহাকে পাইবার জন্য কেবল চাহিলেই হইল, কেবল হৃদয়কে উন্মীলিত করিলেই হইল। আকাশপূর্ণ দিবালোককে উদ্‌যোগ করিয়া পাইতে হইলে যেমন আমাদের পক্ষে পাওয়া অসম্ভব হইত, তেমনি আমাদের অনন্তজীবনের সম্বল ধর্মকে বিশেষ আয়োজনের দ্বারা পাইতে হইলে সে পাওয়া কোনোকালে ঘটিয়া উঠিত না।

আমরা নিজে যাহা রচনা করিতে যাই, তাহা জটিল হইয়া পড়ে। আমাদের সমাজ জটিল, আমাদের সংসার জটিল, আমাদের জীবনযাত্রা জটিল। এই জটিলতা আপন বহুধাবিভক্ত বৈচিত্র্যের দ্বারা অনেক সময় বিপুলতা ও প্রবলতার ভান করিয়া আমাদের মূঢ় চিত্তকে অভিভূত করিয়া দেয়। যে দার্শনিক গ্রন্থের লেখা অত্যন্ত ঘোরালো, আমাদের অজ্ঞ বুদ্ধি তাহার মধ্যেই বিশেষ পান্ডিত্য আরোপ করিয়া বিস্ময় অনুভব করে। যে সভ্যতার সমস্ত গতিপদ্ধতি দুরূহ ও বিমিশ্রিত, যাহার কল-কারখানা আয়োজন-উপকরণ বহুলবিস্তৃত, তাহা আমাদের দুর্বল অন্তঃকরণকে বিহ্বল করিয়া দেয়। কিন্তু যে দার্শনিক দর্শনকে সহজ করিয়া দেখাইতে পারেন তিনিই যথার্থ ক্ষমতাশালী, ধীশক্তিমান; যে সভ্যতা আপনার সমস্ত ব্যবস্থাকে সরলতার দ্বারা সুশৃংখল ও সর্বত্র সুগম করিয়া আনিতে পারে সেই সভ্যতাই যথার্থ উন্নততর। বাহিরে দেখিতে যেমনই হউক জটিলতাই দুর্বলতা, তাহা অকৃতার্থতা; পূর্ণতাই সরলতা। ধর্ম সেই পরিপূর্ণতার,

সুতরাং সরলতার, একমাত্র চরমতম আদর্শ।

কিন্তু এমনি আমাদের দুর্ভাগ্য, সেই ধর্মকেই মানুষ সংসারের সর্বাপেক্ষা জটিলতা-দ্বারা আকীর্ণ করিয়া তুলিয়াছে। তাহা অশেষ তন্ত্রে মন্ত্রে কৃত্রিম ক্রিয়াকর্মে জটিল মতবাদে বিচিত্র কল্পনায় এমনি গহন দুর্গম হইয়া উঠিয়াছে যে, মানুষের সেই স্বকৃত অন্ধকারময় জটিলতার মধ্যে প্রত্যহ এক-একজন অধ্যবসায়ী এক এক নূতন পথ কাটিয়া নব নব সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করিতেছে। সেই ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায় ও মতবাদের সংঘর্ষে জগতে বিরোধ-বিদ্বেষ অশান্তি-অমংগলের আর সীমা নাই।

এমন হইল কেন? ইহার একমাত্র কারণ, সর্বান্তঃকরণে আমরা নিজেকে ধর্মের অনুগত না করিয়া, ধর্মকে নিজের অনুরূপ করিবার চেষ্টা করিয়াছি বলিয়া। ধর্মকে আমরা সংসারের অন্যান্য আবশ্যকদ্রব্যের ন্যায় নিজেদের বিশেষ ব্যবহারযোগ্য করিয়া লইবার জন্য আপন আপন পরিমাপে তাহাকে বিশেষভাবে খর্ব করিয়া লই বলিয়া।

ধর্ম আমাদের পক্ষে সর্বশ্রেষ্ঠ আবশ্যক সন্দেহ নাই, কিন্তু সেইজন্যই তাহাকে নিজের উপযোগী করিয়া লইতে গেলেই তাহার সেই সর্বশ্রেষ্ঠ আবশ্যকতাই নষ্ট হইয়া যায়। তাহা দেশকালপাত্রের ক্ষুদ্র প্রভেদের অতীত, তাহা নিরঞ্জন বিকারবিহীন বলিয়াই তাহা আমাদের চিরদিনের পক্ষে, আমাদের সমস্ত অবস্থার পক্ষে এত একান্ত আবশ্যক। তাহা আমাদের অতীত বলিয়াই তাহা আমাদিগকে নিত্যকাল সমস্ত পরিবর্তনের মধ্যে ধ্রুব অবলম্বন দান করে।

কিন্তু ধর্মকে ধারণা করিতে হইবে তো? ধারণা করিতে হইলে তাহাকে আমাদের প্রকৃতির অনুযায়ী করিয়া লইতে হয়। অথচ মানব-প্রকৃতি বিচিত্র, সুতরাং সেই বৈচিত্র্য অনুসারে যাহা এক তাহা অনেক হইয়া উঠে। যেখানে অনেক সেখানে জটিলতা অনিবার্য, যেখানে জটিলতা সেখানে বিরোধ আপনি আসিয়া পড়ে।

কিন্তু ধর্মকে ধারণা করিতে হইবে না। ধর্মরাজ ঈশ্বর ধারণার অতীত। যাহা ধারণা করি তাহা তিনি নহেন; তাহা আর-কিছু, তাহা ধর্ম নহেন, তাহা সংসার। সুতরাং তাহাতে সংসারের সমস্ত লক্ষণ ফুটিয়া উঠে। সংসারের লক্ষণ বৈচিত্র্য, সংসারের লক্ষণ বিরোধ।

যাহা ধারণা করিতে পারি তাহাতে আমাদের তৃপ্তির অবসান হইয়া যায়, যাহা ধারণা করি তাহাতে প্রতি ক্ষণে বিকার ঘটিতে থাকে। সুখের আশাতেই আমরা সমস্ত-কিছু ধারণা করিতে যাই, কিন্তু যাহা ধারণা করি তাহাতে আমাদের সুখের অবসান হয়। এইজন্য উপনিষদে আছে: যো বৈ ভূমা তৎ সুখং নাল্পে সুখমস্তি। যাহা ভূমা তাহাই সুখ, যাহা অল্প তাহাতে সুখ নাই। সেই ভূমাকে যদি আমরা ধারণাযোগ্য করিবার জন্য অল্প করিয়া লই, তবে তাহা দুঃখ-সৃষ্টি করিবে—দুঃখ হইতে রক্ষা করিবে কী করিয়া? অতএব সংসারে থাকিয়া ভূমাকে উপলব্ধি করিতে হইবে, কিন্তু সংসারের দ্বারা সেই ভূমাকে খণ্ডিত জড়িত করিলে চলিবে না।

একটি উদাহরণ দিই। গৃহ আমাদের পক্ষে প্রয়োজনীয়, তাহা আমাদের বাসযোগ্য। মুক্ত আকাশ আমাদের পক্ষে সেরূপ বাসযোগ্য নহে। কিন্তু এই মুক্ত আকাশকে মুক্ত রাখাই আমাদের পক্ষে একান্ত আবশ্যক। মুক্ত আকাশের সহিত আমাদের গৃহস্থিত আকাশের অবাধ যোগ রাখিলেই তবেই আমাদের গৃহ আমাদের পক্ষে কারাগার,

আমাদের পক্ষে কবরস্বরূপ হয় না। কিন্তু যদি বলি 'আকাশকে গৃহেরই মতো আমার আপনার করিয়া লইব,' যদি আকাশের মধ্যে কেবলই প্রাচীর তুলিতে থাকি, তবে তাহাতে আমাদের গৃহেরই বিস্তার ঘটিতে থাকে, মুক্ত আকাশ দূর হইতে সুদূরে চলিয়া যায়। আমরা যদি বৃহৎ ছাদ পত্তন করিয়া সমস্ত আকাশকে আমার আপনার করিয়া লইলাম বলিয়া কল্পনা করি, তবে আলোকের জন্মভূমি, ভূর্ভুবঃস্বর্লোকের অনন্ত ক্রীড়াক্ষেত্র আকাশ হইতে নিজেকে বঞ্চিত করি। যাহা নিতান্ত সহজেই পাওয়া যায়, সহজে ব্যতীত আর-কোনো উপায়ে যাহা পাওয়া যায় না, নিজের প্রভূত চেষ্টার দ্বারাতেই তাহাকে একেবারে দুর্লভ করিয়া তোলা হয়। বেষ্টন করিয়া লইয়া সংসারের আর-সমস্ত পাওয়াকে আমরা পাইতে পারি—কেবল ধর্মকে, ধর্মের অধীশ্বরকে বেষ্টন ভাঙিয়া দিয়া আমরা পাই। সংসারের লাভের পদ্ধতি-দ্বারা সংসারের অতীতকে পাওয়া যায় না। বস্তুত যেখানে আমরা না-পাইবার আনন্দের অধিকারী, সেখানে পাইবার ব্যর্থ চেষ্টা করিয়া আমরা হারাই মাত্র। সেইজন্য ঋষি বলিয়াছেন—

যতো বাচো নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ।
আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন।।

মনের সহিত বাক্য যাঁহাকে না পাইয়া নিবৃত্ত হয়, সেই ব্রহ্মের আনন্দ যিনি জানিয়াছেন তিনি কিছু হইতেই ভয় পান না।

ধর্মের সরল আদর্শ একদিন আমাদের ভারতবর্ষেই ছিল। উপনিষদের মধ্যে তাহার পরিচয় পাই। তাহার মধ্যে যে ব্রহ্মের প্রকাশ আছে তাহা পরিপূর্ণ, তাহা অখণ্ড, তাহা আমাদের কল্পনা-জাল-দ্বারা বিজড়িত নহে। উপনিষদ্ বলিয়াছেন: সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম। তিনিই সত্য নতুবা এ জগৎ-সংসার কিছুই সত্য হইত না। তিনিই জ্ঞান, এই যাহা-কিছু তাহা তাঁহারই জ্ঞান; তিনি যাহা জানিতেছেন তাহাই আছে, তাহাই সত্য। তিনিই অনন্ত। তিনি অনন্ত সত্য, তিনিই অনন্ত জ্ঞান।

এই বিচিত্র জগৎসংসারকে উপনিষদ্ ব্রহ্মের অনন্ত সত্যে, ব্রহ্মের অনন্ত জ্ঞানে বিলীন করিয়া দেখিয়াছেন। উপনিষদ্ কোনো বিশেষ লোক কল্পনা করেন নাই, কোনো বিশেষ মন্দির রচনা করেন নাই, কোনো বিশেষ স্থানে তাঁহার বিশেষ মূর্তি স্থাপন করেন নাই—একমাত্র তাঁহাকেই পরিপূর্ণভাবে সর্বত্র উপলব্ধি করিয়া সকলপ্রকার জটিলতা, সকলপ্রকার কল্পনার চাঞ্চল্যকে দূরে নিরাকৃত করিয়া দিয়াছেন। ধর্মের বিশুদ্ধ সরলতার এমন বিরাট আদর্শ আর কোথায় আছে?

উপনিষদের এই ব্রহ্ম আমাদের অগম্য এই কথা নির্বিচারে উচ্চারণ করিয়া ঋষিদের অমর বাণীগুলিকে আমরা যেন আমাদের ব্যবহারের বাহিরে নির্বাসিত করিয়া না রাখি। আকাশ লোষ্ট্রখণ্ডের ন্যায় আমাদের গ্রহণযোগ্য নয় বলিয়া আমরা আকাশকে দুর্গম বলিতে পারি না। বস্তুত সেই কারণেই তাহা সুগম। যাহা ধারণাযোগ্য, যাহা স্পর্শগম্য, তাহাই আমাদিগকে বাধা দেয়। আমাদের স্বহস্তরচিত ক্ষুদ্র প্রাচীর দুর্গম, কিন্তু অনন্ত আকাশ দুর্গম নহে। প্রাচীরকে লঙ্ঘন করিতে হয়, কিন্তু আকাশকে লঙ্ঘন করিবার কোনো অর্থই নাই। প্রভাতের অরুণালোক স্বর্ণমুষ্টির ন্যায় সঞ্চয়যোগ্য নহে, সেই কারণেই কি অরুণালোককে দুর্লভ বলিতে হইবে? বস্তুত একমুষ্টি স্বর্ণই কি দুর্লভ নহে? আর, আকাশপূর্ণ প্রভাতকিরণ কি কাহাকেও ক্রয় করিয়া আনিতে হয়? প্রভাতের

আলোককে মূল্য দিয়া ক্রয় করিবার কল্পনাই মনে আসিতে পারে না—তাহা দুর্মূল্য নহে, তাহা অমূল্য।

উপনিষদের ব্রহ্ম সেইরূপ। তিনি অন্তরে বাহিরে সর্বত্র; তিনি অন্তরতম, তিনি সুদূরতম। তাঁহার সত্যে আমরা সত্য, তাঁহার আনন্দে আমরা ব্যক্ত—

কো হ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ
যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ।

কেই বা শরীরচেষ্টা করিত, কেই বা জীবিত থাকিত, যদি আকাশে এই আনন্দ না থাকিতেন। মহাকাশ পূর্ণ করিয়া নিরন্তর সেই আনন্দ বিরাজ করিতেছেন বলিয়াই আমরা প্রতি ক্ষণে নিশ্বাস লইতেছি, আমরা প্রতিমুহূর্তে প্রাণ ধারণ করিতেছি—

এতস্যৈবানন্দস্যান্যানি ভূতানি মাত্রামুপজীবন্তি।

এই আনন্দের কণামাত্র আনন্দকে অন্যান্য জীবসকল উপভোগ করিতেছে।

আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে
আনন্দেন জাতানি জীবন্তি
আনন্দং প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি।

সেই সর্বব্যাপী আনন্দ হইতেই এই-সমস্ত প্রাণী জন্মিতেছে; সেই সর্বব্যাপী আনন্দের দ্বারাই এই-সমস্ত প্রাণী জীবিত আছে; সে সর্বব্যাপী আনন্দের মধ্যেই ইহারা গমন করে, প্রবেশ করে। ঈশ্বর সম্বন্ধে যত কথা আছে, এই কথাই সর্বাপেক্ষা সরল, সর্বাপেক্ষা সহজ। ব্রহ্মের এই ভাব গ্রহণ করিবার জন্য কিছু কল্পনা করিতে হয় না, কিছু রচনা করিতে হয় না, দূরে যাইতে হয় না, দিনক্ষণের অপেক্ষা করিতে হয় না—হৃদয়ের মধ্যে আগ্রহ উপস্থিত হইলেই, তাঁহাকে উপলব্ধি করিবার যথার্থ ইচ্ছা জন্মিলেই, নিশ্বাসের মধ্যে তাঁহার আনন্দ প্রবাহিত হয়, প্রাণে তাঁহার আনন্দ কম্পিত হয়, বুদ্ধিতে তাঁহার আনন্দ বিকীর্ণ হয়, প্রাণে ভোগে তাঁহার আনন্দ প্রতিবিম্বিত দেখি। দিনের আলোক যেমন কেবলমাত্র চক্ষু মেলিবার অপেক্ষা রাখে, ব্রহ্মের আনন্দ সেইরূপ হৃদয়-উন্মীলনের অপেক্ষা রাখে মাত্র।

আমি একদা একখানি নৌকায় একাকী বাস করিতেছিলাম। একদিন সায়াহ্নে একটি মোমের বাতি জ্বালাইয়া পড়িতে পড়িতে অনেক রাত হইয়া গেল। শ্রান্ত হইয়া যেমনি বাতি নিবাইয়া দিলাম, অমনি এক মুহূর্তেই পূর্ণিমার চন্দ্রালোক চারি দিকের মুক্ত বাতায়ন দিয়া আমার কক্ষ পরিপূর্ণ করিয়া দিল। আমার স্বহস্তজ্বালিত একটিমাত্র ক্ষুদ্র বাতি এই আকাশপরিপ্লাবী অজস্র আলোককে আমার নিকট হইতে অগোচর করিয়া রাখিয়াছিল। এই অপরিমেয় জ্যোতিঃসম্পদ্ লাভ করিবার জন্য আমাকে আর কিছুই করিতে হয় নাই, কেবল সেই বাতিটি এক ফুৎকারে নিবাইয়া দিতে হইয়াছিল। তাহার পরে কী পাইলাম! বাতির মতো কোনো নাড়িবার জিনিস পাই নাই, সিন্দুকে ভরিবার জিনিস পাই নাই—পাইয়াছিলাম আলোক, আনন্দ, সৌন্দর্য, শান্তি। যাহাকে সরাইয়াছিলাম তাহার চেয়ে অনেক বেশি পাইয়াছিলাম—অথচ উভয়কে পাইবার পদ্ধতি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র।

ব্রহ্মকে পাইবার জন্য সোনা পাইবার মতো চেষ্টা না করিয়া আলোক পাইবার মতো চেষ্টা করিতে হয়। সোনা পাইবার মতো চেষ্টা করিতে গেলে নানা বিরোধবিদ্বেষ-

বাধাবিপত্তির প্রাদুর্ভাব হয়, আর আলোক পাইবার মতো চেষ্টা করিলে সমস্ত সহজ সরল হইয়া যায়। আমরা জানি বা না জানি, ব্রহ্মের সহিত আমাদের যে নিত্য সম্বন্ধ আছে সেই সম্বন্ধের মধ্যে নিজের চিত্তকে উদ্‌বোধিত করিয়া তোলাই ব্রহ্মপ্রাপ্তির সাধনা।

ভারতবর্ষে এই উদ্‌বোধনের যে মন্ত্র আছে তাহাও অত্যন্ত সরল। তাহা এক নিশ্বাসেই উচ্চারিত হয়। তাহা গায়ত্রীমন্ত্র। ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ—গায়ত্রীর এই অংশটুকুর নাম ব্যাহৃতি। ব্যাহৃতি শব্দের অর্থ—চারি দিক হইতে আহরণ করিয়া আনা। প্রথমত ভূলোক-ভুবর্লোক-স্বর্লোক অর্থাৎ সমস্ত বিশ্বজগৎকে মনের মধ্যে আহরণ করিয়া আনিতে হয়; মনে করিতে হয়, আমি বিশ্বভুবনের অধিবাসী—আমি৷ কোনো বিশেষপ্রদেশবাসী নহি, আমি যে রাজ-অট্টালিকার মধ্যে বাসস্থান পাইয়াছি লোকলোকান্তর তাহার এক-একটি কক্ষ। এইরূপে, যিনি যথার্থ আর্য তিনি অন্তত প্রত্যহ একবার চন্দ্রসূর্য-গ্রহতারকার মাঝখানে নিজেকে দণ্ডায়মান করেন, পৃথিবীকে অতিক্রম করিয়া নিখিল জগতের সহিত আপনার চিরসম্বন্ধ একবার উপলব্ধি করিয়া লন—স্বাস্থ্যকামী যেরূপ রুদ্ধ গৃহ ছাড়িয়া প্রত্যূষে একবার উন্মুক্ত মাঠের সেবন করিয়া আসেন, সেইরূপ আর্য সাধু দিনের মধ্যে একবার নিখিলের মধ্যে, ভূর্ভুবঃস্বর্লোকের মধ্যে নিজের চিত্তকে প্রেরণ করেন। তিনি সেই অগণ্যজ্যোতিষ্কখচিত বিশ্বলোকের মাঝখানে দাঁড়াইয়া কী মন্ত্র উচ্চারণ করেন ?—

তৎসবিতুর্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি।

এই বিশ্বপ্রসবিতা দেবতার বরণীয় শক্তি ধ্যান করি। এই বিশ্বলোকের মধ্যে সেই বিশ্বলোকেশ্বরের যে শক্তি প্রত্যক্ষ তাঁহাকেই ধ্যান করি। একবার উপলব্ধি করি বিপুল বিশ্বজগৎ একসঙ্গে এই মুহূর্তে এবং প্রতি মুহূর্তেই তাঁহা হইতে অবিশ্রাম বিকীর্ণ হইতেছে। আমরা যাহাকে দেখিয়া শেষ করিতে পারি না, জানিয়া অন্ত করিতে পারি না, তাহা সমগ্রভাবে নিয়তই তিনি প্রেরণ করিতেছেন। এই বিশ্বপ্রকাশক অসীম শক্তির সহিত আমার অব্যবহিত সম্পর্ক কী সূত্রে ? কোন্ সূত্র অবলম্বন করিয়া তাঁহাকে ধ্যান করিব ?—

ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ—

যিনি আমাদিগকে বুদ্ধিবৃত্তিসকল প্রেরণ করিতেছেন, তাঁহার প্রেরিত সেই ধীসূত্রেই তাঁহাকে ধ্যান করিব। সূর্যের প্রকাশ আমরা প্রত্যক্ষভাবে কিসের দ্বারা জানি ? সূর্য নিজে আমাদিগকে যে কিরণ প্রেরণ করিতেছেন সেই কিরণেরই দ্বারা। সেইরূপ বিশ্বজগতের সবিতা আমাদের মধ্যে অহরহ যে ধীশক্তি প্রেরণ করিতেছেন, যে শক্তি থাকাতেই আমি নিজেকে ও বাহিরের সমস্ত প্রত্যক্ষ ব্যাপারকে উপলব্ধি করিতেছি, সে ধীশক্তি তাঁহারই শক্তি—এবং সে ধীশক্তি-দ্বারাই তাঁহারই শক্তি প্রত্যক্ষভাবে অন্তরের মধ্যে অন্তরতমরূপে অনুভব করিতে পারি। বাহিরে যেমন ভূর্ভুবঃস্বর্লোকের সবিতৃরূপে তাঁহাকে জগৎচরাচরের মধ্যে উপলব্ধি করি, অন্তরের মধ্যেও সেইরূপ আমার ধীশক্তির অবিশ্রাম প্রেরয়িতা বলিয়া তাঁহাকে অব্যবহিতভাবে উপলব্ধি করিতে পারি। বাহিরে জগৎ এবং আমার অন্তরে ধী এ দুইই একই শক্তির বিকাশ, ইহা জানিলে জগতের সহিত আমার চিত্তের এবং আমার চিত্তের সহিত সেই সচ্চিদানন্দের ঘনিষ্ঠ যোগ অনুভব করিয়া সংকীর্ণতা হইতে, স্বার্থ হইতে,. ভয় হইতে, বিষাদ হইতে মুক্তিলাভ করি। এইরূপে

গায়ত্রীমন্ত্রে বাহিরের সহিত অন্তরের এবং অন্তরের সহিত অন্তরতমের যোগসাধন করে।

ব্রহ্মকে ধ্যান করিবার এই-যে প্রাচীন বৈদিক পদ্ধতি ইহা যেমন উদার তেমনি সরল। ইহা সর্বপ্রকার কৃত্রিমতা-পরিশূন্য। বাহিরের বিশ্বজগৎ এবং অন্তরের ধী, ইহা কাহাকেও কোথাও অনুসন্ধান করিয়া বেড়াইতে হয় না—ইহা ছাড়া আমাদের আর কিছুই নাই। এই জগৎকে এবং এই বুদ্ধিকে তাঁহার অশ্রান্ত শক্তি-দ্বারা তিনিই অহরহ প্রেরণ করিতেছেন, এই কথা স্মরণ করিলে তাঁহার সহিত আমাদের সম্বন্ধ যেমন গভীরভাবে সমগ্রভাবে একান্তভাবে হৃদয়ংগম হয়,এমন আর কোন্ কৌশলে,কোন আয়োজনে কোন্ কৃত্রিম উপায়ে, কোন্ কল্পনানৈপুণ্যে হইতে পারে, তাহা আমি জানি না। ইহার মধ্যে তর্কবিতর্কের কোনো স্থান নাই, মতবাদ নাই, ব্যক্তিবিশেষগত প্রকৃতির কোনো সংকীর্ণতা নাই।

আমাদের এই ব্রহ্মের ধ্যান যেরূপ সরল অথচ বিরাট, আমাদের উপনিষদের প্রার্থনাটিও ঠিক সেইরূপ।

বিদেশীরা এবং তাঁহাদের প্রিয় ছাত্র স্বদেশীরা বলেন, প্রাচীন হিন্দুশাস্ত্র পাপের প্রতি প্রচুর মনোযোগ করে নাই, ইহাই হিন্দুধর্মের অসম্পূর্ণতা ও নিকৃষ্টতার পরিচয়। বস্তুত ইহাই হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতার প্রমাণ। আমরা পাপপুণ্যের একেবারে মূলে গিয়েছিলাম। অনন্ত আনন্দস্বরূপের সহিত চিত্তের সম্মিলন, ইহার প্রতিই আমাদের শাস্ত্রের সমস্ত চেষ্টা নিবদ্ধ ছিল—তাঁহাকে যথার্থভাবে পাইলে এক কথায় সমস্ত পাপ দূর হয়, সমস্ত পুণ্য লাভ হয়। মাতাকে যদি কেবলই উপদেশ দিতে হয় যে, তুমি ছেলের কাছে অনবধান হইয়ো না, তোমাকে এই করিতে হইবে, তোমাকে এই করিতে হইবে না, তবে উপদেশের আর অন্ত থাকে না—কিন্তু যদি বলি তুমি ছেলেকে ভালোবাসো, তবে দ্বিতীয় কোনো কথাই বলিতে হয় না, সমস্ত সরল হইয়া আসে। ফলত সেই ভালোবাসা ব্যতিরেকে মাতার কর্ম সম্ভবপর হইতেই পারে না। তেমনি যদি বলি, অন্তরের মধ্যে ব্রহ্মের প্রকাশ হউক, তবে পাপসম্বন্ধে আর কোনো কথাই বলিতে হয় না। পাপের দিক হইতে যদি দেখি তবে জটিলতার অন্ত নাই—তাহা ছেদন করিয়া,দাহন করিয়া, নির্মূল করিয়া, কেমন করিয়া যে বিনাশ করিতে হয়, তাহা ভাবিয়া শেষ করা যায় না—সে দিক হইতে দেখিতে গেলে ধর্মকে বিরাট বিভীষিকা করিয়া তুলিতে হয়—কিন্তু আনন্দময়ের দিক হইতে দেখিলে তৎক্ষণাৎ পাপ কুহেলিকার মতো অন্তর্হিত হয়। পাশ্চাত্য ধর্মশাস্ত্র পাপ ও পাপ হইতে মুক্তি নিরতিশয় জটিল ও নিদারুণ, মানুষের বুদ্ধি তাহাকে উত্তরোত্তর গহন করিয়া তুলিয়াছে এবং সেই বিচিত্র পাপতত্ত্বের দ্বারা ঈশ্বরকে খণ্ডিত করিয়া, দুর্গম করিয়া ধর্মকে দুর্বল করিয়াছে।—

অসতো মা সদ্গময়
তমসো মা জ্যোতির্গময়
মৃত্যোর্মামৃতং গময়।

অসৎ হইতে সত্যে লইয়া যাও, অন্ধকার হইতে জ্যোতিতে লইয়া যাও, মৃত্যু হইতে অমৃতে লইয়া যাও। আমাদের অভাব কেবল সত্যের অভাব, আলোকের অভাব, অমৃতের অভাব—আমাদের জীবনের সমস্ত দুঃখ পাপ নিরানন্দ কেবল সেইজন্যই। সত্যের,

জ্যোতির, অমৃতের ঐশ্বর্য যিনি কিছু পাইয়াছেন তিনিই জানেন, ইহাতে আমাদের জীবনের সমস্ত অভাবের একেবারে মূলচ্ছেদ করিয়া দেয়। যে-সকল ব্যাঘাত তাঁহার প্রকাশকে আমাদের নিকট হইতে আচ্ছন্ন করিয়া রাখে তাহাই বিচিত্র রূপ ধারণ করিয়া আমাদিগকে নানা দুঃখ এবং অকৃতার্থতার মধ্যে অবতীর্ণ করিয়া দেয়। সেইজন্যই আমাদের মন অসত্য অন্ধকার ও বিনাশের আবরণ হইতে রক্ষা চাহে। যখন সে বলে 'আমার দুঃখ দূর করো' তখন সে শেষ পর্যন্ত না বুঝিলেও এই কথাই বলে; যখন সে বলে 'আমার দৈন্য মোচন করো' তখন সে যথার্থ কী চাহিতেছে তাহা না জানিলেও এই কথাই বলে। যখন সে বলে 'আমাকে পাপ হইতে রক্ষা করো' তখনো এই কথা। সে না বুঝিয়াও বলে—

আবিরাবীর্ম এধি।

হে স্বপ্রকাশ, আমার নিকট প্রকাশিত হও। আমরা ধ্যানযোগে আমাদের অন্তর-বাহিরকে যেমন বিশ্বেশ্বরের দ্বারাই বিকীর্ণ দেখিতে চেষ্টা করিব তেমনি আমরা প্রার্থনা করিব যে, যে সত্য, যে জ্যোতি, যে অমৃতের মধ্যে আমরা নিত্যই রহিয়াছি তাহাকে সচেতনভাবে জানিবার যাহা-কিছু বাধা সেই অসত্য, সেই অন্ধকার, সেই মৃত্যু যেন দূর হইয়া যায়। যাহা নাই তাহা চাই না, আমাদের যাহা আছে তাহাকেই পাইব, ইহাই আমাদের প্রার্থনার বিষয়; যাহা দূরে তাহাকে সন্ধান করিব না, যাহা আমাদের ধীশক্তিতেই প্রকাশিত তাহাকেই আমরা উপলব্ধি করিব, ইহাই আমাদের ধ্যানের লক্ষ্য। আমাদের প্রাচীন ভারতবর্ষের ধর্ম এইরূপ সরল, এইরূপ উদার, এইরূপ অন্তরঙ্গ, তাহাতে স্বরচিত কল্পনাকুহকের স্পর্শ নাই।

জীবনযাত্রাসম্বন্ধেও ভারতবর্ষের উপদেশ এইরূপ সরল এবং মূলগামী। ভারতবর্ষ বলে—

সন্তোষং হৃদি সংস্থায় সুখার্থী সংযতো ভবেৎ।

সুখার্থী সন্তোষকে হৃদয়ের মধ্যে স্থাপন করিয়া সংযত হইবেন। সুখ যিনি চান তিনি সন্তোষকে গ্রহণ করিবেন, সন্তোষ যিনি চান তিনি সংযম অভ্যাস করিবেন। এ কথা বলিবার তাৎপর্য এই যে, সুখের উপায় বাহিরে নাই, তাহা অন্তরেই আছে; তাহা উপকরণজালের বিপুল জটিলতার মধ্যে নাই, তাহা সংযত চিত্তের নির্মল সরলতার মধ্যে বিরাজমান। উপকরণ সঞ্চয়ের আদি-অন্ত নাই; বাসনাবহ্নিতে যত আহুতি দেওয়া যায় সমস্ত ভস্ম হইয়া ক্ষুধিত শিখা ক্রমশই বিস্তৃত হইতে থাকে, ক্রমেই সে নিজের অধিকার হইতে পরের অধিকারে যায়, তাহার লোলুপতা ক্রমেই বিশ্বের প্রতি দারুণ ভাব ধারণ করে। সুখকে বাহিরে কল্পনা করিয়া বিশ্বকে মৃগয়ার মৃগের মতো নিষ্ঠুর বেগে তাড়না করিয়া ফিরিলে জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত কেবল ছুটাছুটিই সার হয় এবং পরিণামে শিকারির উদ্দাম অশ্ব তাহাকে কোন্ অপঘাতের মধ্যে নিক্ষেপ করে তাহার উদ্দেশ পাওয়া যায় না।

এইরূপ উন্মত্তভাবে যখন আমরা ছুটিতে থাকি তখন আমাদের আগ্রহের অসহ্য বেগে সমস্ত জগৎ অস্পষ্ট হইয়া যায়। আমাদের চারি দিকে পদে পদে যে-সকল অযাচিত আনন্দ প্রভূত প্রাচুর্যের সহিত অহরহ প্রতীক্ষা করিয়া আছে তাহাদিগকে অনায়াসেই আমরা লঙ্ঘন করিয়া, দলন করিয়া, বিচ্ছিন্ন করিয়া চলিয়া যাই। জগতের অক্ষয় আনন্দের

ভান্ডারকে আমরা কেবল ছুটিতে ছুটিতেই দেখিতে পাই না। এইজন্যই ভারতবর্ষ বলিতেছেন: সংযতো ভবেৎ। প্রবৃত্তিবেগ সংযত করো। চাঞ্চল্য দূর হইলেই সন্তোষের স্তব্ধতার মধ্যে জগতের সমস্ত বৃহৎ আনন্দগুলি আপনি প্রকাশিত হইবে। গতিবেগের প্রমত্ততাবশতই আমরা সংসারে যে-সকল স্নেহ প্রেম সৌন্দর্যকে, প্রতিদিনের শত শত মঙ্গলভাবের আদানপ্রদানকে লক্ষ্য করিতে পারি নাই, সংযত হইয়া স্থির হইয়া তাহাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই তাহাদের ভিতরকার সমস্ত ঐশ্বর্য অতি সহজেই অবারিত হইয়া যায়।

যাহা নাই তাহারই শিকারে বাহির হইতে হইবে, ভারতবর্ষ এ পরামর্শ দেয় না; ছুটোছুটিই যে চরম সার্থকতা, এ কথা ভরতবর্ষের নহে। যাহা অন্তরে বাহিরে চারি দিকেই আছে, যাহা অজস্র, যাহা ধ্রুব, যাহা সহজ, ভারতবর্ষ তাহাকেই লাভ করিতে পরামর্শ দেয়; কারণ, তাহাই সত্য, তাহাই নিত্য। যিনি অন্তরে আছেন তাঁহাকে অন্তরেই লাভ করিতে ভারতবর্ষ বলে, যিনি বিশ্বে আছেন তাঁহাকে বিশ্বের মধ্যেই উপলব্ধি করা ভারতবর্ষের সাধনা; আমরা যে অমৃত-লোকে সহজেই বাস করিতেছি, দৃষ্টির বাধা দূর করিয়া তাহাকে প্রত্যক্ষ করিবার জন্যই ভারতবর্ষের প্রার্থনা। চিত্তসরোবরের যে অনাবিল অচাঞ্চল্য, যাহার নাম সন্তোষ, আনন্দের যাহা দর্পণ, তাহাকেই সমস্ত ক্ষোভ হইতে রক্ষা করা, ইহাই ভারতবর্ষের শিক্ষা। কিছু কল্পনা করা নহে, রচনা করা নহে, আহরণ করা নহে—জাগরিত হওয়া, বিকশিত হওয়া, প্রতিষ্ঠিত হওয়া—যাহা আছে তাহাকে গ্রহণ করিবার জন্য অত্যন্ত সরল হওয়া। যাহা সত্য তাহা সত্য বলিয়াই আমাদের নিকটতম, সত্য বলিয়াই তাহা দিবালোকের ন্যায় আমাদের সকলেরই প্রাপ্য, তাহা আমাদের স্বরচিত নহে বলিয়াই তাহা আমাদের পক্ষে সুগম, তাহা আমাদের সম্যক্-ধারণার অতীত বলিয়াই তাহা আমাদের চিরজীবনের আশ্রয়—তাহার প্রতিনিধিমাত্রই তাহা অপেক্ষা সুদূর—তাহাকে আমাদের কোনো আবশ্যকবিশেষের উপযোগীরূপে, বিশেষ আয়ত্তগম্যরূপে সহজ করিতে চেষ্টা করিতে গেলেই তাহাকে কঠিন করা হয়, তাহাকে পরিত্যাগ করা হয়—অধীর হইয়া তাহাকে বাহ্যাড়ম্বরের মধ্যে খুঁজিয়া বেড়াইলে নিজের সৃষ্টিকেই খুঁজিয়া ফিরিতে হয়—এইরূপে চেষ্টার উপস্থিত উত্তেজনামাত্র লাভ করি, কিন্তু চরম সার্থকতা প্রাপ্ত হই না। আজ আমরা ভারতবর্ষের সেই উপদেশ ভুলিয়াছি, তাহার অকলঙ্ক সরলতম বিরাটতম একনিষ্ঠ আদর্শ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া শতধাবিভক্ত খর্বতা-খন্ডতার দুর্গম গহনমধ্যে মায়ামৃগীর অনুধাবন করিয়া ফিরিতেছি।

হে ভারতবর্ষের চিরারাধ্যতম অন্তর্যামী বিধাতৃপুরুষ, তুমি আমাদের ভারতবর্ষকে সফল করো। ভারতবর্ষের সফলতার পথ একান্ত সরল একনিষ্ঠতার পথ। তোমার মধ্যেই তাহার ধর্ম, কর্ম, তাহার চিত্ত পরম ঐক্যলাভ করিয়া জগতের, সমাজের, জীবনের সমস্ত জটিলতার নির্মল সহজ মীমাংসা করিয়াছিল। যাহা স্বার্থের, বিরোধের, সংশয়ের নানা শাখাপ্রশাখার মধ্যে আমাদিগকে উত্তীর্ণ করিয়া দেয়, যাহা বিবিধের আকর্ষণে আমাদের প্রবৃত্তিকে নানা-অভিমুখে বিক্ষিপ্ত করে, যাহা উপকরণের নানা জঞ্জালের মধ্যে আমাদের চেষ্টাকে নানা আকারে ভ্রাম্যমাণ করিতে থাকে, তাহা ভারতবর্ষের পন্থা নহে। ভারতবর্ষের পথ একের পথ, তাহা বাধাবিবর্জিত তোমারই পথ; আমাদের বৃদ্ধ পিতামহদের পদাঙ্কচিহ্নিত সেই প্রাচীন প্রশস্ত পুরাতন সরল রাজপথ যদি পরিত্যাগ না

করি, তবে কোনোমতেই আমরা ব্যর্থ হইব না। জগতের মধ্যে অদ্য দারুণ দুর্যোগের দুর্দিন উপস্থিত হইয়াছে, চারি দিকে যুদ্ধভেরী বাজিয়া উঠিয়াছে, বাণিজ্যরথ দুর্বলকে ধূলির সহিত দলন করিয়া ঘর্ঘরশব্দে চারি দিকে ধাবিত হইয়াছে, স্বার্থের ঝঞ্ঝাবায়ু প্রলয়-গর্জনে চারি দিকে পাক খাইয়া ফিরিতেছে—হে বিধাতঃ, পৃথিবীর লোক আজ তোমার সিংহাসন শূন্য মনে করিতেছে, ধর্মকে অভ্যাসজনিত সংস্কারমাত্র মনে করিয়া নিশ্চিন্তচিত্তে যথেচ্ছাচারে প্রবৃত্ত হইয়াছে—হে শান্তং শিবমদ্বৈতম্, এই ঝঞ্ঝাবর্তে আমরা ক্ষুব্ধ হইব না, শুষ্ক মৃত পত্ররাশির ন্যায় ইহার দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া ধূলিধ্বজা তুলিয়া দিগ্‌বিদিকে ভ্রাম্যমাণ হইব না, আমরা পৃথিবীব্যাপী প্রলয় তান্ডবের মধ্যে একমনে একাগ্রনিষ্ঠায় এই বিপুল বিশ্বাস যেন দৃঢ়রূপে ধারণ করিয়া থাকি যে—

অধর্মেণৈধতে তাবৎ ততো ভদ্রাণি পশ্যতি
ততঃ সপত্নান্ জয়তি সমূলস্তু বিনশ্যতি।

অধর্মের দ্বারা আপাতত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হওয়া যায়, আপাতত মঙ্গল দেখা যায়, আপাতত শত্রুরা পরাজিত হইতে থাকে, কিন্তু সমূলে বিনাশ পাইতে হয়।

একদিন নানা দুঃখ ও আঘাতে বৃহৎ শ্মশানের মধ্যে এই দুর্যোগের নিবৃত্তি হইবে—তখন যদি মানবসমাজ এই কথা বলে যে, শক্তির পূজা, ক্ষমতার মত্ততা, স্বার্থের দারুণ দুশ্চেষ্টা যখন প্রবলতম, মোহান্ধকার যখন ঘনীভূত এবং দলবদ্ধ ক্ষুধিত আত্মম্ভরিতা যখন উত্তরে-দক্ষিণে পূর্বে-পশ্চিমে গর্জন করিয়া ফিরিতেছিল, তখনো ভারতবর্ষ আপন ধর্ম হারায় নাই, বিশ্বাস ত্যাগ করে নাই, একমাত্র নিত্যসত্যের প্রতি নিষ্ঠা স্থির রাখিয়াছিল—সকলের ঊর্ধ্বে নির্বিকার একের পতাকা প্রাণপণ দৃঢ়মুষ্টিতে ধরিয়াছিল এবং সমস্ত আলোড়ন-গর্জনের মধ্যে মাভৈঃ মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া বলিতেছিল 'আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন'—একের আনন্দ, ব্রহ্মের আনন্দ যিনি জানিয়াছেন তিনি কিছু হইতেই ভয়প্রাপ্ত হন না—ইহাই যদি সম্ভবপর হয়, তবে ভারতবর্ষে ঋষিদের জন্ম, উপনিষদের শিক্ষা, গীতার উপদেশ, বহুশতাব্দী হইতে নানা দুঃখ ও অবমাননা, সমস্তই সার্থক হইবে—ধৈর্যের দ্বারা সার্থক হইবে, ধর্মের দ্বারা সার্থক হইবে, ব্রহ্মের দ্বারা সার্থক হইবে—দম্ভের দ্বারা নহে, প্রতাপের দ্বারা নহে, স্বার্থসিদ্ধির দ্বারা নহে।.....

ধর্ম, র/১২/১৯-২৮

টীকা ঃ

উপনিষদ—উপনিষদ আরণ্যকের অন্তর্গত। গুরুর সমীপে (উপ) এসে বিদ্যার্থীরা এই বিদ্যা গ্রহণ করতেন বলে এর নাম উপনিষদ। উপনিষদের সংখ্যা অনেক। এদের মধ্যে ঐতরেয়, বৃহদারণ্যক, ছান্দোগ্য, তৈত্তিরীয়, কৌষীতকি, কেন, কঠ, প্রশ্ন প্রভৃতি কয়েকখানি প্রধান বলে গণ্য হয়।

২০। ধর্ম

১৭ শ্রাবণ, ১৩১০ (১৯০৩)

....ধর্মকে একটা বিশেষ স্থান বা বিশেষ সময় বা বিশেষ কথার সঙ্গে জড়িত করলে সেটা ধর্ম হ'ল না। ব্রাহ্মসমাজে এই ভাবটি খুব আছে। যে যেপরিমাণে উপাসনাশীল সে সেই পরিমাণে ধার্মিক—এটি বড়ো ভুল ধারণা। আমি চোখ বুজে ঈশ্বরের ধ্যান করলুম, মনেতে হয়তো একটু ভাবও এল, কিন্তু তারপরে যখন বাইরে গেলুম, যার সঙ্গে শত্রুতা ছিল সে শত্রুই রইল। জগৎ আমার কাছে আগে যে রকম ছিল সেই রকমই রইল, সকলকে আপনার বন্ধুর মতো দেখলুম না—একে কি ঈশ্বরের উপাসনা বলব! অনেক লোকে এরকম ভাবে মনে করে সত্যিই ঈশ্বরকে ধারণা করেছি—নিজেদের নিজেরা প্রতারণা করে। এ একরকম মেস্‌মেরিজম্‌। খোলের আওয়াজে যে অনেক সময়ে ভাব হয়, সেও একরকম মেস্‌মেরিজম্‌।

আমার কাছে ধর্ম ভারি concrete—যদিচ এবিষয়ে আমার কিছু বলবার অধিকার নেই। কিন্তু আমি যদি ঈশ্বরকে কোনোরকম উপলব্ধি করে থাকি বা ঈশ্বরের আভাস পেয়ে থাকি, তাহলে এই সমস্ত জগৎ থেকে, মানুষ থেকে, গাছপালা পশুপাখি ধুলোমাটি—সব জিনিস থেকেই পেয়েছি। আমি ধুলোকে ধুলো নাম দিয়েছি ব'লে তার কি অন্য কোনো significance নেই। আমরা এই জগতের অধিকাংশ জিনিসকেই জড় নাম দিয়ে আমাদের বাইরে ঠেলে রেখে দিই। আমি এই সমস্তের মধ্যে যেন প্রত্যক্ষ ভাবে ঈশ্বরকে অনুভব করি। আমার কাছে ধুলো কেবল ধুলো নয়, গাছ কেবল গাছ নয়, ফুল কেবল ফুল নয়; তাদের মধ্যে একটা deeper significance আছে ব'লে মনে হয়। আকাশে বাতাসে জলে সর্বত্র আমি তাঁর স্পর্শ অনুভব করি। এক এক সময় সমস্ত জগৎ আমার কাছে কথা কয়।

.আমি এইজন্য বলি ঈশ্বরকে একটা বিশেষ উপায়ের ভিতর দিয়ে, একটা বিশেষ অনুষ্ঠানের দ্বারা পাবার দরকার নেই। সর্বত্রই, লোকজন জড়প্রকৃতি সকলের ভিতরেই তাঁকে পাওয়া যায়। আর আমার তো মনে হয় এইটেই স্বাভাবিক উপায়। আমি ভারি positivist। আমি যখন ঈশ্বরকে উপলব্ধি করব তখন সকল জিনিসের ভিতরেই তাঁকে দেখব—সব জগৎ আমার আপনার হবে, আমি সকলকে ক্ষমা করতে পারব, সবেতেই তাঁর মঙ্গলময় হাত দেখব, জগতের মধ্যে একটা harmony অনুভব করব।

বিশ্বভারতী পত্রিকা, প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, শ্রাবণ-১৩৪৯

টীকা ঃ

ধর্ম—এটি রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অনুলেখন। এ-বিষয়ে রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেন, "'ধর্ম' সংক্রান্ত আলোচনাটিতে তারিখ দেওয়া আছে ২রা আগস্ট। ব্রহ্মচর্যাশ্রমের একটি বিশেষ ঘটনারও উল্লেখ আছে—যোগরঞ্জনের মৃত্যু। যতদূর স্মরণ হয়, এই ঘটনার সন ও মাস হবে শ্রাবণ, ১৩১০—আজ থেকে ৩৯ বছর পূর্বের ঘটনা। তখন আমরা গিরিডিতে, বাবামশায়ের বিশেষ বন্ধু শ্রীশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের বাসার পাশ্ববর্তী বাংলোতে কিছুদিন ছিলুম।"

সম্ভবত রচনাটির নামকরণ রথীন্দ্রনাথের।

মেস্‌মেরিজ্‌ম্‌—মেস্‌মেরিজম হল নিদ্রানুরূপ সম্মোহিত অবস্থা। পরবর্তী প্রচলিত নাম Hypnotism। Franz Anton Mesmer (1734-1815) নামে এক অস্ট্রিয়ান চিকিৎসক hypnosis-কে চিকিৎসায় প্রয়োগ করেন। প্রথমদিকে তাঁরই নামানুসারে এই পদ্ধতিকে মেস্‌মেরিজম বলা হত। ১৮৪০-এ এক স্কটিস সার্জন hypnosis নামটি ব্যবহার করেন। ফ্রয়েড প্রমুখ মনঃসমীক্ষণপন্থী চিকিৎসকেরা মানসিক রোগে এই পদ্ধতির প্রয়োগে সুফল পেয়েছেন বলে দাবি করেছেন।

রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর—রবীন্দ্রনাথের পুত্র।

২১। দিন ও রাত্রি

বঙ্গদর্শন, ১৩১১ মাঘ (১৯০৪)

সূর্য অস্ত গিয়াছে। অন্ধকার-অবগুণ্ঠনের অন্তরালে সন্ধ্যার সীমন্তের শেষ স্বর্ণলেখাটুকু অন্তর্হিত হইয়াছে। রাত্রিকাল আসন্ন।

এই-যে দিন এবং রাত্রি প্রত্যহই আমাদের জীবনকে একবার আলোকে একবার অন্ধকারে তালে তালে আঘাত করিয়া যাইতেছে, ইহারা আমাদের চিত্তবীণায় কী রাগিণী ধ্বনিত করিয়া তুলিতেছে ? এইরূপে প্রতিদিন আমাদের মধ্যে যে এক অপরূপ ছন্দ রচিত হইতেছে, তাহার মধ্যে কি কোনো বৃহৎ অর্থ নাই ? আমরা এই-যে অনন্ত গগনতলের নাড়িস্পন্দনের ন্যায় দিনরাত্রির নিয়মিত উত্থানপতনের অভিঘাতের মধ্যে বাড়িয়া উঠিতেছি, আমাদের জীবনের মধ্যে এই আলোক-অন্ধকারের নিত্য গতিবিধির একটা তাৎপর্য কি গ্রথিত হইয়া যাইতেছে না? তটভূমির উপরে প্রতি বর্ষায় যে-একটা জলপ্লাবন বহিয়া যাইতেছে এবং তাহার পরে শরৎকালে সে আবার জল হইতে জাগিয়া উঠিয়া শস্যবপনের জন্য প্রস্তুত হইতেছে—এই বর্ষা ও শরতের গতায়াত তটভূমির স্তরে স্তরে কি নিজের ইতিহাস রাখিয়া যায় না ?

দিনের পর এই-যে রাত্রির অবতরণ, রাত্রির পর এই-যে দিনের অভ্যুদয়, ইহার পরম বিস্ময়করতা হইতে আমরা চিরাভ্যাসবশত যেন বঞ্চিত না হই। সূর্য এক সময়ে হঠাৎ আকাশতলে তাহার আলোকের পুঁথি বন্ধ করিয়া দিয়া চলিয়া যায়, রাত্রি নিঃশব্দ করে আর-একটি নূতন গ্রন্থের নূতন অধ্যায় বিশ্বলোকের সহস্র অনিমেষ নেত্রের সম্মুখে উদ্‌ঘাটিত করিয়া দেয়, ইহা আমাদের পক্ষে সামান্য ব্যাপার নহে।

এই অল্পকালের পরিবর্তন কী বিপুল, কী আশ্চর্য। কী অনায়াসে মুহূর্তকালের মধ্যেই বিশ্বসংসার ভাব হইতে ভাবান্তরে পদার্পণ করে। অথচ মাঝখানে কোনো বিপ্লব নাই, বিচ্ছেদের কোনো তীব্র আঘাত নাই; একের অবসান ও অন্যের আরম্ভের মধ্যে কী স্নিগ্ধ শান্তি, কী সৌম্য সৌন্দর্য!

দিনের আলোকে সকল পদার্থের পরস্পরের যে প্রভেদ, যে পার্থক্য তাহাই বড়ো

হইয়া, স্পষ্ট হইয়া, আমাদের প্রত্যক্ষ হইয়া উঠে। আলোক আমাদের পরস্পরের মধ্যে একটা ব্যবধানের কাজ করে—আমাদের প্রত্যেকের সীমা পরিস্ফুটরূপে নির্ণয় করিয়া দেয়। দিনের বেলায় আমরা যে-যার আপন আপন কাজের দ্বারা স্বতন্ত্র, সেই কাজের চেষ্টার সংঘাতে পরস্পরের মধ্যে বিরোধও বাধিয়া যায়। দিনে আমরা সকলেই নিজ নিজ শক্তি প্রয়োগ করিয়া জগতে নিজেকে জয়ী করিবার চেষ্টায় নিযুক্ত। তখন আমাদের আপন আপন কর্মশালায় আমাদের কাছে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের আর-সমস্ত বৃহৎ ব্যাপারের চেয়ে বৃহত্তম—এবং নিজ নিজ কর্মোদ্‌যোগের আকর্ষণই জগতের আর-সমস্ত মহৎ আকর্ষণের চেয়ে আমাদের কাছে মহত্তম হইয়া উঠে।

এমন সময় নীলাম্বরা রাত্রি নিঃশব্দ পদে আসিয়া নিখিলের উপরে স্নিগ্ধ করস্পর্শ করিবামাত্র আমাদের পরস্পরের বাহ্য প্রভেদ অস্পষ্ট হইয়া আসে—তখন আমাদের পরস্পরের মধ্যে গভীরতম যে ঐক্য তাহাই অন্তরের মধ্যে অনুভব করিবার অবকাশ ঘটে। এইজন্য রাত্রি প্রেমের সময়, মিলনের কাল।

ইহাই ঠিক করিয়া বুঝিতে পারিলে জানিব—দিন আমাদিগকে যাহা দেয় রাত্রি শুধুমাত্র যে তাহা অপহরণ করে, তাহা নহে; অন্ধকার যে কেবলমাত্র অভাব ও শূন্যতা আনয়ন করে, তাহা নহে—তাহারও দিবার জিনিস আছে, এবং যাহা দেয় তাহা মহামূল্য। সে যে কেবল সুপ্তির দ্বারা আমাদের ক্ষতিপূরণ করে, আমাদের ক্লান্তি অপনোদন করিয়া দেয় মাত্র, তাহা নহে। সে আমাদের প্রেমের নিভৃত নির্ভরস্থান, সে আমাদের মিলনের মহাদেশ।

শক্তিতে আমাদের গতি, প্রেমে আমাদের স্থিতি। শক্তি কর্মের মধ্যে আপনাকে ধাবিত করে, প্রেম বিশ্রামের মধ্যে আপনাকে পুঞ্জীভূত করে। শক্তি আপনাকে বিক্ষিপ্ত করিতে থাকে, সে চঞ্চল; প্রেম আপনাকে সংহত করিয়া আনে, সে স্থির। আমাদের চিত্ত যাহাদিগকে ভালোবাসে, সংসারে কেবল তাহাদেরই মধ্যে সে বিরামলাভ করে; আমাদের চিত্ত যখন বিশ্রামের অবকাশ পায়, তখনই সে সম্পূর্ণভাবে ভালোবাসিতে পারে। জগতে আমাদের যথার্থ যে বিরাম তাহা প্রেম; প্রেমহীন যে বিরাম তাহা জড়ত্বমাত্র।

এই কারণে কর্মশালা প্রকৃত মিলনের স্থান নহে; স্বার্থে আমরা একত্র হইতে পারি, কিন্তু এক হইতে পারি না। প্রভুভৃত্যের মিলন সম্পূর্ণ মিলন নহে, বন্ধুদের মিলনই সম্পূর্ণ মিলন। বন্ধুত্বের মিলন বিশ্রামের মধ্যে বিকশিত হয়—তাহাতে কর্মের তাড়না নাই, তাহাতে প্রয়োজনের বাধ্যতা নাই। তাহা অহেতুক।

এইজন্য দিবাবসানে আমাদের প্রয়োজন যখন শেষ হয়, আমাদের কর্মের বেগ যখন শান্ত হয়, তখনই সমস্ত আবশ্যকের অতীত যে প্রেম, সে আপনার যথার্থ অবকাশ পায়। আমাদের কর্মের সহায় যে ইন্দ্রিয়বোধ সে যখন অন্ধকারে আবৃত হইয়া পড়ে, তখন ব্যাঘাতহীন আমাদের হৃদয়ের শক্তি বাড়িয়া উঠে, তখন আমাদের স্নেহপ্রেম সহজ হয়, আমাদের মিলন সম্পূর্ণ হয়।

তাই বলিতেছিলাম, রাত্রি যে কেবল হরণ করে তাহা নহে, সে দানও করে। আমাদের এক যায়, আমরা আর পাই; এবং যায় বলিয়াই আমরা তাহা পাইতে পারি। দিনে সংসারক্ষেত্রে আমাদের শক্তিপ্রয়োগের সুখ, রাত্রে তাহা অভিভূত হয় বলিয়াই নিখিলের মধ্যে আমরা আত্মসমর্পণের আনন্দ পাই। দিনে স্বার্থসাধনচেষ্টায় আমাদের কর্তৃত্ব-

অভিমান তৃপ্ত হয়, রাত্রি তাহাকে খর্ব করে বলিয়াই প্রেম এবং শান্তির অধিকার লাভ করি। দিনে আলোকে-পরিচ্ছিন্ন এই পৃথিবীকে আমরা উজ্জ্বলরূপে পাই, রাত্রে তাহা ম্লান হয় বলিয়াই অগণ্য জ্যোতিষ্কলোক উদ্‌ঘাটিত হইয়া যায়।

আমরা একই সময়ে সীমাকে এবং অসীমকে, অহংকে এবং অখিলকে, বিচিত্রকে এবং এককে সম্পূর্ণভাবে পাইতে পারি না বলিয়াই একবার দিন আসিয়া আমাদের চক্ষু খুলিয়া দেয়, একবার রাত্রি আসিয়া আমাদের হৃদয়ের দ্বার উদ্‌ঘাটিত করে। একবার আলোক আসিয়া আমাদিগকে কেন্দ্রের মধ্যে নিবিষ্ট করে, একবার অন্ধকার আসিয়া আমাদিগকে পরিধির সহিত পরিচিত করিতে থাকে।

এইজন্য রাত্রিই উৎসবের বিশেষ সময়। এখন বিশ্বভুবন অন্ধকারের মাতৃকক্ষে আসিয়া সমবেত হইয়াছে। যে অন্ধকার হইতে জগৎচরাচর ভূমিষ্ঠ হইয়াছে, যে অন্ধকার হইতে আলোকনির্ঝরিণী নিরন্তর উৎসারিত হইতেছে, যেখানে বিশ্বের সমস্ত উদ্‌যোগ নিঃশব্দে শক্তিসঞ্চয় করিতেছে, সমস্ত ক্লান্তি সুপ্তিসুধার মধ্যে নিমগ্ন হইয়া নবজীবনের জন্য প্রস্তুত হইতেছে, যে নিস্তব্ধ মহান্ধকার-গর্ভ হইতে এক-একটি উজ্জ্বল দিবস নীলসমুদ্র হইতে এক-একটি ফেনিল তরঙ্গের ন্যায় একবার আকাশে উত্থিত হইয়া আবার সেই সমুদ্রের মধ্যে শয়ান হইতেছে, সেই অন্ধকার আমাদের নিকট যাহা গোপন করিতেছে তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক প্রকাশ করিতেছে। সে না থাকিলে লোকলোকান্তরের বার্তা আমরা পাইতাম না, আলোক আমাদিগকে কারারুদ্ধ করিয়া রাখিত।

এই রজনীর অন্ধকার প্রত্যহ একবার করিয়া দিবালোকের স্বর্ণসিংহদ্বার মুক্ত করিয়া আমাদিগকে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অন্তঃপুরের মধ্যে আনিয়া উপস্থিত করে, বিশ্বজননীর এক অখণ্ড নীলাঞ্চল আমাদের সকলের উপরে টানিয়া দেয়। সন্তান যখন মাতার আলিঙ্গনপাশের মধ্যে সম্পূর্ণ প্রচ্ছন্ন হইয়া কিছুই দেখে না, শোনে না, তখনই নিবিড়তরভাবে মাতাকে অনুভব করে; সেই অনুভূতি দেখা-শোনার চেয়ে অনেক বেশি ঐকান্তিক—স্তব্ধ অন্ধকার তেমনি যখন আমাদের দেখা-শোনাকে শান্ত করিয়া দেয়, তখনই আমরা এক শয্যাতলে নিখিলকে ও নিখিলমাতাকে আমাদের বক্ষের কাছে অত্যন্ত নিবিড়ভাবে নিকটবর্তী করিয়া অনুভব করি। তখন নিজের অভাব নিজের শক্তি নিজের কাজ বাড়িয়া উঠিয়া আমাদের চারি দিকে প্রাচীর তুলিয়া দেয় না, অত্যুগ্র ভেদবোধ আমাদের প্রত্যেককে খণ্ড-খণ্ড পৃথক-পৃথক করিয়া রাখে না, মহৎ নিঃশব্দতার মধ্য দিয়া নিখিলের নিশ্বাস আমাদের গায়ের উপরে আসিয়া পড়ে, এবং নিত্যজাগ্রত নিখিলজননীর অনিমেষ দৃষ্টি আমাদের শিয়রের কাছে প্রত্যক্ষগম্য হইয়া উঠে।

আমাদের রজনীর উৎসব সেই নিভৃতনিগূঢ় অথচ বিশ্বব্যাপী জননীকক্ষের উৎসব। এখন আমরা কাজের কথা ভুলি, সংগ্রামের কথা ভুলি, আত্মশক্তি-অভিমানের চর্চা ভুলি, আমরা সকলে মিলিয়া তাঁহার প্রসন্ন মুখচ্ছবির ভিখারি হইয়া দাঁড়াই; বলি, জননী, যখন প্রয়োজন ছিল, তখন তোমার কাছে ক্ষুধার অন্ন, কর্মের শক্তি, পথের পাথেয় প্রার্থনা করিয়াছিলাম—কিন্তু এখন সমস্ত প্রয়োজনকে বাহিরে ফেলিয়া আসিয়া তোমার এই কক্ষের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছি, এখন একান্ত তোমাকেই প্রার্থনা করি। আমি তোমার কাছে এখন আর হাত পাতিব না—কেবলমাত্র তুমি আমাকে স্পর্শ করো, মার্জনা করো,

গ্রহণ করো। তোমার রজনীমহাসমুদ্রে অবগাহনস্নান করিয়া বিশ্বজগৎ যখন কাল উজ্জ্বলবেশে নির্মলললাটে প্রভাতআলোকে দণ্ডায়মান হইবে, তখন যেন আমি তাহার সঙ্গে সমান হইয়া দাঁড়াইতে পারি—তখন যেন আমার গ্লানি না থাকে, আমার ক্লান্তি দূর হয়; তখন যেন আমি অন্তরের সহিত বলিতে পারি, সকলের কল্যাণ হউক, কল্যাণ হউক; যেন বলিতে পারি, সকলের মধ্যে যিনি আছেন তাঁহাকে আমি দেখিতেছি—তাঁহার যাহা প্রসাদ, তিনি অদ্য সমস্তদিন আমাকে যাহা দিবেন, তাহাই আমি ভোগ করিব, আমি কিছুতেই লোভ করিব না।

প্রাতঃকালে যিনি আমাদের পিতা হইয়া আমাদিগকে কর্মশালায় প্রেরণ করিয়াছিলেন, সন্ধ্যাকালে তিনিই আমাদের মাতা হইয়া আমাদিগকে তাঁহার অন্তঃপুরে আকর্ষণ করিয়া লইতেছেন। প্রাতঃকালে তিনি আমাদিগকে ভার দিয়াছিলেন, সন্ধ্যাকালে তিনি আমাদের ভার লইতেছেন। প্রত্যহই দিনে রাত্রে এই-যে দুই বিভিন্ন অবস্থার মধ্যে আমাদের জীবন আন্দোলিত হইতেছে—একবার পিতা আমাদিগকে বহির্দেশে পাঠাইতেছেন, একবার মাতা আমাদিগকে অন্তঃপুরে টানিতেছেন; একবার নিজের দিকে ধাবিত হইতেছি, একবার অখিলের দিকে প্রত্যাবর্তন করিতেছি; ইহার মধ্যে আমাদের জীবন ও মৃত্যুর গভীর রহস্যচ্ছবি আলোক-অন্ধকারের তূলিকাপাতে প্রতিদিন বিচিত্র হইতেছে।

আমাদের কাব্যে-গানে আয়ু-অবসানের সহিত আমরা দিনান্তের উপমা দিয়া থাকি—কিন্তু সকল সময়ে তাহার সম্পূর্ণ ভাবটি আমরা হৃদয়ংগম করি না; আমরা কেবল অবসানেরই দিকটা দেখিয়া বিষাদের নিশ্বাস ফেলি, পরিপূরণের দিকটা দেখি না। আমরা ইহা ভাবিয়া দেখি না, প্রত্যহ দিবাবসানে এত বড়ো যে একটা বিপরীত ব্যাপার ঘটিতেছে, আমাদের শক্তির যে এমন-একটা বিপর্যয়দশা উপস্থিত হইতেছে, তাহাতে তো কিছুই বিশ্লিষ্ট হইয়া যাইতেছে না, জগৎ জুড়িয়া তো হাহাকারধ্বনি উঠিতেছে না, মহাকাশতলে বিশ্বের আরামেরই নিশ্বাস পড়িতেছে।

দিবস আমাদের জীবনেরই প্রতিকৃতি বটে। দিনের আলোক যেমন আর-সমস্ত লোককে আবৃত করিয়া আমাদের কর্মস্থান এই পৃথিবীকেই একমাত্র জাজ্বল্যমান করিয়া তুলে, আমাদের জীবনও আমাদের চতুর্দিকে তেমনি একটি বেষ্টন রচনা করে—সেইজন্যই আমাদের জীবনের অন্তর্গত যাহা-কিছু তাহাই আমাদের কাছে এত একান্ত, ইহার চেয়ে বড়ো যে আর-কিছু আছে তাহা সহসা আমাদের মনেই হয় না। দিনের বেলাতেও তো আকাশ ভরিয়া জ্যোতিষ্কলোক বিরাজ করিতেছে, কিন্তু দেখিতে পাই কই ? যে আলোক আমাদের কর্মস্থানের ভিতরে জ্বলিতেছে, সেই আলোকই বাহিরের অন্য-সমস্তকে দ্বিগুণতর অন্ধকারময় করিয়া রাখে। তেমনি আমাদের এই জীবনকে চতুর্দিকে বেষ্টন করিয়া শতসহস্র জ্যোতির্ময় বিচিত্র রহস্য নানা আকারে বিরাজ করিতেছে, কিন্তু আমরা দেখিতে পাই কই ? যে চেতনা, যে বুদ্ধি, যে ইন্দ্রিয়শক্তি আমাদের জীবনের পথকে উজ্জ্বল করে, আমাদের কর্মসাধনেরই পরিধিসীমার মধ্যে আমাদের মনোযোগকে প্রবল করিয়া তোলে, সেই জ্যোতিই আমাদের জীবনের বহিঃসীমার সমস্তই আমাদের নিকট অগোচর রাখিয়া দেয়।

জীবনে যখন আমরাই কর্তা, যখন সংসারই সর্বপ্রধান, যখন আমাদের সুখদুঃখচক্রের

পরিধি আমাদের আয়ুকালের মধ্যেই বিশেষভাবে পরিচ্ছিন্ন বলিয়া প্রতিভাত হইতে থাকে, এমন সময় দিন অবসান হইয়া যায়, জীবনের সূর্য অস্তাচলের অন্তরালে গিয়া পড়ে মৃত্যু আমাদিগকে অঞ্চলে আচ্ছন্ন করিয়া কোলে তুলিয়া লয়। তখন সেই-যে অন্ধকারের আবরণ, সে কি কেবলই অভাব, কেবলই শূন্যতা? আমাদের কাছে কি তাহার একটি সুগভীর ও সুবিপুল প্রকাশ নাই? আমাদের জীবনাকাশের অন্তরালে যে অসীমতা নিত্যকাল বিরাজ করিতেছে, মৃত্যুর তিমিরপটে তাহা কি দেখিতে দেখিতে আমাদের চতুর্দিকে আবিষ্কৃত হইয়া পড়ে না? তখন কি সহসা আমাদের এই সীমাবচ্ছিন্ন জীবনকে অসংখ্য জীবনলোকের সহিত যুক্ত করিয়া দেখিতে পাই না? দিবসের বিচ্ছিন্ন পৃথিবীকে সন্ধ্যাকাশে যখন সমস্ত গ্রহদলের সংগে নক্ষত্রমণ্ডলীর মধ্যে সংযুক্ত করিয়া জানিতে পারি, তখন সমস্তটির যেমন একটি বৃহৎ ছন্দ, একটি প্রকাণ্ড তাৎপর্য আমাদের চিত্তের মধ্য প্রসারিত হইয়া উঠে, তেমনি মৃত্যুর পরে বিশ্বের সহিত যোগযুক্ত আমাদের জীবনের বিপুল তাৎপর্য কি আমাদের কাছে অতি সহজেই প্রকাশিত হয় না? জীবিতকালে যাহাকে আমরা একক করিয়া, পৃথক করিয়া দেখি, মৃত্যুর পরে তাহাকেই আমরা বিরাটের মধ্যে সম্পূর্ণ করিয়া দেখিবার অবকাশ পাই। আমাদের জীবনের চেষ্টা, আমাদের জীবিকার সংগ্রাম যখন ক্ষান্ত হইয়া যায়, তখন সেই গভীর নিস্তব্ধতায় আমরা আপনাকে অসীমেরই মধ্যে প্রতিষ্ঠিত দেখিতে পাই—নিজের ব্যক্তিগত সীমার মধ্যে নহে, নিজের সংসারগত শক্তির মধ্যে নহে।

এইরূপে জীবন হইতে মৃত্যুতে পদার্পণ, দিন হইতে রাত্রিতে সংক্রমণেরই অনুরূপ। ইহা বাহির হইতে অন্তঃপুরে প্রবেশ, কর্মশালা হইতে মাতৃক্রোড়ে আত্মসমর্পণ, পরস্পরের সহিত পার্থক্য ও বিরোধ হইতে নিখিলের সহিত মিলনের মধ্যে আত্মানুভূতি।

শক্তি আপনাকে ঘোষণা করে, প্রেম আপনাকে আবৃত রাখে। শক্তির ক্ষেত্র আলোক, প্রেমের ক্ষেত্র অন্ধকার। প্রেম অন্তরালের মধ্য হইতেই পালন করে, লালন করে, অন্তরালের মধ্যেই আকর্ষণ করিয়া আনে। বিশ্বের সমস্ত ভাণ্ডার বিশ্বজননীর গোপন অন্তঃপুরের মধ্যে, তাই আমরা কিছুই জানি না কোথা হইতে এই নিঃশেষবিহীন প্রাণের ধারা লোকে লোকে প্রবাহিত হইতেছে, কোথা হইতে এই অনির্বাণ চেতনার আলোক জীবে জীবে জ্বলিয়া উঠিতেছে, কোথা হইতে এই নিত্যসঞ্জীবিত ধীশক্তি চিত্তে চিত্তে জাগ্রত হইতেছে। আমরা জানি না এই পুরাতন জগতের ক্লান্তি কোথায় দূর হয়, জীর্ণ জরার ললাটের শিথিল বলিরেখা কোথায় কোন্ অমৃতকরস্পর্শে মুছিয়া গিয়া আবার নবীনতার সৌকুমার্য লাভ করে; জানি না কণাপরিমাণ বীজের মধ্যে বিপুল বনস্পতির মহাশক্তি কোথায় কেমন করিয়া প্রচ্ছন্ন থাকে। জগতের এই-যে আবরণ, যে আবরণের মধ্যে জগতের সমস্ত উদ্যোগ অদৃশ্য হইয়া কাজ করে, সমস্ত চেষ্টা বিরামলাভ করিয়া যথাকালে নবীভূত হইয়া উঠে, ইহা প্রেমেরই আবরণ। সুপ্তির মধ্যে এই প্রেমই স্তম্ভিত, মৃত্যুর মধ্যে এই প্রেমই প্রগাঢ়, অন্ধকারের মধ্যে এই প্রেমই পুঞ্জীকৃত, আলোকের মধ্যে এই প্রেমই চঞ্চল শক্তির পশ্চাতে থাকিয়া অদৃশ্য—জীবনের মধ্যে এই প্রেমই আমাদের কর্তৃত্বের অন্তরালে থাকিয়া প্রতি মুহূর্তে বলপ্রেরণ, প্রতি মুহূর্তে ক্ষতিপূরণ করিতেছে।

হে মহাতিমিরাবগুণ্ঠিতা রমণীয়া রজনী, তুমি পক্ষিমাতার বিপুল পক্ষপুটের ন্যায়

শাবকদিগকে সুকোমল স্নেহাচ্ছাদনে আবৃত করিয়া অবতীর্ণ হইতেছ; তোমার মধ্যে বিশ্বধাত্রীর পরম স্পর্শ নিবিড়ভাবে নিগূঢ়ভাবে অনুভব করিতে চাহি। তোমার অন্ধকার আমাদের ক্লান্ত ইন্দ্রিয়কে আচ্ছন্ন রাখিয়া আমাদের হৃদয়কে উদ্‌ঘাটিত করিয়া দিক, আমাদের শক্তিকে অভিভূত করিয়া আমাদের প্রেমকে উদ্‌বোধিত করিয়া তুলুক, আমাদের নিজের কর্তৃত্বপ্রয়োগের অহংকার-সুখকে খর্ব করিয়া মাতার আলিঙ্গনপাশে নিঃশেষে আপনাকে বর্জন করিবার আনন্দকেই গরীয়ান করুক।

হে বিরামবিভাবরীর ঈশ্বরী মাতা, হে অন্ধকারের অধিদেবতা, হে সুপ্তির মধ্যে জাগ্রত, হে মৃত্যুর মধ্যে বিরাজমান, তোমার নক্ষত্রদীপিত অঙ্গনতলে তোমার চরণচ্ছায়ায় লুণ্ঠিত হইলাম। আমি এখন আর কোনো ভয় করিব না, কেবল আপন ভার তোমার দ্বারে বিসর্জন দিব; কোনো চিন্তা করিব না, কেবল চিত্তকে তোমার কাছে একান্ত সমর্পণ করিব; কোনো চেষ্টা করিব না, কেবল তোমার ইচ্ছায় আমার ইচ্ছাকে বিলীন করিব; কোনো বিচার করিব না, কেবল তোমার সেই আনন্দে আমার প্রেমকে নিমগ্ন করিয়া দিব, যে—

আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে
আনন্দেন জাতানি জীবন্তি
আনন্দং প্রয়ন্তি অভিসংবিশন্তি।

ঐ দেখিতেছি, তোমার মহান্ধকার রূপের মধ্যে বিশ্বভুবনের সমস্ত আলোকপুঞ্জ কেবল বিন্দু-বিন্দু-জ্যোতিরূপে একত্র সমবেত হইয়াছে। দিনের বেলায় পৃথিবীর ছোটো ছোটো চাঞ্চল্য, আমাদের নিজকৃত তুচ্ছ আন্দোলন আমাদের কাছে কত বিপুল-বৃহৎ রূপে দেখা দেয়। কিন্তু আকাশের ঐ-যে নক্ষত্রসকল, যাহাদের উদ্দাম বেগ আমরা মনে ধারণাই করিতে পারি না, যাহাদের উচ্ছ্বসিত আলোকতরঙ্গের আলোড়ন আমাদের কল্পনাকে পরাস্ত করিয়া দেয়, তোমার মধ্যে তাহাদের সেই প্রচণ্ড আন্দোলন তো কিছুই নহে; তোমার অন্ধকার বসনাঞ্চলতলে তোমার অবনত স্থির দৃষ্টির নিম্নে তাহারা স্তন্যপাননিরত সুপ্ত শিশুর মতো নিশ্চল নিস্তব্ধ। তোমার বিরাট ক্রোড়ে তাহাদের অস্থিরতাও স্থিরত্ব, তাহাদের দুঃসহ তীব্র তেজ মাধুর্যরূপে প্রকাশমান। ইহা দেখিয়া এ রাত্রে আমার তুচ্ছ চাঞ্চল্যের আস্ফালন, আমার ক্ষণিক তেজের অভিমান, আমার ক্ষুদ্র দুঃখের আক্ষেপ, কিছুই আর থাকে না; তোমার মধ্যে আমি সমস্তই স্থির করিলাম, সমস্ত আবৃত করিলাম, সমস্ত শান্ত করিলাম; তুমি আমাকে গ্রহণ করো, আমাকে রক্ষা করো—

যত্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যম্।

আমি এখন তোমার নিকট শক্তি প্রার্থনা করি না, আমাকে প্রেম দাও; আমি সংসারে জয়ী হইতে চাহি না, তোমার নিকট প্রণত হইতে চাই; আমি সুখদুঃখকে অবজ্ঞা করিতে চাহি না, সুখদুঃখকে তোমার মঙ্গলহস্তের দান বলিয়া বিনয়ে গ্রহণ করিতে চাই। মৃত্যু যখন আমার কর্মশালার দ্বারে দাঁড়াইয়া নীরব সংকেতে আহ্বান করিবে তখন যেন তাহার অনুসরণ করিয়া, জননী, তোমার অন্তঃপুরের শান্তিকক্ষে নিঃশঙ্ক হৃদয়ের মধ্যে আমি

ক্ষমা লইয়া যাই, প্রীতি লইয়া যাই, কল্যাণ লইয়া যাই—বিরোধের সমস্ত দাহ যেন সেদিন সন্ধ্যাস্নানে জুড়াইয়া যায়, সমস্ত বাসনার পঙ্ক যেন ধৌত হয়; সমস্ত কুটিলতাকে যেন সরল, সমস্ত বিকৃতিকে যেন সংস্কৃত করিয়া যাইতে পারি।...

ধর্ম, র।১২।৯-১৫

২২। মনুষ্যত্ব

বঙ্গদর্শন, ১৩১০ ফাল্গুন (১৯০৪)

'উত্তিষ্ঠত! জাগ্রত!' উত্থান করো, জাগ্রত হও—এই বাণী উদ্‌ঘোষিত হইয়া গেছে। আমরা কে শুনিয়াছি, কে শুনি নাই, জানি না—কিন্তু 'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত' এই বাক্য বারবার আমাদের দ্বারে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। সংসারের প্রত্যেক বাধা প্রত্যেক দুঃখ প্রত্যেক বিচ্ছেদ কতশতবার আমাদের অন্তরাত্মার তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে আঘাত দিয়া যে ঝংকার দিয়াছে তাহাতে কেবল এই বাণীই ঝংকৃত হইয়া উঠিয়াছে 'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত'—উত্থান করো, জাগ্রত হও। অশ্রুশিশিরধৌত আমাদের নবজাগরণের জন্য নিখিল অনিমেষনেত্রে প্রতীক্ষা করিয়া আছে—কবে সেই প্রভাত আসিবে, কবে সেই রাত্রির অন্ধকার অপগত হইয়া আমাদের অপূর্ব বিকাশকে নির্মল নবোদিত অরুণালোকে উদ্‌ঘাটিত করিয়া দিবে! কবে আমাদের বহুদিনের বেদনা সফল হইবে, আমাদের অশ্রুধারা সার্থক হইবে!

পুষ্পকে আজ প্রাতঃকালে বলিতে হয় নাই যে, 'রজনী প্রভাত হইল, তুমি আজ প্রস্ফুটিত হইয়া ওঠো!' বনে বনে আজ বিচিত্র পুষ্পগুলি অতি অনায়াসেই বিশ্বজগতের অন্তর্গূঢ় আনন্দকে বর্ণে গন্ধে শোভায় বিকশিত করিয়া মাধুর্যের দ্বারা নিখিলের সহিত কমনীয়ভাবে আপনার সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছে। পুষ্প আপনাকেও পীড়ন করে নাই, অন্য-কাহাকেও আঘাত করে নাই, কোনো অবস্থায় দ্বিধার লক্ষণ দেখায় নাই, সহজ সার্থকতায় আদ্যোপান্ত প্রফুল্ল হইয়া উঠিয়াছে।

ইহা দেখিয়া মনের মধ্যে এই আক্ষেপ জন্মে যে, আমার জীবন কেন বিশ্বব্যাপী আনন্দকিরণপাতে এমনি সহজে, এমনি সম্পূর্ণভাবে বিকশিত হইয়া উঠে না। সে তাহার সমস্ত দলগুলি সংকুচিত করিয়া আপনার মধ্যে এত প্রাণপণে কী আঁকড়িয়া রাখিতেছে? প্রভাতে তরুণ সূর্য আসিয়া অরুণ করে তাহার দ্বারে আঘাত করিতেছে; বলিতেছে, 'আমি যেমন করিয়া আমার চম্পককিরণরাজি সমস্ত আকাশময় মেলিয়া দিয়াছি, তুমি তেমন সহজে আনন্দে বিশ্বের মাঝখানে আপনাকে অবাধিত করিয়া দাও। রজনী নিঃশব্দ পদে আসিয়া স্নিগ্ধ হস্তে তাহাকে স্পর্শ করিয়া বলিতেছে, 'আমি যেমন করিয়া আমার অতলস্পর্শ অন্ধকারের মধ্য হইতে আমার সমস্ত জ্যোতিঃসম্পদ উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছি, তুমি তেমনি করিয়া একবার অন্তরের গভীর তলের দ্বার নিঃশব্দে উদ্‌ঘাটন করিয়া দাও—আত্মার প্রচ্ছন্ন রাজভান্ডার এক মুহূর্তে বিস্মিত বিশ্বের সম্মুখীন করো। নিখিল জগৎ প্রতিক্ষণেই তাহার বিচিত্র স্পর্শের দ্বারা আমাদিগকে এই কথাই বলিতেছে,

তাহা বীর্যের দ্বারাই লভ্য। প্রত্যহ পদে পদে বাধা অতিক্রম করিয়া যদি তাহাকে পাইতে না হইত তবে তাহাকে পাইয়াও পাইতাম না, যদি তাহা সুলভ হইত তবে আমাদের হৃদয় তাহাকে সর্বতোভাবে গ্রহণ করিত না। কিন্তু তাহা দুঃখের দ্বারা দুর্লভ, তাহা মৃত্যুশঙ্কার দ্বারা দুর্লভ, তাহা ভয়বিপদের দ্বারা দুর্লভ, তাহা নানাভিমুখী প্রবৃত্তির সংক্ষোভের দ্বারা দুর্লভ। এই দুর্লভ মনুষ্যত্বকে অর্জন করিবার চেষ্টায় আত্মা আপনার সমস্ত শক্তি অনুভব করিতে থাকে। সেই অনুভূতিতেই তাহার প্রকৃত আনন্দ। ইহাতেই তাহার যথার্থ আত্মপরিচয়। ইহাতেই সে জানিতে পায়, দুঃখের ঊর্ধ্বে তাহার মস্তক, মৃত্যুর ঊর্ধ্বে তাহার প্রতিষ্ঠা। এইরূপে সংসারের বিচিত্র অভিঘাতে, দুঃখবাধার সহিত নিরন্তর সংগ্রামে, যে আত্মার সমস্ত শক্তি জাগ্রত, সমস্ত তেজ উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে, সেই আত্মাই ব্রহ্মকে যথার্থভাবে লাভ করিবার উদ্যম প্রাপ্ত হয়—ক্ষুদ্র আরামের মধ্যে, ভোগবিলাসের মধ্যে যে আত্মা জড়ত্বে আবিষ্ট হইয়া আছে, ব্রহ্মের আনন্দ তাহার নহে। সেইজন্য উপনিষদ্ বলিয়াছেন: নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ। এই আত্মা (জীবাত্মাই বলো, পরমাত্মাই বলো), ইনি বলহীনের দ্বারা লভ্য নহেন। সমগ্র শক্তিকে সম্পূর্ণভাবে প্রয়োগ করিবার যত উপলক্ষ ঘটে ততই আত্মাকে প্রকৃতভাবে লাভ করিবার উপায় হয়।

এইজন্যই পুষ্পের পক্ষে পুষ্পত্ব যত সহজ, মানুষের পক্ষে মনুষত্ব তত সহজ নহে। মনুষ্যত্বের মধ্য দিয়া মানুষকে যাহা পাইতে হইবে তাহা নিদ্রিত অবস্থায় পাইবার নহে। এইজন্যই সংসারের সমস্ত কঠিন আঘাত আমাদিগকে এই কথা বলিতেছেন—

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত।
ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি।

উঠ, জাগো, যথার্থ গুরুকে প্রাপ্ত হইয়া বোধলাভ করো। সেই পথ শাণিত ক্ষুরধারের ন্যায় দুর্গম, কবিরা এইরূপ বলেন। অতএব প্রভাতে যখন বনে উপবনে পুষ্প পল্লবের মধ্যে তাহাদের ক্ষুদ্র সম্পূর্ণতা, তাহাদের সহজ শোভা পরিপূর্ণভাবে বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে, তখন মানুষ আপন দুর্গম পথ আপন দুঃসহ দুঃখ আপন বৃহৎ অসমাপ্তির গৌরবে মহত্তর বিচিত্রতর আনন্দের গীত কি গাহিবে না? যে প্রভাতে তরুলতার মধ্যে কেবল পুষ্পের বিকাশ এবং পল্লবের হিল্লোল, পাখির গান এবং ছায়ালোকের স্পন্দন, সেই শিশিরধৌত জ্যোতির্ময় প্রভাতে মানুষের সম্মুখে সংসার— তাহার সংগ্রামক্ষেত্র— সেই রমণীয় প্রভাতে মানুষকেই বদ্ধপরিকর হইয়া তাহার প্রতিদিনের দুরূহ জয়চেষ্টার পথে ধাবিত হইতে হইবে, ক্লেশকে বরণ করিয়া লইতে হইবে, সুখদুঃখের উত্তাল তরঙ্গের উপর দিয়া তাহাকে তরণী বাহিতে হইবে—কারণ মানুষ মহৎ, কারণ মনুষ্যত্ব সুকঠিন, এবং মানুষের যে পথ 'দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি'।

কিন্তু সংসারের মধ্যেই যদি সংসারের শেষ দেখি তবে দুঃখকষ্টের পরিমাণ অত্যন্ত উৎকট হইয়া উঠে, তাহার সামঞ্জস্য থাকে না। তবে এই বিষম ভার কে বহন করিবে? কেনই বা বহন করিবে? কিন্তু যেমন নদীর এক প্রান্তে পরমবিরাম সমুদ্র, অন্য দিকে সুদীর্ঘতটনিরুদ্ধ অবিরামযুধ্যমান জলধারা, তেমনি আমাদেরও যদি একই সময়ে এক দিকে ব্রহ্মের মধ্যে বিশ্রাম ও অন্য দিকে সংসারের মধ্যে অবিশ্রাম গতিবেগ না থাকে, তবে এই গতির কোনোই তাৎপর্য থাকে না, আমাদের প্রাণপণ চেষ্টা অদ্ভুত উন্মত্ততা হইয়া দাঁড়ায়। ব্রহ্মের মধ্যেই আমাদের সংসারের পরিণাম, আমাদের কর্মের গতি। শাস্ত্র

'আপনাকে বিকশিত করো, আপনাকে সমর্পণ করো, আপনার দিক হইতে একবার সকলের দিকে ফেরো; এই জল-স্থল-আকাশে, এই সুখদুঃখের বিচিত্র সংসারে অনির্বচনীয় ব্রহ্মের প্রতি আপনাকে একবার সম্পূর্ণ উন্মুখ করিয়া ধরো।'

কিন্তু বাধার অন্ত নাই—প্রভাতের ফুলের মতো করিয়া এমন সহজে এমন পরিপূর্ণভাবে আত্মোৎসর্গ করিতে পারি না। আপনাকে আপনার মধ্যেই আবৃত করিয়া রাখি, চারি দিকে নিখিলের আনন্দ-অভ্যুদয় ব্যর্থ হইতে থাকে।

কে বলিবে ব্যর্থ হইতে থাকে? প্রত্যেক মানুষের মধ্যে যে অনন্ত জীবন রহিয়াছে তাহার সফলতার পরিমাণ কে করিতে পারে? পুষ্পের মতো আমাদের ক্ষণকালীন সম্পূর্ণতা নহে। নদী যেমন তাহার বহুদীর্ঘ তটদ্বয়ের ধারাবাহিক বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়া কত কত পর্বত-প্রান্তর-মরু-কানন-নগর-গ্রামকে তরঙ্গাভিহত করিয়া আপন সুদীর্ঘ যাত্রার বিপুল সঞ্চয়কে প্রতি মুহূর্তে নিঃশেষে মহাসমুদ্রের নিকট উৎসর্গ করিতে থাকে, কোনো কালে তাহার অন্ত থাকে না—তাহার অবিশ্রাম প্রবাহধারারও অন্ত থাকে না, তাহার চরম বিরামেরও সীমা থাকে না—মনুষ্যত্বকে সেইরূপ বৈচিত্র্যের ভিতর দিয়া বিপুলভাবে মহৎ সার্থকতা লাভ করিতে হয়। তাহার সফলতা সহজ নহে। নদীর ন্যায় প্রতিপদে সে নিজের পথ নিজের বলে, নিজের বেগে রচনা করিয়া চলে। কোনো কূল গড়িয়া কোনো কূল ভাঙিয়া, কোথাও বিভক্ত হইয়া কোথাও সংযুক্ত হইয়া, নব নব বাধা-দ্বারা আবর্তবেগে ঘূর্ণিত হইয়া সে আপনাকে আপনি বৃহৎ করিয়া সৃষ্টি করিতে থাকে; অবশেষে যখন সে আপনার সীমাবিহীন পরিণামে আসিয়া উপস্থিত হয়, তখন সে বিচিত্রকে অতিক্রম করিয়া আসিয়াছে বলিয়াই মহান একের সহিত তাহার মিলন সম্পূর্ণ হয়। বাধা যদি না থাকিত তবে সে বৃহৎ হইতে পারিত না, বৃহৎ না হইলে বিরাটের মধ্যে তাহার বিকাশ পরিপূর্ণ হইত না।

দুঃখ আছে—সংসারে দুঃখের শেষ নাই। সেই দুঃখের আঘাতে, সেই দুঃখের বেগে সংসারে প্রকাণ্ড ভাঙন-গড়ন চলিতেছে—ইহাতে অহরহ যে তরঙ্গ উঠিতেছে তাহার কতই ধ্বনি, কতই বর্ণ, কতই গতিভঙ্গিমা। মানুষ যদি ক্ষুদ্র হইত এবং ক্ষুদ্রতাতেই মানুষের যদি শেষ হইত, তবে দুঃখের মতো অসংগত কিছুই হইতে পারিত না। এত দুঃখ ক্ষুদ্রের নহে। মহতেরই গৌরব—দুঃখ। বিশ্বসংসারের মধ্যে মনুষ্যত্বই সেই দুঃখের মহিমায় মহীয়ান্, অশ্রুজলেই তাহার রাজ্যাভিষেক হইয়াছে। পুষ্পের দুঃখ নাই, পশুপক্ষীর দুঃখসীমা সংকীর্ণ; মানুষের দুঃখ বিচিত্র, তাহা গভীর, অনেক সময়ে তাহা অনির্বচনীয়—এই সংসারের মধ্যে তাহার বেদনার সীমা যেন সম্পূর্ণ করিয়া পাওয়া যায় না।

এই দুঃখই মানুষকে বৃহৎ করে, মানুষকে আপন বৃহত্ত্ব সম্বন্ধে জাগ্রত সচেতন করিয়া তোলে, এবং এই বৃহত্ত্বেই মানুষকে আনন্দের অধিকারী করিয়া তোলে। কারণ: ভূমৈব সুখং, নাল্পে সুখমস্তি। অল্পে আমাদের আনন্দ নাই। যাহাতে আমাদের খর্বতা, আমাদের স্বল্পতা, তাহা অনেক সময়ে আমাদের আরামের হইতে পারে, কিন্তু তাহা আমাদের আনন্দের নহে। যাহা আমরা বীর্যের দ্বারা না পাই, অশ্রুর দ্বারা না পাই, যাহা অনায়াসের, তাহা আমরা সম্পূর্ণ পাই না; যাহাকে দুঃখের মধ্য দিয়া কঠিনভাবে লাভ করি হৃদয় তাহাকেই নিবিড়ভাবে, সমগ্রভাবে প্রাপ্ত হয়। মনুষ্যত্ব আমাদের পরম দুঃখের ধন,

বলিয়াছেন ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থ—যদ্‌যৎ কর্ম প্রকুর্বীত তদ্‌ব্রহ্মণি সমর্পয়েৎ—যে যে কর্ম করিবেন তাহা ব্রহ্মে সমর্পণ করিবেন। ইহাতে একই কালে কর্ম এবং বিরাম, চেষ্টা এবং শান্তি, দুঃখ এবং আনন্দ। ইহাতে এক দিকে আমাদের আত্মার কর্তৃত্ব থাকে ও অন্য দিকে যেখানে সেই কর্তৃত্বের নিঃশেষে বি লয় সেইখানে সেই কর্তৃত্বকে প্রতি ক্ষণে বিসর্জন দিয়া আমরা প্রেমের আনন্দ লাভ করি।

প্রেম তো কিছু না দিয়া বাঁচিতে পারে না। আমাদের কর্ম আমাদের কর্তৃত্ব যদি একেবারেই আমাদের না হইত, তবে ব্রহ্মের মধ্যে বিসর্জন দিতাম কী? তবে ভক্তি তাহার সার্থকতালাভ করিত কেমন করিয়া? সংসারেই আমাদের কর্ম, আমাদের কর্তৃত্ব, তাহাই আমাদের দিবার জিনিস। আমাদের প্রেমের চরম সার্থকতা হইবে—যখন আমাদের সমস্ত কর্ম, সমস্ত কর্তৃত্ব আনন্দে ব্রহ্মকে সমর্পণ করিতে পারিব। নতুবা কর্ম আমাদের পক্ষে নিরর্থক ভার ও কর্তৃত্ব বস্তুত সংসারের দাসত্ব হইয়া উঠিবে। পতিব্রতা স্ত্রীর পক্ষে তাহার পতিগৃহের কর্মই গৌরবের, তাহা আনন্দের; সে কর্ম তাহার বন্ধন নহে, পতিপ্রেমের মধ্যেই তাহা প্রতিক্ষণেই মুক্তিলাভ করিতেছে; এক পতিপ্রেমের মধ্যেই তাহার বিচিত্র কর্মের অখণ্ড ঐক্য, তাহার নানা দুঃখের এক আনন্দ-অবসান—ব্রহ্মের সংসারে আমরা যখন ব্রহ্মের কর্ম করিব, সকল কর্ম ব্রহ্মকে দিব, তখন সেই কর্ম এবং মুক্তি একই কথা হইয়া দাঁড়াইবে, তখন এক ব্রহ্মে আমাদের সমস্ত কর্মের বৈচিত্র্য বিলীন হইবে, সমস্ত দুঃখের ঝংকার একটি আনন্দসংগীতে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিবে।

প্রেম যাহা দান করে, সেই দান যতই কঠিন হয় ততই তাহার সার্থকতার আনন্দ নিবিড় হয়। সন্তানের প্রতি জননীর স্নেহ দুঃখের দ্বারাই সম্পূর্ণ। প্রীতিমাত্রই কষ্ট দ্বারা আপনাকে সমগ্রভাবে সপ্রমাণ করিয়া কৃতার্থ হয়। ব্রহ্মের প্রতি যখন আমাদের প্রীতি জাগ্রত হইবে তখন আমাদের সংসারধর্ম দুঃখক্লেশের দ্বারাই সার্থক হইবে, তাহা আমাদের প্রেমকেই প্রতিদিন উজ্জ্বল করিবে, অলংকৃত করিবে; ব্রহ্মের প্রতি আমাদের আত্মোৎসর্গকে দুঃখের মূল্যেই মূল্যবান করিয়া তুলিবে।

হে প্রাণের প্রাণ, চক্ষুর চক্ষু, শ্রোত্রের শ্রোত্র, মনের মন, আমার দৃষ্টি শ্রবণ চিন্তা, আমার সমস্ত কর্ম, তোমার অভিমুখেই অহরহ চলিতেছে, ইহা আমি জানি না বলিয়াই, ইহা আমার ইচ্ছাকৃত নহে বলিয়াই দুঃখ পাই। আমি সমস্তকেই অন্ধভাবে বলপূর্বক আমার বলিতে চাই—বল রক্ষা হয় না, আমার কিছুই থাকে না। নিখিলের দিক হইতে, তোমার দিক হইতে সমস্ত নিজের দিকে টানিয়া টানিয়া রাখিবার নিষ্ফল চেষ্টায় প্রতিদিন পীড়িত হইতে থাকি। আজ আমি আর কিছুই চাই না, আমি আজ পাইবার প্রার্থনা করিব না; আজ আমি দিতে চাই, দিবার শক্তি চাই। তোমার কাছে আমি আপনাকে পরিপূর্ণরূপে রিক্ত করিব, রিক্ত করিয়া পরিপূর্ণ করিব। তোমার সংসারে কর্মের দ্বারা তোমার যে সেবা করিব তাহা নিরন্তর হইয়া আমার প্রেমকে জাগ্রত নিষ্ঠাবান করিয়া রাখুক, তোমার অমৃতসমুদ্রের মধ্যে অতলস্পর্শ যে বিশ্রাম তাহাও আমাকে অবসানহীন শান্তি দান করুক। তুমি দিনে দিনে স্তরে স্তরে আমাকে শতদল পদ্মের ন্যায় বিশ্বজগতের মধ্যে বিকশিত করিয়া তোমারই পূজার অর্ঘ্যরূপে গ্রহণ করো।

ধর্ম, র/১২/১৫-১৯

টীকা ঃ

মনুষ্যত্ব—পশ্চিমবঙ্গের শতবার্ষিকী সংস্করণ রবীন্দ্ররচনাবলীতে—এই প্রবন্ধটির রচনাকাল ১৩১৮ দেওয়া আছে। এখানে আমরা মূল গ্রন্থের এবং বিশ্বভারতীর রবীন্দ্ররচনাবলীর অনুসরণে ১৩১০-কেই যথার্থ বলে গ্রহণ করেছি।

তুলনীয় প্রসঙ্গ ঃ দুঃখ (৩২)

২৩। ধর্মপ্রচার

[বঙ্গদর্শন, ১৩১০ ফাল্গুন (১৯০৪)]

'এসো আমরা ফললাভ করি' বলিয়া হঠাৎ উৎসাহে তখনই পথে বাহির হইয়া পড়াই যে ফললাভের উপায়, তাহা কেহই বলিবেন না। কারণ, কেবলমাত্র সদিচ্ছা এবং সদুৎসাহের বলে ফল সৃষ্টি করা যায় না। বীজ হইতে বৃক্ষ এবং বৃক্ষ হইতে ফল জন্মে। দলবদ্ধ উৎসাহের দ্বারাতেও সে নিয়মের অন্যথা ঘটিতে পারে না। বীজ ও বৃক্ষের সহিত সম্পর্ক না রাখিয়া আমরা যদি অন্য উপায়ে ফললাভের আকাঙ্ক্ষা করি তবে সেই ঘরগড়া কৃত্রিম ফল খেলার পক্ষে, গৃহসজ্জার পক্ষে অতি উত্তম হইতে পারে—কিন্তু তাহা আমাদের যথার্থ ক্ষুধানিবৃত্তির পক্ষে অত্যন্ত অনুপযোগী হয়।

আমাদের দেশে আধুনিক ধর্মসমাজে আমরা এই কথাটা ভাবি না। আমরা মনে করি, দল বাঁধিলেই বুঝি ফল পাওয়া যায়। শেষকালে মনে করি দলবাঁধাটাই ফল।

ক্ষণে ক্ষণে আমাদের উৎসাহ হয়—প্রচার করিতে হইবে। হঠাৎ অনুতাপ হয়—কিছু করিতেছি না। যেন করাটাই সব চেয়ে প্রধান—কী করিব, কে করিবে, সেটা বড়ো-একটা ভাবিবার কথা নয়।

কিন্তু এ কথাটা সর্বদাই স্মরণ রাখা দরকার যে, ধর্মপ্রচারকার্যে ধর্মটা আগে, প্রচারটা তাহার পরে। প্রচার করিলেই তবে ধর্মরক্ষা হইবে তাহা নহে, ধর্মকে রক্ষা করিলেই প্রচার আপনি হইবে।

মনুষ্যত্বের সমস্ত মহাসত্যগুলিই পুরাতন এবং 'ঈশ্বর আছেন' এ কথা পুরাণতম। এই পুরাতনকে মানুষের কাছে চিরদিন নূতন করিয়া রাখাই মহাপুরুষের কাজ। জগতের চিরন্তন ধর্মগুরুগণ কোনো নূতন সত্য আবিষ্কার করিয়াছেন তাহা নহে, তাঁহারা পুরাতনকে তাঁহাদের জীবনের মধ্যে নূতন করিয়া পাইয়াছেন এবং সংসারের মধ্যে তাহাকে নূতন করিয়া তুলিয়াছেন।

নব নব বসন্ত নব নব পুষ্প সৃষ্টি করে না—সেরূপ নূতনত্বে আমাদের প্রয়োজন নাই। আমরা আমাদের চিরকালের পুরাতন ফুলগুলিকেই বর্ষে বর্ষে বসন্তে বসন্তে নূতন করিয়া দেখিতে চাই। সংসারের যাহা-কিছু মহত্তম, যাহা মহার্ঘতম, তাহা পুরাতন, তাহা সরল, তাহার মধ্যে গোপন কিছুই নাই; যাঁহাদের অভ্যুদয় বসন্তের ন্যায় অনির্বচনীয় জীবন ও যৌবনের দক্ষিণসমীরণ মহাসমুদ্রবক্ষ হইতে সঙ্গে করিয়া আনে, তাঁহারা সহসা

এই পুরাতনকে অপূর্ব করিয়া তোলেন, অতিপরিচিতকে নিজ জীবনের নব নব বর্ণে গন্ধে রূপে সজীব সরস প্রস্ফুটিত করিয়া মধুপিপাসুগণকে দিগ্‌দিগন্ত হইতে আকর্ষণ করিয়া আনেন।

আমরা ধর্মনীতির সর্বজনবিদিত সহজ সত্যগুলি এবং ঈশ্বরের শক্তি ও করুণা প্রত্যহ পুনরাবৃত্তি করিয়া সত্যকে কিছুমাত্র অগ্রসর করি না, বরঞ্চ অভ্যস্ত বাক্যের তাড়নায় বোধশক্তিকে আড়ষ্ট করিয়া ফেলি। যে-সকল কথা অত্যন্ত জানা তাহাদিগকে একটা নিয়ম বাঁধিয়া বারংবার শুনাইতে গেলে, হয় আমাদের মনোযোগ একেবারে নিশ্চেষ্ট হইয়া পড়ে, নয় আমাদের হৃদয় বিদ্রোহী হইয়া উঠে।

বিপদ কেবল এই একমাত্র নহে। অনুভূতিরও একটা অভ্যাস আছে। আমরা বিশেষস্থানে বিশেষ ভাষাবিন্যাসে একপ্রকার ভাবাবেগ মাদকতার ন্যায় অভ্যাস করিয়া ফেলিতে পারি। সেই অভ্যস্ত আবেগকে আমরা আধ্যাত্মিক সফলতা বলিয়া ভ্রম করি, কিন্তু তাহা একপ্রকার সম্মোহনমাত্র।

এইরূপে ধর্মও যখন সম্প্রদায়বিশেষে বদ্ধ হইয়া পড়ে তখন তাহা সম্প্রদায়স্থ অধিকাংশ লোকের কাছে, হয় অভ্যস্ত অসাড়তায় নয় অভ্যস্ত সম্মোহনে পরিণত হইয়া থাকে। তাহার প্রধান কারণ, চিরপুরাতন ধর্মকে নূতন করিয়া বিশেষভাবে আপনার করিবার এবং সেই সূত্রে তাহাকে পুনর্বার বিশেষভাবে সমস্ত মানবের উপযোগী করিবার ক্ষমতা যাহাদের নাই, ধর্মরক্ষা ও ধর্মপ্রচারের ভার তাহারাই গ্রহণ করে। তাহারা মনে করে—আমরা নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকিলে সমাজের ক্ষতি হইবে।

ধর্মকে যাহারা সম্পূর্ণ উপলব্ধি না করিয়া প্রচার করিতে চেষ্টা করে, তাহারা ক্রমশই ধর্মকে জীবন হইতে দূরে ঠেলিয়া দিতে থাকে। ইহারা ধর্মকে বিশেষ গণ্ডি আঁকিয়া একটা বিশেষ সীমানার মধ্যে বদ্ধ করে। ধর্ম বিশেষ দিনের, বিশেষ স্থানের, বিশেষ প্রণালীর ধর্ম হইয়া উঠে। তাহার কোথাও কিছু ব্যত্যয় হইলেই সম্প্রদায়ের মধ্যে হুলুস্থূল পড়িয়া যায়। বিষয়ী নিজের জমির সীমানা এত সতর্কতার সহিত বাঁচাইতে চেষ্টা করে না, ধর্মব্যবসায়ী যেমন প্রচণ্ড উৎসাহের সহিত ধর্মের স্বরচিত গণ্ডিরক্ষা করিবার জন্য সংগ্রাম করিতে থাকে। এই গণ্ডিরক্ষাকেই তাহারা ধর্মরক্ষা বলিয়া জ্ঞান করে। বিজ্ঞানের কোনো নূতন মূলতত্ত্ব আবিষ্কৃত হইলে তাহারা প্রথমে ইহাই দেখে যে, সে তত্ত্ব তাহাদের গণ্ডির সীমানায় হস্তক্ষেপ করিতেছে কি না; যদি করে তবে 'ধর্ম গেল' বলিয়া তাহারা ভীত হইয়া উঠে। ধর্মের বৃন্তটিকে তাহারা এতই ক্ষীণ করিয়া রাখে যে, প্রত্যেক বায়ুহিল্লোলকে তাহারা শত্রুপক্ষ বলিয়া জ্ঞান করে। ধর্মকে তাহারা সংসার হইতে বহু দূরে স্থাপিত করে—পাছে ধর্ম-সীমানার মধ্যে মানুষ আপন হাস্য, আপন ক্রন্দন, আপন প্রাত্যহিক ব্যাপারকে, আপন জীবনের অধিকাংশকে লইয়া উপস্থিত হয়। সপ্তাহের এক দিনের এক অংশকে, গৃহের এক কোণকে বা নগরের একটি মন্দিরকে ধর্মের জন্য উৎসর্গ করা হয়—বাকি সমস্ত দেশ-কালের সহিত ইহার একটি পার্থক্য, এমন-কি, ইহার একটি বিরোধ ক্রমশ সুপরিস্ফুট হইয়া উঠে। দেহের সহিত আত্মার, সংসারের সহিত ব্রহ্মের, এক সম্প্রদায়ের সহিত অন্য সম্প্রদায়ের বৈষম্য ও বিদ্রোহভাব স্থাপন করাই, মনুষ্যত্বের মাঝখানে গৃহবিচ্ছেদ উপস্থিত করাই যেন ধর্মের বিশেষ লক্ষ্য হইয়া দাঁড়ায়।

অথচ সংসারে একমাত্র যাহা সমস্ত বৈষম্যের মধ্যে ঐক্য, সমস্ত বিরোধের মধ্যে

শান্তি আনয়ন করে, সমস্ত বিচ্ছেদের মধ্যে একমাত্র যাহা মিলনের সেতু, তাহাকেই ধর্ম বলা যায়। তাহা মনুষ্যত্বের এক অংশে অবস্থিত হইয়া অপর অংশের সহিত অহরহ কলহ করে না—সমস্ত মনুষ্যত্ব তাহার অন্তর্ভূত—তাহাই যথার্থভাবে মনুষ্যত্বের ছোটো-বড়ো অন্তর-বাহির সর্বাংশে পূর্ণ সামঞ্জস্য। সেই সুবৃহৎ সামঞ্জস্য হইতে বিচ্ছিন্ন হইলে মনুষ্যত্ব সত্য হইতে স্খলিত হয়, সৌন্দর্য হইতে ভ্রষ্ট হইয়া পড়ে। সেই অমোঘ ধর্মের আদর্শকে যদি গির্জার গণ্ডির মধ্যে নির্বাসিত করিয়া দিয়া অন্য যে-কোনো উপস্থিত প্রয়োজনের আদর্শ-দ্বারা সংসারের ব্যবহার চালাইতে যাই, তাহাতে সর্বনাশী অমঙ্গলের সৃষ্টি হইতে থাকে।

কিন্তু ভারতবর্ষের এ আদর্শ সনাতন নহে। আমাদের ধর্ম রিলিজন নহে, তাহা মনুষ্যত্বের একাংশ নহে—তাহা পলিটিক্স্ হইতে তিরস্কৃত, যুদ্ধ হইতে বহিষ্কৃত, ব্যবসায় হইতে নির্বাসিত, প্রাত্যহিক ব্যবহার হইতে দূরবর্তী নহে। সমাজের কোনো বিশেষ অংশে তাহাকে প্রাচীরবদ্ধ করিয়া মানুষের আরাম-আমোদ হইতে, কাব্য-কলা হইতে, জ্ঞানবিজ্ঞান হইতে তাহার সীমানা-রক্ষার জন্য সর্বদা পাহারা দাঁড়াইয়া নাই। ব্রহ্মচর্য গার্হস্থ্য বানপ্রস্থ প্রভৃতি আশ্রমগুলি এই ধর্মকেই জীবনের মধ্যে, সংসারের মধ্যে সর্বতোভাবে সার্থক করিবার সোপান। ধর্ম সংসারের আংশিক প্রয়োজনসাধনের জন্য নহে, সমগ্র সংসারই ধর্ম-সাধনের জন্য। এইরূপে ধর্ম গৃহের মধ্যে গৃহধর্ম, রাজত্বের মধ্যে রাজধর্ম হইয়া ভারতবর্ষের সমগ্র সমাজকে একটি অখন্ড তাৎপর্য দান করিয়াছিল। সেইজন্য ভারতবর্ষে যাহা অধর্ম তাহাই অনুপযোগী ছিল; ধর্মের দ্বারাই সফলতা বিচার করা হইত, অন্য সফলতা-দ্বারা ধর্মের বিচার চলিত না।

এইজন্য ভারতবর্ষীয় আর্যসমাজে শিক্ষার কালকে ব্রহ্মচর্য নাম দেওয়া হইয়াছিল। ভারতবর্ষ জানিত ব্রহ্মলাভের দ্বারা মনুষ্যত্বলাভই শিক্ষা। সেই শিক্ষা ব্যতীত গৃহস্থতনয় গৃহী, রাজপুত্র রাজা হইতে পারে না। কারণ গৃহকর্মের মধ্য দিয়াই ব্রহ্মলাভ, রাজকর্মের মধ্য দিয়াই ব্রহ্মপ্রাপ্তি ভারতবর্ষের লক্ষ্য। সকল কর্ম সকল আশ্রমের সাহায্যেই ব্রহ্ম-উপলব্ধি যখন ভারতবর্ষের চরম সাধনা, তখন ব্রহ্মচর্যই তাহার শিক্ষা না হইয়া থাকিতে পারে না।

যে যাহা যথার্থভাবে চায় সে তাহার উপায় সেইরূপ যথার্থভাবে অবলম্বন করে। য়ুরোপ যাহা কামনা করে, বাল্যকাল হইতে তাহার পথ সে প্রস্তুত করে; তাহার সমাজে, তাহার প্রাত্যহিক জীবনে সেই লক্ষ্য জ্ঞাতসারে, এবং অজ্ঞাতসারে সে ধরিয়া রাখে। এই কারণেই য়ুরোপ দেশ জয় করে, ঐশ্বর্য লাভ করে, প্রাকৃতিক শক্তিকে নিজের সেবাকার্যে নিযুক্ত করিয়া আপনাকে পরম চরিতার্থ জ্ঞান করে। তাহার উদ্দেশ্য ও উপায়ের মধ্যে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য আছে বলিয়াই সে সিদ্ধকাম হইয়াছে। এইজন্য য়ুরোপীয়েরা বলিয়া থাকে—তাহাদের পাবলিক-স্কুলে, তাহাদের ক্রিকেটক্ষেত্রে, তাহারা রণজয়ের চর্চা করিয়া লক্ষ-সিদ্ধির জন্য প্রস্তুত হইতে থাকে।

এক কালে আমরা সেইরূপ যথার্থভাবেই ব্রহ্মলাভকে যখন চরম লাভ বলিয়া জ্ঞান করিয়াছিলাম তখন সমাজের সর্বত্রই তাহার যথার্থ উপায় অবলম্বিত হইয়াছিল। তখন য়ুরোপীয় রিলিজন-চর্চার আদর্শকে আমাদের দেশ কখনোই ধর্মলাভের আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিত না। সুতরাং ধর্মপালন তখন সংকুচিত হইয়া বিশেষভাবে রবিবার

বা আর-কোনো বারের সামগ্রী হইয়া উঠে নাই। ব্রহ্মচর্য তাহার শিক্ষা ছিল, গৃহাশ্রম তাহার সাধনা ছিল, সমস্ত সমাজ তাহার অনুকূল ছিল এবং যে ঋষিরা লব্ধকাম হইয়া বলিয়া উঠিয়াছিলেন—

বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তমাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ

যাঁহারা বলিয়াছিলেন—

আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন

তাঁহারাই তাহার গুরু ছিলেন।

ধর্মকে যে আমরা শৌখিনের ধর্ম করিয়া তুলিব—আমরা যে মনে করিব অজস্র ভোগবিলাসের এক পার্শ্বে ধর্মকেও একটুখানি স্থান দেওয়া আবশ্যক, নতুবা ভব্যতারক্ষা হয় না, নতুবা ঘরের ছেলেমেয়েদের জীবনে যেটুকু ধর্মের সংস্রব রাখা শোভন, তাহা রাখিবার উপায় থাকে না—আমরা যে মনে করিব আমাদের আদর্শভূত পাশ্চাত্যসমাজে ভদ্রপরিবারেরা ধর্মকে যেটুকু পরিমাণে স্বীকার করা ভদ্রতারক্ষার অঙ্গ বলিয়া গণ্য করেন, আমরাও সর্ববিষয়ে তাঁহাদের অনুবর্তন করিয়া অগত্যা সেইটুকু পরিমাণ ধর্মের ব্যবস্থা না রাখিলে লজ্জার কারণ হইবে—তবে আমাদের সেই ভদ্রতাবিলাসের আসবাবের সঙ্গে ভারতের সুমহৎ ব্রহ্মনামকে জড়িত করিয়া রাখিলে আমাদের পিতামহদের পবিত্রতম সাধনাকে চটুলতম পরিহাসে পরিণত করা হইবে।

যাঁহারা ব্রহ্মকে সর্বত্র উপলব্ধি করিয়াছিলেন সেই ঋষিরা কী বলিয়াছিলেন? তাঁহারা বলেন—

ঈশাবাস্যমিদং সর্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনম্।

বিশ্বজগতে যাহা-কিছু চলিতেছে সমস্তকেই ঈশ্বরের দ্বারা আবৃত দেখিতে হইবে—এবং তিনি যাহা দান করিয়াছেন তাহাই ভোগ করিতে হইবে, অন্যের ধনে লোভ করিবে না।

ইহার অর্থ এমন নহে যে, 'ঈশ্বর সর্বব্যাপী' এই কথাটা স্বীকার করিয়া লইয়া তাহার পরে সংসারে যেমন ইচ্ছা তেমনি করিয়া চলা। যথার্থভাবে ঈশ্বরের দ্বারা সমস্তকে আচ্ছন্ন করিয়া দেখিবার অর্থ অত্যন্ত বৃহৎ—সেরূপ করিয়া না দেখিলে সংসারকে সত্য করিয়া দেখা হয় না এবং জীবনকে অন্ধ করিয়া রাখা হয়।

ঈশা বাস্যমিদং সর্বম্—ইহা কাজের কথা; ইহা কাল্পনিক কিছু নহে, ইহা কেবল শুনিয়া জানার এবং উচ্চারণদ্বারা মানিয়া লইবার মন্ত্র নহে। গুরুর নিকট এই মন্ত্র গ্রহণ করিয়া লইয়া তাহার পরে দিনে দিনে পদে পদে ইহাকে জীবনের মধ্যে সফল করিতে হইবে। সংসারকে ক্রমে ক্রমে ঈশ্বরের মধ্যে ব্যাপ্ত করিয়া দেখিতে হইবে। পিতাকে সেই পিতার মধ্যে, মাতাকে সেই মাতার মধ্যে, বন্ধুকে সেই বন্ধুর মধ্যে, প্রতিবেশী স্বদেশী ও মনুষ্যসমাজকে সেই সর্বভূতান্তরাত্মার মধ্যে উপলব্ধি করিতে হইবে।

ঋষিরা যে ব্রহ্মকে কতখানি সত্য বলিয়া দেখিয়াছিলেন তাহা তাঁহাদের একটি কথাতেই বুঝিতে পারি। তাঁহারা বলিয়াছেন—

তেষামেবৈষ ব্রহ্মলোকো

যেষাং তপো ব্রহ্মচর্যং
যেষু সত্যং প্রতিষ্ঠিতম্।

এই-যে ব্রহ্মলোক, অর্থাৎ যে ব্রহ্মলোক সর্বত্রই রহিয়াছে, ইহা তাঁহাদেরই, তপস্যা যাঁহাদের, ব্রহ্মচর্য যাঁহাদের, সত্য যাঁহাদের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত। অর্থাৎ যাঁহারা যথার্থভাবে ইচ্ছা করেন, যথার্থভাবে চেষ্টা করেন, যথার্থ উপায় অবলম্বন করেন। তপস্যা একটা-কোনো কৌশল-বিশেষ নহে, তাহা কোনো গোপন রহস্য নহে—

ঋতং তপঃ সত্যং তপঃ শ্রুতং তপঃ শান্তং তপো দানং
তপো যজ্ঞস্তপো ভূরভুবঃসুবর্ব্রহ্মৈতদুপাস্যৈতৎ তপঃ।

ঋতই তপস্যা, সত্যই তপস্যা, শ্রুত তপস্যা, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ তপস্যা, দান তপস্যা, কর্ম তপস্যা এবং ভূর্লোকি-ভুবর্লোকি-স্বর্লোকিব্যাপী এই-যে ব্রহ্ম ইঁহার উপাসনাই তপস্যা। অর্থাৎ ব্রহ্মচর্যের দ্বারা বল তেজ শান্তি সন্তোষ নিষ্ঠা ও পবিত্রতা লাভ করিয়া, দান ও কর্ম-দ্বারা স্বার্থপাশ হইতে মুক্তিলাভ করিয়া, তবে অন্তরে-বাহিরে আত্মায়-পরে লোক-লোকান্তরে ব্রহ্মকে লাভ করা যায়।

উপনিষদ্ বলেন—যিনি ব্রহ্মকে জানিয়াছেন তিনি সর্বমেবাবিবেশ, সকলের মধ্যে প্রবেশ করেন। বিশ্ব হইতে আমরা যে পরিমাণে বিমুখ হই, ব্রহ্ম হইতেই আমরা সেই পরিমাণে বিমুখ হইতে থাকি। আমরা ধৈর্যলাভ করিলাম কি না, অভয়লাভ করিলাম কি না, ক্ষমা আমাদের পক্ষে সহজ হইল কি না, আত্মবিস্মৃত মঙ্গলভাব আমাদের পক্ষে স্বাভাবিক হইল কি না, পরনিন্দা আমাদের পক্ষে অপ্রিয় ও পরের প্রতি ঈর্ষার উদ্রেক আমাদের পক্ষে পরম লজ্জার বিষয় হইল কি না, বৈষয়িকতার বন্ধন ঐশ্বর্য-আড়ম্বরের প্রলোভন-পাশ ক্রমশ শিথিল হইতেছে কি না, এবং সর্বাপেক্ষা যাহাকে বশ করা দুরূহ সেই উদ্যত আত্মাভিমান বংশীরববিমুগ্ধ ভুজঙ্গমের ন্যায় ক্রমে ক্রমে আপন মস্তক নত করিতেছে কি না, ইহাই অনুধাবন করিলে আমরা যথার্থভাবে দেখিব ব্রহ্মের মধ্যে আমরা কতদূর পর্যন্ত অগ্রসর হইতে পারিয়াছি—ব্রহ্মের দ্বারা নিখিলজগৎকে কত দূর পর্যন্ত সত্যরূপে আবৃত দেখিয়াছি।

আমরা বিশ্বের অন্য সর্বত্র ব্রহ্মের আবির্ভাব কেবলমাত্র সাধারণভাবেজ্ঞানে জানিতে পারি। জল-স্থল-আকাশ-গ্রহ-নক্ষত্রের সহিত আমাদের হৃদয়ের আদানপ্রদান চলে না, তাহাদের সহিত আমাদের মঙ্গলকর্মের সম্বন্ধ নাই। আমরা জ্ঞানে প্রেমে কর্মে অর্থাৎ সম্পূর্ণভাবে কেবল মানুষকেই পাইতে পারি। এইজন্য মানুষের মধ্যেই পূর্ণতরভাবে ব্রহ্মের উপলব্ধি মানুষের পক্ষে সম্ভবপর। নিখিল মানবাত্মার মধ্যে আমরা সেই পরমাত্মাকে নিকটতম অন্তরতম রূপে জানিয়া তাঁহাকে বারবার নমস্কার করি। সর্বভূতান্তরাত্মা ব্রহ্ম এই মনুষ্যত্বের ক্রোড়েই আমাদিগকে মাতার ন্যায় ধারণ করিয়াছেন, এই বিশ্বমানবের স্তন্যরসপ্রবাহে ব্রহ্ম আমাদিগকে চিরকালসঞ্চিত প্রাণ বুদ্ধি প্রীতি ও উদ্যমে নিরন্তর পরিপূর্ণ করিয়া রাখিতেছেন, এই বিশ্বমানবের কণ্ঠ হইতে ব্রহ্ম আমাদের মুখে পরমাশ্চর্য ভাষার সঞ্চার করিয়া দিতেছেন, এই বিশ্বমানবের অন্তঃপুরে আমরা চিরকালরচিত কাব্যকাহিনী শুনিতেছি, এই বিশ্বমানবের রাজভাণ্ডারে আমাদের জন্য জ্ঞান ও ধর্ম প্রতিদিন পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিতেছে। এই মানবাত্মার মধ্যে সেই বিশ্বাত্মাকে প্রত্যক্ষ করিলে আমাদের পরিতৃপ্তি ঘনিষ্ঠ হয়—কারণ, মানবসমাজের উত্তরোত্তর-

বিকাশমান অপরূপ রহস্যময় ইতিহাসের মধ্যে ব্রহ্মের আবির্ভাবকে কেবল জানামাত্র আমাদের পক্ষে যথেষ্ট আনন্দ নহে, মানবের বিচিত্র প্রীতিসম্বন্ধের মধ্যে ব্রহ্মের প্রীতিরস নিশ্চয়ভাবে অনুভব করিতে পারা আমাদের অনুভূতির চরম সার্থকতা এবং প্রীতিবৃত্তির স্বাভাবিক পরিণাম যে কর্ম সেই কর্মদ্বারা মানবের সেবারূপে ব্রহ্মের সেবা করিয়া আমাদের কর্মপরতার পরম সাফল্য। আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি, হৃদয়বৃত্তি, কর্মবৃত্তি, আমাদের সমস্ত শক্তি সমগ্রভাবে প্রয়োগ করিলে তবে আমাদের অধিকার আমাদের পক্ষে যথাসম্ভব সম্পূর্ণ হয়। এইজন্য ব্রহ্মের অধিকারকে বুদ্ধি প্রীতি ও কর্ম-দ্বারা আমাদের পক্ষে সম্পূর্ণ করিবার ক্ষেত্র মনুষ্যত্ব ছাড়া আর-কোথাও নাই। মাতা যেমন একমাত্র মাতৃসম্বন্ধেই শিশুর পক্ষে সর্বাপেক্ষা নিকট, সর্বাপেক্ষা প্রত্যক্ষ, সংসারের সহিত তাঁহার অন্যান্য বিচিত্র সম্বন্ধ শিশুর নিকট অগোচর এবং অব্যবহার্য, তেমনি ব্রহ্ম মানুষের নিকট একমাত্র মনুষ্যত্বের মধ্যেই সর্বাপেক্ষা সত্যরূপে প্রত্যক্ষরূপে বিরাজমান—এই সম্বন্ধের মধ্য দিয়াই আমরা তাঁহাকে জানি, তাঁহাকে প্রীতি করি, তাঁহার কর্ম করি। এইজন্য মানবসংসারের মধ্যেই প্রতিদিনের ছোটো বড়ো সমস্ত কর্মের মধ্যেই ব্রহ্মের উপাসনা মানুষের পক্ষে একমাত্র সত্য উপাসনা। অন্য উপাসনা আংশিক—কেবল জ্ঞানের উপাসনা, কেবল ভাবের উপাসনা—সেই উপাসনা-দ্বারা আমরা ক্ষণে ক্ষণে ব্রহ্মকে স্পর্শ করিতে পারি, কিন্তু ব্রহ্মকে লাভ করিতে পারি না।

এ কথা সকলেই জানেন, অনেক সময় মানুষ যাহাকে উপায়রূপে আশ্রয় করে তাহাকেই উদ্দেশ্যরূপে বরণ করিয়া লয়, যাহাকে রাজ্যলাভের সহায়মাত্র বলিয়া ডাকিয়া লয় সে-ই রাজসিংহাসন অধিকার করিয়া বসে। আমাদের ধর্মসমাজরচনাতেও সে বিপদ আছে। আমরা ধর্মলাভের জন্য ধর্মসমাজ স্থাপন করি, শেষকালে ধর্মসমাজই ধর্মের স্থান অধিকার করে। আমাদের নিজের চেষ্টা-রচিত সামগ্রী আমাদের সমস্ত মমতা ক্রমে এমন করিয়া নিঃশেষে আকর্ষণ করিয়া লয় যে, ধর্ম, যাহা আমাদের স্বরচিত নহে, তাহা ইহার পশ্চাতে পড়িয়া যায়। তখন, আমাদের সমাজের বাহিরে যে আর কোথাও ধর্মের স্থান থাকিতে পারে সে কথা স্বীকার করিতে কষ্টবোধ হয়। ইহা হইতে ধর্মের বৈষয়িকতা আসিয়া পড়ে। দেশলুব্ধগণ যে ভাবে দেশ জয় করিতে বাহির হয়, আমরা সেই ভাবেই ধর্মসমাজের ধ্বজা লইয়া বাহির হই। অন্যান্য দলের সহিত তুলনা করিয়া আমাদের দলের লোকবল, অর্থবল, আমাদের দলের মন্দিরসংখ্যা গণনা করিতে থাকি। মঙ্গলকর্মে মঙ্গলসাধনের আনন্দ অপেক্ষা মঙ্গলসাধনের প্রতিদ্বন্দ্বিতা বড়ো হইয়া উঠে। দলাদলির আগুন কিছুতেই নেবে না, কেবলই বাড়িয়া চলিতে থাকে। আমাদের এখনকার প্রধান কর্তব্য এই যে, ধর্মকে যেন আমরা ধর্মসমাজের হস্তে পীড়িত হইতে না দিই। ব্রহ্ম ধন্য—তিনি সর্বদেশে সর্বকালে, সর্বজীবে ধন্য—তিনি কোনো দলের নহেন, কোনো সমাজের নহেন, কোনো বিশেষ ধর্মপ্রণালীর নহেন, তাঁহাকে লইয়া ধর্মের বিষয়কর্ম ফাঁদিয়া বসা চলে না। ব্রহ্মচারী শিষ্য জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, স ভগবঃ কস্মিন্ প্রতিষ্ঠিত ইতি। হে ভগবন্, তিনি কোথায় প্রতিষ্ঠিত আছেন? ব্রহ্মবাদী গুরু উত্তর করিলেন, স্বে মহিম্নি। আপন মহিমাতে। তাঁহারই সেই মহিমার মধ্যে তাঁহার প্রতিষ্ঠা অনুভব করিতে হইবে, আমাদের রচনার মধ্যে নহে।

ধর্ম, র/১২/৪০-৪৫

২৪। প্রার্থনা

বঙ্গদর্শন, ১৩১১ আষাঢ়(১৯০৪)

সকলেই জানেন একটা গল্প আছে—দেবতা একজনকে তিনটে বর দিতে চাহিয়াছিলেন। এত বড়ো সুযোগটাতে হতভাগ্য কী যে চাহিবে ভাবিয়া বিহবল হইল; শেষকালে উদ্‌ভ্রান্তচিত্তে যে-তিনটে প্রার্থনা জানাইল তাহা এমনি অকিঞ্চিৎকর যে, তাহার পরে চিরজীবন অনুতাপ করিয়া তাহার দিন কাটিল।

এই গল্পের তাৎপর্য এই যে, আমরা মনে করি, পৃথিবীতে আর কিছু জানি বা না-জানি, ইচ্ছাটাই বুঝি আমাদের কাছে সব চেয়ে জাজ্বল্যমান, আমি সব চেয়ে কী চাই তাহাই বুঝি সব চেয়ে আমার কাছে সুস্পষ্ট—কিন্তু সেটা ভ্রম। আমার যথার্থ ইচ্ছা আমার অগোচর।

অগোচরে থাকিবার কারণ আছে—সেই ইচ্ছাই আমাকে নানা অনুকূল ও প্রতিকূল অবস্থার ভিতর দিয়া গড়িয়া তুলিবার ভার লইয়াছে। যে বিরাট ইচ্ছা সমস্ত মানুষকে মানুষ করিয়া তুলিতে উদ্‌যোগী সেই ইচ্ছাই আমার অন্তরে থাকিয়া কাজ করিতেছে। ততক্ষণ পর্যন্ত সেই ইচ্ছা লুকাইয়া কাজ করে যতক্ষণ পর্যন্ত আমি আপনাকে সর্বাংশে তাহার অনুকূল করিয়া তুলিতে না পারি। তাহার উপরে হস্তক্ষেপ করিবার অধিকার আমরা লাভ করি নাই বলিয়াই সে আমাদিগকে ধরা দেয় না।

আমার সব চেয়ে সত্য ইচ্ছা, নিত্য ইচ্ছা কোন্‌টা ? যে ইচ্ছা আমার সার্থকতাসাধনে নিরত। আমার সার্থকতা আমার কাছে যতদিন পর্যন্ত রহস্য সেই ইচ্ছাও ততদিন আমার কাছে গুপ্ত। কিসে আমার পেট ভরিবে, আমার নাম হইবে, তাহা বলা শক্ত নয়; কিন্তু 'কিসে আমি সম্পূর্ণ হইব' তাহা পৃথিবীতে কয়জন লোক আবিষ্কার করিতে পারিয়াছে ? আমি কী, আমার মধ্যে যে-একটা প্রকাশচেষ্টা চলিতেছে তাহার পরিমাণ কী, তাহার গতি কোন্ দিকে, তাহা স্পষ্ট করিয়া কে জানে ?

অতএব দেবতা যদি বর দিতে আসেন তবে হঠাৎ দেখি—প্রার্থনা জানাইবার জন্যও প্রস্তুত নই। তখন এই কথা বলিতে হয়—আমার যথার্থ প্রার্থনা কী তাহা জানিবার জন্য আমাকে সুদীর্ঘ সময় দাও, নহিলে উপস্থিত-মতো হঠাৎ একটা-কিছু চাহিতে গিয়া হয়তো ভয়ানক ফাঁকিতে পড়িতে হইবে।

বস্তুত আমরা সেই সময় লইয়াছি, আমাদের জীবনটা এই কাজেই আছে। আমরা কী প্রার্থনা করিব তাহাই অহরহ পরখ করিতেছি। আজ বলিতেছি খেলা, কাল বলিতেছি ধন, পরদিন বলিতেছি মান—এমনি করিয়া সংসারকে অবিশ্রাম মন্থন করিতেছি, আলোড়ন করিতেছি। কিসের জন্য ? আমি যথার্থ কী চাই তাহারই সন্ধান পাইবার জন্য। মনে করিতেছি—টাকা খুঁজিতেছি, বন্ধু খুঁজিতেছি, মান খুঁজিতেছি; কিন্তু আসলে আর-কিছু নয়, কাহাকে যে খুঁজিতেছি তাহাই নানা স্থানে খুঁজিয়া বেড়াইতেছি; আমার প্রার্থনা কী তাহাই জানি না।

যাঁহারা আপনাদের অন্তরের প্রার্থনা খুঁজিয়া পাইয়াছেন বলেন, শোনা গিয়াছে তাঁহারা কী বলেন। তাঁহারা বলেন একটিমাত্র প্রার্থনা আছে, তাহা এই—

অসতো মা সদ্‌গময়
তমসো মা জ্যোতির্গময়
মৃত্যোর্মামৃতং গময়।
আবিরাবীর্ম এধি।
রুদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখং
তেন মাং পাহি নিত্যম্‌।

অসত্য হইতে আমাকে সত্যে লইয়া যাও, অন্ধকার হইতে আমাকে জ্যোতিতে লইয়া যাও, মৃত্যু হইতে আমাকে অমৃতে লইয়া যাও। হে স্বপ্রকাশ, আমার নিকটে প্রকাশিত হও। রুদ্র, তোমার যে প্রসন্ন মুখ তাহার দ্বারা আমাকে সর্বদাই রক্ষা করো।

কিন্তু কানে শুনিয়া কোনো ফল নাই এবং মুখে উচ্চারণ করিয়া যাওয়া আরো বৃথা। আমরা যখন সত্যকে আলোককে অমৃতকে যথার্থ চাহিব, সমস্ত জীবনে তাহার পরিচয় দিব, তখনই এ প্রার্থনা সার্থক হইবে। যে প্রার্থনা আমি নিজে মনের মধ্যে পাই নাই তাহা পূর্ণ হইবার কোনো পথ আমার সম্মুখে নাই। অতএব, সবই শুনিলাম বটে, মন্ত্রও কর্ণগোচর হইল, কিন্তু তবু এখনো প্রার্থনা করিবার পূর্বে প্রার্থনাটিকে সমস্ত জীবন দিয়া খুঁজিয়া পাইতে হইবে।

বনস্পতি হইয়া উঠিবার একমাত্র প্রার্থনা বীজের শস্যাংশের মধ্যে সংহতভাবে নিগূঢ়ভাবে নিহিত হইয়া আছে, কিন্তু যতক্ষণ তাহা অঙ্কুরিত হইয়া আকাশে আলোকে মাথা না তুলিয়াছে ততক্ষণ তাহা না-থাকারই তুল্য হইয়া আছে। সত্যের আকাঙ্ক্ষা অমৃতের আকাঙ্ক্ষা আমাদের সকল আকাঙ্ক্ষার অন্তর্নিহিত, কিন্তু ততক্ষণ আমরা তাহাকে জানিই না যতক্ষণ না সে আমাদের সমস্ত ধূলিস্তর বিদীর্ণ করিয়া মুক্ত আকাশে পাতা মেলিতে পারে।

আমাদের এই যথার্থ প্রার্থনাটি কী তাহা অনেক সময় অন্যের ভিতর দিয়া আমাদিগকে জানিতে হয়। জগতে মহাপুরুষেরা আমাদিগকে নিজের অন্তর্গূঢ় ইচ্ছাটিকে জানিবার সহায়তা করেন। আমরা চিরকাল মনে করিয়া আসিতেছি, আমরা বুঝি পেট ভরাইতেই চাই, আরাম করিতেই চাই; কিন্তু যখন দেখি কেহ ধন-মান-আরামকে উপেক্ষা করিয়া সত্য আলোক ও অমৃতের জন্য জীবন উৎসর্গ করিতেছেন, তখন হঠাৎ এক রকম করিয়া বুঝিতে পারি যে, আমার অন্তরাত্মার মধ্যে যে ইচ্ছা আমার অগোচরে কাজ করিতেছে তাহাকেই তিনি তাঁহার জীবনের মধ্যে উপলব্ধি করিয়াছেন। আমার ইচ্ছাকে যখন তাঁহার মধ্যে প্রত্যক্ষ দেখিতে পাই, তখন অন্তত ক্ষণকালের জন্যও জানিতে পারি কিসের প্রতি আমার যথার্থ ভক্তি, কী আমার অন্তরের আকাঙ্ক্ষা।

তখন আরো একটা কথা বোঝা যায়। ইহা বুঝিতে পারি যে, যে-সমস্ত ইচ্ছা প্রতিক্ষণে আমার সুগোচর, যাহারা কেবলই আমাকে তাড়না করে, তাহারাই আমার অন্তরতম ইচ্ছাকে, আমার সার্থকতালাভের প্রার্থনাকে বাধা দিতেছে, স্ফূর্তি দিতেছে না; তাহাকে কেবলই আমার চেতনার অন্তরালবর্তী, আমার চেষ্টার বহির্গত করিয়া রাখিয়াছে।

আর, যাঁহার কথা বলিতেছি তাঁহার পক্ষে ঠিক ইহার বিপরীত। যে মঙ্গল-ইচ্ছা, যে সার্থকতার ইচ্ছা বিশ্বমানবের মজ্জাস্বরূপ—যাহা মানবসমাজের মধ্যে চিরদিনই অকথিত বাণীতে এই মন্ত্রগান করিতেছে ‘অসতো মা সদ্‌গময় তমসো মা জ্যোতির্গময়

মৃত্যোর্মামৃতং গময়'—এই ইচ্ছাই তাঁহার কাছে সর্বাপেক্ষা প্রত্যক্ষ; আর-সমস্ত ইচ্ছা ছায়ার মতো তাহার পশ্চাদ্‌বর্তী, তাহার পদতলগত। তিনি জানেন সত্য, আলোক, অমৃতই চাই; মানুষের ইহা না হইলেই নয়। অন্নবস্ত্র-ধনমানকে তিনি ক্ষণিক ও আংশিক আবশ্যক বলিয়াই জানেন। বিশ্বমানবের অন্তর্নিহিত এই ইচ্ছাশক্তি তাঁহার ভিতর দিয়া জগতে প্রত্যক্ষ হয় বলিয়া, প্রমাণিত হয় বলিয়াই, তিনি চিরকালের জন্য মানবের সামগ্রী হইয়া উঠেন। আর, আমরা খাই পরি, টাকা করি, নাম করি, মরি ও পুড়িয়া ছাই হইয়া যাই—মানবের চিরন্তন সত্য-ইচ্ছাকে আমাদের যে জীবনের মধ্যে প্রতিফলিত করিতে পারি না মানবসমাজে সে জীবনের ক্ষণিক মূল্য ক্ষণকালের মধ্যেই নিঃশেষ হইয়া যায়।

কিন্তু মহাপুরুষদের দৃষ্টান্ত আনিলে একটা ভুল বুঝিবার সম্ভাবনা থাকে। মনে হইতে পারে যে, ক্ষমতাসাধ্য প্রতিভাসাধ্য কর্মের দ্বারাতেই বুঝি মানুষ সত্য আলোক ও অমৃতানুসন্ধানের পরিচয় দেয়।

তাহা কোনোমতেই নহে। তাহা যদি হইত, তবে পৃথিবীর অধিকাংশ লোক অমৃতের আশামাত্র করিতে পারিত না। যাহা সাধারণ বুদ্ধিবল-বাহুবলের পক্ষে দুঃসাধ্য, তাহাতেই প্রতিভা বা অসামান্য শারীরিক শক্তির প্রয়োজন; কিন্তু সত্যকে অবলম্বন করা, আলোককে গ্রহণ করা, অমৃতকে বরণ করিয়া লওয়া, ইহা কেবল একান্তভাবে যথার্থভাবে ইচ্ছার কর্ম। ইহা আর কিছু নয়—যাহা কাছেই আছে তাহাকেই পাওয়া।

ইহা মনে রাখিতে হইবে, আমাদিগকে যাহা-কিছু দিবার তাহা আমাদের প্রার্থনার বহু পূর্বেই দেওয়া হইয়া গেছে। আমাদের যথার্থ ঈপ্সিতধনের দ্বারা আমরা পরিবেষ্টিত। বাকি আছে কেবল লইবার চেষ্টা—তাহাই যথার্থ প্রার্থনা।

ঈশ্বর এইখানেই আমাদের গৌরব রক্ষা করিয়াছেন। তিনিই সব দিয়াছেন, অথচ এটুকু আমাদের বলিবার মুখ রাখিয়াছেন যে আমরাই লইয়াছি। এই লওয়াটাই সফলতা, ইহাই লাভ; পাওয়াটা সকল সময়ে লাভ নহে—তাহা অধিকাংশ স্থলেই পাইয়াও না-পাওয়া, এবং অবশিষ্ট স্থলে বিষম একটা বোঝা। আর্থিক-পারমার্থিক সকল বিষয়েই এ কথা খাটে।

ঋষি বলিয়াছেন: আবিরাবীর্ম এধি। হে স্বপ্রকাশ, আমার নিকট প্রকাশিত হও। তুমি তো স্বপ্রকাশ, আপনা-আপনি প্রকাশিত আছই, এখন আমার কাছে প্রকাশিত হও, এই আমার প্রার্থনা। তোমার পক্ষে প্রকাশের অভাব নাই, আমার পক্ষে সেই প্রকাশ-উপলব্ধির সুযোগ বাকি আছে। যতক্ষণ আমি তোমাকে না দেখিব ততক্ষণ তুমি পরিপূর্ণপ্রকাশ হইলেও আমার কাছে দেখা দিবে না। সূর্য তো আপন আলোকে আপনি প্রকাশিত হইয়াই আছেন; এখন আমারই কেবল চোখ খুলিবার, জাগ্রত হইবার অপেক্ষা। যখন আমাদের চোখ খুলিবার ইচ্ছা হয়, আমরা চোখ খুলি; তখন সূর্য আমাদিগকে নূতন করিয়া কিছু দেন না, তিনি যে আপনাকে আপনি দান করিয়া রাখিয়াছেন ইহাই আমরা মুহূর্তের মধ্যে বুঝিতে পারি।

অতএব দেখা যাইতেছে—আমরা যে কী চাই তাহা যথার্থভাবে জানিতে পারাই প্রার্থনার আরম্ভ। যখন তাহা জানিতে পারিলাম তখন সিদ্ধির আর বড়ো বিলম্ব থাকে না, তখন দূরে যাইবার প্রয়োজন হয় না। তখন বুঝিতে পারা যায়, সমস্ত মানবের নিত্য আকাঙ্ক্ষা আমার মধ্যে জাগ্রত হইয়াছে—এই সুমহৎ আকাঙ্ক্ষাই আপনার মধ্যে

আপনার সফলতা অতি সুন্দরভাবে অতি সহজভাবে বহন করিয়া আনে।

আমাদের ছোটো বড়ো সকল ইচ্ছাকেই মানবের এই বড়ো ইচ্ছা এই মর্মগত প্রার্থনা দিয়া যাচাই করিয়া লইতে হইবে। নিশ্চয় বুঝিতে হইবে—আমাদের যে কোনো ইচ্ছা এই সত্য-আলোক-অমৃতের ইচ্ছাকে অতিক্রম করে তাহাই আমাদিগকে খর্ব করে, তাহাই কেবল আমাকে নহে, সমস্ত মানবকে পশ্চাতের দিকে টানিতে থাকে।

এ-যে কেবল আমাদের খাওয়া-পরা, আমাদের ধনমান-অর্জন সম্বন্ধেই খাটে তাহা নহে—আমাদের বড়ো বড়ো চেষ্টা সম্বন্ধে আরো বেশি করিয়াই খাটে।

যেমন দেশহিতৈষা। এ প্রবৃত্তি যদিও আমাদিগকে আত্মত্যাগ ও দুষ্কর তপঃসাধনের দিকে লইয়া যায়, তবু ইহা মানবত্বের গুরুতর অন্তরায় স্বরূপ হইয়া উঠিতে পারে ইহার প্রমাণ আমাদের সম্মুখেই, আমাদের নিকটেই রহিয়াছে। য়ুরোপীয় জাতিরা ইহাকেই তাহাদের চরম লক্ষ্য, পরম ধর্ম বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে। ইহা প্রতিদিনই সত্যকে আলোককে অমৃতকে য়ুরোপের দৃষ্টি হইতে আড়াল করিতেছে। য়ুরোপের স্বদেশাসক্তিই মানবত্বলাভের ইচ্ছাকে, সার্থকতা লাভের ইচ্ছাকে প্রবলবেগে প্রতিহত করিতেছে এবং য়ুরোপীয় সভ্যতা অধিকাংশ পৃথিবীর পক্ষে প্রকাণ্ড বিভীষিকা হইয়া উঠিতেছে। য়ুরোপ কেবলই মাটি চাহিতেছে, সোনা চাহিতেছে, প্রভুত্ব চাহিতেছে—এমন লোলুপভাবে, এমন ভীষণভাবে চাহিতেছে যে, সত্য আলোক ও অমৃতের জন্য মানবের যে চিরন্তন প্রার্থনা তাহা য়ুরোপের কাছে উত্তরোত্তর প্রচ্ছন্ন হইয়া গিয়া তাহাকে উদ্দাম করিয়া তুলিতেছে। ইহাই বিনাশের পথ—পথ নহে, ইহাই মৃত্যু।

আমাদের সম্মুখে, আমাদের অত্যন্ত নিকটে য়ুরোপের এই দৃষ্টান্ত আমাদিগকে প্রতিদিন মোহাভিভূত করিয়া তুলিতেছে। কিন্তু ভারতবর্ষকে এই কথাই কেবল মনে রাখিতে হইবে যে, সত্য-আলোক-অমৃতই প্রার্থনার সামগ্রী—বিষয়ানুরাগই হউক আর দেশানুরাগই হউক, আপনার উদ্দেশ্য বা উদ্দেশ্যসাধনের উপায়ে যেখানেই এই সত্য আলোক ও অমৃতকে অতিক্রম করিতে চাহে সেখানেই তাহাকে অভিশাপ দিয়া বলিতে হইবে—বিনিপাত! বলা কঠিন, প্রলোভন প্রবল, ক্ষমতার মোহ অতিক্রম করা অতি দুঃসাধ্য, তবু ভারতবর্ষ এই কথা সুস্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন—

> অধর্মেণৈধতে তাবৎ ততো ভদ্রাণি পশ্যতি।
> ততঃ সপত্নান্ জয়তি সমূলস্তু বিনশ্যতি।।

ধর্ম, র/১২/৩৬-৩৯

২৫। আত্মপরিচয়-১

'বঙ্গভাষার লেখক', ১৩১১ (১৯০৪,

...শুধু কি কবিতা-লেখার একজন কর্তা কবিকে অতিক্রম করিয়া তাহার লেখনী চালনা করিয়াছেন? তাহা নহে। সেইসঙ্গে ইহাও দেখিয়াছি যে, জীবনটা যে গঠিত হইয়া

উঠিতেছে, তাহার সমস্ত সুখদুঃখ, তাহার সমস্ত যোগবিয়োগের বিচ্ছিন্নতাকে কে-একজন একটি অখন্ড তাৎপর্যের মধ্যে গাঁথিয়া তুলিতেছেন। সকল সময়ে আমি তাঁহার আনুকূল্য করিতেছি কিনা জানি না, কিন্তু আমার সমস্ত বাধা-বিপত্তিকেও, আমার সমস্ত ভাঙাচোরাকেও তিনি নিয়তই গাঁথিয়া জুড়িয়া দাঁড় করাইতেছেন। কেবল তাই নয়, আমার স্বার্থ, আমার প্রবৃত্তি, আমার জীবনকে যে অর্থের মধ্যে সীমাবদ্ধ করিতেছে তিনি বারে বারে সে সীমা ছিন্ন করিয়া দিতেছেন। তিনি সুগভীর বেদনার দ্বারা, বিচ্ছেদের দ্বারা, বিপুলের সহিত, বিরাটের সহিত তাহাকে যুক্ত করিয়া দিতেছেন। সে যখন একদিন হাট করিতে বাহির হইয়াছিল তখন বিশ্বমানবের মধ্যে সে আপনার সফলতা চায় নাই— সে আপনার ঘরের সুখ ঘরের সম্পদের জন্যই কড়ি সংগ্রহ করিয়াছিল। কিন্তু সেই মেঠো পথ, সেই ঘোরো সুখদুঃখের দিক হইতে কে তাহাকে জোর করিয়া পাহাড়-পর্বত অধিত্যকা-উপত্যকার দুর্গমতার মধ্য দিয়া টানিয়া লইয়া যাইতেছে।...

...এই যে কবি, যিনি আমার সমস্ত ভালোমন্দ, আমার সমস্ত অনুকূল ও প্রতিকূল উপকরণ লইয়া আমার জীবনকে রচনা করিয়া চলিয়াছেন, তাঁহাকেই আমার কাব্যে আমি 'জীবনদেবতা' নাম দিয়াছি। তিনি যে কেবল আমার এই ইহজীবনের সমস্ত খন্ডতাকে ঐক্যদান করিয়া বিশ্বের সহিত তাহার সামঞ্জস্যস্থাপন করিতেছেন, আমি তাহা মনে করি না। আমি জানি, অনাদিকাল হইতে বিচিত্র বিস্মৃত অবস্থার মধ্য দিয়া তিনি আমাকে আমার এই বর্তমান প্রকাশের মধ্যে উপনীত করিয়াছেন—সেই বিশ্বের মধ্য দিয়া প্রবাহিত অস্তিত্বধারায় বৃহৎ স্মৃতি তাঁহাকে অবলম্বন করিয়া আমার অগোচরে আমার মধ্যে রহিয়াছে। সেইজন্য এই জগতের তরুলতা-পশুপক্ষীর সঙ্গে এমন একটা পুরাতন ঐক্য অনুভব করিতে পারি, সেইজন্য এতবড়ো রহস্যময় প্রকান্ড জগৎকে অনাত্মীয় ও ভীষণ বলিয়া মনে হয় না।...

আত্মপরিচয়, র/১০/১৬৬-৮১

টীকা :

আত্মপরিচয়—আত্মপরিচয় গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় ১৩৫০ (১৯৪৩) সালে। এটি বিভিন্ন সময়ের সাতটি রচনার সংকলন। প্রথমটি ১৩১১ বঙ্গাব্দে 'বঙ্গভাষার লেখক' গ্রন্থে সংকলিত হয়। এখানে পর পর দুটি রচনাই প্রথম প্রবন্ধটি থেকে গৃহীত হয়েছে।

২৬। আত্মপরিচয়—২

'বঙ্গভাষার লেখক', ১৩১১ (১৯০৪)

...প্রকৃতি তাহার রূপরস বর্ণগন্ধ লইয়া, মানুষ তাহার বুদ্ধিমন তাহার স্নেহপ্রেম লইয়া আমাকে মুগ্ধ করিয়াছে—সেই মোহকে আমি অবিশ্বাস করি না, সেই মোহকে আমি নিন্দা করি না। তাহা আমাকে বদ্ধ করিতেছে না, তাহা আমাকে মুক্তই করিতেছে; তাহা আমাকে আমার বাহিরেই ব্যাপ্ত করিতেছে। নৌকার গুণ নৌকাকে বাঁধিয়া রাখে নাই,

নৌকাকে টানিয়া টানিয়া লইয়া চলিয়াছে। জগতের সমস্তআকর্ষণপাশ আমাদিগকে তেমনি অগ্রসর করিতেছে। কেহ-বা দ্রুত চলিতেছে বলিয়া সে আপন গতিসম্বন্ধে সচেতন, কেহ-বা মন্দগমনে চলিতেছে বলিয়া মনে করিতেছে বুঝি-বা সে এক জায়গায় বাঁধাই পড়িয়া আছে। কিন্তু সকলকেই চলিতে হইতেছে—সকলই এই জগৎসংসারের নিরন্তর টানে প্রতিদিনই ন্যূনাধিক পরিমাণে আপনার দিক হইতে ব্রহ্মের দিকে ব্যাপ্ত হইতেছে। আমরা যেমনই মনে করি, আমাদের ভাই, আমাদের প্রিয়, আমাদের পুত্র আমাদিগকে একটি জায়গায় বাঁধিয়া রাখে নাই; যে জিনিসটাকে সন্ধান করিতেছি, দীপালোক কেবলমাত্র সেই জিনিসটাকে প্রকাশ করে তাহা নহে, সমস্ত ঘরকে আলোকিত করে—প্রেম প্রেমের বিষয়কে অতিক্রম করিয়াও ব্যাপ্ত হয়। জগতের সৌন্দর্যের মধ্য দিয়া, প্রিয়জনের মাধুর্যের মধ্য দিয়া ভগবানই আমাদিগকে টানিতেছেন—আর-কাহারো টানিবার ক্ষমতাই নাই। পৃথিবীর প্রেমের মধ্য দিয়াই সেই ভূমানন্দের পরিচয় পাওয়া, জগতের এই রূপের মধ্যেই সেই অপরূপকে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ করা, ইহাকেই তো আমি মুক্তির সাধনা বলি। জগতের মধ্যে আমি মুগ্ধ, সেই মোহেই আমার মুক্তিরসের আস্বাদন।—...

আত্মপরিচয়, র/১০/১৬৬-৮১

২৭। উৎসব

বঙ্গদর্শন, ১৩১২ মাঘ (১৯০৬)

সংসারে প্রতিদিন আমরা যে সত্যকে স্বার্থের বিক্ষিপ্ততায় ভুলিয়া থাকি উৎসবের বিশেষ দিনে সেই অখন্ড সত্যকে স্বীকার করিবার দিন—এইজন্য উৎসবের মধ্যে মিলন চাই। একলার উৎসব হইলে চলে না। বস্তুত বিশ্বের সকল জিনিসকেই আমরা যখন বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখি, তখনই এই সত্যকে আমরা দেখিতে পাই না—তখনই প্রত্যেক খন্ড পদার্থ, প্রত্যেক খন্ড ঘটনা আমাদের মনোযোগকে স্বতন্ত্ররূপে আঘাত করিতে থাকে। ইহাতে পদে পদে আমাদের চেষ্টা বাড়িয়া উঠে, কষ্ট বাড়িয়া যায়, তাহাতে আমাদের আনন্দ থাকে না। এইজন্য আমাদের প্রতিদিনের স্বার্থের মধ্যে, স্বাতন্ত্র্যের মধ্যে পূর্ণতা নাই, পরিতৃপ্তি নাই; তাহার সম্পূর্ণ তাৎপর্য পাই নাই, তাহার রাগিণী হারাইয়া ফেলি—তাহার চরম সত্য আমাদের অগোচরে থাকে। কিন্তু যে মাহেন্দ্রক্ষণে আমরা খন্ডকে মিলিত করিয়া দেখি, সেই ক্ষণেই সেই-মিলনেই আমরা সত্যকে উপলব্ধি করি এবং এই অনুভূতিতেই আমাদের আনন্দ। তখনই আমরা দেখিতে পাই—

নিখিলে তব কী মহোৎসব! বন্দন করে বিশ্ব
শ্রীসম্পদভূমাস্পদ নির্ভয়শরণে।

সেইজন্যই বলিতেছিলাম, উৎসব একলার নহে। মিলনের মধ্যেই সত্যের প্রকাশ—সেই মিলনের মধ্যেই সত্যকে অনুভব করা উৎসবের সম্পূর্ণতা। একলার মধ্যে যাহা ধ্যানযোগে

বুঝিবার চেষ্টা করি, নিখিলের মধ্যে তাহাই প্রত্যক্ষ করিলে তবেই আমাদের উপলব্ধি সম্পূর্ণ হয়।

মিলনের মধ্যে যে সত্য তাহা কেবল বিজ্ঞান নহে, তাহা আনন্দ, তাহা রসস্বরূপ, তাহা প্রেম। তাহা আংশিক নহে, তাহা সমগ্র; কারণ, তাহা কেবল বুদ্ধিকে নহে, তাহা হৃদয়কেও পূর্ণ করে। যিনি নানা স্থান হইতে আমাদের সকলকে একের দিকে আকর্ষণ করিতেছেন—যাঁহার সম্মুখে, যাঁহার দক্ষিণকরতলচ্ছায়ায় আমরা সকলে মুখামুখি করিয়া বসিয়া আছি—তিনি নীরস সত্য নহেন, তিনি প্রেম। এই প্রেমই উৎসবের দেবতা, মিলনই তাঁহার সজীব সচেতন মন্দির।

মিলনের যে শক্তি, প্রেমের যে প্রবল সত্যতা, তাহার পরিচয় আমরা পৃথিবীতে পদে পদে পাইয়াছি। পৃথিবীতে ভয়কে যদি কেহ সম্পূর্ণ অতিক্রম করিতে পারে, বিপদকে তুচ্ছ করিতে পারে, ক্ষতিকে অগ্রাহ্য করিতে পারে, মৃত্যুকে উপেক্ষা করিতে পারে, তবে তাহা প্রেম। স্বার্থপরতাকে আমরা জগতের একটা সুকঠিন সত্য বলিয়া জানিয়াছি, সেই স্বার্থপরতার সুদৃঢ় জালকে অনায়াসে ছিন্নবিছিন্ন করিয়া দেয় প্রেম। যে হতভাগ্য দেশবাসীরা পরস্পরের সুখে-দুঃখে সম্পদে-বিপদে এক হইয়া মিলিতে পারে না, তাহারা জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ সত্য হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছে বলিয়া শ্রী হইতে ভ্রষ্ট হয়—তাহারা ত্যাগ করিতে পারে না, সুতরাং লাভ করিতে জানে না—তাহারা প্রাণ দিতে পারে না, সুতরাং তাহাদের জীবনধারণ করা বিড়ম্বনা। তাহারা পৃথিবীতে নিয়তই ভয়ে ভীত হইয়া, অপমানে লাঞ্ছিত হইয়া, দীনপ্রাণে নতশিরে ভ্রমণ করে। ইহার কারণ কী? ইহার কারণ এই যে, তাহারা সত্যকে পাইতেছে না, প্রেমকে পাইতেছে না, এইজন্যই কোনোমতেই বল পাইতেছে না। আমরা সত্যকে যে পরিমাণে উপলব্ধি করি, তাহার জন্য সেই পরিমাণে মূল্য দিতে পারি; আমরা ভাইকে যতখানি সত্য বলিয়া জানি, ভায়ের জন্য ততখানি ত্যাগ করিতে পারি। আমাদিগকে যে জলস্থল বেষ্টিত করিয়া আছে, আমরা যে-সকল লোকের মাঝখানে জন্মগ্রহণ করিয়াছি, যথেষ্ট পরিমাণে যদি তাহাদের সত্যতা অনুভব করিতে না পারি, তবে তাহাদের জন্য আত্মোৎসর্গ করিতে পারিব না।

তাই বলিতেছি, সত্য প্রেমরূপে আমাদের অন্তঃকরণে আবির্ভূত হইলেই সত্যের সম্পূর্ণ বিকাশ হয়। তখন বুদ্ধির দ্বিধা হইতে, মৃত্যু পীড়া হইতে, স্বার্থের বন্ধন ও ক্ষতির আশংকা হইতে আমরা মুক্তিলাভ করি। তখন এই অস্থির সংসারের মাঝখানে আমাদের চিত্ত এমন একটি চরম স্থিতির আদর্শ খুঁজিয়া পায়, যাহার উপর সে আপনার সর্বস্ব সমর্পণ করিতে প্রস্তুত হয়।

প্রাত্যহিক উদ্‌ভ্রান্তির মধ্যে মাঝে মাঝে এই স্থিতির সুখ, এই প্রেমের স্বাদ পাইবার জন্যই মানুষ উৎসবক্ষেত্রে সকল মানুষকে একত্রে আহবান করে। সেদিন তাহার ব্যবহার প্রাত্যহিক ব্যবহারের বিপরীত হইয়া উঠে। সেদিন একলার গৃহ সকলের গৃহ হয়, একলার ধন সকলের জন্য ব্যয়িত হয়। সেদিন ধনী দরিদ্রকে সম্মানদান করে, সেদিন পন্ডিত মূর্খকে আসনদান করে। কারণ, আত্মপর ধনিদরিদ্র পন্ডিতমূর্খ এই জগতে একই প্রেমের দ্বারা বিধৃত হইয়া আছে, ইহাই পরম সত্য—এই সত্যেরই প্রকৃত উপলব্ধি পরমানন্দ। উৎসবদিনের অবারিত মিলন এই উপলব্ধিরই অবসর। যে ব্যক্তি এই উপলব্ধি হইতে একেবারেই বঞ্চিত হইল, সে ব্যক্তি উন্মুক্ত উৎসবসম্পদের মাঝখানে আসিয়াও দীনভাবে

রিক্তহস্তে ফিরিয়া চলিয়া গেল।

সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম—ব্রহ্ম সত্যস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ, অনন্তস্বরূপ। কিন্তু এই জ্ঞানময় অনন্তসত্য কিরূপে প্রকাশ পাইতেছেন ? আনন্দরূপমমৃতং যদ্‌বিভাতি। তিনি আনন্দরূপে প্রকাশ পাইতেছেন; যাহা-কিছু প্রকাশ পাইতেছে তাহা তাঁহার আনন্দরূপ, তাঁহার অমৃতরূপ, অর্থাৎ তাঁহার প্রেম। বিশ্বজগৎ তাঁহার অমৃতময় আনন্দ, তাঁহার প্রেম।

সত্যের পরিপূর্ণতাই প্রকাশ; সত্যের পরিপূর্ণতাই প্রেম, আনন্দ। আমরা তো লৌকিক ব্যাপারেই দেখিয়াছি—অপূর্ণ সত্য অপরিস্ফুট। এবং ইহাও দেখিয়াছি যে, যে সত্য আমরা যত সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করিব তাহাতেই আমাদের তত আনন্দ, তত প্রেম। উদাসীনের নিকট একটা তৃণে কোনো আনন্দ নাই; তৃণ তাহার নিকট তুচ্ছ, তৃণের প্রকাশ তাহার নিকট অত্যন্ত ক্ষীণ। কিন্তু উদ্ভিদ্‌বেত্তার নিকট তৃণের মধ্যে যথেষ্ট আনন্দ আছে; কারণ, তৃণের প্রকাশ তাহার নিকট অত্যন্ত ব্যাপক. উদ্ভিদ্‌পর্যায়ের মধ্যে তৃণের সত্য যে ক্ষুদ্র নহে তাহা সে জানে। যে ব্যক্তি আধ্যাত্মিক দৃষ্টি-দ্বারা তৃণকে দেখিতে জানে তৃণের মধ্যে তাহার আনন্দ আরো পরিপূর্ণ, তাহার নিকট নিখিলের প্রকাশ এই তৃণের প্রকাশের মধ্যে প্রতিবিম্বিত। তৃণের সত্য তাহার নিকট ক্ষুদ্রসত্য অস্ফুটসত্য নয় বলিয়াই সে তাহার আনন্দ—তাহার প্রেম উদ্‌বোধিত করে। যে মানুষের প্রকাশ আমার নিকট ক্ষুদ্র, আমার নিকট অস্ফুট, তাহাতে আমার প্রেম অসম্পূর্ণ। যে মানুষকে আমি এতখানি সত্য বলিয়া জানি যে, তাহার জন্য প্রাণ দিতে পারি, তাহাতে আমার আনন্দ, আমার প্রেম। অন্যের স্বার্থ অপেক্ষা নিজের স্বার্থ আমার কাছে এত অধিক সত্য যে, অন্যের স্বার্থসাধনে আমার প্রেম নাই—কিন্তু বুদ্ধদেবের নিকট জীবমাত্রেরই প্রকাশ এত সুপরিস্ফুট যে তাহাদের মঙ্গলচিন্তায় তিনি রাজ্যত্যাগ করিয়াছিলেন।

তাই বলিতেছি, আনন্দ হইতেই সত্যের প্রকাশ এবং সত্যের প্রকাশ হইতেই আনন্দ। আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে—এই-যে যাহা-কিছু হইয়াছে ইহা সমস্ত আনন্দ হইতেই জাত। অতএব যতক্ষণ পর্যন্ত এই জগৎ আমাদের নিকট সেই আনন্দরূপে প্রেমরূপে ব্যক্ত না হয়, ততক্ষণ তাহা পূর্ণসত্যরূপেই ব্যক্ত হইল না। জগতে আমাদের আনন্দ জগতে আমাদের প্রেমই সত্যের প্রকাশরূপের উপলব্ধি। জগৎ আছে এটুকু সত্য কিছুই নহে; কিন্তু জগৎ আনন্দ এই সত্যই পূর্ণ।

আনন্দ কেমন করিয়া আপনাকে প্রকাশ করে ? প্রাচুর্যে, ঐশ্বর্যে, সৌন্দর্যে। জগৎপ্রকাশে কোথাও দারিদ্র্য নাই, কৃপণতা নাই, যেটুকু মাত্র প্রয়োজন তাহারই মধ্যে সমস্ত অবসান নাই। এই-যে লক্ষ লক্ষ নক্ষত্র হইতে আলোকের ঝর্না আকাশময় ঝরিয়া পড়িতেছে, যেখানে আসিয়া ঠেকিতেছে সেখানে বর্ণে তাপে প্রাণে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেছে, ইহা আনন্দের প্রাচুর্য। প্রয়োজন যতটুকু ইহা তাহার চেয়ে অনেক বেশি—ইহা অজস্র। বসন্তকালে লতাগুল্মের গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে কুঁড়ি ধরিয়া, ফুল ফুটিয়া, পাতা গজাইয়া, একেবারে যে-মাতামাতি আরম্ভ হয়, আম্রশাখায় মুকুল ভরিয়া উঠিয়া তাহার তলদেশে অনর্থক রাশি রাশি ঝরিয়া পড়ে—ইহা আনন্দের প্রাচুর্য। সূর্যোদয়ে সূর্যাস্তে মেঘের মুখে যে কত পরিবর্তমান বিচিত্র রঙের পাগলামি প্রকাশ হইতে থাকে, ইহার কোনো প্রয়োজন দেখি না—ইহা আনন্দের প্রাচুর্য। প্রভাতে পাখিদের শত শত কন্ঠ

হইতে উদ্‌গারিত সুরের উচ্ছ্বাসে অরুণ-গগনে যেন চারি দিক হইতে গানের হোরিখেলা চলিতে থাকে, ইহাও প্রয়োজনের অতিরিক্ত—ইহা আনন্দেরই প্রাচুর্য। আনন্দ উদার, আনন্দ অকৃপণ; সৌন্দর্যে সম্পদে আনন্দ আপনাকে নিঃশেষে বিলাইতে গিয়া আপনার আর অন্ত পায় না।

উৎসবের দিনে আমরা যে সত্যের নামে বহুতর লোকে সম্মিলিত হই, তাহা আনন্দ; তাহা প্রেম। উৎসবে পরস্পরকে পরস্পরের কোনো প্রয়োজন নাই—সকল প্রয়োজনের অধিক যাহা, উৎসব তাহাই লইয়া। এইজন্য উৎসবের একটা প্রধান লক্ষণ প্রাচুর্য। এইজন্য উৎসবদিনে আমরা প্রতিদিনের কার্পণ্য পরিহার করি—প্রতিদিন যেরূপ প্রয়োজন হিসাব করিয়া চলি, আজ তাহা অকাতরে জলাঞ্জলি দিতে হয়। দৈন্যের দিন অনেক আছে, আজ ঐশ্বর্যের দিন।

আজ সৌন্দর্যের দিন। সৌন্দর্যও প্রয়োজনের বাড়া। ইহা আবশ্যকের নহে, ইহা আনন্দের বিকাশ—ইহা প্রেমের ভাষা। ফুল যদি সুন্দর না হইত, তবু সে আমার জ্ঞানগম্য হইত, ইন্দ্রিয়গম্য হইত—কিন্তু ফুল যে আমাকে সৌন্দর্য দেয়, সেটা অতিরিক্ত দান। এই বাহুল্য দানই আমার নিকট হইতে বাহুল্য প্রতিদান গ্রহণ করে—সেই-যে বাহুল্য প্রতিদান, তাহাই প্রেম। এই বাহুল্য প্রতিদানটুকু লইয়া ফুলেরই বা কী, আর-কাহারই বা কী কিন্তু এক দিকে এই বাহুল্য সৌন্দর্য, আর-এক দিকে এই বাহুল্য প্রেম, ইহা লইয়াই জগতের নিত্যাৎসব—ইহাই আনন্দসমুদ্রের তরঙ্গলীলা।

তাই উৎসবের দিন সৌন্দর্যের দিন। এই দিনকে আমরা ফুল পাতার দ্বারা সাজাই, দীপমালার দ্বারা উজ্জ্বল করি, সংগীতের দ্বারা মধুর করিয়া তুলি।

এইরূপে মিলনের দ্বারা প্রাচুর্যের দ্বারা, সৌন্দর্যের দ্বারা আমরা উৎসবের দিনকে বৎসরের সাধারণ দিনগুলির মুকুটমণিস্বরূপ করিয়া তুলি। যিনি আনন্দের প্রাচুর্য, ঐশ্বর্যে, সৌন্দর্যে বিশ্বজগতের মধ্যে অমৃতরূপে প্রকাশমান–আনন্দরূপমমৃতং যদ্‌বিভাতি–উৎসবের দিন তাঁহারই উপলব্ধি-দ্বারা পূর্ণ হইয়া আমাদের মনুষ্যত্ব আপন ক্ষণিক অবস্থানগত সমস্ত দৈন্য দূর করিবে এবং অন্তরাত্মার চিরন্তর ঐশ্বর্য ও সৌন্দর্য প্রেমের আনন্দে অনুভব ও বিকাশ করিতে থাকিবে। এই দিনে সে অনুভব করিবে–সে ক্ষুদ্র নহে, সে বিচ্ছিন্ন নহে, বিশ্বই তাহার নিকেতন, সত্যই তাহার আশ্রয়, প্রেম তাহার চরমগতি, সকলেই তাহার আপন–ক্ষমা তাহার পক্ষে স্বাভাবিক, ত্যাগ তাহার পক্ষে সহজ, মৃত্যু তাহার পক্ষে নাই।

কিন্তু বলা বাহুল্য উৎসবের এই আয়োজন তেমন দুঃসাধ্য নহে ইহার উপলব্ধি যেমন দুরূহ। উৎসব অপরূপসুন্দর শতদলপদ্মের ন্যায় যখন বিকশিত হইয়া উঠে তখন আমাদের মধ্যে কতজন আছেন যাঁহারা মধুকরের মতো ইহার সুগন্ধ মধুকোষের মধ্যে নিমগ্ন হইয়া ইহার সুধারস উপভোগ করিতে পারেন? এদিনেও সম্মিলনকে আমরা কেবল জনতা করিয়া ফেলি, আয়োজনকে কেবল আড়ম্বর করিয়া তুলি। এ দিনেও তুচ্ছ কৌতূহল আমাদের চিত্ত কেবল বাহিরেই বিক্ষিপ্ত হইয়া বেড়ায়। যে আনন্দ অন্তরীক্ষে অন্তহীন জ্যোতিষ্কলোকের শিখায় শিখায় নিরন্তর আন্দোলিত, আমাদের গৃহ-প্রাঙ্গণে দীপমালা জ্বালাইয়া আমরা কি সেই আনন্দের তরঙ্গে আমাদের আনন্দকে সচেতনভাবে

মিলিত করিয়াছি ? আমাদের এই সংগীতধ্বনি কি আমাদিগকে জগতের সেই গভীরতম অন্তঃপুরে প্রবাহিত করিয়া লইয়া যাইতেছে—যেখানে বিশ্বভুবনের সমস্ত সুর তাহার আপাতপ্রতীয়মান সমস্ত বিরোধ-বিশৃঙ্খলতা মিলাইয়া দিয়া প্রতিমুহূর্তেই পরিপূর্ণ রাগিণীরূপে উন্মেষিত হইয়া উঠিতেছে ?

হায়, প্রত্যেক দিনে যে দরিদ্র, একদিনে সে ঐশ্বর্যলাভ করিবে কী করিয়া ? প্রত্যেক দিনে যাহার জীবন শোভা হইতে নির্বাসিত, হঠাৎ এক দিনেই সে সুন্দরের সহিত একাসনে বসিবে কেমন করিয়া ? দিনে দিনে যে ব্যক্তি সত্যে প্রেমে প্রস্তুত হইয়াছে, এই উৎসবের দিনে তাহারই উৎসব। হে বিশ্বযজ্ঞপ্রাঙ্গণের উৎসবদেবতা, আমি কে ? আজি উৎসবদিনে এই আসন গ্রহণ করিবার অধিকার আমার কী আছে ? জীবনের নৌকাকে আমি যে প্রতিদিন দাঁড় টানিয়া বাহিয়া চলিয়াছি, সে কি তোমার মহোৎসবের সোনা বাঁধানো ঘাটে আসিয়া আজও পৌঁছিয়াছে ? তাহার বাধা কি একটি ? তাহার লক্ষ্য কি ঠিক থাকে ? প্রতিকূল তরঙ্গের আঘাত সে কি সামলাইতে পারিল ? দিনের পর দিন কোথায় সে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে ? আজ কোথা হইতে সহসা তোমার উৎসবে সকলকে আহবানের ভার লইয়া, হে অন্তর্যামিন্, আমার অন্তরাত্মা তোমার সমক্ষে লজ্জিত হইতেছে। তাহাকে ক্ষমা করিয়া তুমিই তাহাকে আহবান করো। একদিন নহে, প্রত্যহ তাহাকে আহবান করো। ফিরাও, ফিরাও, তাহাকে আত্মাভিমান হইতে ফিরাও। দুর্বল প্রবৃত্তির নিদারুণ অপমান হইতে তাহাকে রক্ষা করো। বুদ্ধির জটিলতার মধ্যে আর তাহাকে নিষ্ফল হইতে দিয়ো না। তাহাকে প্রতিদিন তোমার বিশ্বলোকে, তোমার আনন্দলোকে, তোমার সৌন্দর্যলোকে আকর্ষণ করিয়া, তাহার চিরজীবনের সমস্ত দৈন্য চূর্ণ করিয়া ফেলো। যে মহাপুরুষগণ তোমার নিত্যোৎসবের নিমন্ত্রণে আহূত, যাঁহারা প্রতিদিনই নিখিললোকের সহিত তোমার আনন্দভোজে আসনগ্রহণ করিয়া থাকেন, তাহাকে বিনম্রনতশিরে তাঁহাদের পদধূলি মাথায় তুলিয়া লইতে দাও। তাহার মিথ্যা গর্ব, তাহার ব্যর্থ চেষ্টা, তাহার বিক্ষিপ্ত প্রবৃত্তি আজই তুমি অপসারিত করিয়া দাও—কাল হইতেই সে যেন নত হইয়া তোমার আসনের সর্বনিম্ন স্থানে ধূলিতলে বসিবার অধিকারী হইতে পারে। তোমার উৎসবসভার মহাসংগীত সেখানে কান পাতিয়া শুনা যাইবে, তোমার আনন্দ-উৎসের রসস্রোত সেখানকার ধূলিকেও অভিষিক্ত করিবে। কিন্তু যেখানে অহংকার, যেখানে তর্ক, যেখানে বিরোধ, যেখানে খ্যাতিপ্রতিপত্তির জন্য প্রতিযোগিতা, যেখানে মঙ্গলকর্মও লোকে লুব্ধভাবে গর্বিতভাবে করে, যেখানে পুণ্যকর্ম অভ্যস্ত আচারমাত্রে পর্যবসিত—সেখানে সমস্ত আচ্ছন্ন, সমস্ত রুদ্ধ, সেখানে ক্ষুদ্র বৃহৎরূপে প্রতিভাত হয়, বৃহৎ ক্ষুদ্র হইয়া পড়ে, সেখানে তোমার বিশ্বযজ্ঞোৎসবের আহবান উপহসিত হইয়া ফিরিয়া আসে। সেখানে তোমার সূর্য আলোক দেয় কিন্তু তোমার স্বহস্তলিখিত আলোকলিপি লইয়া প্রবেশ করিতে পারে না ; সেখানে তোমার উদার বায়ু নিশ্বাস জোগায় মাত্র, অন্তঃকরণের মধ্যে বিশ্বপ্রাণকে সমীরিত করিতে পারে না। সেই উদ্ধত কারাগারের পাষাণপ্রাসাদ হইতে তাহাকে উদ্ধার করো—তোমার উৎসব প্রাঙ্গণের ধূলায় তাহাকে লুটাইতে দাও। জগতে কেহই তাহাকে না চিনুক, কেহই না মানুক, সে যেন এক প্রান্তে থাকিয়া তোমাকে চিনে, তোমাকে মানিয়া চলে। এই সৌভাগ্য কবে তাহার ঘটিবে তাহা জানি না, কবে তুমি তাহাকে তোমার উৎসবের অধিকারী করিবে

তাহা তুমিই জান—আপাতত তাহার এই নিবেদন যে, এই প্রার্থনাটিও তাহার অন্তরে যেন যথার্থ সত্য হইয়া উঠে—সত্যকে সে যেন সত্যই চায়, অমৃতকে সে যেন মৌখিক যাচ্ঞাবাক্যের দ্বারা অপমান না করে।

ধর্ম, র/১২/৫-৯

২৮। ততঃ কিম

বঙ্গদর্শন, ১৩১৩ অগ্রহায়ণ(১৯০৬)

আহার সংগ্রহ ও আত্মরক্ষা করিয়া বাঁচিয়া থাকিতে শিখিলেই পশুপাখির শেখা সম্পূর্ণ হয়; সে জীবলীলা সম্পন্ন করিবার জন্যই প্রস্তুত হয়।

মানুষ শুধু জীব নহে, মানুষ সামাজিক জীব। সুতরাং জীবনধারণ করা এবং সমাজের যোগ্য হওয়া, এই উভয়ের জন্যই মানুষকে প্রস্তুত হইতে হয়।

কিন্তু, সামাজিক জীব বলিলেই মানুষের সব কথা ফুরায় না। মানুষকে আত্মারূপে দেখিলে সমাজে তাহার অন্ত পাওয়া যায় না। যাহারা মানুষকে সেইভাবে দেখিয়াছে তাহারা বলিয়াছে 'আত্মানং বিদ্ধি' আত্মাকে জানো। আত্মাকে উপলব্ধি করাই তাহারা মানুষের চরম সিদ্ধি বলিয়া গণ্য করিয়াছে।

নীচের ধাপ বরাবর উপরের ধাপেরই অনুগত। সামাজিক জীবের পক্ষে শুদ্ধমাত্র জীবলীলা সমাজধর্মের অনুবর্তী। ক্ষুধা পাইলেই খাওয়া জীবের প্রবৃত্তি; কিন্তু সামাজিক জীবকে সেই আদিম প্রবৃত্তি খর্ব করিয়া চলিতে হয়। সমাজের দিকে তাকাইয়া অনেক সময় ক্ষুধাতৃষ্ণাকে উপেক্ষা করাই আমরা ধর্ম বলি। এমন-কি, সমাজের জন্য প্রাণ দেওয়া অর্থাৎ জীবধর্ম ত্যাগ করাও শ্রেয় বলিয়া গণ্য হয়। তবেই দেখা যাইতেছে, জীবধর্মকে সংযত করিয়া সমাজধর্মের অনুকূল করাই সাম্যজিক জীবের শিক্ষার প্রধান কাজ।

কিন্তু, মানুষের সত্যকে যাহারা এইখানেই সীমাবদ্ধ না করিয়া পরিপূর্ণ ভাবে উপলব্ধি করিতে ইচ্ছা করে, তাহারা জীবধর্ম ও সমাজধর্ম উভয়কেই সেই আত্ম-উপলব্ধির অনুগত করিবার সাধনাকেই শিক্ষা বলিয়া জানে। এক কথায় মানবাত্মার মুক্তিই তাহাদের কাছে মানবজীবনের চরম লক্ষ্য; জীবনধারণ ও সমাজরক্ষার সমস্ত লক্ষ্যই ইহার অনুবর্তী।

তবেই দেখা যাইতেছে মানুষ বলিতে যে যেমন বুঝিয়াছে সে সেই অনুসারেই মানুষের শিক্ষাপ্রণালী প্রবর্তন করিতে চাহিয়াছে—কারণ, মানুষ করিয়া তোলাই শিক্ষা।...

সংসারের সঙ্গে আমার সম্বন্ধের অন্ত নাই এমন মনে করিয়া কাজ করিলে কাজ ভালো হয় কি মন্দ হয় সে পরের কথা—কিন্তু ইহাতে সন্দেহ নাই যে, সে কথা মিথ্যা। সংসারে আমাদের সমুদয় সম্বন্ধেরই যে অবসান আছে, এত বড়ো সত্য কথা আর কিছুই নাই। প্রয়োজনের খাতিরে গালি দিয়া সত্যকে মিথ্যা বলিয়া চালাইলেও সে সমানে আপনার কাজ করিয়া যায়; সোনার রাজদণ্ডকেই যে রাজা চরম বলিয়া জানে তাহারও

হ্যত হইতে চরমে সেই রাজদণ্ড ধূলায় খসিয়া পড়ে; লোকালয়ে প্রতিষ্ঠালাভকেই যে ব্যক্তি একমাত্র লক্ষ্য বলিয়া জানে সমস্ত জীবনের সমস্ত চেষ্টার শেষে তাহাকে সেই লোকালয় একলা ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে হয়। বড়ো বড়ো কীর্তি লুপ্ত হইয়া যায় এবং বড়ো বড়ো জাতিকেও উন্নতির নাট্যমঞ্চ হইতে প্রদীপ নিবাইয়া দিয়া রঙ্গলীলা সমাধা করিতে হয়। এ-সব অত্যন্ত পুরাতন কথা, তবু ইহা কিছুমাত্র মিথ্যা নহে।

সকল সম্বন্ধেরই অবসান হয়, কিন্তু তাই বলিয়া অবসান হইবার পূর্বে তাহাকে অস্বীকার করিলে তো চলে না। অবসানের পরে যাহা অসত্য, অবসানের পূর্বে তো তাহা সত্য। যাহা যে পরিমাণে সত্য তাহাকে সেই পরিমাণে যদি না মানি, তবে হয় সে আমাদিগকে কানে ধরিয়া মানাইবে, নয়তো কোনোদিন কোনো দিক দিয়া সুদসুদ্ধ শোধ করিয়া লইবে।

ছাত্র বিদ্যালয়ে চিরদিন পড়ে না, পড়ার একদিন অবসান হয়ই। কিন্তু যত দিন বিদ্যালয়ে আছে তত দিন সে যদি পড়াটাকে যথার্থভাবে স্বীকার করিয়া লয় তবেই পড়ার অবসানটা প্রকৃত হয়, তবেই বিদ্যালয় হইতে নিষ্কৃতি তাহার পক্ষে সম্পূর্ণ হয়। যদি সে জোর করিয়া বিদ্যালয় হইতে অবসর লয়, তবে চিরদিন ধরিয়া অসম্পূর্ণ বিদ্যার ফল তাহাকে ভোগ করিতে হয়। পথ গম্যস্থান নয় এ কথা ঠিক, পথের সমাপ্তিই আমাদের লক্ষ্য; কিন্তু আগে পথটাকে ভোগ না করিলে তাহার সমাপ্তিটাই অসম্ভব হইয়া পড়ে।

তবেই দেখা যাইতেছে জগতের সম্বন্ধগুলিকে আমরা ধ্বংস করিতে পারি না, তাহাদের ভিতর দিয়া গিয়া তাহাদিগকে উত্তীর্ণ হইতে পারি। অর্থাৎ, সকল সম্বন্ধ যেখানে আসিয়া মিলিয়াছে সেইখানে পৌঁছিতে পারি। অতএব ঠিকভাবে এই ভিতর দিয়া যাওয়াটাই সাধনা—কোনো সম্বন্ধকে নাই বলিয়া বিমুখ হওয়াই সাধনা নহে। পথকে যদি বৈরাগ্যের জোরে ছাড়িয়া দাও, অপথে তবে সাতগুণ বেশি ঘুর খাইয়া মরিতে হইবে।

জর্মান মহাকবি গ্যয়টে তাঁহার ফাউস্ট্ নাটকে দেখাইয়াছেন, যে ব্যক্তি মানব-প্রবৃত্তিকে উপবাসী রাখিয়া সংসারের লীলাভূমি হইতে উচ্চে নিভৃতে বসিয়া জ্ঞানসংগ্রহ করিতে প্রবৃত্ত ছিল, সংসারের ধূলার উপরে বহুজোরে আছাড় খাইয়া তাহাকে কেমনতরো শক্ত জ্ঞান লাভ করিতে হইয়াছিল। মুক্তির প্রতি অসময়ে অযথা লোভ করিয়া যেটুকু ফাঁকি দিতে যাইব সেটুকু তো শোধ করিতেই হইবে, তাহার উপরে আবার ফাঁকির চেষ্টার জন্য দণ্ড আছে। বেশি তাড়াতাড়ি করিতে গেলেই বেশি বিলম্ব ঘটিয়া যায়।

বস্তুত গ্রহণ এবং বর্জন, বন্ধন এবং বৈরাগ্য, এই দুটাই সমান সত্য – একের মধ্যেই অন্যটির বাসা, কেহ কাহাকেও ছাড়িয়া সত্য নহে। দুইকে যথার্থরূপে মিলাইতে পারিলেই তবে পূর্ণতা লাভ করিতে পারা যায়। শংকর ত্যাগের এবং অন্নপূর্ণা ভোগের মূর্তি; উভয়ে মিলিয়া যখন একাঙ্গ হইয়া যায় তখনই সম্পূর্ণতার আনন্দ। আমাদের জীবনে যেখানেই এই শিব ও শিবানীর বিচ্ছেদ, যেখানেই বন্ধন ও মুক্তির একত্রে প্রতিষ্ঠা নাই, যেখানেই অনুরাগ ও বৈরাগ্যের বিরোধ ঘটিয়াছে, সেইখানেই যত অশান্তি, যত নিরানন্দ। সেইখানেই আমরা লইতে চাই, দিতে চাই না; সেইখানেই আমরা নিজের দিকে টানি, অন্যের দিকে তাকাই না; সেইখানেই আমরা যাহাকে ভোগ করি তাহার আর অন্ত দেখিতে পাই না, অন্ত দেখিলে বিধাতাকে ধিক্কার দিয়া হাহাকার করিতে থাকি; সেখানেই কর্মে আমাদের প্রতিযোগিতা, ধর্মেও আমাদের বিদ্বেষ; সেখানেই কোনো-

কিছুরই যেন স্বাভাবিক পরিণাম নাই, অপঘাতমৃত্যুতেই সমস্ত ব্যাপারের অকস্মাৎ বিলোপ।

জীবনটাকে নাহয় যুদ্ধ বলিয়াই গণ্য করা গেল। এই যুদ্ধ-ব্যাপারে যদি কেবল ব্যূহের মধ্যে প্রবেশ করিবার বিদ্যাই আমাদের শেখা থাকে, ব্যূহ হইতে বাহির-হইবার কৌশল আমরা না জানি, তবে সপ্তরথী ঘিরিয়া যে আমাদিগকে মারিবে। সেরূপ মরিয়াও আমরা বীরত্ব দেখাইতে পারি, কিন্তু যুদ্ধে জয় তো তাহাকে বলে না। অপর পক্ষে যাহারা ব্যূহের মধ্যে একেবারে প্রবেশ করিতেই বিরত সেই কাপুরুষদের বীরের সদ্‌গতি নাই। প্রবেশ করা এবং বাহির হওয়া, এই দুয়ের দ্বারাতেই জীবনের চরিতার্থতা।

প্রাচীন সংহিতাকারগণ হিন্দুসমাজে হরগৌরীকে অভেদাঙ্গ করিতে চাহিয়াছিলেন—বিশ্বচরাচর যে গ্রহণ ও বর্জন, যে আকর্ষণ ও বিপ্রকর্ষণ, যে কেন্দ্রানুগ ও কেন্দ্রাতিগ, যে স্ত্রী ও পুরুষ ভাবের নিয়ত-সামঞ্জস্যের উপর প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া সত্য ও সুন্দর হইয়া উঠিয়াছে, সমাজকে তাঁহারা প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত সকল দিকে সেই বৃহৎ সামঞ্জস্যের উপরে স্থাপিত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। শিব ও শক্তির, নিবৃত্তি ও প্রবৃত্তির সম্মিলনই সমাজের একমাত্র মঙ্গল এবং শিব ও শক্তির বিরোধই সমাজের সমস্ত অমঙ্গলের কারণ—ইহাই তাঁহারা বুঝিয়াছিলেন।

এই সামঞ্জস্যকে আশ্রয় করিতে হইলে প্রথমে মানুষকে সত্যভাবে দেখিতে হইবে। অর্থাৎ তাহাকে কোনো-একটা বিশেষ প্রয়োজনের দিক হইতে দেখিলে চলিবে না। আমরা যদি আম্রকে অম্বল খাওয়ার দিক হইতে দেখি তাহা হইলে তাহাকে সমগ্রভাবে দেখি না; এইজন্য তাহার স্বাভাবিক পরিণামে বাধা ঘটাই; তাহাকে কাঁচা পাড়িয়া আনিয়া তাহার কষিটাকে মাটি করিয়া দিই। গাছকে যদি জ্বালানী কাঠ বলিয়াই দেখি, তবে তাহার ফল ফুল পাতার কোনো তাৎপর্যই দেখিতে পাই না। তেমনি মানুষকে যদি রাজ্যরক্ষার উপায় মনে করি তবে তাহাকে সৈনিক করিয়া তুলিব, তাহাকে যদি জাতীয় সমৃদ্ধি বৃদ্ধির হেতু বলিয়া গণ্য করি তবে তাহাকে বণিক করিবার একান্ত চেষ্টা করিব—এমনি করিয়া আমাদের আবহমান সংস্কার-অনুসারে যেটাকেই আমরা পৃথিবীতে সকলের চেয়ে অভিলষিত বলিয়া জানি মানুষকে তাহারই উপকরণমাত্র বলিয়া দেখিব ও সেই প্রয়োজন-সাধনকেই মানুষের সার্থকতা বলিয়া মনে করিব। এমন করিয়া দেখাতে কোনো হিত হয় না তাহা নহে, কিন্তু সামঞ্জস্য নষ্ট হইয়া শেষকালে অহিত আসিয়া পড়ে—এবং যাহাকে তারা মনে করিয়া আকাশে উড়াই তাহা খানিকক্ষণ ঠিক তারার মতোই ভঙ্গি করে, তাহার পরে পুড়িয়া, ছাই হইয়া, মাটিতে পড়িয়া যায়।

আমাদের দেশে একদিন মানুষকে সমস্ত প্রয়োজনের চেয়ে কিরূপ বড়ো করিয়া দেখা হইয়াছিল, তাহা সাধারণে-প্রচলিত একটি চাণক্য-শ্লোকেই দেখা যায়—

ত্যজেদেকং কুলস্যার্থে গ্রামস্যার্থে কুলং ত্যজেৎ।
গ্রামং জনপদস্যার্থে আত্মার্থে পৃথিবীং ত্যজেৎ।।

মানুষের আত্মা কুলের চেয়ে, গ্রামের চেয়ে, দেশের চেয়ে, সমস্ত পৃথিবীর চেয়ে বড়ো। অন্তত কাহারও চেয়ে ছোটো নয়। প্রথমে মানুষের আত্মাকে এইরূপে সমস্ত দেশিক ও ক্ষণিক প্রয়োজন হইতে পৃথক করিয়া তাহাকে বিশুদ্ধ ও বৃহৎ করিয়া দেখিতে হইবে,

তবেই সংসারের সমস্ত প্রয়োজনের সঙ্গে তাহার সত্যসম্বন্ধ, জীবনের ক্ষেত্রের মধ্যে তাহার যথার্থ স্থান নির্ণয় করা সম্ভবপর হয়।

আমাদের দেশে তাই করা হইয়াছিল; শাস্ত্রকারগণ মানুষের আত্মাকে অত্যন্ত বড়ো করিয়া দেখিয়াছিলেন। মানুষের মর্যাদার কোথাও সীমা ছিল না, ব্রহ্মের মধ্যেই তাহার সমাপ্তি। আর-যাহাতেই মানুষকে শেষ করিয়া দেখ তাহাকে মিথ্যা করিয়া দেখা হয়— তাহাকে citizen করিয়া দেখ কিন্তু কোথায় আছে city আর কোথায় আছে সে, cityতে তাহার পর্যাপ্তি নহে; তাহাকে patriot করিয়া দেখ কিন্তু দেশেই তাহার শেষ পাওয়া যায় না, দেশ তো জলবিম্ব, সমস্ত পৃথিবীই বা কী।

...কামনার বিষয়ের দ্বারা মানুষকে খাটো করিয়া দেখিলে চলিবে না, মানুষ ইহার চেয়েও বড়ো। মানুষের সেই-যে সকলের চেয়ে বড়ো সত্য, যাহা অনাদি হইতে অনন্তের অভিমুখ, তাহাকেই মনে রাখিলে তবেই তাহার জীবনকে সজ্ঞানভাবে সম্পূর্ণতার পথে চালনা করিবার উপায় করা যাইতে পারে। কিন্তু মানুষকে যদি সংসারের জীব বলিয়াই মানি, তবে তাহাকে সংসারের প্রয়োজনের মধ্যেই আবদ্ধ করিয়া, ছোটো করিয়া, ছাঁটিয়া কাটিয়া লই।

আমাদের দেশের প্রাচীন মনীষীরা মানুষের আত্মাকে বড়ো করিয়া দেখিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহাদের জীবনযাত্রার আদর্শ য়ুরোপের সহিত স্বতন্ত্র হইয়াছে—তাঁহারা জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত খাটিয়া মরাকে গৌরবের বিষয় মনে করেন নাই—কর্মকেই তাঁহারা শেষ লক্ষ্য না করিয়া, কর্মের দ্বারা কর্মকে ক্ষয় করাই চরম সাধনার বিষয় বলিয়া জানিয়াছিলেন। আত্মার মুক্তিই যে প্রত্যেক মানুষের একমাত্র শ্রেয়, এ বিষয়ে তাঁহাদের সন্দেহ ছিল না।

য়ুরোপে স্বাধীনতার গৌরব সকল সময়েই গাওয়া হইয়া থাকে। এই স্বাধীনতার অর্থ আহরণ করিবার স্বাধীনতা, ভোগ করিবার স্বাধীনতা, কাজ করিবার স্বাধীনতা। এ স্বাধীনতা বড়ো কম জিনিস নয়— এ সংসারে ইহাকে রক্ষা করিতে অনেক শক্তি এবং আয়োজন আবশ্যক হয়। কিন্তু প্রাচীন ভারতবর্ষ ইহার প্রতিও অবজ্ঞা করিয়া বলিয়াছিল—ততঃ কিম্? এ স্বাধীনতাকে সে স্বাধীনতা বলিয়াই স্বীকার করে নাই। ভারতবর্ষ কামনার উপরে, কর্মের উপরেও স্বাধীন হইতে চাহিয়াছিল।

কিন্তু 'স্বাধীন হইলাম' মনে করিলেই তো স্বাধীন হওয়া যায় না। নিয়ম অর্থাৎ অধীনতার ভিতর দিয়া না গেলে স্বাধীন হওয়া যায় না। রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতাকে যদি বড়ো মনে কর তবে সৈনিকরূপে অধীন হইতে হইবে, বণিকরূপে অধীন হইতে হইবে। ইংলণ্ডে যে কত লক্ষ সৈনিক আছে, তাহারা কি স্বাধীন? মনুষ্যত্বকে যে তাহারা মানুষ-মারা কলে পরিণত করিয়াছে, তাহারা সজীব বন্দুকমাত্র। কত লক্ষ মজুর খনির অন্ধ রসাতলে, কারখানার অগ্নিকুণ্ডে থাকিয়া, ইংলণ্ডের রাজ্যশ্রীর পায়ের তলায় বুকের রক্ত দিয়া আলতা পরাইতেছে। তাহারা কি স্বাধীন? তাহারা তো নির্জীব কলের সজীব অঙ্গপ্রত্যঙ্গ। য়ুরোপের স্বাধীনতার ফলভোগ করিতেছে কয়জন? তবে স্বাধীনতা কাহাকে বলে? individualism অর্থাৎ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য য়ুরোপের সাধনার বিষয় হইতে পারে, কিন্তু ব্যক্তির পরতন্ত্রতা এত বেশি কি অন্যত্র দেখা গিয়াছে?

ইহার উত্তরে একটা স্বতোবিরোধী কথা বলিতে হয়। পরতন্ত্রতার ভিতর দিয়াই

স্বাতন্ত্র্যে যাইবার পথ। বাণিজ্যে তুমি যত বড়ো লাভের টাকা আনিতে চাও তত বড়ো মূলধনের টাকা ফেলিতে হইবে। টাকা কিছুই খাটিতেছে না, কেবলই লাভ করিতেছে, ইহা হয় না। স্বাতন্ত্র্য তেমনি সুদের মতো, বিপুল পরতন্ত্রতা খাটাইয়া তবে সেইটুকু লাভ হইতেছে— আগাগোড়া সমস্তটাই লাভ, আগাগোড়া সমস্তই স্বাধীনতা, এ কখনো সম্ভবপর নহে।

আমাদের দেশেরও সাধনার বিষয় ছিল individualism, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য। কিন্তু, সে তো কোনো ছোটোখাটো স্বাতন্ত্র্য নয়। সেই স্বাতন্ত্র্যের আদর্শ একেবারে মুক্তিতে গিয়া ঠেকিয়াছে। ভারতবর্ষ প্রত্যেক লোককে জীবনের প্রতি দিনের ভিতর দিয়া, সমাজের প্রত্যেক সম্বন্ধের ভিতর দিয়া, সেই মুক্তির অধিকার দিবার চেষ্টা করিয়াছে। য়ুরোপে যেমন কঠোর পরতন্ত্রতার ভিতর দিয়া স্বাতন্ত্র্য বিকাশ পাইতেছে, আমাদের দেশেও তেমনি নিয়মসংযমের নিবিড় বন্ধনের ভিতর দিয়াই মুক্তির উপায় নির্দিষ্ট হইয়াছে। সেই মুক্তির পরিণামকে লক্ষ্য হইতে বাদ দিয়া যদি কেবল নিয়মসংযমকেই একান্ত করিয়া দেখি, তবে বলিতেই হয়— আমাদের দেশে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের খর্বতা বড়ো বেশি।

আসল কথা, কোনো দেশের যখন দুর্গতির দিন আসে তখন সে মুখ্য জিনিসটাকে হারায়, অথচ গৌণটা জঞ্জাল হইয়া জায়গা জুড়িয়া বসে। তখন পাখি উড়িয়া পালায়, খাঁচা পড়িয়া থাকে। আমাদের দেশেও তাই ঘটিয়াছে। আমরা এখনো নানাবিধ বাঁধাবাঁধি মানিয়া চলি, অথচ তাহার পরিণামের প্রতি লক্ষ্য নাই। মুক্তির সাধনা আমাদের মনের মধ্যে, আমাদের ইচ্ছার মধ্যে নাই, অথচ তাহার বন্ধনগুলি আমরা আপাদমস্তক বহন করিয়া বেড়াইতেছি। ইহাতে আমাদের দেশের যে মুক্তির আদর্শ তাহা তো নষ্ট হইতেছেই, য়ুরোপের যে স্বাধীনতার আদর্শ তাহার পথেও পদে পদে বাধা পড়িতেছে। সাত্ত্বিকতার যে পূর্ণতা তাহা ভুলিয়াছি, রাজসিকতার যে ঐশ্বর্য তাহাও দুর্লভ হইয়াছে, কেবল তামসিকতার যে নিরর্থক অভ্যাসগত বোঝা তাহাই বহন করিয়া নিজেকে অকর্মণ্য করিয়া তুলিতেছি। অতএব এখনকার দিনে আমাদের দিকে তাকাইয়া যদি কেহ বলে, ভারতবর্ষের সমাজ মানুষকে কেবল আচারে-বিচারে আটেঘাটে বন্ধন করিবারই ফাঁদ, তবে মনে রাগ হইতে পারে কিন্তু জবাব দেওয়া কঠিন। পুকুর যখন শুকাইয়া গেছে তখন তাহাকে যদি কেহ গর্ত বলে, তবে তাহা আমাদের পৈতৃক সম্পত্তি হইলেও চুপ করিয়া থাকিতে হয়। আসল কথা, সরোবরের পূর্ণতা এক কালে যতই সুগভীর ছিল, শুষ্ক অবস্থায় তাহার রিক্ততার গর্তটাও ততই প্রকাণ্ড হইয়া থাকে।

ভারতবর্ষের মুক্তির লক্ষ্য যে একদা কত সচেষ্ট ছিল, তাহা এখনকার দিনের নিরর্থক বাঁধাবাঁধি, অনাবশ্যক আচারবিচারের দ্বারাই বুঝা যায়। য়ুরোপেও কালক্রমে যখন শক্তির হ্রাস হইবে, তখন বাঁধনের অসহ্য ভারের দ্বারাই তাহার পূর্বতন স্বাতন্ত্র্যচেষ্টার পরিমাপ হইবে। এখনই কি ভার অনুভব করিয়া সে অসহিষ্ণু হইয়া উঠিতেছে না? এখনই কি তাহার উপায় ক্রমশ উদ্দেশ্যকে ছাড়াইয়া যাইবার চেষ্টা করিতেছে না?

কিন্তু সে তর্ক থাক্; আসল কথা এই, যদি লক্ষ্য সজাগ থাকে তবে নিয়মসংযমের বন্ধনই মুক্তির একমাত্র উপায়। ভারতবর্ষ একদিন নিয়মের দ্বারা সমাজকে খুব করিয়া বাঁধিয়াছিল। মানুষ সমাজের মধ্য দিয়া সমাজকে ছাড়াইয়া যাইবে বলিয়াই বাঁধিয়াছিল। ঘোড়াকে তাহার সওয়ার লাগাম দিয়া বাঁধে কেন এবং নিজেই বা তাহার সঙ্গে রেকাবের

দ্বারা বদ্ধ হয় কেন—ছুটিতে হইবে বলিয়া, দূরের লক্ষ্যস্থানে যাইতে হইবে বলিয়া। ভারতবর্ষ জানিত সমাজ মানুষের শেষ লক্ষ্য নহে, মানুষের চির-অবলম্বন নহে— সমাজ হইয়াছে মানুষকে মুক্তির পথে অগ্রসর করিয়া দিবার জন্য। সংসারের বন্ধন ভারতবর্ষ বরঞ্চ বেশি করিয়াই স্বীকার করিয়াছে, তাহার হাত হইতে বেশি করিয়া নিষ্কৃতি পাইবার অভিপ্রায়ে।

এইরূপে বন্ধন ও মুক্তির, উপায় ও উদ্দেশ্য, উভয়কেই মান্য করিবার কথা প্রাচীন উপনিষদের মধ্যেও দেখা যায়। ঈশোপনিষৎ বলিতেছেন—

অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি যে অবিদ্যামুপাসতে।
ততো ভূয় ইব তে তমো য উ বিদ্যায়াং রতাঃ।।

যাহারা কেবলমাত্র অবিদ্যা অর্থাৎ সংসারের উপাসনা করে তাহারা অন্ধতমসের মধ্যে প্রবেশ করে; তদপেক্ষাও ভূয় অন্ধকারের মধ্যে প্রবেশ করে তাহারা, যাহারা কেবলমাত্র ব্রহ্মবিদ্যায় নিরত।—

বিদ্যাঞ্চাবিদ্যাঞ্চ যস্তদ্‌বেদোভয়ং সহ।
অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা বিদ্যয়ামৃতমশ্নুতে।।

বিদ্যা এবং অবিদ্যা উভয়কেই যিনি একত্র করিয়া জানেন তিনি অবিদ্যাদ্বারা মৃত্যু হইতে উত্তীর্ণ হইয়া বিদ্যাদ্বারা অমৃত প্রাপ্ত হন।

মৃত্যুকে প্রথমে উত্তীর্ণ হইতে হইবে, তাহার পরে অমৃতলাভ। সংসারের ভিতর দিয়া এই মৃত্যুকে উত্তীর্ণ হইতে হয়। কর্মের মধ্যে প্রবৃত্তিকে যথার্থভাবে নিযুক্ত করিয়া আগে সেই প্রবৃত্তিকে ও কর্মকে ক্ষয় করিয়া ফেলা; তার পরে ব্রহ্মলাভের কথা; সংসারকে বলপূর্বক অস্বীকার করিয়া কেহ অমৃতের অধিকার পাইতে পারে না।

কুর্বন্নেবেহ কর্মাণি জিজীবিষেৎ শতং সমাঃ।
এবং ত্বয়ি নান্যথেতোঽস্তি ন কর্ম লিপ্যতে নরে।।

কর্ম করিয়া শতবৎসর ইহলোকে জীবিত থাকিতে ইচ্ছা করিবে, হে নর, তোমার পক্ষে ইহার আর অন্যথা নাই; কর্মে লিপ্ত হইবে না, এমন পথ নাই।

মানুষকে পূর্ণতালাভ করিতে হইলে পরিপূর্ণ জীবন এবং সম্পূর্ণ কর্মের প্রয়োজন হয়। জীবন সম্পূর্ণ হইলেই জীবনের প্রয়োজন নিঃশেষ হইয়া যায়, কর্ম সমাপ্ত হইলেই কর্মের বন্ধন শিথিল হইয়া আসে।

জীবনকে ও জীবনের অবসানকে, কর্মকে ও কর্মের সমাপ্তিকে এইরূপ অত্যন্ত সহজভাবে গ্রহণ করিতে হইলে যে কথাটি মনে রাখিতে হইবে তাহা ঈশোপনিষদের প্রথম শ্লোকেই রহিয়াছে: ঈশা বাস্যমিদং সর্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ। ঈশ্বরের দ্বারা এই জগতের সমস্ত যাহা-কিছু আচ্ছন্ন জানিবে। এবং— তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনম্। তিনি যাহা ত্যাগ করিতেছেন, তিনি যাহা দিতেছেন, তাহাই ভোগ করিবে, অন্য কাহারও ধনে লোভ করিবে না।

সংসারকে যদি ব্রহ্মের দ্বারা আচ্ছন্ন বলিয়া জানিতে পারি তাহা হইলে সংসারের বিষ কাটিয়া যায়; তাহার সংকীর্ণতা দূর হইয়া, তাহার বন্ধন আমাদিগকে আঁটিয়া ধরে না। এবং সংসারের ভোগকে ঈশ্বরের দান বলিয়া গ্রহণ করিলে কাড়াকাড়ি-মারামারি থামিয়া যায়।

এইরূপে সংসারকে, সংসারের সুখকে, কর্মকে ও জীবনকে ব্রহ্ম-উপলব্ধির সঙ্গে যুক্ত করিয়া খুব বড় করিয়া জানাটা হইল সমাজ-রচনার, জীবন নির্বাহের গোড়াকার কথা। ভারতবর্ষ এই ভূমার সুরেই সমাজকে বাঁধিবার চেষ্টা করিয়াছিল। সমাজকে বাঁধিয়া মানুষের আত্মাকে মুক্তি দিবার চেষ্টা করিয়াছিল। শরীরকে অপবিত্র বলিয়া পীড়া দিতে চায় নাই, সমাজকে কলুষিত বলিয়া পরিহার করিতে চায় নাই, জীবনকে অনিত্য বলিয়া অবজ্ঞা করিতে চায় নাই— সে সমস্তকেই ব্রহ্মের দ্বারা অখন্ড-পরিপূর্ণ করিতে চাহিয়াছিল।

য়ুরোপে মানুষের জীবনের দুইটি ভাগ দেখা যায়। এক শেখার অবস্থা, তাহার পরে সংসারের কাজ করিবার অবস্থা। এইখানেই শেষ।

কিন্তু, কাজ জিনিসটাকে তো কোনো-কিছুর শেষ বলা যায় না। লাভই শেষ। শক্তিকে শুদ্ধমাত্র খাটাইয়া চলাই তো শক্তির পরিণাম নহে, সিদ্ধিতে পৌঁছানোই পরিণাম। আগুনে কেবল ইন্ধন চাপানোই তো লক্ষ্য নহে, রন্ধনেই তাহার সার্থকতা। কিন্তু য়ুরোপ মানুষকে এমন-কোনো জায়গায় লক্ষ্য স্থাপন করিতে দেয় নাই, কাজ যেখানে তাহার স্বাভাবিক পরিণামে আসিয়া হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিতে পারে। টাকা সংগ্রহ করিতে চাও, সংগ্রহের তো শেষ নাই; জগতের খবর জানিতে চাও, জানার তো অন্ত নাই; সভ্যতাকে progress বলিয়া থাক, প্রোগ্রেস শব্দের অর্থই এই দাঁড়াইয়াছে যে, কেবলই পথে চলা, কোথাও ঘরে না পৌঁছানো। এইজন্য জীবনকে না-শেষের মধ্যে হঠাৎ শেষ করা, না-থামার মধ্যে হঠাৎ থামিয়া যাওয়া য়ুরোপের জীবনযাত্রা। Not the game but the chase— শিকার পাওয়া নহে, শিকারের পশ্চাতে অনুধাবন করাই য়ুরোপের কাছে আনন্দের সারভাগ বলিয়া গণ্য হয়।

যাহা হাতে পাওয়া যায় তাহাতে সুখ নাই, এ কথা কি আমরাও বলি না?...

এক কথায় যে যাহা পায় তাহাতে তাহার আশা মিটে না; যতই বেশি পাও না কেন, তাহার চেয়ে বেশি পাইবার দিকে মন ছুটে। তবে আর কাজের অন্ত হইবে কেমন করিয়া। পাওয়াতে যখন চাওয়ার শেষ নহে তখন অসম্পূর্ণ আশার মধ্যে অসমাপ্ত কর্ম লইয়া মরাই মানুষের একমাত্র গতি বলিয়া মনে হয়।

এইখানে ভারতবর্ষ বলিয়াছেন, আর-সমস্ত পাওয়ার এই লক্ষণ বটে, কিন্তু এক জায়গায় পাওয়ার সমাপ্তি আছে। সেইখানেই যদি লক্ষ্য স্থাপন করি তবে কাজের অবসান হইবে, আমরা ছুটি পাইব। কোনোখানেই চাওয়ার শেষ নাই, জগৎটা এত বড়ো একটা ফাঁকি, জীবনটা এত বড়ো একটা পাগলামি হইতেই পারে না। মানুষের জীবনসংগীতে কেবলই অবিশ্রাম তানই আছে আর কোনো জায়গাতেই সম নাই, এ কথা আমরা মানি না। অবশ্য এ কথা বলিতে হইবে—তান যতই মনোহর হউক তাহার মধ্যে গানের অকস্মাৎ শেষ হইলে রসবোধে আঘাত লাগে; সমে আসিয়া শেষ হইলে সমস্ত তানের লীলা নিবিড় আনন্দের মধ্যে পরিসমাপ্ত হয়।

ভারতবর্ষ তাই কাজের মাঝখানে জীবনকে মৃত্যুর দ্বারা হঠাৎ বিচ্ছিন্ন হইতে উপদেশ দেন নাই। পূরাদমের মধ্যেই সাঁকো ভাঙিয়া হঠাৎ অতলে তলাইয়া যাইতে বলেন নাই, তাহাকে ইস্টিশনে আনিয়া পৌঁছাইয়া দিতে চাহিয়াছেন। সংসার কোনোদিন সমাপ্ত হইবে না, এ কথা ঠিক; জীবসৃষ্টির আরম্ভ হইতে আজ পর্যন্ত উন্নতি অবনতির

ঢেউ-খেলার মধ্য দিয়া সংসার চলিয়া আসিতেছে, তাহার বিরাম নাই। কিন্তু, প্রত্যেক মানুষের সংসারলীলার যখন শেষ আছে, তখন মানুষ যদি একটা সম্পূর্ণতার উপলব্ধিকে না জানিয়া প্রস্থান করে, তবে তাহার কি হইল?

বাহিরে কিছুর শেষ নাই, কেবলই একটা হইতে আর-একটা বাড়িয়াই চলিয়াছে। এই চিরচলমান বহিঃসংসারের দোলায় দুলিয়া আমরা মানুষ হইয়াছি—আমার পক্ষে একদিন সে দোলার কাজ ফুরাইলেও কোনোদিন একেবারে তাহার কাজ শেষ হইবে না। এই কথা মনে করিয়া, আমার যতটুকু সাধ্য এই প্রবাহের পথকে আগে ঠেলিয়া দিতে হইবে। ইহার জ্ঞানের ভান্ডারে আমার সাধ্যমত জ্ঞান, ইহার কর্মের চক্রে আমার সাধ্যমত বেগ—সঞ্চার করিয়া দিতে হইবে। কিন্তু, তাই বলিয়া বাহিরের এই অশেষের মধ্যে আমিসুদ্ধ ভাসিয়া গেলে নষ্ট হইতে হইবে। অন্তরের মধ্যে একটা সমাধার পন্থা আছে। বাহিরে উপকরণের অন্ত নাই, কিন্তু অন্তরে সন্তোষ আছে; বাহিরে দুঃখবেদনার অন্ত নাই, কিন্তু অন্তরে ধৈর্য আছে; বাহিরে প্রতিকূলতার অন্ত নাই, কিন্তু অন্তরে ক্ষমা আছে; বাহিরে লোকের সহিত সম্বন্ধভাবের অন্ত নাই, কিন্তু অন্তরে প্রেম আছে; বাহিরে সংসারের অন্ত নাই, কিন্তু আত্মাতে আত্মা সম্পূর্ণ। এক দিকের অশেষের দ্বারাতেই আর-এক দিকের অখন্ডতার উপলব্ধি পরিপূর্ণ হইয়া থাকে। গতির দ্বারাতেই স্থিতিকে মাপিয়া লইতে হয়।

এইজন্য ভারতবর্ষ মানুষের জীবনকে যেরূপে বিভক্ত করিয়াছিলেন, কর্ম তাহার মাঝখানে ও মুক্তি তাহার শেষে।

দিন যেমন চার স্বাভাবিক অংশে বিভক্ত—পূর্বাহ্ণ, মধ্যাহ্ন, অপরাহ্ণ এবং সায়াহ্ন, ভারতবর্ষ জীবনকে সেইরূপ চারি আশ্রমে ভাগ করিয়াছিল। এই বিভাগ স্বভাবকে অনুসরণ করিয়াই হইয়াছিল। আলোক ও উত্তাপের ক্রমশ বৃদ্ধি এবং ক্রমশ হ্রাস যেমন দিনের আছে, তেমনি মানুষেরও ইন্দ্রিয়শক্তির ক্রমশ উন্নতি এবং ক্রমশ অবনতি আছে। সেই স্বাভাবিক ক্রমকে অবলম্বন করিয়া ভারতবর্ষ জীবনের আরম্ভ হইতে জীবনান্ত পর্যন্ত একটি অখন্ড তাৎপর্যকে বহন করিয়া লইয়া গেছে। প্রথমে শিক্ষা, তাহার পরে সংসার, তাহার পরে বন্ধনগুলিকে শিথিল করা, তাহার পরে মুক্তি ও মৃত্যুর মধ্যে প্রবেশ— ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও প্রব্রজ্যা।

আধুনিক কালে আমরা জীবনের সঙ্গে মৃত্যুর একটা বিরোধ অনুভব করি। মৃত্যু যে জীবনের পরিণাম তাহা নহে, মৃত্যু যেন জীবনের শত্রু। জীবনের পর্বে পর্বে আমরা অক্ষমভাবে মৃত্যুর সঙ্গে ঝগড়া করিয়া চলিতে থাকি। যৌবন চলিয়া গেলেও আমরা যৌবনকে টানাটানি করিয়া রাখিতে চাই। ভোগের আগুন নিবিয়া আসিতে থাকিলেও আমরা নানাপ্রকার কাঠখড় জোগাইয়া তাহাকে জাগাইয়া রাখিতে চাই। ইন্দ্রিয়শক্তির হ্রাস হইয়া আসিলেও আমরা প্রাণপণে কাজ করিতে চেষ্টা করি। মুষ্টি যখন স্বভাবতই শিথিল হইয়া আসে তখনো আমরা কোনোমতেই কোনো-কিছুর দখল ছাড়িতে চাই না। প্রভাত ও মধ্যাহ্ন ছাড়া আমাদের জীবনের আর-কোনো অংশকে আমরা কিছুতেই স্বীকার করিতে ইচ্ছা করি না। অবশেষে যখন আমাদের চেয়ে প্রবলতর শক্তি কানে ধরিয়া স্বীকার করিতে বাধ্য করায়, তখন হয় বিদ্রোহ নয় বিষাদ উপস্থিত হয়; তখন আমাদের সেই পরাভব কেবল রণে-ভঙ্গ রূপেই পরিণত হয়, তাহাকে কোনো কাজে

লাগাইতেই পারি না। যে পারণামগুলি নিশ্চয় পরিণাম, তাহাদিগকে সহজে গ্রহণ করিবার শিক্ষা হয় নাই বলিয়া কিছুই নিজে ছাড়িয়া দিই না, সমস্ত নিজের কাছ হইতে কাড়িয়া লইতে দিই। সত্যকে অস্বীকার করি বলিয়া পদে পদেই সত্যের নিকটে পরাস্ত হইতে থাকি।

...ফল যে একদিন গাছের বাঁধন হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র হইয়া যাইবে, ইহাই তাহার সফলতা; গাছকে চিরকাল আঁটিয়া ধরিয়া থাকিলেই সে ব্যর্থ। ফলের মতো আমাদের ইন্দ্রিয়শক্তিও একদিন সংসারের ডাল হইতে সমস্ত রস আকর্ষণ করিয়া লইয়া শেষকালে এই ডালকে ত্যাগ করিয়া ধূলিসাৎ হয়। ইহা জগতের নিয়মেই হয়, ইহার উপরে আমাদের হাত নাই। কিন্তু ভিতরে যেখানে আমাদের স্বাধীন মনুষ্যত্ব, যেখানে আমাদের ইচ্ছাশক্তির লীলা, সেখানকার পরিণতির পক্ষে ইচ্ছাশক্তিই একটা প্রধান শক্তি। এঞ্জিনের বয়লারের গায়ে যে তাপমান যন্ত্রটা আছে তাহার পারা স্বভাবের নিয়মেই ওঠে বা নামে, কিন্তু ভিতরের আগুনের আঁচটাকে এই সংকেত বুঝিয়া বাড়াইব কি কমাইব তাহা এঞ্জিনিয়ারের ইচ্ছার উপরেই নির্ভর করে। আমাদের ইন্দ্রিয়শক্তির হ্রাসবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আমাদের প্রবৃত্তির উত্তেজনা ও কর্মের উৎসাহকে বাড়াইব কি কমাইব তাহা আমাদের হাতে। সেই যথাসময়ে বাড়ানো-কমানোর দ্বারাতেই আমরা সফলতা লাভ করি।

পাকা ফলে এক দিকে বোঁটা দুর্বল ও শাঁস আলগা হইতে থাকে বটে, তেমনি অন্য দিকে তাহার আঁটি শক্ত হইয়া নূতন প্রাণের সম্বল লাভ করিতে থাকে। আমাদের মধ্যেও সেই হরণ-পূরণ আছে। আমাদেরও বাহিরে হ্রাসের সঙ্গে ভিতরে বৃদ্ধির যোগ আছে। কিন্তু ভিতরের কাজে মানুষের নিজের ইচ্ছা বলবান বলিয়া এই বৃদ্ধি, এই পরিণতি আমাদের সাধনার অপেক্ষা রাখে। সেইজন্যই দেখিতে পাই, দাঁত পড়িল, চুল পাকিল, শরীরের তেজ কমিল, মানুষ তাহার আয়ুর শেষ প্রান্তে আসিয়া দাঁড়াইল, তবু কোনোমতেই সহজে সংসার-হইতে আপন বোঁটা আলগা হইতে দিল না— প্রাণপণে সমস্ত আঁকড়াইয়া ধরিয়া রহিল, এমন-কি, মৃত্যুর পরেও সংসারের ক্ষুদ্র বিষয়েও তাহার ইচ্ছাই বলবান রহিবে ইহা লইয়া জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত চিন্তা করিতে লাগিল। আধুনিক কাল ইহাকে গর্বের বিষয় মনে করে, কিন্তু ইহা গৌরবের বিষয় নহে।

ত্যাগ করিতেই হইবে এবং ত্যাগের দ্বারাই আমরা লাভ করি। ইহা জগতের মর্মগত সত্য। ফুলকে পাপড়ি খসাইতেই হয়, তবে ফল ধরে; ফলকে ঝরিয়া পড়িতেই হয়, তবে গাছ হয়। গর্ভের শিশুকে গর্ভাশ্রয় ছাড়িয়া পৃথিবীতে ভূমিষ্ঠ হইতে হয়। ভূমিষ্ঠ হইয়া শরীরে মনে সে নিজের মধ্যে বাড়িতে থাকে, তখন তাহার আর-কোনো কর্তব্য নাই। তাহার ইন্দ্রিয়শক্তি তাহার বুদ্ধি-বিদ্যা বাড়ার একটা সীমায় আসিলে, তাহাকে আবার নিজের মধ্য হইতে সংসারের মধ্যে ভূমিষ্ঠ হইতে হয়। এইখানে পুষ্ট শরীর শিক্ষিত মন ও সবল প্রবৃত্তি লইয়া সে পরিবার ও প্রতিবেশীদের মাঝখানে নিবিষ্ট হয়। ইহাই তাহার দ্বিতীয় শরীর, তাহার বৃহৎ কলেবর। তাহার পরে শরীর জীর্ণ ও প্রবৃত্তি ক্ষীণ হইয়া আসে, তখন সে আপনার বিচিত্র অভিজ্ঞতা ও অনাসক্ত প্রবীণতা লইয়া আপন ক্ষুদ্র সংসার হইতে বৃহত্তর সংসারে জন্মগ্রহণ করে; তাহার শিক্ষা জ্ঞান ও বুদ্ধি এক দিকে সাধারণ মানবের কাজে লাগিতে থাকে, অন্য দিকে সে অবসন্নপ্রায় মানবজীবনের সঙ্গে

নিত্যজীবনের সম্বন্ধ স্থাপন করিতে থাকে। তাহার পরে পৃথিবীর নাড়ীর বন্ধন সম্পূর্ণ ক্ষয় করিয়া দিয়া সে অতি সহজে মৃত্যুর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়ায় ও অনন্তলোকের মধ্যে জন্মগ্রহণ করে। এইরূপে সে শরীর হইতে সমাজে, সমাজ হইতে নিখিলে, নিখিল হইতে অধ্যাত্মক্ষেত্রে মানবজন্মকে শেষ পরিণতি দান করে।

প্রাচীন সংহিতাকারগণ আমাদের শিক্ষাকে, আমাদের গার্হস্থ্যকে অনন্তের মধ্যে সেই শেষ পরিণামের অভিমুখ করিতে চাহিয়াছিলেন। সমস্ত জীবনকে জীবনের পরিণামের অনুকূল করিতে চাহিয়াছিলেন। সেইজন্য আমাদের শিক্ষা কেবল বিষয়শিক্ষা, কেবল গ্রন্থশিক্ষা ছিল না; তাহা ছিল ব্রহ্মচর্য। নিয়ম-সংযমের অভ্যাস-দ্বারা এমন একটি বললাভ হইত যাহাতে ভোগ এবং ত্যাগ উভয়ই আমাদের পক্ষে স্বাভাবিক হইত। সমস্ত জীবনই নাকি ধর্মাচরণ, কারণ, তাহার লক্ষ্য ব্রহ্মের মধ্যে মুক্তি—সেইজন্য সেই জীবন বহন-করিবার শিক্ষাও ধর্মব্রত ছিল। এই ব্রত শ্রদ্ধার সহিত, ভক্তির সহিত, নিষ্ঠার সহিত, অতি সাবধানে যাপন করিতে হইত। মানুষের পক্ষে যাহা একমাত্র পরম সত্য সেই সত্যকে সম্মুখে রাখিয়া বালক তাহার জীবনের পথে প্রবেশ করিবার জন্য প্রস্তুত হইত।

বাহিরের শক্তির সঙ্গে ভিতরের শক্তির সামঞ্জস্যক্রিয়া প্রাণের লক্ষণ বলিয়া কথিত হইয়াছে। গাছপালায় এই সামঞ্জস্যের কাজ যন্ত্রের মতো ঘটে। আলোকের, বাতাসের, খাদ্যরসের উত্তেজনার প্রতিক্রিয়ার দ্বারা তাহার প্রাণের কাজ চলিতে থাকে। আমাদের দেহেও সেইরূপ ঘটে। জিহ্বায় খাদ্যসংযোগের উত্তেজনায় আপনি রস ক্ষরিয়া আসে, পাকযন্ত্রেও খাদ্যের সংস্পর্শে সহজেই পাকরসের উদ্রেক হয়। আমাদের শরীরের প্রাণক্রিয়া বাহিরের বিশ্বশক্তির সহজ প্রতিক্রিয়া।

কিন্তু আমাদের আবার মন বলিয়া, ইচ্ছা বলিয়া, আর-একটা পদার্থ যোগ হওয়াতে প্রাণের উপর আর-একটা উপসর্গ বাড়িয়া গেছে। খাইবার অন্যান্য উত্তেজনার সঙ্গে খাইবার আনন্দ একটা আসিয়াছে। তাহাতে করিয়া আহারের কাজটা শুধু আমাদের আবশ্যকের কাজ নহে, আমাদের খুশির কাজ হইয়া উঠিয়াছে। ইহাতে প্রকৃতির কাজের সঙ্গে আমাদের একটা মানসিক সম্বন্ধ বাড়িয়া গেছে। দেহের সঙ্গে দেহের বাহিরের শক্তির একটা সামঞ্জস্য প্রাণের মধ্যে ঘটিতেছে, আবার তাহার সঙ্গে ইচ্ছাশক্তির একটা সামঞ্জস্য মনের মধ্যে ঘটিতেছে। ইহাতে মানুষের প্রকৃতিযন্ত্রের সাধনা বড়ো শক্ত হইয়া উঠিয়াছে। বিশ্বশক্তির সঙ্গে প্রাণশক্তির সুর অনেক দিন হইতে বাঁধিয়া চুকিয়া গেছে, সেজন্য বড়ো ভাবিতে হয় না, কিন্তু ইচ্ছাশক্তির সুর বাঁধা লইয়া আমাদিগকে অহরহ ঝঞ্ঝাট পোহাইতে হয়। খাদ্য সম্বন্ধে প্রাণশক্তির আবশ্যক হয়তো ফুরাইল, কিন্তু আমাদের ইচ্ছার তাগিদ শেষ হইল না; শরীরের আবশ্যকসাধনে সে যে আনন্দ পাইল সেই আনন্দকে সে আবশ্যকের বাহিরেও টানিয়া লইয়া যাইতে চেষ্টা করিল—সে নানা কৃত্রিম উপায়ে বিমুখ রসনাকে রসসিক্ত করিতে ও শ্রান্ত পাকযন্ত্রকে উত্তেজিত করিতে লাগিল; এমনি করিয়া বাহিরের সহিত প্রাণের এবং প্রাণের সহিত মনের একতানটা নষ্ট করিয়া সে নানা অনাবশ্যক চেষ্টা, অনাবশ্যক উপকরণ ও শাখাপল্লবায়িত দুঃখের সৃষ্টি করিয়া চলিল। আমাদের যাহা প্রয়োজন তাহার সংগ্রহই যথেষ্ট দুরূহ, তাহার উপরে ভূরি-পরিমাণ অনাবশ্যকের বোঝা চাপিয়া সেই আবশ্যকের আয়োজনও কষ্টকর হইয়া উঠিয়াছে। শুধু তাহাই নয়—ইচ্ছা যখন একবার স্বভাবের সীমা লঙ্ঘন করে তখন কোথাও

তাহার আর থামিবার কারণ থাকে না, তখন সে 'হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্ধতে', কেবল সে চাই-চাই করিয়া বাড়িয়াই চলে। পৃথিবীতে নিজের এবং পরের পনেরো-আনা দুঃখের কারণ ইহাই। অথচ এই ইচ্ছাশক্তিকেই বিশ্বশক্তির সঙ্গে সামঞ্জস্যে আনাই আমাদের পরমানন্দের হেতু। এইজন্য ইচ্ছাকে নষ্ট করা আমাদের সাধনার বিষয় নহে, ইচ্ছাকে বিশ্ব-ইচ্ছার সঙ্গে এক সুরে বাঁধাই আমাদের সকল শিক্ষার চরম লক্ষ্য। গোড়ায় তাহা যদি না করি তবে আমাদের চঞ্চল মনে জ্ঞান লক্ষ্যভ্রষ্ট, প্রেম কলুষিত এবং কর্ম বৃথা পরিভ্রান্ত হইতে থাকে। জ্ঞান প্রেম ও কর্ম বিশ্বের সহিত সহজমিলনে মিলিত না হইয়া আমাদের আত্মম্ভরী ইচ্ছার কৃত্রিম সৃষ্টি-সকলের মধ্যে মরীচিকা-অনুসরণে নিযুক্ত হইতে থাকে।

এইজন্য আমাদের আয়ুর প্রথম ভাগে ব্রহ্মচর্যপালন-দ্বারা ইচ্ছাকে তাহার যথাবিহিত সীমার মধ্যে সহজে সঞ্চরণ করিবার অভ্যাস করাইতে হইবে। ইহাতেই আমাদের বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে মানসপ্রকৃতির সুর বাঁধা হইয়া আসিবে। তাহার পরে সেই সুরে তোমার সাধ্যমত ও ইচ্ছামত যে-কোনো রাগিণী বাজাও-না কেন, সত্যের সুরকে, মঙ্গলের সুরকে, আনন্দের সুরকে আঘাত করিবে না।

এইরূপে শিক্ষার কাল যাপন করিয়া সংসারধর্মে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। মনু বলিয়াছেন—

> ন তথৈতানি শক্যন্তে সংনিয়ন্তুমসেবয়া।
> বিষয়েষু প্রজুষ্টানি যথা জ্ঞানেন নিত্যশঃ।

বিষয়ের সেবা না করিয়া সেরূপ সংযমন করা যায় না, বিষয়ে নিযুক্ত থাকিয়া জ্ঞানের দ্বারা নিত্যশঃ যেমন করিয়া করা যায়।

অর্থাৎ বিষয়ে নিযুক্ত না হইলে জ্ঞান পূর্ণতালাভ করে না, এবং যে সংযম জ্ঞানের দ্বারা লব্ধ নহে তাহা পূর্ণ সংযম নহে—তাহা জড় অভ্যাস বা অনভিজ্ঞতার অন্তরাল মাত্র; তাহা প্রকৃতির মূলগত নহে, তাহা বাহ্যিক।

সংযমের সঙ্গে প্রবৃত্তিকে চালনা করিবার শিক্ষা ও সাধনা থাকিলেই কর্ম, বিশেষত মঙ্গলকর্ম করা সহজ ও সুখসাধ্য হয়। সেই অবস্থাতেই গৃহাশ্রম জগতের কল্যাণের আধার হইয়া উঠে। সেই অবস্থাতেই গৃহাশ্রম মানুষের মুক্তিপথে অগ্রসর হইবার বাধা নহে, সহায় হয়। সেই অবস্থাতেই গৃহস্থ যেকোনো কর্ম করেন তাহা সহজে ব্রহ্মকে সমর্পণ করিয়া আনন্দিত হইতে পারেন। গৃহের সমস্ত কর্ম যখন মঙ্গলকর্ম হয়, তাহা যখন ধর্মকর্ম হইয়া উঠে, তখন সেই কর্মের বন্ধন মানুষকে বাঁধিয়া একেবারে জর্জরীভূত করিয়া দেয় না। যথাসময়ে সে বন্ধন অনায়াসে স্খলিত হইয়া যায়, যথাসময়ে সে কর্মের একটা স্বাভাবিক পরিসমাপ্তি আপনি আসে।

আয়ুর দ্বিতীয় ভাগকে এইরূপে সংসারধর্মে নিযুক্ত করিয়া শরীরের তেজ যখন হ্রাস হইতে থাকিবে তখন এ কথা মনে রাখিতে হইবে যে, এই ক্ষেত্রের কাজ শেষ হইল সেই খবরটা আসিল। শেষ হইল খবর পাইয়া চাকরি-বরখাস্ত হতভাগার মতো নিজেকে দীন বলিয়া দেখিতে হইবে না। আমার সমস্ত গেল ইহাকেই অনুশোচনার বিষয় করিলে চলিবে না; এখন আরো বড়ো পরিধি-বিশিষ্ট ক্ষেত্রের মধ্যে প্রবেশ করিতে হইবে বলিয়া সেই দিকে আশার সহিত, বলের সহিত মুখ ফিরাইতে হইবে। যাহা গায়ের জোরের, যাহা

ইন্দ্রিয়শক্তির, যাহা প্রবৃত্তিসকলের ক্ষেত্র ছিল, তাহা এবারে পিছনে পড়িয়া রহিল—সেখানে যাহা-কিছু ফসল জন্মাইয়াছি তাহা কাটিয়া, মাড়াই করিয়া, গোলা-বোঝাই করিয়া দিয়া এ মজুরি শেষ করিয়া চলিলাম; এবার সন্ধ্যা আসিতেছে, আপিসের কুঠরি ছাড়িয়া বড়ো রাস্তা ধরিতে হইবে। ঘরে না পৌঁছিলে তো চরম শান্তি নাই। যেখানে যত-কিছু সহিলাম, কত-কিছু খাটিলাম, সে কিসের জন্য ? ঘরের জন্য তো ? সেই ঘরই ভূমা, সেই ঘরই আনন্দ—যে আনন্দ হইতে আমরা আসিয়াছি, যে আনন্দে আমরা যাইব। তাহা যদি না হয় তবে, ততঃ কিম্! ততঃ কিম্! ততঃ কিম্!

তাই গৃহাশ্রমের কাজ সারিয়া, সন্তানের হাতে সংসারের ভার সমর্পণ করিয়া, এবার বড়ো রাস্তায় বাহির হইবার সময়। এবার বাহিরের খোলা বাতাসে বুক ভরিয়া লইতে হইবে; খোলা আকাশের আলোতে দৃষ্টিকে নিমগ্ন এবং শরীরের সমস্ত রোমকূপকে পুলকিত করিতে হইবে। এবার এক দিক্‌কার পালা সমাধা হইল। আঁতুড়ঘরে নাড়ী কাটা পড়িল, এখন অন্য জগতে স্বাধীন সঞ্চরণের অধিকার লাভ করিতে হইবে।

শিশু গর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইলেও সম্পূর্ণ স্বাধীন হইবার পূর্বে কিছুকাল মাতার কাছে কাছেই থাকে। বিযুক্ত হইয়াও যুক্ত থাকে, সম্পূর্ণ বিযুক্ত হইবার জন্য প্রস্তুত হয়। বানপ্রস্থ-আশ্রমও সেইরূপ। সংসারের গর্ভ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়াও বাহিরের দিক হইতে সংসারের সঙ্গে সেই তৃতীয়-আশ্রম-ধারীর যোগ থাকে। বাহিরের দিক হইতে সে সংসারকে আপনার জীবনের সঞ্চিত জ্ঞানের ফল দান করে এবং সংসার হইতে সহায়তা গ্রহণ করে। এই দানগ্রহণ সংসারীর মতো একান্তভাবে করে না, মুক্তভাবে করে।

অবশেষে আয়ুর চতুর্থ ভাগে এমন দিন আসে যখন এই বন্ধনটুকুও ফেলিয়া একাকী সেই পরম একের সম্মুখীন হইতে হয়। মঙ্গলকর্মের দ্বারা পৃথিবীর সমস্ত সম্বন্ধকে পূর্ণ পরিণতি দান করিয়া আনন্দস্বরূপের সহিত চিরন্তন সম্বন্ধকে লাভ করিবার জন্য প্রস্তুত হইতে হয়। পতিব্রতা স্ত্রী যেমন সমস্তদিন সংসারের নানা লোকের সহিত নানা সম্বন্ধ পালন করিয়া, নানা কর্ম সমাধা করিয়া, স্বামীরই কর্ম করেন, স্বামীরই সম্বন্ধ যথার্থভাবে স্বীকার করেন—অবশেষে দিন অবসান হইলে একে একে কাজের জিনিসগুলি তুলিয়া রাখিয়া, কাজের কাপড় ছাড়িয়া, গা ধুইয়া, কর্মস্থানের চিহ্ন মুছিয়া, নির্মলমিলনবেশে একাকিনী স্বামীর সহিত একমাত্র পূর্ণসম্বন্ধের অধিকার গ্রহণ করিবার জন্য নির্জন গৃহে প্রবেশ করেন—সমাপ্তকর্ম পুরুষ সেইরূপ একে একে কাজের জীবনের সমস্ত খণ্ডতা ঘুচাইয়া দিয়া, অসীমের সহিত সম্মিলনের জন্য প্রস্তুত হইয়া, অবশেষে একাকী সেই একের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হন এবং সম্পূর্ণ জীবনকে এই পরিপূর্ণ সমাপ্তির মধ্যে অখণ্ড সার্থকতা দান করেন। এইরূপেই মানবজীবন আদ্যোপান্ত সত্য হয়, জীবন মৃত্যুকে লঙ্ঘন করিতে বৃথা চেষ্টা করে না ও মৃত্যু শত্রুপক্ষের ন্যায় জীবনকে আক্রমণ করিয়া বলপূর্বক পরাস্ত করে না। জীবনকে আর আমরা যেমন করিয়াই খণ্ডবিখণ্ড বিক্ষিপ্ত করি, অন্য যে-কোনো অভিপ্রায়কেই আমরা চরম বলিয়া জ্ঞান করি এবং তাহাকে আমরা দেশ-উদ্ধার লোকহিত বা যে-কোনো বড়ো নাম দিই-না কেন, তাহার মধ্যে সম্পূর্ণতা থাকে না—তাহা আমাদিগকে মাঝপথে অকস্মাৎ পরিত্যাগ করে, তাহার মধ্য হইতে এই প্রশ্নই কেবলই বাজিতে থাকে: ততঃ কিম্! ততঃ কিম্! ততঃ কিম্! আর, ভারতবর্ষ চারি আশ্রমের মধ্য দিয়া, মানুষের জীবনকে বাল্য যৌবন প্রৌঢ়বয়স

ও বার্ধক্যের স্বাভাবিক বিভাগের অনুগত করিয়া, অধ্যায়ে অধ্যায়ে যেরূপ একমাত্র সমাপ্তির দিকে লইয়া গিয়াছেন, তাহাতে বিশাল বিশ্বসংগীতের সহিত মানুষের জীবন অবিরোধে সম্মিলিত হয়। বিদ্রোহ-বিরোধ থাকে না; অশিক্ষিত প্রবৃত্তি আপনার উপযুক্ত স্থানকাল বিস্মৃত হইয়া যে-সকল গুরুতর অশান্তির সৃষ্টি করিতে থাকে, তাহারই মধ্যে বিভ্রান্ত ও নিখিলের সহিত সহজ সত্যসম্বন্ধ-ভ্রষ্ট হইয়া পৃথিবীর মধ্যে উৎপাতস্বরূপ হইয়া উঠিতে হয় না।

আমি জানি, এইখানে একটা প্রশ্ন উদয় হইবে যে, একটা দেশের সকল লোককেই কি এই আদর্শে গড়িয়া তোলা যায়? তাহার উত্তরে আমি এই কথা বলি যে, যখন ঘরে আলো জ্বলে তখন কি পিলসুজ হইতে আরম্ভ করিয়া পলিতা পর্যন্ত প্রদীপের সমস্তটাই জ্বলে? জীবনযাপন সম্বন্ধে, ধর্ম সম্বন্ধে, যে দেশের যে-কোনো আদর্শই থাক্-না কেন, তাহা সমস্ত দেশের মুখাগ্রভাগেই উজ্জ্বলরূপে প্রকাশ পায়। কিন্তু পলিতার ডগাটা-মাত্র জ্বলাকেই সমস্ত দীপের জ্বলা বলে। তেমনি দেশের এক অংশ-মাত্র যে ভাবকে পূর্ণরূপে আয়ত্ত করেন সমস্ত দেশেরই তাহা লাভ। বস্তুত সেই অংশটুকু-মাত্রকে পূর্ণতা দিবার জন্য সমস্ত দেশকে প্রস্তুত হইতে হয়, সমস্ত সমাজকে অনুকূল হইতে হয়—ডালের আগায় ফল ধরাইতে গাছের শিকড় এবং গুঁড়িকে সচেষ্ট থাকিতে হয়। ভারতবর্ষে যদি এমন দিন আসে যে, আমাদের দেশের মান্য শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিরা সর্বোচ্চ সত্য এবং সর্বোচ্চ মঙ্গলকেই আর-সমস্ত খণ্ড প্রয়োজনের ঊর্ধ্বে তুলিয়া চিরজীবনের সাধনার সামগ্রী করিয়া রাখেন, তবে তাঁহাদের সাধনা ও সার্থকতা সমস্ত দেশের মধ্যে একটা বিশেষ গতি একটা বিশেষ শক্তি সঞ্চার করিবেই। একদিন ভারতবর্ষে ঋষিরা যখন ব্রহ্মের সাধনায় রত ছিলেন তখন সমস্ত আর্যসমাজের মধ্যেই—রাজকার্যে, যুদ্ধে, বাণিজ্যে, সাহিত্যে, শিল্পে, ধর্মার্চনায় —সর্বত্রই সেই ব্রহ্মের সুর বাজিয়াছিল; কর্মের মধ্যে মোক্ষের ভাব বিরাজ করিয়াছিল; ভারতবর্ষে সমস্ত সমাজস্থিতি মৈত্রেয়ীর ন্যায় বলিতেছিল; যেনাহং নামৃতা স্যাং কিমহং তেন কুর্যাম্! সে বাণী চিরদিনের মতোই নীরব হইয়া গেছে এমনি যদি আমাদের ধারণা হয়, তবে আমাদের এই মৃত সমাজকে এত উপকরণ জোগাইয়া বৃথা সেবা করিয়া মরিতেছি কেন? তবে তো এই মুহূর্তেই আপাদমস্তকে পরজাতির অনুকরণ করাই আমাদের পক্ষে শ্রেয়; কারণ, পরিণামহীন ব্যর্থতার বোঝা অকারণে বহিয়া পড়িয়া থাকার চেয়ে সজীব ভাবে কিছু-একটা হইয়া উঠার চেষ্টা করা ভালো। কিন্তু, এ কথা কখনোই মানিব না। আমাদের প্রকৃতি মানিবে না। যতই দুর্গতি হউক, আমাদের অন্তরতম স্থান এমনভাবে তৈরি হইয়া আছে যে, কোনো অসম্পূর্ণ অধিকারকে আমাদের মন পরম লাভ বলিয়া সায় দিতে পারিবে না। এখনো যদি কোনো সাধক তাঁহার জীবনের যন্ত্রে সংসারের সকল চাওয়া, সকল পাওয়ার চেয়ে উচ্চতম সপ্তকে একটা বড়ো সুর বাজাইয়া তোলেন, সেটা আমাদের হৃদয়ের তারে তখনই প্রতিঝংকৃত হইতে থাকে—তাহাকে আমরা ঠেকাইতে পারি না। প্রতাপ এবং ঐশ্বর্যের প্রতিযোগিতাকে আমরা যত বড়ো কণ্ঠে যত বড়ো করিয়াই প্রচার করিবার চেষ্টা করিতেছি, আমরা সমস্ত মনপ্রাণ দিয়া তাহা গ্রহণ করিতে পারিতেছি না। তাহা আমাদের মনের বহির্দ্বারে একটা গোলমাল পাকাইয়া তুলিয়াছে মাত্র। আমাদের সমাজে আজকাল বিবাহ প্রভৃতি ক্রিয়াকর্মে দেশী রশুনচৌকির সংগে সংগে একই কালে গড়ের বাদ্য বাজানো হয় দেখিতে

পাই; ইহাতে সংগীত ছিন্নবিছিন্ন হইয়া কেবল একটা সুরের গণ্ডগোল হইতে থাকে। এই বিষম গণ্ডগোলের ঝঞ্ঝনার মধ্যে মনোযোগ দিলেই বুঝা যায় যে, রশুনচৌকির বৈরাগ্যগাম্ভীর্য-মিশ্রিত করুণ শাহানাই আমাদের উৎসবের চিরন্তন হৃদয়ের মধ্য হইতে বাজিতেছে; আর গড়ের বাদ্য তাহার প্রচণ্ড কাংস্যকণ্ঠ ও স্ফীতোদর জয়ঢাকটা লইয়া কেবলমাত্র ধনের অহংকার, কেবলমাত্র ফ্যাশানের আড়ম্বরকে অভ্রভেদী করিয়া সমস্ত গভীরতর অন্তরতর সুরকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিতেছে। তাহা আমাদের মঙ্গল-অনুষ্ঠানের মধ্যে একটা গর্বপরিপূর্ণ অসামঞ্জস্যকেই অত্যুৎকট করিয়া তুলিতেছে, তাহা আমাদের উৎসবের চিরদিনের বেদনার সঙ্গে আপনার সুর মিলাইতেছে না। আমাদের জীবনের সকল দিকেই এমনিতরো একটা খাপছাড়া জোড়াতাড়া ব্যাপার ঘটিতেছে। য়ুরোপীয় সভ্যতার প্রতাপ ও ঐশ্বর্যের আয়োজন আমাদের দৃষ্টিকে মুগ্ধ করিয়াছে; তাহার অসংগত ও ক্ষীণ অনুকরণের দ্বারা আমরা আমাদের আড়ম্বর-আস্ফালনের প্রবৃত্তিকে খুব দৌড় করাইতেছি; আমাদের দেউড়ির কাছে তাহার বড়ো জয়ঢাকটা কাঠি পিটাইয়া খুবই শব্দ করিতেছে; কিন্তু যে আমাদের অন্তঃপুরের খবর রাখে সে জানে, সেখানকার মঙ্গলশঙ্খ এই বাহ্যাড়ম্বরের ধমকে নীরব হইয়া যায় নাই, ভাড়া-করা গড়ের বাদ্য এক সময় যখন গড়ের মধ্যে ফিরিয়া যায় তখনো ঘরের এই শঙ্খ আকাশে উৎসবের মঙ্গলধ্বনি ঘোষণা করে। আমরা ইংরেজের রাষ্ট্রনীতি সমাজনীতি বাণিজ্যনীতির উপযোগিতা খুব করিয়া স্বীকার ও প্রচার করিতেছি, কিন্তু তাহাতে কোনোমতেই আমাদের সমস্ত হৃদয়কে পূর্ণভাবে আকর্ষণ করিতেছে না। আমরা সকলের চেয়ে বড়ো সুর যাহা শুনিয়াছি এ সুর যে তাহাকে আঘাত করিতেছে, আমাদের অন্তরাত্মা এক জায়গায় ইহাকে কেবলই অস্বীকার করিতেছে।

আমরা কোনোদিন এমনতরো হাটের মানুষ ছিলাম না। আজ আমরা হাটের মধ্যে বাহির হইয়া ঠেলাঠেলি ও চীৎকার করিতেছি—ইতর হইয়া উঠিয়াছি, কলহে মাতিয়াছি, পদ ও পদবী লইয়া কাড়াকাড়ি করিতেছি, বড়ো অক্ষরের ও উচ্চকণ্ঠের বিজ্ঞাপনের দ্বারা নিজেকে আর-পাঁচজনের চেয়ে অগ্রসর করিয়া ঘোষণা করিবার প্রাণপণ চেষ্টা চলিতেছে। অথচ ইহা একটা নকল। ইহার মধ্যে সত্য অতি অল্পই আছে। ইহার মধ্যে শান্তি নাই, গাম্ভীর্য নাই, শিষ্টতাশীলতার সংযম নাই, শ্রী নাই। এই নকলের যুগ আসিবার পূর্বে আমাদের মধ্যে এমন একটা স্বাভাবিক মর্যাদা ছিল যে, দারিদ্র্যেও আমাদিগকে মানাইত, মোটা ভাত মোটা কাপড়ে আমাদের গৌরব নষ্ট করিতে পারিত না। কর্ণ যেমন তাঁহার কবচকুণ্ডল লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তখনকার দিনে আমরা সেইরূপ একটা স্বাভাবিক আভিজাত্যের কবচ লইয়াই জন্মিতাম। সেই কবচেই আমাদিগকে বহু দিনের অধীনতা ও দুঃখ-দারিদ্র্যের মধ্যেও বাঁচাইয়া রাখিয়াছে, আমাদের সম্মান নষ্ট করিতে পারে নাই। কারণ, আমাদের সে সম্মান বাহিরের আহরণ-করা ধন ছিল না, সে আমাদের অন্তরের সামগ্রী ছিল। সেই সহজাত কবচখানি আমাদের কাছ হইতে কে ভুলাইয়া লইল! ইহাতেই আমাদের আত্মরক্ষার উপায় চলিয়া গেছে। এখন আমরা বিশ্বের মধ্যে লজ্জিত। এখন আমাদের বেশে-ভূষায় আয়োজনে-উপকরণে একটু কোথাও কিছু খাটো পড়িয়া গেলেই আমরা আর মাথা তুলিতে পারি না। সম্মান এখন বাহিরের জিনিস হইয়া পড়িয়াছে; তাই উপাধির জন্য খ্যাতির জন্য আমরা বাহিরের দিকে

ছুটিয়াছি, বাহিরের আড়ম্বরকে কেবলই বাড়াইয়া তুলিতেছি এবং কোথাও একটু-কিছু ছিদ্র বাহির হইবার উপক্রম হইলেই তাহাকে মিথ্যার তালি দিয়া ঢাকা দিবার চেষ্টা করিতেছি। কিন্তু, ইহার অন্ত কোথায়? যে ভদ্রতা আমাদের অন্তরের সামগ্রী ছিল তাহাকে আজ যদি বাহিরে টানিয়া জুতার দোকান, কাপড়ের দোকান, ঘোড়ার হাট এবং গাড়ির কারখানায় ঘোরাইতে আরম্ভ করি, তবে কোথায় লইয়া গিয়া তাহাকে বলিব 'বস্—হইয়াছে—এখন বিশ্রাম করো'? আমরা সন্তোষকেই সুখের পূর্ণতা বলিয়া জানিতাম; কারণ, সন্তোষ অন্তরের সামগ্রী—এখন সেই সুখকে যদি হাটে-হাটে ঘাটে-ঘাটে খুঁজিয়া ফিরিতে হয় তবে কবে বলিতে পারিব সুখ পাইয়াছি? এখন আমাদের ভদ্রতাকে সস্তা কাপড়ে অপমান করে, বিলাতি গৃহশয্যার অভাবে উপহাস করে, চেকবহির অঙ্কপাতের ন্যূনতায় তাহার প্রতি কলঙ্কপাত করে—এমন ভদ্রতাকে মজুরের মতো বহন করিয়া গৌরববোধ করা যে কত লজ্জাকর তাহাই আমরা ভুলিতে বসিয়াছি। আর, যে-সকল পরিণামহীন উত্তেজনা-উন্মাদনাকে আমরা সুখ বলিয়া বরণ করিয়া লইয়াছি, তাহার দ্বারা আমাদের মতো বহির্বিষয়ে-পরাধীন জাতিকে অন্তঃকরণেও দাসানুদাস করিয়াছে।

...একবার কেহ যদি আমাদের মধ্যে দাঁড়াইয়া যথার্থ অধিকারের সহিত এ কথা বলেন যে, 'অসম্পূর্ণ প্রয়াসে, উন্মত্ত প্রতিযোগিতায়, অনিত্য ঐশ্বর্যে আমাদের শ্রেয় নহে—জীবনের একটি পরিপূর্ণ পরিণাম আছে—সকল কর্ম সকল সাধনার একটি পরিপূর্ণ পরিসমাপ্তি আছে—এবং সেই পরিণাম সেই পরিসমাপ্তিই আমাদের প্রত্যেকের একমাত্র চরম চরিতার্থতা, তাহার নিকটে আর-সমস্তই তুচ্ছ'—তবে আজও এই হাট-বাজারের কোলাহলের মধ্যেও আমাদের সমস্ত হৃদয় সায় দিয়া উঠে; বলে, 'সত্য, ইহাই সত্য, ইহার চেয়ে সত্য আর কিছুই নাই।' তখন, ইস্কুলে যে-সকল ইতিহাসের পড়া মুখস্থ করিয়াছিলাম—কাড়াকাড়ি-মারামারির কথা, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতির ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অভিমানকেই সর্বোচ্চ সিংহাসনে নররক্ত দিয়া অভিষেক করিবার কথা—অত্যন্ত ক্ষীণ-খর্ব হইয়া আসে। তখন লালকুর্তি-পরা অক্ষৌহিণী সেনার দম্ভ, উদ্যত-মাস্তুল বৃহদাকার যুদ্ধ-জাহাজের ঔদ্ধত্য আমাদের চিত্তকে আর অভিভূত করে না; আমাদের মর্মস্থলে ভারতবর্ষের বহু যুগের একটি সজল-জলদগম্ভীর ওঙ্কারধ্বনি নিত্যজীবনের আদিসুরটিকে জগতের সমস্ত কোলাহলের ঊর্ধ্বে জাগাইয়া তুলে। ইহাকে আমরা কোনোমতেই অস্বীকার করিতে পারিব না; যদি করি তবে ইহার পরিবর্তে আমরা এমন কিছুই পাইব না যাহার দ্বারা আমরা মাথা তুলিয়া দাঁড়াইব, যাহার দ্বারা আমরা আপনাকে রক্ষা করিতে পারিব। আমরা কেবলই তরবারির ছটা, বাণিজ্যের ঘটা, কল-কারখানার রক্তচক্ষু এবং স্বর্গের প্রতিস্পর্ধী যে ঐশ্বর্য উত্তরোত্তর আপনার উপকরণস্তূপকে উচ্চে তুলিয়া আকাশের সীমা মাপিবার ভাণ করিতেছে তাহার উৎকট মূর্তি দেখিয়া সমস্ত মনে প্রাণে কেবলই পরাস্ত পরাভূত হইতে থাকিব; কেবলই সংকুচিত শঙ্কিত হইয়া পৃথিবীর রাজপথে ভিক্ষাসম্বল দীনহীনের মতো ফিরিয়া বেড়াইব।

অথচ এ কথাও আমি কোনোমতেই স্বীকার করি না যে, আমরা যাহাকে শ্রেয় বলিতেছি তাহা কেবল আমাদের পক্ষেই শ্রেয়। আমরা অক্ষম বলিয়া ধর্মকে দায়ে পড়িয়া

বরণ করিতে হইবে, তাহাকে দারিদ্র্য গোপন করিবার একটা কৌশলস্বরূপে গ্রহণ করিতে হইবে, এ কথা কখনোই সত্য নহে। প্রাচীন সংহিতাকার মানবজীবনের যে আদর্শ আমাদের সম্মুখে ধরিয়াছেন তাহা কেবলমাত্র কোনো-একটি বিশেষ জাতির বিশেষ অবস্থার পক্ষেই সত্য, তাহা নহে। ইহাই একমাত্র সত্য আদর্শ সুতরাং ইহাই সকল মানুষেরই পক্ষে মঙ্গলের হেতু। প্রথম বয়সে শ্রদ্ধার দ্বারা, সংযমের দ্বারা, ব্রহ্মচর্যের দ্বারা প্রস্তুত হইয়া দ্বিতীয় বয়সে সংসার-আশ্রমে মঙ্গলকর্মে আত্মাকে পরিপুষ্ট করিতে হইবে—তৃতীয় বয়সে উদারতর ক্ষেত্রে একে একে সমস্ত বন্ধন শিথিল করিয়া অবশেষে আনন্দের সহিত মৃত্যুকে মোক্ষের নামান্তররূপে গ্রহণ করিবে—মানুষের জীবনকে এমন করিয়া চালাইলেই তবে তাহার আদ্যন্তসংগত পূর্ণ তাৎপর্য পাওয়া যায়। তবেই সমুদ্র হইতে যে মেঘ উৎপন্ন হইয়া পর্বতের রহস্যগূঢ় গুহা হইতে নদীরূপে বাহির হইল, সমস্ত যাত্রাশেষে আবার তাহাকে সেই সমুদ্রের মধ্যেই পূর্ণতারূপে সম্মিলিত হইতে দেখিয়া তৃপ্তিলাভ করি। মাঝপথে, যেখানেই হউক, তাহার অকস্মাৎ অবসান অসংগত, অসমাপ্ত। এ কথা যদি অন্তরের সঙ্গে বুঝিতে পারি তবে বলিতেই হইবে, এই সত্যকেই উপলব্ধি করিবার জন্য সকল জাতিকেই নানা পথ দিয়া নানা আঘাতে ঠেকিয়া বারংবার চেষ্টা করিতেই হইবে। ইহার কাছে বিলাসীর উপকরণ, নেশনের প্রতাপ, রাজার ঐশ্বর্য, বণিকের সমৃদ্ধি, সমস্তই গৌণ। মানুষের আত্মাকে জয়ী হইতে হইবে, মানুষের আত্মাকে মুক্ত হইতে হইবে, তবেই মানুষের এত কালের সমস্ত চেষ্টা সার্থক হইবে—নহিলে, ততঃ কিম্! ততঃ কিম্! ততঃ কিম্!

ধর্ম, র/১২/৭৫-৯২

টীকা ঃ

গ্যয়েটে—গ্যেটে (Goethe) জার্মান কবি। বহুমুখী প্রতিভা, অনেক কাব্য, নাটকাদি রচনা করেছেন। পাশ্চাত্য সাহিত্যে অত্যন্ত প্রভাবশালী। জন্ম—১৭৪৯, মৃত্যু—১৮৩২

ফাউস্ট—গ্যয়টে রচিত সুবিখ্যাত কাব্যনাট্য। শয়তানের কাছে ফাউস্টের নিজের আত্মা বিক্রয় করার কিংবদন্তীমূলক কাহিনী নিয়ে রচিত।

২৯। নমস্কার

৭ ভাদ্র ১৩১৪, (১৯০৭)

...তারপরে তাঁরে নমি যিনি ক্রীড়াচ্ছলে
গড়েন নূতন সৃষ্টি প্রলয়-অনলে,
মৃত্যু হতে দেন প্রাণ, বিপদের বুকে
সম্পদেরে করেন লালন হাসিমুখে
ভক্তেরে পাঠায়ে দেন কণ্টককান্তারে
রিক্তহস্তে শত্রুমাঝে রাত্রি-অন্ধকারে;

যিনি নানা কণ্ঠে কন, নানা ইতিহাসে,
সকল মহৎ কর্মে, পরম প্রয়াসে.
সকল চরম লাভে, 'দুঃখ কিছু নয়—
ক্ষত মিথ্যা, ক্ষতি মিথ্যা, মিথ্যা সর্বভয়।
কোথা মিথ্যা রাজা, কোথা রাজদন্ড তার!
কোথা মৃত্যু, অন্যায়ের কোথা অত্যাচার!
ওরে ভীরু, ওরে মূঢ়, তোলো তোলো শির।
আমি আছি, তুমি আছ সত্য আছে স্থির।'

পরিশিষ্ট, র/৩/৯২৪-২৬

টীকা :

অরবিন্দ ঘোষ—এ যুগের বিশিষ্ট বাঙালি মনীষী। রাজনৈতিক নেতা, যোগী ও দার্শনিক। ১৯০৮ সালে আলিপুর বোমার মামলায় বৈপ্লবিক ক্রিয়াকলাপের সংগে যুক্ত এই সন্দেহে ধৃত হন। রাজদ্রোহিতার অপরাধ প্রমাণিত না হওয়ায় মুক্তি পান। বোমার মামলায় মুক্ত হবার পর ধর্মপ্রচারে ব্রতী হন এবং পন্ডিচেরীতে যোগসাধনার আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। প্রধান গ্রন্থ 'Life Divine' দিব্যজীবন ও আধ্যাত্মিক সত্যের মর্মকথা নিয়ে রচিত।

জন্ম—১৮৭২, মৃত্যু—১৯৫০।

নমস্কার—সমগ্র কবিতাটি শ্রীঅরবিন্দের প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন। এখানে শেষাংশ গৃহীত হয়েছে। কবিতাটি কোন বিশেষ গ্রন্থভুক্ত নয়—পশ্চিমবংগ রবীন্দ্র রচনাবলী ৩য় খন্ডের পরিশিষ্টে গৃহীত হয়েছে।

৩০। দুঃখ

ফাল্গুন ১৩১৪ (১৯০৭)

জগৎসংসারের বিধান সম্বন্ধে যখনই আমরা ভাবিয়া দেখিতে যাই তখনই, এ বিশ্বরাজ্যে দুঃখ কেন আছে এই প্রশ্নই সকলের চেয়ে আমাদিগকে সংশয়ে আন্দোলিত করিয়া তোলে। আমরা কেহ বা তাহাকে মানবপিতামহের আদিম পাপের শাস্তি বলিয়া থাকি, কেহ বা তাহাকে জন্মান্তরের কর্মফল বলিয়া জানি, কিন্তু তাহাতে দুঃখ তো দুঃখই থাকিয়া যায়।

না থাকিয়া যে জো নাই। দুঃখের তত্ত্ব আর সৃষ্টির তত্ত্ব যে একেবারে একসংগে বাঁধা। কারণ, অপূর্ণতাই তো দুঃখ এবং সৃষ্টিই যে অপূর্ণ।

সেই অপূর্ণতাই বা কেন ? এটা একবারে গোড়ার কথা। সৃষ্টি অপূর্ণ হইবে না, দেশে কালে বিভক্ত হইবে না, কার্যকারণে আবদ্ধ হইবে না, এমন সৃষ্টিছাড়া আশা আমরা মনেও আনিতে পারি না।

অপূর্ণের মধ্য দিয়া নহিলে পূর্ণের প্রকাশ হইবে কেমন করিয়া।...

জগৎ অপূর্ণ বলিয়াই তাহা চঞ্চল, মানবসমাজ অপূর্ণ বলিয়াই তাহা সচেষ্ট, এবং আমাদের আত্মবোধ অপূর্ণ বলিয়াই আমরা আত্মাকে এবং অন্য-সমস্তকে বিভিন্ন করিয়াই জানি। কিন্তু সেই চাঞ্চল্যের মধ্যেই শান্তি, দুঃখচেষ্টার মধ্যেই সফলতা এবং বিচ্ছেদের মধ্যেই প্রেম।

অতএব এ কথা মনে রাখিতে হইবে, পূর্ণতার বিপরীত শূন্যতা; কিন্তু অপূর্ণতা পূর্ণতার বিপরীত নহে, বিরুদ্ধ নহে, তাহা পূর্ণতারই বিকাশ। গান যখন চলিতেছে, যখন তাহা সমে আসিয়া শেষ হয় নাই, তখন তাহা সম্পূর্ণ গান নহে বটে কিন্তু তাহা গানের বিপরীতও নহে—তাহার অংশে অংশে সেই সম্পূর্ণ গানেরই আনন্দ তরঙ্গিত হইতেছে। এ নহিলে রস কেমন করিয়া হয়! রসো বৈ সঃ। তিনি যে রসস্বরূপ। অপূর্ণকে প্রতি নিমেষেই তিনি পরিপূর্ণ করিয়া তুলিতেছেন বলিয়াই তো তিনি রস। তাঁহাতে করিয়া সমস্ত ভরিয়া উঠিতেছে, ইহাই রসের আকৃতি, ইহাই রসের প্রকৃতি। সেইজন্য জগতের প্রকাশ 'আনন্দরূপমমৃতং'—ইহাই আনন্দের রূপ, ইহা আনন্দের অমৃতরূপ।

সেইজন্যই এই অপূর্ণ জগৎ শূন্য নহে, মিথ্যা নহে। সেইজন্যই এ জগতে রূপের মধ্যে অপরূপ, শব্দের মধ্যে বেদনা, ঘ্রাণের মধ্যে ব্যাকুলতা আমাদিগকে কোন্ অনির্বচনীয়তায় নিমগ্ন করিয়া দিতেছে। সেইজন্য আকাশ কেবলমাত্র আমাদিগকে বেষ্টন করিয়া নাই, তাহা আমাদের হৃদয়কে বিস্ফারিত করিয়া দিতেছে; আলোক কেবল আমাদের দৃষ্টিকে সার্থক করিতেছে না, তাহা আমাদের অন্তঃকরণকে উদ্‌বোধিত করিয়া তুলিতেছে এবং যাহা-কিছু আছে তাহা কেবল আছে মাত্র নহে, তাহাতে আমাদের চিত্তকে চেতনায়, আমাদের আত্মাকে সত্যে সম্পূর্ণ করিতেছে।...

...জগতের এই অপূর্ণতা যেমন পূর্ণতার বিপরীত নহে, কিন্তু তাহা যেমন পূর্ণতারই একটি প্রকাশ, তেমনি এই অপূর্ণতার নিত্যসহচর দুঃখও আনন্দের বিপরীত নহে, তাহা আনন্দেরই অঙ্গ। অর্থাৎ, দুঃখের পরিপূর্ণতা ও সার্থকতা দুঃখই নহে, তাহা আনন্দ। দুঃখও আনন্দরূপমমৃতম্।

এ কথা কেমন করিয়া বলি? ইহাকে সম্পূর্ণ প্রমাণ করিবই বা কী করিয়া?

কিন্তু অমাবস্যার অন্ধকারে অনন্ত জ্যোতিষ্কলোককে যেমন প্রকাশ করিয়া দেয়, তেমনি দুঃখের নিবিড়তম তমসার মধ্যে অবতীর্ণ হইয়া আত্মা কি কোনোদিনই আনন্দলোকের ধ্রুবদীপ্তি দেখিতে পায় নাই—হঠাৎ কি কখনোই বলিয়া উঠে নাই 'বুঝিয়াছি, দুঃখের রহস্য বুঝিয়াছি, আর কখনো সংশয় করিব না'? পরম দুঃখের শেষ প্রান্ত যেখানে গিয়া মিলিয়া গেছে সেখানে কি আমাদের হৃদয় কোনো শুভমুহূর্তে চাহিয়া দেখে নাই? অমৃত ও মৃত্যু, আনন্দ ও দুঃখ সেখানে কি এক হইয়া যায় নাই? সেইদিকেই কি তাকাইয়া ঋষি বলেন নাই 'যস্যচ্ছায়ামৃতং যস্য মৃত্যুঃ কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম'? অমৃত যাঁহার ছায়া এবং মৃত্যুও যাঁহার ছায়া তিনি ছাড়া আর কোন্ দেবতাকে পূজা করিব! ইহা কি তর্কের বিষয়? ইহা কি আমাদের উপলব্ধির বিষয় নহে? সমস্ত মানুষের অন্তরের মধ্যে এই উপলব্ধি গভীরভাবে আছে বলিয়াই মানুষ দুঃখকেই পূজা করিয়া আসিয়াছে, আরামকে নহে। জগতের ইতিহাসে মানুষের পরমপূজ্যগণ দুঃখেরই অবতার, আরামে-লালিত লক্ষ্মীর ক্রীতদাস নহে।

অতএব দুঃখকে আমরা দুর্বলতাবশত খর্ব করিব না, অস্বীকার করিব না, দুঃখের দ্বারাই আনন্দকে আমরা বড়ো করিয়া এবং মঙ্গলকে আমরা সত্য করিয়া জানিব।

এ কথা আমাদিগকে মনে রাখিতে হইবে অপূর্ণতার গৌরবই দুঃখ, দুঃখই এই অপূর্ণতার সম্পৎ, দুঃখই তাহার একমাত্র মূলধন। মানুষ সত্যপদার্থ যাহা-কিছু পায় তাহা দুঃখের দ্বারাই পায় বলিয়াই তাহার মনুষ্যত্ব। তাহার ক্ষমতা অল্প বটে, কিন্তু ঈশ্বর তাহাকে ভিক্ষুক করেন নাই। সে শুধু চাহিয়াই কিছু পায় না, দুঃখ করিয়া পায়। আর যত-কিছু ধন সে তো তাহার নহে, সে সমস্তই বিশ্বেশ্বরের, কিন্তু দুঃখ যে তাহার নিতান্তই আপনার। সেই দুঃখের ঐশ্বর্যেই অপূর্ণ জীব পূর্ণস্বরূপের সহিত আপনার গর্বের সম্বন্ধ রক্ষা করিয়াছে, তাহাকে লজ্জা পাইতে হয় নাই। সাধনার দ্বারা আমরা ঈশ্বরকে পাই, তপস্যার দ্বারা আমরা ব্রহ্মকে লাভ করি—তাহার অর্থই এই, ঈশ্বরের মধ্যে যেমন পূর্ণতা আছে, আমাদের মধ্যে তেমনি পূর্ণতার মূল্য আছে, তাহাই দুঃখ; সেই দুঃখই সাধনা; সেই দুঃখই তপস্যা; সেই দুঃখেরই পরিণাম আনন্দ, মুক্তি, ঈশ্বর।

আমাদের পক্ষ হইতে ঈশ্বরকে যদি কিছু দিতে হয় তবে কী দিব, কী দিতে পারি? তাঁহারই ধন তাঁহাকে দিয়া তো তৃপ্তি নাই—আমাদের একটিমাত্র যে আপনার ধন দুঃখধন আছে তাহাই তাঁহাকে সমর্পণ করিতে হয়। এই দুঃখকেই তিনি আনন্দ দিয়া, তিনি আপনাকে দিয়া পূর্ণ করিয়া দেন—নহিলে তিনি আনন্দ ঢালিবেন কোন্‌খানে! আমাদের এই আপন ঘরের পাত্রটি না থাকিলে তাঁহার সুধা তিনি দান করিতেন কী করিয়া! এই কথাই আমরা গৌরব করিয়া বলিতে পারি। দানেই ঐশ্বর্যের পূর্ণতা। হে ভগবান, আনন্দকে দান করিবার, বর্ষণ করিবার, প্রবাহিত করিবার এই-যে তোমার শক্তি ইহা তোমার পূর্ণতারই অঙ্গ। আনন্দ আপনাতে বদ্ধ হইয়া সম্পূর্ণ হয় না, আনন্দ আপনাকে ত্যাগ করিয়াই সার্থক—তোমার সেই আপনাকে দান করিবার পরিপূর্ণতা আমরাই বহন করিতেছি, আমাদের দুঃখের দ্বারা বহন করিতেছি, এই আমাদের বড়ো অভিমান; এইখানেই তোমাতে আমাতে মিলিয়াছি, এইখানেই তোমার ঐশ্বর্যে আমার ঐশ্বর্যে যোগ; এইখানে তুমি আমাদের অতীত নহ, এইখানেই তুমি আমাদের মধ্যে নামিয়া আসিয়াছ। তুমি তোমার অগণ্য গ্রহসূর্যনক্ষত্র-খচিত মহা-সিংহাসন হইতে আমাদের এই দুঃখের জীবনে তোমার লীলা সম্পূর্ণ করিতে আসিয়াছ। হে রাজা, তুমি আমাদের দুঃখের রাজা; হঠাৎ যখন অর্ধরাত্রে তোমার রথচক্রের বজ্রগর্জনে মেদিনী বলির পশুর হৃৎপিন্ডের মতো কাঁপিয়া উঠে তখন জীবনে তোমার সেই প্রচন্ড আবির্ভাবের মহাক্ষণে যেন তোমার জয়ধ্বনি করিতে পারি; হে দুঃখের ধন, তোমাকে চাহি না এমন কথা সেদিন যেন ভয়ে না বলি—সেদিন যেন দ্বার ভাঙিয়া ফেলিয়া তোমাকে ঘরে প্রবেশ করিতে না হয়, যেন সম্পূর্ণ জাগ্রত হইয়া সিংহদ্বার খুলিয়া দিয়া তোমার উদ্দীপ্ত ললাটের দিকে দুই চক্ষু তুলিয়া বলিতে পারি, হে দারুণ, তুমিই আমার প্রিয়।

আমরা দুঃখের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়া অনেকবার বলিবার চেষ্টা করিয়া থাকি যে, আমরা সুখদুঃখকে সমান করিয়া বোধ করিব। কোনো উপায় চিত্তকে অসাড় করিয়া ব্যক্তিবিশেষের পক্ষে সেরূপ উদাসীন হওয়া হয়তো অসম্ভব না হইতে পারে। কিন্তু সুখদুঃখ তো কেবলই নিজের নহে, তাহা যে জগতের সমস্ত জীবের সঙ্গে জড়িত। আমার দুঃখবোধ চলিয়া গেলেই তো সংসার হইতে দুঃখ দূর হয় না।

অতএব, কেবলমাত্র নিজের মধ্যে নহে, দুঃখকে তাহার সেই বিরাট রঙ্গভূমির মাঝখানে দেখিতে হইবে যেখানে সে আপনার বহ্নির তাপে, বজ্রের আঘাতে, কত জাতি, কত রাজ্য, কত সমাজ গড়িয়া তুলিতেছে; যেখানে সে মানুষের জিজ্ঞাসাকে দুর্গম পথে ধাবিত করিতেছে, মানুষের ইচ্ছাকে দুর্ভেদ্য বাধার ভিতর দিয়া উদ্‌ভিন্ন করিয়া তুলিতেছে এবং মানুষের চেষ্টাকে কোনো ক্ষুদ্র সফলতার মধ্যে নিঃশেষিত হইতে দিতেছে না; যেখানে যুদ্ধবিগ্রহ দুর্ভিক্ষমারী অন্যায়-অত্যাচার তাহার সহায়; যেখানে রক্তসরোবরের মাঝখান হইতে শুভ্র শান্তিকে সে বিকশিত করিয়া তুলিতেছে, দারিদ্র্যের নিষ্ঠুর তাপের দ্বারা শোষণ করিয়া বর্ষণের মেঘকে রচনা করিতেছে এবং যেখানে হলধরমূর্তিতে সুতীক্ষ্ণ লাঙল দিয়া সে মানবহৃদয়কে বারম্বার শত শত রেখায় দীর্ণ বিদীর্ণ করিয়াই তাহাকে ফলবান করিয়া তুলিতেছে। সেখানে সেই দুঃখের হস্ত হইতে পরিত্রাণকে পরিত্রাণ বলে না—সেই পরিত্রাণই মৃত্যু—সেখানে স্বেচ্ছায় অঞ্জলি রচনা করিয়া যে তাহাকে প্রথম অর্ঘ্য না দিয়াছে সে নিজেই বিড়ম্বিত হইয়াছে।

মানুষের এই-যে দুঃখ ইহা কেবল কোমল অশ্রুবাষ্পে আচ্ছন্ন নহে, ইহা রুদ্রতেজে উদ্দীপ্ত। বিশ্বজগতে তেজঃপদার্থ যেমন মানুষের চিত্তে দুঃখ সেইরূপ; তাহাই আলোক, তাহাই তাপ, তাহাই গতি, তাহাই প্রাণ; তাহাই চক্রপথে ঘুরিতে ঘুরিতে মানবসমাজে নূতন নূতন কর্মলোক ও সৌন্দর্যলোক সৃষ্টি করিতেছে; এই দুঃখের তাপ কোথাও বা প্রকাশ পাইয়া, কোথাও বা প্রচ্ছন্ন থাকিয়া, মানবসংসারের সমস্ত বায়ুপ্রবাহগুলিকে বহমান করিয়া রাখিয়াছে।

মানুষের এই দুঃখকে আমরা ক্ষুদ্র করিয়া বা দুর্বলভাবে দেখিব না। আমরা বক্ষ বিস্ফারিত ও মস্তক উন্নত করিয়াই ইহাকে স্বীকার করিব। এই দুঃখের শক্তির দ্বারা নিজেকে ভস্ম করিব না, নিজেকে কঠিন করিয়া গড়িয়া তুলিব। দুঃখের দ্বারা নিজেকে উপরে না তুলিয়া নিজেকে অভিভূত করিয়া অতলে তলাইয়া দেওয়াই দুঃখের অবমাননা—যাহাকে যথার্থভাবে বহন করিতে পারিলেই জীবন সার্থক হয় তাহার দ্বারা আত্মহত্যা সাধন করিতে বসিলে দুঃখদেবতার কাছে অপরাধী হইতে হয়। দুঃখের দ্বারা আত্মাকে অবজ্ঞা না করি, দুঃখের দ্বারাই যেন আত্মার সম্মান উপলব্ধি করিতে পারি। দুঃখ ছাড়া সে সম্মান বুঝিবার আর কোনো পন্থা নাই।

কারণ, পূর্বেই আভাস দিয়াছি, দুঃখই জগতে একমাত্র সকল পদার্থের মূল্য। মানুষ যাহা-কিছু নির্মাণ করিয়াছে তাহা দুঃখ দিয়াই করিয়াছে। দুঃখ দিয়া যাহা না করিয়াছে তাহা তাহার সম্পূর্ণ আপন হয় না।

সেইজন্য ত্যাগের দ্বারা, দানের দ্বারা, তপস্যার দ্বারা, দুঃখের দ্বারাই আমরা আপন আত্মাকে গভীররূপে লাভ করি—সুখের দ্বারা, আরামের দ্বারা নহে। দুঃখ ছাড়া আর কোনো উপায়েই আপন শক্তিকে আমরা জানিতে পারি না। এবং আপন শক্তিকে যতই কম করিয়া জানি আত্মার গৌরবও তত কম করিয়া বুঝি, যথার্থ আনন্দও তত অগভীর হইয়া থাকে।

রামায়ণে কবি রামকে সীতাকে লক্ষ্মণকে ভরতকে দুঃখের দ্বারাই মহিমান্বিত করিয়া তুলিয়াছেন। রামায়ণের কাব্যরসে মানুষ যে আনন্দের মঙ্গলময় মূর্তি দেখিয়াছে দুঃখই তাহাকে ধারণ করিয়া আছে। মহাভারতেও সেইরূপ। মানুষের ইতিহাসে যত

বীরত্ব, যত মহত্ত্ব সমস্তই দুঃখের আসনে প্রতিষ্ঠিত। মাতৃস্নেহের মূল্য দুঃখে, পাতিব্রত্যের মূল্য দুঃখে, বীর্যের মূল্য দুঃখে, পুণ্যের মূল্য দুঃখে।

এই মূল্যটুকু ঈশ্বর যদি মানুষের নিকট হইতে হরণ করিয়া লইয়া যান, যদি তাহাকে অবিমিশ্র সুখ ও আরামের মধ্যে লালিত করিয়া রাখেন, তবেই আমাদের অপূর্ণতা যথার্থ লজ্জাকর হয়, তাহার মর্যাদা একেবারে চলিয়া যায়। তাহা হইলে কিছুকেই আর আপনার অর্জিত বলিতে পারি না, সমস্তই দানের সামগ্রী হইয়া উঠে। আজ ঈশ্বরের শস্যকে কর্ষণের দুঃখের দ্বারা আমরা আমার করিতেছি, ঈশ্বরের পানীয় জলকে বহনের দুঃখের দ্বারা আমার করিতেছি, ঈশ্বরের অগ্নিকে ঘর্ষণের দুঃখের দ্বারা আমার করিতেছি। ঈশ্বর আমাদের অত্যন্ত প্রয়োজনের সামগ্রীকেও সহজে দিয়া আমাদের অসম্মান করেন নাই; ঈশ্বরের দানকেও বিশেষরূপে আমাদের করিয়া লইলে তবেই তাহাকে পাই, নহিলে তাহাকে পাই না। সেই দুঃখ তুলিয়া লইলে জগৎ-সংসারে আমাদের সমস্ত দাবি চলিয়া যায়, আমাদের নিজের কোনো দলিল থাকে না; আমরা কেবল দাতার ঘরে বাস করি, নিজের ঘরে নহে। কিন্তু তাহাই যথার্থ অভাব; মানুষের পক্ষে দুঃখের অভাবের মতো এত বড়ো অভাব আর-কিছু হইতেই পারে না।

উপনিষৎ বলিয়াছেন: স তপোহতপ্যত স তপস্তপ্ত্বা সর্বমসৃজত যদিদং কিঞ্চ। তিনি তপ করিলেন, তিনি তপ করিয়া এই যাহা-কিছু সমস্ত সৃষ্টি করিলেন। সেই তাঁহার তপই দুঃখরূপে জগতে বিরাজ করিতেছে। আমরা অন্তরে বাহিরে যাহা-কিছু সৃষ্টি করিতে যাই সমস্তই তপ করিয়া করিতে হয়—আমাদের সমস্ত জন্মই বেদনার মধ্য দিয়া, সমস্ত লাভই ত্যাগের পথ বাহিয়া সমস্ত অমৃতত্বই মৃত্যুর সোপান অতিক্রম করিয়া। ঈশ্বরের সৃষ্টির তপস্যাকে আমরা এমনি করিয়াই বহন করিতেছি। তাঁহারই তপের তাপ নব নব রূপে মানুষের অন্তরে নব নব প্রকাশকে উন্মেষিত করিতেছে।

সেই তপস্যাই আনন্দের অঙ্গ। সেইজন্য আর-এক দিক দিয়া বলা হইয়াছে; আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে। আনন্দ হইতেই এই ভূতসকল উৎপন্ন হইয়াছে। আনন্দ ব্যতীত সৃষ্টির এত বড়ো দুঃখকে বহন করিবে কে! কোহ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ। কৃষক চাষ করিয়া যে ফসল ফলাইতেছে, সেই ফসলে তাহার তপস্যা যত বড়ো তাহার আনন্দও ততখানি। সম্রাটের সাম্রাজ্যরচনা বৃহৎ দুঃখ এবং বৃহৎ আনন্দ, দেশভক্তের দেশকে প্রাণ দিয়ে গড়িয়া তোলা পরম দুঃখ এবং পরম আনন্দ—জ্ঞানীর জ্ঞানলাভ এবং প্রেমিকের প্রিয়সাধনাও তাই।

খৃস্টান শাস্ত্রে বলে ঈশ্বর মানবগৃহে জন্মগ্রহণ করিয়া বেদনার ভার বহন ও দুঃখের কণ্টক-কিরীট মাথায় পরিয়াছিলেন। মানুষের সকল প্রকার পরিত্রাণের একমাত্র মূল্যই সেই দুঃখ। মানুষের নিতান্ত আপন সামগ্রী যে দুঃখ, প্রেমের দ্বারা তাহাকে ঈশ্বরও আপন করিয়া এই দুঃখসংগমে মানুষের সঙ্গে মিলিয়াছেন, দুঃখকে অপরিসীম মুক্তিতে ও আনন্দে উত্তীর্ণ করিয়া দিয়াছেন—ইহাই খৃস্টানধর্মের মর্মকথা।

আমাদের দেশেও কোনো সম্প্রদায়ের সাধকেরা ঈশ্বরকে দুঃখদারুণ ভীষণ মূর্তির মধ্যেই মা বলিয়া ডাকিয়াছেন। সে মূর্তিকে বাহ্যত কোথাও তাঁহারা মধুর ও কোমল, শোভন ও সুখকর করিবার লেশমাত্র চেষ্টা করেন নাই। সংহাররূপকেই তাঁহার জননী বলিয়া অনুভব করিতেছেন। এই সংহারের বিভীষিকার মধ্যেই তাঁহারা শক্তি ও শিবের

সম্মিলন প্রত্যক্ষ করিবার সাধনা করেন।

শক্তিতে ও ভক্তিতে যাহারা দুর্বল, তাহারাই কেবল সুখস্বাচ্ছন্দ্য-শোভা-সম্পদের মধ্যেই ঈশ্বরের আবির্ভাবকে সত্য বলিয়া অনুভব করিতে চায়। তাহারা বলে ধনমানই ঈশ্বরের প্রসাদ, সৌন্দর্যই ঈশ্বরের মূর্তি, সংসারসুখের সফলতাই ঈশ্বরের আশীর্বাদ এবং তাহাই পুণ্যের পুরস্কার। ঈশ্বরের দয়াকে তাহারা বড়োই সকরুণ, বড়োই কোমলকান্ত রূপে দেখে। সেইজন্যই এই-সকল দুর্বলচিত্ত সুখের পূজারিগণ ঈশ্বরের দয়াকে নিজের লোভের মোহের ও ভীরুতার সহায় বলিয়া ক্ষুদ্র ও খণ্ডিত করিয়া জানে।

কিন্তু হে ভীষণ, তোমার দয়াকে তোমার আনন্দকে কোথায় সীমাবদ্ধ করিব ? কেবল সুখে, কেবল সম্পদে, কেবল জীবনে, কেবল নিরাপদ নিরাতঙ্কতায় ? দুঃখ বিপদ মৃত্যু ও ভয়কে তোমা হইতে পৃথক করিয়া তোমার বিরুদ্ধে দাঁড় করাইয়া জানিতে হইবে ? তাহা নহে। হে পিতা, তুমিই দুঃখ, তুমিই বিপদ। হে মাতা, তুমিই মৃত্যু, তুমিই ভয়, তুমিই— ভয়ানাং ভয়ং ভীষণং ভীষণানাং।...

ধর্ম, র/১২/৫৯-৬৭

তুলনীয় প্রসঙ্গ: দুঃখ (৩৩)

তিন । ব্রহ্মভাবনা: উপলব্ধির আলোকে

তিন। ব্রহ্মভাবনা ঃ উপলব্ধির আলোকে

৩১। অভাব

২৩ অগ্রহায়ণ ১৩১৫ (১৯০৮)

ঈশ্বরকে যে আমরা দিন রাত্রি বাদ দিয়ে চলছি তাতে আমাদের সাংসারিক ক্ষতি যদি সিকি পয়সাও হত তা হলে তখনই সতর্ক হয়ে উঠতুম। কিন্তু সে বিপদ নেই; সূর্য আমাদের আলো দিচ্ছে, পৃথিবী আমাদের অন্ন দিচ্ছে, বৃহৎ লোকালয় তার সহস্র নাড়ী দিয়ে আমাদের সহস্র অভাব পূরণ করে চলেছে। তবে সংসারকে ঈশ্বরবর্জিত করে আমাদের কী অভাব হচ্ছে! হায়, যে অভাব হচ্ছে তা যতক্ষণ না জানতে পারি ততক্ষণ আরামে নিঃসংশয়ে থাকি এবং সচ্ছল সংসারের মধ্যে বাস করে মনে করি, আমরা ঈশ্বরের বিশেষ অনুগৃহীত ব্যক্তি।

কিন্তু, ক্ষতিটা কী হয় তা কেমন করে বোঝানো যেতে পারে?

এইখানে দৃষ্টান্তস্বরূপে আমার একটি স্বপ্নের কথা বলি। আমি নিতান্ত বালককালে মাতৃহীন। আমার বড়ো বয়সের জীবনে মার অধিষ্ঠান ছিল না। কাল রাত্রে স্বপ্ন দেখলুম, আমি যেন বাল্যকালেই রয়ে গেছি। গঙ্গার ধারের বাগানবাড়িতে মা একটি ঘরে বসে রয়েছেন। মা আছেন তো আছেন—তাঁর আবির্ভাব তো সকল সময়ে চেতনাকে অধিকার করে থাকে না। আমিও মাতার প্রতি মন না দিয়ে তাঁর ঘরের পাশ দিয়ে চলে গেলুম। বারান্দায় গিয়ে এক মুহূর্তে আমার হঠাৎ কী হল জানি নে—আমার মনে এই কথাটা জেগে উঠল যে মা আছেন! তখনই তাঁর ঘরে গিয়ে তাঁর পায়ের ধুলো নিয়ে তাঁকে প্রণাম করলুম। তিনি আমার হাত ধরে আমাকে বললেন: তুমি এসেছ!

এইখানেই স্বপ্ন ভেঙে গেল। আমি ভাবতে লাগলুম—মায়ের বাড়িতেই বাস করছি, তাঁর ঘরের দুয়ার দিয়েই দশবার করে আনাগোনা করি—তিনি আছেন এটা জানি সন্দেহ নেই, কিন্তু যেন নেই এমনি ভাবেই সংসার চলছে। তাতে ক্ষতিটা কী হচ্ছে! তাঁর ভাঁড়ারের দ্বার তিনি বন্ধ করেন নি, তাঁর অন্ন তিনি পরিবেশন করছেন, যখন ঘুমিয়ে থাকি তখনও তাঁর পাখা আমাকে বীজন করছে। কেবল ওইটুকু হচ্ছে না, তিনি আমার হাতটি ধরে বলছেন না 'তুমি এসেছ'! অন্নজল ধনজন সমস্তই আছে, কিন্তু সেই স্বরটি সেই স্পর্শটি কোথায়! মন যখন সম্পূর্ণ জেগে উঠে সেইটিকেই চায় এবং চেয়ে যখন না পায়, কেবল উপকরণ-ভরা ঘরে ঘরে খুঁজে বেড়ায়, তখন অন্নজল তার আর কিছুতেই রোচে না।

একবার ভালো করে ভেবে দেখো, জগতে কোনো জিনিসের কাছে, কোনো মানুষের কাছে যাওয়া আমাদের জীবনে অল্পই ঘটে। পরমাত্মীয়ের নিকট দিয়েও আমরা প্রত্যহ আনাগোনা করি বটে, কিন্তু দৈবাৎ এক মুহূর্ত তার কাছে গিয়ে পৌঁছোই। কত দিন তার সঙ্গে নিভৃতে কথা কয়েছি এবং সকাল-সন্ধ্যার আলোকে একসঙ্গে বেড়িয়েছি কিন্তু এর মধ্যে হয়তো সকলের চেয়ে কেবল এক দিনের কথা মনে পড়ে যে দিন হৃদয় পরিপূর্ণ হয়ে উঠে মনে হয়েছে আমি তার কাছে এসেছি। এমন শত সহস্র লোক আছে যারা সমস্ত জীবনে একবারও কোনো জিনিসের কোনো মানুষের কাছে আসে নি। জগতে জন্মেছে, কিন্তু জগতের সঙ্গে তাদের অব্যবহিত সংস্পর্শ ঘটে নি। ঘটে নি যে এও তারা

একেবারেই জানে না। তারা যে সকলের সঙ্গে হাসছে, খেলছে, গল্পগুজব করছে, নানা লোকের সঙ্গে দেনাপাওনা আনাগোনা চলছে, তারা ভাবছে : এই তো আমি সকলের সঙ্গে আছি। এইরূপ সঙ্গে থাকার মধ্যে সঙ্গটা যে কতই যৎসামান্য সে তার বোধের অতীত।

শান্তিনিকেতন, র/১২/১০২-৩

টীকা ঃ

অভাব—'শান্তিনিকেতন'-গ্রন্থ থেকে নেওয়া। গ্রন্থটি শান্তিনিকেতন-উপদেশমালার সংকলন। ১৩১৫ থেকে ১৩২১ সাল অর্থাৎ ১৯০৮ থেকে ১৯১৪ খৃষ্টাব্দ, এই উপদেশগুলির ব্যাপ্তিকাল। প্রথমে এই ভাষণগুলি ছোট ছোট ১৭টি গুচ্ছে প্রকাশিত হয়, ১৯০৯-১৯১৬ খৃ. মধ্যে। পরে দুই খণ্ডে 'শান্তিনিকেতন' গ্রন্থে সংকলিত হয়, ১৩৪১-৪২ বঙ্গাব্দে।

বিষয়-সংকেত ঃ ঈশ্বরের অভাব ও ঈশ্বরের সঙ্গ।

৩২। দুঃখ

(২৬ অগ্রহায়ণ ১৩১৫ ১৯০৮)

আমাদের উপাসনার মন্ত্রে আছে : নমঃ সম্ভবায় চ ময়োভবায় চ ! সুখকরকে নমস্কার করি, কল্যাণকরকে নমস্কার করি। কিন্তু আমরা সুখকরকেই নমস্কার করি, কল্যাণকরকে সব সময়ে নমস্কার করতে পারি নে। কল্যাণকর যে শুধু সুখকর নন, তিনি যে দুঃখকর। আমরা সুখকেই তাঁর দান বলে জানি, আর দুঃখকে কোনো দুর্দৈবকৃত বিড়ম্বনা বলেই জ্ঞান করি।

এইজন্যে দুঃখভীরু বেদনাকাতর আমরা দুঃখ থেকে নিজেকে বাঁচাবার জন্যে নানা প্রকার আবরণ রচনা করি, আমরা কেবলই লুকিয়ে থাকতে চাই। তাতে কী হয় ? তাতে সত্যের পূর্ণ সংস্পর্শ থেকে আমরা বঞ্চিত হই।

ধনী বিলাসী সমস্ত আয়াস থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে কেবল আরামের মধ্যে পরিবৃত হয়ে থাকে। তাতে কী হয় ? তাতে সে নিজেকে পঙ্গু করে ফেলে; নিজের হাত-পায়ের উপর তার অধিকার থাকে না, যে-সমস্ত শক্তি নিয়ে সে পৃথিবীতে জন্মেছিল সেগুলি কর্ম অভাবে পরিণত হতে পারে না—মুষড়ে যায়, বিগড়ে যায়। স্বরচিত আবরণের মধ্যে সে একটি কৃত্রিম জগতে বাস করে। কৃত্রিম জগৎ আমাদের প্রকৃতিকে কখনোই তার সমস্ত স্বাভাবিক খাদ্য জোগাতে পারে না; এইজন্যে সে অবস্থায় আমাদের স্বভাব একটি ঘরগড়া পুতুলের মতো হয়ে ওঠে, পূর্ণতালাভ করে না।

দুঃখের আঘাত থেকে আমাদের মনকে ভয়ে ভয়ে কেবলই বাঁচিয়ে রাখবার চেষ্টা করলে জগতে আমাদের অসম্পূর্ণভাবে বাস করা হয়, সুতরাং তাতে কখনোই আমাদের স্বাস্থ্যরক্ষা ও শক্তির পরিণতি হয় না। পৃথিবীতে এসে যে ব্যক্তি দুঃখ পেলে না সে লোক ঈশ্বরের কাছ থেকে তার সব পাওনা পেলে না—তার পাথেয় কম পড়ে গেল।...

জগতে এই-যে আমাদের দুঃখের পাওনা এ যে সম্পূর্ণ ন্যায়সংগত হবেই তা নয়।

যাকে আমরা অন্যায় বলি, অবিচার বলি, তাও আমাদের গ্রহণ করতে হবে—অত্যন্ত সাবধানে সূক্ষ্ম হিসাবের খাতা খুলে কেবলমাত্র ন্যায্যটুকুর ভিতর দিয়েই নিজেকে মানুষ করে তোলা—সে তো হয়েও ওঠে না এবং হলেও তাতে আমাদের মঙ্গল হয় না। অন্যায় এবং অবিচারকেও আমরা উপযুক্তভাবে গ্রহণ করতে পারি এমন আমাদের সামর্থ্য থাকা চাই।

পৃথিবীতে আমাদের ভাগে যে সুখ পড়ে তাও কি একেবারে ঠিক হিসাবমত পড়ে, অনেক সময়েই কি আমরা গাঁঠের থেকে যা দাম দিয়েছি তার চেয়ে বেশি খরিদ করে ফেলি নে? কিন্তু কখনও তো মনে করি নে আমি তার অযোগ্য। সবটুকুই তো দিব্য অসংকোচে দখল করি। দুঃখের বেলাতেই কি কেবল ন্যায়-অন্যায়ের হিসাব মেলাতে হবে?

ঠিক হিসাব মিলিয়ে কোনো জিনিস যে আমরা পাই নে তার একটি কারণ আছে। গ্রহণ এবং বর্জনের ভিতর দিয়েই আমাদের প্রাণের ক্রিয়া চলতে থাকে—কেন্দ্রানুগ এবং কেন্দ্রাতিগ এই দুটো শক্তিই আমাদের পক্ষে সমান গৌরবের। আমাদের প্রাণের, আমাদের বুদ্ধির, আমাদের সৌন্দর্যবোধের, আমাদের মঙ্গলপ্রবৃত্তির, বস্তুত আমাদের সমস্ত শ্রেষ্ঠতার মূলধর্মই এই যে, সে যে কেবলমাত্র নেবে তা নয়, সে ত্যাগও করবে।

এইজন্যই আমাদের আহার্যপদার্থে ঠিক হিসাবমত আমাদের প্রয়োজনের উপকরণ থাকে না, তাতে যেমন খাদ্য অংশ আছে তেমনি অখাদ্য অংশও আছে। এই অখাদ্য অংশ শরীর পরিত্যাগ করে। যদি ঠিক ওজনমত নিছক খাদ্যপদার্থ আমরা গ্রহণ করি তা হলে আমাদের চলে না, শরীর ব্যাধিগ্রস্ত হয়। কারণ, কেবল কি আমাদের পাকশক্তি ও পাকযন্ত্র আছে? আমাদের ত্যাগশক্তি ও ত্যাগযন্ত্র আছে—সেই শক্তি সেই যন্ত্রকেও আমাদের কাজ দিতে হবে, তবেই গ্রহণবর্জনের সামঞ্জস্যে প্রাণের পূর্ণতাসাধন ঘটবে।

সংসারে তেমনি আমরা যে কেবলমাত্র ন্যায্যটুকু পাব, কেউ আমাদের প্রতি কোনো অবিচার করবে না, এও বিধান নয়। সংসারে এই ন্যায়ের সঙ্গে অন্যায় মিশ্রিত থাকা আমাদের চরিত্রের পক্ষে একান্ত আবশ্যক। নিশ্বাসপ্রশ্বাসের ক্রিয়ার মতো আমাদের চরিত্রের এমন একটি সহজ ক্ষমতা থাকা চাই যাতে আমাদের যেটুকু প্রাপ্য সেটুকু অনায়াসে গ্রহণ করি এবং যেটুকু ত্যাজ্য সেটুকু বিনা ক্ষোভে ত্যাগ করতে পারি।

অতএব দুঃখ এবং আঘাত ন্যায্য হোক বা অন্যায্য হোক তার সংস্পর্শ থেকে নিজেকে নিঃশেষে বাঁচিয়ে চলবার অতিচেষ্টায় আমাদের মনুষ্যত্বকে দুর্বল ও ব্যাধিগ্রস্ত করে তোলে।

এই ভীরুতায় শুধুমাত্র বিলাসিতার পেলবতা ও দৌর্বল্য জন্মে তা নয়, যে-সমস্ত অতিবেদনাশীল লোক আঘাতের ভয়ে নিজেকে আবৃত করে তাদের শুচিতা নষ্ট হয়। আবরণের ভিতরে ভিতরে তাদের অনেক মলিনতা জমতে থাকে; যতই লোকের ভয়ে তারা সেগুলো লোকচক্ষুর সামনে বের করতে না চায় ততই সেগুলো দূষিত হয়ে উঠে স্বাস্থ্যকে বিকৃত করতে থাকে। পৃথিবীর নিন্দা অবিচার দুঃখ কষ্টকে যারা অবাধে অসংকোচে গ্রহণ করতে পারে তারা যে কেবল বলিষ্ঠ হয় তা নয়, তারা নির্মল হয়, অনাবৃত জীবনের উপর দিয়ে জগতের পূর্ণসংঘাত লেগে তাদের কলুষ ক্ষয় হয়ে যেতে থাকে।...

শান্তিনিকেতন, র/১২/১০৬-৮

বিষয়-সংকেত ঃ দুঃখ মনুষ্যত্বকে জাগ্রত করে, মানুষকে নির্মল ও অনাবৃত করে। দুঃখ ও আঘাতকে বাঁচিয়ে চলতে গেলে মনুষ্যত্ব দুর্বল ও ব্যাধিগ্রস্ত হয়।

তুলনীয় প্রসঙ্গ ঃ মনুষ্যত্ব (২২), দুঃখ (৩০)

৩৩। ত্যাগ

২৭ অগ্রহায়ণ ১৩১৫ ১৯০৮

প্রতিদিন প্রাতে আমরা যে এই উপাসনা করছি যদি তার মধ্যে কিছু সত্য থাকে তবে তার সাহায্যে আমরা প্রত্যহ অল্পে অল্পে ত্যাগের জন্য প্রস্তুত হচ্ছি। নিতান্তই প্রস্তুত হওয়া চাই, কারণ, সংসারের মধ্যে একটি ত্যাগের ধর্ম আছে, তার বিধান অমোঘ। সে আমাদের কোথাও দাঁড়াতে দিতে চায় না; সে বলে কেবলই ছাড়তে হবে এবং এগোতে হবে। এমন কোথাও কিছুই দেখতে পাচ্ছি নে যেখানে পৌঁছে বলতে পারি—এইখানেই সমস্ত সমাপ্ত হল, পরিপূর্ণ হল, অতএব এখান থেকে আর কোনো কালেই নড়ব না।

সংসারের ধর্মই যখন কেবল ধরে রাখা নয়, সরিয়ে দেওয়া, এগিয়ে দেওয়া, তখন তারই সঙ্গে আমাদের ইচ্ছার সামঞ্জস্য সাধন না করলে দুটোতে কেবলই ঠোকাঠুকি হতে থাকে। আমরা যদি কেবলই বলি 'আমরা থাকব' 'আমরা রাখব' আর সংসার বলে 'তোমাকে ছাড়তে হবে' 'চলতে হবে,' তা হলে বিষম কষ্ট উৎপন্ন হতে থাকে। আমাদের ইচ্ছাকে পরাস্ত হতে হয়—যা আমরা ছাড়তে চাই নে তা আমাদের কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া হয়। অতএব আমাদের ইচ্ছাকেও এই বিশ্বধর্মের সুরে বাঁধতে হবে।

বিশ্বধর্মের সঙ্গে আমাদের ইচ্ছাকে মেলাতে পারলেই আমরা বস্তুত স্বাধীন হই। স্বাধীনতার নিয়মই তাই। আমি স্বেচ্ছায় বিশ্বের সঙ্গে যোগ না দিই যদি, তা হলেই বিশ্ব আমার প্রতি জবর্দস্তি করে আমাকে তার অনুগত করবে—তখন আমার আনন্দ থাকবে না, গৌরব থাকবে না, তখন দাসের মতো সংসারের কানমলা খাব।

অতএব একদিন এ কথা যেন সংসার না বলতে পারে যে 'তোমার কাছ থেকে কেড়ে নেব', আমিই যেন বলতে পারি 'আমি ত্যাগ করব'। কিন্তু প্রতিদিনই যদি ইচ্ছাকে এই ত্যাগের অভিমুখে প্রস্তুত না করি তবে মৃত্যু যখন ক্ষতি যখন তার বড়ো বড়ো দাবি নিয়ে আমাদের সম্মুখে এসে দাঁড়াবে তখন তাকে কোনোমতে ফাঁকি দিতে ইচ্ছা হবে, অথচ সেখানে একেবারেই ফাঁকি চলবে না—সে বড়ো দুঃখের দিন উপস্থিত হবে।

এই ত্যাগের দ্বারা আমরা দারিদ্র্য ও রিক্ততা লাভ করি এমন কথা যেন আমাদের মনে না হয়। পূর্ণতররূপে লাভ করবার জন্যেই আমাদের ত্যাগ।

আমরা যেটা থেকে বেরিয়ে না আসব সেটাকে আমরা পাব না। গর্ভের মধ্যে আবৃত শিশু তার মাকে পায় না—সে যখন নাড়ীর বন্ধন কাটিয়ে ভূমিষ্ঠ হয়, স্বাধীন হয়, তখনই সে তার মাকে পূর্ণতরভাবে পায়।

এই জগতের গর্ভাবরণের মধ্যে থেকে আমাদের সেইরকম করে মুক্ত হতে হবে—তা হলেই যথার্থভাবে আমরা জগৎকে পাব, কারণ, স্বাধীনভাবে পাব। আমরা জগতের

মধ্যে বদ্ধ হয়ে ভ্রূণের মতো জগৎকে দেখতেই পাই নে; যিনি মুক্ত হয়েছেন তিনিই জগৎকে জানেন, জগৎকে পান।...

অতএব সংসারকে লাভ করতে হলে আমাদের সংসারের বাইরে যেতে হবে, এবং কর্মকে সাধন করতে গেলে আসক্তি পরিহার করে আমাদের কর্ম করতে হবে।

তার মানেই হল এই যে, সংসারে নেওয়া এবং দেওয়া এই-যে দুটো বিপরীত ধর্ম আছে এই দুই বিপরীতের সামঞ্জস্য করতে হবে—এর মধ্যে একটা একান্ত হয়ে উঠলেই তাতে অকল্যাণ ঘটে। যদি নেওয়াটাই একমাত্র বড়ো হয় তা হলে আমরা আবদ্ধ হই, আর যদি দেওয়াটাই একমাত্র বড়ো হয় তা হলে আমরা বঞ্চিত হই। যদি কর্মটা মুক্তিবিবর্জিত হয় তা হলে আমরা দাস হই আর যদি মুক্তি কর্মবিহীন হয় তা হলে আমরা বিলুপ্ত হই।

বস্তুত ত্যাগ জিনিসটা শূন্যতা নয়, তা অধিকারের পূর্ণতা। নাবালক যখন সম্পত্তিতে পূর্ণ অধিকারী না হয় তখন সে দান বিক্রয় করতে পারে না—তখন তার কেবল ভোগের ক্ষুদ্র অধিকার থাকে, ত্যাগের মহৎ অধিকার থাকে না। আমরা যে অবস্থায় কেবল জমাতে পারি কিন্তু প্রাণ ধরে দিতে পারি নে, সে অবস্থায় আমাদের সেই সঞ্চিত সামগ্রীর সম্বন্ধে আমাদের স্বাধীনতা থাকে না।...

শান্তিনিকেতন, র/১২/১০৮-১০

বিষয়-সংকেত ঃ মুক্তিবিহীন কর্ম দাসত্ব, কর্মবিহীন মুক্তি শূন্যতা। ত্যাগ শূন্যতা নয়, তা অধিকারের পূর্ণতা। আসক্তি বর্জন না হলে পূর্ণকে পাওয়া হয় না।

৩৪। প্রেম

২৮ অগ্রহায়ণ ১৩১৫, ১৯০৮

...ত্যাগ কেন করব এ প্রশ্নটার চরম উত্তরটি এখনও মনের মধ্যে এসে পৌঁছল না। শাস্ত্রে উত্তর দেয়, ত্যাগ না করলে স্বাধীন হওয়া যায় না, যেটিকে ত্যাগ না করব সেইটিই আমাদের বদ্ধ করে রাখবে–ত্যাগের দ্বারা আমরা মুক্ত হব।

মুক্তিলাভ করব এ কথাটার জোর যে আমাদের কাছে নেই। আমরা তো মুক্তি চাচ্ছি নে; আমাদের ভিতরে যে অধীনতার একটা বিষম ঝোঁক আছে–আমরা যে ইচ্ছা করে খুশি হয়ে সংসারের অধীন হয়েছি–আমরা ঘটিবাটি থালার অধীন, আমরা ভৃত্যেরও অধীন, আমরা কথার অধীন, প্রথার অধীন, অসংখ্য প্রবৃত্তির অধীন–এত বড়ো জন্ম-অধীন দাসানুদাসকে এ কথা বলাই মিথ্যা যে, 'মুক্তিতে তোমার সার্থকতা আছে'। যে ব্যক্তি স্বভাবত এবং স্বেচ্ছাক্রমেই বদ্ধ তাকে মুক্তির প্রলোভন দেখানো মিথ্যা।

বস্তুত মুক্তি তার কাছে শূন্যতা, নির্বাণ, মরুভূমি। যে মুক্তির মধ্যে তার ঘরদুয়ার ঘটিবাটি টাকাকড়ি কিছুই নেই, যা-কিছুকে সে একমাত্র আশ্রয় বলে জানত তার সমস্তই বিলুপ্ত–সে মুক্তি তার কাছে বিভীষিকা, বিনাশ।

আমরা যে ত্যাগ করব তা যদি শূন্যতার মধ্যেই ত্যাগ হয় তবে সে তো একেবারেই লোকসান। একটি কানাকড়িতেও সেই রকম শূন্যের মধ্যে বিসর্জন দেওয়া আমাদের পক্ষে

একেবারে অসহ্য।

কিন্তু ত্যাগ তো শূন্যের মধ্যে নয়। যদ্ যদ্ কর্ম প্রকুর্বীত তদ্‌ব্রহ্মণি সমর্পয়েৎ। যা-কিছু করবে সমস্তই ব্রহ্মে সমর্পণ করবে। তোমার সংসারকে, তোমার প্রিয়জনকে, তোমার সমস্ত কিছুকেই তাঁকে নিবেদন করে দাও—এই-যে ত্যাগ এ যে পরিপূর্ণতার মধ্যে বিসর্জন।

পূর্ণের মধ্যে যাকে ত্যাগ করি তাকেই সত্যরূপে পূর্ণরূপে লাভ করি এ কথা পূর্বেই বলেছি। কিন্তু এতেও কথা শেষ হয় না। কেবলমাত্র লাভের কথায় কোনো কথার সমাপ্তি হতে পারে না—লাভ করে কী হবে এ প্রশ্ন থেকে যায়। স্বাধীন হয়েইবা কি হবে, পূর্ণতা লাভ করেই বা কী হবে?...

ইচ্ছার শেষ চরিতার্থতা প্রেমে। প্রেমে—কেন, কী হবে, এ-সমস্ত প্রশ্ন থাকতেই পারে না। প্রেম আপনিই আপনার জবাবদিহি আপনিই আপনার লক্ষ্য।...

ত্যাগের সঙ্গে প্রেমের ভারি একটা সম্বন্ধ আছে—এমন সম্বন্ধ যে, কে আগে কে পরে তা ঠিক করাই দায়। প্রেম ছাড়া ত্যাগ হয় না, আবার ত্যাগ ছাড়া প্রেম হতে পারে না। যা আমাদের কাছ থেকে প্রয়োজনের তাগিদে বা অত্যাচারের তাড়নায় ছিনিয়ে নেওয়া হয় সে তো ত্যাগই নয়—আমরা প্রেমে যা দিই তাই সম্পূর্ণ দিই, কিছুই তার আর রাখি নে, সেই দেওয়াতেই দানকে সার্থক মনে করি। কিন্তু এই-যে প্রেম এও ত্যাগের সাধনাতেই শেষে আমাদের কাছে ধরা দেয়। যে লোক চিরকাল কেবল আপনার দিকেই টানে, নিজের অহংকারকেই জয়ী করবার জন্যে ব্যস্ত, সেই স্বার্থপর, সেই দাম্ভিক ব্যক্তির মনে প্রেমের উদয় হয় না—প্রেমের সূর্য একেবারে কুহেলিকায় আচ্ছন্ন হয়ে থাকে।

স্বার্থের বন্ধন ছাড়তে হবে, অহংকারের নাগপাশ মোচন করতে হবে, যা কেবল জমাবার জন্যেই জীবনপাত করেছি প্রত্যহ তা ত্যাগ করতে বসতে হবে—ত্যাগটা যেন ক্রমশই সহজ হয়ে আসে, নিজের দিকের টানটা যেন প্রত্যহই আলগা হয়ে আসে। তা হলেই কি যাকে মুক্তি বলে তাই পাব? হাঁ, মুক্তি পাবে। মুক্তি পেয়ে কী পাব? মুক্তির যা চরম লক্ষ্য সেই প্রেমকে পাব।

প্রেম কে? তিনিই প্রেম যিনি কোনো প্রয়োজন নেই তবু আমাদের জন্যে সমস্তই ত্যাগ করছেন। তিনিই প্রেমস্বরূপ। তিনি নিজের শক্তিকে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের ভিতর দিয়ে নিয়ত আমাদের জন্যে উৎসর্জন করছেন—সমস্ত সৃষ্টি তাঁর কৃত উৎসর্গ। আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে। আনন্দ থেকেই এই যা-কিছু সমস্ত সৃষ্টি হচ্ছে, দায়ে পড়ে কিছুই হচ্ছে না—সেই স্বয়ম্ভু সেই স্বত-উৎসারিত প্রেমই সমস্ত সৃষ্টির মূল।

এই প্রেমস্বরূপের সঙ্গে আমাদের সম্পূর্ণ যোগ হলেই আমাদের সমুদয় ইচ্ছার পরিপূর্ণ চরিতার্থতা হবে। সম্পূর্ণ যোগ হতে গেলেই যার সঙ্গে যোগ হবে তার মতন হতে হবে। প্রেমের সঙ্গে প্রেমের দ্বারাই যোগ হবে।

কিন্তু প্রেম যে মুক্ত, সে যে স্বাধীন। দাসত্বের সঙ্গে প্রেমের আর কোনো তফাতই নেই—কেবল দাসত্ব বদ্ধ আর প্রেম মুক্ত। প্রেম নিজের নিয়মেই নিজে চূড়ান্তভাবে প্রতিষ্ঠিত, সে নিজের চেয়ে উপরের আর কারও কাছে কোনো বিষয়ে কোনো কৈফিয়ত দেয় না।

সুতরাং প্রেমস্বরূপের সঙ্গে মিলতে গেলে আমাদের সম্পূর্ণ স্বাধীন হতে হবে। স্বাধীন ছাড়া স্বাধীনের সঙ্গে আদানপ্রদান চলতে পারে না। তাঁর সঙ্গে আমাদের এই কথাবার্তা হয়ে গেছে, তিনি আমাদের বলে রেখেছেন: তুমি মুক্ত হয়ে আমার কাছে এসো—যে ব্যক্তি দাস তার জন্যে আমার আমদরবার খোলা আছে বটে, কিন্তু সে আমার খাস-দরবারে প্রবেশ করতে পারবে না।

এক-এক সময় মনের আগ্রহে আমরা তাঁর সেই খাস-দরবারের দরজার কাছে ছুটে যাই, কিন্তু দ্বারী বারবার আমাদের ফিরিয়ে দেয়। বলে, তোমার নিমন্ত্রণপত্র কুই! খুঁজতে গিয়ে দেখি আমার কাছে যে-কটা নিমন্ত্রণ আছে সে ধনের নিমন্ত্রণ, যশের নিমন্ত্রণ, অমৃতের নিমন্ত্রণ নয়। বারবার ফিরে আসতে হল—বারবার!

...যা-কিছু সংগ্রহ এবং যা-কিছু ত্যাগ করতে হবে সে কেবল সেই প্রেমের জন্যে।

কেমন করে সংগ্রহ করব? আমাদের এই প্রতিদিন উপাসনার মধ্যে আমরা কিছু কিছু সংগ্রহ করছি। এই প্রাতঃকালে সেই চৈতন্যস্বরূপের সঙ্গে নিজের চৈতন্যকে নিবিড়ভাবে পরিবেষ্টিত করে দেখবার জন্যে আমাকে যে ক্ষণকালের জন্যেও সমস্ত আবরণ ত্যাগ করতে হচ্ছে, অনাবৃত হয়ে সদ্যোজাত শিশুর মতো তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ করতে হচ্ছে, এতেই আমার দিনে দিনে কিছু কিছু করে জমে উঠবে। আনন্দের সঙ্গে আনন্দ, প্রেমের সঙ্গে প্রেমের মিলন নিশ্চয়ই ক্রমশই কিছু-না-কিছু সহজ হয়ে আসছে।

শান্তিনিকেতন, র/১২/১১১-১৩

বিষয়-সংকেত : ইচ্ছার শেষ চরিতার্থতা প্রেমে। প্রেম আপনিই আপনার জবাবদিহি, আপনিই আপনার শেষ। মুক্তির চরম লক্ষ্য প্রেম।

৩৫। সামঞ্জস্য

২৯ অগ্রহায়ণ ১৩১৫, ১৯০৮

...আমরা আর কোনো চরম কথা জানি বা না জানি নিজের ভিতর থেকে একটি চরম কথা বুঝে নিয়েছি সেটি হচ্ছে এই যে, একমাত্র প্রেমের মধ্যেই সমস্ত দ্বন্দ্ব এক সঙ্গে মিলে থাকতে পারে। যুক্তিতে তারা কাটাকাটি করে, কর্মেতে তারা মারামারি করে, কিছুতেই তারা মিলতে চায় না, প্রেমেতে সমস্তই মিটমাট হয়ে যায়। তর্কক্ষেত্রে কর্মক্ষেত্রে যারা দিতিপুত্র ও অদিতিপুত্রের মতো পরস্পরকে একেবারে বিনাশ করবার জন্যেই সর্বদা উদ্যত, প্রেমের মধ্যে তারা আপন ভাই।

তর্কের ক্ষেত্রে দ্বৈত এবং অদ্বৈত পরস্পরের একান্ত বিরোধী; হাঁ যেমন না'কে কাটে, না যেমন হাঁ'কে কাটে, তারা তেমনি বিরোধী। কিন্তু প্রেমের ক্ষেত্রে দ্বৈত এবং অদ্বৈত ঠিক একই স্থান জুড়ে রয়েছে। প্রেমেতে একই কালে দুই হওয়াও চাই, এক হওয়াও চাই। এই দুই প্রকান্ড বিরোধের কোনোটাই বাদ দিলে চলে না, আবার তাদের বিরুদ্ধরূপে থাকলেও চলবে না। যা বিরুদ্ধ তাকে অবিরুদ্ধ হয়ে থাকতে হবে এই এক সৃষ্টিছাড়া

কান্ড, এ কেবল প্রেমেতেই ঘটে। এইজন্যেই কেন যে আমি অন্যের জন্যে নিজেকে উৎসর্গ করতে যাই নিজের ভিতরকার এই রহস্য তলিয়ে বুঝতে পারি নে, কিন্তু স্বার্থ জিনিসটা বোঝা কিছুই শক্ত নয়।

ভগবান প্রেমস্বরূপ কিনা, তাই তিনি এককে নিয়ে দুই করেছেন আবার দুইকে নিয়ে এক করেছেন। স্পষ্টই যে দেখতে পাচ্ছি, দুই যেমন সত্য একও তেমনি সত্য। এই অদ্ভুত ব্যাপারটাকেও তো যুক্তির দ্বারা নাগাল পাওয়া যাবে না—এ যে প্রেমের কান্ড।

উপনিষদে ঈশ্বরের সম্বন্ধে এইজন্যে কেবলই বিরুদ্ধ কথাই দেখতে পাই। য একোহবর্ণো বহুধাশক্তিযোগাৎ বর্ণাননেকান্নিহিতার্থো দধাতি। তিনি এক এবং তাঁর কোনো বর্ণ নেই, অথচ বহুধা শক্তি নিয়ে সেই জাতিহীন এক, অনেক জাতির গভীর প্রয়োজনসকল বিধান করছেন। যিনি এক তিনি আবার কোথা থেকে অনেকের প্রয়োজনসকল বিধান করতে যান? তিনি যে প্রেমস্বরূপ—তাই, শুধু এক হয়ে তাঁর চলে না, অনেকের বিধান নিয়েই তিনি থাকেন।

স পর্যগাৎ শুক্রং, আবার তিনিই ব্যদধাৎ শাশ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ—অর্থাৎ, অনন্ত দেশে তিনি স্তব্ধ হয়ে ব্যাপ্ত হয়ে আছেন, আবার অনন্ত কালে তিনি বিধান করছেন, তিনি কাজ করছেন। একাধারে স্থিতিও তিনি গতিও তিনি।

আমাদের প্রকৃতির মধ্যেও এই স্থিতি ও গতির সামঞ্জস্য আমরা একটিমাত্র জায়গায় দেখতে পাই; সে হচ্ছে প্রেমে। এই চঞ্চল সংসারের মধ্যে যেখানে আমাদের প্রেম কেবলমাত্র সেইখানেই আমাদের চিত্তের স্থিতি—আর-সমস্তকে আমরা ছুঁই আর চলে যাই, ধরি আর ছেড়ে দিই, যেখানে প্রেম সেইখানেই আমাদের মন স্থির হয়। অথচ সেইখানেই তার ক্রিয়াও বেশি। সেইখানেই আমাদের মন সকলের চেয়ে সচল। প্রেমেতেই যেখানে স্থির করায় সেইখানেই অস্থির করে। প্রেমের মধ্যেই স্থিতিগতি এক নাম নিয়ে আছে।

কর্মক্ষেত্রে ত্যাগ এবং লাভ ভিন্নশ্রেণীভুক্ত, তারা বিপরীত পর্যায়ের। প্রেমেতে ত্যাগও যা লাভও তাই। যাকে ভালোবাসি তাকে যা দিই সেই দেওয়াটাই লাভ। আনন্দের হিসাবের খাতায় জমা খরচ একই জায়গায়—সেখানে দেওয়াও যা পাওয়াও তাই। ভগবানও সৃষ্টিতে এই-যে আনন্দের যজ্ঞ, এই-যে প্রেমের খেলা ফেঁদেছেন, এতে তিনি নিজেকে দিয়ে নিজেকেই লাভ করছেন। এই দেওয়া-পাওয়াকে একেবারে এক করে দেওয়াকেই বলে প্রেম।

দর্শনশাস্ত্রে মস্ত একটা তর্ক আছে। ঈশ্বর পুরুষ কি অপুরুষ, তিনি সগুণ কি নির্গুণ, তিনি personal কি impersonal। প্রেমের মধ্যে এই হাঁ না একসঙ্গে মিলে আছে। প্রেমের একটা কোটি সগুণ, আর-একটা কোটি নির্গুণ। তার এক দিক বলে 'আমি আছি', আর-এক দিক বলে 'আমি নেই'। 'আমি' না হলেও প্রেম নেই, 'আমি' না ছাড়লেও প্রেম নেই। সেইজন্যে ভগবান সগুণ কি নির্গুণ সে-সমস্ত তর্কের কথা কেবল তর্কের ক্ষেত্রেই চলে; সে তর্ক তাঁকে স্পর্শ করতে পারে না।

পাশ্চাত্য ধর্মতত্ত্বে বলে আমাদের অনন্ত উন্নতি—আমরা ক্রমাগতই তার দিকে যাই, কোনো কালে তাঁর কাছে যাই নে। আমাদের উপনিষৎ বলেছেন আমরা তাঁর কাছে যেতেও পারি নে, আবার তাঁর কাছে যেতেও পারি; তাঁকে পাইও না, তাঁকে পাইও।

যতো বাচো নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ।
আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন।।

এমন অদ্ভুত বিরুদ্ধ কথা একই শ্লোকের দুই চরণের মধ্যে তো এমন সুস্পষ্ট করে আর কোথাও শোনা যায় নি। শুধু বাক্য ফেরে না, মনও তাঁকে না পেয়ে ফিরে আসে, এ একেবারে সাফ জবাব। অথচ সেই ব্রহ্মের আনন্দকে যিনি জেনেছেন তিনি আর কিছু থেকে ভয় পান না। তবেই তো যাঁকে একেবারেই জানা যায় না তাঁকে এমনি জানা যায় যে আর কিছু থেকেই ভয় থাকে না। সেই জানাটা কিসের জানা? আনন্দের জানা প্রেমের জানা। এ হচ্ছে সমস্ত না-জানাকে লঙ্ঘন করে জানা। প্রেমের মধ্যেই না-জানার সঙ্গে জানার ঐকান্তিক বিরোধ নেই। স্ত্রী তার স্বামীকে জ্ঞানের পরিচয়ে সকল দিক থেকে সম্পূর্ণ না জানতে পারে কিন্তু প্রেমের জানায়, আনন্দের জানায় এমন করে জানতে পারে যে কোনো জ্ঞানী তেমন করে জানতে পারে না। প্রেমের ভিতরকার এই এক অদ্ভুত রহস্য যে, যেখানে এক দিকে কিছুই জানি নে সেখানে অন্য দিকে সম্পূর্ণ জানি। প্রেমেতেই অসীম সীমার মধ্যে ধরা দিচ্ছেন এবং সীমা অসীমকে আলিঙ্গন করছে। তর্কের দ্বারা এর কোনো মীমাংসা করবার জো নেই।

ধর্মশাস্ত্রে তো দেখা যায় মুক্তি এবং বন্ধনে এমন বিরুদ্ধ সম্বন্ধ যে, কেউ কাউকে রেয়াত করে না। বন্ধনকে নিঃশেষে নিকাশ করে দিয়ে মুক্তিলাভ করতে হবে, এই আমাদের প্রতি উপদেশ। স্বাধীনতা জিনিসটা যেন একটা চূড়ান্ত জিনিস, পাশ্চাত্য শাস্ত্রেও এই সংস্কার আমাদের মনে বদ্ধমূল করে দিয়েছে। কিন্তু একটি ক্ষেত্র আছে যেখানে অধীনতা এবং স্বাধীনতা ঠিক সমান গৌরব ভোগ করে, এ কথা আমাদের ভুললে চলবে না। সে হচ্ছে প্রেমে। সেখানে অধীনতা স্বাধীনতার কাছে এক চুলও মাথা হেঁট করে না। প্রেমই সম্পূর্ণ স্বাধীন এবং প্রেমই সম্পূর্ণ অধীন।

ঈশ্বর তো কেবলমাত্র মুক্ত নন। তা হলে তো তিনি একেবারে নিষ্ক্রিয় হতেন। তিনি নিজেকে বেঁধেছেন। না যদি বাঁধতেন তা হলে সৃষ্টিই হত না এবং সৃষ্টির মধ্যে কোনো নিয়ম কোনো তাৎপর্যই দেখা যেত না। তাঁর যে আনন্দরূপ, যে রূপে তিনি প্রকাশ পাচ্ছেন, এই তো তাঁর বন্ধনের রূপ। এই বন্ধন তাঁর আমাদের সঙ্গে প্রণয়বন্ধন। এই তার নিজকৃত স্বাধীন বন্ধনেই তো তিনি আমাদের সখা, আমাদের পিতা। এই বন্ধনে যদি তিনি ধরা না দিতেন তা হলে আমরা বলতে পারতুম না যে, স এব বন্ধুর্জনিতা স বিধাতা। তিনিই বন্ধু তিনিই পিতা, তিনিই বিধাতা। এত বড়ো একটা আশ্চর্য কথা মানুষের মুখ দিয়ে বের হতেই পারত না। কোন্‌টা বড়ো কথা? ঈশ্বর বুদ্ধ মুক্ত—এইটে? না, তিনি আমাদের সঙ্গে পিতৃত্বে সখিত্বে পতিত্বে বদ্ধ—এইটে? দুটোই সমান বড়ো কথা। অধীনতাকে অত্যন্ত ছোটো করে দেখে তার সম্বন্ধে আমাদের একটা হীন সংস্কার হয়ে গেছে। এ রকম অন্ধ সংস্কার আরও আমাদের অনেক আছে। যেমন আমরা ছোটোকে মনে করি তুচ্ছ, বড়োকেই মনে করি মহৎ—যেন গণিতশাস্ত্রের দ্বারা কাউকে মহত্ত্ব দিতে পারে! তেমনি সীমাকে আমরা গাল দিয়ে থাকি।—যেন, সীমা জিনিসটা যে কী তা আমরা কিছুই জানি! সীমা একটি পরমাশ্চর্য রহস্য। এই সীমাই তো অসীমকে প্রকাশ করছে। এ কী অনির্বচনীয়! এই কী আশ্চর্য রূপ, কী আশ্চর্য গুণ, কী আশ্চর্য বিকাশ! এক রূপ হতে আর-এক রূপ, এক গুণ হতে আর-এক গুণ, এক শক্তি হতে আর-এক শক্তি—এরই বা নাশ

কোথায়! এরই বা সীমা কোন্‌খানে! সীমা যে ধারণাতীত বৈচিত্র্য, যে অগণনীয় বহুলত্বে, যে অশেষ পরিবর্তনপরম্পরায় প্রকাশ পাচ্ছে তাকে অবজ্ঞা করতে পারে এত বড়ো সাধ্য আছে কার! বস্তুত আমরা নিজের ভাষাকেই নিজে অবজ্ঞা করি, কিন্তু সীমা পদার্থকে অবজ্ঞা করি এমন অধিকার আমাদের নেই। অসীমের অপেক্ষা সীমা কোনো অংশেই কম আশ্চর্য নয়, অব্যক্তের অপেক্ষা ব্যক্ত কোনোমতেই অশ্রদ্ধেয় নয়।

স্বাধীনতা অধীনতা নিয়েও আমরা কথার খেলা করি। অধীনতাও যে স্বাধীনতার সঙ্গেই এক আসনে ব'সে রাজত্ব করে এ কথা আমরা ভুলে যাই। স্বাধীনতাই যে আমরা চাই তা নয়, অধীনতাও আমরা চাই। যে চাওয়াতে আমাদের ভিতরকার এই দুই চাওয়ারই সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য হয়, সেই হচ্ছে প্রেমের চাওয়া। বন্ধনকে স্বীকার করে বন্ধনকে অতিক্রম করব এই হচ্ছে প্রেমের কাজ। প্রেম যেমন স্বাধীন এমন স্বাধীন আর দ্বিতীয় কেউ নেই, আবার প্রেমের যে অধীনতা এত বড়ো অধীনতাই বা জগতে কোথায় আছে?

অধীনতা জিনিসটা যে কত বড়ো মহিমান্বিত বৈষ্ণবধর্মে সেইটে আমাদের দেখিয়েছে। অদ্ভুত সাহসের সঙ্গে অসংকোচে বলেছে, ভগবান জীবের কাছে নিজেকে বাঁধা রেখেছেন—সেই পরম গৌরবের উপরেই জীবের অস্তিত্ব। আমাদের পরম অভিমান এই যে, তিনি আমাদের ছেড়ে থাকতে পারেন নি—এই বন্ধনটি তিনি মেনেছেন—নইলে আমরা আছি কী করে?

মা যেমন সন্তানের, প্রণয়ী যেমন প্রণয়ীর সেবা করে, তিনি তেমনি বিশ্ব জুড়ে আমাদের সেবা করছেন। তিনি নিজে সেবক হয়ে সেবা জিনিসকে অসীম মাহাত্ম্য দিয়েছেন। তাঁর প্রকাণ্ড জগৎটি নিয়ে তিনি তো খুব ধুমধাম করতে পারতেন, কিন্তু আমাদের মন ভোলাবার এত চেষ্টা কেন? নানা ছলে নানা কলায় বিশ্বের সঙ্গে আমাদের এত অসংখ্য ভালো লাগাবার সম্পর্ক পাতিয়ে দিচ্ছেন কেন? এই ভালো লাগাবার অপ্রয়োজনীয় আয়োজনের কি অন্ত আছে? তিনি নানা দিক থেকে কেবলই বলছেন, তোমাকে আমার আনন্দ দিচ্ছি, তোমার আনন্দ আমাকে দাও। তিনি যে নিজেকে চারি দিকেই সীমার অপরূপ ছন্দে বেঁধেছেন—নইলে প্রেমের গীতিকাব্য প্রকাশ হয় না যে।

এই প্রেমস্বরূপের সঙ্গে আমাদের প্রেম যেখানেই ভালো করে না মিলছে সেইখানে সমস্ত জগতে তার বেসুরটা বাজছে। সেইখানে কত দুঃখ যে জাগছে তার সীমা নেই—চোখের জল বয়ে যাচ্ছে। ওগো প্রেমিক, তুমি যে প্রেম কেড়ে নেবে না, তুমি যে মন ভুলিয়ে নেবে একদিন সমস্ত মনে প্রাণে কাঁদিয়ে তার পরে তোমার প্রেমের ঋণ শোধ করাবে।...

শান্তিনিকেতন, র/১২/১১৩-১৬

টীকা ঃ

সামঞ্জস্য—শান্তিনিকেতন গ্রন্থের প্রথমখণ্ডে প্রবন্ধটি 'বিরোধের সামঞ্জস্য' নামে প্রকাশিত হয়েছিল। পরবর্তীকালে রবীন্দ্ররচনাবলীতে—প্রবন্ধটি 'সামঞ্জস্য' নামে গৃহীত হয়েছে।

বিষয়-সংকেত : প্রেমের মধ্যেই সব দ্বন্দ্ব এক সঙ্গে মিলতে পারে। দ্বৈত অদ্বৈত, গতি স্থিতি, পুরুষ অপুরুষ, মুক্তি বন্ধন, স্বাধীনতা অধীনতা প্রেমস্বরূপে সব সামঞ্জস্যলাভ করে।

৩৬। প্রার্থনা

২ পৌষ ১৩১৫, ১৯০৮

উপনিষৎ ভারতবর্ষের ব্রহ্মজ্ঞানের বনস্পতি। এ যে কেবল সুন্দর শ্যামল ছায়াময় তা নয়, এ বৃহৎ এবং এ কঠিন। এর মধ্যে যে কেবল সিদ্ধির প্রাচুর্য পল্লবিত তা নয়, এতে তপস্যার কঠোরতা ঊর্ধ্বগামী হয়ে রয়েছে। সেই অভ্রভেদী সুদৃঢ় অটলতার মধ্যে একটি মধুর ফুল ফুটে আছে—তার গন্ধে আমাদের ব্যাকুল করে তুলেছে। সেটি ওই মৈত্রেয়ীর প্রার্থনা-মন্ত্রটি।

যাজ্ঞবল্ক্য যখন গৃহত্যাগ করবার সময় তাঁর পত্নীদুটিকে তাঁর সমস্ত সম্পত্তি দান করে যেতে উদ্যত হলেন তখন মৈত্রেয়ী জিজ্ঞাসা করলেন, আচ্ছা, বলো তো এ-সব নিয়ে কি আমি অমর হব? যাজ্ঞবল্ক্য বললেন, না, তা হবে না, তবে কিনা উপকরণবন্তের যেমনতরো জীবন তোমার জীবন সেই রকম হবে। সংসারীরা যেমন করে তাদের ঘরদুয়ার গোরুবাছুর অশনবসন নিয়ে স্বচ্ছন্দে দিন কাটায় তোমরাও তেমনি করে দিন কাটাতে পারবে।

মৈত্রেয়ী তখন এক মুহূর্তে বলে উঠলেন: যেনাহং নামৃতা স্যাম্ কিমহং তেন কুর্যাম্! যার দ্বারা আমি অমৃতা না হব তা নিয়ে আমি কী করব! এ তো কঠোর জ্ঞানের কথা নয়—তিনি তো চিন্তার দ্বারা, ধ্যানের দ্বারা, কোন্‌টা নিত্য কোন্‌টা অনিত্য তার বিবেক লাভ করে এ কথা বলেন নি। তাঁর মনের মধ্যে একটি কষ্টিপাথর ছিল যার উপরে সংসারের সমস্ত উপকরণকে একবার ঘষে নিয়েই তিনি বলে উঠলেন, 'আমি যা চাই এ তো তা নয়।'

উপনিষদে সমস্ত পুরুষ ঋষিদের জ্ঞানগম্ভীর বাণীর মধ্যে একটিমাত্র স্ত্রীকণ্ঠের এই একটিমাত্র ব্যাকুল বাক্য ধ্বনিত হয়ে উঠেছে এবং সে ধ্বনি বিলীন হয়ে যায়নি। সেই ধ্বনি তাঁদের মেঘমন্দ্র শান্ত স্বরের মাঝখানে অপূর্ব একটি অশ্রুপূর্ণ মাধুর্য জাগ্রত করে রেখেছে। মানুষের মধ্যে যে পুরুষ আছে উপনিষদে নানা দিকে নানা ভাবে আমরা তারই সাক্ষাৎ পেয়েছিলুম। এমন সময়ে হঠাৎ এক প্রান্তে দেখা গেল মানুষের মধ্যে যে নারী রয়েছেন তিনিও সৌন্দর্য বিকীর্ণ করে দাঁড়িয়ে রয়েছেন।

আমাদের অন্তরপ্রকৃতির মধ্যেও একটি নারী রয়েছেন। আমরা তাঁর কাছে আমাদের সমুদয় সঞ্চয় এনে দিই। আমরা ধন এনে বলি, এই নাও। খ্যাতি এনে বলি, এই তুমি জমিয়ে রাখো। আমাদের পুরুষ সমস্ত জীবন প্রাণপণ পরিশ্রম করে কত দিক থেকে কত কী যে আনছে তার ঠিক নেই; স্ত্রীটিকে বলছে, এই নিয়ে তুমি ঘর ফাঁদো, বেশ গুছিয়ে ঘরকন্না করো, এই নিয়ে তুমি সুখে থাকো। আমাদের অন্তরের তপস্বিনী এখনও স্পষ্ট করে বলতে পারছে না যে এ-সবে আমার কোনো ফল হবে না। সে মনে করছে, হয়তো আমি যা চাচ্ছি তা বুঝি এইই। কিন্তু তবু সব নিয়েও, 'সব পেলুম' ব'লে তার মন মানছে না। সে ভাবছে, হয়তো পাওয়ার পরিমাণটা আরও বাড়াতে হবে–টাকা আরও চাই, খ্যাতি আরও দরকার, ক্ষমতা আরও না হলে চলছে না। কিন্তু সেই আরো'র শেষ হয় না। বস্তুত সে যে অমৃতই চায় এবং এই উপকরণগুলো যে অমৃত নয়, এটা একদিন তাকে বুঝতেই হবে।

একদিন এক মুহূর্তে সমস্ত জীবনের স্তূপাকার সঞ্চয়কে এক পাশে আবর্জনার মতো ঠেলে দিয়ে তাকে বলে উঠতেই হবে: যেনাহং নামৃতা স্যাম্ কিমহং তেন কুর্যাম্!

কিন্তু মৈত্রেয়ী ওই-যে বলেছিলেন 'আমি যাতে অমৃতা না হব তা নিয়ে আমি কী করব', তার মানেটা কী? অমর হওয়ার মানে কি এই পার্থিব শরীরটাকে অনন্তকাল বহন করে চলা? অথবা মৃত্যুর পরেও কোনোরূপে জন্মাতরে বা অবস্থান্তরে টিঁকে থাকা? মৈত্রেয়ী যে শরীরের অমরতা চান নি এবং আত্মার নিত্যতা সম্বন্ধেও তাঁর কোনো দুশ্চিন্তা ছিল না, এ কথা নিশ্চিত। তবে তিনি কিভাবে অমৃতা হতে চেয়েছিলেন?

তিনি এই কথা বলেছিলেন, সংসারে আমরা তো কেবলই একটার ভিতর দিয়ে আর-একটাতে চলেছি—কিছুতেই তো স্থির হয়ে থাকতে পারছি নে। আমার মনের বিষয়গুলোও সরে যায়, আমার মনও সরে যায়। যাকে আমার চিত্ত অবলম্বন করে তাকে যখন ছাড়ি তখন তার সম্বন্ধে আমার মৃত্যু ঘটে। এমনি করে ক্রমাগত এক মৃত্যুর ভিতর দিয়ে আর মৃত্যুতে চলেছি—এই যে মৃত্যুর পর্যায় এর আর অন্ত নেই।

অথচ আমার মন এমন কিছুকে চায় যার থেকে তাকে আর নড়তে হবে না, যেটা পেলে সে বলতে পারে 'এ ছাড়া আমি বেশি চাই নে', যাকে পেলে আর ছাড়াছাড়ির কোনো কথাই উঠবে না। তা হলেই তো মৃত্যুর হাত একেবারে এড়ানো যায়। এমন কোন্ মানুষ এমন কোন্ উপকরণ আছে যাকে নিয়ে বলতে পারি, এই আমার চিরজীবনের সম্বল লাভ হয়ে গেল—আর কিছুই দরকার নেই!

সেইজন্যেই তো স্বামীর ত্যক্ত সমস্ত বিষয়সম্পত্তি ঠেলে ফেলে দিয়ে মৈত্রেয়ী বলে উঠেছিলেন, 'এ-সব নিয়ে আমি কী করব? আমি যে অমৃতকে চাই।'

আচ্ছা বেশ, উপকরণ তো অমৃত নয়, তা হলে অমৃত কী! আমরা জানি অমৃত কী। পৃথিবীতে একেবারে যে তার স্বাদ পাই নি তা নয়। যদি না পেতুম তা হলে তার জন্যে আমাদের কান্না উঠত না। আমরা সংসারের সমস্ত বিষয়ের মধ্যে কেবলই তাকে খুঁজে বেড়াচ্ছি, তার কারণ, ক্ষণে-ক্ষণে সে আমাদের স্পর্শ করে যায়।

মৃত্যুর মধ্যে এই অমৃতের স্পর্শ আমরা কোন্‌খানে পাই? যেখানে আমাদের প্রেম আছে। এই প্রেমেই আমরা অনন্তের স্বাদ পাই। প্রেমই সীমার মধ্যে অসীমতার ছায়া ফেলে পুরাতনকে নবীন করে রাখে, মৃত্যুকে কিছুতেই স্বীকার করে না। সংসারের বিচিত্র বিষয়ের মধ্যে এই-যে, প্রেমের আভাস দেখতে পেয়ে আমরা মৃত্যুর অতীত পরম পদার্থের পরিচয় পাই, তাঁর স্বরূপ যে প্রেমস্বরূপ তা বুঝতে পারি—এই প্রেমকেই যখন পরিপূর্ণরূপে পাবার জন্যে আমাদের অন্তরাত্মার সত্য আকাঙ্ক্ষা আবিষ্কার করি তখন আমরা সমস্ত উপকরণকে অনায়াসেই ঠেলে দিয়ে বলতে পারি: যেনাহং নামৃতঃ স্যাম্ কিমহং তেন কুর্যাম্।

এই-যে বলা, এটি যখন রমণীর মুখের থেকে উঠেছে তখন কী স্পষ্ট, কী সত্য, কী মধুর হয়েই উঠেছে। সমস্ত চিন্তা সমস্ত যুক্তি পরিহার করে কী অনায়াসেই এটি ধ্বনিত হয়ে উঠেছে। ওগো, আমি ঘর-দুয়ার কিছুই চাই নে, আমি প্রেম চাই—এ কী কান্না!

মৈত্রেয়ীর সেই সরল কান্নাটি যে প্রার্থনারূপ ধারণ করে জাগ্রত হয়ে উঠেছিল তেমন আশ্চর্য পরিপূর্ণ প্রার্থনা কি জগতে আর কোথাও কখনো শোনা গিয়েছে?

শান্তিনিকেতন, র/১২/১১৮-২১

টীকা :

প্রার্থনা—পশ্চিমবঙ্গের শতবার্ষিকী সংস্করণ রবীন্দ্ররচনাবলীতে এই প্রবন্ধটির তারিখ আছে—৩ পৌষ। মূল গ্রন্থ ও বিশ্বভারতীর রবীন্দ্র রচনাবলীর নির্দেশ অনুযায়ী আমরা এখানে ২-পৌষকেই যথার্থ বলে গ্রহণ করেছি।

বিষয়-সংকেত : মৃত্যু থেকে অমৃতে যাওয়া, অসত্য থেকে সত্যে যাওয়া—এই প্রার্থনাই মানুষের গভীরতম এবং অন্তরঙ্গতম প্রার্থনা।

৩৭। বিকারশঙ্কা

৩ পৌষ ১৩১৫(১৯০৮)

প্রেমের সাধনায় বিকারের আশঙ্কা আছে। প্রেমের একটা দিক আছে যেটা প্রধানত রসেরই দিক–সেইটেব প্রলোভনে জড়িয়ে পড়লে. কেবলমাত্র সেইখানেই ঠেকে যেতে হয়–তখন কেবল রসসম্ভোগকেই আমরা সাধনার চরম সিদ্ধি বলে জ্ঞান করি। তখন এই নেশায় আমাদের পেয়ে বসে। এই নেশাকেই দিনরাত্রি জাগিয়ে তুলে আমরা কর্মের কঠোরতা জ্ঞানের বিশুদ্ধতাকে ভুলে থাকতে চাই–কর্মকে বিস্মৃত হই, জ্ঞানকে অমান্য করি।

এমনি করে বস্তুত আমরা গাছকে কেটে ফেলে ফুলকে নেবার চেষ্টা করি, ফুলের সৌন্দর্যে যতই মুগ্ধ হই-না, গাছকে যদি তার সঙ্গে তুলনায় নিন্দিত ক'রে, তাকে কঠোর ব'লে, তাকে দুরারোহ ব'লে উৎপাটন ক'রে ফুলটি তুলে নেবার চেষ্টা করি, তা হলে তখনকার মতো ফুলকে পাওয়া যায় কিন্তু চিরদিন সেই ফুল নূতন নূতন করে ফোটবার মূল আশ্রয়কেই নষ্ট করা হয়। এমনি করে ফুলটির প্রতিই একান্ত লক্ষ্য করে তার প্রতি অবিচার এবং অত্যাচারই করে থাকি।

কাব্যের থেকে আমরা ভাবের রস গ্রহণ করে পরিতৃপ্ত হই। কিন্তু সেই রসের সম্পূর্ণতা নির্ভর করে কিসের উপরে? তার তিনটি আশ্রয় আছে। একটি হচ্ছে কাব্যের কলেবর–ছন্দ এবং ভাষা; তা ছাড়া ভাবকে, যেটির পরে যেটিকে, যেরূপে সাজালে তার প্রকাশটি সুন্দর হয় সেই বিন্যাসনৈপুণ্য। এই কলেবররচনার কাজ যেমন-তেমন করে চলে না–কঠিন নিয়ম রক্ষা করে চলতে হয়; তার একটু ব্যাঘাত হলেই যতিপতন ঘটে, কানকে পীড়িত করে, ভাবের প্রকাশ বাধাপ্রাপ্ত হয়। অতএব এই ছন্দ ভাষা এবং ভাববিন্যাসে কবিকে নিয়মের বন্ধন স্বীকার করতেই হয়, এতে যথেচ্ছাচার খাটে না। তার পরে আর-একটা বড়ো আশ্রয় আছে সেটা হচ্ছে জ্ঞানের আশ্রয়। সমস্ত শ্রেষ্ঠকাব্যের ভিতরে

স্ত্রীলোকের কোন্ গুণগুলি শ্রেষ্ঠ তাহার উত্তরে পরমপূজনীয় শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর অগ্রজমহাশয় কোনো একটি খাতায় লিখিয়াছিলেন–শ্রী হ্রী ও ধী।

এমন একটা-কিছু থাকে যাতে আমাদের জ্ঞান তৃপ্ত হয়, যাতে আমাদের মননবৃত্তিকেও উদ্‌বোধিত করে তোলে, কবি যদি অত্যন্তই খামখেয়ালি এমন একটা বিষয় নিয়ে কাব্য রচনা করেন যাতে আমাদের জ্ঞানের কোনো খাদ্য না থাকে অথবা যাতে সত্যের বিকৃতিবশত মননশক্তিকে পীড়িত ক'রে তোলে তবে সে কাব্যে রসের প্রকাশ বাধাপ্রাপ্ত হয়—সে কাব্য স্থায়িভাবে ও গভীরভাবে আমাদের আনন্দ দিতে পারে না। আর তৃতীয় আশ্রয় এবং শেষ আশ্রয় হচ্ছে ভাবের আশ্রয়—এই ভাবের সংস্পর্শে আমাদের হৃদয় আনন্দিত হয়ে ওঠে। অতএব শ্রেষ্ঠকাব্যে প্রথমে আমাদের কানের এবং কলাবোধের তৃপ্তি, তার পরে আমাদের বুদ্ধির তৃপ্তি ও তার পরে হৃদয়ের তৃপ্তি ঘটলে তবেই আমাদের সমগ্র প্রকৃতির তৃপ্তির সঙ্গে সঙ্গে কাব্যের যে রস তাই আমাদের স্থায়িরূপে প্রগাঢ়রূপে অন্তরকে অধিকার করে। নইলে, হয় রসের ক্ষীণতা ক্ষণিকতা নয় রসের বিকার ঘটে।

চিনি মধু গুড়ের যখন বিকার ঘটে তখন সে গাঁজিয়ে ওঠে, তখন সে মোদো হয়ে ওঠে, তখন সে আপনার পাত্রটিকে ফাটিয়ে ফেলে। মানসিক রসের বিকৃতিতেও আমাদের মধ্যে প্রমত্ততা আনে; তখন আর সে বন্ধন মানে না, অধৈর্য-অশান্তিতে সে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে। এই রসের উন্মত্ততায় আমাদের চিত্ত যখন উন্মথিত হতে থাকে তখন সেইটেকেই সিদ্ধি বলে জ্ঞান করি। কিন্তু, নেশাকে কখনোই সিদ্ধি বলা চলে না, অসতীত্বকে প্রেম বলা চলে না, জ্বর বিকারের দুর্বার উত্তেজনাকে স্বাস্থ্যের বলপ্রকাশ বলা চলে না। মত্ততার মধ্যে যে-একটা উগ্র প্রবলতা আছে সেটা বস্তুত লাভ নয়—সেটাতে নিজের স্বভাবের অন্য সব দিক থেকেই হরণ করে কেবল একটিমাত্র দিককে অস্বাভাবিকরূপে স্ফীত করে তোলা হয়। তাতে যে কেবল যে-সকল অংশের থেকে হরণ করা হয় তাদেরই ক্ষতি ও কৃশতা ঘটে তা নয়, যে অংশকে ফাঁপিয়ে মাতিয়ে তোলা হয় তারও ভালো হয় না। কারণ, স্বভাবের ভিন্ন ভিন্ন অংশ যখন সহজভাবে সক্রিয় থাকে তখনই প্রত্যেকটির যোগে প্রত্যেকটি সার্থক হয়ে থাকে—একটির থেকে আর-একটি যদি চুরি করে তবে যার চুরি যায় তারও ক্ষতি হয় এবং চোরও নষ্ট হতে থাকে।

তাই বলছিলুম, প্রেম যদি সত্য থেকে, জ্ঞান থেকে চুরি ক'রে মত্ত হয়ে বেড়ায়, তার সংযম ও ধৈর্য নষ্ট হয়, তার কল্পনাবৃত্তি উচ্ছৃঙ্খল হয়ে ওঠে, তবে সে নিজের প্রতিষ্ঠাকে নিজের হাতে নষ্ট করে নিজেকে লক্ষ্মীছাড়া করে তোলে।

আমরা যে প্রেমের সাধনা করব সে সতী স্ত্রীর সাধনা। তাতে সতীর তিন লক্ষণই থাকবে; তাতে হ্রী থাকবে, ধী থাকবে এবং শ্রী থাকবে।[১] তাতে সংযম থাকবে, সুবিবেচনা থাকবে এবং সৌন্দর্য থাকবে। এই প্রেম সংসারের মধ্যে চলায় ফেরায়, কথায় বার্তায়, কাজে কর্মে, দেনায় পাওনায়, ছোটোয় বড়োয়, সুখে দুঃখে, ব্যাপ্তভাবে সুতরাং সংযতভাবে নির্মলভাবে মধুরভাবে প্রকাশ পেতে থাকবে। প্রেমের যে-একটি স্বাভাবিক হ্রী আছে সেই লজ্জার আবরণটুকু থাকলেই তবে সে বৃহৎভাবে পরিব্যাপ্ত হতে পারে, নইলে কোনো একটা দিকেই সে জ্বলে উঠে হয়তো কর্মকে নষ্ট ক'রে, জ্ঞানকে বিকৃত ক'রে, সংসারকে আঘাত ক'রে, নিজেকে এক দমে খরচ করে ফেলে। হ্রী দ্বারাই সতী স্ত্রী আপনার প্রেমকে ধারণ করে তাকে নানা দিকে বিকীর্ণ করে দেন—এইরূপে সে প্রেম কাউকে দগ্ধ করে না, সকলকে আলোকিত করে। আমাদের পৃথিবীর এই রকমের একটি আবরণ আছে, সেটি

হচ্ছে বাতাসের আবরণ। এই আবরণটির দ্বারাই ধরণী সূর্যের আলোককে পরিমিত এবং ব্যাপক-ভাবে সর্বত্র বিকীর্ণ করে দেয়। এই আবরণটি না থাকলে রৌদ্র যেখানটিতে পড়ত সেখানটিতে দগ্ধ এবং রুদ্ররূপে উজ্জ্বল করত এবং ঠিক তার পাশেই যেখানে ছায়া সেখানে হিমশীতল মৃত্যু ও নিবিড়তম অন্ধকার বিরাজ করত। অসতীর যে প্রেমে হ্রী নেই, সংযম নেই, সে প্রেম নিজেকে পরিমিত ভাবে সর্বত্র বিকীর্ণ করতে পারে না, সে প্রেম এক জায়গায় উগ্র জ্বালা এবং ঠিক তার পাশেই তেজোহীন আলোকবঞ্চিত ঔদাসীন্য বিস্তার করে।

আমাদেরও এই মানসপুরীর সতীর প্রেমে ধী থাকবে, জ্ঞানের বিশুদ্ধতা থাকবে। এ প্রেম সংস্কারজালে জড়িত মূঢ় প্রেম নয়। পশুদের মতো এ একটা সংস্কারগত অন্ধ প্রেম নয়। এর দৃষ্টি জাগ্রত, এর চিত্ত উন্মুক্ত। কোনো কল্পনার দ্রব্য দিয়ে এ নিজেকে ভুলিয়ে রাখতে চায় না—এ যাকে চায় তার অবাধ পরিচয় চায়, তার সম্বন্ধে সে যে নিজের জ্ঞানকে অপমানিত করে রাখবে এ সে সহ্য করতে পারে না। এর মনে মনে কেবলই ভয় হয় যে, পাছে পাবার একান্ত আগ্রহে একটা কোনো ভুলকে পেয়েই সে নিজেকে শান্ত করে রাখে। পাখি যেমন ডিমে তা দেবার জন্যই ব্যাকুল তাই সে একটা নুড়ি পেলেও তাতে তা দিতে বসে, তেমনি পাছে আমাদের প্রেম কোনোমতে কেবল আত্মসমর্পণ করতেই ব্যগ্র হয়, কাকে যে আত্মসমর্পণ করছে সেটার দিকে পাছে তার কোনো খেয়াল না থাকে, এই আশঙ্কাটুকু যায় না—পতিকে দেখে নেবার জন্যে সন্ধ্যার অন্ধকারে নিজের প্রদীপটিকে যেন সে সাবধানে জ্বালিয়ে রাখতে চায়।

তার পরে আমাদের এই সতীর প্রেমে শ্রী থাকবে, সৌন্দর্যের আনন্দময়তা থাকবে। কিন্তু যদি হ্রী'র অভাব ঘটে, যদি ধী'র বিকার ঘটে, তবে এই শ্রীও নষ্ট হয়ে যায়।

সতী-মৈত্রেয়ী যে প্রার্থনা উচ্চারণ করেছিলেন, তার মধ্যে প্রেমের কোনো অঙ্গের অভাব ছিল না। তিনি যে অমৃত চেয়েছিলেন তা পরিপূর্ণ প্রেম—তা কর্মহীন জ্ঞানহীন প্রমত্ত প্রেম নয়। তিনি বলেছিলেন, অসতো মা সদ্গময়—অসত্য হতে আমাকে সত্যে নিয়ে যাও। তিনি বলেছিলেন, আমি যাঁকে চাই তিনি যে সত্য; নিজেকে সকল দিকে সত্যের নিয়মে, সত্যের বন্ধনে, না বাঁধলে তাঁর সঙ্গে যে আমার পরিণয়বন্ধন সমাপ্ত হবে না। বাক্যে চিন্তায় কর্মে সত্য হতে হবে, তা হলেই যিনি বিশ্বজগতে সত্য, যিনি বিশ্বসমাজে সত্য, তাঁর সঙ্গে আমাদের সম্মিলন সত্য হয়ে উঠবে—নইলে পদে পদে বাধতে থাকবে। এ সাধনা কঠিন সাধনা—এ পুণ্যের সাধনা, এ কর্মের সাধনা।

তার পরে তিনি বলেছিলেন: তমসো মা জ্যোতির্গময়। তিনি যে জ্ঞানস্বরূপ—বিশ্বজগতের মধ্যে তিনি যেমন ধ্রুব সত্যরূপে আছেন, তেমনি সেই সত্যকে যে আমরা জানছি সেই জ্ঞান যে জ্ঞানস্বরূপেরই প্রকাশ। সেইজন্যই তো গায়ত্রীমন্ত্রে এক দিকে ভূলোক ভুবর্লোক স্বর্লোকের মধ্যে তাঁর সত্য প্রত্যক্ষ করবার নির্দেশ আছে, তেমনি অন্য দিকে আমাদের জ্ঞানের মধ্যে তাঁর জ্ঞানকে উপলব্ধি করবারও উপদেশ আছে—যিনি ধী'কে প্রেরণ করছেন তাঁকে জ্ঞানের মধ্যে ধী-স্বরূপ বলেই জানতে হবে। বিশ্বভুবনের মধ্যে সেই সত্যের সঙ্গে মিলিত হবে, জ্ঞানের মধ্যে সেই জ্ঞানের সঙ্গে মিলতে হবে। ধ্যানের দ্বারা, যোগের দ্বারা এই মিলন।

তার পরের প্রার্থনা, মৃত্যোর্মামৃতংগময়! আমরা আমাদের প্রেমকে মৃত্যুর মধ্যে

পীড়িত খণ্ডিত করছি; তোমার অনন্ত প্রেম অখন্ড আনন্দের মধ্যে তাকে সার্থক করো। আমাদের অন্তঃকরণের বহুবিভক্ত রসের উৎস, হে রসস্বরূপ, তোমার পরিপূর্ণ রসসমুদ্রে মিলিত হয়ে চরিতার্থ হোক। এমনি করে অন্তরাত্মা সত্যের সংযমে, জ্ঞানের আলোকে ও আনন্দের রসে পরিপূর্ণ হয়ে, প্রকাশই যাঁর স্বরূপ তাঁকে নিজের মধ্যে লাভ করুক—তা হলেই রুদ্রের যে প্রেমমুখ তাই আমাদের চিরন্তন কাল রক্ষা করবে।

শান্তিনিকেতন, র/১২/১২১-২৪

বিষয়-সংকেত : সংযম জ্ঞান সৌন্দর্য ভিন্ন প্রেম সত্য হয় না। যথার্থ প্রেমে হ্রী, ধী এবং শ্রী তিনেরই থাকতে হবে।

৩৮। মানুষ

৮ ই পৌষ ১৩১৫

...বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে মানুষের সম্পূর্ণ ঐক্য নেই। বিশ্বপ্রবাহের সঙ্গে মানুষ এক টানে, এক তালে চলে না। এইজন্যেই যেখানেই মানুষ থাকে সেইখানেই চারি দিকে সে নিজের একটা তরঙ্গ তোলে; সে একটিমাত্র কথা না বললেও তারার মতো নিঃশব্দ ও একটুমাত্র নড়াচড়া না করলেও বনস্পতির মতো নিস্তব্ধ থাকে না। তার অস্তিত্বই অগ্রসর হয়ে আঘাত করে।

ভগবান ইচ্ছা করেই বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে মানুষের সামঞ্জস্য একটুখানি নষ্ট করে দিয়েছেন—এই তাঁর আনন্দের কৌতুক। ওই-যে আমাদের পঞ্চভূতের মধ্যে একটু বুদ্ধির সঞ্চার করেছেন, একটা অহংকার যোজনা করে বসে আছেন, তাতে করেই আমরা বিশ্ব থেকে আলাদা হয়ে গেছি।—ঐ জিনিসটার দ্বারাতেই আমাদের পঙ্‌ক্তি নষ্ট হয়ে গেছে। এইজন্যেই গ্রহসূর্যতারার সঙ্গে আমরা আর মিল রক্ষা করে চলতে পারি নে—আমরা যেখানে আছি সেখানে যে আমরা আছি এ কথাটা আর কারও ভোলবার জো থাকে না।

ভগবান আমাদের সেই সামঞ্জস্যটি নষ্ট করে প্রকৃতির কাছ থেকে আমাদের একঘরে করে দেওয়াতে, সকালবেলা থেকে রাত্রি পর্যন্ত আমাদের নিজের কাজের ধান্দায় নিজে ঘুরে বেড়াতে হয়।

ওই সামঞ্জস্যটি ভেঙে গেছে বলেই আমাদের প্রকৃতির মধ্যে বিরাট বিশ্বের শান্তি নেই—আমাদের ভিতরকার নানা মহল থেকে রব উঠেছে, 'চাই চাই চাই।' শরীর বলছে চাই, মন বলছে চাই, হৃদয় বলছে চাই—এক মুহূর্তও এই রবের বিশ্রাম নেই। যদি সমস্তর সঙ্গে অবিচ্ছিন্ন মিল থাকত তা হলে আমাদের মধ্যে এই হাজার সুরে চাওয়ার বালাই থাকত না।

আজ অন্ধকার প্রত্যুষে বসে আমার চার দিকে সেই বিচিত্র চাওয়ার কোলাহল শুনছিলুম—কত দরকারের হাঁক। 'ওরে, গোরুটা কোথায় গেল! অমুক কই! আগুন চাই রে! তামাক কোথায়! গাড়িটা ডাক্ রে! হাঁড়িটা পড়ে রইল যে!'

এক জাতের পাখি সকালে যখন গান গায় তখন তারা এক সুরে এক রকমেরই গান গায়—কিন্তু মানুষের এই-যে কলধ্বনি তাতে এক জনের সঙ্গে আর-এক জনের না আছে বাণীর মিল, না আছে সুরের।

কেননা ভগবান ওই-যে অহংকারটি জুড়ে দিয়ে আমাদের জগতের সঙ্গে ভেদ জন্মিয়ে দিয়েছেন তাতে আমাদের প্রত্যেককে স্বতন্ত্র করে দিয়েছেন। আমাদের রুচি আকাঙ্ক্ষা চেষ্টা সমস্তই এক-একটি ভিন্ন ভিন্ন কেন্দ্র আশ্রয় করে এক-একটি অপরূপ মূর্তি ধরে বসে আছে। কাজেই একের সঙ্গে আরের ঠেকাঠেকি ঠোকাঠুকি চলেইছে। কাড়াকাড়ি টানাটানির অন্ত নেই। তাতে কত বেসুর কত উত্তাপ যে জন্মাচ্ছে তার আর সীমা নেই। সেই বেসুরে পীড়িত, সেই তাপে, তপ্ত, আমাদের স্বাতন্ত্র্যগত অসামঞ্জস্য কেবলই সামঞ্জস্যকে প্রার্থনা করছে; সেইজন্যেই আমরা কেবলমাত্র খেয়ে প'রে জীবন ধারণ করে বাঁচি নে। আমরা একটা সুরকে, একটা মিলকে চাচ্ছি। সে চাওয়াটা আমাদের খাওয়াপরার চাওয়ার চেয়ে বেশি বৈ কম নয়—সামঞ্জস্য আমাদের নিতান্তই চাই। সেইজন্যেই কথা নেই বার্তা নেই, আমরা কাব্য রচনা করতে বসে গেছি—কত লিখছি, কত আঁকছি, কত গড়ছি। কত গৃহ কত সমাজ বাঁধছি, কত ধর্মমত ফাঁদছি। আমাদের কত অনুষ্ঠান, কত প্রতিষ্ঠান, কত প্রথা। এই সামঞ্জস্যের আকাঙ্ক্ষার তাগিদে নানা দেশের মানুষ কত নানা আকৃতির রাজ্যতন্ত্র গড়ে তুলছে। কত আইন, কত শাসন, কত রকম-বেরকমের শিক্ষাদীক্ষা। কী করলে নানা মানুষের নানা অহংকারকে সাজিয়ে একটি বিচিত্র সুন্দর ঐক্য স্থাপিত হতে পারে এই চেষ্টায় এই তপস্যায় পৃথিবী জুড়ে সমস্ত মানুষে ব্যস্ত হয়ে রয়েছে।

এই চেষ্টার তাড়নাতেই মানুষ আপনার একটা সৃষ্টি তৈরি করে তুলছে। নিখিল সৃষ্টি থেকে এই অহংকারের মধ্যে নির্বাসিত হওয়াতেই তার এই নিজের সৃষ্টির এত অধিক প্রয়োজন হয়ে উঠেছে। মানুষের ইতিহাস কেবলই এই সৃষ্টির ইতিহাস, এই সমন্বয়ের ইতিহাস; তার সমস্ত ধর্ম ও কর্ম, সমস্ত ভাব ও কল্পনার মধ্যে কেবলই এই অমিলের মেলবার ইতিহাস রচিত হচ্ছে। 'পেতে চাই, পেতে চাই, মিলতে চাই, মিলতে চাই'—এ ছাড়া আর কথা নেই।

সেইজন্যে এই মাঠ জুড়ে নানা লোকের নানা স্বতন্ত্র প্রয়োজনের নানা কলরবের মধ্যে যখন শুনলুম একজন গান গাচ্ছে 'হরি আমায় বিনা মূল্যে পার করে দাও', তখন সেই গানটির ভিতর এই সমস্ত কলরবের মাঝখানটির কথা আমি শুনতে পেলুম। সমস্ত চাওয়ার ভিতরকার চাওয়া হচ্ছে এই পার হতে চাওয়া। যে বিচ্ছিন্ন সে কেবলই বলছে, 'ওগো, আমাকে এই বিচ্ছেদ উত্তীর্ণ করে দাও'। এই বিচ্ছেদ পার হলেই তবে যে প্রেম পূর্ণ হয়। এই প্রেম পূর্ণ না হলে কোনো-কিছু পেয়েই আমার তৃপ্তি নেই—নইলে কেবলই মৃত্যু থেকে মৃত্যুতে যাচ্ছি—একের থেকে আরে ঘুরে মরছি। মিলে গেলেই এই বিষম আপদ চুকে যায়।

কিন্তু, যে মিলটি হচ্ছে অমৃত তাকে পেতে গেলেই তো বিচ্ছেদের ভিতর দিয়েই পেতে হয়। মিল থাকলে তো মিলকে পাওয়া হয় না।

সেইজন্যে ঈশ্বর যে অহংকার দিয়ে আমাদের বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছেন, সেটা তাঁর প্রেমেরই লীলা। অহংকার না হলে বিচ্ছেদ হয় না, বিচ্ছেদ না হলে মিলন হয় না, মিলন না হলে প্রেম হয় না। মানুষ তাই বিচ্ছেদপারাবারের পারে বসে প্রেমকেই নানা আকারে চাইতে চাইতে নানা রকমের তরী গড়ে তুলছে—এ সমস্তই তার পার হবার তরণী—রাজ্যতন্ত্রই বল, সমাজতন্ত্রই বল, আর ধর্মতন্ত্রই বল।

কিন্তু, তাই যদি হয় তবে পার হয়ে যাব কোথায় ? তবে কি অহংকারকে একেবারেই লুপ্ত করে দিয়ে সম্পূর্ণ অবিচ্ছেদের দেশে যাওয়াই অমৃতলোকপ্রাপ্তি ? সেই দেশেই তো ধুলা মাটি পাথর রয়েছে। তারা তো সমষ্টির সঙ্গে একতানে মিলে চলেছে, কোনো বিচ্ছেদ জানে না। এই রকমের আত্মবিলয়ের জন্যেই কি মানুষ কাঁদছে ?

কখনোই নয়। তা যদি হত সকলপ্রকার বিলয়ের মধ্যেই সে সান্ত্বনা পেত, আনন্দ পেত। বিলুপ্তিকে যে মানুষ সর্বান্তঃকরণে ভয় করে তার প্রমাণ-প্রয়োগের কোনো দরকার নেই। কিছু-একটা গেল এ কথার স্মরণ তার সুখের স্মরণ নয়। এই আশংকা এবং এই স্মরণের সঙ্গেই তার জীবনের গভীর বিষাদ জড়িত—সে ধরে রাখতে চায় অথচ ধরে রাখতে পারে না। মানুষ সর্বান্তঃকরণে যদি কিছুকে না চায় তো সে বিলয়কে।

তাই যদি হল তবে যে অসামঞ্জস্য, যে বিচ্ছেদের উপর তার স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠিত, সেইটেকে কি সে চায় ? তাও তো চায় না। এই বিচ্ছেদ এই অসামঞ্জস্যের জন্যেই তো সে চিরদিন কেঁদে মরছে। তার যত পাপ যত তাপ সে তো একেই আশ্রয় করে। এইজন্যেই তো সে গান গেয়ে উঠছে, ‘হরি আমায় বিনা মূল্যে পার করো।’ কিন্তু, পারে যাওয়া যদি লুপ্ত হওয়াই হল তবে তো আমরা মুশকিলেই পড়েছি ; তবে তো এ পারে দুঃখ আর ও পারে ফাঁকি।

আমরা কিন্তু দুঃখকেও চাই নে ফাঁকিকেও চাই নে। তবে আমরা কী চাই, আর সেটা পাবই বা কী করে ?

আমরা প্রেমকেই চাই। কখন সেই প্রেমকে পাই ? যখন বিচ্ছেদ-মিলনের সামঞ্জস্য ঘটে; যখন বিচ্ছেদ মিলনকে নাশ করে না এবং মিলনও বিচ্ছেদকে গ্রাস করে না; দু'ই যখন একসঙ্গে থাকে অথচ তাদের মধ্যে আর বিরোধ থাকে না, তারা পরস্পরের সহায় হয়।

এই ভেদ ও ঐক্যের সামঞ্জস্যের জন্যেই আমাদের সমস্ত আকাঙ্ক্ষা। আমরা এর কোনোটাকেই ছাড়তে চাই নে। আমাদের যা-কিছু প্রয়াস, যা-কিছু সৃষ্টি সে কেবল এই ভেদ ও অভেদের অবিরুদ্ধ ঐক্যের মূর্তি দেখবার জন্যেই, দুইয়ের মধ্যেই এককে লাভ করবার জন্যে। আমাদের প্রেমের ভগবান যখন আমাদের পার করবেন তখন তিনি আমাদের চিরদুঃখের বিচ্ছেদকেই চিরন্তন আনন্দে বিচ্ছেদ করে তুলবেন। তখন তিনি আমাদের এই বিচ্ছেদের পাত্র ভরেই মিলনের সুধা পান করাবেন। তখনই বুঝিয়ে দেবেন বিচ্ছেদটি কী অমূল্য রত্ন।

শান্তিনিকেতন, র/১২/১৩৪-৩৭

বিষয়-সংকেত ঃ মানুষের ক্ষেত্রে সামঞ্জস্য সহজসিদ্ধ নয়, মানুষকে তা অর্জন করতে হয়। বিচ্ছেদ ও মিলনের সামঞ্জস্যে মানুষ প্রেমকে পায়।

৩৯ ৷ দেখা

৪ পৌষ

এই তো দিনের পর দিন, আলোকের পর আলোক আসছে। কতকাল থেকেই আসছে, প্রত্যহই আসছে। এই আলোকের দূতটি পুষ্পকুঞ্জে প্রতিদিন প্রাতেই একটি আশা বহন করে আনছে;যে কুঁড়িগুলির ঈষৎ একটু উদ্‌গম হয়েছে মাত্র তাদের বলছে, 'তোমরা আজ জান না, কিন্তু তোমরাও তোমাদের সমস্ত দলগুলি একেবারে মেলে দিয়ে সুগন্ধে সৌন্দর্যে একেবারে বিকশিত হয়ে উঠবে।' এই আলোকের দূতটি শস্যক্ষেত্রের উপরে তার জ্যোতির্ময় আশীর্বাদ স্থাপন করে প্রতিদিন এই কথাটি বলছে, 'তোমরা মনে করছ, আজ যে বায়ুতে হিল্লোলিত হয়ে তোমরা শ্যামল মাধুর্যে চারি দিকে চক্ষু জুড়িয়ে দিয়েছ এতেই বুঝি তোমাদের সব হয়ে গেল, কিন্তু তা নয়, একদিন তোমাদের জীবনের মাঝখানটি হতে একটি শিষ উঠে একেবারে স্তরে স্তরে ফসলে ভরে যাবে।' যে ফুল ফোটে নি আলোক প্রতিদিন সেই ফুলের প্রতিশ্রুতি নিয়ে আসছে, যে ফসল ধরেনি আলোকের বাণী সেই ফসলের নিশ্চিত আশ্বাসে পরিপূর্ণ। এই জ্যোতির্ময় আশা প্রতিদিনই পুষ্পকুঞ্জকে এবং শস্যক্ষেত্রকে দেখা দিয়ে যাচ্ছে।

কিন্তু এই প্রতিদিনের আলোক, এ তো কেবল ফুলের বনে এবং শস্যের খেতে আসছে না। এ যে রোজই সকালে আমাদের ঘুমের পর্দা খুলে দিচ্ছে। আমাদেরই কাছে এর কি কোনো কথা নেই ? আমাদের কাছেও এই আলো কি প্রত্যহ এমন কোনো আশা আনছে না যে আশার সফল মূর্তি হয়তো কুঁড়িটুকুর মতো নিতান্ত অন্ধভাবে আমাদের ভিতরে রয়েছে, যার শিষটি এখনও আমাদের জীবনের কেন্দ্রস্থল থেকে ঊর্ধ্বে আকাশের দিকে মাথা তোলে নি ?

আলো কেবল একটিমাত্র কথা প্রতিদিন আমাদের বলছে, 'দেখো।' বাস্। 'একবার চেয়ে দেখো।' আর কিছুই না।

আমরা চোখ মেলি, আমরা দেখি। কিন্তু সেই দেখাটুকুর দেখার একটু কুঁড়িমাত্র, এখনও তা অন্ধ। সেই দেখায় দেখার সমস্ত ফসল ধরবার মতো স্বর্গাভিগামী শিষটি এখনও ধরে নি। বিকশিত দেখা এখনও হয় নি, ভরপুর দেখা এখনও দেখি নি।

কিন্তু, তবু রোজ সকালবেলায় বহুযোজন দূরে থেকে আলো এসে বলছে, 'দেখো।' সেই-যে একই মন্ত্ররাজই আমাদের কানে উচ্চারণ করে যাচ্ছে তার মধ্যে একটি অশ্রান্ত আশ্বাস প্রচ্ছন্ন হয়ে রয়েছে—আমাদের এই দেখার ভিতরে এমন একটি দেখার অঙ্কুর রয়েছে যার পূর্ণ পরিণতির উপলব্ধি এখনও আমাদের মধ্যে জাগ্রত হয়ে ওঠে নি।

কিন্তু, এ কথা মনে কোরো না আমার এই কথাগুলি অলংকারমাত্র। মনে কোরো না, আমি রূপকে কথা কচ্ছি। আমি জ্ঞানের কথা, ধ্যানের কথা কিছু বলছি নে, আমি নিতান্তই সরলভাবে চোখে দেখার কথাই বলছি।

আলোক যে দেখাটা দেখায় সে তো ছোটোখাটো কিছুই নয়। শুধু আমাদের নিজের শয্যাটুকু, শুধু ঘরটুকু তো দেখায় না—দিগন্তবিস্তৃত আকাশমণ্ডলের নীলোজ্জ্বল থালাটির মধ্যে যে সামগ্রী সাজিয়ে সে আমাদের সম্মুখে ধরে সে কী অদ্ভুত জিনিস! তার মধ্যে বিস্ময়ের যে অন্ত পাওয়া যায় না। আমাদের প্রতিদিনের যেটুকু দরকার তার চেয়ে সে যে কতই বেশি!

এই-যে বৃহৎ ব্যাপারটি আমরা রোজ দেখছি এই দেখাটা কি নিতান্তই একটা বাহুল্য ব্যাপার? এ কি নিতান্ত অকারণে মুক্তহস্ত ধনীর অপব্যয়ের মতো আমাদের চার দিকে কেবল নষ্ট হবার জন্যেই হয়েছে? এতবড়ো দৃশ্যের মাঝখানে থেকে আমরা কিছু টাকা জমিয়ে, কিছু খ্যাতি নিয়ে, কিছু ক্ষমতা ফলিয়েই যেমনি একদিন চোখ বুজব অমনি এমন বিরাট জগতে চোখ মেলে চাবার আশ্চর্য সুযোগ একেবারে চূড়ান্ত হয়ে শেষ হয়ে যাবে! এই পৃথিবীতে যে আমরা প্রতিদিন চোখ মেলে চেয়েছিলুম এবং আলোক এই চোখকে প্রতিদিনই অভিষিক্ত করেছিল, তার কি পুরা হিসাব ওই টাকা এবং খ্যাতি এবং ভোগের মধ্যে পাওয়া যায়?

না, তা পাওয়া যায় না। তাই আমি বলছি, এই আলোক অন্ধ কুঁড়িটির কাছে প্রত্যহই যেমন একটি অভাবনীয় বিকাশের কথা বলে যাচ্ছে, আমাদের দেখাকেও সে তেমনি করেই আশা দিয়ে যাচ্ছে যে, 'একটি চরম দেখা, একটি পরম দেখা আছে, সেটি তোমার মধ্যেই আছে। সেইটি একদিন ফুটে উঠবে বলেই রোজ আমি তোমার কাছে আনাগোনা করছি।'

তুমি কি ভাবছ, চোখ বুজে ধ্যানযোগে দেখবার কথা আমি বলছি? আমি এই চর্মচক্ষে দেখার কথাই বলছি। চর্মচক্ষুকে চর্মচক্ষু বলে গাল দিলে চলবে কেন? একে শারীরিক বলে তুমি ঘৃণা করবে এত বড়ো লোকটি তুমি কে? আমি বলছি, এই চোখ দিয়েই, এই চর্মচক্ষু দিয়েই এমন দেখা দেখবার আছে যা চরম দেখা—তাই যদি না থাকত তবে আলোক বৃথা আমাদের জাগ্রত করছে, তবে এত বড়ো এই গ্রহতারাচন্দ্রসূর্য-খচিত প্রাণে-সৌন্দর্যে-পরিপূর্ণ বিশ্বজগৎ বৃথা আমাদের চারি দিকে অহরাত্র নানা আকারে আত্মপ্রকাশ করছে। এই জগতের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করার চরম সফলতা কি বিজ্ঞান? সূর্যের চারদিকে পৃথিবী ঘুরছে, নক্ষত্রগুলি এক-একটি সূর্যমণ্ডল—এই কথাগুলি আমরা জানব বলেই এত বড়ো জগতের সামনে আমাদের এই দুটি চোখের পাতা খুলে গেছে? এ জেনেই বা কী হবে?

জেনে হয়তো অনেক লাভ হতে পারে, কিন্তু জানার লাভ সে তো জানারই লাভ; তাতে জ্ঞানের তহবিল পূর্ণ হচ্ছে—তা হোক। কিন্তু আমি যে বলছি চোখে দেখার কথা। আমি বলছি, এই চোখেই আমরা যা দেখতে পাব তা এখনও পাই নি। আমাদের সামনে আমাদের চার দিকে যা আছে তার কোনোটাকেই আমরা দেখতে পাই নি—ওই তৃণটিকেও না। আমাদের মনই আমাদের চোখকে চেপে রয়েছে—সে যে কত মাথামুণ্ড ভাবনা নিয়ে আছে তার ঠিকানা নেই—সেই অশনবসনের ভাবনা দিয়ে সে আমাদের দৃষ্টিকে ঝাপসা করে রেখেছে—সে কত লোকের মুখে থেকে কত সংস্কার নিয়ে জমা

করেছে—তার যে কত বাঁধা শব্দ আছে, কত বাঁধা মত আছে, তার সীমা নেই—সে কাকে যে বলে শরীর কাকে যে বলে আত্মা, কাকে যে বলে হেয় কাকে যে বলে শ্রেয়, কাকে যে বলে সীমা কাকে যে বলে অসীম তার ঠিকানা নেই—এই সমস্ত সংস্কারের দ্বারা চাপা দেওয়াতে আমাদের দৃষ্টি নির্মল নির্মুক্ত ভাবে জগতের সংস্রব লাভ করতেই পারে না।

আলোক তাই প্রত্যহই আমাদের চক্ষুকে নিদ্রালসতা থেকে ধৌত করে দিয়ে বলছে, 'তুমি স্পষ্ট করে দেখো, তুমি নির্মল হয়ে দেখো, পদ্ম যেরকম সম্পূর্ণ উন্মুক্ত হয়ে সূর্যকে দেখে তেমনি করে দেখো।' কাকে দেখবে ? তাঁকে, যাঁকে ধ্যানে দেখা যায় ? না তাঁকে না, যাঁকে চোখে দেখা যায় তাঁকেই। সেই রূপের নিকেতনকে, যাঁর থেকে গণনাতীত রূপের ধারা অনন্তকাল থেকে ঝরে পড়ছে। চারি দিকেই রূপ—কেবলই এক রূপ থেকে আর-এক রূপের খেলা; কোথাও তার আর শেষ পাওয়া যায় না—দেখেও পাই নে, ভেবেও পাই নে। রূপের ঝরনা দিকে দিকে থেকে কেবলই প্রবাহিত হয়ে সেই অনন্তরূপসাগরে গিয়ে ঝাঁপ দিয়ে পড়ছে। সেই অপরূপ অনন্তরূপকে তাঁর রূপের লীলার মধ্যেই যখন দেখব তখন পৃথিবীর আলোকে একদিন আমাদের চোখ মেলা সার্থক হবে, আমাদের প্রতিদিনকার আলোকের অভিষেক চরিতার্থ হবে। আজ যা দেখছি, এই-যে চারি দিকে আমার যে-কেউ আছে, যা-কিছু আছে, এদের একদিন যে কেমন করে, কী পরিপূর্ণ চৈতন্যযোগে দেখব তা আজ মনে করতে পারি নে—কিন্তু এটুকু জানি, আমাদের এই চোখের দেখার সামনে সমস্ত জগৎকে সাজিয়ে আলোক আমাদের কাছে যে আশার বার্তা আনছে তা এখনও কিছুই সম্পূর্ণ হয় নি। এই গাছের রূপটি যে তাঁর আনন্দরূপ, সে দেখা এখনও আমাদের দেখা হয় নি—মানুষের মুখে যে তাঁর অমৃতরূপ, সে দেখার এখনও অনেক বাকি—'আনন্দরূপমমৃতং' এই কথাটি যেদিন আমার এই দুই চক্ষু বলবে সেই দিনই তারা সার্থক হবে।...

শান্তিনিকেতন, র/১২/১২৪-২৬

বিষয়-সংকেত : আমরা চোখ মেলি, দেখি। কিন্তু তা দেখার কুঁড়িমাত্র, তা অন্ধ। স্পষ্ট ক'রে, পরিপূর্ণ চৈতন্যযোগে দেখতে হবে। তাহলে দেখব, চারিদিকেই রূপ, রূপের ঝরণা কেবলই দিকে দিকে প্রবাহিত হচ্ছে। সে অনন্তরূপকে তাঁর রূপের লীলার মধ্যে যখন দেখব, তখনই আমাদের চোখ মেলা সার্থক হবে।

৪০। সঞ্চয়তৃষ্ণা

১০ পৌষ

এক দিনের প্রয়োজনের বেশি যিনি সঞ্চয় করেন না আমাদের প্রাচীন সংহিতায় সেই দ্বিজ গৃহীকেই প্রশংসা করেছেন। কেননা, একবার সঞ্চয় করতে আরম্ভ করলে ক্রমে আমরা সঞ্চয়ের কল হয়ে উঠি, তখন আমাদের সঞ্চয় প্রয়োজনকেই বহু দূরে ছাড়িয়া চলে যায়, এমন-কি, প্রয়োজনকে বঞ্চিত ও পীড়িত করতে থাকে।

আধ্যাত্মিক সঞ্চয়ের সম্বন্ধেও যে এ কথা খাটে না তা নয়। আমরা যদি কোনো পুণ্যকে মনে করি যে ভবিষ্যৎ কোনো একটা ফললাভের জন্যে তাকে জমাচ্ছি, তা হলে জমানোটাই আমাদের পেয়ে বসে—তার সম্বন্ধে আমরা কৃপণের মতো হয়ে উঠি, তার সম্বন্ধে আমাদের স্বাভাবিকতা একেবারে চলে যায়; সব কথাতেই কেবল আমরা সুদের দিকে তাকাই, লাভের হিসাব করতে থাকি।

এমন অবস্থায় পুণ্য আমাদের আনন্দকে উপবাসী করে রাখে এবং মনে করে উপবাস করেই সেই পুণ্যের বৃদ্ধিলাভ হচ্ছে। এইরূপে আধ্যাত্মিক সাধনক্ষেত্রেও অনেক কৃপণ আহারকে জমিয়ে তুলে প্রাণকে নষ্ট করে।

আধ্যাত্মিক গৃহস্থালিতে আমরা কালকের জন্যে আজকে ভাবব না। তা যদি করি তবে আজকেরটাকেই বঞ্চিত করব। আমরা জমানোর কথা চিন্তাই করব না, আমরা খরচই জানি। আমাদের প্রতি দিনের উপাসনা যেন আমাদের প্রতি দিনের নিঃশেষ সামগ্রী হয়। মনে করব না তার থেকে আমরা শান্তিলাভ করব, পুণ্যলাভ করব, ভবিষ্যতে কোনো-এক সময়ে পরিত্রাণলাভ করব, বা আর-কিছু। যা-কিছু সংগ্রহ হয়েছে তা হাতে হাতে সমস্তই তাঁকে ঢেলে শেষ করে দিতে হবে; তাঁকেই সব দেওয়াতেই সেই দেওয়ার শেষ।

যদি আমরা মনে করি তাঁর উপাসনা করে আমার পুণ্য হচ্ছে, তা হলে সমস্ত পূজা ঈশ্বরকে দেওয়া হয় না, পুণ্যের জন্যেই তার অনেকখানি জমানো হয়। যদি মনে করতে আরম্ভ করি ঈশ্বরের যে কাজ করছি তার থেকে লোকহিত হবে, তা হলে লোকহিতের উত্তেজনা ক্রমেই ঈশ্বরের প্রসাদলাভকে খর্ব করে দিয়ে বেড়ে উঠতে থাকে।

ধর্মব্যাপারে এই পাপের ছিদ্র দিয়েই বিষয়কর্মের সাংসারিকতার চেয়ে তীব্রতর সাংসারিকতা প্রবেশলাভ করে। তার থেকেই ক্রোধ বিদ্বেষ পরনিন্দা পরপীড়ন নিশাচরগণ ধর্মের নামে তাদের গুহাগহবর থেকে বেরিয়ে পড়ে, মতের সঙ্গে মতের যুদ্ধে পৃথিবী একেবারে রক্তাক্ত হয়ে ওঠে। তখন ঈশ্বরকে পিছনে ঠেলে রেখে আমরা এগিয়ে চলতে থাকি। আমরা হিত করব, আমরা পুণ্য করব, আমরা ঈশ্বরকে প্রচার করব, এই কথাটাই ক্রমে ভীষণ হয়ে বেড়ে উঠতে থাকে—ঈশ্বর করবেন সে আর মনে থাকে না। তখন ঈশ্বরের ভৃত্যেরাই ঈশ্বরের পথ রোধ করে দাঁড়ায়—কোথায় থাকে শান্তি, কোথায় থাকে হিত, কোথায় থাকে পুণ্য।...

শান্তিনিকেতন, র/১২/১৩৯-৪১

বিষয়-সংকেত ঃ আধ্যাত্মিক সঞ্চয়ও বস্তুসঞ্চয়ের মতো ব্যবসাবৃত্তির ফল। এই বৃত্তি ধর্মকে অধর্মে পরিণত করতে পারে।

৪১। দিন

১৩ পৌষ

...আমাদের যথার্থ তাৎপর্য আমাদের নিজেদের মধ্যে নেই, তা জগতের সমস্তের মধ্যে ছড়িয়ে রয়েছে। সেইজন্যে আমরা বুদ্ধি দিয়ে, হৃদয় দিয়ে, কর্ম দিয়ে কেবলই সমস্তকে খুঁজছি; কেবলই সমস্তের সঙ্গে যুক্ত হতে চাচ্ছি; নইলে যে নিজেকে পাই নে। আত্মাকে সর্বত্র উপলব্ধি করব, এই হচ্ছে আত্মার একমাত্র আকাঙ্ক্ষা।

...আমরা আমাদের নিজেকে সর্বত্র ব্যাপ্ত দেখব এই হলেই নিজেকে সত্যরূপে দেখা হয়। নিজের এই সত্যকে যতই ব্যাপক করে জানব ততই আমাদের আনন্দ হবে। যে-কেউ আমাদের আপনাকে তার নিজের ভিতর থেকে বাইরের দিকে টেনে নিয়ে তাকে আমাদের কাছে সত্যতররূপে প্রকাশ করে তাকেই আমরা আত্মীয় বলি, সেই আমাদের আনন্দ দেয়।

এই কারণেই মানবাত্মা বহু প্রাচীন যুগ হতে গৃহ বল, সমাজ বল, রাজ্য বল, যা-কিছু সৃষ্টি করছে তার ভিতরকার একটিমাত্র মূল তাৎপর্য এই যে, মানুষ একাকিত্ব পরিহার করে বহুর মধ্যে, বিচিত্রের মধ্যে, আপনার নানা শক্তিকে নানা সম্বন্ধে বিস্তৃত করে নিজেকে বৃহৎ ক্ষেত্রে উপলব্ধি করবে—এই তার যথার্থ সুখ।...

যে সমাজ সভ্য সেই সমাজ বহুকে বিচিত্রভাবে আত্মার সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত করে বলেই সে সমাজের গৌরব। নইলে কেবল উপকরণবাহুল্য এবং সুবিধার সমাবেশ তার সার্থকতা নয়।...

এইজন্যেই আমাদের সভ্যতার সাধনা করতে হবে, রেলওয়ে-টেলিগ্রাফের জন্যে নয়। কারণ, রেলওয়ে-টেলিগ্রাফেরও শেষ গম্যস্থান হচ্ছে মানুষ—কোনো স্থানীয় ইস্টেশন-বিশেষ নয়।

এই সভ্যতা-সাধনার গোড়াকার কথাই হচ্ছে ধর্মবুদ্ধি। যতই আপনার প্রসার অল্প হয় ততই ধর্মবুদ্ধি অল্প হলেও চলে। নিজের ঘরে সংকীর্ণ জায়গায় যখন কাজ করি তখন ধর্মবুদ্ধি সংকীর্ণ হলেও বিশেষ ক্ষতি হয় না। কিন্তু, যেখানে বহু লোককে বহু বন্ধনে বাঁধতে হয় সেখানে ধর্মবুদ্ধি প্রবল হওয়া চাই। সেখানে ধৈর্য বীর্য অধ্যবসায় ত্যাগ সেবাপরতা লোকহিতৈষা সমস্তই খুব বড়ো রকমের না হলে নয়। বস্তু কোনোমতেই বৃহৎ হয়ে উঠতে পারে না যদি তাকে ধরে রাখবার উপযোগী ধর্মও বৃহৎ না হয়। ধর্ম যখনই দুর্বল হয় তখনই বৃহৎ সমাজ বিশ্লিষ্ট হয়ে ভেঙে চারি দিকে ছড়িয়ে পড়ে, কখনোই কেউ তাকে বাঁধতে পারে না।...

শান্তিনিকেতন, র/১২/১৪৪-৪৬

বিষয়-সংকেত : আমাদের যথার্থ তাৎপর্য নিজের মধ্যে নয়, সকলের মধ্যে। যে সমাজ সভ্য, সে সমাজ বহুকে নিজের মধ্যে পায়—জ্ঞানে প্রেমে কর্মে। সভ্যতা-সাধনের গোড়ার কথাই হল ধর্মবুদ্ধি। যত আপনার প্রসার অল্প, ধর্মবুদ্ধি তত দুর্বল।

৪২। বিশেষ

১৬ই পৌষ ১৩১৫ (১৯০৮)

জগতের সর্বসাধারণের সঙ্গে সাধারণভাবে আমার মিল আছে। ধূলির সঙ্গে পাথরের সঙ্গে আমার মিল আছে, ঘাসের সঙ্গে গাছের সঙ্গে আমার মিল আছে; পশুপক্ষীর সঙ্গে আমার মিল আছে; সাধারণ মানুষের সঙ্গে আমার মিল আছে; কিন্তু, এক জায়গায়, একেবারে মিল নেই—যেখানে আমি হচ্ছি বিশেষ। আমি যাকে আজ 'আমি' বলছি এর আর কোনো দ্বিতীয় নেই। ঈশ্বরের অনন্ত বিশ্বসৃষ্টির মধ্যে এ সৃষ্টি সম্পূর্ণ অপূর্ব—এ কেবলমাত্র আমি, একলা আমি, অনুপম অতুলনীয় আমি। এই আমির যে জগৎ সে একলা আমারই জগৎ—সে মহাবিজন লোকে আমার অন্তর্যামী ছাড়া আর কারও প্রবেশ করবার কোনো জো নেই।

হে আমার প্রভু, সেই যে একলা আমি, বিশেষ আমি, তার মধ্যে তোমার বিশেষ আনন্দ, বিশেষ আবির্ভাব আছে—সেই বিশেষ আবির্ভাবটি আর কোনো দেশে কোনো কালে নেই। আমার সেই বিশিষ্টতাকে আমি সার্থক করব, প্রভু। আমি-নামক তোমার সকল হতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র এই-যে একটি বিশেষ লীলা আছে, এই বিশেষ লীলায় তোমার সঙ্গে যোগ দেব। এইখানে একের সঙ্গে এক হয়ে মিলব।

পৃথিবীর ক্ষেত্রে আমার এই মানবজন্ম তোমার সেই বিশেষ লীলাটিকে যেন সৌন্দর্যের সঙ্গে, সংগীতের সঙ্গে, পবিত্রতার সঙ্গে, মহত্ত্বের সঙ্গে সচেতনভাবে বহন করে নিয়ে যায়। আমাতে তোমার যে-একটি বিশেষ অধিষ্ঠান আছে সে কথা যেন কোনোদিন কোনোমতেই না ভোলে। অনন্ত বিশ্বসংসারে এই-যে একটি আমি হয়েছি মানবজীবনে এই আমি সার্থক হোক।

এই আমিটিকে আর-সকল হতে স্বতন্ত্র করে অনাদি কাল থেকে তুমি বহন করে আনছ। সূর্য চন্দ্র গ্রহ তারার মধ্যে দিয়ে একে হাতে ধরে নিয়ে এসেছ, কিন্তু কারও সঙ্গে একে জড়িয়ে ফেল নি। কোন্‌ নীহারিকার জ্যোতির্ময় বাষ্পনির্ঝর থেকে অণুপরমাণুকে চালন করে কত সৃষ্টি, কত পরিবর্তন, কত পরিণতির মধ্যে দিয়ে এই আমিকে আজ এই শরীরে ফুটিয়ে তুলেছ। তোমার সেই অনাদি কালের সংগ আমার এই দেহটির মধ্যে সঞ্চিত হয়ে আছে। অনাদি কাল থেকে আজ পর্যন্ত অনন্ত সৃষ্টির মাঝখান দিয়ে একটি বিশেষ রেখাপাত হয়ে এসেছে, সেটি হচ্ছে এই আমির রেখা—সেই রেখাপথে তোমার সঙ্গে আমি বরাবর চলে এসেছি। সেই তুমি আমার অনাদি পথের চালক, অনন্ত পথের অদ্বিতীয় বন্ধু, তোমাকে আমার সেই একলা-বন্ধু রূপে আমার জীবনের মধ্যে উপলব্ধি করব। আর-কোনো কিছুই তোমার সমান না হোক, তোমার চেয়ে বড়ো না হোক। আর, আমার এই-যে সাধারণ জীবন যা নানা ক্ষুধাতৃষ্ণা চিন্তাচেষ্টা দ্বারা আমি সমস্ত তরুলতা পশুপক্ষীর সঙ্গে একত্রে মিলে ভোগ করছি, সেইটেই নানা দিক দিয়ে প্রবল হয়ে না ওঠে—আমাতে তোমার যে-একটি বিশেষ স্পর্শ, বিশেষ ক্রিয়া, বিশেষ আনন্দ অনন্ত কালের সুহৃদ্‌ ও সারথি-রূপে রয়েছে তাকে যেন আচ্ছন্ন করে না দাঁড়ায়। আমি যেখানে জগতের সামিল সেখানে তোমাকে জগদীশ্বর বলে মানি, তোমার সব নিয়ম পালন করবার চেষ্টা করি, না পালন করলে তোমার শাস্তি গ্রহণ করি—কিন্তু, আমি-রূপে

তোমাকে আমি আমার একমাত্র বলে জানতে চাই। সেইখানে তুমি আমাকে স্বাধীন করে দিয়েছ—কেননা, স্বাধীন না হলে প্রেম সার্থক হবে না, ইচ্ছার সঙ্গে ইচ্ছা মিলবে না, লীলার সঙ্গে লীলার যোগ হতে পারবে না। এইজন্যে এই স্বাধীনতার আমি-ক্ষেত্রেই আমার সব দুঃখের চেয়ে পরম দুঃখ তোমার সঙ্গে বিচ্ছেদ, অর্থাৎ অহংকারের দুঃখ; আর, সব সুখের চেয়ে পরম সুখ তোমার সঙ্গে মিলন, অর্থাৎ প্রেমের সুখ।...

শান্তিনিকেতন, র/১২/১৪৮-৪৯

বিষয়-সংকেত ঃ একটা ক্ষেত্রে সকলের সঙ্গে আমার মিল, আর-একটা ক্ষেত্রে আমি বিশেষ, আমি স্বতন্ত্র, আমি স্বাধীন। স্বাধীন না হলে প্রেম সার্থক হয় না। এই স্বাধীনতার আমি-ক্ষেত্রেই ঈশ্বরের সঙ্গে আমার বিচ্ছেদের পরম দুঃখ, আবার মিলনের পরম সুখ।

তুলনীয় প্রসঙ্গ ঃ প্রেমের অধিকার (৪২), বিধান (৪৫), পার্থক্য (৪৬), তাই তোমার আনন্দ (৮৩)।

৪৩। প্রেমের অধিকার

১৭ই পৌষ

কাল রাত্রে এই গানটা আমার মনের মধ্যে বাজছিল—

> নাথ হে, প্রেমপথে সব বাধা ভাঙিয়া দাও।
> মাঝে কিছু রেখো না, থেকো না দূরে।
> নির্জনে সজনে অন্তরে বাহিরে নিত্য তোমারে হেরিব,
> সব বাধা ভাঙিয়া দাও।

কিন্তু, এ কেমন প্রার্থনা! এ প্রেম কার সঙ্গে? মানুষ কেমন করে এ কথা কল্পনাতে এনেছে এবং মুখে উচ্চারণ করেছে যে বিশ্বভুবনেশ্বরের সঙ্গে তার প্রেম হবে?

বিশ্বভুবন বলতে কতখানি বোঝায় এবং তার তুলনায় একজন মানুষ যে কত ক্ষুদ্র সে কথা মনে করলে যে মুখ দিয়ে কথা সরে না। সমস্ত মানুষের মধ্যে আমি ক্ষুদ্র, আমার সুখ দুঃখ কতই অকিঞ্চিৎকর। সৌরজগতের মধ্যে সেই মানুষ একমুষ্টি বালুকার মতো যৎসামান্য, এবং সমস্ত নক্ষত্রলোকের মধ্যে এই সৌরজগতের স্থান এত ছোটো যে অঙ্গের দ্বারা তার গণনা করা দুঃসাধ্য।

সেই সমস্ত অগণ্য অপরিচিত লোকলোকান্তরের অধিবাসী এই মুহূর্তেই সেই বিশ্বেশ্বরের মহারাজ্যে তাদের অভাবনীয় জীবনযাত্রা বহন করছে। এমন-সকল জ্যোতিষ্কলোক অনন্ত আকাশের গভীরতার মধ্যে নিমগ্ন হয়ে রয়েছে যার আলোক যুগযুগান্তর হতে অবিশ্রাম যাত্রা করে আজও আমাদের দূরবীক্ষণ-ক্ষেত্রে এসে প্রবেশ করে

নি। সেইসমস্ত অজ্ঞাত অদৃশ্য লোকও সেই পরমপুরুষের পরমশক্তির উপরে প্রতি মুহূর্তেই একান্ত নির্ভর করে রয়েছে—আমরা তার কিছুই জানি নে।

এমন-যে অচিন্তনীয় ব্রহ্মাণ্ডের পরমেশ্বর, তাঁরই সঙ্গে এই কণার কণা, অণুর অণু, বলে কিনা প্রেম করবে! অর্থাৎ তাঁর রাজসিংহাসনে তাঁর পাশে গিয়ে বসবে! অনন্ত আকাশে নক্ষত্রে নক্ষত্রে তাঁর জগৎযজ্ঞের হোমহুতাশন যুগযুগান্তর জ্বলছে, আমি সেই যজ্ঞক্ষেত্রের অসীম জনতার একটি প্রান্তে দাঁড়িয়ে কোন্‌ দাবির জোরে দ্বারীকে বলছি এই যজ্ঞেশ্বরের এক শয্যায় আমাকে আসন দিতে হবে!

মানুষ জগদীশ্বরের সঙ্গে প্রেম করতে চায়, এও কি তার সেই অত্যাকাঙ্ক্ষারই একটা চরম উন্মত্ততা? তার অহংকারেরই একটা অশান্ত পরিচয়?

কিন্তু, এর মধ্যে তো অহংকারের লক্ষণ নেই। তাঁর প্রেমের জন্যে যে লোক খেপেছে সে যে নিজেকে দীন করে, সকলের পিছনে সে যে দাঁড়ায় এবং যাঁরা ঈশ্বরের প্রেমের দরবারের দরবারি তাঁদের পায়ের ধুলো পেলেও সে যে বাঁচে। কোনো ক্ষমতা কোনো ঐশ্বর্যের কাঙাল সে নয়—সমস্তই সে যে ত্যাগ করবার জন্যেই প্রস্তুত হয়েছে।

সেইজন্যেই জগৎসৃষ্টির মধ্যে এইটেই সকলের চেয়ে আশ্চর্য বলে আমার মনে হয় যে, মানুষ তাঁর প্রেম চায়, এবং সকল প্রেমের চেয়ে সেইটেকেই বড়ো সত্য, বড়ো লাভ বলে চায়। কেন চায়? কেননা, মানুষ যে অধিকার পেয়েছে। এই প্রেমের দাবি যিনি জন্মিয়ে দিয়েছেন তাঁরই সঙ্গে যে প্রেম, এতে আর ভয় লজ্জা কিসের?

তিনি যে আমাকে একটি বিশেষ আমি করে তুলে সমস্ত জগৎ থেকে স্বতন্ত্র করে দিয়েছেন, এইখানেই যে আমার সকলের চেয়ে বড়ো দাবি—সমস্ত সূর্য চন্দ্র তারার চেয়ে বড়ো দাবি। সর্বত্র বিশ্বের ভারাকর্ষণের টান আছে, আমার এই স্বাতন্ত্র্যটুকুর উপর তার কোনো টান নেই। যদি থাকত তা হলে সে যে একে ধূলিরাশির সঙ্গে মিশিয়ে এক করে দিত।

প্রকাণ্ড জগতের চাপ এই আমিটুকুর উপর নেই বলেই এই আমিটি নিজের গৌরব রক্ষা করে কেমন মাথা তুলে চলেছে। পুরাণে বলে কাশী সমস্ত পৃথিবীর বাইরে। বস্তুত আমিই সেই কাশী। আমি জগতের মাঝখানে থেকে সমস্ত জগতের বাইরে।

সেইজন্যেই জগতের সঙ্গে নিজেকে ওজন করে ক্ষুদ্র বললে তো চলবে না। তার সঙ্গে আমি তো তুলনীয় নই।

আমি যে একজন বিশেষ আমি। আমাতে তাঁর শাসন নেই, আমাতে তাঁর বিশেষ আনন্দ। সেই আনন্দের উপরেই আমি আছি, বিশ্বনিয়মের উপরে নেই, এইজন্যেই এই আমির ব্যাপারটি একেবারে সৃষ্টিছাড়া। এইজন্যেই এই পরমাশ্চর্য আমির দিকেই তাকিয়ে উপনিষৎ বলে গিয়েছেন; দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে। বলেছেন, এই আমি আর তিনি, সমান বৃক্ষের ডালে দুই পাখির মতো, দুই সখা একেবারে পাশাপাশি বসে আছেন।

তাঁর জগতের রাজ্যে আমাকে খাজনা দিতে হয়; এই জলস্থল আকাশ-বাতাসের অনেক রকমের ট্যাক্‌স্‌ আছে, সমস্তই আম।.কে কড়ায় গণ্ডায় চুকিয়ে দিতে হয়—যেখানে কিছু দেনা পড়ে সেইখানেই প্রাণ বেরিয়ে যায়। কিন্তু, আমার এই আমিটুকু একবারে

লাখেরাজ, ওইখানেই বন্ধুর মন্দির কিনা—আমার সঙ্গে তাঁর কথা এই যে, 'তুমি ইচ্ছা করে আমাকে যা দেবে তাই নেব, যদি না দাও তবু আমার যা দেবার তার থেকে বঞ্চিত করব না।'

এমন যদি না হত তবে তাঁর জগৎরাজ্যের একলা রাজা হয়ে তাঁর আনন্দ কী হত? কোথাও যাঁর কোনো সমান নেই তিনি কী ভয়ংকর একলা, কী অনন্ত একলা! তিনি ইচ্ছা করে কেবল প্রেমের জোরে এই একাধিপত্য এক জায়গায় পরিত্যাগ করেছেন। তিনি আমার এই আমিটুকুর কুঞ্জবনে বিশেষ করে নেমে এসেছেন, বন্ধু হয়ে আপনি ধরা দিয়েছেন। বলে দিয়েছেন, 'আমার চন্দ্রসূর্যের সঙ্গে তোমার নিজের দামের হিসাব করতে হবে না। কেননা, ওজনদরে তোমার দাম নয়। তোমার দাম আমার আনন্দের মধ্যে, তোমার সঙ্গেই আমার বিশেষ প্রেম বলেই তুমি তুমি হয়েছ।'

এইখানেই আমার এত গৌরব যে তাঁকে সুদ্ধ আমি-অস্বীকার করতে পারি। বলতে পারি, 'আমি তোমাকে চাই নে।'... যেদিন বলতে পারব 'আমার টাকায় কাজ নেই, খ্যাতিতে কাজ নেই, কিছুতে কাজ নেই, তুমি এসো', যেদিন বলতে পারব 'চন্দ্রসূর্যহীন আমার এই একলা ঘরটিতে তুমি আমার আর আমি তোমার', সেই দিন আমার বরশয্যায় বর এসে বসবেন, সেই দিন আমার আমি সার্থক হবে।

সেদিন একটি আশ্চর্য ব্যাপার এই ঘটবে যে, নিজেকে যতই দীন বলে জানব তাঁর প্রেমকে ততই বড়ো করে বুঝব। তাঁর প্রেমের ঐশ্বর্যের উপলব্ধিতে তাঁর প্রেমকেই অনন্ত বলে জানব, নিজেকে বড়ো করে দাঁড়াব না। জ্ঞান পেলে নিজেকে জ্ঞানী বলে গর্ব হয়, কিন্তু প্রেম পেলে নিজেকে অধম বলে জেনেও আনন্দ হয়। পাত্র যতই গভীররূপে শূন্য হয় সুধারসে ভরে উঠলে ততই সে বেশি করে পূর্ণ হয়।...

শান্তিনিকেতন, র/১২/১৫০-৫২

বিষয়-সংকেত: প্রেমের গৌরব আছে, অহংকার নেই। প্রেমের গৌরবেই মানুষ বিশ্বভুবনকে নিজের সমান ক'রে গ্রহণ করতে পারে। প্রেমের এই গৌরবকেই অহংকার বলে ভুল হয়। অহংকার নয়, এ হল প্রেমের অধিকার। মানুষের এই প্রেমের অধিকারের মধ্যেই ঈশ্বর সত্য।
তুলনীয় প্রসঙ্গ: বিশেষ (৪১), বিধান (৪৫), পার্থক্য (৪৬), তাই তোমার আনন্দ (৮৩)।

৪৪। সৌন্দর্য

১৯শে পৌষ

ঈশ্বর 'সত্যং'। তাঁর সত্যকে আমরা স্বীকার করতে বাধ্য। সত্যকে এতটুকুমাত্র স্বীকার না করলে আমাদের নিষ্কৃতি নেই। সুতরাং, অমোঘ সত্যকে আমরা জলে স্থলে আকাশে সর্বত্র দেখতে পাচ্ছি।

কিন্তু, তিনি তো শুধু সত্য নন, তিনি 'আনন্দরূপমমৃতং'। তিনি আনন্দরূপ, অমৃতরূপ। সেই তাঁর আনন্দরূপকে দেখছি কোথায়?

...আনন্দ স্বভাবতই মুক্ত। তার উপরে জোর খাটে না, হিসাব চলে না। এই কারণে আমরা যেদিন আনন্দের উৎসব করি সেদিন প্রতিদিনের বাঁধা নিয়মকে শিথিল করে দিই—সেদিন স্বার্থকে শিথিল করি, প্রয়োজনকে শিথিল করি, আত্মপরের ভেদকে শিথিল করি, সংসারের কঠিন সংকোচকে শিথিল করি—তবেই ঘরের মাঝখানে এমন একটুখানি ফাঁকা জায়গা তৈরি হয় যেখানে আনন্দের প্রকাশ সম্ভবপর। সত্য বাঁধনকেই মানে, আনন্দ বাঁধন মানে না।

এইজন্য বিশ্বপ্রকৃতিতে সত্যের মূর্তি দেখতে পাই নিয়মে, এবং আনন্দের মূর্তি দেখি সৌন্দর্যে। এইজন্য সত্যরূপের পরিচয় আমাদের পক্ষে অত্যাবশ্যক, আনন্দরূপের পরিচয় আমাদের না হলেও চলে। প্রভাতে সূর্যোদয়ে আলো হয় এই কথাটা জানা এবং এটাকে ব্যবহারে লাগানো আমাদের নিতান্ত দরকার, কিন্তু প্রভাত যে সুন্দর সুপ্রশান্ত এটুকু না জানলে আমাদের কোনো কাজের কোনো ক্ষতিই হয় না।

জল স্থল আকাশ আমাদের নানা বন্ধনে বন্ধ করছে, কিন্তু এই জল স্থল আকাশে নানা বর্ণে গন্ধে গীতে সৌন্দর্যের যে বিপুল বিচিত্র আয়োজন সে আমাদের কিছুতে বাধ্য করে না, তার দিকে না তাকিয়ে চলে গেলে সে আমাদের অরসিক বলে গালিও দেয় না!

অতএব দেখতে পাচ্ছি, জগতের সত্যলোকে আমরা বন্ধ, সৌন্দর্যলোকে আমরা স্বাধীন। সত্যকে যুক্তির দ্বারা অখণ্ডনীয়রূপে প্রমাণ করতে পারি, সৌন্দর্যকে আমাদের স্বাধীন আনন্দ ছাড়া আর-কিছুর দ্বারাই প্রমাণ করবার জো নেই। যে ব্যক্তি তুড়ি দিয়ে বলে 'ছাই তোমার সৌন্দর্য', মহাবিশ্বের লক্ষ্মীকেও তার কাছে একেবারে চুপ করে যেতে হয়। কোনো আইন নেই, কোনো পেয়াদা নেই যার দ্বারা এই সৌন্দর্যকে সে দায়ে পড়ে মেনে নিতে পারে।

অতএব, জগতে ঈশ্বরের এই-যে অপরূপ রহস্যময় সৌন্দর্যের আয়োজন এ আমাদের কাছে কোনো মাসুল কোনো খাজনা আদায় করে না, এ আমাদের স্বাধীন ইচ্ছাকে চায়—বলে, 'আমাতে তোমাতে আনন্দ হোক; তুমি স্বত আমাকে গ্রহণ করো।'

তাই আমি বলছিলুম, আমাদের অন্তরাত্মার আমি-ক্ষেত্রের একটা সৃষ্টিছাড়া নিকেতনে সেই আনন্দময়ের যে যাতায়াত আছে জগৎ জুড়ে তার নিদর্শন পড়ে রয়েছে। আকাশের নীলিমায়, বনের শ্যামলতায়, ফুলের গন্ধে সর্বত্রই তাঁর সেই পায়ের চিহ্ন ধরা পড়েছে যে। সেখানে যদি তিনি রাজবেশ ধরে আসতেন তা হলে জোড়হাত করে তাঁকে মানতুম; কিন্তু, তিনি যে বন্ধুর বেশে ধীরপদে আসেন, একেবারে একলা আসেন, সঙ্গে তাঁর পদাতিকগুলো শাসনদণ্ড হাতে জয়ডঙ্কা বাজিয়ে কেউ আসে না—সেইজন্যে পাপ-ঘুম ভাঙতেই চায় না, দরজা বন্ধই থাকে।

কিন্তু, এমন করলে তো চলবে না–শাসনের দায় নেই বলেই লক্ষ্মীছাড়া যদি প্রেমের দায় স্বেচ্ছার সঙ্গে স্বীকার না করে, তবে জন্মজন্ম সে কেবল দাস, দাসানুদাস হয়েই ঘুরে মরবে। মানবজন্ম যে আনন্দের জন্ম সে খবরটা সে যে একেবারে পাবেই না। যেমন প্রভাতে সুস্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি তাঁর আলোক আমাকে সর্বাঙ্গে পরিবেষ্টন করে আছে, যেন ঠিক তেমনি প্রত্যক্ষ বুঝতে পারি তাঁর আনন্দ, তাঁর ইচ্ছা, তাঁর প্রেম আমার জীবনকে

সর্বত্র নীরন্ধ্র নিবিড়ভাবে পরিবৃত করে আছে। যেদিন আমার প্রেম জাগবে সেদিন তাঁর প্রেম আর লেশমাত্র গোপন থাকবে না। কেন যে আমি 'আমি' হয়ে এতদিন এত দুঃখে দ্বারে দ্বারে ঘুরে মরেছি সেদিন সেই বিরহদুঃখের রহস্য এক মুহূর্তে ফাঁস হয়ে যাবে।

শান্তিনিকেতন, র/১২/১৫৪-৫৬

বিষয়-সংকেত ঃ বিশ্বে সত্যের মূর্তি দেখি নিয়মে, এবং আনন্দের মূর্তি দেখি সৌন্দর্যে। সত্যে আমরা বন্দী, সৌন্দর্যে আমরা স্বাধীন। আমাদের মধ্যে যে-একটি স্বাধীন নিকেতন আছে, সেই নিকেতনেই প্রেমের অধিষ্ঠান, সেইখানেই আনন্দময়ের যাওয়া আসা।

তুলনীয় প্রসঙ্গ ঃ তাই তোমার আনন্দ (৮৩)।

৪৫। প্রার্থনার সত্য

২০শে পৌষ

কেউ কেউ বলেন, উপাসনায় প্রার্থনার কোনো স্থান নেই উপাসনা কেবলমাত্র ধ্যান, ঈশ্বরের স্বরূপকে মনে উপলব্ধি করা।

সে কথা স্বীকার করতে পারতুম যদি জগতে আমরা ইচ্ছার কোনো প্রকাশ না দেখতে পেতুম। আমরা লোহার কাছে প্রার্থনা করি নে, পাথরের কাছে প্রার্থনা করি নে—যার ইচ্ছাবৃত্তি আছে তার কাছেই প্রার্থনা জানাই।

ঈশ্বর যদি কেবল সত্যস্বরূপ হতেন, কেবল অব্যর্থ নিয়মরূপে তাঁর প্রকাশ হত, তা হলে তাঁর কাছে প্রার্থনার কথা আমাদের কল্পনাতেও উদিত হতে পারত না। কিন্তু, তিনি নাকি 'আনন্দরূপমমৃতং', তিনি নাকি ইচ্ছাময়, প্রেমময়, আনন্দময়, সেইজন্যে কেবলমাত্র বিজ্ঞানের দ্বারা তাঁকে আমরা জানি নে ইচ্ছার দ্বারাই তাঁর ইচ্ছাস্বরূপকে আনন্দস্বরূপকে জানতে হয়।

...জগতে ইচ্ছার একটি নিদর্শন পেয়েছি সৌন্দর্যে। এই সৌন্দর্য আমাদের ইচ্ছাকে জাগ্রত করে এবং ইচ্ছার উপরেই তার নির্ভর; এইজন্যে আমরা সৌন্দর্যকে উপকরণরূপে ব্যবহার করি প্রেমের ক্ষেত্রে, প্রয়োজনের ক্ষেত্রে নয়। এইজন্যে আমাদের সজ্জা সংগীত সৌগন্ধ্য সেইখানেই যেখানে ইচ্ছার সঙ্গে ইচ্ছার যোগ, আনন্দের সঙ্গে আনন্দের মিলন। জগদীশ্বর তাঁর জগতে এই অনাবশ্যক সৌন্দর্যের এমন বিপুল আয়োজন করেছেন বলেই আমাদের হৃদয় বুঝেছে জগৎ একটি মিলনের ক্ষেত্র—নইলে এখানকার এত সাজসজ্জা একেবারেই বাহুল্য।

জগতে হৃদয়েরও একটা বোঝবার বিষয় আছে, সে কথা একেবারে উড়িয়ে দিলে চলবে কেন? এক দিকে আলোক আছে বলেই আমাদের চক্ষু আছে, এক দিকে সত্য আছে বলেই আমাদের চৈতন্য আছে, এক দিকে জ্ঞান আছে বলেই আমাদের বুদ্ধি আছে—তেমনি আর-এক দিকে কী আছে আমাদের মধ্যে হৃদয় হচ্ছে যার প্রতিরূপ? উপনিষৎ এই

প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন: রসোবৈ সঃ। তিনি হচ্ছেন রস, তিনিই আনন্দ।

...আমরা শক্তির দ্বারা প্রয়োজন সাধন করতে পারি, যুক্তির দ্বারা জ্ঞান লাভ করতে পারি, কিন্তু, আনন্দের সম্বন্ধে শক্তি এবং যুক্তি কেবল দ্বার পর্যন্ত এসে ঠেকে যায়—তাদের বাইরেই দাঁড়িয়ে থাকতে হয়। এই আনন্দের সঙ্গে একেবারে অন্তঃপুরের সম্বন্ধ হচ্ছে ইচ্ছার। আনন্দে কোনোরকম জোর খাটে না—সেখানে কেবল ইচ্ছা, কেবল খুশি।

আমার মধ্যে এই ইচ্ছার নিকেতন হচ্ছে হৃদয়। আমার সেই ইচ্ছাময় হৃদয় কি শূন্যে প্রতিষ্ঠিত, তার পুষ্টি হচ্ছে মিথ্যায়, তার গম্য স্থান হচ্ছে ব্যর্থতার মধ্যে? তবে এই অদ্ভুত উপসর্গটা এল কোথা থেকে, এ এক মুহূর্তও আছে কোন্ উপায়ে? জগতের মধ্যে কি কেবল একটিমাত্রই ফাঁকি আছে? এবং সেই ফাঁকিটিই আমার এই হৃদয়?

তা কখনোই নয়। আমাদের এই ইচ্ছার সময় হৃদয়টি জগদ্‌ব্যাপী ইচ্ছারসের নাড়ীর সঙ্গে বাঁধা–সেইখান থেকেই সে আনন্দরস পেয়ে বেঁচে আছে, না পেলে তার প্রাণ বেরিয়ে যায়; সে অন্নবস্ত্র চায় না, বিদ্যাসাধ্য চায় না, অমৃত চায়, প্রেম চায়। যা চায় তা ক্ষুদ্ররূপে সংসারে এবং চরমরূপে তাঁতে আছে বলেই চায়–নইলে কেবল রুদ্ধ দ্বারে মাথা খুঁড়ে মরবার জন্যে তার সৃষ্টি হয় নি।

অতএব, হৃদয় আপনাকে জানে বলেই নিশ্চয় জানে, তার একটি পরিপূর্ণ কৃতার্থতা অনন্তের মধ্যে আছে। ইচ্ছা কেবল তার দিকেই আছে তা নয়, অন্য দিকেও আছে–অন্য দিকে না থাকলে সে নিমেষকালও থাকত না। এতটুকু কণামাত্রও থাকত না যাতে নিশ্বাসপ্রশ্বাসরূপ প্রাণের ক্রিয়াটুকুও চলতে পারে। সেইজন্যেই উপনিষৎ এত জোর করে বলেছেন: কোহ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ, এষ হ্যেবানন্দয়াতি। কেই বা শরীরের চেষ্টা করত, কেই বা প্রাণধারণ করত, যদি আকাশে এই আনন্দ না থাকতেন–ইনিই আনন্দ দেন।

ইচ্ছার সঙ্গে ইচ্ছার মাঝখানে দৌত্য-সাধন্ করে প্রার্থনা। দুই ইচ্ছার মাঝখানে যে বিচ্ছেদ আছে সেই বিচ্ছেদের উপরে ব্যাকুলবেশে দাঁড়িয়ে আছে ওই প্রার্থনাদূতী। এইজন্যে অসাধারণ সাহসের সঙ্গে বৈষ্ণব বলেছেন যে, জগতের বিচিত্র সৌন্দর্যে ভগবানের বাঁশির যে নানা সুর বেজে উঠছে সে কেবল আমাদের জন্যে তাঁর প্রার্থনা—আমাদের হৃদয়কে তিনি এই অনির্বচনীয় সংগীতে ডাক দিয়ে চাচ্ছেন, সেইজন্যেই তো এই সৌন্দর্যসংগীত আমাদের হৃদয়ের বিরহবেদনাকে জাগিয়ে তোলে।

সেই ইচ্ছাময় এমনি মধুর স্বরে যেখানে আমাদের ইচ্ছাকে চাচ্ছেন সেখানে তাঁর সমস্ত জোরকে একেবারে সম্বরণ করেছেন–যে প্রচন্ড জোরে তিনি সৌরজগৎকে সূর্যের সঙ্গে অমোঘরূপে বেঁধে দিয়েছেন, সেই জোরের লেশমাত্র এখানে নেই–সেইজন্যে এমন করুণ, এমন মধুর সুরে, এমন নানা বিচিত্র রসে বাঁশি বাজছে; আহবানের আর অন্ত নেই।

তাঁর এমন আহবানে আমাদের মনের প্রার্থনা কি জাগবে না? সে কি তার বিরহের ধূলি-আসনে লুটিয়ে কেঁদে উঠবে না? অসত্য অন্ধকার এবং মৃত্যুর নিরানন্দ নির্বাসন থেকে অভিসারযাত্রার সময়ে এই প্রার্থনাদূতীই কি তার কম্পিত দীপশিখাটি নিয়ে আমাদের পথ দেখিয়ে চলবে না?

যতদিন আমাদের হৃদয় আছে, যতদিন প্রেমস্বরূপ ভগবান তাঁর নানা সৌন্দর্য দ্বারা এই জগৎকে আনন্দনিকেতন করে সাজাচ্ছেন, ততদিন তাঁর সঙ্গে মিলন না হলে মানুষের বেদনা ঘুচবে কী করে? ততদিন কোন্ সন্দেহকঠোর জ্ঞানাভিমান মানুষের প্রার্থনাকে অপমানিত করে ফিরিয়ে দিতে পারে?

এই আমাদের প্রার্থনাটি যে বিশ্বমানবের অন্তরের পঙ্কশয্যা থেকে ব্যাকুল শতদলের মতো তার সমস্ত জলরাশির আবরণ ঠেলে আলোকের অভিমুখে মুখ তুলছে—তার সমস্ত সৌগন্ধ্য এবং শিশিরাশ্রুসিক্ত সৌন্দর্য উদ্‌ঘাটিত করে দিয়ে বলছে 'অসতো মা সদ্‌গময়, তমসো মা জ্যোতির্গময়, মৃত্যোর্মামৃতং গময়', মানবহৃদয়ের এই পরিপূর্ণ প্রার্থনার পূজোপহারটিকে মোহ বলে তিরস্কৃত করতে পারে এত বড়ো নিদারুণ শুষ্কতা কার আছে!

শান্তিনিকেতন, র/১২/১৫৬-৫৭

বিষয়-সংকেত ঃ ঈশ্বর কেবল সত্যময় নন, তিনি ইচ্ছাময়, প্রেমময়, আনন্দময়। ইচ্ছার নিদর্শন সৌন্দর্যে। মানুষের মধ্যে তার ইচ্ছার নিকেতন তার হৃদয়ে। ইচ্ছার সঙ্গে ইচ্ছার দৌত্যসাধন করে প্রার্থনা। এই পথেই প্রেমময়ের সঙ্গে মানুষের মিলন সার্থক হয়।

৪৬। বিধান

২১ পৌষ

...ইচ্ছা প্রেম আনন্দের কথাটা উঠলেই তার উল্‌টো কথাটা এসে মনের মধ্যে আঘাত করতে থাকে। সে বলে, তবে এত শাসন বন্ধন কেন? যা চাই তা পাই নে কেন, যা চাই নে তা ঘাড়ে এসে পড়ে কেন?

এইখানে মানুষ তর্কের দ্বারা নয়, কেবলমাত্র বিশ্বাসের দ্বারা এর উত্তর দিতে চেষ্টা করেছে। সে বলেছে: স এব বন্ধুর্জনিতা স বিধাতা। অর্থাৎ, যিনি আমাকে প্রকাশ করেছেন 'স এব বন্ধুঃ', তিনি তো আমার বন্ধু হবেনই। আমাতে যদি তাঁর আনন্দ না থাকত তবে তো আমি থাকতুমই না। আবার, 'স বিধাতা'। বিধাতা আর দ্বিতীয় কেউ নয় যিনি জনিতা তিনিই বন্ধু, বিধানকর্তাও তিনি। অতএব বিধান যাই হোক, মূলে কোনো ভয় নেই।

কিন্তু, বিধান জিনিসটা তো খামখেয়ালি হলে চলে না। আজ একরকম কাল অন্যরকম, আমার পক্ষে একরকম অন্যের পক্ষে অন্যরকম, কখন কিরকম তার কোনো স্থিরতা নেই—এ তো বিধান নয়। বিধান যে বিশ্ববিধান।

এই বিধানের অবিচ্ছিন্ন সূত্রে এই পৃথিবীর ধূলি থেকে নক্ষত্রলোক পর্যন্ত একসঙ্গে গাঁথা রয়েছে। আমার সুখসুবিধার জন্য যদি বলি 'তোমার বিধানের সূত্র এক জায়গায় ছিন্ন করে দাও, এক জায়গায় অন্য-সকলের সঙ্গে আমার নিয়মের বিশেষ পার্থক্য করে

দাও', তা হলে বস্তুত বলা হয় যে, 'এই কাদাটুকু পার হতে আমার কাপড়ে দাগ লাগছে, অতএব এই ব্রহ্মাণ্ডের মণিহারের ঐক্যসূত্রটিকে ছিঁড়ে সমস্ত সূর্যতারাকে রাস্তায় ছড়িয়ে ফেলে দাও।'

এই বিধান জিনিসটা কারও একলার নয় এবং কোনো-এক খণ্ড সময়ের নয়—এই বিশ্ববিধানের যোগেই সমষ্টির সঙ্গে আমরা প্রত্যেকে যুক্ত হয়ে আছি এবং কোনো কালে সে যোগের বিচ্ছেদ নেই। উপনিষদ বলেছেন, যিনি বিশ্বের প্রভু তিনি 'যাথাতথ্যতোহর্থান্ ব্যদধাৎ শাশ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ'। তিনি নিত্যকাল হতে এবং নিত্যকালের জন্য সমস্তই যথাতথরূপে বিধান করছেন। এই বিধানের মূলে শাশ্বতকাল—এ বিধান অনাদি অনন্ত কালের বিধান, তার পরে আবার এই বিধান 'যাথাতথ্যতঃ' বিহিত হচ্ছে; এর আদ্যোপান্তই যথাতথ, কোথাও ছেদ নেই, অসংগতি নেই। আধুনিক বিজ্ঞানশাস্ত্র বিশ্ববিধান সম্বন্ধে এর চেয়ে জোর করে এবং পরিষ্কার করে কিছু বলে নি।

কিন্তু, শুধু তাই যদি হয়, যদি কেবল অমোঘ নিয়মের লৌহ-সিংহাসনে তিনি কেবল বিধাতারূপেই বসে থাকেন, তা হলে তো সেই বিধাতার সামনে আমরা কাঠ-পাথর ধূলি-বালিরই সমান হই। তা হলে তো আমরা শিকলে বাঁধা বন্দী।

কিন্তু, তিনি শুধু তো বিধাতা নন, 'স এব বন্ধুঃ', তিনিই যে বন্ধু।

বিধাতার প্রকাশ তো বিশ্বচরাচরে দেখছি, বন্ধুর প্রকাশ কোন্‌খানে? বন্ধুর প্রকাশ তো নিয়মের ক্ষেত্রে নয়—সে প্রকাশ আমার অন্তরের মধ্যে প্রেমের ক্ষেত্রে ছাড়া আর কোথায় হবে?

বিধাতার কর্মক্ষেত্র এই বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে, আর বন্ধুর আনন্দনিকেতন আমার জীবাত্মায়।

মানুষ এক দিকে প্রকৃতি আর-এক দিকে আত্মা—এক দিকে রাজার খাজনা জোগায়, আর-এক দিকে বন্ধুর ডালি সাজায়। এক দিকে সত্যের সাহায্যে তাকে মঙ্গল পেতে হয়, আর-এক দিকে মঙ্গলের ভিতর দিয়ে তাকে সুন্দর হয়ে উঠতে হয়।

ঈশ্বরের ইচ্ছা যে দিকে নিয়মরূপে প্রকাশ পায় সেই দিকে প্রকৃতি, আর ঈশ্বরের ইচ্ছা যে দিকে আনন্দরূপে প্রকাশ পায় সেই দিকে আত্মা। এই প্রকৃতির ধর্ম বন্ধন, আর আত্মার ধর্ম মুক্তি। এই সত্য এবং আনন্দ, এই বন্ধন এবং মুক্তি, তাঁর বাম এবং দক্ষিণ বাহু। এই দুই বাহু দিয়েই তিনি মানুষকে ধরে রেখেছেন। ...

শান্তিনিকেতন, র/১২/১৫৮-৫৯

বিষয়-সংকেত ঃ বিধান সত্য, তাই ঈশ্বর বিধাতা। কিন্তু তিনি কেবল বিধাতা নন, তিনি বন্ধু। বিধাতার কর্মক্ষেত্র বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে, আর বন্ধুর আনন্দনিকেতন আমার জীবাত্মায়।

তুলনীয় প্রসঙ্গ ঃ বিশেষ (৪১), প্রেমের অধিকার (৪২), পার্থক্য (৪৬), তাই তোমার আনন্দ (৮৩)

৪৭। পার্থক্য

২৩ পৌষ

ঈশ্বর যে কেবল মানুষকেই পার্থক্য দান করেছেন আর প্রকৃতির সঙ্গে মিলে এক হয়ে রয়েছেন, এ কথা বললে চলবে কেন ? প্রকৃতির সঙ্গেও তাঁর একটি স্বাতন্ত্র্য আছে, নইলে প্রকৃতির উপরে তাঁর তো কোনো ক্রিয়া চলত না।

তফাত এই যে, মানুষ জানে সে স্বাতন্ত্র্য–শুধু তাই নয়, সে এও জানে যে ওই স্বাতন্ত্র্যে তার অপমান নয়, তার গৌরব। বাপ যখন বয়ঃপ্রাপ্ত ছেলেকে নিজের তহবিল থেকে একটি স্বতন্ত্র তহবিল করে দেন তখন এই পার্থক্যের দ্বারা তাকে তিরস্কৃত করেন না; বস্তুত, এই পার্থক্যেই তাঁর একটি বিশেষ স্নেহ প্রকাশ পায় এবং এই পার্থক্যের মহাগৌরবটুকু মানুষ কোনোমতেই ভুলতে পারে না।

মানুষ নিজের সেই স্বাতন্ত্র্যগৌরবের অধিকারটি নিয়ে নিজে ব্যবহার করছে। প্রকৃতির মধ্যে সেই অহংকার নেই, সে জানে না সে কী পেয়েছে।

ঈশ্বর এই প্রকৃতিকে কী দিয়ে পৃথক করে দিয়েছেন ? নিয়ম দিয়ে।

নিয়ম দিয়ে না যদি পৃথক করে দিতেন তা হলে প্রকৃতির সঙ্গে তাঁর ইচ্ছার যোগ থাকত না। একাকার হয়ে থাকলে ইচ্ছার গতিবিধির পথ থাকে না।

যে লোক দাবাবড়ে খেলায় নিজের ইচ্ছাকে প্রয়োগ করতে চায় সে প্রথমে নিজের ইচ্ছাকে বাধা দেয়। কেমন করে ? নিয়ম রচনা ক'রে। প্রত্যেক ঘুঁটিকে সে নিয়মে বদ্ধ করে দেয়। এই-যে নিয়ম এ বস্তুত ঘুঁটির মধ্যে নেই, যে খেলবে তারই ইচ্ছার মধ্যে। ইচ্ছা নিজেই নিয়ম স্থাপন করে সেই নিয়মের উপরে নিজেকে প্রয়োগ করতে থাকে, তবেই খেলা সম্ভব হয়।

বিশ্বজগতে ঈশ্বর জলের নিয়ম, স্থলের নিয়ম, বাতাসের নিয়ম, আলোর নিয়ম, মনের নিয়ম, নানাপ্রকার নিয়ম বিস্তার করে দিয়েছেন। এই নিয়মকেই আমরা বলি সীমা। এ সীমা প্রকৃতি কোথাও থেকে মাথায় করে এনেছে তা তো নয়। তাঁর ইচ্ছাই নিজের মধ্যে এই নিয়মকে এই সীমাকে স্থাপন করেছে; নতুবা ইচ্ছা বেকার থাকে, কাজ পায় না। এইজন্যই যিনি অসীম তিনিই সীমার আকর হয়ে উঠেছেন–কেবলমাত্র ইচ্ছার দ্বারা, আনন্দের দ্বারা। সেই কারণেই উপনিষৎ বলেন: আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে। সেইজন্যই বলেন: আনন্দরূপমমৃতং যদ্‌বিভাতি। যিনি প্রকাশ পাচ্ছেন তাঁর যা-কিছু রূপ তা আনন্দরূপ, অর্থাৎ মূর্তিমান ইচ্ছা; আপনাকে সীমায় বেঁধেছে, রূপে বেঁধেছে।

প্রকৃতিতে ঈশ্বর নিয়মের দ্বারা, সীমার দ্বারা যে পার্থক্য সৃষ্টি করে দিয়েছেন সে যদি কেবলমাত্রই পার্থক্য হত তা হলে জগৎ তো সমষ্টিরূপ ধারণ করত না। তা হলে অসংখ্য বিচ্ছিন্নতা এমনি বিচ্ছিন্ন হত যে কেবলমাত্র সংখ্যাসূত্রেও তাদের এক করে জানবার কিছুই থাকত না।

অতএব, এর মধ্যে আর-একটি জিনিস আছে যা এই চিরন্তন পার্থক্যকে চিরকালই অতিক্রম করছে। সেটি কী ? সেটি হচ্ছে শক্তি। ঈশ্বরের শক্তি এই-সমস্ত পার্থক্যের উপর কাজ করে একে এক অভিপ্রায়ে বাঁধছে। সমস্ত স্বতন্ত্র নিয়মবদ্ধ দাবাবড়ের ঘুঁটির

মধ্যে একই খেলোয়াড়ের শক্তি একটি এক-তাৎপর্য-বিশিষ্ট খেলাকে অভিব্যক্ত করে তুলছে।

এইজন্যেই তাঁকে ঋষিরা বলছেন 'কবিঃ'। কবি যেমন ভাষার স্বাতন্ত্র্যকে নিজের ইচ্ছার অধীনে নিজের শক্তির অনুগত করে সুন্দর ছন্দোবিন্যাসের ভিতর দিয়ে একটি আশ্চর্য অর্থ উদ্ভাবিত করে তুলছে তিনিও তেমনি 'বহুধাশক্তিযোগাৎ বর্ণাননেকান্ নিহিতার্থোদিধাতি', অর্থাৎ শক্তিকে বহুর মধ্যে চালিত ক'রে, বহুর সংগে যুক্ত ক'রে, অনেক বর্ণের ভিতর থেকে একটি নিহিত অর্থ ফুটিয়ে তুলছেন,—নইলে সমস্তই অর্থহীন হত।

'শক্তিযোগাৎ', শক্তিযোগের দ্বারা। শক্তি একটি যোগ। এই যোগের দ্বারাই ঈশ্বর সীমাদ্বারা-পৃথক্-কৃত প্রকৃতির সংগে যুক্ত হচ্ছেন; নিয়মের সীমারূপ পার্থক্যের মধ্যে দাঁড়িয়ে তাঁর শক্তি দেশের সংগে দেশান্তরের, রূপের সংগে রূপান্তরের, কালের সংগে কালান্তরের বহুবিচিত্র সংযোগ সাধন ক'রে এক অপূর্ব বিশ্বকাব্য সৃজন করে চলেছে।

এমনি করে যিনি অসীম তিনি সীমার দ্বারাই নিজেকে ব্যক্ত করছেন, যিনি অকালস্বরূপ খণ্ড কালের দ্বারা তাঁর প্রকাশ চলেছে। এই পরমাশ্চর্য রহস্যকেই বিজ্ঞানশাস্ত্রে বলে পরিণামবাদ। যিনি আপনাতেই আপনি পর্যাপ্ত তিনি ক্রমের ভিতর দিয়ে নিজের ইচ্ছাকে বিচিত্ররূপে মূর্তিমান করছেন—জগৎ-রচনায় করছেন, মানবসমাজের ইতিহাসে করছেন।

প্রকৃতির মধ্যে সীমাই হচ্ছে পার্থক্য, আর আত্মার মধ্যে অহংকারের সীমাই হচ্ছে পার্থক্য। এই সীমা যদি তিনি স্থাপিত না করতেন তা হলে তাঁর প্রেমের লীলা কোনোমতে সম্ভবপর হত না। জীবাত্মার স্বাতন্ত্র্যের ভিতর দিয়ে তাঁর প্রেম কাজ করছে। তাঁর শক্তির ক্ষেত্র হচ্ছে নিয়মবন্ধ প্রকৃতি, আর তাঁর প্রেমের ক্ষেত্র হচ্ছে অহংকারবদ্ধ জীবাত্মা। এই অহংকারকে জীবাত্মার সীমা বলে তাকে তিরস্কার করলে চলবে না। জীবাত্মার এই অহংকারে পরমাত্মা নিজের আনন্দের মধ্যে সীমা স্থাপন করেছেন; নতুবা তাঁর আনন্দের কোনো কর্ম থাকে না।

এই অহংকারে যদি কেবল পার্থক্যই সর্বপ্রধান হত তা হলে আত্মায় আত্মায় বিরোধ হবার মতোও সংঘাত ঘটতে পারত না—আত্মার সংগে আত্মার কোনো দিক থেকে কোনো সংস্পর্শই থাকতে পারত না। কিন্তু, তাঁর প্রেম সমস্ত আত্মাকে আত্মীয় করবার পথে চলেছে, পরস্পরকে যোজনা করে প্রত্যেক স্বাতন্ত্র্যের নিহিতার্থটিকে জাগ্রত করে তুলছে। নতুবা জীবাত্মার স্বাতন্ত্র্য ভয়ংকর নিরর্থক হত।

এখানেও সেই আশ্চর্য রহস্য। পরিপূর্ণ আনন্দ অপূর্ণের দ্বারাই আপনার আনন্দলীলা বিকশিত করে তুলছেন। বহুতর দুঃখসুখ বিচ্ছেদমিলনের ভিতর দিয়ে ছায়ালোকবিচিত্র এই প্রেমের অভিব্যক্তি কেবলই অগ্রসর হচ্ছে। স্বার্থ ও অভিমানের ঘাত-প্রতিঘাতে কত আঁকাবাঁকা পথ নিয়ে, কত বিস্তারের মধ্যে দিয়ে, ছোটোবড়ো কত আসক্তি-অনুরক্তিকে বিদীর্ণ করে জীবাত্মার প্রেমের নদী প্রেমসমুদ্রের দিকে গিয়ে মিলছে। প্রেমের শতদল পদ্ম অহংকারের বৃন্ত আশ্রয় করে আত্মা হতে গৃহে, গৃহ হতে সমাজে, সমাজ হতে দেশে, দেশ হতে মানবে, মানব হতে বিশ্বাত্মায় ও বিশ্বাত্মা হতে

পরমাত্মায় একটি একটি করে পাপড়ি খুলে দিয়ে বিকাশের লীলা সমাধান করছে।

শান্তিনিকেতন, র/১২/১৬০-৬২

বিষয়-সংকেত: প্রকৃতির মধ্যে নিয়মের সীমাই হচ্ছে পার্থক্য, আর আত্মার মধ্যে অহংকারের সীমাই হচ্ছে পার্থক্য। সীমা না থাকলে প্রেমের লীলা সম্ভব হত না। জীবাত্মার স্বাতন্ত্রে ভিতর দিয়েই তার প্রেম কাজ করছে। আবার সেই প্রেমই তার স্বাতন্ত্র্যকে ঘুচিয়ে দেয়। পরিপূর্ণ আনন্দ অপূর্ণের দ্বারাই আপনার আনন্দলীলা বিকশিত ক'রে তুলছেন।

তুলনীয় প্রসঙ্গ: বিশেষ (৪১), প্রেমের অধিকার (৪২), বিধান (৪৫), তাই তোমার আনন্দ ৮৩)।

৪৮। প্রকৃতি

২৪ পৌষ

প্রকৃতি ঈশ্বরের শক্তির ক্ষেত্র আর জীবাত্মা তাঁর প্রেমের ক্ষেত্র, এ কথা বলা হয়েছে। প্রকৃতিতে শক্তির দ্বারা তিনি নিজেকে 'প্রচার' করছেন, আর জীবাত্মায় প্রেমের দ্বারা তিনি নিজেকে 'দান' করছেন।

অধিকাংশ মানুষ এই দুই দিকে ওজন সমান রেখে চলতে পারে না। কেউ-বা প্রাকৃতিক দিকেই সাধনা প্রয়োগ করে, কেউ-বা আধ্যাত্মিক দিকে। ভিন্ন ভিন্ন জাতির মধ্যেও এ সম্বন্ধে ভিন্নতা প্রকাশ পায়।

প্রকৃতির ক্ষেত্রে যাদের সাধনা তারা শক্তি লাভ করে, তারা ঐশ্বর্যশালী হয়, তারা রাজ্য সাম্রাজ্য বিস্তার করে। তারা অন্নপূর্ণার বরলাভ করে পরিপুষ্ট হয়।

তারা সর্ব বিষয়ে বড়ো হয়ে ওঠবার জন্যে পরস্পর ঠেলাঠেলি করতে করতে একটা খুব বড়ো জিনিস লাভ করে। অর্থাৎ, তাদের মধ্যে যাঁরা শ্রেষ্ঠ তাঁদের শ্রেষ্ঠ লাভ হচ্ছে ধর্মনীতি।

কারণ, বড়ো হয়ে উঠতে গেলে, শক্তিশালী হয়ে উঠতে গেলেই, অনেকের সঙ্গে মিলতে হয়। এই মিলন-সাধনের উপরেই শক্তির সার্থকতা নির্ভর করে। কিন্তু, বড়ো রকমে, স্থায়ী রকমে, সকলের চেয়ে সার্থক রকমে, মিলতে গেলেই এমন একটি নিয়মকে স্বীকার করতে হয় যা মঙ্গলের নিয়ম, অর্থাৎ বিশ্বের নিয়ম, অর্থাৎ ধর্মনীতি। এই নিয়মকে স্বীকার করলেই সমস্ত বিশ্ব আনুকূল্য করে; যেখানে অস্বীকার করা যায় সেইখানেই সমস্ত বিশ্বের আঘাত লাগতে থাকে—সেই আঘাত লাগতে লাগতে কোন্ সময়ে যে ছিদ্র দেখা দেয় তা চোখেই পড়ে না, অবশেষে বহুদিনের কীর্তি দেখতে দেখতে ভূমিসাৎ হয়ে যায়।

যাঁরা শক্তির ক্ষেত্রে বিশেষ ভাবে কাজ করেন তাঁদের বড়ো বড়ো সাধকেরা এই নিয়মকে বিশেষ করে আবিস্কার করেন। তাঁরা জানেন নিয়মই শক্তির প্রতিষ্ঠাস্থল, তা ঈশ্বরের সম্বন্ধেও যেমন মানুষের সম্বন্ধেও তেমনি। নিয়মকে যেখানে লংঘন করব শক্তিকে সেইখানেই নিরাশ্রয় করা হবে। যার আপিসে নিয়ম নেই সে অশক্ত কর্মী। যার গৃহে নিয়ম নেই সে অশক্ত গৃহী। যে রাষ্ট্র-ব্যাপারে নিয়মলঙ্ঘন হয় সেখানে অশক্ত স্বাতন্ত্র্যের যার বুদ্ধি বিশ্বব্যাপারে নিয়মকে দেখতে পায় না সে জীবনের সর্ব বিষয়েই অশক্ত, অকৃতার্থ, পরাভূত।

এইজন্য যথার্থ শক্তির সাধকেরা নিয়মকে বুদ্ধিতে স্বীকার করেন, বিশ্বে স্বীকার করেন, নিজের কর্মে স্বীকার করেন। এইজন্যই তাঁরা যোজনা করতে পারেন, রচনা করতে পারেন, লাভ করতে পারেন। এইরূপে তাঁরা যে পরিমাণে সত্যশালী হন সেই পরিমাণেই ঐশ্বর্যশালী হয়ে উঠতে থাকেন।

কিন্তু, এর একটি মুশকিল হচ্ছে এই যে, অনেক সময়ে তাঁরা এই ধর্মনীতিকেই মানুষের শেষ সম্বল বলে জ্ঞান করেন। যার সাহায্যে কেবলই কর্ম করা যায়, কেবলই শক্তি কেবলই উন্নতি লাভ করা যায়, সেইটেকেই তাঁরা চরম শ্রেয় বলে জানেন। এইজন্য বৈজ্ঞানিক সত্যকেই তাঁরা চরম সত্য বলে জ্ঞান করেন এবং সকল কর্মের আশ্রয়ভূত ধর্মনীতিকেই তাঁরা পরম পদার্থ বলে অনুভব করেন।

কিন্তু, যারা শক্তির ক্ষেত্রেই তাদের সমস্ত পাওয়াকে সীমাবদ্ধ করে রাখে তারা ঐশ্বর্যকে পায়, ঈশ্বরকে পায় না। কারণ, ঈশ্বর সেখানে নিজেকে প্রচ্ছন্ন রেখে নিজের ঐশ্বর্যকেই উদ্‌ঘাটন করেছেন।

এই অনন্ত ঐশ্বর্যসমুদ্র পার হয়ে ঈশ্বরে গিয়ে পৌঁছবে এমন সাধ্য কার আছে! ঐশ্বর্যের তো অন্ত নেই, শক্তিরও শেষ নেই। যেইজন্য ও পথে ক্রমাগতই অন্তহীন একের থেকে আরের দিকে চলতে হয়। সেইজন্যেই মানুষ এই রাস্তায় চলতে চলতে বলতে থাকে, 'ঈশ্বর নেই—কেবলই এই আছে এবং এই আছে, আর আছে এবং আরও আছে।'

ঈশ্বরের সমান না হতে পারলে তাঁকে উপলব্ধি করব কী করে? আমরা যতই রেলগাড়ি চালাই আর টেলিগ্রাফের তার বসাই, শক্তিক্ষেত্রে আমরা ঈশ্বর হতে অনন্ত দূরে থেকে যাই। যদি স্পর্ধা করে তাঁর সংগে প্রতিযোগিতা করবার চেষ্টা করি তা হলে আমাদের চেষ্টা আপন অধিকারকে লংঘন করে ব্যাসকাশীর মতো অভিশপ্ত এবং বিশ্বামিত্রের সৃষ্টি জগতের মতো বিনাশপ্রাপ্ত হয়।

এইজন্যই জগতের সমস্ত ধর্মসাধকেরা বারম্বার বলেছেন, ঐশ্বর্যপথের পথিকদের ঈশ্বরদর্শন অত্যন্ত দুঃসাধ্য। অন্তহীন চেষ্টা চরমতাহীন পথে তাদের কেবলই ভুলিয়ে ভুলিয়ে নিয়ে যায়।

অতএব, ঈশ্বরকে বাহিরে অর্থাৎ তাঁর শক্তির ক্ষেত্রে কোনো জায়গায় আমরা লাভ করতে পারি নে। সেখানে যে বালুকণাটির অন্তরালে তিনি রয়েছেন সেই বালুকণাটিকে নিঃশেষে অতিক্রম করে এমন সাধ্য কোনো বৈজ্ঞানিকের কোনো যান্ত্রিকের নেই। অতএব, শক্তির ক্ষেত্রে যে লোক ঈশ্বরের সংগে প্রতিযোগিতা করতে যায় সে অর্জুনের

মতো ছদ্মবেশী মহাদেবকে বাণ মারে—সে বাণ তাঁকে স্পর্শ করে না, সেখানে না হেরে উপায় নেই।

এই শক্তির ক্ষেত্রে আমরা ঈশ্বরের দুই মূর্তি দেখতে পাই। এক হচ্ছে অন্নপূর্ণা মূর্তি, এই মূর্তি ঐশ্বর্যের দ্বারা আমাদের শক্তিকে পরিপুষ্ট করে তোলে। আর-এক হচ্ছে করালী কালী মূর্তি, এই মূর্তি আমাদের সীমাবদ্ধ শক্তিকে সংহরণ করে নেয়; আমাদের কোনো দিক দিয়ে শক্তির চরমতায় যেতে দেয় না—না টাকায়, না খ্যাতিতে, না অন্য কোনো বাসনার বিষয়ে। বড়ো বড়ো রাজ্যসাম্রাজ্য ধূলিসাৎ হয়ে যায়, বড়ো বড়ো ঐশ্বর্যভান্ডার ভুক্তশেষ নারিকেলের খোলার মতো পড়ে থাকে। এখানে পাওয়ার মূর্তি খুব সুন্দর উজ্জ্বল এবং মহিমান্বিত, কিন্তু যাওয়ার মূর্তি হয় বিষাদে পরিপূর্ণ নয় ভয়ংকর। তা শূন্যতার চেয়ে শূন্যতর, কারণ, তা পূর্ণতার অন্তর্ধান।

কিন্তু, যেমনই হোক এখানে পাওয়াও চরম নয়, যাওয়াও চরম নয়—এখানে পাওয়া এবং যাওয়ার আবর্তন কেবলই চলেছে। সুতরাং, এই শক্তির ক্ষেত্র মানুষের স্থিতির ক্ষেত্র নয়। এর কোনোখানে এসে মানুষ চিরদিনের মতো বলে না যে এইখানে পৌঁছনো গেল।

শান্তিনিকেতন, র/১২/১৬২-৬৪

বিষয়-সংকেত: প্রকৃতি ঈশ্বরের শক্তির ক্ষেত্র, জীবাত্মা ঈশ্বরের প্রেমের ক্ষেত্র। শক্তির ক্ষেত্রে ঐশ্বর্যলাভ হয়, প্রেমলাভ হয় না। শক্তির ক্ষেত্র মানুষের স্থিতির ক্ষেত্র নয়, মানুষের চিরদিনের মতো পৌঁছনোর ক্ষেত্র হল প্রেমের ক্ষেত্র।

তুলনীয় প্রসঙ্গ: বিধান (৪৫)

৪৯। সমগ্র

২৬ পৌষ

...আমাদের বোঝবার প্রক্রিয়াই এই যে, সত্যকে আমরা এক মুহূর্তে সমগ্র করে দেখতে পাইনে। প্রথমে খন্ড খন্ড ক'রে, তার পরে জোড়া দিয়ে দেখি। এই উপায়ে খন্ডের হিসাবে সত্য করে দেখতে গিয়ে সমগ্রের হিসাবে ভুল করে দেখি। ছবিতে একটি পরিপ্রেক্ষণতত্ত্ব আছে; তদনুসারে দূরকে ছোটো করে এবং নিকটকে বড়ো করে আঁকতে হয়। তা যদি না করি তবে ছবিটি আমাদের কাছে সত্য বলে মনে হয় না। কিন্তু, সমগ্র সত্যের কাছে দূর নিকট নেই, সবই সমান নিকট। এইজন্যে নিকটকে বড়ো করে ও দূরকে ছোটো করে দেখা সারা হলে, তার পরে সমগ্র সত্যের মধ্যে তাকে সংশোধন করে দিতে হয়।

...প্রাকৃতিক এবং আধ্যাত্মিক যেখানে পরিপূর্ণ সামঞ্জস্য লাভ করেছে সেখান থেকে আমাদের লক্ষ্য যেন একান্ত স্খলিত না হয়। যেখানে সত্যের মধ্যে উভয়ের আত্মীয়তা

আছে সেখানে মিথ্যার দ্বারা আত্মবিচ্ছেদ না ঘটাই। কেবলমাত্র ভাষা, কেবল তর্ক, কেবল মোহের দ্বারা প্রাচীর গেঁথে তুলে সেইটেকেই সত্যপদার্থ বলে যেন ভুল না করি।

পূর্ব এবং পশ্চিম দিক যেমন একটি অখন্ড গোলকের মধ্যে বিধৃত হয়ে আছে, প্রাকৃতিক এবং আধ্যাত্মিক তেমনি একটি অখন্ডতার দ্বারা বিধৃত। এর মধ্যে একটিকে পরিহার করতে গেলেই আমরা সমগ্রতার কাছে অপরাধী হব, এবং সে অপরাধের দন্ড অবশ্যম্ভাবী।

ভারতবর্ষ যে পরিমাণে আধ্যাত্মিকতার দিকে অতিরিক্ত ঝোঁক দিয়ে প্রকৃতির দিকে ওজন হারিয়েছে, সেই পরিমাণে তাকে আজ পর্যন্ত জরিমানার টাকা গুনে দিয়ে আসতে হচ্ছে। এমন-কি, তার যথাসর্বস্ব বিকিয়ে যাবার উপক্রম হয়েছে। ভারতবর্ষ যে আজ শ্রীভ্রষ্ট হয়েছে তার কারণ এই যে, সে একচক্ষু হরিণের মতো জানত না যে, যে দিকে তার দৃষ্টি থাকবে না সেই দিক থেকেই ব্যাধের মৃত্যুবাণ এসে তাকে আঘাত করবে। প্রাকৃতিক দিকে সে নিশ্চিন্তভাবে কানা ছিল; প্রকৃতি তাকে মৃত্যুবাণ মেরেছে।

এ কথা যদি সত্য হয় যে, পাশ্চাত্য জাতি প্রাকৃতিক ক্ষেত্রেই সম্পূর্ণ জয়লাভ করবার জন্যে একেবারে উন্মত্ত হয়ে উঠেছে তা হলে এ কথা নিশ্চয়ই জানতে হবে, একদিন তার পরাজয়ের ব্রহ্মাস্ত্র অন্য দিক থেকে এসে অর মর্মস্থানে বাজবে।

মূলে যাদের ঐক্য আছে, সেই ঐক্যমূল থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিলে তারা যে কেবল পৃথক হয় তা নয়, তারা পরস্পরের বিরোধী হয়। ঐক্যের সহজ টানে যারা আত্মীয়রূপে থাকে, বিচ্ছিন্নতার ভিতর দিয়ে তারা প্রলয়সংঘাতে আকৃষ্ট হয়।...

শান্তিনিকেতন, র/১২/১৬৬-৬৮

বিষয়-সংকেত : সত্যের মধ্যে আত্মবিচ্ছেদ নেই, সেখানে প্রাকৃতিকে এবং আধ্যাত্মিকে সামঞ্জস্য ঘটেছে। আধ্যাত্মিকের উপর অতিরিক্ত জোর দিলে শ্রীভ্রষ্ট হতে হবে, যেমন হয়েছে ভারতবর্ষের। প্রাকৃতিকের উপর অতিরিক্ত জোর দিলে উন্মত্ততা সার হবে, যেমন হয়েছে পাশ্চাত্য জাতির।

৫০। কর্ম

২৭ পৌষ

আমাদের দেশের জ্ঞানীসম্প্রদায় কর্মকে বন্ধন বলে থাকেন। এই বন্ধন থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হয়ে নিষ্ক্রিয় হওয়াকেই তাঁরা মুক্তি বলেন। এইজন্য কর্মক্ষেত্রে প্রকৃতিকে তাঁরা ধ্বংস করে নিশ্চিন্ত হতে চান।

এইজন্য ব্রহ্মকেও তাঁরা নিষ্ক্রিয় বলেন, এবং যা-কিছু জাগতিক ক্রিয়া একে মায়া বলে একেবারে অস্বীকার করেন।

কিন্তু, উপনিষৎ বলেন: যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, যেন জাতানি জীবন্তি, যৎ

প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি, তদ্‌বিজিজ্ঞাসস্ব, তদ্‌ব্রহ্ম। যাঁর থেকে সমস্তই জন্মাচ্ছে, যার দ্বারা জীবন ধারণ করছে, যাঁতে প্রয়াণ ও প্রবেশ করছে, তাঁকে জানতে ইচ্ছা করো, তিনিই ব্রহ্ম।

অতএব উপনিষদের ব্রহ্মবাদী বলেন, ব্রহ্মই সমস্ত ক্রিয়ার আধার।

তা যদি হয় তবে কি তিনি এইসকল কর্মের দ্বারা বদ্ধ ?

এক দিকে কর্ম আপনিই হচ্ছে, আর-এক দিকে ব্রহ্ম স্বতন্ত্র হয়ে রয়েছেন, পরস্পরে কোনো যোগ নেই, এ কথাও যেমন আমরা বলতে পারি নে, তেমনি তাঁর কর্ম মাকড়সার জালের মতো, শামুকের খোলার মতো, তাঁর নিজেকে বদ্ধ করছে, এ কথাও বলা চলে না।

এইজন্যই পরক্ষণে ব্রহ্মবাদী বলছেন: আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে, আনন্দেন জাতানি জীবন্তি, আনন্দং প্রয়ন্তভিসংবিশন্তি। ব্রহ্ম আনন্দস্বরূপ। সেই আনন্দ হতেই সমস্ত উৎপন্ন, জীবিত, সচেষ্ট এবং রূপান্তরিত হচ্ছে।

কর্ম দুই রকমে হয়—এক অভাবের থেকে হয়, আর প্রাচুর্য থেকে হয়। অর্থাৎ, প্রয়োজন থেকে হয় বা আনন্দ থেকে হয়।

প্রয়োজন থেকে, অভাব থেকে, আমরা যে কর্ম করি সেই কর্মই আমাদের বন্ধন ; আনন্দ থেকে যা করি সে তো বন্ধন নয়—বস্তুত সেই কর্মই মুক্তি।

এইজন্য আনন্দের স্বভাবই হচ্ছে ক্রিয়া; আনন্দ স্বতই নিজেকে বিচিত্র প্রকাশের মধ্যে মুক্তিদান করতে থাকে। সেইজন্যই অনন্ত আনন্দের অনন্ত প্রকাশ। ব্রহ্ম যে আনন্দ সে এই অনিঃশেষ প্রকাশধর্মের দ্বারাই অহরহ প্রমাণ হচ্ছে। তাঁর ক্রিয়ার মধ্যেই তিনি আনন্দ, এইজন্য তাঁর কর্মের মধ্যেই তিনি মুক্তস্বরূপ।

আমরাও দেখেছি, আমাদের আনন্দের কর্মের মধ্যেই আমরা মুক্ত। আমরা প্রিয়বন্ধুর যে কাজ করি সে কাজ আমাদের দাসত্বে বদ্ধ করে না। শুধু বদ্ধ করে না তা নয়, সেই কর্মই আমাদের মুক্ত করে; কারণ, আনন্দের নিষ্ক্রিয়তাই তার বন্ধন, কর্মই তার মুক্তি।

তবে কর্ম কখন বন্ধন ? যখন তার মূল আনন্দ থেকে সে বিচ্যুত হয়। বন্ধুর বন্ধুত্বটুকু যদি আমাদের অগোচর থাকে, যদি কেবল তার কাজমাত্রই আমাদের চোখে পড়ে, তবে সেই বিনা বেতনের প্রাণপণ কাজকে তার প্রতি একটা ভয়ংকর অত্যাচার বলে আমাদের কাছে প্রতিভাত হবে।

কিন্তু, বস্তুত তার প্রতি অত্যাচার কোন্‌টা হবে ? যদি তার কাজ বন্ধ করে দিই। কারণ, কর্মের মুক্তি আনন্দের মধ্যে এবং আনন্দের মুক্তি কর্মে। সমস্ত কর্মের লক্ষ্য আনন্দের দিকে এবং আনন্দের লক্ষ্য কর্মের দিকে।

এইজন্য উপনিষৎ আমাদের কর্ম নিষেধ করেন নি। ঈশোপনিষৎ বলেছেন, মানুষ কর্মে প্রবৃত্ত হবে না এ কোনোমতে হতেই পারে না।

এইজন্য তিনি পুনশ্চ বলেছেন, যারা কেবল অবিদ্যায় অর্থাৎ সংসারের কর্মে রত তারা অন্ধকারে পড়ে, আর যারা বিদ্যায় অর্থাৎ কেবল ব্রহ্মজ্ঞানে রত তারা ততোধিক অন্ধকারে পড়ে।

এই সমস্যার মীমাংসাস্বরূপ বলেছেন, কর্ম এবং ব্রহ্মজ্ঞান উভয়েরই প্রয়োজন আছে—অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা বিদ্যয়ামৃতমশ্নুতে। কর্মের দ্বারা মৃত্যু উত্তীর্ণ হয়ে বিদ্যা দ্বারা জীব অমৃত লাভ করে।

ব্রহ্মহীন কর্ম অন্ধকার এবং কর্মহীন ব্রহ্ম ততোধিক শূন্যতা। কারণ, তাকে নাস্তিকতা বললেও হয়। যে আনন্দস্বরূপ ব্রহ্ম হতে সমস্ত-কিছুই হচ্ছে সেই ব্রহ্মকে এই-সমস্ত-কিছু -বিবর্জিত করে দেখলে সমস্তকে ত্যাগ করা হয়, সেইসঙ্গে তাঁকেও ত্যাগ করা হয়।

যাই হোক, আনন্দের ধর্ম যদি কর্ম হয় তবে কর্মের দ্বারাই সেই আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মের সঙ্গে আমাদের যোগ হতে পারে। গীতায় একেই বলে কর্মযোগ।

কর্মযোগের একটি লৌকিক রূপ পৃথিবীতে আমরা দেখেছি। সে হচ্ছে পতিব্রতা স্ত্রীর সংসারযাত্রা। সতী স্ত্রীর সমস্ত সংসারকর্মের মূলে আছে স্বামীর প্রতি প্রেম, স্বামীর প্রতি আনন্দ। এইজন্য সংসারকর্মকে তিনি স্বামীর কর্ম জেনেই আনন্দ বোধ করেন—কোনো ক্রীতদাসীও তাঁর মতো এমন করে কাজ করতে পারে না। এই কাজ যদি একান্ত তাঁর নিজের প্রয়োজনের কাজ হ'ত তা হলে এর ভার বহন করা তাঁর পক্ষে দুঃসাধ্য হত। কিন্তু, এই সংসারকর্ম তাঁর পক্ষে কর্মযোগ। এই কর্মের দ্বারাই তিনি স্বামীর সঙ্গে বিচিত্রভাবে মিলিত হচ্ছেন।

আমাদের কর্মক্ষেত্র এই কর্মযোগের যদি তপোবন হয় তবে কর্ম আমাদের পক্ষে বন্ধন হয় না। তা হলে, সতী স্ত্রী যেমন কর্মের দ্বারাই কর্মকে উত্তীর্ণ হয়ে প্রেমকে লাভ করেন, আমরাও তেমনি কর্মের দ্বারাই কর্মের সংসারকে উত্তীর্ণ হয়ে—মৃত্যুং তীর্ত্বা—অমৃতকে লাভ করি।

এইজন্যই গৃহস্থের প্রতি উপদেশ আছে, তিনি যে যে কাজ করবেন তা নিজেকে যেন নিবেদন না করেন—তা করলেই কর্ম তাঁকে নাগপাশে বাঁধবে এবং ঈর্ষাদ্বেষ লোভক্ষোভের বিষনিশ্বাসে তিনি জর্জরিত হতে থাকবেন—তিনি 'যদ্‌যৎ কর্ম প্রকুর্বীত তদ্‌ব্রহ্মণি সমর্পয়েৎ', যে যে কর্ম করবেন সমস্ত ব্রহ্মকে সমর্পণ করবেন। তা হলে, সতী গৃহিণী যেমন সংসারের সমস্ত ভোগের অংশ পরিত্যাগ করেন অথচ সংসারের সমস্ত ভার অশ্রান্ত যত্নে বহন করেন—কারণ, কর্মকে তিনি স্বার্থসাধনরূপে জানেন না, আনন্দসাধনরূপেই, জানেন—আমরাও তেমনি কর্মের আসক্তি দূর ক'রে, কর্মের ফলাকাঙ্ক্ষা বিসর্জন ক'রে, কর্মকে বিশুদ্ধ আনন্দময় করে তুলতে পারব এবং যে আনন্দ আকাশে না থাকলে 'কোহ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ', কেই বা কিছুমাত্র চেষ্টা করত, কেই বা প্রাণ ধারণ করত, জগতের সেই সকল চেষ্টার আকর পরমানন্দের সঙ্গে আমাদের সকল চেষ্টাতে যুক্ত ক'রে জেনে আমরা কোনো কালেও এবং কাহা হতেও ভয় প্রাপ্ত হব না।

শান্তিনিকেতন, র/১২/১৬৮-৭০

বিষয় সংকেত: কর্মমাত্রই বন্ধন হয়। প্রয়োজনের কর্মে বন্ধন, আনন্দের কর্মে মুক্তি। ব্রহ্ম কর্মহীন নন, তিনি সকল ক্রিয়ার আধার। ব্রহ্মহীন কর্ম অন্ধকার, কর্মহীন ব্রহ্ম শূন্যতা। আনন্দের মধ্যেই কর্মের পথে ব্রহ্মের সঙ্গে মানুষের যোগ।

৫৯। প্রাণ

২৯ পৌষ

আত্মক্রীড় আত্মরতিঃ ক্রিয়াবান্ এষ ব্রহ্মবিদাং বরিষ্ঠঃ। ব্রহ্মবিদ্‌দের মধ্যে যাঁরা শ্রেষ্ঠ পরমাত্মায় তাঁদের ক্রীড়া, পরমাত্মায় তাঁদের আনন্দ, এবং তাঁরা ক্রিয়াবান।

শুধু তাঁদের আনন্দ নয়, তাঁদের কর্মও আছে।এই শ্লোকটির প্রথমার্ধটুকু তুললেই কথাটার অর্থ স্পষ্টতর হবে।

প্রাণোহ্যেষ যঃ সর্বভূতৈর্বিভাতি বিজানন্ বিদ্বান্ ভবতে নাতিবাদী। এই যিনি প্রাণরূপে সকলের মধ্যে প্রকাশ পাচ্ছেন, এঁকে যিনি জানেন তিনি এঁকে অতিক্রম করে কোনো কথা বলেন না।

প্রাণের মধ্যে আনন্দ এবং কর্ম এই দুটো জিনিস একত্র মিলিত হয়ে রয়েছে। প্রাণের সচেষ্টতাতেই প্রাণের আনন্দ, প্রাণের আনন্দেই তার সচেষ্টতা।

অতএব, ব্রহ্মই যদি সমস্ত সৃষ্টির প্রাণস্বরূপ হন, তিনিই যদি সৃষ্টির মধ্যে গতির দ্বারা আনন্দ ও আনন্দের দ্বারা গতি সঞ্চার করছেন, তবে যিনি ব্রহ্মবাদী তিনি শুধু ব্রহ্মকে নিয়ে আনন্দ করবেন না তো, তিনি ব্রহ্মকে নিয়ে কর্মও করবেন।

তিনি যে ব্রহ্মবাদী। তিনি তো শুধু ব্রহ্মকে জানেন তা নয়, তিনি যে ব্রহ্মকে বলেন। না বললে তাঁর আনন্দ বাঁধ মানবে কেন? তিনি বিশ্বের প্রাণস্বরূপ ব্রহ্মকে প্রাণের মধ্যে নিয়ে 'ভবতে নাতিবাদী'। অর্থাৎ, ব্রহ্মকে বাদ দিয়ে কোনো কথা বলতে চান না, তিনি ব্রহ্মকেই বলতে চান।

মানুষ ব্রহ্মকে কেমন করে বলে? সেতারের তার যেমন করে গানকে বলে। সে নিজের সমস্ত গতির দ্বারা, স্পন্দনের দ্বারা, ক্রিয়ার দ্বারাই বলে—সর্বতোভাবে গানকে প্রকাশের দ্বারাই সে নিজের সার্থকতা সাধন করে।

ব্রহ্ম নিজেকে কেমন করে বলছেন? নিজের ক্রিয়ার দ্বারা অনন্ত আকাশকে আলোকে ও আকারে পরিপূর্ণ ক'রে, স্পন্দিত ক'রে, ঝংকৃত করে তিনি বলছেন! আনন্দরূপমমৃতং যদ্‌বিভাতি। তিনি কর্মের মধ্যেই আপন আনন্দবাণী বলছেন, আপন অমৃতসংগীত বলছেন। তাঁর সেই আনন্দ এবং তাঁর কর্ম একেবারে একাকার হয়ে দ্যুলোকে ভূলোকে বিকীর্ণ হয়ে পড়েছে।

ব্রহ্মবাদীও যখন ব্রহ্মকে বলবেন তখন আর কেমন করে বলবেন? তাঁকে কর্মের দ্বারাই বলতে হবে। তাঁকে ক্রিয়াবান হতে হবে।

সে কর্ম কেমন কর্ম?—না, যে কর্ম দ্বারা প্রকাশ পায় তিনি 'আত্মক্রীড় আত্মরতিঃ', পরমাত্মায় তাঁর ক্রীড়া, পরমাত্মায় তাঁর আনন্দ। যে কর্মে প্রকাশ পায় তাঁর আনন্দ নিজের স্বার্থ-সাধনে নয়, নিজের গৌরব-বিস্তারে নয়। তিনি যে, 'নাতিবাদী'—তিনি পরমাত্মাকে ছাড়া নিজের কর্মে আর কাউকেই প্রকাশ করতে চান না।

তাই সেই 'ব্রহ্মবিদাং বরিষ্ঠঃ' তাঁর জীবনের প্রত্যেক কাজে নানা ভাষায় নানা রূপে এই সংগীত ধ্বনিত করে তুলছেন: শান্তম্ শিবমদ্বৈতম্। জগৎক্রিয়ার সঙ্গে তাঁর

জীবনক্রিয়া এক ছন্দে এক রাগিণীতে গান করছে।

অন্তরের মধ্যে যা আত্মক্রীড়া, যা পরমাত্মার সঙ্গে ক্রীড়া বাহিরে সেইটিই যে জীবনের কর্ম। অন্তরের সেই আনন্দ বাহিরের সেই কর্মে উচ্ছ্বসিত হচ্ছে, বাহিরের সেই কর্ম অন্তরের সেই আনন্দে আবার ফিরে ফিরে যাচ্ছে। এমনি করে অন্তরে বাহিরে আনন্দ ও কর্মের অপূর্ব সুন্দর আবর্তন চলছে, এবং সেই আবর্তনবেগে নব নব মঙ্গললোকের সৃষ্টি হচ্ছে। সেই আবর্তনবেগে জ্যোতি উদ্দীপ্ত হচ্ছে, প্রেম উৎসারিত হয়ে উঠছে।

এমনি করে যিনি চরাচর নিখিলে প্রাণরূপে, অর্থাৎ একই কালে আনন্দ ও কর্মরূপে, প্রকাশমান সেই প্রাণকে ব্রহ্মবিৎ আপনার প্রাণের দ্বারাই প্রকাশ করেন।...

শান্তিনিকেতন, র/১২/১৭২-৭৩

বিষয়-সংকেত ঃ প্রাণের মধ্যে আনন্দ এবং কর্ম দুটো জিনিস একত্র মিলিত। ব্রহ্মই যখন সমস্ত সৃষ্টির প্রাণস্বরূপ, তখন যিনি ব্রহ্মবাদী, তিনি ব্রহ্মকে নিয়ে শুধু আনন্দই করেন না, কর্মও করেন। অন্তরের আনন্দ বাহিরের কর্মে উচ্ছ্বসিত হয়, বাহিরের কর্ম আবার সেই অন্তরের আনন্দে প্রত্যাবর্তন করে। এই আবর্তনবেগে প্রেম উৎসারিত হয়।

৫২। জগতে মুক্তি

১লা মাঘ

ভারতবর্ষে একদিন অদ্বৈতবাদ কর্মকে অজ্ঞানের অবিদ্যার কোঠায় নির্বাসিত ক'রে অত্যন্ত বিশুদ্ধ হতে চেয়েছিলেন। বলেছিলেন, ব্রহ্ম যখন নিষ্ক্রিয় তখন ব্রহ্মলাভ করতে গেলে কর্মকে সমূলে ছেদন করা আবশ্যক।

সেই অদ্বৈতবাদের ধারা ক্রমে যখন দ্বৈতবাদের নানাশাখাময়ী নদীতে পরিণত হল তখন ব্রহ্ম এবং অবিদ্যাকে নিয়ে একটা দ্বিধা উৎপন্ন হল।

তখন দ্বৈতবাদী ভারত জগৎ এবং জগতের মূলে দুইটি তত্ত্ব স্বীকার করলেন। প্রকৃতি ও পুরুষ।

অর্থাৎ, ব্রহ্মকে তাঁরা নিষ্ক্রিয় নির্‌গুণ বলে এক পাশে সরিয়ে রেখে দিলেন এবং শক্তিকে জগৎক্রিয়ার মূলে যেন স্বতন্ত্র সত্তারূপে স্বীকার করলেন। এইরূপে ব্রহ্ম যে কর্ম দ্বারা বদ্ধ নন এ কথাও বললেন, অথচ কর্ম যে একেবারে কিছুই নয় তাও বলা হল না। শক্তি ও শক্তির কার্য থেকে শক্তিমানকে দূরে বসিয়ে তাঁকে একটা খুব বড়ো পদ দিয়ে তাঁর সঙ্গে সমস্ত সম্বন্ধ একেবারে পরিত্যাগ করলেন।

শুধু তাই নয়, এই ব্রহ্মই যে পরাস্ত, তিনিই যে ছোটো, সে কথাও নানা রূপকের দ্বারা প্রচার করতে লাগলেন।

এমনটি যে ঘটল তার মূলে একটি সত্য আছে।

মুক্তির মধ্যে একই কালে একটি নির্‌গুণ দিক এবং একটি সগুণ দিক দেখা যায়। তারা একত্র বিরাজিত। আমরা সেটা আমাদের নিজের মধ্য থেকেই বুঝতে পারি। সেই কথাটার আলোচনা করবার চেষ্টা করা যাক।

একদিন জগতের মধ্যে একটি অখণ্ড নিয়মকে আমরা আবিষ্কার করি নি। তখন মনে হয়েছে, জগতে কোনো-এক বা অনেক শক্তির কৃপা আছে, কিন্তু বিধান নেই। যখন-তখন যা খুশি তাই হতে পারে। অর্থাৎ, যা-কিছু হচ্ছে তা এমনি একতরফা হচ্ছে যে আমার দিক থেকে তার দিকে যে যাব এমন রাস্তা বন্ধ; সমস্ত রাস্তাই হচ্ছে তার দিক থেকে আমার দিকে, আমার পক্ষে কেবল ভিক্ষার রাস্তাটি খোলা।

এমন অবস্থায় মানুষকে কেবলই সকলের হাতে পায়ে ধরে বেড়াতে হয়। আগুনকে বলতে হয় 'তুমি দয়া করে জ্বলো', বাতাসকে বলতে হয় 'তুমি দয়া করে বও', সূর্যকে বলতে হয় 'তুমি যদি কৃপা করে না উদয় হও তবে আমার রাত্রি দূর হবে না'।

ভয় কিছুতেই ঘোচে না।—অব্যবস্থিতচিত্তস্য প্রসাদোঽপি ভয়ংকরঃ। যেখানে ব্যবস্থা দেখতে পাই নে সেখানে প্রসাদেও মন নিশ্চিন্ত হয় না। কারণ সেই প্রসাদের উপর আমার নিজের কোনো দাবি নেই, সেটা একেবারেই একতরফা জিনিস।

অথচ, যার সঙ্গে এত বড়ো কারবার তার সঙ্গে মানুষ নিজের একটা যোগের পথ না খুলে যে বাঁচতে পারে না। কিন্তু, তার মধ্যে যদি কোনো নিয়ম না থাকে তবে তার সঙ্গে যোগেরও তো কোনো নিয়ম থাকতে পারে না।

এমন অবস্থায় যে লোকই তাকে যেরকমই তুকতাক বলে তাই সে আঁকড়ে থাকতে চায়; সেই তুকতাক যে মিথ্যে তাও তাকে বোঝানো অসম্ভব, কারণ, বোঝাতে গেলেও নিয়মের দোহাই দিয়েই তো বোঝাতে হয়। কাজেই মানুষ মন্ত্রতন্ত্র তাগাতাবিজ এবং অর্থহীন বিচিত্র বাহ্যপ্রক্রিয়া নিয়ে অস্থির হয়ে বেড়াতে থাকে।

জগতে এরকম করে থাকা ঠিক পরের বাড়ি থাকা। সেও আবার এমন পর যে খামখেয়ালিতার অবতার। হয়তো পাত পেড়ে দিয়ে গেল, কিন্তু অন্ন আর দিলই না। হয়তো হঠাৎ হুকুম হল, আজই এখনই ঘর ছেড়ে বেরোতে হবে।

এইরকম জগতে পরান্নভোজী পরাবসথশায়ী হয়ে মানুষ পীড়িত এবং অবমানিত হয়। সে নিজেকে বদ্ধ বলেই জানে ও দীন বলে শোক করতে থাকে।

এর থেকে মুক্তি কখন পাই? এর থেকে পালিয়ে গিয়ে নয়। কারণ, পালিয়ে যাব কোথায়? মরবার পথও যে এ আগলে বসে আছে।

জ্ঞান যখন বিশ্বজগতে অখণ্ড নিয়মকে আবিষ্কার করে, যখন দেখে কার্য-কারণের কোথাও ছেদ নেই, তখন সে মুক্তিলাভ করে।

কেননা, জ্ঞান তখন জ্ঞানকেই দেখে। এমন-কিছুকে পায় যার সঙ্গে তার যোগ আছে, যা তার আপনারই। তার নিজের যে আলোক, সর্বত্রই সেই আলোক। এমন-কি, সর্বত্রই সেই আলোক অখণ্ডরূপে না থাকলে সে নিজেই বা কোথায় থাকত?

এতদিনে জ্ঞান মুক্তি পেলে। সে আর তো বাধা পেল না। সে বলল, 'আঃ বাঁচা গেল, এ যে আমাদেরই বাড়ি, এ যে আমার পিতৃভবন। আর তো আমাকে সংকুচিত হয়ে, অপমানিত হয়ে থাকতে হবে না। এতদিন স্বপ্ন দেখছিলুম যেন কোন্ পাগলাগারদে

আছি। আজ স্বপ্ন ভেঙেই দেখি, শিয়রের কাছে পিতা বসে আছেন, সমস্তই আমার আপনার।'

এই তো হল জ্ঞানের মুক্তি। বাইরের কিছু থেকে নয়, নিজেরই কল্পনা থেকে।

কিন্তু, এই মুক্তির মধ্যেই জ্ঞান চুপচাপ বসে থাকে না। তার মন্ত্রতন্ত্র তাগাতাবিজের শিকল ছিন্নভিন্ন করে এই মুক্তির ক্ষেত্রে তার শক্তিকে প্রয়োগ করে।

যখন আমরা আত্মীয়ের পরিচয় পাই তখন সেই পরিচয়ের উপরেই তো চুপচাপ করে বসে থাকতে পারি নে, তখন আত্মীয়ের সঙ্গে আত্মীয়তার আদানপ্রদান করবার জন্য উদ্যত হয়ে উঠি।

জ্ঞান যখন জগতে জ্ঞানের পরিচয় পায়, তখন তার সঙ্গে কাজে যোগ দিতে প্রবৃত্ত হয়। তখন পূর্বের চেয়ে তার কাজ ঢের বেড়ে যায়, কারণ, মুক্তির ক্ষেত্রে শক্তির অধিকার বহুবিস্তৃত হয়ে পড়ে। তখন জ্ঞানের সঙ্গে জ্ঞানের যোগে জাগ্রত শক্তি বহুধা হয়ে প্রসারিত হতে থাকে।

তবেই দেখা যাচ্ছে, জ্ঞান বিশ্বজ্ঞানের মধ্যে আপনাকে উপলব্ধি ক'রে আর চুপ ক'রে থাকতে পারে না। তখন শক্তিযোগে কর্মদ্বারা নিজেকে সার্থক করতে থাকে।

প্রথমে অজ্ঞান থেকে মুক্তির মধ্যে জ্ঞান নিজেকে লাভ করে, তার পরে নিজেকে দান করা তার কাজ। কর্মের দ্বারা সে নিজেকে দান করে, সৃষ্টি করে, অর্থাৎ, সর্জন করে। অর্থাৎ, যে শক্তিকে পরের ঘরে বন্দীর মতো থেকে কেবলই বদ্ধ করে রেখেছিল সেই শক্তিকেই আত্মীয়ঘরে নিয়তই ত্যাগ করে সে হাঁপ ছেড়ে বাঁচে।

অতএব দেখা যাচ্ছে, মুক্তির সঙ্গে সঙ্গেই কর্মের বৃদ্ধি বৈ হ্রাস নয়।

কিন্তু, কর্ম যে অধীনতা। সে কথা স্বীকার করতেই হবে। কর্মকে সত্যের অনুগত হতেই হবে, নিয়মের অনুগত হতেই হবে, নইলে সে কর্মই হতে পারবে না।

তা, কী করা যাবে? নিন্দাই কর আর যাই কর, আমাদের ভিতরকার শক্তি সত্যের অধীন হতেই চাচ্ছেন। সেই তাঁর প্রার্থনা। সেইজন্যেই মহাদেবের প্রসাদপ্রার্থী পার্বতীর মতো তিনি তপস্যা করছেন।

জ্ঞান যেদিন পুরোহিত হয়ে সত্যের সঙ্গে আমাদের শক্তির পরিণয় সাধন করিয়ে দেন তখনই আমাদের শক্তি সতী হন, তখন তাঁর বন্ধ্যাদশা আর থাকে না। তিনি সত্যের অধীন হওয়াতেই সত্যের ঘরে কর্তৃত্ব লাভ করতে পারেন।

অতএব, কেবল মুক্তির দ্বারা সাফল্য নয়, তারও পরের কথা হচ্ছে অধীনতা। দানের দ্বারা অর্জন যেমন তেমনি এই অধীনতার দ্বারাই মুক্তি সম্পূর্ণ সার্থক হয়। এইজন্যই দ্বৈতশাস্ত্রে নির্গুণ ব্রহ্মের উপরে সগুণ ভগবানকে ঘোষণা করেন। আমাদের প্রেম জ্ঞান ও শক্তি এই তিনকেই পূর্ণভাবে ছাড়া দিতে পারলেই তবেই তো তাকে মুক্তি বলব— নির্গুণ ব্রহ্মে তার যে কোনো স্থান নেই।

শান্তিনিকেতন, র/১২/১৭৩-৭৫

বিষয়-সংকেত ঃ মুক্তির মধ্যে একই কালে একটি নির্গুণ দিক এবং একটি সগুণ দিক দেখা যায়। তারা একত্র বিরাজিত।

জ্ঞান যখন বিশ্বজগতের অখন্ড নিয়মকে আবিষ্কার করে, যখন দেখে কার্যকারণে কোথাও ছেদ নেই, তখন সে মুক্তিলাভ করে। অজ্ঞান থেকে মুক্তির মধ্যেই জ্ঞান নিজেকে লাভ করে, তখন শক্তিযোগে কর্মের দ্বারা সে নিজেকে সার্থক করে, তখন কর্মের দ্বারা সে নিজেকে সৃষ্টি করে। মুক্তিতে কর্মের হ্রাস নয়, কর্মের বৃদ্ধি। আমাদের প্রেম জ্ঞান ও শক্তি এই তিনকে পূর্ণভাবে ছাড়া দিতে পারলেই মুক্তি—নির্গুণ ব্রহ্মে তার স্থান নেই।

তুলনীয় প্রসঙ্গ ঃ বিধান (৪৫), সমাজে মুক্তি (৫২)

৫৩। সমাজে মুক্তি

১লা মাঘ

মানুষের কাছে কেবল জগৎপ্রকৃতি নয়, সমাজপ্রকৃতি বলে আর-একটি আশ্রয় আছে। এই সমাজের সঙ্গে মানুষের কোন্ সম্বন্ধটা সত্য সে কথা ভাবতে হয়। কারণ, সেই সত্য সম্বন্ধেই মানুষ সমাজে মুক্তিলাভ করে, মিথ্যাকে সে যতখানি আসন দেয় ততখানিই বন্ধ হয়ে থাকে।

আমরা অনেক সময় বলেছি ও মনে করেছি, প্রয়োজনের তাগিদেই মানুষ সমাজে বদ্ধ হয়েছে। আমরা একত্রে দল বাঁধলে বিস্তর সুবিধা আছে। রাজা আমার বিচার করে, পুলিস আমার পাহারা দেয়, পৌরপরিষৎ আমার রাস্তা ঝাঁট দিয়ে যায়, ম্যাঞ্চেস্টার আমার কাপড় জোগায় এবং জ্ঞানলাভ প্রভৃতি আরও বড়ো বড়ো উদ্দেশ্যও এই উপায়ে সহজ হয়ে আসে। অতএব, মানুষের সমাজ সমাজস্থ প্রত্যেকের স্বার্থসাধনের প্রকৃষ্ট উপায়।

এই প্রয়োজনের তাগিদেই মানুষ সমাজে আবদ্ধ হয়েছে এই কথাকেই অন্তরের সঙ্গে যদি সত্য বলে জানি, তা হলে সমাজকে মানবহৃদয়ের কারাগার বলতে হয়। সমাজকে একটা প্রকান্ড এঞ্জিনওয়ালা কারখানা বলে মানতে হয়; ক্ষুধানলদীপ্ত প্রয়োজনই সেই কলের কয়লা জোগাচ্ছে।

যে হতভাগ্য এইরকম অত্যন্ত-প্রয়োজন-ওয়ালা হয়ে সংসারের খাটুনি খেটে মরে সে তো কৃপামাত্র সন্দেহ নেই।

সংসারের এই বন্দীশাল-মূর্তি দেখেই তো সন্ন্যাসী বিদ্রোহ করে ওঠে। সে বলে, 'প্রয়োজনের তাড়ায় আমি সমাজের হরিণবাড়িতে পাথর ভেঙে মরব! কোনোমতেই না। জানি আমি প্রয়োজনের চেয়ে অনেক বড়ো। ম্যাঞ্চেস্টার আমার কাপড় জোগাবে? দরকার কী! আমি কাপড় ফেলে দিয়ে বনে চলে যাব। বাণিজ্যের জাহাজ দেশবিদেশ থেকে আমার খাদ্য এনে দেবে? দরকার নেই, আমি বনে গিয়ে ফল মূল খেয়ে থাকব।'

কিন্তু, বনে গেলেও যখন প্রয়োজন আমার পিছনে পিছনে নানা আকারে তাড়া করে তখন এত বড়ো স্পর্ধা আমাদের মুখে সম্পূর্ণ শোভা পায় না।

তবে সংসারের মধ্যে আমাদের মুক্তি কোন্‌খানে ? প্রেমে। যখনই জানব প্রয়োজনই মানবসমাজের মূলগত নয়, প্রেমই এর নিগূঢ় এবং চরম আশ্রয়, তখনই এক মুহূর্তে আমরা বন্ধনমুক্ত হয়ে যাব। তখনই বলে উঠব, 'প্রেম! আঃ! বাঁচা গেল। তবে আর কথা নেই। কেননা, প্রেম যে আমারই জিনিস। এ তো আমাকে বাহির থেকে তাড়া লাগিয়ে বাধ্য করে না। প্রেমই যদি মানবসমাজের তত্ত্ব হয় তবে সে তো আমারই তত্ত্ব। অতএব, প্রেমের দ্বারা মুহূর্তেই আমি প্রয়োজনের সংসার থেকে মুক্ত আনন্দের সংসারে উত্তীর্ণ হলুম।'— যেন পলকে স্বপ্ন ভেঙে গেল।

এই তো গেল মুক্তি। তার পরে ? তার পরে অধীনতা। প্রেম মুক্তি পাবামাত্রই সেই মুক্তিক্ষেত্রে আপনার শক্তিকে চরিতার্থ করবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। তখন তার কাজ পূর্বের চেয়ে অনেক বেশি বেড়ে ওঠে। তখন সে পৃথিবীর দীন দরিদ্রেরও দাস, তখন সে মূঢ় অধমেরও সেবক। এই হচ্ছে মুক্তির পরিণাম।

যে মুক্ত তার তো ওজর নেই। সে তো বলতে পারবে না, 'আমার আপিস আছে, আমার মনিব আছে, বাইরে থেকে তাড়া আছে।' কাজেই যেখান থেকেই ডাক পড়ে তার আর 'না' বলবার জো নেই। মুক্তির এত বড়ো দায়। আনন্দের দায়ের মতো দায় আর কোথায় আছে!

যদি বলি মানুষ মুক্তি চায়, তবে মিথ্যা কথা বলা হয়। মানুষ মুক্তির চেয়ে ঢের বেশি চায়। মানুষ অধীন হতেই চায়। যার অধীন হলে অধীনতার অন্ত থাকে না তারই অধীন হবার জন্যে সে কাঁদছে। সে বলছে, 'হে পরম প্রেম, তুমি যে আমার অধীন, আমি কবে তোমার অধীন হব! অধীনতার সঙ্গে অধীনতার পূর্ণ মিলন হবে কবে! যেখানে আমি উদ্ধত, গর্বিত, স্বতন্ত্র, সেইখানেই আমি পীড়িত, আমি ব্যর্থ। হে নাথ, আমাকে অধীন করে নত করে বাঁচাও। যতদিন আমি এই মিথ্যেটাকে অত্যন্ত করে জেনেছিলুম যে আমিই হচ্ছে আমি, তার অধিক আমি আর নেই, ততদিন আমি কী ঘোরাই ঘুরেছি! আমার ধন আমার মানের বোঝা নিয়ে মরেছি। যখনই স্বপ্ন ভেঙে যায় বুঝতে পারি, তুমি পরম-আমি আছ—আমার আমি তারই জোরে আমি—তখনই এক মুহূর্তে মুক্তি লাভ করি।' কিন্তু শুধু তো মুক্তিলাভ নয়। তার পরে পরম অধীনতা। পরম-আমির কাছে সমস্ত আমিত্বর অভিমান জলাঞ্জলি দিয়ে একেবারে অনন্ত পরিপূর্ণ অধীনতার পরমানন্দ।

শান্তিনিকেতন, র/১২/১৭৫-৭৭

বিষয়-সংকেত : মানুষ কেবল প্রয়োজনের তাগিদে সমাজ গড়লে সমাজ তার কারাগার হত। মানুষ সমাজ গড়েছে হৃদয়ের তাগিদেও, আনন্দের তাগিদেও। সমাজে সংসারে প্রয়োজনের ক্ষেত্রে মানুষ যেমন বন্দী, তেমনি আনন্দের ক্ষেত্রে, প্রেমের ক্ষেত্রে মানুষের মুক্তি।

তুলনীয় প্রসঙ্গ : জগতে মুক্তি (৫১)

৫৪। দুই

৪ মাঘ

> স পর্যগাচ্ছুক্রমকায়মব্রণমস্নাবিরং শুদ্ধমপাপবিদ্ধং।
> কবির্মনীষী পরিভূঃ স্বয়ম্ভূর্যাথাতথ্যতোহর্থান্
> ব্যদধাচ্ছাশ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ।

উপনিষদের এই মন্ত্রটিকে আমি অনেকদিন অবজ্ঞা করে এসেছি। নানা কারণেই এই মন্ত্রটিকে খাপছাড়া এবং অদ্ভুত মনে হত।

বাল্যকাল থেকে আমরা এই মন্ত্রের অর্থ এইভাবে শুনে আসছি—'তিনি সর্বব্যাপী নির্মল, নিরবয়ব, শিরা ও ব্রণ-রহিত, শুদ্ধ, অপাপবিদ্ধ। তিনি সর্বদর্শী, মনের নিয়ন্তা, সকলের শ্রেষ্ঠ ও স্বপ্রকাশ; তিনি সর্বকালে প্রজাদিগকে যথোপযুক্ত অর্থসকল বিধান করিতেছেন।'

ঈশ্বরের নাম এবং স্বরূপের তালিকা নানা স্থানে শুনে শুনে আমাদের অভ্যস্ত হয়ে গেছে। এখন এগুলি আবৃত্তি করা এত সহজ হয়ে পড়েছে যে এজন্য আর চিন্তা করতে হয় না, সুতরাং যে শোনে তারও চিন্তা উদ্রেক করে না।

বাল্যকালে উল্লিখিত মন্ত্রটিকে আমি চিন্তার দ্বারা গ্রহণ করি নি, বরঞ্চ আমার চিন্তার মধ্যে একটি বিদ্রোহ ছিল। প্রথমত, এর ব্যাকরণ এবং রচনাপ্রণালীতে ভারী একটা শৈথিল্য দেখতে পেতুম। তিনি সর্বব্যাপী এই কথাটাকে একটা ক্রিয়াপদের দ্বারা প্রকাশ করা হয়েছে; যথা 'স পর্যগাৎ'। তার পরে তাঁর অন্য সংজ্ঞাগুলি 'শুক্রম্' 'অকায়ম্' প্রভৃতি বিশেষণপদের দ্বারা ব্যক্ত হয়েছে। দ্বিতীয়ত, 'শুক্রম্' 'অকায়ম্' এগুলি ক্লীবলিঙ্গ, তার পরেই হঠাৎ 'কবির্মনীষী' প্রভৃতি পুংলিঙ্গ বিশেষণের প্রয়োগ হয়েছে। তৃতীয়ত, ব্রহ্মের শরীর নেই এই পর্যন্তই সহ্য করা যায়, কিন্তু ব্রণ নেই, স্নায়ু নেই বললে এক তো বাহুল্য বলা হয়, তার পরে আবার কথাটাকে অত্যন্ত নামিয়ে নিয়ে আসা হয়। এইসকল কারণে আমাদের উপাসনার এই মন্ত্রটি দীর্ঘকাল আমাকে পীড়া করেছে।

অন্তঃকরণ যখন ভাবকে গ্রহণ করবার জন্যে প্রস্তুত থাকে না তখন শ্রদ্ধাহীন শ্রোতার কাছে কথাগুলি তার সমস্ত অর্থটা উদ্‌ঘাটিত করে দেয় না। অধ্যাত্মমন্ত্রকে যখন সাহিত্য-সমালোচনার কান দিয়ে শুনেছি তখন সাহিত্যের দিক দিয়েও তার ঠিক বিচার করতে পারি নি।

আমি সেজন্যে অনুতপ্ত নই, বরঞ্চ আনন্দিত। মূল্যবান জিনিসকে তখনই লাভ করা সৌভাগ্য যখন তার মূল্য বোঝবার শক্তি কিছু পরিমাণে হয়েছে; যথার্থ অভাবের পূর্বে পেলে পাওয়ার আনন্দ ও সফলতা থেকে বঞ্চিত হতে হয়।

পূর্বে আমি দেখতে পাই নি যে এই মন্ত্রের দুটি ছত্রে দুটি ক্রিয়াপদ প্রধান স্থান অধিকার করে আছে। একটি হচ্ছে 'পর্যগাৎ'; তিনি সর্বত্রই গিয়েছেন, সর্বত্রই আছেন। আর-একটি হচ্ছে 'ব্যদধাৎ'; তিনি সমস্তই করছেন। এই মন্ত্রের এক অর্ধে তিনি আছেন, অন্য অর্ধে তিনি করছেন।

যেখানে আছেন সেখানে ক্লীবলিঙ্গ বিশেষণপদ, যেখানে করছেন সেখানে পুংলিঙ্গ

বিশেষণ। অতএব, বাহুল্য কোনো কথা না বলে একটি ব্যাকরণের ইঙ্গিতের দ্বারা এই মন্ত্র একটি গভীর সার্থকতা লাভ করেছে।

তিনি সর্বত্র আছেন; কেননা, তিনি মুক্ত, তাঁর কোথাও কোনো বাধা নেই। না আছে শরীরের বাধা, না আছে পাপের বাধা। তিনি আছেন এই ধ্যানটিকে সম্পূর্ণ করতে গেলে তাঁর সেই মুক্ত বিশুদ্ধ স্বরূপকে মনে উজ্জ্বল করে দেখতে হয়। তিনি যে কিছুতেই বদ্ধ নন এইটিই সর্বব্যাপিত্বের লক্ষণ।

শরীর যার আছে সে সর্বত্র নেই। শুধু সর্বত্র নেই তা নয়; সে সর্বত্র নির্বিকারভাবে থাকতে পারে না, কারণ শরীরের ধর্মই বিকার। তাঁর শরীর নেই, সুতরাং তিনি নির্বিকার, তিনি অব্রণ। যার শরীর আছে সে ব্যক্তি স্নায়ু প্রভৃতির সাহায্যে নিজের প্রয়োজন সাধন করে; সেরকম সাহায্য তাঁর পক্ষে সম্পূর্ণ অনাবশ্যক। শরীর নেই বলার দরুণ কী বলা হল তা ঐ অব্রণ ও অস্নাবির বিশেষণের দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে; তাঁর শারীরিক সীমা নেই, সুতরাং তাঁর বিকার নেই এবং খন্ডভাবে খন্ড উপকরণের দ্বারা তাঁকে কাজ করতে হয় না। তিনি 'শুদ্ধং অপাপবিদ্ধং'; কোনোপ্রকার পাপপ্রবৃত্তি তাঁকে এক দিকে হেলিয়ে এক দিকে বেঁধে রাখে না। সুতরাং, তিনি সর্বত্রই সম্পূর্ণ সমান। এই তো গেল 'স পর্যগাৎ'।

তার পরে 'স ব্যদধাৎ'; যেমন অনন্ত দেশে তিনি 'পর্যগাৎ' তেমনি অনন্ত কালে তিনি 'ব্যদধাৎ'। বদ্যধাৎ শাশ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ। নিত্য কাল হতে বিধান করছেন এবং নিত্য কালের জন্য বিধান করছেন। সে বিধান কিছুমাত্র এলোমেলো নয়—যাথাতথ্যতোহর্থান্ ব্যদধাৎ—যেখানকার যেটি অর্থ ঠিক সেইটেই একেবারে যথাতথরূপে বিধান করছেন। তার আর লেশমাত্র ব্যত্যয় হবার জো নেই।

এই যিনি বিধান করেন তাঁর স্বরূপ কী? তিনি কবি। এ স্থলে কবি শব্দের প্রতিশব্দস্বরূপ সর্বদর্শী কথাটা ঠিক চলে না। কেননা, এখানে তিনি যে কেবল দেখছেন তা নয়, তিনি করছেন। কবি শুধু দেখেন জানেন তা নয়, তিনি প্রকাশ করেন। তিনি যে কবি অর্থাৎ তাঁর আনন্দ যে একটি সুশৃঙ্খল সুষমার মধ্যে সুবিহিত ছন্দে নিজেকে প্রকাশ করছে, তা তাঁর এই জগৎ মহাকাব্য দেখলেই টের পাওয়া যায়। জগৎ-প্রকৃতিতে তিনি কবি, মানুষের মনঃপ্রকৃতিতে তিনি অধীশ্বর। বিশ্বমানবের মন যে আপনা-আপনি যেমন-তেমন করে একটা কান্ড করছে তা নয়, তিনি তাকে নিগূঢ়ভাবে নিয়ন্ত্রিত করে ক্ষুদ্র থেকে ভূমার দিকে, স্বার্থ থেকে পরমার্থের দিকে নিয়ে চলেছেন। তিনিই হচ্ছেন 'পরিভূঃ'। কি জগৎপ্রকৃতি কি মানুষের মন, সর্বত্র তাঁর প্রভুত্ব। কিন্তু, তাঁর এই কবিত্ব ও প্রভুত্ব বাইরের কিছু থেকে নিয়মিত হচ্ছে না; তিনি স্বয়ম্ভূ—তিনি নিজেকেই নিজে প্রকাশ করেন। এইজন্যে তাঁর কর্মকে, তাঁর বিধানকে, বাইরে থেকে দেশে বা কালে বাধা দেবার কিছুই নেই; এবং এই কারণেই শাশ্বত কালে তাঁর বিধান, এবং যথাতথরূপে তাঁর বিধান।

আমাদের স্বভাবেও এইরকম ভাববাচ্য ও কর্মবাচ্য দুই বাচ্য আছে। আমরাও হই এবং করি। আমাদের হওয়া যতই বাধামুক্ত ও সম্পূর্ণ হবে আমাদের করাও ততই সুন্দর ও যথাতথ হয়ে উঠবে। আমাদের হওয়ার পূর্ণতা কিসে? না, পাপশূন্য বিশুদ্ধতায়। বৈরাগ্যদ্বারা আসক্তিবন্ধন থেকে মুক্ত, হও, পবিত্র হও, নির্বিকার হও। সেই ব্রহ্মচর্যসাধনায় তোমার হওয়া যেমন সম্পূর্ণ হতে থাকবে, যতই তুমি তোমার বাধামুক্ত

নিষ্পাপ চিত্তের দ্বারা সর্বত্র ব্যাপ্ত হতে থাকবে, যতই সকলের মধ্যে প্রবেশের অধিকার লাভ করবে, ততই তুমি সংসারকে কাব্য করে তুলবে, মনকে রাজ্য করে তুলবে; বাহিরে এবং অন্তরে প্রভুত্ব লাভ করবে। অর্থাৎ, আত্মার স্বয়ম্ভূত্ব সুস্পষ্ট হবে, অনুভব করবে তোমার মধ্যে একটি মুক্তির অধিষ্ঠান আছে।

একই অনন্ত চক্রে ভাব এবং কর্ম কেমন মিলিত হয়েছে, হওয়া থেকে করা স্বতই নিজের স্বয়ম্ভূ আনন্দে কেমন করে সৌন্দর্যে ও ঐশ্বর্যে বহুধা হয়ে উঠেছে, বিশুদ্ধ নির্বিশেষে বিচিত্র বিশেষের মধ্যে কেমন ধরা দিয়েছেন, যিনি অকায় তিনি কায়ের কাব্যরচনা করছেন, যিনি অপাপবিদ্ধ তিনি পাপপুণ্যময় মনের অধিপতি হয়েছেন—কোনোখানে এর আর ছেদ পাওয়া যায় না—উপনিষদের ঐ একটি ছোটো মন্ত্রে সে কথা সমস্তটা বলা হয়েছে।

শান্তিনিকেতন, র/১২/১৮১-৮৩

বিষয় সংকেতঃ ঈশ্বর সর্বত্র আছেন এবং নিত্যকাল বিধান করছেন, আমাদের স্বভাবেও তেমনি একই সঙ্গে ভাব বাচ্য এবং কর্মবাচ্য, হই এবং করি। ঈশ্বর একদিকে কবি, তাঁর আনন্দ সুশৃঙ্খল সুষমায় নিজেকে প্রকাশ করে, আবার তিনি অধীশ্বর, সর্বত্র তাঁর বিধানের প্রভুত্ব। আমাদেরও তেমনি বাধামুক্তভাবে হওয়াতে হওয়ার পূর্ণতা, স্বয়ম্ভূ আনন্দে কবিত্বের পূর্ণতা।

তুলনীয় প্রসঙ্গ: বিধান (৪৫), জগতে মুক্তি (৫১)

৫৫। তিনতলা

১০ ফাল্গুন ১৩১৫(১৯০৯)

আমাদের তিনটে অবস্থা দেখতে পাই। তিনটে বড়ো বড়ো স্তরে মানবজীবন গড়ে তুলছে—একটা প্রাকৃতিক, একটা ধর্মনৈতিক, একটা আধ্যাত্মিক।

প্রথম অবস্থায় প্রকৃতিই আমাদের সব। তখন আমরা বাইরেই থাকি। তখন প্রকৃতিই আমাদের সমস্ত উপলব্ধির ক্ষেত্রই হয়ে দাঁড়ায়। তখন বাইরের দিকেই আমাদের সমুদয় প্রবৃত্তি, সমুদয় চিন্তা, সমুদয় প্রয়াস। এমন-কি, আমাদের মনের মধ্যে যা গড়ে ওঠে তাকেও আমরা বাইরে স্থাপন না করে থাকতে পারি না; আমাদের মনের জিনিসগুলিও আমাদের কল্পনায় বাহ্য রূপ গ্রহণ করতে থাকে। আমরা সত্য তাকেই বলি যাকে দেখতে ছুঁতে পাওয়া যায়। এইজন্য আমাদের দেবতাকেও কোনো বাহ্য পদার্থের মধ্যে বদ্ধ ক'রে অথবা তাঁকে কোনো বাহ্য রূপ দান ক'রে আমরা তাঁকে প্রাকৃতিক বিষয়েরই শামিল করে দিই। বাহিরের এই দেবতাকে আমরা বাহ্য প্রক্রিয়া-দ্বারা শান্ত করবার চেষ্টা করি। তাঁর সম্মুখে বলি দিই, খাদ্য দিই, তাঁকে কাপড় পরাই। তখন দেবতার অনুশাসনগুলিও বাহ্য অনুশাসন। কোন্ নদীতে স্নান করলে পুণ্য, কোন্ খাদ্য আহার করলে পাপ, কোন্ দিকে

মাথা রেখে শুতে হবে, কোন্ মন্ত্র কিরকম নিয়মে কোন্ তিথিতে কোন্ দণ্ডে উচ্চারণ করা আবশ্যক—এই সমস্তই তখন ধর্মানুষ্ঠান।

এমনি করে দৃষ্টি ঘ্রাণ স্পর্শাদি-দ্বারা, মনের দ্বারা, কল্পনার দ্বারা, ভয়ের দ্বারা, ভক্তির দ্বারা, বাহিরকে নানা রকম করে নেড়েচেড়ে, তাকে নানা রকমে আঘাত করে এবং তার দ্বারা আঘাত খেয়ে আমরা বাহিরের পরিচয়ের সীমায় এসে ঠেকি। তখন বাহিরকেই আর পূর্বের মতো একমাত্র বলে মনে হয় না। তখন তাকেই আমাদের একমাত্র গতি, একমাত্র আশ্রয়, একমাত্র সম্পদ বলে আর জানি নে। সে আমাদের সম্পূর্ণ আশাকে জাগিয়ে তুলে একদিন আমাদের সমস্ত মনকে টেনে নিয়েছিল ব'লেই যখন আমরা তার সীমা দেখতে পেলুম তখন তার উপরে আমাদের একান্ত অশ্রদ্ধা জন্মালো। তখন প্রকৃতিকে মায়াবিনী বলে গাল দিতে লাগলুম, সংসারকে একেবারে সর্বতোভাবে অস্বীকার করবার জন্যে মনে বিদ্রোহ জন্মালো। তখন বলতে লাগলুম, যার মধ্যে কেবলই আধিব্যাধি মৃত্যু, কেবলই ঘানির বলদের চলার মতো অনন্ত প্রদক্ষিণ, তাকেই আমরা সত্য ব'লে তারই কাছে সমস্ত আত্মসমর্পণ করেছিলুম—আমাদের এই মূঢ়তাকে ধিক্।

তখন বাহিরকে নিঃশেষে নিরস্ত করে দিয়ে আমরা অন্তরেই বাসা বাঁধবার চেষ্টা করলুম। যে বাহিরকে একদিন রাজা বলে মেনেছিলুম তাকে কঠোর যুদ্ধে পরাস্ত করে দিয়ে ভিতরকেই জয়ী বলে প্রচার করলুম। যে প্রবৃত্তিগুলি এতদিন বাহিরের পেয়াদা হয়ে আমাদের সর্বদাই বাহিরের তাগিদেই ঘুরিয়ে মেরেছিল তাদের জেলে দিয়ে, শূলে চড়িয়ে, ফাঁসি দিয়ে, একেবারে নির্মূল করবার চেষ্টায় প্রবৃত্ত হলুম। যে-সমস্ত কষ্ট ও অভাবের ভয় দেখিয়ে বাহির আমাদের দাসত্বের শৃঙ্খল পরিয়েছিল, সেই-সকল কষ্ট ও অভাবকে আমরা একেবারে তুচ্ছ করে দিলুম। রাজসূয় যজ্ঞ ক'রে উত্তরে দক্ষিণে পূর্বে পশ্চিমে বাহিরের সমস্ত দোর্দণ্ডপ্রতাপ রাজাকে হার মানিয়ে জয়পতাকা আমাদের অন্তররাজধানীর উচ্চপ্রাসাদচূড়ায় উড়িয়ে দিলুম। বাসনার পায়ে শিকল পরিয়ে দিলুম। সুখদুঃখকে কড়া পাহারায় রাখলুম। পূর্বতন রাজত্বকে আগাগোড়া বিপর্যস্ত করে তবে ছাড়লুম।

এমনি করে বাহিরের একান্ত প্রভুত্বকে খর্ব করে যখন আমাদের অন্তরে প্রতিষ্ঠা লাভ করলুম তখন অন্তরতম গুহার মধ্যে এ কী দেখি? এ তো জয়গর্ব নয়। এ তো কেবল আত্মশাসনের অতিবিস্তারিত সুব্যবস্থা নয়। বাহিরের বন্ধনের স্থানে এ তো কেবল অন্তরের নিয়মবন্ধন নয়। শান্ত দান্ত সমাহিত নির্মল চিদাকাশে এমন আনন্দজ্যোতি দেখলুম যা অন্তর এবং বাহির উভয়কেই উদ্ভাসিত করেছে, অন্তরের নিগূঢ় কেন্দ্র থেকে নিখিল বিশ্বের অভিমুখে যার মঙ্গলরশ্মিরাজি বিচ্ছুরিত হচ্ছে।

তখন ভিতর-বাহিরের সমস্ত দ্বন্দ্ব দূর হয়ে গেল। তখন জয় নয়, তখন আনন্দ; তখন সংগ্রাম নয়, তখন লীলা; তখন ভেদ নয়, তখন মিলন; তখন আমি নয়, তখন সব; তখন বাহিরও নয়, ভিতরও নয়, তখন ব্রহ্ম: তচ্ছুভ্রং জ্যোতিষাং জ্যোতিঃ। তখন আত্মা পরমাত্মার পরম মিলনে বিশ্বজগৎ সম্মিলিত। তখন স্বার্থবিহীন করুণা, ঔদ্ধত্যবিহীন ক্ষমা, অহংকারবিহীন প্রেম; তখন জ্ঞান ভক্তি কর্মে বিচ্ছেদবিহীন পরিপূর্ণতা।

শান্তিনিকেতন, র/১২/২০৬-৭

বিষয়-সংকেত: প্রাকৃতিক, ধর্মনৈতিক ও আধ্যাত্মিক—এই তিন অবস্থা। প্রথম অবস্থায় প্রাকৃতিক, সে হল বাহিরের। পরে বাহিরকে পরাস্ত ক'রে অন্তরে আসি, বাহিরকে শত্রু মনে করি। কিন্তু অন্তরে ঢুকে দেখি যেখানে ভিতর বাহিরের দ্বন্দ্ব নেই। তখন জয় নয়, তখন আনন্দ, তখন প্রেম।

৫৬। স্বাভাবিকী ক্রিয়া

১১ ফাল্গুন

যে এক ইচ্ছা বিশ্বজগতের মূলে বিরাজ করছে তারই সম্বন্ধে উপনিষৎ বলেছেন: স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ। সেই একেরই জ্ঞানক্রিয়া এবং বলক্রিয়া স্বাভাবিকী। তা সহজ, তা স্বাধীন, তার উপরে বাইরের কোনো কৃত্রিম তাড়না নেই।

আমাদের ইচ্ছা যখন সেই মূল মঙ্গল-ইচ্ছার সঙ্গে সংগত হয় তখন তারও সমস্ত ক্রিয়া স্বাভাবিকী হয়। অর্থাৎ, তার সমস্ত কাজকে কোনো প্রবৃত্তির তাড়নার দ্বারা ঘটায় না—অহংকার তাকে ঠেলা দেয় না, লোকসমাজের অনুকরণ তাকে সৃষ্টি করে না, লোকের খ্যাতিই তাকে কোনো রকমে জীবিত করে রাখে না, সাম্প্রদায়িক দলবদ্ধতার উৎসাহ তাকে শক্তি জোগায় না, নিন্দা তাকে আঘাত করে না, উৎপীড়ন তাকে বাধা দেয় না, উপকরণের দৈন্য তাকে নিরস্ত করে না।

মঙ্গল-ইচ্ছার সঙ্গে যাঁদের ইচ্ছা সম্মিলিত হয়েছে তাঁরা যে বিশ্বজগতের সেই অমর শক্তি সেই স্বাভাবিকী ক্রিয়াশক্তিকে লাভ করেন, ইতিহাসে তার অনেক প্রমাণ আছে। বুদ্ধদেব কপিলবস্তুর সুখসমৃদ্ধি পরিহার করে যখন বিশ্বের মঙ্গল প্রচার করতে বেরিয়েছিলেন তখন কোথায় তাঁর রাজকোষ, কোথায় তাঁর সৈন্যসামন্ত! তখন বাহ্য উপকরণে তিনি তাঁর পৈতৃক রাজ্যের দীনতম অক্ষমতম প্রজার সঙ্গে সমান। কিন্তু, তিনি যে বিশ্বের মঙ্গল-ইচ্ছার সঙ্গে তাঁর ইচ্ছাকে যোজিত করেছিলেন, সেইজন্য তাঁর ইচ্ছা সেই পরাশক্তির স্বাভাবিকী ক্রিয়াকে লাভ করেছিল। সেইজন্যে কত শত শতাব্দী হল তাঁর মৃত্যু হয়ে গেছে, কিন্তু তাঁর মঙ্গল-ইচ্ছার স্বাভাবিকী ক্রিয়া আজও চলছে। আজও বুদ্ধগয়ার নিভৃত মন্দিরে গিয়ে দেখি সুদূর জাপানের সমুদ্রতীর থেকে সংসারতাপতাপিত জেলে এসে অন্ধকার অর্ধরাত্রে বোধিদ্রুমের সম্মুখে বসে সেই বিশ্বকল্যাণী ইচ্ছার কাছে আত্মসমর্পণ করে দিয়ে জোড়হাতে বলছে: বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি। আজও তাঁর জীবন মানুষকে জীবন দিচ্ছে, তাঁর বাণী মানুষকে অভয় দান করছে, তাঁর সেই বহু সহস্র বৎসর পূর্বের ইচ্ছার ক্রিয়ার আজও ক্ষয় হল না।

যিশু কোন্ অখ্যাত গ্রামের প্রান্তে কোন্-এক পশুরক্ষণশালায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন—কোনো পণ্ডিতের ঘরে নয়, কোনো রাজার প্রাসাদে নয়, কোনো মহৈশ্বর্যশালী রাজধানীতে নয়, কোনো মহাপুণ্যক্ষেত্র তীর্থস্থানে নয়। যারা মাছ ধরে জীবিকা অর্জন করত এমন কয়েকজন মাত্র ইহুদি যুবক তাঁর শিষ্য হয়েছিল—যেদিন তাঁকে রোমরাজের প্রতিনিধি অনায়াসেই ক্রুশে বিদ্ধ করবার আদেশ দিলেন সেই দিনটি জগতের ইতিহাসে যে চিরদিন

ধন্য হবে এমন কোনো লক্ষণ সেদিন কোথাও প্রকাশ পায় নি। তাঁর শত্রুরা মনে করলে সমস্তই চুকেবুকে গেল, এই অতি ক্ষুদ্র স্ফুলিঙ্গটিকে একেবারে দলন করে নিবিয়ে দেওয়া গেল। কিন্তু, কার সাধ্য নেবায়! ভগবান যিশু তাঁর ইচ্ছাকে তাঁর পিতার ইচ্ছার সঙ্গে যে মিলিয়ে দিয়েছিলেন—সেই ইচ্ছার মৃত্যু নেই, তার স্বাভাবিকী ক্রিয়ার ক্ষয় নেই। অত্যন্ত কৃশ এবং দীন-ভাবে যা নিজেকে প্রকাশ করেছিল তাই আজ দুই সহস্র বৎসর ধরে বিশ্বজয় করছে।

অখ্যাত অজ্ঞাত দৈন্যদারিদ্র্যের মধ্যেই সেই পরমমঙ্গলশক্তি যে আপনার স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়াকে প্রকাশ করেছেন ইতিহাসে বারম্বার তার প্রমাণ পাওয়া গেছে।

শান্তিনিকেতন, র/১২/২০৯-১০

বিষয়-সংকেত: বিশ্বজগতের মূলে যে ইচ্ছা সে হল স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া। আমাদের ইচ্ছা যখন সেই মূল মঙ্গল-ইচ্ছার সঙ্গে মিলিত হয় তখন তারও সমস্ত ক্রিয়া স্বাভাবিকী হয়।

৫৭। বৈরাগ্য

১৫ ফাল্গুন ১৩১৫ (১৯০৯)

...ছেলেবেলায় বর্ণপরিচয়ে যখন ক খ গ প্রত্যেক অক্ষরকে স্বতন্ত্র করে শিখছিলুম তখন তাতে আনন্দ পাই নি। কারণ, এই স্বতন্ত্র অক্ষরগুলির কোনো সত্য পাচ্ছিলুম না। তার পরে অক্ষরগুলি যোজনা করে যখন 'কর' 'খল' প্রভৃতি পদ পাওয়া গেল, তখন অক্ষর আমাদের কাছে তার তাৎপর্য প্রকাশ করাতে আমার মন কিছু-কিছু সুখ অনুভব করতে লাগল। কিন্তু,এরকম বিচ্ছিন্ন পদগুলি চিত্তকে যথেষ্ট রস দিতে পারে না; এতে ক্লেশ এবং ক্লান্তি এসে পড়ে। তারপর পরে আজও আমার স্পষ্ট মনে আছে যেদিন 'জল পড়ে' 'পাতা নড়ে' বাক্যগুলি পড়েছিলুম সেদিন ভারি আনন্দ হয়েছিল; কারণ, শব্দগুলি তখন পূর্ণতর অর্থে ভরে উঠল। এখন শুধুমাত্র 'জল পড়ে' 'পাতা নড়ে' আবৃত্তি করতে মনে সুখ হয় না, বিরক্তি বোধ হয়; এখন ব্যাপক-অর্থ-যুক্ত বাক্যাবলীর মধ্যেই শব্দবিন্যাসকে সার্থক বলে উপলব্ধি করতে চাই।

বিচ্ছিন্ন আত্মা তেমনি বিচ্ছিন্ন পদের মতো। তার একার মধ্যে তার তাৎপর্যকে পূর্ণরূপে পাওয়া যায় না। এইজন্যেই আত্মা নিজের সত্যকে নানার মধ্যে উপলব্ধি করতে চেষ্টা করে। সে যখন আত্মীয় বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে যুক্ত হয় তখন সে নিজের সার্থকতার একটা রূপ দেখতে পায়; সে যখন আত্মীয় পরকীয় বহুতর লোককে আপন করে জানে তখন সে আর ছোটো আত্মা থাকে না, তখন সে মহাত্মা হয়ে ওঠে।

এর একমাত্র কারণ, আত্মার পরিপূর্ণ সত্যটি আছে পরমাত্মার মধ্যে। আমার আমি সেই একমাত্র মহা-আমিতেই সার্থক। এইজন্যে সে জেনে এবং না জেনেও সেই পরম-

আমিকেই খুঁজছে। আমার আমি যখন পুত্রের আমিতে গিয়ে সংযুক্ত হয় তখন কী ঘটে? তখন, যে পরম-আমি আমার আমির মধ্যেও আছেন, পুত্রের আমির মধ্যেও আছেন, তাঁকে উপলব্ধি করে আমার আনন্দ হয়।

কিন্তু, তখন মুশকিল হয় এই যে, আমার আমি এই উপলক্ষে যে সেই বড়ো-আমির কাছেই একটুখানি এগোলো তা সে স্পষ্ট বুঝতে পারে না। সে মনে করে সে পুত্রকেই পেল এবং পুত্রের কোনো বিশেষ গুণ-বশতই পুত্র আনন্দ দেয়। সুতরাং, এই আসক্তির বন্ধনেই সে আটকা পড়ে যায়। তখন সে পুত্র-মিত্রকে কেবলই জড়িয়ে বসে থাকতে চায়। তখন সে এই আসক্তির টানে অনেক পাপেও লিপ্ত হয়ে পড়ে।...

কোনো কাব্যের তাৎপর্যের উপলব্ধি যখন আমাদের কাছে গভীর হয়, উজ্জ্বল হয়, তখনই তার প্রত্যেক শব্দের সার্থকতা সেই সমগ্র ভাবের মাধুর্যে আমাদের কাছে বিশেষ সৌন্দর্যময় হয়ে ওঠে। তখন, যখন ফিরে দেখি দেখতে পাই কোনো শব্দটিই নিরর্থক নয়, সমগ্রের রসটি প্রত্যেক পদের মধ্যেই প্রকাশ পাচ্ছে। তখন সেই কাব্যের প্রত্যেক পদটিই আমাদের কাছে বিশেষ আনন্দ ও বিস্ময়ের কারণ হয়ে ওঠে। তখন তার পদগুলি সমগ্রের উপলব্ধিতে আমাদের বাধা না দিয়ে সহায়তা করে ব'লেই আমাদের কাছে বড়োই মূল্যবান হয়ে ওঠে।

তেমনি বৈরাগ্যে যখন স্বাতন্ত্র্যের মোহ কাটিয়ে ভূমার মধ্যে আমাদের মহাসত্যের পরিচয়-সাধন করিয়ে দেয়, তখন সেই বৃহৎ পরিচয়ের ভিতর দিয়ে ফিরে এসে প্রত্যেক স্বাতন্ত্র্য সেই ভূমার রসে রসপরিপূর্ণ হয়ে ওঠে। একদিন যাদের বানান করে পড়তে হচ্ছিল, যারা পদে পদে আমাদের পথরোধ করছিল, তারা প্রত্যেকে সেই ভূমার প্রতিই আমাদের বহন করে, রোধ করে না।

তখন যে আনন্দ সেই আনন্দই প্রেম। সেই প্রেমে বেঁধে রাখে না; সেই প্রেমে টেনে নিয়ে যায়। নির্মল নির্বাধ প্রেম। সেই প্রেমই মুক্তি—সমস্ত আসক্তির মৃত্যু।...

যখন আসক্তির বন্ধন ছিন্ন হয়ে গেছে তখন জল স্থল আকাশ, জড় জন্তু মনুষ্য, সমস্তই অমৃতে পরিপূর্ণ—তখন আনন্দের অবধি নেই।

আসক্তি আমাদের চিত্তকে বিষয়ে আবদ্ধ করে। চিত্ত যখন সেই বিষয়ের ভিতরে বিষয়াতীত সত্যকে লাভ করে, তখন প্রজাপতি যেমন গুটি কেটে বের হয় তেমনি সে বৈরাগ্য-দ্বারা আসক্তিবন্ধন ছিন্ন করে ফেলে। আসক্তি ছিন্ন হয়ে গেলেই পূর্ণ সুন্দর প্রেম আনন্দরূপে সর্বত্রই প্রকাশ পায়।...

শান্তিনিকেতন, র/১২/২১৫-১৭

বিষয়-সংকেত: বিচ্ছিন্ন আত্মা বিচ্ছিন্ন পদের মতো, নিজের মধ্যে তার পূর্ণ তাৎপর্য নেই। আত্মার সম্পূর্ণ সত্যটি আছে পরমাত্মার মধ্যে। বৈরাগ্য যখন স্বাতন্ত্র্যের মোহ কাটিয়ে ভূমার মধ্যে সত্যের পরিচয়-সাধন করিয়ে দেয়, তখন স্বাতন্ত্র্য ভূমার রসে পরিপূর্ণ হয়। সেই আনন্দই প্রেম। তখন আসক্তির বন্ধন ছিন্ন হয়। আসক্তি ছিন্ন হলে সুন্দর প্রেম ও আনন্দ এক হয়ে মিলে যায়।

৫৮। স্বভাবকে লাভ

৫ চৈত্র

আমাদের জীবনের একটিমাত্র সাধনা এই যে, আমাদের আত্মার যা স্বভাব সেই স্বভাবটিকেই যেন বাধামুক্ত করে তুলি।

আত্মার স্বভাব কী? পরমাত্মার যা স্বভাব আত্মারও স্বভাব তাই। পরমাত্মার স্বভাব কী? তিনি গ্রহণ করেন না, তিনি দান করেন।

তিনি সৃষ্টি করেন। সৃষ্টি করার অর্থই হচ্ছে বিসর্জন করা। এই-যে তিনি বিসর্জন করেন এর মধ্যে কোনো দায় নেই, কোনো বাধ্যতা নেই। আনন্দের ধর্মই হচ্ছে স্বতই দান করা, স্বতই বিসর্জন করা। আমরাও তা জানি। আমাদের আনন্দ, আমাদের প্রেম, বিনা কারণে আত্মবিসর্জনেই আপনাকে চরিতার্থ করে। এইজন্যই উপনিষৎ বলেন: আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে। সেই আনন্দময়ের স্বভাবই এই।

আত্মার সঙ্গে পরমাত্মার একটি সাধর্ম্য আছে। আমাদের আত্মাও নিয়ে খুশি নয়, সে দিয়ে খুশি। নেব, কাড়ব, সঞ্চয় করব, এই বেগই যদি ব্যাধির বিকারের মতো জেগে ওঠে তা হলে ক্ষোভের ও তাপের সীমা থাকে না। যখন আমরা সমস্ত মন দিয়ে বলি 'দেব' তখনই আমাদের আনন্দের দিন। তখনই সমস্ত ক্ষোভ দূর হয়, সমস্ত তাপ শান্ত হয়ে যায়।

আত্মার এই আনন্দময় স্বরূপটিকে উপলব্ধি করবার সাধনা করতে হবে। কেমন করে করব?

ওই-যে একটা ক্ষুধিত অহং আছে, যে কাঙাল সব জিনিসই মুঠো করে ধরতে চায়, যে কৃপণ নেবার মতলব ছাড়া কিছু দেয় না, ফলের মতলব ছাড়া কিছু করে না, সেই অহংটাকে বাইরে রাখতে হবে, তাকে পরমাত্মীয়ের মতো সমাদর করে অন্তঃপুরে ঢুকতে দেওয়া হবে না। সে বস্তুত আত্মার আত্মীয় নয়; কেননা সে যে মরে, আর আত্মা যে অমর।

আত্মা যে 'ন জায়তে ম্রিয়তে', না জন্মায় না মরে। কিন্তু, ওই অহংটা জন্মেছে, তার একটা নামকরণ হয়েছে; কিছু না পারে তো অন্তত তার ওই নামটাকে স্থায়ী করবার জন্যে তার প্রাণপণ যত্ন।

এই-যে আমার অহং তাকে একটা বাইরের লোকের মতো আমি দেখব। যখন তার দুঃখ হবে তখন বলব তার দুঃখ হয়েছে। শুধু দুঃখ কেন, তার ধন জন খ্যাতি প্রতিপত্তি কিছুতে আমি অংশ নেব না।

আমি বলব না যে, এ-সমস্ত আমি পাচ্ছি, আমি নিচ্ছি। প্রতিদিনই এই চেষ্টা করব, আমার অহং যা-কিছুকে আঁকড়ে ধরতে চায় আমি তাকে যেন গ্রহণ না করি। আমি বারবার করে বলব, ও আমার নয়, ও আমার বাইরে।

যা বাইরেকার তাকে বাইরে রাখতে প্রাণ সরে না ব'লে আবর্জনায় ভরে উঠলুম, বোঝায় চলা দায় হল। সেই মৃত্যুময় উপকরণের বিকারে প্রতিদিনই আমি মরছি। এই মরণধর্মী অহংটাকেই আত্মার সঙ্গে জড়িয়ে তার শোকে, তার দুঃখে, তার ভারে, ক্লান্ত হচ্ছি।

অহং'এর স্বভাব হচ্ছে নিজের দিকে টানা, আর আত্মার স্বভাব হচ্ছে বাইরের দিকে দেওয়া—এইজন্যে এই দুটোতে জড়িয়ে গেলে ভাবি একটা পাকের সৃষ্টি হয়। একটা বেগ প্রবাহিত হয়ে যেতে চায়, আর-একটা বেগ কেবলই ভিতরের দিকে আকর্ষণ করতে থাকে—ভারি একটা সংকট ঘনিয়ে ওঠে। আত্মা তার স্বভাবের বিরুদ্ধে আকৃষ্ট হয়ে ঘূর্ণিত হতে থাকে; সে অনন্তের অভিমুখে চলে না, সে একই বিন্দুর চার দিকে ঘানির বলদের মতো পাক খায়। সে চলে অথচ এগোয় না—সুতরাং, এ চলায় কেবল তার কষ্ট, এতে তার সার্থকতা নয়।

তাই বলছিলুম, এই সংকট থেকে উদ্ধার পেতে হবে। অহং'এর সঙ্গে একেবারে এক হয়ে মিলে যাব না, তার সঙ্গে বিচ্ছেদ রাখব। দান করব, কর্ম করব, কিন্তু অহং যখন সেই কর্মের ফল হাতে করে তাকে লেহন ক'রে দংশন ক'রে নাচতে নাচতে উপস্থিত হবে তখন তার সেই উচ্ছিষ্ট ফলকে কোনোমতেই গ্রহণ করব না। কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।

শান্তিনিকেতন, ২/১২/২৩৫ ৩৭

বিষয়-সংকেত: আমাদের একটিই সাধনা—আত্মার যা স্বভাব তাকে বাধামুক্ত করা। পরমাত্মার যা স্বভাব আত্মারও তাই—দান করা, সর্জন করা সৃষ্টি করা। এই দানেই, এই বিসর্জনেই, এই সৃষ্টিতেই তার আনন্দ। অহং-এর স্বভাব কিন্তু বিপরীত। আমাদের মধ্যের যে ক্ষুধিত অহং সে শুধু গ্রহণ করতে চায়, গ্রাস করতে চায়। অহং-এর স্বভাব নিজের দিকে টানা, আত্মার স্বভাব বাইরের দিকে দেওয়া।

৫৯। নদী ও কূল

৭ চৈত্র

অমর আত্মার সঙ্গে এই মরণধর্মী অহংটা আলোর সঙ্গে ছায়ার মতো যে নিয়তই লেগে রয়েছে। শিক্ষার দ্বারা, অভ্যাসের দ্বারা, ঘটনা-সংঘাতের দ্বারা, স্থানিক এবং সাময়িক নানা প্রভাবের দ্বারা, শরীর মন হৃদয়ের প্রকৃতিগত প্রবৃত্তির বেগের দ্বারা অহরহ নানা সংস্কার গড়ে তুলছে এবং কেবলই এই সংস্কারদেহটির পরিবর্তন ঘটাচ্ছে, আমাদের আত্মার নামরূপময় একটি চিরচঞ্চল পরিবেষ্টন তৈরি করছে। এই অহংকে যদি একেবারে মিথ্যা মায়া বলে উড়িয়ে দিতে চেষ্টা করি তা হলেই সে যে ঘরে গিয়ে মরে থাকবে, এমন আশঙ্কা নেই। যেমন সংসারকে মনের ক্ষোভে মিথ্যা বললেই সে মিথ্যা হয় না, তেমনি এই অহংকে রাগ করে মিথ্যা অপবাদ দিলে তার তাতে ক্ষতিবৃদ্ধি ঘটে না।

আত্মার সঙ্গে তার একটি সত্য সম্বন্ধ আছে সেইখানেই সে সত্য, সেই সম্বন্ধের বিকার ঘটলেই সে মিথ্যা। এই উপলক্ষে আমি একটি উপমার অবতারণ করতে চাই।

নদীর ধারাটা চিরন্তন। সে পর্বতের গুহা থেকে নিঃসৃত হয়ে সমুদ্রের অতলের মধ্যে

প্রবেশ করছে; সে যে ক্ষেত্রের উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে সেই ক্ষেত্র থেকে উপকরণরাশি তার গতিবেগে আহরিত হয়ে চর বেঁধে উঠছে—কোথাও নুড়ি, কোথাও বালি, কোথাও মাটি জমছে; তার সঙ্গে নানা দেশের কত ধাতুকণা এবং জৈব পদার্থ এসে মিলছে। এই চর কতবার ভাঙছে, কতবার গড়ছে, কত স্থান ও আকার-পরিবর্তন করছে। এর কোথাও বা গাছপালা উঠছে, কোথাও বা মরুভূমি। কোথাও জলাশয়ে পাখি চরছে, কোথাও বা বালির উপর কুমিরের ছানা হাঁ করে পড়ে রোদ পোয়াচ্ছে।

এই চিরপরিবর্তনশীল চরগুলিই যদি একান্ত প্রবল হয়ে ওঠে তা হলেই নদীর চিরন্তন ধারা বাধা পায়। ক্রমে ক্রমে নদী হয়ে পড়ে গৌণ, চরই হয়ে পড়ে মুখ্য। শেষকালে ফল্গুর মতো নদীটা একেবারেই আচ্ছন্ন হয়ে যেতে পারে।

আত্মা সেই চিরস্রোত নদীর মতো। অনাদি তার উৎপত্তিশিখর, অনন্ত তার সঞ্চারক্ষেত্র। আনন্দই তাকে গতিবেগ দিয়েছে, সেই গতির বিরাম নেই।

এই আত্মা যে দেশ দিয়ে যে কাল দিয়ে চলেছে তার গতিবেগে সেই দেশ ও সেই কালের নানা উপকরণ সঞ্চিত হয়ে তার একটি সংস্কাররূপ তৈরি হতে থাকে—এই জিনিসটি কেবলই ভাঙছে, গড়ছে, কেবলই আকারপরিবর্তন করছে।

কিন্তু, সৃষ্টি কোনো কোনো অবস্থায় সৃষ্টিকর্তাকে ছাপিয়ে উঠতে পারে। আত্মাকেও তার দেশকালজাত অহং প্রবল হয়ে উঠে অবরুদ্ধ করতে পারে। এমন হতে পারে অহংটাকেই তার স্তূপাকার উপকরণসমেত দেখা যায়, আত্মাকে আর দেখা যায় না। অহং চারি দিকেই বড়ো হয়ে উঠে আত্মাকে বলতে থাকে, 'তুমি চলতে পাবে না, তুমি এইখানেই থেকে যাও; তুমি এই ধনদৌলতেই থাকো, এই ঘরবাড়িতেই থাকো, এই খ্যাতিপ্রতিপত্তিতেই থাকো।'

যদি আত্মা আটকা পড়ে তবে তার স্বরূপ ক্লিষ্ট হয়, তার স্বভাব নষ্ট হয়। সে তার গতি হারায়। অনন্তের মুখে সে আর চলে না; সে মজে যায়, সে মরতে থাকে।

আত্মা দেশকালপাত্রের মধ্যে দিয়ে নানা উপকরণে এই-যে নিজের উপকূল রচনা করতে থাকে তার প্রধান সার্থকতা এই যে, কূলের দ্বারাই তার গতি সাহায্য প্রাপ্ত হয়। এই কূল না থাকলে সে ব্যাপ্ত হয়ে, বিক্ষিপ্ত হয়ে, অচল হয়ে থাকত। অহং লোকে লোকান্তরে আত্মার গতিবেগকে বাড়িয়ে তার গতিপথকে এগিয়ে নিয়ে চলে। উপকূলই নদীর সীমা এবং নদীর রূপ—অহংই আত্মার সীমা, আত্মার রূপ। এই রূপের মধ্য দিয়েই আত্মার প্রবাহ, আত্মার প্রকাশ। এই প্রকাশপরম্পরার ভিতর দিয়েই সে নিজেকে নিয়ত উপলব্ধি করছে, অনন্তের মধ্যে সঞ্চরণ করছে। এই অহং-উপকূলের নানা ঘাতে প্রতিঘাতেই তার তরঙ্গ, তার সংগীত।

কিন্তু, যখনই উপকূলই প্রধান হয়ে উঠতে থাকে, যখন সে নদীর আনুগত্য না করে, তখনই গতির সহায় না হয়ে সে গতিরোধ করে। তখন অহং নিজে ব্যর্থ হয় এবং আত্মাকে ব্যর্থ করে। যেটুকু বাধায় আত্মা বেগ পায় তার চেয়ে অধিক বাধায় আত্মা অবরুদ্ধ হয়। তখন উপকূল নদীর সামগ্রী না হয়ে নদীই উপকূলের সামগ্রী হয়ে ওঠে এবং আত্মাই অহংএর বশীভূত হয়ে নিজের অমরত্ব ভুলে সংসারে নিতান্ত দীনহীন হয়ে বাস করতে থাকে। নিজেকে দানের দ্বারা যে সার্থক হ'ত, সঞ্চয়ের বহুতর শুষ্কবালুময়

বেষ্টনের মধ্যে সে মৃত্যুশয্যায় পড়ে থাকে। তবু মরে না, কেবল নিজের দুর্গতিকেই ভোগ করে।

শান্তিনিকেতন, র/১২/২৩৯-৪০

বিষয়-সংকেত: আত্মার সঙ্গে অহং-এর একটি সত্য সম্বন্ধ আছে। সুতরাং অহং মিথ্যা নয়, মিথ্যা হয় সম্বন্ধের বিকার ঘটলে। আত্মা চিরস্রোত নদীর মতো, অহং তার কূলের মতো। কূল যদি চর দিয়ে স্রোতকে চেপে ধরে তখনই সম্বন্ধের বিকার। অহংই আত্মার সীমা, আত্মার রূপ। এই রূপের মধ্যে দিয়েই আত্মার প্রবাহ। কূল প্রধান হলে নদী ব্যর্থ হয়, অহং প্রধান হলে আত্মাও ব্যর্থ হয়, অহং-ও ব্যর্থ হয়।

৬০। আদেশ

৯ চৈত্র

কোন্ কোন্ মন্দ কাজ করবে না তার বিশেষ উল্লেখ ক'রে সেইগুলিকে ধর্মশাস্ত্র ঈশ্বরের বিশেষ নিষেধরূপে প্রচার করেছেন।

সেই রকম ভাবে প্রচার করলে মনে হয়, যেন ঈশ্বর কতকগুলি নিজের ইচ্ছামত আইন করে দিয়েছেন, সেই আইনগুলি লঙ্ঘন করলে বিশ্বরাজের কোপে পড়তে হবে। সে কথাটাকে এইরূপ ক্ষুদ্র ও কৃত্রিম-ভাবে মানতে পারি নে। তিনি কোনো বিশেষ আদেশ জানান নি, কেবল তাঁর একটি আদেশ তিনি ঘোষণা করেছেন—সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের উপরে তাঁর সেই আদেশ। সেই একমাত্র আদেশ।

তিনি কেবলমাত্র বলেছেন, প্রকাশিত হও। সূর্যকেও তাই বলেছেন, পৃথিবীকেও তাই বলেছেন, মানুষকেও তাই বলেছেন। সূর্য তাই জ্যোতির্ময় হয়েছে, পৃথিবী তাই জীবধাত্রী হয়েছে, মানুষকেও তাই আত্মাকে প্রকাশ করতে হবে।

বিশ্বজগতের যে-কোনো প্রান্তে তাঁর এই আদেশ বাধা পাচ্ছে সেইখানেই কুঁড়ি মুষড়ে যাচ্ছে, সেইখানেই নদী স্রোতোহীন হয়ে শৈবালজালে রুদ্ধ হচ্ছে—সেইখানেই বন্ধন, বিকার, বিনাশ।

বুদ্ধদেব যখন বেদনাপূর্ণ চিত্তে ধ্যান-দ্বারা এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজেছিলেন যে, মানুষের বন্ধন বিকার বিনাশ কেন, দুঃখ জরা মৃত্যু কেন, তখন তিনি কোন্ উত্তর পেয়ে আনন্দিত হয়ে উঠেছিলেন? তখন তিনি এই উত্তরই পেয়েছিলেন যে, মানুষ আত্মাকে উপলব্ধি করলেই, আত্মাকে প্রকাশ করলেই, মুক্তিলাভ করবে। সেই প্রকাশের বাধাতেই তার দুঃখ, সেইখানেই তার পাপ।

এইজন্যে তিনি প্রথমে কতকগুলি নিষেধ স্বীকার করিয়ে মানুষকে শীল গ্রহণ করতে আদেশ করেন। তাকে বললেন, 'তুমি লোভ কোরো না, হিংসা কোরো না, বিলাসে আসক্ত হোয়ো না।' যে-সমস্ত আবরণ তাকে বেষ্টন করে ধরেছে সেইগুলি প্রতিদিনের

নিয়ত অভ্যাসে মোচন করে ফেলবার জন্যে তাকে উপদেশ দিলেন। সেই আবরণগুলি মোচন হলেই আত্মা আপনার বিশুদ্ধ স্বরূপটি লাভ করবে।

সেই স্বরূপটি কী? শূন্যতা নয়, নৈষ্কর্ম্য নয়। সে হচ্ছে মৈত্রী, করুণা, নিখিলের প্রতি প্রেম। বুদ্ধ কেবল বাসনা ত্যাগ করতে বলেন নি, তিনি প্রেমকে বিস্তার করতে বলেছেন। কারণ, এই প্রেমকে বিস্তারের দ্বারাই আত্মা আপন স্বরূপকে পায়—সূর্য যেমন আলোককে বিকীর্ণ করার দ্বারাই আপনার স্বভাবকে পায়।

সর্বলোকে আপনাকে পরিকীর্ণ করা আত্মার ধর্ম—পরমাত্মারও সেই ধর্ম। তাঁর সেই ধর্ম পরিপূর্ণ, কেননা তিনি 'শুদ্ধং অপাপবিদ্ধং'। তিনি নির্বিকার, তাঁতে পাপের কোনো বাধা নেই। এইজন্যে সর্বত্রই তাঁর প্রবেশ।

পাপের বন্ধন মোচন করলে আমাদেরও প্রবেশ অব্যাহত হবে। তখন আমরা কী হব? পরমাত্মার মতো সেই স্বরূপটি লাভ করব যে স্বরূপে তিনি কবি, মনীষী, প্রভু, স্বয়ম্ভূ। আমরাও আনন্দময় কবি হব, মনের অধীশ্বর হব, দাসত্ব থেকে মুক্ত হব, আপন নির্মল আলোকে আপনি প্রকাশিত হব। তখন আত্মা সমস্ত চিন্তায় বাক্যে কর্মে আপনাকে 'শান্তম্ শিবম্ অদ্বৈতম্'-রূপে প্রকাশ করবে—আপনাকে ক্ষুব্ধ ক'রে, লুব্ধ ক'রে, খণ্ডবিখণ্ডিত ক'রে দেখাবে না।

মৈত্রেয়ীর প্রার্থনাও সেই প্রকাশের প্রার্থনা। যে প্রার্থনা বিশ্বের সমস্ত কুঁড়ির মধ্যে, কিশলয়ের মধ্যে, যে প্রার্থনা দেশকালের অপরিতৃপ্ত গভীরতার মধ্য হতে নিয়ত উঠছে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রত্যেক অণুতে পরমাণুতে যে প্রার্থনা, যে প্রার্থনার যুগযুগান্তব্যাপী ক্রন্দনে পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে ব'লেই বেদে এই অন্তরীক্ষকে 'ক্রন্দসী' 'রোদসী' বলেছে, সেই মানবাত্মার চিরন্তন প্রার্থনাই মৈত্রেয়ীর প্রার্থনা। আমাকে প্রকাশ করো, আমাকে প্রকাশ করো। আমি অসত্যে আচ্ছন্ন, আমাকে সত্যে প্রকাশ করো। আমি অন্ধকারে আবিষ্ট, আমাকে জ্যোতিতে প্রকাশ করো। আমি মৃত্যুর দ্বারা আবিষ্ট, আমাকে অমৃতে প্রকাশ করো। হে আবিঃ, হে পরিপূর্ণ প্রকাশ, তোমার মধ্যেই আমার প্রকাশ হোক, আমার মধ্যে তোমার প্রকাশ কোনো বাধা না পাক—সেই প্রকাশ নির্মুক্ত হলেই তোমার দক্ষিণ মুখের জ্যোতিতে আমি চিরকালের জন্যে রক্ষা পাব। সেই প্রকাশের বাধাতেই তোমার অপ্রসন্নতা, সেই প্রকাশের মধ্যেই তোমার প্রসন্নতা।

শান্তিনিকেতন, র/১২/২৪৩-৪৪

বিষয়-সংকেত: ঈশ্বরের একটিই আদেশ প্রকাশিত হও। এ আদেশ– সকলের প্রতি। যেখানে প্রকাশের বাধা, সেইখানেই পাপ, সেইখানেই দুঃখ। সর্বলোকে নিজেকে পরিকীর্ণ করা, নিজেকে প্রকাশ করা এই হল আত্মার ধর্ম, পরমাত্মারও তাই। আমাকে প্রকাশ করো, আমি মৃত্যুর দ্বারা আবিষ্ট, অসত্যের দ্বারা আবিষ্ট, আমাকে প্রকাশ করো, এই হল মানুষের একমাত্র প্রার্থনা।

৬১। ভূমা

১৪ চৈত্র

বুদ্ধকে যখন মানুষ জিজ্ঞাসা করলে, কোথায় থেকে এই-সমস্ত হয়েছে, আমরা কোথা থেকে এসেছি, আমরা কোথায় যাব, তখন তিনি বললেন, 'তোমার ও-সব কথায় কাজ কী? আপাতত তোমার যেটা অত্যন্ত দরকার সেইটেতে তুমি মন দাও। তুমি বড়ো দুঃখে পড়েছ—তুমি যা চাও তা পাও না, যা পাও তা রাখতে পার না, যা রাখ তাতে তোমার আশা মেটে না। এই নিয়ে তোমার দুঃখের অবধি নেই। সেইটে মেটাবার উপায় করে তবে অন্য কথা।' এই বলে দুঃখনিবৃত্তিকেই তিনি পরম লক্ষ্য বলে তার থেকে মুক্তির পথে আমাদের ডাক দিলেন।

কিন্তু, কথা এই যে, একান্ত দুঃখনিবৃত্তিকেই তো মানুষ পরম লক্ষ্য বলে ধরে নিতে পারে না। সে যে তার স্বভাবই নয়। আমি যে স্পষ্ট দেখছি দুঃখকে অঙ্গীকার করে নিতে সে আপত্তি করে না। অনেকসময় গায়ে পড়ে সে দুঃখকে বরণ করে নেয়।

আল্‌প্‌স্‌ পর্বতের দুর্গম শিখরের উপর একবার কেবল পদার্পণ করে আসবার জন্যে প্রাণপণ করা তার পক্ষে সম্পূর্ণ অনাবশ্যক, কিন্তু বিনা কারণে মানুষ সেই দুঃখ স্বীকার করতে প্রস্তুত হয়। এমন দৃষ্টান্ত ঢের আছে।

তার কারণ, কী? তার কারণ এই যে, দুঃখের সম্বন্ধে মানুষের একটা স্পর্ধা আছে। 'আমি দুঃখ সইতে পারি, আমার মধ্যে সেই শক্তি আছে'—এ কথা মানুষ নিজেকে এবং অন্যকে জানাতে চায়।

আসল কথা, মানুষের সকলের চেয়ে সত্য ইচ্ছা হচ্ছে বড়ো হবার ইচ্ছা, সুখী হবার ইচ্ছা নয়। আলেকজান্ডারের হঠাৎ ইচ্ছা হল দুর্গম নদী গিরি মরু সমুদ্র পার হয়ে দিগ্বিজয় করে আসবেন। রাজসিংহাসনের আরাম ছেড়ে এমন দুঃসহ দুঃখের ভিতর দিয়ে তাঁকে পথে পথে ঘোরায় কে? ঠিক রাজ্যলোভ নয়, বড়ো হবার ইচ্ছা—বড়ো হওয়ার দ্বারা নিজের শক্তিকে বড়ো করে উপলব্ধি করা। এই অভিপ্রায়ে মানুষ কোনো দুঃখ থেকে নিজেকে বাঁচাতে চায় না।

যে লোক লক্ষপতি হবে বলে দিনরাত টাকা জমাচ্ছে—বিশ্রামের সুখ নেই, খাবার সুখ নেই, রাত্রে ঘুম নেই, লাভক্ষতির নিরন্তর আন্দোলনে মনে চিন্তার সীমা নেই—সে কিজন্যে এই অসহ্য কষ্ট স্বীকার করে নিয়েছে? ধনের পথে যত দূর সম্ভব বড়ো হয়ে ওঠবার জন্যে।

তাকে এ কথা বলা মিথ্যা যে 'তোমাকে দুঃখনিবারণের পথ বলে দিচ্ছি'। তাকে এ কথাও বলা মিথ্যা যে 'ভোগের বাসনা ত্যাগ করো, আরামের আকাঙ্ক্ষা মনে রেখো না'। ভোগ এবং আরাম সে যেমন ত্যাগ করেছে এমন আর কে করতে পারে?

বুদ্ধদেব যে দুঃখনিবৃত্তির পথ দেখিয়ে দিয়েছেন সে পথের একটা সকলের চেয়ে বড়ো আকর্ষণ কী? সে এই যে, অত্যন্ত দুঃখ স্বীকার করে এই পথে অগ্রসর হতে হয়। এই দুঃখস্বীকারের দ্বারা মানুষ আপনাকে বড়ো করে জানে। খুব বড়ো রকম করে ত্যাগ, খুব বড়ো রকম করে ব্রতপালনের মাহাত্ম্য মানুষের শক্তিকে বড়ো করে দেখায় ব'লে মানুষের মন তাতে ধাবিত হয়।

এই পথে অগ্রসর হয়ে যদি সত্যই এমন কোনো-একটা জায়গায় মানুষ ঠেকতে পারত যেখানে একান্ত দুঃখনিবৃত্তি ছাড়া আর কিছুই নেই, তা হলে ব্যাকুল হয়ে তাকে জগতে দুঃখের সন্ধানে বেরোতে হত।

অতএব, মানুষকে যখন বলি 'দুঃখনিবৃত্তির উদ্দেশে তোমাকে সমস্ত সুখের বাসনা ত্যাগ করতে হবে', তখন সে রাগ করে বলতে পারে 'চাই নে আমি দুঃখনিবৃত্তি'। ওর চেয়ে বড়ো কিছু-একটাকে দিতে হবে, কারণ মানুষ বড়োকেই চায়।

সেইজন্যে উপনিষৎ বলেছেন: ভূমৈব সুখম্। অর্থাৎ, সুখ সুখই নয়, বড়োই সুখ। ভূমাত্বের বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ। এই বড়োকেই জানতে হবে, এঁকেই পেতে হবে। এই কথাটির তাৎপর্য যদি ঠিকমত বুঝি তা হলে কখনোই বলি নে যে 'চাই নে তোমার বড়োকে'।

কেননা, টাকায় বল', বিদ্যাতে বল', খ্যাতিতে বল', কোনো-না-কোনো বিষয়ে আমরা সুখকে ত্যাগ করে বড়োকেই চাচ্ছি। অথচ যাকে বড়ো বলে চাচ্ছি সে এমন বড়ো নয় যাকে পেয়ে আমার আত্মা বলতে পারে 'আমার সব পাওয়া হল'।

অতএব, যিনি ব্রহ্ম, যিনি ভূমা, যিনি সকলের বড়ো,তাঁকেই মানুষের সামনে লক্ষ্যরূপে স্থাপন করলে মানুষের মন তাতে সায় দিতে পারে, দুঃখনিবৃত্তিকে নয়।

কেউ কেউ এ কথা বলতে পারেন, 'তাঁকে উদ্দেশ্যরূপে স্থাপন করলেই কী আর না করলেই কী। এই সিদ্ধি এতই দূরে যে এখন থেকে এ সম্বন্ধে চিন্তা না করলেও চলে। আগে বাসনা দূর করো, শুচি হও, সবল হও, আগে কঠোর সাধনার সুদীর্ঘ পথ নিঃশেষে উত্তীর্ণ হও, তার পরে তাঁর কথা হবে।'

যিনি উদ্দেশ্য তাঁকে যদি গোড়া থেকেই সাধনার পথে কিছু-না-কিছু [না] পাই তা হলে এই দীর্ঘ অরাজকতার অবকাশে সাধনাটাই সিদ্ধির স্থান অধিকার করে, শুচিতাটাই প্রাপ্তি বলে মনে হয়, অনুষ্ঠানটাই দেবতা হয়ে ওঠে—পদে পদে সকল বিষয়েই মানুষের এই বিপদ দেখা গেছে। অহরহ ব্যাকরণ পড়তে পড়তে মানুষ কেবলই বৈয়াকরণ হয়ে ওঠে, ব্যাকরণ যে সাহিত্যের সোপান সেই সাহিত্যে সে প্রবেশই করে না।

দুধে তেঁতুল দিয়ে সেই দুধকে দধি করবার চেষ্টা করলে হয়তো বহু চেষ্টাতেও সে দুধ না জ'মে উঠতে পারে, কিন্তু যে দইয়ে তার পরিণতি সেই দই গোড়াতেই যোগ করে দিলে দেখতে দেখতে দুধ সহজেই দই হয়ে উঠতে থাকে। তেমনি যেটা আমাদের পরিণামে সেটাকে গোড়াতেই যোগ করে দিলে স্বভাবের সহজ নিয়মে পরিণাম সুসিদ্ধ হয়ে উঠতে থাকে।

আমরা যাঁকে সাধনার দ্বারা চাই, গোড়াতেই তাঁর হাতে আমাদের হাত সমর্পণ করে দিতে হবে; তিনিই আমাদের হাতে ধরে তাঁরই দিকে নিয়ে চলবেন তা হলে চলাও আনন্দ, পৌঁছানোও আনন্দ হয়ে উঠবে। তা হলে, অভাব থেকে ভাব হয় না, অসৎ থেকে সৎ হয় না, একেবারে না-পাওয়া থেকে পাওয়া হয় না—এই উপদেশটাকে মেনে চলা হবে। যিনিই আনন্দরূপে আমাদের কাছে চিরদিন ধরা দেবেন তিনিই কৃপারূপে আমাদের প্রতিদিন ধরে নিয়ে যাবেন।

শান্তিনিকেতন, র/১২/২৫৪-৫৬

বিষয়-সংকেত: মানুষের সকলের চেয়ে বড়ো ইচ্ছা দুঃখনিবারণের ইচ্ছা নয়, সুখী হবার ইচ্ছা নয়, বড়ো হবার ইচ্ছা। যিনি ব্রহ্ম,যিনি ভূমা, যিনি সকলের চেয়ে বড়ো, তাঁকেই মানুষের সামনে স্থাপন করলে মানুষের মন তাতে সায় দেয়।

৬২। আত্মসমর্পণ

১৮ চৈত্র ১৩১৫, ১৯০৯

... ব্রহ্মকে পাওয়ার কথাটা ঠিক বলা চলে না। কেননা, তিনি তো আপনাকে দিয়েই বসে আছেন, তাঁর তো কোনোখানে কমতি নেই—এ কথা তো বলা চলে না যে, এই জায়গায় তাঁর অভাব আছে, অতএব আর-এক জায়গায় তাঁকে খুঁজে বেড়াতে হবে।

অতএব, ব্রহ্মকে পেতে হবে এ কথাটা বলা ঠিক চলে না—'আপনাকে দিতে হবে' বলতে হবে। ওইখানেই অভাব আছে, সেইজন্যেই মিলন হচ্ছে না। তিনি আপনাকে দিয়েছেন, আমরা আপনাকে দিই নি। আমরা নানাপ্রকার স্বার্থের অহংকারের ক্ষুদ্রতার বেড়া দিয়ে নিজেকে অত্যন্ত, স্বতন্ত্র, এমন-কি বিরুদ্ধ করে রেখেছি।

এইজন্যই বুদ্ধদেব এই স্বাতন্ত্র্যের অতি কঠিন বেষ্টন নানা চেষ্টায় ক্রমে ক্রমে ক্ষয় করে ফেলবার উপদেশ করেছেন। এর চেয়ে বড়ো সত্তা, বড়ো আনন্দ যদি কিছুই না থাকে, তা হলে এই ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য নিরন্তর অভ্যাসে নষ্ট করে ফেলবার কোনো মানে নেই। কারণ, কিছুই যদি না থাকে তা হলে তো আমাদের এই অহং, এই ব্যক্তিগত বিশেষত্বই, একেবারে পরম লাভ—তা হলে একে আঁকড়ে না রেখে এত করে নষ্ট করব কেন?

কিন্তু আসল কথা এই যে, যিনি পরিপূর্ণরূপে নিজেকে দান করেছেন আমরাও তাঁর কাছে পরিপূর্ণরূপে নিজেকে দান না করলে তাঁকে প্রতিগ্রহ করাই হবে না। আমাদের দিকেই বাকি আছে।

তাঁর উপাসনা তাঁকে লাভ করবার উপাসনা নয়—আপনাকে দান করবার উপাসনা। দিনে দিনে ভক্তি-দ্বারা, ক্ষমা-দ্বারা, সন্তোষের দ্বারা, সেবার দ্বারা, তাঁর নিজেকে মঙ্গলে ও প্রেমে বাধাহীনরূপে ব্যাপ্ত করে দেওয়াই তাঁর উপাসনা।

অতএব, আমরা যেন না বলি যে 'তাঁকে পাচ্ছি নে কেন', আমরা যেন বলতে পারি 'তাঁকে দিচ্ছি নে কেন'। আমাদের প্রতিদিনের আক্ষেপ হচ্ছে এই যে—

> আমার যা আছে আমি সকল দিতে
> পারি নি তোমারে নাথ!
> আমার লাজ ভয়, আমার মান অপমান,
> সুখ দুখ ভাবনা।

দাও দাও দাও, সমস্ত ক্ষয় করো, সমস্ত খরচ করে ফেলো—তা হলেই পাওয়াতে একেবারে পূর্ণ হয়ে উঠবে।

মাঝে রয়েছে আবরণ কত শত, কতমত—
তাই কেঁদে ফিরি, তাই তোমারে না পাই,
মনে থেকে যায় তাই হে মনের বেদনা।

আমাদের যত দুঃখ যত বেদনা সে কেবল আপনাকে ঘোচাতে পারছি নে ব'লেই; সেইটে ঘুচলেই যে তৎক্ষণাৎ দেখতে পাব, আমার সকল পাওয়াকে চিরকালই পেয়ে বসে আছি।

উপনিষৎ বলেছেন: ব্রহ্ম তল্লক্ষ্যমুচ্যতে। ব্রহ্মকেই লক্ষ্য বলা হয়। এই লক্ষ্যটি কিসের জন্যে? কিছুকে আহরণ করে নিজের দিকে টানবার জন্যে নয়, নিজেকে একেবারে হারাবার জন্যে। শরবৎ তন্ময়ো ভবেৎ। শর যেমন লক্ষ্যের মধ্যে সম্পূর্ণ প্রবেশ ক'রে তন্ময় হয়ে যায় তেমনি করে তাঁর মধ্যে একেবারে আচ্ছন্ন হয়ে যেতে হবে।

এই তন্ময় হয়ে যাওয়াটা কেবল যে একটা ধ্যানের ব্যাপার, আমি তা মনে করি নে। এটা হচ্ছে সমস্ত জীবনেরই ব্যাপার। সকল অবস্থায়, সকল চিন্তায়, সকল কাজে এই উপলব্ধি যেন মনের এক জায়গায় থাকে যে, আমি তাঁর মধ্যেই আছি, কোথাও বিচ্ছেদ নেই। এই জ্ঞানটি যেন মনের মধ্যে প্রতিদিনই ক্রমে ক্রমে একান্ত সহজ হয়ে আছে যে: কোহ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ। আমার শরীর মনের তুচ্ছতম চেষ্টাটিও থাকত না যদি আকাশপরিপূর্ণ আনন্দ না থাকতেন; তাঁরই আনন্দ শক্তিরূপে ছোটো বড়ো সমস্ত ক্রিয়াকেই চেষ্টা দান করছে। আমি আছি তাঁরই মধ্যে, আমি করছি তাঁরই শক্তিতে এবং আমি ভোগ করছি তাঁরই দানে, এই জ্ঞানটিকে নিশ্বাস-প্রশ্বাসের মতো সহজ করে তুলতে হবে—এই আমাদের সাধনার লক্ষ্য। এই হলেই জগতে আমাদের থাকা করা এবং ভোগ, আমাদের সত্য মঙ্গল এবং সুখ, সমস্তই সহজ হয়ে যাবে—কেননা, যিনি স্বয়ম্ভূ, যার জ্ঞান শক্তি ও কর্ম স্বাভাবিক, তাঁর সঙ্গে আমাদের যোগকে আমরা চেতনার মধ্যে প্রাপ্ত হব। এইটি পাওয়ার জন্যেই আমাদের সকল চাওয়া।

শান্তিনিকেতন, র/১২/২৬২-৬৩

বিষয়-সংকেত: প্রশ্নটা ব্রহ্মকে পাওয়া নয়, প্রশ্নটা নিজেকে দেওয়া। ব্রহ্ম আপনাকে দিয়েই আছেন, আমরা নিজেকে পরিপূর্ণ দিতে পারলে তবেই যথার্থ পাওয়া হবে। অহংকার ও স্বাতন্ত্র্যের বেড়া না ভাঙলে নিজেকে দেওয়া সত্য হয় না।

৬৩। সমগ্র এক

১৯ চৈত্র ১৩১৫ (১৯০৯)

পরমত্মার মধ্যে আত্মাকে এইরূপ যোগযুক্ত করে উপলব্ধি করা এ কি কেবল জ্ঞানের দ্বারা হবে? তা কখনোই না। এতে প্রেমেরও প্রয়োজন...

নিজের মধ্যে আমরা কী কী দেখছি?

প্রথমে দেখছি আমি আছি, আমি সত্য।

তারপরে দেখছি যেটুকু এখনই আছি এইটুকুতেই আমি শেষ নই। যা আমি হব, যা এখনও হই নি, তাও আমার মধ্যে আছে। তাকে ধরতে পারি নে, ছুঁতে পারি নে, কিন্তু তা একটি রহস্যময় পদার্থরূপে আমার মধ্যে রয়েছে।...

আমাদের মানসিক শক্তিরও এইরূপ প্রকৃতি। আমাদের চিন্তাশক্তি যে কেবলমাত্র আমাদের চিন্তিত বিষয়গুলির মধ্যেই সম্পূর্ণ পর্যাপ্ত তা নয়—যা চিন্তা করি নি, ভবিষ্যতে করব, তার সম্বন্ধেও সে আছে। যা চিন্তা করতে পারতুম, প্রয়োজন উপস্থিত হলে যা চিন্তা করতুম, তার সম্বন্ধেও সে আছে।

অতএব দেখা যাচ্ছে, যা প্রত্যক্ষ সত্যরূপে বর্তমান তার মধ্যে আর-একটি পদার্থ বিদ্যমান, যা তাকে অতিক্রম করে অনাদি অতীত হতে অনন্ত ভবিষ্যতের দিকে ব্যাপ্ত।

এই-যে শক্তি যা আমাদের সত্যকে নিশ্চল জড়ত্বের মধ্যে নিঃশেষ করে রাখে নি, যা তাকে ছাড়িয়ে গিয়ে তাকে অনন্তের দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে, এ যে কেবলমাত্র গতিরূপে অহরহ আপনাকে অনাগতের অভিমুখে প্রকাশ করে চলেছে তা নয়, এর আর-একটি ভাব দেখছি। এ একের সঙ্গে আরকে, ব্যষ্টির সঙ্গে সমষ্টিকে যোজনা করছে।...

আমার মধ্যে যে-একটি সমগ্রতা আছে তার সঙ্গে একটি জ্ঞান আছে—সে জানছে আমি হচ্ছি আমি, আমি হচ্ছি একটি সম্পূর্ণ আছি।

শুধু জানছে নয়, এই জানায় তার একটি প্রীতি আছে। এই একটি সম্পূর্ণতাকে সে এত ভালবাসে যে এর কোনো ক্ষতি সে সহ্য করতে পারে না। এর মঙ্গলে তার লাভ, এর সেবায় তার আনন্দ।

তা হলে দেখতে পাচ্ছি, শক্তি একটি সমগ্রতাকে বাঁধছে রাখছে এবং তাকে অহরহ একটি ভাবী সম্পূর্ণতার দিকে চালনা করে নিয়ে যাচ্ছে।...

যেটি আমার নিজের মধ্যে দেখছি ঠিক এইটেই আবার সমাজের মধ্যে দেখছি। সমাজসত্তার ভিতরে একটি শক্তি বর্তমান যা সমাজকে কেবলই বর্তমানে আবদ্ধ করছে না, তাকে তার ভাবী পরিণতির দিকে নিয়ে যাচ্ছে। শুধু তাই নয়, সমাজস্থ প্রত্যেকের স্বার্থকে সকলের স্বার্থ এবং সকলের স্বার্থকে প্রত্যেকের স্বার্থ করে তুলছে।

কিন্তু, এই ব্যক্তিগত স্বার্থকে সমষ্টিগত মঙ্গলে পরিণত করাটা যে কেবল যন্ত্রবৎ জড় শাসনে ঘটে উঠছে তা নয়। এর মধ্যে প্রেম আছে। মানুষের সঙ্গে মানুষের মিলনে একটা রস আছে। স্নেহ প্রেম দয়া দাক্ষিণ্য আমাদের পরস্পরের যোগকে স্বেচ্ছাকৃত, আনন্দময়, অর্থাৎ, জ্ঞান ও প্রেম-ময় যোগরূপে জাগিয়ে তুলছে। আমরা দায়ে পড়ে নয়, আনন্দের সঙ্গে স্বার্থ বিসর্জন করছি। মা ইচ্ছা করেই সন্তানের সেবা করছে; মানুষ অন্ধভাবে নয়, সজ্ঞানে প্রেমের দ্বারাই সমাজের হিত করছে। এই-যে বৃহৎ আমি, সামাজিক আমি, স্বাদেশিক আমি, মানবিক আমি, এর প্রেমের জোর এত যে, এই চৈতন্য যাকে যথার্থভাবে অধিকার করে সে এই বৃহতের প্রেমে নিজের ক্ষুদ্র আমির সুখদুঃখ জীবনমৃত্যু সমস্ত অকাতরে তুচ্ছ করে। সমগ্রতার মধ্যে এতই আনন্দ; বিচ্ছিন্নতার মধ্যেই দুঃখ, দুর্বলতা। তাই উপনিষৎ বলেছেন ভূমৈব সুখং নাল্পে সুখমস্তি।

বিশ্বব্যাপী সমগ্রতার মধ্যে ব্রহ্মের শক্তি কেবল যে সত্যের সত্য ও মঙ্গলের মঙ্গল-

রূপে আছে তা নয়, সেই শক্তি অপরিমেয় আনন্দরূপে বিরাজ করছে।...

এইজন্যই পরমাত্মার সঙ্গে আত্মার যে মিলন, সে জ্ঞান প্রেম কর্মের মিলন। সেই মিলনই আনন্দের মিলন।...

শান্তিনিকেতন, র/১২/২৬৩-৬৫

বিষয়-সংকেত: আমাদের নিজেদের মধ্যে যে সমগ্রতা আছে, তার সঙ্গে জ্ঞান আছে, প্রেম আছে, আনন্দ আছে। সমাজসত্তাও তাই। সমাজও বর্তমানে আবদ্ধ নয়। সমাজসত্তাও আনন্দময় জ্ঞান ও মিলনের পথে পরিণতির দিকে অগ্রসর হয়। বিশ্বসত্তাতেও তাই। পরমাত্মার সঙ্গে আত্মার যে মিলন, সে জ্ঞান প্রেম ও কর্মের মিলন। সেই মিলনই আনন্দের মিলন।

৬৪। নিয়ম ও মুক্তি

৩০ চৈত্র

সুখ জিনিসটা কেবল আমার, কল্যাণ জিনিসটা সমস্ত জগতের। পিতার কাছে যখন প্রার্থনা করি 'যদ্‌ভদ্রং তন্ন আসুব', 'যা ভালো তাই আমাদের দাও', তার মানে হচ্ছে সমস্ত জগতের ভালো আমাদের মধ্যে প্রেরণ করো। কারণ, সেই ভালোই আমার পক্ষেও সত্য ভালো, আমার পক্ষেও নিত্য ভালো। যা বিশ্বের ভালো তাই আমার ভালো, কারণ, যিনি বিশ্বের পিতা তিনিই আমার পিতা।

যেখানে কল্যাণ নিয়ে অর্থাৎ বিশ্বের ভালো নিয়ে কথা সেখানে অত্যন্ত কড়া নিয়ম। সেখানে উপস্থিত সুখসুবিধা কিছুই খাটে না; সেখানে ব্যক্তিবিশেষের আরাম-বিরামের স্থান নেই। সেখানে দুঃখও শ্রেয়, মৃত্যুও বরণীয়।

যেখানে বিশ্বের ভালো নিয়ে কথা সেখানে সমস্ত নিয়ম একেবারে শেষ পর্যন্ত মানতেই হবে। সেখানে কোনো বন্ধন কোনো দায়কেই অস্বীকার করতে পারব না।

আমাদের পিতা এইখানেই 'মহদ্‌ভয়ং বজ্রমুদ্যতম্'। এইখানেই তিনি পুত্রকে এক চুল প্রশ্রয় দেন না। বিশ্বের ভাগ থেকে একটি কণা হরণ করেও তিনি কোনো বিশেষ পুত্রের পাতে দেন না। এখানে কোনো স্তব-স্তুতি অনুনয়-বিনয় খাটে না।

তবে মুক্তি কাকে বলে? এই নিয়মকে পরিপূর্ণভাবে আত্মসাৎ করে নেওয়াকেই বলে মুক্তি। নিয়ম যখন কোনো জায়গায় আমার বাইরের জিনিস হবে না, সম্পূর্ণ আমার ভিতরকার জিনিস হবে, তখনই সেই অবস্থাকে বলব মুক্তি।

এখনও নিয়মের সঙ্গে আমার সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য হয় নি। এখনও চলতে ফিরতে বাধে।

এখনও সকলের ভালোকে আমার ভালো বলে অনুভব করি নে। সকলের ভালোর বিরুদ্ধে আমার অনেক স্থানেই বিদ্রোহ আছে।

এইজন্যে পিতার সঙ্গে আমার সম্পূর্ণ মিলন হচ্ছে না, পিতা আমার পক্ষে রুদ্র হয়ে আছেন। তাঁর শাসনকেই আমি পদে পদে অনুভব করছি, তাঁর প্রসন্নতাকে নয়। পিতার মধ্যে পুত্রের সম্পূর্ণ মুক্তি হচ্ছে না।

অর্থাৎ, মঙ্গল এখনও আমার পক্ষে ধর্ম হয়ে ওঠে নি। যার ধর্ম যেটা সেটা তার পক্ষে বন্ধন নয়, সেইটেই তার আনন্দ। চোখের ধর্ম দেখা; তাই দেখাতেই চোখের আনন্দ, দেখায় বাধা পেলেই তার কষ্ট। মনের ধর্ম মনন করা; মননেই তার আনন্দ, মননে বাধা পেলেই তার দুঃখ।

বিশ্বের ভালো যখন আমার ধর্ম হয়ে উঠবে তখন সেইটেতেই আমার আনন্দ এবং তার বাধাতেই আমার পীড়া হবে।

মায়ের ধর্ম যেমন পুত্রস্নেহ ঈশ্বরের ধর্মই তেমনি মঙ্গল। সমস্ত জগৎচরাচরের ভালো করাই তাঁর স্বভাব, তাতেই তাঁর আনন্দ।

আমাদের স্বভাবেও সেই মঙ্গল আছে, সমগ্র-হিতেই নিজের হিতবোধ মানুষের একটা ধর্ম। স্বার্থের বন্ধন কাটিয়ে পূর্ণ-পরিণত হয়ে উঠবার জন্যে নিয়তই মনুষ্য সমাজে প্রয়াস পাচ্ছে। আমাদের এই ধর্ম অপরিণত এবং বাধাগ্রস্ত ব'লেই আমরা দুঃখ পাচ্ছি, পূর্ণ মঙ্গলের সঙ্গে মিলনের আনন্দ ঘ'টে উঠছে না।

যতদিন ভিতরের থেকে এই পরিণতিলাভ'না হবে, এই বাধা কেটে গিয়ে আমাদের স্বভাব নিজেকে উপলব্ধি না করবে, ততদিন বাহিরের বন্ধন আমাদের মানতেই হবে। ছেলের পক্ষে যতদিন চলাফেরা স্বাভাবিক হয়ে না ওঠে, ততদিন ধাত্রী বাইরে থেকে তার হাত ধরে তাকে চালায়। তখনই তার মুক্তি হয় যখন চলার শক্তি তার স্বাভাবিক শক্তি হয়।

অতএব, নিয়মের শাসন থেকে আমরা মুক্তিলাভ করব নিয়মকে এড়িয়ে নয়, নিয়মকে আপন করে নিয়ে। আমাদের দেশে একটা শ্লোক প্রচলিত আছে: প্রাপ্তে তু ষোড়শে বর্ষে পুত্রং মিত্রবদাচরেৎ। ষোলো বছর বয়স হলে পুত্রের প্রতি মিত্রের মতো ব্যবহার করবে।

তার কারণ কী? তার কারণ এই, যে পর্যন্ত না পুত্রের শিক্ষা পরিণতি লাভ করবে, অর্থাৎ সেই-সমস্ত শিক্ষা তার স্বভাবসিদ্ধ হয়ে উঠবে, ততক্ষণ তার প্রতি একটি বাইরের শাসন রাখার দরকার হয়। বাইরের শাসন যতক্ষণ থাকে ততক্ষণ পুত্রের সঙ্গে পিতার অন্তরের যোগ কখনোই সম্পূর্ণ হতে পারে না। যখনই সেই বাইরের শাসনের প্রয়োজন চলে যায় তখনই পিতাপুত্রের মাঝখানের আনন্দসম্বন্ধ একেবারে অব্যাহত হয়ে ওঠে। তখনই সমস্ত অসত্য সত্যে বিলীন হয়, অন্ধকার জ্যোতিতে উদ্‌ভাসিত হয়, মৃত্যু অমৃতে নিঃশেষিত হয়ে যায়। তখনই পিতার প্রকাশ পুত্রের কাছে সম্পূর্ণ হয়। তখনই যিনি রুদ্ররূপে আঘাত করেছিলেন তিনিই প্রসন্নতা-দ্বারা রক্ষা করেন। ভয় তখন আনন্দে এবং শাসন তখন মুক্তিতে পরিণত হয়; সত্য তখন প্রিয়-অপ্রিয়ের-দ্বন্দ্ব-বর্জিত সৌন্দর্যে উজ্জ্বল হয়, মঙ্গল তখন ইচ্ছা-অনিচ্ছার-দ্বিধা-বর্জিত প্রেমে এসে উপনীত হয়। তখনই আমাদের মুক্তি। সে মুক্তিতে কিছুই বাদ পড়ে না, সমস্ত সম্পূর্ণ হয়; বন্ধনশূন্য হয়ে যায়

না, বন্ধনই অবন্ধন হয়ে ওঠে; কর্ম চলে যায় না, কিন্তু কর্মই আসক্তিশূন্য বিরামরূপ ধারণ করে।

শান্তিনিকেতন, র/১২/২৭৭-৭৮

বিষয়-সংকেত: কল্যাণ সকলের জিনিস। কল্যাণের নিয়মে কোথাও শিথিলতা নেই। এই নিয়মকে পরিপূর্ণভাবে আত্মসাৎ করাতেই মুক্তি। তখন বিশ্বের নিয়মের সঙ্গে ব্যক্তির সামঞ্জস্য। তখন তা ব্যক্তির ধর্ম হয়ে উঠবে। তখন বন্ধনশূন্যতা নয়, তখন বন্ধনই অবন্ধন।

৬৫। অনন্তের ইচ্ছা

৩ বৈশাখ ১৩১৬, ১৯০৯

আমার শরীরের মধ্যে কতকগুলি ইচ্ছা আছে যা আমার শরীরের গোচর। যেমন আমার খেতে ইচ্ছা করে, স্নান করতে ইচ্ছা করে, শীতের সময় গরম হতে ইচ্ছা করে।

কিন্তু, সমস্ত শরীরের মধ্যে একটি ইচ্ছা আছে যা আমার অগোচরেই আছে। সেটি হচ্ছে স্বাস্থ্যের ইচ্ছা। সে আমাকে খবর না জানিয়েই রোগে এবং অরোগে নিয়ত কাজ করছে। সে ব্যাধির সময় কত রকম প্রতিকারের আশ্চর্য ব্যবস্থা করছে তা আমরা জানিই নে এবং অরোগের সময় সমস্ত শরীরের মধ্যে বিচিত্র ক্রিয়ার সামঞ্জস্য-স্থাপনার জন্যে তার কৌশলের অন্ত নেই—তারও কোনো খবর সে আমাদের জানায় না। এই স্বাস্থ্যের ইচ্ছাটি শরীরের মূলে আমাদের চেতনার অগোচরে রাত্রিদিন নিদ্রায় জাগরণে অবিশ্রাম বিরাজ করছে।

শরীর সম্বন্ধে যে ব্যক্তি জ্ঞানী তিনি এইটিকেই জানেন। তিনি জানেন আমাদের মধ্যে একটি স্বাস্থ্যতত্ত্ব আছে। শরীরের এই মূল অব্যক্ত ইচ্ছাটিকে যিনি জেনেছেন তিনি শরীরগত সমস্ত ব্যক্ত ইচ্ছাকে এর অনুগত করে তোলেন। ব্যক্ত ইচ্ছা যখন খাব ব'লে আবদার করছে তখন তাকে তিনি এই অব্যক্ত স্বাস্থ্যের ইচ্ছারই শাসনে নিয়মিত করবার চেষ্টা করেন। শরীর সম্বন্ধে এইটেই হচ্ছে সাধনা।

পাঁচ জনের সঙ্গে মিলে আমরা যে একটা সামাজিক শরীর রচনা করে আছি, তার মধ্যেও ব্যক্ত এবং অব্যক্ত ইচ্ছা আছে। সমাজের প্রত্যেকের নিজের স্বার্থ সুবিধা সুখ ও স্বাধীনতার জন্যে যে ইচ্ছা এইটেই তার ব্যক্ত ইচ্ছা। সকলেই বেশি পেতে চাচ্ছে, সকলেই জিততে চাচ্ছে, যত কম মূল্য দিয়ে যত বেশি পরিমাণ আদায় করতে পারে এই সকলের ইচ্ছা। এই ইচ্ছার সংঘাতে কত ফাঁকি, কত যুদ্ধ, কত দলাদলি চলছে তার আর সীমা নেই।

কিন্তু, এরই মধ্যে একটি অব্যক্ত ইচ্ছা ধ্রুব হয়ে আছে—তাকে প্রত্যক্ষ দেখা যাচ্ছে না, কিন্তু সে আছেই, না থাকলে কোনোমতেই সমাজ রক্ষা পেত না—সে হচ্ছে মঙ্গলের

ইচ্ছা। অর্থাৎ, সমস্ত সমাজের সুখ হোক, ভালো হোক, এই ইচ্ছা প্রত্যেকের মধ্যে নিগূঢ়ভাবেই আছে। এই থাকার উপরেই সমাজ বেঁধে উঠেছে, কোনো প্রত্যক্ষ সুবিধার উপরে নয়।

সমাজ সম্বন্ধে যাঁরা জ্ঞানী তাঁরা এইটেই জেনেছেন। তাঁরা সমুদয় সুখ সুবিধা স্বাধীনতার ব্যক্ত ইচ্ছাকে এই গভীরতর অব্যক্ত মঙ্গল-ইচ্ছার অনুগত করতে চেষ্টা করেন। তাঁরা এই নিগূঢ় নিত্য ইচ্ছার কাছে সমস্ত অনিত্য ইচ্ছাকে ত্যাগ করতে পারেন।

আমাদের আত্মার মধ্যেও ব্যক্ত এবং অব্যক্ত ইচ্ছা আছে। আত্মা আপনাকে নানা দিকে বড়ো বলে অনুভব করতে চায়। সে ধনে বড়ো, বিদ্যায় বড়ো, খ্যাতিতে বড়ো হয়ে নিজেকে বড়ো জানতে চায়। এর জন্যে তার কাড়াকাড়ি-মারামারির অন্ত নেই।

কিন্তু, তার মধ্যে প্রতিনিয়ত একটি অব্যক্ত ইচ্ছা রয়েইছে। সকলের বড়ো, যিনি অনন্ত অখন্ড এক, সেই ব্রহ্মের মধ্যে মিলনেই নিজেকে উপলব্ধি করবার ইচ্ছা তার মধ্যে নিগূঢ়রূপে ধ্রুবরূপে রয়েছে। এই অব্যক্ত ইচ্ছাই তার সকলের চেয়ে বড়ো ইচ্ছা।

তিনিই আত্মবিৎ যিনি এই কথাটি জানেন। তিনি আত্মার সমস্ত ব্যক্ত ইচ্ছাকে সেই নিগূঢ় এক ইচ্ছার অধীন করেন।

শরীরের নানা ইচ্ছা ঐক্যলাভ করেছে একটি একের মধ্যে, সেইটি হচ্ছে স্বাস্থ্যের ইচ্ছা; এই গভীর ইচ্ছাটি শরীরের সমস্ত বর্তমান ইচ্ছাকে অতিক্রম করে অনাগতের মধ্যে চলে গেছে—শরীরের যে ভবিষ্যৎটি এখন নেই সেই ভবিষ্যৎকেও সে অধিকার করে রয়েছে।

সমাজশরীরেও নানা ইচ্ছা এক অন্তরতম গোপন ইচ্ছার মধ্যে ঐক্যলাভ করেছে; সে ওই মঙ্গল-ইচ্ছা। সে ইচ্ছাও বর্তমান সুখদুঃখের সীমা ছাড়িয়ে ভবিষ্যতের অভিমুখে চলে গেছে।

আত্মার অন্তরতম ইচ্ছে দেশে কালে কোথাও বদ্ধ নয়। তার যে-সকল ইচ্ছা কেবল পৃথিবীতেই সার্থক হতে পারে সেই-সকল ইচ্ছার মধ্যেই তার সমাপ্তি নয়; অনন্তের সঙ্গে মিলনের আকাঙ্ক্ষাই তার জ্ঞান প্রেম কর্মকে কেবলই আকর্ষণ করছে–সে সেখানে গিয়ে পৌঁচচ্ছে সেখানে গিয়ে থামতে পারছে না–কেবলই ছাড়িয়ে যাচ্ছে। সমস্তকেই ছাড়িয়ে নিয়ে যাবার ইচ্ছে তার সমস্ত ইচ্ছার ভিতরে নিরন্তর জাগ্রত হয়ে রয়েছে।

শরীরের মধ্যে এই স্বাস্থ্যের শান্তি, সমাজের মধ্যে মঙ্গল এবং আত্মার মধ্যে অদ্বিতীয়ের প্রেম, ইচ্ছারূপে বিরাজ করছে। এই ইচ্ছা অনন্তের ইচ্ছা, ব্রহ্মের ইচ্ছা। তাঁর এই ইচ্ছার সঙ্গে আমাদের সচেতন ইচ্ছাকে সংগত করে দেওয়াই আমাদের মুক্তি। এই ইচ্ছার সঙ্গে অসামঞ্জস্যই আমাদের বন্ধন, আমাদের দুঃখ। ব্রহ্মের যে ইচ্ছা আমাদের মধ্যে আছে সে আমাদে দেশকালের বাইরের দিকে নিয়ে যাবার ইচ্ছা, কোনো বর্তমানের বিশেষ স্বার্থ বা সুখের মধ্যে আবদ্ধ করবার ইচ্ছা নয়। সে ইচ্ছা কিনা তাঁর প্রেম, এইজন্য সে ইচ্ছা তাঁরই দিকে আমাদের টানছে। এই অনন্ত প্রেম যা আমাদের মধ্যেই আছে তার সঙ্গে আমাদের প্রেমকে যোগ করে দিয়ে আমাদের আনন্দকে বাধামুক্ত করে দেওয়াই আমাদের সাধনা। কি শরীরে, কি সমাজে, কি আত্মায়, সর্বত্রই আমরা এই-যে দুটি ইচ্ছার

ধারাকে দেখতে পাচ্ছি—একটি আমাদের গোচর অথচ চিরপরিবর্তনশীল, আর-একটি আমাদের অগোচর অথচ চিরন্তন—একটি কেবল বর্তমানের প্রতিই আকৃষ্ট, আর-একটি অনাগতের দিকে আকর্ষণকারী—একটি কেবল ব্যক্তিবিশেষের মধ্যেই বদ্ধ, আর-একটি নিখিলের সঙ্গে যোগযুক্ত—এই দুটি ইচ্ছার গতি নিরীক্ষণ করো, এর তাৎপর্য গ্রহণ করো। এদের উভয়ের মধ্যে মিলিত হবার যে একটি তত্ত্ব বিরোধের দ্বারাই নিজেকে ব্যক্ত করছে, সেইটি উপলব্ধি ক'রে এই মিলনের জন্যই সমস্ত-জীবন প্রতিদিনই আপনাকে প্রস্তুত করো।

শান্তিনিকেতন, র/১২/২৪২-৪৪

বিষয়-সংকেত : শরীরের সমস্ত ছোট বড়ো ব্যক্ত ইচ্ছা একটি অব্যক্ত ইচ্ছার অধীন, সে হল স্বাস্থ্যের ইচ্ছা। তেমনি সমাজশরীরের সমস্ত ব্যক্ত ইচ্ছা নিগূঢ় মঙ্গল-ইচ্ছার অধীন। আত্মার মধ্যেও প্রেম ইচ্ছারূপে বিরাজ করে। সে ইচ্ছা অনন্তের সঙ্গে মিলনের ইচ্ছা। সেই ইচ্ছাই তার জ্ঞান প্রেম ও কর্মকে নিয়ত আকর্ষণ করে। আমাদের গোচর ইচ্ছা পরিবর্তনশীল এবং বর্তমানে আবদ্ধ, আমাদের মধ্যে অগোচর অনন্তের ইচ্ছা সব সময় আমাদের অনাগতের দিকে নিয়ে যায়।

৬৬। পাওয়া ও না-পাওয়া

বৈশাখ ১৩১৬, (১৯০৯)

সেই পাওয়াতেই মানুষের মন আনন্দিত, যে পাওয়ার সঙ্গে না-পাওয়া জড়িত হয়ে আছে।

যে সুখ কেবলমাত্র পাওয়ার দ্বারাই আমাদের উন্মত্ত করে তোলে না, অনেকখানি না পাওয়ার মধ্যে যার স্থিতি আছে ব'লেই যার ওজন ঠিক আছে সেইজন্যেই যাকে আমরা গভীর সুখ বলি—অর্থাৎ, যে সুখের সকল অংশই একেবারে সুস্পষ্ট সুব্যক্ত নয়, যার এক অংশ নিগূঢ়তার মধ্যে অগোচর, যা প্রকাশের মধ্যেই নিঃশেষিত নয়— তাকেই আমরা উচ্চ শ্রেণীর সুখ বলি।

পেট ভরে আহার করলে পর আহার করবার সুখটা সম্পূর্ণ পাওয়া যায়, দর্শনে স্পর্শনে ঘ্রাণে স্বাদে সর্ব প্রকারে তাকে সম্পূর্ণ আয়ত্ত করা হয়। সে সুখের প্রতি যতই লোভ থাকুক, মানুষ তাকে আনন্দের কোঠায় ফেলে না।

কিন্তু, যে সৌন্দর্যবোধকে আমরা কেবলমাত্র ইন্দ্রিয়বোধের দ্বারা সেরে ফেলতে পারি নে—যা বীণার অনুরণনের মতো চেতনার মধ্যে স্পন্দিত হতে থাকে, যা সমাপ্ত হতেই চায় না, সে আনন্দকে আমরা আহারের আনন্দের সঙ্গে এক শ্রেণীতে গণ্যই করি নে। কেবলমাত্র পাওয়া তাকে অপমানিত করে না, না-পাওয়া তাকে গৌরব দান করে।

আমরা জগতে পাওয়ার মতো পাওয়া তাকেই বলি যে পাওয়ার মধ্যে অনির্বচনীয়তা আছে। যে জ্ঞান কেবলমাত্র একটি খবর তার মূল্য অতি অল্প, কেননা, সেটা একটা সংকীর্ণ

জানার মধ্যেই ফুরিয়ে যায়। কিন্তু, যে জ্ঞান তথ্য নয়, তত্ত্ব, অর্থাৎ যাকে কেবল একটি ঘটনার মধ্যে নিঃশেষ করা যায় না, যা অসংখ্য অতীত ঘটনার মধ্যেও আছে এবং যা অসংখ্য ভাবী ঘটনার মধ্যেও আপনাকে প্রকাশ করবে, যা কেবল ঘটনাবিশেষের মধ্যে ব্যক্ত বটে কিন্তু অনন্তের মধ্যে অব্যক্তরূপে বিরাজমান, সেই জ্ঞানেই আমাদের আনন্দ; কেবলমাত্র বিচ্ছিন্ন তুচ্ছ খবরে নিতান্ত জড়বুদ্ধি অলস লোকের বিলাস।

ক্ষণিক আমোদ বা ক্ষণিক প্রয়োজনে আমরা অনেক লোকের সঙ্গে মিলি, আমাদের কাছে তারা সেইটুকুর মধ্যেই নিঃশেষিত। কিন্তু, যে আমার প্রিয়, কোনো-এক সময়ের আলাপে আমোদে কোনো-এক সময়ের প্রয়োজনে তার শেষ পাই নে। তার সঙ্গে যে সময়ে যে আলাপে যে কর্মে নিযুক্ত আছি, সে সময়কে, সেই আলাপকে, সেই কর্মকে বহু দূরে ছাড়িয়ে সে রয়েছে। কোনো বিশেষ দেশে বিশেষ কালে বিশেষ ঘটনায় আমরা তাকে সমাপ্ত করলুম ব'লে মনেই করতে পারি নে; সে আমার কাছে প্রাপ্ত অথচ অপ্রাপ্ত—এই অপ্রাপ্তি তাকে আমার কাছে এমন আনন্দময় করে রেখেছে।

এর থেকে বোঝা যায়, আমাদের আত্মা যে পেতেই চাচ্ছে তা নয়, সে না-পেতেও চায়। এইজন্যেই সংসারের সমস্ত দৃশ্যস্পৃশ্যের মাঝখানে দাঁড়িয়ে সে বলছে, 'কেবলই পেয়ে পেয়ে আমি শ্রান্ত হয়ে গেলুম, আমার না-পাওয়ার ধন কোথায় ? সেই চিরদিনের না-পাওয়াকে পেলে যে আমি বাঁচি।'—

যতো বাচো নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ
আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কদাচন।

বাক্য মন যাঁকে না পেয়ে ফিরে আসে সেই আমার না-পাওয়া ব্রহ্মের আনন্দে আমি সমস্ত ক্ষুদ্র ভয় হতে যে রক্ষা পেতে পারি।

এইজন্যেই উপনিষৎ বলেছেন: অবিজ্ঞাতম্ বিজানতাং বিজ্ঞাতম্ অবিজানতাম্। যিনি বলেন 'আমি তাঁকে জানি নি' তিনিই জানেন, যিনি বলেন 'আমি জেনেছি' তিনি জানেন না।

আমি তাঁকে জানতে পারলুম না, এ কথাটা জানবার অপেক্ষা আছে। পাখি যেমন করে জানে 'আমি আকাশ পার হতে পারলুম না', তেমনি করে জানা চাই। পাখি আকাশকে জানে ব'লেই সে জানে যে আকাশ পার হওয়া গেল ন্য। আকাশ পার হওয়া গেল না জানে বলেই তার আনন্দ; এইজন্যেই সে আকাশে উড়ে বেড়ায়। কোনো প্রাপ্তি নয়, কোনো সমাপ্তি নয়, কোনো প্রয়োজন নয়, কিন্তু উড়েই তার আনন্দ।

পাখি আকাশকে জানে ব'লেই সে জানে 'আমি আকাশকে শেষ করে জানলুম না' এবং এই জেনে না-জানাতেই তার আনন্দ—ব্রহ্মকে জানার কথাতেও এই কথাটাই খাটে। সেইজন্যেই উপনিষৎ বলেন: নাহং মন্যে সুবেদেতি নো ন বেদেতি বেদ চ। আমি যে ব্রহ্মকে বেশ জেনেছি এও নয়, আমি যে একেবারে জানি নে এও নয়।

কেউ কেউ বলেন, 'আমরা ব্রহ্মকে একেবারেই জানতে চাই, যেমন করে এই-সমস্ত জিনিসপত্র জানি, নইলে আমার কিছুই হল না।'

আমি বলছি, আমরা তা চাই নে। যদি চাইতুম তা হলে সংসারই আমাদের পক্ষে যথেষ্ট ছিল। এখানে জিনিসপত্রের অন্ত কোথায় ? এর উপরে আবার কেন ? নীড়ের পাখি যেমন আকাশকে চায় তেমনি আমরা এমন-কিছুকে চাই যাকে পাওয়া যয় না।

আমার মনে আছে, যাঁরা ব্রহ্মকে চান তাঁদের প্রতি বিদ্রূপ প্রকাশ করে একজন পণ্ডিত অনেক দিন হল বলেছিলেন—একদল গাঁজাখোর রাত্রে গাঁজা খাবার সভা করেছিল। টিকা ধরাবার আগুন ফুরিয়ে যাওয়াতে তারা সংকটে পড়েছিল। তখন রক্তবর্ণ হয়ে চাঁদ আকাশে উঠছিল। একজন বললে, ওই-যে ওই আলোতে টিকা ধরাব।' ব'লে টিকা নিয়ে জানলার কাছে দাঁড়িয়ে চাঁদের অভিমুখে বাড়িয়ে ধরলে। টিকা ধরল না। তখন আর-একজন বললে, 'দূর! চাঁদ বুঝি অত কাছে! দে আমাকে দে।' বলে সে আরও কিছু দূরে গিয়ে টিকা বাড়িয়ে ধরলে। এমনি করে সমস্ত গাঁজাখোরের শক্তি পরাস্ত হল; টিকা ধরল না।

এই গল্পের ভাবখানা হচ্ছে এই যে,যে ব্রহ্মের সীমা পাওয়া যায় না তাঁর সঙ্গে কোনো সম্বন্ধ-স্থাপনের চেষ্টা এইরকম বিড়ম্বনা।

এর থেকে দেখা যাচ্ছে, কারও কারও মতে সাংসারিক প্রার্থনা ছাড়া আমাদের মনে আর-কোনো প্রার্থনা নেই। আমরা কেবল প্রয়োজনসিদ্ধিই চাই—টিকেয় আমাদের আগুন ধরাতে হবে।

এ কথাটা যে কত অমূলক তা ওই চাঁদের কথা ভাবলেই বোঝা যাবে। আমরা দেশলাইকে যে ভাবে চাই চাঁদকে সে ভাবে চাই নে, চাঁদকে চাঁদ বলেই চাই, চাঁদ আমাদের বিশেষ কোনো সংকীর্ণ প্রয়োজনের অতীত বলেই তাকে চাই। সেই চির-অতৃপ্ত অসমাপ্ত পাওয়ার চাওয়াটাই সব চেয়ে বড়ো চাওয়া। সেইজন্যেই পূর্ণচন্দ্র আকাশে উঠলেই নদীতে, নৌকায়, ঘাটে, গ্রামে, পথে, নগরের হর্ম্যতলে, গাছের নীড়ে, চার দিক থেকে গান জেগে ওঠে—কারও টিকেয় আগুন ধরে না ব'লে কোথাও কোনো ক্ষোভ থাকে না।

ব্রহ্ম তো তাল-বেতাল নন যে তাঁকে আমরা বশ করে নিয়ে প্রয়োজনসিদ্ধি করব। কেবল প্রয়োজনসিদ্ধিতেই পাওয়ার দরকার, আনন্দের পাওয়াতে ঠিক তার উল্টো। তাতে না-পাওয়াটাই হচ্ছে সকলের চেয়ে বড়ো জিনিস। যে জিনিস আমরা পাই তাতে আমাদের যে সুখ সে অহংকারের সুখ। আমার আয়ত্তের জিনিস আমার ভৃত্য, আমার অধীন, আমি তার চেয়ে বড়ো।

কিন্তু, এই সুখই মানুষের সব চেয়ে বড়ো সুখ নয়। আমার চেয়ে যে বড়ো তার কাছে আত্মসমর্পণ করার সুখই হচ্ছে আনন্দ। আমার যিনি অতীত আমি তাঁরই—এইটি জানাতেই অভয়, এইটি অনুভব করাতেই আনন্দ। যেখানে ভূমানন্দ সেখানে আমি বলি, 'আমি আর পারলুম না, আমি হাল ছেড়ে দিলুম, আমি গেলুম। গেল আমার অহংকার, গেল আমার শক্তির ঔদ্ধত্য।' এই না-পেরে-ওঠার মধ্যে, এই না-পাওয়ার মধ্যে, নিজেকে একান্ত ছেড়ে দেওয়াই মুক্তি।

মানুষ তো সমাপ্ত নয়, সে তো হয়ে-বয়ে যায় নি, সে যেটুকু হয়েছে সে তো অতি অল্পই। তার না-হওয়াই যে অনন্ত। মানুষ যখন আপনার এই হওয়া-রূপী জীবের বর্তমান-প্রয়োজন-সাধন করতে চায়, তখন প্রয়োজনের সামগ্রীকে নিজের অভাবের সঙ্গে একেবারে সম্পূর্ণ করে চারি দিকে মিলিয়ে নিতে হয়, তার বর্তমানটি একেবারে সম্পূর্ণ বর্তমানকেই চাচ্ছে। কিন্তু, সে তো কেবলই বর্তমান নয়, সে তো কেবলই হওয়া-রূপী নয়;

তার না-হওয়া-রূপী অনন্ত যদি কিছুই না পায় তবে তার আনন্দ নেই। পাওয়ার সঙ্গে অনন্ত না-পাওয়া তার সেই অনন্ত না-হওয়াকে আশ্রয় দিচ্ছে, খাদ্য দিচ্ছে। এইজন্যেই মানুষ কেবলই বলে, 'অনেক দেখলুম, অনেক শুনলুম, অনেক বুঝলুম, কিন্তু আমার না-দেখার ধন, না-শোনার ধন, না-বোঝার ধন কোথায়?' যা অনাদি ব'লেই অনন্ত, যা হয় না ব'লেই যায় না, যাকে পাই নে ব'লেই হারাই নে, যা আমাকে পেয়েছে ব'লেই আমি আছি, সেই অশেষের মধ্যে নিজেকে নিঃশেষ করবার জন্যেই আত্মা কাঁদছে। সেই অশেষকে সশেষ করতে চায়, এমন ভয়ংকর নির্বোধ সে নয়; যাকে আশ্রয় করবে তাকে আশ্রয় দিতে চায়, এমন সমূলে আত্মঘাতী নয়।

শান্তিনিকেতন, র/১২/২৮৪-৮৭

বিষয়-সংকেত: সেই পাওয়াতেই মন আনন্দিত, যে-পাওয়ার সঙ্গে না-পাওয়া জড়িত হয়ে আছে, যে-পাওয়ার মধ্যে অনির্বচনীয়তা আছে, যে-পাওয়া প্রয়োজনসিদ্ধির পাওয়া নয়, যে-পাওয়া আনন্দের পাওয়া। সেই পাওয়া যা আমার আয়ত্তের অতীত, যা আমার থেকে বড়ো। না-পাওয়ার মধ্যে নিজেকে ছেড়ে দেওয়াতে মানুষের মুক্তি।

মানুষ তো সমাপ্ত নয়, সে তো হয়ে-বয়ে যায় নি, সে যেটুকু হয়েছে সে তো অতি অল্পই। তার না-হওয়াই যে অনন্ত। হওয়া-রূপী বর্তমানে মানুষের সুখ আছে, আনন্দ নেই। না-হওয়া-রূপী অনন্ততেই মানুষের আনন্দ।

৬৭। হওয়া

৬ বৈশাখ ১৩১৬ (১৯০৯)

পাওয়া মানেই আংশিকভাবে পাওয়া। প্রয়োজনের জন্যে আমরা যাকে পাই তাকে তো কেবল প্রয়োজনের মতোই পাই; তার বেশি তো পাই নে। অন্ন কেবল খাওয়ার সঙ্গে মেলে, বস্ত্র কেবল পরার সঙ্গেই মেলে, বাড়ি কেবল বাসের সঙ্গে মেলে। এদের সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ ওই-সকল ক্ষুদ্র প্রয়োজনের সীমাতে এসে ঠেকে, সেটাকে আর লঙ্ঘন করা যায় না।

এইরকম বিশেষ প্রয়োজনের সংকীর্ণ পাওয়াকেই আমরা লাভ বলি। সেইজন্যে ঈশ্বরকে লাভের কথা যখন ওঠে তখনও ভাষা এবং অভ্যাসের টানে ওইরকম লাভের কথাই মনে উদয় হয়। সে যেন কোনো বিশেষ স্থানে কোনো বিশেষ কালে লাভ; তাঁকে দর্শন মানে কোনো বিশেষ মূর্তিতে কোনো বিশেষ মন্দিরে বা বিশেষ কল্পনায় দর্শন।

কিন্তু, পাওয়া বলতে যদি আমরা এই বুঝি তবে ঈশ্বরকে পাওয়া হতেই পারে না। আমরা যা-কিছুকে পেলুম বলে মনে করি সে আমাদের ঈশ্বর নয়। তিনি আমাদের পাওয়ার সম্পূর্ণ অতীত। তিনি আমাদের বিষয়সম্পত্তি নন।

ও জায়গায় আমাদের কেবল হওয়া, পাওয়া নয়। তাঁকে আমরা পাব না, তাঁর মধ্যে

আমরা হব। আমার সমস্ত শরীর মন হৃদয় নিয়ে আমি কেবলই হয়ে উঠতে থাকব। ছাড়তে ছাড়তে, বাড়তে বাড়তে, মরতে মরতে, বাঁচতে বাঁচতে, আমি কেবলই হব। পাওয়াটা কেবল এক অংশে পাওয়া; হওয়াটা যে একেবারে সমগ্রভাবে হওয়া—সে তো লাভ নয়, সে বিকাশ।

ভীরু লোকে বলবে, 'বল কী! তুমি ব্রহ্ম হবে! এমন কথা তুমি মুখে আন কী করে !'

হাঁ, আমি ব্রহ্মই হব। এ কথা ছাড়া অন্য কথা আমি মুখে আনতে পারি নে। আমি অসংকোচেই বলব, আমি ব্রহ্ম হব। কিন্তু, 'আমি ব্রহ্মকে পাব' এত বড়ো স্পর্ধার কথা বলতে পারি নে।

তবে কি ব্রহ্মেতে আমাতে তফাত নেই ? মস্ত তফাত আছে। তিনি ব্রহ্ম হয়েই আছেন, আমাকে ব্রহ্ম হতে হচ্ছে! তিনি হয়ে রয়েছেন, আমি হয়ে উঠেছি—আমাদের দুজনের মধ্যে এই লীলা চলছে। হয়ে থাকার সঙ্গে হয়ে ওঠার নিয়ত মিলনেই আনন্দ।

নদী কেবলই বলছে, 'আমি সমুদ্র হব।' তার স্পর্ধা নয়—সে যে সত্য কথা, সুতরাং সেই তার বিনয়। তাই সে সমুদ্রের সঙ্গে মিলিত হয়ে ক্রমাগতই সমুদ্র হয়ে যাচ্ছে—তার আর সমুদ্র হওয়া শেষ হল না।

বস্তুত, চরমে সমুদ্র হতে থাকা ছাড়া তার আর গতিই নেই। তার দুই দীর্ঘ উপকূলে কত খেত কত শহর কত গ্রাম কত বন আছে তার ঠিক নেই—নদী তাদের তুষ্ট করতে পারে, পুষ্ট করতে পারে, কিন্তু তাদের সঙ্গে মিলে যেতে পারে না। এই-সমস্ত শহর গ্রাম বনের সঙ্গে তার কেবল আংশিক সম্পর্ক। নদী হাজার ইচ্ছা করলেও শহর গ্রাম বন হয়ে উঠতে পারে না।

সে কেবল সমুদ্রই হতে পারে। তার ছোটো সচল জল সেই বড়ো অচল জলের একই জাত। এইজন্যে তার সমস্ত উপকূল পার হয়ে বিশ্বের মধ্যে সে কেবল ওই বড়ো জলের সঙ্গেই এক হতে পারে।

সে সমুদ্র হতে পারে, কিন্তু সে সমুদ্রকে পেতে পারে না। সমুদ্রকে সংগ্রহ করে এনে নিজের কোনো বিশেষ প্রয়োজনে তাকে কোনো বিশেষ গুহাগহ্বরে লুকিয়ে রাখতে পারে না। যদি কোনো ছোটো জলকে দেখিয়ে সে মূঢ়ের মতো বলে 'হাঁ, সমুদ্রকে এইখানে আমি নিজের সম্পত্তি করে রেখেছি' তাকে উত্তর দেব, 'ও তোমার সম্পত্তি হতে পারে, কিন্তু ও তোমার সমুদ্র নয়। তোমার চিরন্তন জলধারা এই জলটাকে চায় না, সে সমুদ্রকেই চায়। কেননা, সে সমুদ্র হতে চাচ্ছে, সে সমুদ্রকে পেতে চাচ্ছে না।'

আমরাও কেবল ব্রহ্মই হতে পারি, আর-কিছুই হতে পারি নে। আর-কোনো হওয়াতে তো আমরা সম্পূর্ণ হই নে। ধনী হওয়া, মানী হওয়া, বিদ্বান হওয়া, কিছুতেই আমরা টিঁকে থাকি নে; সমস্তই আমরা পেরিয়ে যাই; পেরোতে পারি নে ব্রহ্মকে। ছোটো সেখানে বড়ো হয়। কিন্তু তার সেই বড়ো হওয়া শেষ হয় না এই তার আনন্দ।

আমরা এই আনন্দেরই সাধনা করব। আমরা ব্রহ্মে মিলিত হয়ে অহরহ কেবল ব্রহ্মই হতে থাকব। যেখানে বাধা পাব সেখানে হয় ভেঙে নয় এড়িয়ে যাব। অহংকার স্বার্থ এবং জড়তা যেখানে নিষ্ফল বালির স্তূপ হয়ে পথরোধ করে দাঁড়াবে সেখানে প্রতি মুহূর্তে তাকে ক্ষয় করে ফেলব।

সকালবেলায় এইখানে বসে যে একটুখানি উপাসনা করি দেশকালবদ্ধ আংশিক জিনিসটাকে আমরা যেন সিদ্ধি বলে ভ্রম না করি। একটু রস, একটু ভাব, একটু চিন্তাই ব্রহ্ম নয়। এইটুকুমাত্রকে নিয়ে কোনোদিন জমছে কোনোদিন জমছে না বলে খুঁত-খুঁত কোরো না। এই সময় এবং এই অনুষ্ঠানটিকে একটি অভ্যস্ত আরামে পরিণত করে সেটাকে একটা পরমার্থ বলে কল্পনা কোরো না। সমস্তদিন সমস্ত চিন্তায় সমস্ত কাজে একেবারে সমগ্র নিজেকে ব্রহ্মের অভিমুখে চালনা করো—উল্টো দিকে নয়, নিজের দিকে নয়, কেবলই সেই ভূমার দিকে, শ্রেয়ের দিকে, অমৃতের দিকে। সমুদ্রে নদীর মতো তাঁর সঙ্গে মিলিত হও—তা হলে তোমার সমস্ত সত্তার ধারা কেবলই তিনিময় হতে থাকবে, কেবলই তুমি ব্রহ্ম হয়ে উঠবে। তা হলে তুমি তোমার সমস্ত জীবন দিয়ে, সমস্ত অস্তিত্ব দিয়ে, জানতে পারবে—ব্রহ্মকে তোমার পরমা গতি, পরমা সম্পৎ, পরম আশ্রয়, পরম আনন্দ, কেননা তাঁতেই তোমার পরম হওয়া।

শান্তিনিকেতন, র/১২/২৮৭-২৮৯

বিষয়-সংকেত : পাওয়া মানে আংশিকভাবে পাওয়া, তাতে আমরা সম্পূর্ণ হই না। কেবল ব্রহ্ম হওয়াতেই আমরা সম্পূর্ণ হই, কেননা এই বড়ো হওয়া শেষ হয় না। যে বড়ো হওয়ার শেষ নেই তাইতেই তার আনন্দ—আমরা সেই আনন্দেরই সাধনা করব। আমরা কেবল ব্রহ্মই হতে পারি, আর কিছুতেই আমরা সম্পূর্ণ হইনা।

চার। 'তোমায় আমায় মিলন হবে বলে' : রসের সাধনা

৬৮। বর্তমান যুগ

১৩১৬

...আসল জিনিসটা সহসা আমাদের চোখে পড়ে না, অনেক সময়ে এমন-কি তার অস্তিত্ব পর্যন্ত অস্বীকার করে বসি। আজ আমরা বাহির হতে দেখছি চারি দিকে একটা তুমুল আন্দোলন উপস্থিত, যাকে আমরা পলিটিক্‌স্ (politics) বলি। তাকে যত বড়ো করেই দেখি-না কেন, সে নিতান্তই বাহিরের জিনিস। আমাদের আত্মাকে কিছুতে যদি জাগরিত করছে সত্য হয়, তবে তা ধর্ম ছাড়া আর কিছুই নয়। এই ধর্মের মূলশক্তিটি প্রচ্ছন্ন থেকে কাজ করছে বলেই আমাদের চোখে ধরা পড়ছে না; পলিটিক্‌সের চাঞ্চল্যই আমাদের সমস্ত চিত্তকে আকর্ষণ করেছে। আমরা উপরকার তরঙ্গটাকেই দেখে থাকি, ভিতরকার স্রোতটাকে দেখি না। কিন্তু, বস্তুত ভগবান যে মানবসমাজকে ধর্মের ভিতর দিয়ে একটা মস্ত নাড়া দিয়েছেন, এই তো বিংশ শতাব্দীর বার্তা। বিশ্বাস করো, অনুভব করো, উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিম সমস্ত বিশ্বের ভিতর দিয়ে আজ এই ধর্মের বৈদ্যুতশক্তি ছুটে চলেছে। পৃথিবীতে আজ যে-কোনো তাপস সাধনায় প্রবৃত্ত আছে, তার পক্ষে এমন অনুকূল সময় আর আসবে না।...

শান্তিনিকেতন, র/১২/৩০১-০৩

বিষয়-সংকেত: আসল জিনিসটা সহসা নজরে পড়ে না, নজরে পড়ে বাইরের চাঞ্চল্যটা। পলিটিক্‌স বাইরের চাঞ্চল্য, তা আত্মাকে জাগরিত করতে পারে না। আত্মাকে জাগরিত করতে পারে ধর্ম।

৬৯। মেঘের পরে মেঘ

আষাঢ় ১৩১৬

মেঘের পরে মেঘ জমেছে, আঁধার করে আসে।
আমায় কেন বসিয়ে রাখ একা দ্বারের পাশে।।
কাজের দিনে নানা কাজে থাকি নানা লোকের মাঝে,
আজ আমি যে বসে আছি তোমারি আশ্বাসে।।
তুমি যদি না দেখা দাও, কর আমায় হেলা,
কেমন করে কাটে আমার এমন বাদল-বেলা।
দূরের পানে মেলে আঁখি কেবল আমি চেয়ে থাকি,
পরান আমার কেঁদে বেড়ায় দুরন্ত বাতাসে।।

গীতাঞ্জলি, র/২/২২৪

বিষয়-সংকেত: প্রতীক্ষা

তুলনীয় প্রসঙ্গ: আজি ঝড়ের রাতে (৭০), আমার মিলন লাগি (৭২) তোমায় আমায় মিলন হবে বলে (৯৫)।

৭০। আজি ঝড়ের রাতে

আষাঢ় ১৩১৬

আজি ঝড়ের রাতে তোমার অভিসার
পরানসখা বন্ধু হে আমার।।

আকাশ কাঁদে হতাশ-সম, নাই যে ঘুম নয়নে মম—
দুয়ার খুলি হে প্রিয়তম, চাই যে বারে বার।।

বাহিরে কিছু দেখিতে নাহি পাই,
তোমার পথ কোথায় ভাবি তাই।

সুদূর কোন্ নদীর পারে গহন কোন্ বনের ধারে
গভীর কোন্ অন্ধকারে হতেছ তুমি পার।।

গীতাঞ্জলি, র/২/২২৭

বিষয়-সংকেত: প্রতীক্ষা ও প্রত্যাশা

তুলনীয়-প্রসঙ্গ: মেঘের পরে মেঘ জমেছে (৬৯), আমার মিলন লাগি (৭২), তোমায় আমায় মিলন হবে বলে (৯৫)।

৭১। কোথায় আলো

আষাঢ় ১৩১৬

কোথায় আলো, কোথায় ওরে আলো!
বিরহানলে জ্বালো রে তারে জ্বালো।।
রয়েছে দীপ, না আছে শিখা, এই কি ভালে ছিল রে লিখা—
ইহার চেয়ে মরণ সে যে ভালো।
বিরহানলে প্রদীপখানি জ্বালো।।
বেদনাদূতী গাহিছে, 'ওরে প্রাণ,
তোমার লাগি জাগেন ভগবান।
নিশীথে ঘন অন্ধকারে ডাকেন তোরে প্রেমাভিসারে,
দুঃখ দিয়ে রাখেন তোর মান।
তোমার লাগি জাগেন ভগবান।'
গগনতল গিয়েছে মেঘে ভরি,
বাদলজল পড়িছে ঝরি ঝরি।
এ ঘোর রাতে কিসের লাগি পরান মম সহসা জাগি
এমন কেন করিছে মরি মরি।

বাদল-জল পড়িছে ঝরি ঝরি।।
বিজুলি শুধু ক্ষণিক আভা হানে,
নিবিড়তর তিমির চোখে আনে।
জানি না কোথা অনেক দূরে বাজিল গান গভীর সুরে,
সকল প্রাণ টানিছে পথপানে।
নিবিড়তর তিমির চোখে আনে।।
কোথায় আলো, কোথায় ওরে আলো!
বিরহানলে জ্বালো রে তারে জ্বালো।
ডাকিছে মেঘ, হাঁকিছে হাওয়া, সময় গেলে হবে না যাওয়া—
নিবিড় নিশা নিকষঘনকালো।
পরান দিয়ে প্রেমের দীপ জ্বালো।।

গীতবিতান, র/৪/৪৫

৭২। আমার মিলন লাগি

ভাদ্র ১৩১৬

আমার মিলন লাগি তুমি আসছ কবে থেকে!
তোমার চন্দ্র সূর্য তোমায় রাখবে কোথায় ঢেকে?
কত কালের সকাল-সাঁঝে তোমার চরণধ্বনি বাজে,
গোপনে দূত হৃদয়-মাঝে গেছে আমায় ডেকে।।
ওগো পথিক, আজকে আমার সকল পরান ব্যেপে
থেকে থেকে হরষ যেন উঠছে কেঁপে কেঁপে।
যেন সময় এসেছে আজ ফুরালো মোর যা ছিল কাজ—
বাতাস আসে, হে মহারাজ, তোমার গন্ধ মেখে।।

গীতবিতান, র/৪/৪৪

তুলনীয় প্রসঙ্গ : তোমায় আমায় মিলন হবে বলে(৯৫), তাই তোমার আনন্দ (৮৩)।

৭৩। ওই আসনতলের মাটির 'পরে

১০ই পৌষ ১৩১৬ (১৯০৯)

ওই আসনতলের মাটির 'পরে লুটিয়ে রব,
তোমার চরণ-ধূলায় ধূলায় ধূসর হব।।
কেন আমায় মান দিয়ে আর দূরে রাখ?
চিরজনম এমন করে ভুলিয়ো নাকো।
অসম্মানে আনো টেনে পায়ে তব।
তোমার চরণ-ধূলায় ধূলায় ধূসর হব।।

আমি তোমার যাত্রীদলের রব পিছে,
স্থান দিয়ো হে আমায় তুমি সবার নিচে।
প্রসাদ লাগি কতই লোকে আসে ধেয়ে,
আমি কিছুই চাইব না তো, রইব চেয়ে—
সবার শেষে যা বাকি রয় তাহাই লব।
তোমার চরণ-ধূলায় ধূলায় ধূসর হব।।

গীতবিতান-১৯৪, র/৪/১৫০

৭৪। রূপসাগরে ডুব দিয়েছি

১২ই পৌষ ১৩১৬ (১৯০৯)

রূপসাগরে ডুব দিয়েছি অরূপরতন আশা করি,
ঘাটে ঘাটে ঘুরব না আর ভাসিয়ে আমার জীর্ণ তরী।।
সময় যেন হয় রে এবার ঢেউ-খাওয়া সব চুকিয়ে দেবার,
সুধায় এবার তলিয়ে গিয়ে অমর হয়ে রব মরি।।
যে গান কানে যায় না শোনা সে গান যেথায় নিত্য বাজে
প্রাণের বীণা নিয়ে যাব সেই অতলের সভা-মাঝে।
চিরদিনের সুরটি বেঁধে শেষ গানে তার কান্না কেঁদে
নীরব যিনি তাঁহার পায়ে নীরব বীণা দিব ধরি।।

গীতবিতান-২৩৮, র/৪/১৮৫

৭৫। যিশুচরিত

২৫ ডিসেম্বর ১৯১০ (১৩১৭)

বাউল সম্প্রদায়ের একজন লোককে একবার জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, 'তোমরা সকলের ঘরে খাও না?' সে কহিল, 'না'। কারণ জিজ্ঞাসা করাতে সে কহিল, 'যাহারা আমাদের স্বীকার করে না আমরা তাহাদের ঘরে খাই না।' আমি কহিলাম, 'তারা স্বীকার না করে নাই করিল, তোমরা স্বীকার করিবে না কেন?' সে লোকটি কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া সরল ভাবে কহিল, 'তা বটে, ঐ জায়গাটাতে আমাদের একটু প্যাঁচ আছে'।

আমাদের সমাজে যে ভেদবুদ্ধি আছে তাহারই দ্বারা চালিত হইয়া কোথায় আমরা অন্ন গ্রহণ করিব আর কোথায় করিব না তাহারই কৃত্রিম গণ্ডিরেখা-দ্বারা আমরা সমস্ত পৃথিবীকে চিহ্নিত করিয়া রাখিয়াছি। এমন-কি, যে-সকল মহাপুরুষ সমস্ত পৃথিবীর সামগ্রী, তাঁহাদিগকেও এইরূপ কোনো-না-কোনো একটা নিষিদ্ধ গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ করিয়া পর করিয়া রাখিয়াছি। তাঁহাদের ঘরে অন্ন গ্রহণ করিব না বলিয়া স্থির করিয়া বসিয়া আছি। সমস্ত জগতকে অন্ন বিতরণের ভার দিয়া বিধাতা যাঁহাদিগকে

পাঠাইয়াছেন আমরা স্পর্ধার সঙ্গে তাঁহাদিগকেও জাতে ঠেলিয়াছি।

মহাত্মা যিশুর প্রতি আমরা অনেক দিন এইরূপ একটা বিদ্বেষভাব পোষণ করিয়াছি। আমরা তাঁহাকে হৃদয়ে গ্রহণ করিতে অনিচ্ছুক।

কিন্তু এজন্য একলা আমাদিগকেই দায়ী করা চলে না। আমাদের খৃষ্টের পরিচয় প্রধানত সাধারণ খৃষ্টান মিশনারিদের নিকট হইতে। খৃষ্টকে তাঁহারা খৃষ্টানি-দ্বারা আচ্ছন্ন করিয়া আমাদের কাছে ধরিয়াছেন। এ পর্যন্ত বিশেষভাবে তাঁহাদের ধর্মমতের দ্বারা আমাদের-ধর্মসংস্কারকে তাঁহারা পরাভূত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। সুতরাং আত্মরক্ষার চেষ্টায় আমরা লড়াই করিবার জন্যই প্রস্তুত হইয়া থাকি।

লড়াইয়ের অবস্থায় মানুষ বিচার করে না। সেই মত্ততার উত্তেজনায় আমরা খৃষ্টানকে আঘাত করিতে গিয়া খৃষ্টকেও আঘাত করিয়াছি। কিন্তু যাঁহারা জগতের মহাপুরুষ, শত্রু কল্পনা করিয়া তাঁহাদিগকে আঘাত করা আত্মঘাতেরই নামান্তর। বস্তুত শত্রুর প্রতি রাগ করিয়া আমাদেরই দেশের উচ্চ আদর্শকে খর্ব করিয়াছি—আপনাকে ক্ষুদ্র করিয়া দিয়াছি।

সকলেই জানেন ইংরাজি শিক্ষার প্রথমাবস্থায় আমাদের সমাজে একটা সংকটের দিন উপস্থিত হইয়াছিল। তখন সমস্ত সমাজ টলমল, শিক্ষিতের মন আন্দোলিত। ভারতবর্ষে পূজার্চনা সমস্তই বয়ঃপ্রাপ্ত শিশুর খেলামাত্র—এ দেশে ধর্মের কোনো উচ্চ আদর্শ, ঈশ্বরের কোনো সত্য উপলব্ধি কোনো কালে ছিল না—এই বিশ্বাসে তখন আমরা নিজেদের সম্বন্ধে লজ্জা অনুভব করিতে আরম্ভ করিয়াছিলাম। এইরূপে হিন্দু সমাজের কূল যখন ভাঙিতেছিল, শিক্ষিতদের মন যখন ভিতরে ভিতরে বিদীর্ণ হইয়া দেশের দিক হইতে ধসিয়া পড়িতেছিল, স্বদেশের প্রতি অন্তরের অশ্রদ্ধা যখন বাহিরের আক্রমণের সম্মুখে আমাদিগকে দুর্বল করিয়া তুলিতেছিল, সেই সময়ে খৃষ্টান মিশনরি আমাদের সমাজে যে বিভীষিকা আনয়ন করিয়াছিল তাহার প্রভাব এখনও আমাদের হৃদয় হইতে সম্পূর্ণ দূর হয় নাই।

কিন্তু সেই সংকট আজ আমাদের কাটিয়া গিয়াছে। সেই ঘোরতর দুর্যোগের সময় রামমোহন রায় বাহিরের আবর্জনা ভেদ করিয়া আমাদের দেশের নিত্য সম্পদ সংশয়াকুল স্বদেশবাসীর নিকট উদ্ঘাটিত করিয়া দিলেন। এখন ধর্মসাধনায় আমাদের ভিক্ষাবৃত্তির দিন ঘুচিয়াছে। এখন হিন্দুধর্ম কেবলমাত্র কতকগুলি অদ্ভুত কাহিনী এবং বাহ্য-আচার-রূপে আমাদের নিকট প্রকাশমান নহে। এখন আমরা নির্ভয়ে সকল ধর্মের মহাপুরুষদের মহাবাণী-সকল গ্রহণ করিয়া আমাদের পৈতৃক ঐশ্বর্যকে বৈচিত্র্যদান করিতে পারি।

কিন্তু দুর্গতির দিনে মানুষ যখন দুর্বল থাকে তখন সে এক দিকের আতিশয্য হইতে রক্ষা পাইলে আর-এক দিকের আতিশয্যে গিয়া উত্তীর্ণ হয়। বিকারের জ্বরে মানুষের দেহের তাপ যখন উপরে চড়ে তখনও ভয় লাগাইয়া দেয় আবার যখন নিচে নামিতে থাকে তখনও সে ভয়ানক। আমাদের দেশের বর্তমান বিপদ আমাদের পূর্বতন বিপদের উল্টাদিকে উন্মত্ত হইয়া ছুটিতেছে।

আমাদের দেশের মহত্ত্বের মূর্তিটি প্রকাশ করিয়া দিলেও তাহা গ্রহণ করিবার বাধা আমাদের শক্তির জীর্ণতা। আমাদের অধিকার পাকা হইল না, কিন্তু আমাদের অহংকার বাড়িল। পূর্বে একদিন ছিল যখন আমরা কেবল সংস্কারবশত আমাদের সমাজ ও ধর্মের সমস্ত বিকারগুলিকে পুঞ্জীভূত করিয়া তাহার মধ্যে আবদ্ধ হইয়া বসিয়াছিলাম। এখন অহংকারবশতই সমস্ত বিকৃতিকে জোর করিয়া স্বীকার করাকে আমরা বলিষ্ঠতার লক্ষণ বলিয়া মনে করি। ঘরে ঝাঁট দিব না, কোনো আবর্জনাকেই বাহিরে ফেলিব না, যেখানে যাহা-কিছু আছে সমস্তকেই গায়ে মাখিয়া লইব, ধুলামাটির সঙ্গে মণিমানিক্যকে' নির্বিচারে একত্রে রক্ষা করাকেই সমন্বয়নীতি বলিয়া গণ্য করিব—এই দশা আমাদের ঘটিয়াছে। ইহা বস্তুত তামসিকতা। নির্জীবতাই যেখানে যাহা-কিছু আছে সমস্তকেই সমান মূল্যে রক্ষা করে। তাহার কাছে ভালোও যেমন মন্দও তেমন, ভুলও যেমন সত্যও তেমনি।

জীবনের ধর্মই নির্বাচনের ধর্ম। তাহার কাছে নানা পদার্থের মূল্যের তারতম্য আছেই। সেই অনুসারে সে গ্রহণ করে, ত্যাগ করে। এবং যাহা তাহার পক্ষে যথার্থ শ্রেয় তাহাকেই সে গ্রহণ করে এবং বিপরীতকেই বর্জন করিয়া থাকে।

পশ্চিমের আঘাত খাইয়া আমাদের দেশে যে জাগরণ ঘটিয়াছে তাহা মুখ্যত জ্ঞানের দিকে। এই জাগরণের প্রথম অবস্থায় আমরা নিজের সম্বন্ধে বার বার ইহাই লক্ষ্য করিয়া আসিতেছিলাম যে, আমরা জ্ঞানে যাহা বুঝি ব্যবহারে তাহার উল্টা করি। ইহাতে ক্রমে যখন আত্মধিক্কারের সূত্রপাত হইল তখন নিজের বুদ্ধির সঙ্গে ব্যবহারের সামঞ্জস্য-সাধনের অতি সহজ উপায় বাহির করিবার চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইয়াছি। আমাদের যাহা-কিছু আছে সমস্তই ভালো, তাহার কিছুই বর্জনীয় নহে, ইহাই প্রমাণ করিতে বসিয়াছি।

এক দিকে আমরা জাগিয়াছি। সত্য আমাদের দ্বারে আঘাত করিতেছেন তাহা আমরা জানিতে পারিয়াছি। কিন্তু দ্বার খুলিয়া দিতেছি না—সাড়া দিতেছি, কিন্তু পাদ্য-অর্ঘ্য আনিয়া দিতেছি না। ইহাতে আমাদের অপরাধ প্রতিদিন কেবল বাড়িয়া চলিতেছে। কিন্তু সেই অপরাধকে ঔদ্ধত্যের সহিত অস্বীকার করিবার যে অপরাধ সে অপরাধ সে আরও গুরুতর। লোকভয়ে এবং অভ্যাসের আলস্যে সত্যকে আমরা যদি দ্বারের কাছে দাঁড় করাইয়া লজ্জিত হইয়া বসিয়া থাকিতাম তাহা হইলেও তেমন ক্ষতি হইত না, কিন্তু 'তুমি সত্য নও—যাহা অসত্য তাহাই সত্য' ইহাই প্রাণপণ শক্তিতে প্রমাণ করিবার জন্য যুক্তির কুহক বিস্তার করার মতো এত বড়ো অপরাধ আর কিছুই হইতে পারে না। আমরা ঘরের পুরাতন জঞ্জালকে বাঁচাইতে গিয়া সত্যকে বিনাশ করিতে কুণ্ঠিত হইতেছি না।

এই চেষ্টার মধ্যে যে দুর্বলতা প্রকাশ পায় তাহা মূলত চরিত্রের দুর্বলতা। চরিত্র অসাড় হইয়া আছে বলিয়াই আমরা কাজের দিকটাতে আপনাকে ও সকলকে ফাঁকি দিতে উদ্যত। যে-সকল আচার বিচার বিশ্বাস পূজাপদ্ধতি আমাদের দেশের শতসহস্র নরনারীকে জড়তা মূঢ়তা ও নানা দুঃখে অভিভূত করিয়া ফেলিতেছে, যাহা আমাদিগকে কেবলই ছোটো করিতেছে, ব্যর্থ করিতেছে, বিচ্ছিন্ন করিতেছে, জগতে আমাদিগকে সকলের কাছে অপমানিত ও সকল আক্রমণে পরাভূত করিতেছে, কোনোমতেই আমরা সাহস করিয়া

স্পষ্ট করিয়া তাহাদের অকল্যাণরূপ দেখিতে এবং ঘোষণা করিতে চাহি না—নিজের বুদ্ধির চোখে সূক্ষ্ম ব্যাখ্যার ধুলা ছড়াইয়া নিশ্চেষ্টতার পথে স্পর্ধা করিয়া পদচারণ করিতে চাই। ধর্মবুদ্ধি চরিত্রবল যখন জাগিয়া উঠে তখন সে এই-সকল বিড়ম্বনা-সৃষ্টিকে প্রবল পৌরুষের সহিত অবজ্ঞা করে। মানুষের যে-সকল দুঃখ দুর্গতি সম্মুখে স্পষ্ট বিদ্যমান তাহাকে সে হৃদয়হীন ভাবুকতার সূক্ষ্ম কারুকার্যে মনোরম করিয়া তোলার অধ্যবসায়কে কিছুতেই আর সহ্য করিতে পারে না।

ইহা হইতেই আমাদের প্রয়োজন বুঝা যাইবে। জ্ঞানবৃদ্ধির দ্বারা আমাদের সম্পূর্ণ বলবৃদ্ধি হইতেছে না। আমাদের মনুষ্যত্বকে সমগ্রভাবে উদ্‌বোধিত করিয়া তোলার অভাবে আমরা নির্ভীক পৌরুষের সহিত পূর্ণশক্তিতে জীবনকে মঙ্গলের সরল পথে প্রবাহিত করিতে পারিতেছি না।

এই দুর্গতির দিনে সেই মহাপুরুষেরাই আমাদের সহায় যাঁহারা কোনো কারণেই কোনো প্রলোভনেই আপনাকে এবং অন্যকে বঞ্চনা করিতে চান নাই, যাঁহারা প্রবল বলে মিথ্যাকে অস্বীকার করিয়াছেন এবং সমস্ত পৃথিবীর লোকের নিকট অপমানিত হইয়াও সত্যকে যাঁহারা নিজের জীবন দিয়া সপ্রমাণ করিয়াছেন। তাঁহাদের চরিত চিন্তা করিয়া সমস্ত কৃত্রিমতা কুটিলতক ও প্রাণহীন বাহ্য-আচারের জটিল বেষ্টন হইতে চিত্ত মুক্তিলাভ করিয়া রক্ষা পায়।

যিশুর চরিত আলোচনা করিলে দেখিতে পাইব যাঁহারা মহাত্মা তাঁহারা সত্যকে অত্যন্ত সরল করিয়া সমস্ত জীবনের সামগ্রী করিয়া দেখেন—তাঁহারা কোনো নূতন পন্থা, কোনো বাহ্য প্রণালী, কোনো অদ্ভুত মত প্রচার করেন না। তাঁহারা অত্যন্ত সহজ কথা বলিবার জন্য আসেন—তাঁহারা পিতাকে পিতাবলিতে ও ভাইকে ভাই ডাকিতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহারা এই অত্যন্ত সরল বাক্যটি অত্যান্ত জোরের সঙ্গে বলিয়া যান যে, যাহা অন্তরের সামগ্রী তাহাকে বাহিরের আয়োজন পুঞ্জীকৃত করিবার চেষ্টা করা বিড়ম্বনা মাত্র। তাঁহারা মনকে জাগাইতে বলেন, তাঁহারা দৃষ্টিকে সরল করিয়া সম্মুখে লক্ষ্য করিতে বলেন, অন্ধ অভ্যাসকে তাঁহারা সত্যের সিংহাসন হইতে অপসারিত করিতে আদেশ করেন। তাঁহারা কোনো অপরূপ সামগ্রী সংগ্রহ করিয়া আনেন না, কেবল তাঁহাদের দীপ্ত নেত্রের দৃষ্টিপাতে আমাদের জীবনের মধ্যে তাঁহারা সেই চিরকালের আলোক নিক্ষেপ করেন যাহার আঘাতে আমাদের দুর্বল জড়তার সমস্ত ব্যর্থ জাল-বুনানির মধ্য হইতে আমরা লজ্জিত হইয়া জাগিয়া উঠি।

জাগিয়া উঠিয়া আমরা কী দেখি? আমরা মানুষকে দেখিতে পাই। আমরা নিজের সত্যমূর্তি সম্মুখে দেখি। মানুষ যে কত বড়ো সে কথা আমরা প্রতিদিন ভুলিয়া থাকি; স্বরচিত ও সমাজরচিত শত শত বাধা আমাদিগকে চারি দিক হইতে ছোটো করিয়া রাখিয়াছে, আমরা আমাদের সমস্তটা দেখিতে পাই না। যাঁহারা আপনার দেবতাকে ক্ষুদ্র করেন নাই, পূজাকে কৃত্রিম করেন নাই, লোকাচারের দাসত্বচিহ্ন ধুলায় ফেলিয়া দিয়া যাঁহারা আপনাকে অমৃতের পুত্র বলিয়া সগৌরবে ঘোষণা করিয়াছেন, তাঁহারা মানুষের কাছে মানুষকে বড়ো করিয়া দিয়াছেন। ইহাকেই বলে মুক্তি দেওয়া। মুক্তি স্বর্গ নহে, সুখ নহে। মুক্তি অধিকারবিস্তার, মুক্তি ভূমাকে উপলব্ধি।

সেই মুক্তির আহবান বহন করিয়া নিত্যকালের রাজপথে ঐ দেখো কে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। তাঁহাকে অনাদর করিয়ো না, আঘাত করিয়ো না, 'তুমি আমাদের কেহ নও' বলিয়া আপনাকে হীন করিয়ো না। 'তুমি আমাদের জাতির নও' বলিয়া আপনার জাতিকে লজ্জা দিয়ো না। সমস্ত জড়সংস্কারজাল ছিন্ন করিয়া বাহির হইয়া আইস, ভক্তিনম্র চিত্তে প্রণাম করো, বলো—'তুমি আমাদের অত্যন্ত আপন, কারণ, তোমার মধ্যে আমরা আপনাকে সত্যভাবে লাভ করিতেছি।'

যে সময়ে কোনো দেশে কোনো মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করেন সে সময়কে আমরা তাঁহার আর্বিভাবের অনুকূল সময় বলিয়া গণ্য করি। এ কথা এক দিক হইতে সত্য হইলেও, এ সম্বন্ধে আমাদের ভুল বুঝিবার সম্ভাবনা আছে। সাধারণত যে লক্ষণগুলিকে আমরা অনুকূল বলিয়া মনে করি তাহার বিপরীতকেই প্রতিকূল বলিয়া গণ্য করা চলে না। অভাব অত্যন্ত কঠোর হইলে মানুষের লাভের চেষ্টা অত্যন্ত জাগ্রত হয়। অতএব একান্ত অভাবকেই লাভসম্ভাবনার প্রতিকূল বলা যাইতে পারে না। বাতাস যখন অত্যন্ত স্থির হয় তখনই ঝড়কে আমরা আসন্ন বলিয়া থাকি, বস্তুত মানুষের ইতিহাসে আমরা বরাবর দেখিয়া আসিতেছি—প্রতিকূলতা যেমন আনুকূল্য করে এমন আর কিছুতেই নহে। যিশুর জন্মগ্রহণ কালের প্রতি লক্ষ করিলেও আমরা এই সত্যটির প্রমাণ পাইব।

মানুষের প্রতাপ ও ঐশ্বর্য যখন চোখে দেখিতে পাই তখন আমাদের মনের উপর তাহার প্রভাব যে কিরূপ প্রবল হইয়া উঠে তাহা বর্তমান যুগে আমরা স্পষ্টই দেখিতে পাইতেছি। সে আপনার চেয়ে বড়ো যেন আর কাহাকেও স্বীকার করিতে চায় না। মানুষ এই ঐশ্বর্যের প্রলোভনে আকৃষ্ট হইয়া কেহ ব্য ভিক্ষাবৃত্তি, কেহ বা দাস্যবৃত্তি, কেহ বা দস্যুবৃত্তি অবলম্বন করিয়া সমস্ত জীবন কাটাইয়া দেয়—এক মুহূর্ত অবকাশ পায় না।

যিশু যখন জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন তখন রোম-সাম্রাজ্যের অভ্রভেদী হইয়া উঠিয়াছিল। যে দিকে চোখ মেলিত এই সাম্রাজ্যেরই গৌরবচূড়া সকল দিক হইতেই চোখে পড়িতে থাকিত; ইহারই আয়োজন উপকরণ সকলের চিত্তকে অভিভূত করিয়া দিতেছিল। রোমের বিদ্যাবুদ্ধি বাহুবল ও রাষ্ট্রীয় শক্তির মহাজালে যখন বিপুল সাম্রাজ্য চারি দিকে আবদ্ধ, সেই সময়ে সাম্রাজ্যের এক প্রান্তে দরিদ্র ইহুদি মাতার গর্ভে এই যিশু জন্মগ্রহণ করিলেন।

তখন রোম-সাম্রাজ্যে ঐশ্বর্যের যেমন প্রবল মূর্তি, ইহুদি-সমাজে লোকাচার ও শাস্ত্রশাসনেরও সেইরূপ প্রবল প্রভাব।

ইহুদিদের ধর্ম স্বজাতির মধ্যে গণ্ডিবদ্ধ। তাহাদের ঈশ্বর জিহোভা বিশেষভাবে তাহাদিগকে বরণ করিয়া লইয়াছেন এইরূপ তাহাদের বিশ্বাস। তাঁহার নিকট তাহারা কতকগুলি সত্যে বদ্ধ, এই সত্যগুলি বিধিরূপে তাহাদের সংহিতায় লিখিত। এই বিধি পালন করাই ঈশ্বরের আদেশ-পালন।

বিধির অচল গণ্ডির মধ্যে নিয়ত বাস করিতে গেলে মানুষের ধর্মবুদ্ধি কঠিন ও সংকীর্ণ না হইয়া থাকিতে পারে না। কিন্তু ইহুদিদের সনাতন-আচার-নিষ্পেষিত চিত্তে

নূতন প্রাণ সঞ্চার করিবার উপায় ঘটিয়াছিল। মাঝে মাঝে তাহাদের পাথরের প্রাচীর ভেদ করিয়া তাহাদের মধ্যে এক-একজন ঋষি আসিয়া দেখা দিতেন। ধর্মের প্রত্যক্ষ উপলব্ধি বহন করিয়াই তাঁহাদের অভ্যুদয়। তাঁহারা স্মৃতিশাস্ত্রের মৃতপত্রমর্মরকে আচ্ছন্ন করিয়া দিয়া অমৃতবাণী প্রচার করিতেন। এই ইসায়া জেরেমায়া প্রভৃতি ইহুদি ঋষিগণ পরমদুর্গতির দিনে আলোক জ্বালাইয়াছেন, তাঁহাদের তীব্র জ্বালাময় বাক্যের বজ্রবর্ষণে স্বজাতির বদ্ধ জীবনের বহুদিনসঞ্চিত কলুষরাশি দগ্ধ করিয়াছেন।

শাস্ত্র ও আচারধর্মের দ্বারাই ইহুদিদের সমস্ত জীবন নিয়মিত। যদিচ তাহারা সাহসিক যোদ্ধা ছিল, তবু রাস্ট্ররক্ষা-ব্যাপারে তাহাদের পটুত্ব প্রকাশ পায় নাই। এই জন্য রাষ্ট্র সম্বন্ধে বিদেশী প্রতিবেশীদের হাতে তাহারা দুর্গতিলাভ করিয়াছিল।

যিশুর জন্মের কিছুকাল পূর্ব হইতে ইহুদিদের সমাজে ঋষি-অভ্যুদয় বন্ধ ছিল। কালের গতি প্রতিহত করিয়া, প্রাণের প্রবাহ অবরুদ্ধ করিয়া, পুরাতনকে চিরস্থায়ী করিবার চেষ্টায় তখন সকলে নিযুক্ত ছিল। বাহিরকে একেবারে বাহিরে ঠেকাইয়া, সমস্ত দ্বার জানালা বন্ধ করিয়া, দেয়াল গাঁথিয়া তুলিবার দলই তখন প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। নবসংকলিত তাল্‌মদ্‌ শাস্ত্রে বাহ্য আচারবন্ধনের আয়োজন পাকা হইল, এবং ধর্মপালনের মূলে যে-একটি মুক্ত বুদ্ধি ও স্বাধীনতা-তত্ত্ব আছে তাহাকে স্থান দেওয়া হইল না।

জড়ত্বের চাপ যতই কঠোর হউক মনুষ্যত্বের বীজ একেবারে মরিতে চায় না। অন্তরাত্মা যখন পীড়িত হইয়া উঠে, বাহিরে যখন সে কোনো আশার মূর্তি দেখিতে পায় না, তখন তাহার অন্তর হইতেই আশ্বাসের বাণী উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে—সেই বাণীকে সে হয়তো সম্পূর্ণ বোঝে না, অথচ তাহাকে প্রচার করিতে থাকে। এই সময়টীতে ইহুদিরা আপনা-আপনি বলাবলি করিতেছিল মর্ত্যে পুনরায় স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠার কাল আসিতেছে। তাহারা মনে করিতেছিল তাহাদেরই দেবতা তাহাদের জাতিকেই এই স্বর্গরাজ্যের অধিকার দান করিবেন—ঈশ্বরের বরপুত্র ইহুদি জাতির-সত্যযুগ পুনরায় আসন্ন হইয়াছে।

এই আসন্ন শুভ মুহূর্তের জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে এই ভাবটিও জাতির মধ্যে কাজ করিতেছিল। এই জন্য মরুস্থলীতে বসিয়া অভিষেকদাতা যোহন্‌ যখন ইহুদিদিগকে অনুতাপের দ্বারা পাপের প্রায়শ্চিত্ত ও জর্ডনের তীর্থজলে দীক্ষা গ্রহণ করিবার জন্য আহবান করিলেন তখন দলে দলে পুণ্যকামিগণ তাঁহার নিকট আসিয়া সমবেত হইতে লাগিল। ইহুদিরা ঈশ্বরকে প্রসন্ন করিয়া পৃথিবীতে আপনাদের অপমান ঘুচাইতে চাহিল, ধরাতলের রাজত্বে এবং সকলের শ্রেষ্ঠস্থান অধিকার করিবার আশ্বাসে তাহারা উৎসাহিত হইয়া উঠিল।

এমন সময়ে যিশুও মর্ত্যলোকে ঈশ্বরের রাজ্যকে আসন্ন বলিয়া ঘোষণা করিলেন। কিন্তু ঈশ্বরের রাজ্য যিনি স্থাপন করিতে আসিবেন তিনি কে? তিনি তো রাজা, তাঁহাকে তো রাজপদ গ্রহণ করিতে হইবে। রাজপ্রভাব না থাকিলে সর্বত্র ধর্মবিধি প্রবর্তন করিবে কী করিয়া? একবার কি মরুস্থলীতে মানবের মঙ্গল ধ্যান করিবার সময় যিশুর মনে এই দ্বিধা উপস্থিত হয় নাই? ক্ষণকালের জন্য কি তাঁহার মনে হয় নাই রাজপীঠের উপরে

ধর্মসিংহাসন প্রতিষ্ঠা করিলে তবেই তাঁহার ক্ষমতা অপ্রতিহত হইতে পারে? কথিত আছে, শয়তান তাঁহার সম্মুখে রাজ্যের প্রলোভন বিস্তার করিয়া তাঁহাকে মুগ্ধ করিতে উদ্যত হইয়াছিল। সেই প্রলোভনকে নিরস্ত করিয়া তিনি জয়ী হইয়াছিলেন। এই প্রলোভনের কাহিনীকে কাল্পনিক বলিয়া উড়াইয়া দিবার হেতু নাই। রোমের জয়পতাকা তখন রাজগৌরবে আকাশে আন্দোলিত হইতেছিল এবং সমস্ত ইহুদি জাতি রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার সুখস্বপ্নে নিবিষ্ট হইয়াছিল। এমন অবস্থায় সমস্ত জনসাধারণের সেই অন্তরের আন্দোলন যে তাঁহারও ধ্যানকে গভীরভাবে আঘাত করিতে থাকিবে ইহাতে আশ্চর্যের কথা কিছুই নাই।

কিন্তু আশ্চর্যের কথা এই যে, এই সর্বব্যাপী মায়াজালকে ছেদন করিয়া তিনি ঈশ্বরের সত্যরাজ্যকে সুস্পষ্ট প্রত্যক্ষ করিলেন। ধনমানের মধ্যে তাহাকে দেখিলেন না, মহাসাম্রাজ্যের দৃপ্ত প্রতাপের মধ্যে তাহাকে দেখিলেন না; বাহ্য উপকরণহীন দারিদ্রের মধ্যে তাহাকে দেখিলেন এবং সমস্ত বিষয়ী লোকের সম্মুখে একটা অদ্ভূত কথা অসংকোচে প্রচার করিলেন যে, যে নম্র পৃথিবীর অধিকার তাহারই। তিনি চরিত্রের দিক দিয়া এই যেমন একটা কথা বলিলেন, উপনিষদের ঋষিরা মানুষের মনের দিক দিয়া এই প্রকারই অদ্ভূত একটা কথা বলিয়াছেন: যাহারা ধীর তাহারাই সকলের মধ্যে প্রবেশের অধিকার লাভ করে। ধীরা: সর্বসেবাবিশন্তি।

যাহা অত্যন্ত প্রত্যক্ষ এবং যাহা সর্বজনের চিত্তকে অভিভূত করিয়া বর্তমান, তাহাকে সম্পূর্ণ ভেদ করিয়া, সাধারণ মানবের সংস্কারকে অতিক্রম করিয়া, ঈশ্বরের রাজ্যকে এমন একটি সত্যের মধ্যে তিনি দেখিলেন যেখানে সে আপনার আন্তরিক শক্তিতে আপনি প্রতিষ্ঠিত—বাহিরের কোনো উপাদানের উপর তাহার আশ্রয় নহে। সেখানে অপমানিতেরও সম্মান কেহ কাড়িতে পারে না, দরিদ্রেরও সম্পদ কেহ নষ্ট করিতে পারে না। সেখানে যে নত সেই উন্নত হয়, যে পশ্চাদ্‌বর্তী সেই অগ্রগণ্য হইয়া উঠে। একথা তিনি কেবল কথায় রাখিয়া যান নাই। যে দোর্দণ্ডপ্রতাপ সম্রাটের রাজদণ্ড অনায়াসে তাঁহার প্রাণবিনাশ করিয়াছে তাহার নামে ইতিহাসের পাতার এক প্রান্তে লেখা আছে মাত্র। আর যিনি সামান্য চোরের সংগে একত্রে ক্রুশে বিদ্ধ হইয়া প্রাণত্যাগ করিলেন, মৃত্যুকালে সামান্য কয়েকজন ভীত অখ্যাত শিষ্য যাঁহার অনুবর্তী, অন্যায় বিচারের বিরুদ্ধে দাঁড়াইবার সাধ্যমাত্র যাঁহার ছিল না, তিনি আজ মৃত্যুহীন গৌরবে সমস্ত পৃথিবীর হৃদয়ের মধ্যে বিরাজ করিতেছেন এবং আজও বলিতেছেন, 'যাহারা দীন তাহারা ধন্য; কারণ, স্বর্গরাজ্য তাহাদের। যাহারা নম্র তাহারা ধন্য; কারণ, পৃথিবীর অধিকার তাহারাই লাভ করিবে'।

এইরূপে স্বর্গরাজ্যকে যিশু মানুষের অন্তরের মধ্যে নির্দেশ করিয়া মানুষকেই বড়ো করিয়া দেখাইয়াছেন। তাহাকে বাহিরের উপকরণের মধ্যে স্থাপিত করিয়া দেখাইলে মানুষের বিশুদ্ধ গৌরব খর্ব হইত। তিনি আপনাকে বলিয়াছেন মানুষের পুত্র। মানবসন্তান যে কে তাহাই তিনি প্রকাশ করিতে আসিয়াছেন।

তাই তিনি দেখাইয়াছেন, মানুষের মনুষ্যত্ব সাম্রাজ্যের ঐশ্বর্যেও নহে, আচারের অনুষ্ঠানেও নহে; কিন্তু মানুষের মধ্যে ঈশ্বরের প্রকাশ আছে এই সত্যেই সে সত্য। মানবসমাজে দাঁড়াইয়া ঈশ্বরকে তিনি পিতা বলিয়াছেন। পিতার সংগে পুত্রের যে সম্বন্ধ

তাহা আত্মীয়তার নিকটতম সম্বন্ধ—আত্মা বৈ জায়তে পুত্রঃ। তাহা আদেশপালনের ও অংগীকার-রক্ষার বাহ্য সম্পর্ক নহে। ঈশ্বর পিতা এই চিরন্তন সম্বন্ধের দ্বারাই মানুষ মহীয়ান, আর কিছুর দ্বারা নহে। তাই শয়তান আসিয়া যখন তাঁহাকে বলিল 'তুমি রাজা' তিনি বলিলেন, 'না, আমি মানুষের পুত্র'। এই বলিয়া তিনি সমস্ত মানুষকে সম্মানিত করিয়াছেন।

তিনি এক জায়গায় ধনকে নিন্দা করিয়াছেন, বলিয়াছেন ধন মানুষের পরিত্রাণের পথে প্রধান বাধা। ইহা একটা নিরর্থক বৈরাগ্যের কথা নহে। ইহার ভিতরকার অর্থ এই যে, ধনী ধনকেই আপনার প্রধান অবলম্বন বলিয়া জানে—অভ্যাসের মোহবশত ধনের সংগে সে আপনার মনুষ্যত্বকে মিলাইয়া ফেলে। এমন অবস্থায় তাহার প্রকৃত আত্মশক্তি আবৃত হইয়া যায়। যে আত্মশক্তিকে বাধামুক্ত করিয়া দেখে সে ঈশ্বরের শক্তিকেই দেখিতে পায় এবং সেই দেখার মধ্যেই তাহার যথার্থ পরিত্রাণের আশা। মানুষ যখন যথার্থভাবে আপনাকে দেখে তখনই আপনার মধ্যে ঈশ্বরকে দেখে; আর আপনাকে দেখিতে গিয়া যখন সে কেবল ধনকে দেখে, মানকে দেখে, তখনই আপনাকে অবমানিত করে এবং সমস্ত জীবনযাত্রার দ্বারা ঈশ্বরকে অস্বীকার করিতে থাকে।

মানুষকে এই মানবপুত্র বড়ো দেখিয়াছেন বলিয়াই মানুষকে যন্ত্ররূপে দেখিতে চান নাই। বাহ্যধনে যেমন মানুষকে বড়ো করে না তেমনি বাহ্য আকারে মানুষকে পবিত্র করে না। বাহিরের স্পর্শ বাহিরের খাদ্য মানুষকে দূষিত করিতে পারে না; কারণ, মানুষের মনুষ্যত্ব যেখানে, সেখানে তাহার প্রবেশ নাই। যাহারা বলে বাহিরের সংস্রবে মানুষ পতিত হয় তাহারা মানুষকে ছোটো করিয়া দেয়। এইরূপে মানুষ যখন ছোটো হইয়া যায় তখন তাহার সংকল্প, তাহার ক্রিয়াকর্ম, সমস্তই ক্ষুদ্র হইয়া আসে; তাহার শক্তি হ্রাস হয় এবং সে কেবলই ব্যর্থতার মধ্যে ঘুরিয়া মরে। এই জন্যই মানবপুত্র আচার ও শাস্ত্রকে মানুষের চেয়ে বড়ো হইতে দেন নাই এবং বলিয়াছেন, বলি-নৈবেদ্যের দ্বারা ঈশ্বরের পূজা নহে, অন্তরের ভক্তির দ্বারাই তাঁহার ভজনা। এই বলিয়াই তিনি অস্পৃশ্যকে স্পর্শ করিলেন, অনাচারীর সহিত একত্রে আহার করিলেন, এবং পাপীকে পরিত্যাগ না করিয়া তাহাকে পরিত্রাণের পথে আহ্বান করিলেন।

শুধু তাই নয়, সমস্ত মানুষের মধ্যে তিনি আপনাকে এবং সেই যোগে ভগবানকে উপলব্ধি করিলেন। তিনি শিষ্যদিগকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, 'দরিদ্রকে যে খাওয়ায় সে আমাকে খাওয়ায়, বস্ত্রহীনকে যে বস্ত্র দেয় সে আমাকেই বসন পরায়।' ভক্তিবৃত্তিকে বাহ্য অনুষ্ঠানের দ্বারা সংকীর্ণরূপে চরিতার্থ করিবার উপদেশ ও দৃষ্টান্ত তিনি দেখান নাই। ঈশ্বরের ভজনা ভক্তিরস-সম্ভোগ করার উপায়মাত্র নহে। তাঁহাকে ফুল দিয়া, নৈবেদ্য দিয়া, বস্ত্র দিয়া, স্বর্ণ দিয়া, ফাঁকি দিলে যথার্থ আপনাকেই ফাঁকি দেওয়া হয়; ভক্তি লইয়া খেলা করা হয় মাত্র এবং এইরূপে খেলায় যতই সুখ হউক তাহা মনুষ্যত্বের অবমাননা। যিশুর উপদেশ যাঁহারা সত্যভাবে গ্রহণ করিয়াছেন তাঁহারা কেবল মাত্র পূজার্চনা-দ্বারা দিনরাত কাটাইয়া দিতে পারেন না; মানুষের সেবা তাঁহাদের পূজা, অতি কঠিন তাঁহাদের ব্রত। তাঁহারা আরামের শয্যা ত্যাগ করিয়া, প্রাণের মমতা বিসর্জন দিয়া, দূর দেশ-দেশান্তরে নরখাদকদের মধ্যে, কুষ্ঠরোগীদের মধ্যে, জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন—কেননা, যাঁহার নিকট হইতে তাহার দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছেন তিনি মানবপুত্র, তাঁহার আবির্ভাবে

মানবের প্রতি ঈশ্বরের দয়া সুস্পষ্ট প্রকাশমান হইয়াছে। কারণ, এই মহাপুরুষ সর্বপ্রকারে মানবের মাহাত্ম্য যেমন করিয়া প্রচার করিয়াছেন এমন আর কে করিয়াছেন?

তাঁহাকে তাঁহার শিষ্যেরা দুঃখের মানুষ বলেন। দুঃখ-স্বীকারকে তিনি মহৎ করিয়া দেখাইয়াছেন। ইহাতেও তিনি মানুষকে বড়ো করিয়াছেন। দুঃখের উপরেও মানুষ যখন আপনাকে প্রকাশ করে তখনই মানুষ আপনার সেই বিশুদ্ধ মনুষ্যত্বকে প্রচার করে যাহা আগুনে পোড়ে না যাহা অস্ত্রাঘাতে ছিন্ন হয় না।

সমস্ত মানুষের প্রতি প্রেমের দ্বারা যিনি ঈশ্বরের প্রেম প্রচার করিয়াছেন, সমস্ত মানুষের দুঃখভার স্বেচ্ছাপূর্বক গ্রহণ করিবার উপদেশ তাঁহার জীবন হইতে আপনিই নিঃশ্বসিত হইয়া উঠিবে ইহাতে আর আশ্চর্য কী আছে। কারণ, স্বেচ্ছায় দুঃখবহন করিতে অগ্রসর হওয়াই প্রেমের ধর্ম। দুর্বলের নির্জীব প্রেমই ঘরের কোণে ভাবাবেশের অশ্রুজলপাতে আপনাকে আপনি আর্দ্র করিতে থাকে। যে প্রেমের মধ্যে যথার্থ জীবন আছে সে আত্মত্যাগের দ্বারা, দুঃখস্বীকারের দ্বারা গৌরব লাভ করে। সে গৌরব অহংকারের গৌরব নহে; কারণ, অহংকারের মদিরায় নিজেকে মত্ত করা প্রেমের পক্ষে অনাবশ্যক—তাহার নিজের মধ্যে স্বত-উৎসারিত অমৃতের উৎস আছে।

মানুষের মধ্যে ভগবানের প্রকাশ—যিশুর এই বাণী কেবলমাত্র তত্ত্বকথারূপে কোনো-একটি শাস্ত্রের শ্লোকের মধ্যে বন্দী হইয়া বাস করিতেছে না। তাঁহার জীবনের মধ্যে তাহা একান্ত সত্য হইয়া দেখা দিয়াছিল বলিয়াই আজ পর্যন্ত তাহা সজীব বনস্পতির মতো নব নব শাখা প্রশাখা বিস্তার করিতেছে। মানবচিত্তের শত সহস্র সংস্কারের বাধা প্রতিদিনই সে ক্ষয় করিবার কাজে নিযুক্ত আছে। ক্ষমতার মদে মাতাল প্রতিদিন তাহাকে অপমান করিতেছে, জ্ঞানের গর্বে উদ্ধত প্রতিদিন তাহাকে উপহাস করিতেছে, কঠোর বিষয়ী তাহাকে কাপুরুষের ভাবুকতা বলিয়া উড়াইয়া দিতেছে—তবু সে নম্র হইয়া নীরবে মানুষের গভীরতম চিত্তে ব্যাপ্ত হইতেছে, দুঃখকেই আপনার সহায় এবং সেবাকে আপনার সঙ্গিনী করিয়া লইয়াছে—যে পর তাহাকে আপন করিতেছে, যে পতিত তাহাকে তুলিয়া লইতেছে, যাহার কাছ হইতে কিছুই পাইবার নাই তাহার কাছে আপনাকে নিঃশেষে উৎসর্গ করিয়া দিতেছে। এমনি করিয়া মানবপুত্র পৃথিবীকে, সকল মানুষকেই বড়ো করিয়া তুলিয়াছেন—তাহাদের অনাদর দূর করিয়াছেন, তাহাদের অধিকার প্রশস্ত করিয়াছেন, তাহারা যে তাহাদের পিতার ঘরে বাস করিতেছে এই সংবাদের দ্বারা অপমানের সংকোচ মানবসমাজ হইতে অপসারিত করিয়াছেন—ইহাকেই বলে মুক্তিদান করা।

খৃষ্ট, র/১১/৫০৩-৫১০

টীকা:

যিশু, যিশুখৃষ্ট (Jesus Christ)- খৃষ্টধর্মের প্রতিষ্ঠাতা। প্যালেস্টাইনের বেথেলহেমে দরিদ্র ইহুদী পরিবারে জন্ম। প্রেম নম্রতা ও অহিংসার বাণীর প্রচারক। পরে যিশুর প্রেমের বাণীকে অবলম্বন ক'রেই খৃষ্টধর্ম গ'ড়ে ওঠে। অভিনব এবং আপত্তিকর ধর্মমতের প্রচারের জন্য রোমান রাজশক্তির বিরাগভাজন হন। রাজদণ্ডে দণ্ডিত হয়ে ক্রুশবিদ্ধ অবস্থায় প্রাণত্যাগ করেন।

জন্ম ৮ থেকে ৪ খৃ: পূ: অব্দ, মৃত্যু ২৯ খৃষ্টাব্দ

তুলনীয় প্রসঙ্গ : খৃষ্টধর্ম (৯৮), খৃষ্টোৎসব (১১৮)

৭৬। বজ্রে তোমার বাজে

২১শে জ্যৈষ্ঠ ১৩১৭ (১৯১০)

বজ্রে তোমার বাজে বাঁশি, সে কি সহজ গান!
সেই সুরেতে জাগব আমি, দাও মোরে সেই কান।।
আমি ভুলব না আর সহজেতে, সেই প্রাণে মন উঠবে মেতে
মৃত্যু-মাঝে ঢাকা আছে যে অন্তহীন প্রাণ।।
সে ঝড় যেন সেই আনন্দে চিত্তবীণার তারে
সপ্তসিন্ধু দশদিগন্ত নাচাও যে ঝঙ্কারে।
আরাম হতে ছিন্ন করে সেই গভীরে লও গো মোরে
অশান্তির অন্তরে যেথায় শান্তি সুমহান।।

গীতবিতান, র/৪/৭৫

তুলনীয় প্রসঙ্গ : মনুষ্যত্ব (২২), দুঃখ (৩২), এই করেছো ভালো (৭৮)

৭৭। ধায় যেন মোর সকল

জ্যৈষ্ঠ ১৩১৭ (১৯১০)

ধায় যেন মোর সকল ভালোবাসা
প্রভু, তোমার পানে, তোমার পানে, তোমার পানে।
যায় যেন মোর সকল গভীর আশা
তোমার কানে, তোমার কানে, তোমার কানে।।
চিত্ত মম যখন যেথা থাকে সাড়া যেন দেয় সে তব ডাকে,
যত বাঁধন সব টুটে গো যেন
প্রভু, তোমার টানে, তোমার টানে, তোমার টানে।।
বাহিরের এই ভিক্ষা-ভরা থালি এবার যেন নিঃশেষে হয় খালি,
অন্তর মোর গোপনে যায় ভরে
প্রভু, তোমার দানে, তোমার দানে, তোমার দানে।
হে বন্ধু মোর, হে অন্তরতর, এ জীবনে যা-কিছু সুন্দর
সকলই আজ বেজে উঠুক সুরে
প্রভু, তোমার গানে, তোমার গানে, তোমার গানে।।

গীতবিতান, র/৪/৩৩

৭৮। এই করেছ ভালো

৪ঠা আষাঢ় ১৩১৭ (১৯১০)

এই করেছ ভালো, নিঠুর হে, নিঠুর হে, এই করেছ ভালো।
এমনি করে হৃদয়ে মোর তীব্র দহন জ্বালো।।
আমার এ ধূপ না পোড়ালে গন্ধ কিছুই নাহি ঢালে,
আমার এ দীপ না জ্বালালে দেয় না কিছুই আলো।।
যখন থাকে অচেতনে এ চিত্ত আমার
আঘাত সে যে পরশ তব, সেই তো পুরস্কার।
অন্ধকারে মোহে লাজে চোখে তোমার দেখি না যে,
বজ্রে তোলো আগুন করে আমার যত কালো।।

গীতবিতান, র/৪/৭৫

তুলনীয় প্রসঙ্গ : মনুষ্যত্ব (২২), দুঃখ (৩২), বজ্রে তোমার বাজে বাঁশি (৭৬)

৭৯। দেবতা জেনে দূরে রই

৫ই আষাঢ় ১৩১৭ (১৯১০)

দেবতা জেনে দূরে রই দাঁড়ায়ে,
আপন জেনে আদর করি নে।
পিতা বলে প্রণাম করি পায়ে,
বন্ধু বলে দু হাত ধরি নে।।
আপনি তুমি অতি সহজ প্রেমে
আমার হয়ে যেথায় এলে নেমে
সেথায় সুখে বুকের মধ্যে ধরে সঙ্গী বলে তোমায় বরি নে।।
ভাই তুমি যে ভাইয়ের মাঝে, প্রভু,
তাদের পানে তাকাই না যে তবু—
ভাইয়ের সাথে ভাগ করে মোর ধন তোমার মুঠো কেন ভরি নে।।
ছুটে এসে সবার সুখে দুখে
দাঁড়াই নে তো তোমারি সম্মুখে,
সঁপিয়ে প্রাণ ক্লান্তিবিহীন কাজে প্রাণসাগরে ঝাঁপিয়ে পড়ি নে।।

গীতবিতান, র/৪/৫৪

৮০। যেথায় থাকে সবার অধম

১৯শে আষাঢ় ১৩১৭ (১৯১০)

যেথায় থাকে সবার অধম দীনের হতে দীন
সেইখানে যে চরণ তোমার রাজে
সবার পিছে, সবার নিচে, সবহারাদের মাঝে।।
যখন তোমায় প্রণাম করি আমি প্রণাম আমার কোন্‌খানে যায় থামি।
তোমার চরণ যেথায় নামে অপমানের তলে
সেথায় আমার প্রণাম নামে না যে
সবার পিছে, সবার নিচে, সবহারাদের মাঝে।।
অহংকার তো পায় না নাগাল যেথায় তুমি ফের
রিক্তভূষণ দীন দরিদ্র সাজে
সবার পিছে, সবার নিচে, সবহারাদের মাঝে।
ধনে মানে যেথায় আছে ভরি সেথায় তোমার সংগ আশা করি,
সংগী হয়ে আছ যেথায় সংগীহীনের ঘরে
সেথায় আমার হৃদয় নামে না যে
সবার পিছে, সবার নিচে, সবহারাদের মাঝে।।

গীতবিতান, র/৪/১৫০

তুলনীয় প্রসংগঃ ভজন পূজন সাধন আরাধনা (৮২)

৮১। কাদম্বিনী দেবীকে লিখিত পত্র

৪ জুলাই ১৯১০ (১৩১৭, ২০শে আষাঢ়)

তুমি আমাকে যে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছ তার উত্তর দিতে আমি সংকোচ বোধ করচি।

একটি কথা তুমি নিশ্চয় জেনো ব্রাহ্ম পরিবারে যদিও আমার জন্ম তবু ঈশ্বর উপাসনা সম্বন্ধে আমার মন কোনো সংস্কারে আবদ্ধ হয় নি। তার একটা কারণ, অতি শিশুকালেই আমার মধ্যে কবি প্রকৃতি অত্যন্ত প্রবলভাবে জেগে উঠেছিল—আমি আমার কল্পনা নিয়েই সর্বদা ভোর হয়ে ছিলুম—ধর্ম প্রভৃতি সম্বন্ধে কে কি বলে বাল্যকালে তা আমার কানেও যায় নি।

তার পরে আমার বয়স যখন ১৩।১৪ তখন থেকে আমি অত্যন্ত আনন্দ ও আগ্রহের সংগে বৈষ্ণব পদাবলী পাঠ করেছি—তার ছন্দ রস ভাষা ভাব সমস্তই আমাকে মুগ্ধ করত। যদিও আমার বয়স অল্প ছিল তবু অস্ফুট রকমেও বৈষ্ণব ধর্মতত্ত্বের মধ্যে আমি প্রবেশ লাভ করেছিলুম।

এই বৈষ্ণবকাব্য এবং চৈতন্যমংগল প্রভৃতি কাব্য অবলম্বন করে চৈতন্যের জীবনী

আমি অনেক বয়স পর্যন্ত বিশেষ উৎসাহের সঙ্গে আলোচনা করেছি। এমন কি, আমাদের সমাজের ধর্মালোচনার সঙ্গে আমি বিশেষ যুক্ত ছিলুম না—সম্পূর্ণই উদাসীন ছিলুম। তার পরে আমার স্বদেশ অভিমানও বাল্যকাল থেকে অত্যন্ত প্রবল। সেজন্যও, যা কিছু আমাদের দেশের তাকে ভালভাবে গ্রহণ করতে আমি সর্বদাই প্রস্তুত ছিলুম—বরঞ্চ প্রতিকূল কিছু শুনলে জোর করে নিজের বিশ্বাসের বিরুদ্ধেও তার প্রতিবাদ করা আমার স্বভাব ছিল।

এই সকল নানাকারণে ব্রাহ্মসমাজে আমাকে ঠিক ব্রাহ্ম বলে গ্রহণ করেন নি এবং আমাকে তাঁরা বিশেষ অনুকূল দৃষ্টিতে কোনোদিন দেখেন নি।

এই ভূমিকাটুকু আবশ্যক। কারণ, তোমার এটুকু জানা আবশ্যক কোনো সাম্প্রদায়িক সংস্কারবশত অন্ধভাবে আমি কোনো কথা বলচিনে। যখন থেকে আমি আমার জীবনের গভীরতম প্রয়োজনে আমার অন্তরতম প্রকৃতির স্বাভাবিক ব্যাকুলতার প্রেরণায় সাধনার পথে প্রবৃত্ত হলুম তখন থেকে আমার পক্ষে যা বাধা তা বর্জন করতেই হয়েছে এবং যা অনুকূল তাই গ্রহণ করেছি।

অর্থাৎ যখন মানুষের সত্যকে না হলে নিতান্ত চলেনা তখন সে দেশের খাতিরে বা সংস্কারের টানে কল্পনার ইন্দ্রজাল দিয়ে নিজেকে আর ভুলিয়ে বেড়াতে কোনোমতে পারে না—এমন কি, সে রকম ফাঁকিতে তার অত্যন্ত একটা ধিক্কার বোধ হয়। যখন আমরা সত্যই ঈশ্বরকে চাই তখন আমরা নিজের বা অন্যের সঙ্গে লেশমাত্র চালাকি করতে পারি নে।

এই রকম অবস্থায় আমি আমাদের দেশপ্রচলিত দেবপূজার প্রণালীকে কেন যে সমস্ত মন থেকে ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছি তা নিশ্চয়ই আমার সমস্ত শান্তিনিকেতনের লেখাগুলির ভিতরে কতকটা প্রচ্ছন্ন ও কতকটা প্রকাশ্য ভাবে ব্যক্ত হয়েছে।

সে সমস্ত এই চিঠির মধ্যে ঠিকমত বিবৃত করা অসম্ভব। কারণ, তার অনেকগুলি দিক্ আছে। যাঁরা বলেন প্রতিমা-পূজার আবশ্যক আছে তাঁরা নানা ভিন্ন দিক্ থেকে বলেন—কেউ বলেন আমাদের মন সীমাবদ্ধ এই জন্যে মানুষ মাত্রেরই পক্ষে প্রতিমাপূজা ছাড়া গতি নেই—কেউ বলেন যাঁরা দুর্বলচিত্ত, কনিষ্ঠ অধিকারী তাঁদেরই এই সোপান দিয়ে উত্তীর্ণ হওয়া ছাড়া উপায় নেই অতএব তাঁদের খাতিরে এ সমস্তকে সহ্য করে চলতে হয়—আবার আজকাল অনেকে বলেন, এই প্রতিমাপূজাই সকল উপাসনার শ্রেষ্ঠ—এইটেই হচ্ছে আধ্যাত্মিকতার চরম।

এঁরা যে যে হেতু দেখান্ তা নিয়ে যদি তর্ক করতে যাই তবে তাতে কেবল তার্কিকতাই করা হবে। ধর্মবিষয়ে তার্কিকতায় কোনো ফল হয় না বরঞ্চ অনিষ্ট হয়—অতএব সে থাক্।

আমি এইটুকু বলতে চাই যে, মানুষ যখন ভগবানকে চায় তখন ঠিক কি চায় তা যদি পরিষ্কার করে বোঝে তাহলে অনেক জঞ্জাল কেটে যায়।

আমরা অনেক সময়ে যখন ঈশ্বরকে চাই বলি এবং বিশ্বাস করি তখন বস্তুত অন্যান্য বিষয়েরই মত আর একটা বিষয়কে চাই। যাদের চাওয়ার ঝোঁক ঘোচে নি তারা তাদের প্রার্থনার ফর্দের মধ্যে ঈশ্বরের নামটাও রাখে। হয় ত খুব বড় করে রাখে—কিন্তু

ঐ তালিকাটার মধ্যেই তার স্থান।

তারা কেউ বা তাঁকে "শান্তি" বলে চায়, কেউবা তাঁকে "সান্ত্বনা" বলে চায়, কেউবা তাঁকে "শক্তি" বলে চায়, কেউবা তাঁকে অন্যের অনুকরণে চায় কেউবা এই বলে চায় যে যখন ঋষিতপস্বীরা তাঁকে চেয়েছে তখন নিশ্চয় তাঁকে পাওয়াটা খুব গৌরবের।

আমরা ব্যামোর সময় ওষুধ চাই, অভাবের সময় টাকা চাই ঈশ্বরকে তেমন করেও চাই—সেটা যে একেবারে অন্যায় অসংগত আমি তা বল্‌তে পারি নে—কিন্তু সেইরকম চাওয়া নিতান্তই গৌণ চাওয়া—মুখ্য চাওয়া নয়।

যে চাওয়া আধ্যাত্মিক চাওয়া সে তাঁকে পেতে চাওয়া নয়—তাঁর সংগে মিলতে চাওয়া।

পৃথিবীতে কিছুর সংগে আমরা মিলতে পারিনে এইটেই আমাদের সকলের চেয়ে বেদনা। আংশিক ভাবে একটুমাত্র মিলি বাকি সব জায়গায় বাধে। তার প্রধান কারণই হচ্ছে সকলেই নিজের সীমা দিয়ে আমাদের বাধা দেয়—তার সংগে আপনাকে সবদিক দিয়ে মিলিয়ে দেওয়া অসম্ভব। স্বামীর স্বামীত্ব, বন্ধুর বন্ধুত্ব, পিতার পিতৃত্ব, পুত্রের পুত্রত্ব সর্বত্রই অল্প কিছু দূর গিয়ে ঠেকে যায়—তার মধ্যে আত্মা আপনাকে পরিপূর্ণরূপে খুঁজে পায় না।

যিনি জগৎ জুড়ে আমার পিতামাতা স্বামীবন্ধু সব হয়ে আছেন তাঁর মধ্যেই দেহে মনে আত্মায় কোথাও আমাদের আর ঠেকেনা।

যাঁর মধ্যে আমি সমস্তকেই চাই তাঁকে যতই বিশেষের মধ্যে গন্ডী দিয়ে বাঁধব ততই তিনি আমার আত্মাকে কোথাও না কোথাও এমন বাধা দেবেন যে অবশেষে তিনিও দশের মধ্যে একজন হয়ে উঠ্‌বেন।

একটি কথা ভেবে দেখো আমাদের দেশে দেবতা কেবলমাত্র মূর্ত্তি নন—অর্থাৎ কেবল যে আমরা আমাদের ধ্যানকে বাইরে আকৃতি দিয়েছি তা নয়—তাঁরা জন্মমৃত্যু বিবাহ সন্তান-সন্ততি ক্রোধ দ্বেষ প্রভৃতি নানা ইতিহাসের দ্বারা অত্যন্ত আবদ্ধ—সে সমস্ত ইতিহাসকে সত্য বলে বিশ্বাস করতে গেলে নিজের বুদ্ধিকে একেবারেই অন্ধ করতে হয় এবং সে সমস্ত ইতিহাসকে সত্য বলে বিশ্বাস করলে ভগবানের সার্বভৌমিকতা একেবারে চলে যায়—তিনি নিতান্ত আমাদের দেশের ও গ্রামের মানুষটি হয়ে পড়েন—সেইরকম বেশভূষা স্নানাহার আচারব্যবহার।

অথচ তিনিই আমাদের একমাত্র যাঁকে অবলম্বন করে, আমাদের চিত্ত দেশ ও জাতিগত সমস্ত সংকোচ অতিক্রম করে বিশ্বের সংগে মিলিত হবে—তাঁকে অবলম্বন করে আমাদের সর্বত্র প্রবেশাধিকার বিস্তৃত হবে। কিন্তু আমাদের দেশে ধর্মই মানুষের সংগে মানুষের প্রভেদ ঘটিয়েছে। আমরাই ভগবানের নাম করে পরস্পরকে ঘৃণা করেছি, স্ত্রীলোককে হত্যা করেছি, শিশুকে জলে ফেলেছি, বিধবাকে নিতান্তই অকারণে তৃষ্ণায় দগ্ধ করেছি, নিরীহ পশুদের বলিদান করচি—এবং সকল প্রকার বুদ্ধি যুক্তিকে একেবারে লংঘন করে এমন সকল নিরর্থকতার সৃষ্টি করেছি যাতে মানুষকে মূঢ় করে ফেলে। আমরা ধর্মের নামেই অপরিচিত মুমূর্ষুকে পথের ধারে পড়ে মরে যেতে দিই পাছে জাত যায় (এ আমার জানা)—অপরিচিত মৃতদেহকে সংকার করিনে—মানুষের স্পর্শকে বীভৎস

জন্তুর চেয়ে বেশি ঘৃণা করি। কেন এমন হয়েছে? আমরা ধর্মকে আমাদের নিজের চেয়ে নেবে যেতে দিয়েছি। আমরা কেবলি বলেছি, আমরা নিকৃষ্ট অধিকারী, আমরা পারি নে, বিশুদ্ধ সত্য, বিশুদ্ধ মঙ্গল আমাদের জন্যে নয়। অতএব আমাদের পক্ষে এই সমস্ত মুগ্ধ কল্পনাই ভাল। এমনি ধর্মকে সহজ করতে গিয়ে যে তাকে কেবলি নীচু করেছে তার আর উদ্ধারের উপায় নেই। ধর্মকে যে উপরে রেখেছে, ধর্ম তাকে উপরে টেনেছে—হিন্দু তা করে না। হিন্দু কেবলি বলেছে মেয়েদের জন্যে সর্বসাধারণের জন্যে এই রকম আটপৌরে মোটা ধর্মই দরকার—এই বলে সমস্ত দেশের বুদ্ধি ও আকাঙ্ক্ষাকে সেই মোটার দিকে ভারাক্রান্ত করে নেবে যেতে দিয়েছে। আর যাই হোক্ সাধনাকে নীচের দিকে নামতে দিলে কোনো মতেই চলবে না। কল্পনাকে, হৃদয়কে, বুদ্ধিকে, কর্মকে কেবলি মুক্তির অভিমুখে আকর্ষণ করতে হবে—তাকে কোনো কারণেই কোনো সুযোগের প্রলোভনেই ভুলিয়ে রাখতে হবে না। আমি নিজের জন্য এবং দেশের জন্যে সেই মুক্তি চাই। মনে কোরো না সেই মুক্তি জ্ঞানের মধ্যে মুক্তি—সে প্রেমের মধ্যে মুক্তি। তুমি মনে কোরো না প্রতিমা পূজা ছাড়া প্রেম হতেই পারে না—যদি সূফীদের প্রেমের সাধনার বিবরণ পড়ে থাক তবে দেখবে তাঁরা কি আশ্চর্য্য বিশুদ্ধ জ্ঞানের সঙ্গে কি অপরিসীম প্রেমের মিলন সাধন করিয়েছেন। তাঁদের সেই প্রেম কেবল একটা শূন্য ভাবের জিনিষ নয়, তা অত্যন্ত নিকট, অত্যন্ত প্রত্যক্ষ, অত্যন্ত অন্তরঙ্গ অথচ তার সঙ্গে কোনো প্রকার কাল্পনিক জঞ্জালের আবর্জ্জনা নেই। এ সমস্ত কথা এমন করে চিঠির মধ্যে স্পষ্ট করে প্রকাশ করা অসম্ভব।...

চিঠিপত্র-৭, পৃঃ ২৭-৩৩

টীকা ঃ

কাদম্বিনী দেবী—কাদম্বিনী দেবী মহিমচন্দ্র সরকারের কন্যা এবং প্রাণগোপাল দত্তের স্ত্রী।

প্রচলিত অর্থে উচ্চশিক্ষিতা ছিলেন না। কিন্তু এঁর 'ধীশক্তি' রবীন্দ্রনাথকে মুগ্ধ করেছিল। স্বামীর মৃত্যুর পর সাহিত্যে ও দর্শনে আগ্রহী হন। এই সূত্রেই রবীন্দ্ররচনাবলীকে আশ্রয় হিসাবে গ্রহণ করেন এবং রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে পত্রব্যবহারে প্রবৃত্ত হন।

জন্ম ১২৮৫ (?), মৃত্যু ১৩৫০

৮২। ভজন পূজন সাধন আরাধনা

২৭শে আষাঢ় ১৩১৭ (১৯১০)

ভজন পূজন সাধন আরাধনা
সমস্ত থাক্ পড়ে।

রুদ্ধদ্বারে দেবালয়ের কোণে
কেন আছিস ওরে।
অন্ধকারে লুকিয়ে আপন মনে
কাহারে তুই পূজিস সংগোপনে,
নয়ন মেলে দেখ্ দেখি তুই চেয়ে
দেবতা নাই ঘরে।

তিনি গেছেন যেথায় মাটি ভেঙে
করছে চাষা চাষ—
পাথর ভেঙে কাটছে যেথায় পথ,
খাটছে বারো মাস।
রৌদ্রে জলে আছেন সবার সাথে,
ধুলা তাঁহার লেগেছে দুই হাতে;
তাঁরি মতন শুচি বসন ছাড়ি
আয় রে ধুলার 'পরে।

মুক্তি? ওরে মুক্তি কোথায় পাবি,
মুক্তি কোথায় আছে।
আপনি প্রভু সৃষ্টিবাঁধন প'রে
বাঁধা সবার কাছে।
রাখো রে ধ্যান থাক্ রে ফুলের ডালি,
ছিঁড়ুক বস্ত্র, লাগুক ধুলাবালি,
কর্মযোগে তাঁর সাথে এক হয়ে
ঘর্ম পড়ুক ঝরে।

গীতাঞ্জলি, র/২/২৯১

তুলনীয় প্রসঙ্গঃ

যেথায় থাকে সবার অধম (৮০)

৮৩। তাই তোমার আনন্দ

২৮শে আষাঢ় ১৩১৭ (১৯১০)

তাই তোমার আনন্দ আমার 'পর
তুমি তাই এসেছ নিচে—

আমায় নইলে, ত্রিভুবনেশ্বর,
তোমার প্রেম হত যে মিছে।।

আমার নিয়ে মেলেছ এই মেলা,
আমার হিয়ায় চলছে রসের খেলা,
মোর জীবনে বিচিত্ররূপ ধরে
তোমার ইচ্ছা তরঙ্গিছে।

তাই তো তুমি রাজার রাজা হয়ে
তবু আমার হৃদয় লাগি
ফিরছ কত মনোহরণ-বেশে,—
প্রভু, নিত্য আছ জাগি।
তাই তো, প্রভু যেথায় এল নেমে
তোমারি প্রেম ভক্তপ্রাণের প্রেমে
মূর্তি তোমার যুগলসম্মিলনে সেথায় পূর্ণ প্রকাশিছে।।

গীতবিতান, র/৪/৯৫

তুলনীয় প্রসঙ্গঃ বিশেষ (৪১), প্রেমের অধিকার (৪২), বিধান (৪৫), পার্থক্য (৪৬)
তোমার আমার মিলন হবে বলে (৯৫), খৃষ্টোৎসব (১১৮), আমার মিলন লাগি (৭৪)

৮৪। মম চিত্তে নিতি নৃত্যে

'রাজা', ১৩১৭ পৌষ, 'নাচের দলের নৃত্য ও গীত'

মম চিত্তে নিতি নৃত্যে কে যে নাচে
তাতা থৈথৈ, তাতা থৈথৈ, তাতা থৈথৈ।
তারি সঙ্গে কী মৃদঙ্গে সদা বাজে
তাতা থৈথৈ, তাতা থৈথৈ, তাতা থৈথৈ।।
হাসিকান্না হীরাপান্না দোলে ভালে,
কাঁপে ছন্দে ভালো মন্দ তালে তালে।
নাচে জন্ম, নাচে মৃত্যু পাছে পাছে
তাতা থৈথৈ, তাতা থৈথৈ, তাতা থৈথৈ।
কী আনন্দ, কী আনন্দ, কী আনন্দ,
দিবারাত্রি নাচে মুক্তি, নাচে বন্ধ—
সে তরঙ্গে ছুটি রঙ্গে পাছে পাছে
তাতা থৈথৈ, তাতা থৈথৈ, তাতা থৈথৈ।।

গীতবিতান, র/৪/৩১৯

৮৫। আমার প্রাণের মানুষ আছে

১৩১৭ পৌষ (১৯১০)

আমার প্রাণের মানুষ আছে প্রাণে,
তাই হেরি তায় সকল খানে।।
আছে সে নয়নতারায় আলোক-ধারায়, তাই না হারায়—
ওগো তাই দেখি আয় যেথায় সেথায়
তাকাই আমি যে দিক-পানে।।
আমি তার মুখের কথা শুনব বলে গেলাম কোথা,
শোনা হল না, হল না—
আজ ফিরে এসে নিজের দেশে এই-যে শুনি
শুনি তাহার বাণী আপন গানে।।
কে তোরা খুঁজিস তারে কাঙাল বেশে দ্বারে দ্বারে,
দেখা মেলে না, মেলে না—
তোরা আয় রে ধেয়ে, দেখ্ রে চেয়ে আমার বুকে—
ওরে দেখ্ রে আমার দুই নয়ানে।।

গীতবিতান, র/৪/১৬৭

তুলনীয় প্রসঙ্গঃ

আমি তারেই জানি (১৪৮), আমি তারেই খুঁজে বেড়াই (১১৫), আমি কান পেতে রই (১১৬), আমার হিয়ার মাঝে (১০১),আপনি আমার কোন্‌খানে (১২৩)

৮৬। আমরা সবাই রাজা

'রাজা', ১৩৭০ পৌষ, 'ঠাকুরদার গান'

আমরা সবাই রাজা আমাদের এই রাজার রাজত্বে—
নইলে মোদের রাজার সনে মিলব কী স্বত্বে।
আমরা যা খুশি তাই করি, তবু তাঁর খুশিতেই চরি,
আমরা নই বাঁধা নই দাসের রাজার ত্রাসের দাসত্বে—
নইলে মোদের রাজার সনে মিলব কী স্বত্বে।
রাজা সবারে দেন মান, সে মান আপনি ফিরে পান,
মোদের খাটো করে রাখে নি কেউ কোনো অসত্যে—
নইলে মোদের রাজার সনে মিলব কী স্বত্বে।
আমরা চলব আপন মতে, শেষে মিলব তাঁরি পথে,
মোরা মরব না কেউ বিফলতার বিষম আবর্তে—

নইলে মোদের রাজার সনে মিলব কী স্বত্বে।

গীতবিতান, র/৪/১৯২

৮৭। বিশ্বসাথে যোগে যেথায় বিহারো

চৈত্র ১৩১৭ (১৯১১)

বিশ্বসাথে যোগে যেথায় বিহারো।
সেইখানে যোগ তোমার সাথে আমারও।।
নয়কো বনে, নয় বিজনে, নয়কো আমার আপন মনে—
সবার যেথায় আপন তুমি, হে প্রিয়, সেথায় আপন আমারও
সবার পানে যেথায় বাহু পসারো
সেইখানেতে প্রেম জাগিবে আমারও।
গোপনে প্রেম রয় না ঘরে, আলোর মতো ছড়িয়ে পড়ে—
সবার তুমি আনন্দধন হে প্রিয়, আনন্দ সেই আমারও।।

গীতবিতান, র/৪/১১৬

৮৮। ধর্মের অধিকার

১৩১৮ (১৯১১)

যে-সকল মহাপুরুষের বাণী জগতে আজও অমর হইয়া আছে তাঁহারা কেহই মানুষের মন জোগাইয়া কথা কহিতে চেষ্টা করেন নাই। তাঁহারা জানিতেন মানুষ আপনার মনের চেয়েও অনেক বড়ো—অর্থাৎ মানুষ আপনাকে যাহা মনে করে সেইখানেই তাহার সমাপ্তি নহে। এইজন্য তাঁহারা একেবারে মানুষের রাজদরবারে আপনার দূত প্রেরণ করিয়াছেন, বাহিরের দেউড়িতে দ্বারীকে মিষ্টবাক্যে ভুলাইয়া কাজ উদ্ধারের সহজ উপায় সন্ধান করিয়া কাজ নষ্ট করেন নাই।

তাঁহারা এমন সব কথা বলিয়াছেন যাহা বলিতে কেহ সাহস করে না, এবং সংসারের কাজকর্মের মধ্যে যাহা শুনিবামাত্র মানুষ বিরক্ত হইয়া ওঠে, বলিয়া বসে এসব কথা কোনো কাজের কথাই নহে। কিন্তু কত বড়ো বড়ো কাজের কথা কালের স্রোতে বুদ্‌বুদের মতো ফেনাইয়া উঠিল এবং ভাসিতে ভাসিতে ফাটিয়া বিলীন হইয়া গেল, আর যত অসম্ভবই সম্ভব হইল, অভাবনীয়ই সত্য হইল, বুদ্ধিমানের মন্ত্রণা নহে কিন্তু পাগলের পাগলামিই যুগে যুগে মানুষের অন্তরে বাহিরে, তাহার চিন্তায় কর্মে, তাহার দর্শনে সাহিত্যে কত নব

নব সৃষ্টিবিকাশ করিয়া চলিল তাহার আর অন্ত নাই। তাঁহাদের সেই সকল অদ্ভুত কথা ঠেকাইতে গিয়াও কোনোমতেই ঠেকানো যায় না, তাহাকে মারিতে চেষ্টা করিলেই আরও অমর হইয়া উঠে, তাহাকে পোড়াইলে সে উজ্জ্বল হয়, তাহাকে পুঁতিয়া ফেলিলে সে অঙ্কুরিত হইয়া দেখা দেয়, তাহাকে সবলে বাধা দিতে গিয়াই আরও নিবিড় করিয়া গ্রহণ করিতে হয়—এবং যেন মন্ত্রের বলে কেমন করিয়া দেখিতে দেখিতে নিজের অগোচরে, এমন কি, নিজের অনিচ্ছায় সেই সকল বাণীর বেদনায় ভাবুক লোকের ভাবের রং বদল হইতে থাকে, কাজের লোকের কাজের সুর ফিরিয়া যায়।

মহাপুরুষেরা মানুষকে অকুণ্ঠিত কণ্ঠে অসাধ্য সাধনেরই উপদেশ দিয়াছেন। মানুষ যেখানেই একটা কোনো বাধায় আসিয়া ঠেকিয়াছে এবং মনে করিয়াছে ইহার তাহার চরম আশ্রয়, এবং সেইখানেই আপনার শাস্ত্রকে প্রথাকে একেবারে নিশ্ছিদ্ররূপে পাকা করিয়া সনাতন বাসা বাঁধিবার চেষ্টা করিয়াছেন—সেইখানেই মহাপুরুষেরা আসিয়া গণ্ডি মুছিয়াছেন, বেড়া ভাঙিয়াছেন—বলিয়াছেন পথ এখনও বাকি, পাথেয় এখনও শেষ হয় নাই, যে অমৃতভবন তোমার আপন ঘর তোমার চরমলোক সে তোমাদের এই মিস্ত্রির হাতের গড়া পাথরের দেওয়াল দিয়া প্রস্তুত নহে, তাহা পরিবর্তিত হয় কিন্তু ভাঙে না, তাহা আশ্রয় দেয় কিন্তু আবদ্ধ করে না, তাহা নির্মিত হয় না বিকশিত হয়, সঞ্চিত হয় না সঞ্চারিত হয়, তাহা কৌশলের কারুকার্য নহে তাহা অক্ষয় জীবনের অশ্রান্ত সৃষ্টি। মানুষ বলে সেই পথযাত্রা আমার অসাধ্য, কেননা আমি দুর্বল আমি শ্রান্ত; তাঁহারা বলেন এইখানে স্থির হইয়া থাকাই তোমার অসাধ্য, কেননা তুমি মানুষ, তুমি মহৎ, তুমি অমৃতের পুত্র, ভূমাকে ছাড়া কোথাও তোমার সন্তোষ নাই।...

মানুষ বলে, জানি, আমরা পারি না—মহাপুরুষ বলেন, জানি তোমরা পার। মানুষ বলে, যাহা সাধ্য এমন একটা ধর্ম খাড়া করো; মহাপুরুষ বলেন, যাহা ধর্ম তাহা নিশ্চয়ই তোমাদের সাধ্য। মানুষের সমস্ত শক্তির উপরে তাঁহারা দাবি করেন—কেননা সমস্ত অশক্তির পরিচয়কে অতিক্রম করিয়াও তাঁহারা নিশ্চয়ই জানেন তাহার শক্তি আছে।

অতএব ধর্মেই মানুষের শ্রেষ্ঠ পরিচয়। ধর্ম মানুষের উপরে যে পরিমাণে দাবি করে সেই অনুসারে মানুষ আপনাকে চেনে।...

...ধর্ম কেবলই মানুষকে বলিতেছে, তুমি অমৃতের পুত্র, ইহাই সত্য; ব্যবহারত মানুষের স্খলন পদে পদে হইতেছে তবু ধর্ম তাহার সত্য পরিচয়কে উচ্চে ধরিয়া রাখিতেছে; মানুষ বলিতে যে কতখানি বুঝায় ধর্ম তাহা কোনোমতেই মানুষকে ভুলিতে দিবে না; ইহাই তাহার সর্বপ্রধান কাজ।...

...মানুষ নিয়ত আপনার সর্বশ্রেষ্ঠকেই প্রকাশ করিবে ইহাই তাহার সাধনার লক্ষ্য। যাহা আপনি আসিয়া জমিয়াছে তাহাকে নহে, যাহা হাজার বৎসর পূর্বে ঘটিয়াছে তাহাকেও নহে। নিজের এই সর্বশ্রেষ্ঠকেই নিয়ত প্রকাশ করিবার যে শক্তি, সেই শক্তি তাহার ধর্মই তাহাকে দান করে, এই কারণে মানুষ আপন ধর্মের আদর্শকে আপন তপস্যার সর্বশেষে, আপন শ্রেষ্ঠতার চরমেই স্থাপন করিয়া থাকে। কিন্তু মানুষ যদি বিপদে পড়িয়া বা মোহে ডুবিয়া ধর্মকেই নামাইয়া বসে তবে নিজের সবচেয়ে সাংঘাতিক বিপদ ঘটায়, তবে ধর্মের মতো সর্বনেশে ভার তাহার পক্ষে আর কিছুই হইতে পারে না। যাহাকে

উপরে রাখিলে উপরে টানে, তাহাকে নিচে রাখিলে সে নিচেই টানিয়া লয়। অতএব ধর্মকে কোনো জাতি যদি নীতির দিকে না বসাইয়া রীতির দিকে বসায়, বুদ্ধির দিকে না বসাইয়া সংস্কারের দিকেই বসায়, অন্তরের দিকে আসন না দিয়া যদি বাহ্য অনুষ্ঠানে তাহাকে বদ্ধ করে এবং ধর্মের উপরেই দেশকালপাত্রের ভার না দিয়া দেশকালপাত্রের হাতেই ধর্মকে হাত পা বাঁধিয়া নির্মমভাবে সমর্পণ করিয়া বসে; ধর্মেরই দোহাই দিয়া কোনো জাতি যদি মানুষকে পৃথক করিতে থাকে, এক শ্রেণীর অভিমানকে আর এক শ্রেণীর মাথার উপরে চাপাইয়া দেয় এবং মানুষের চরমতম আশা ও পরমতম অধিকারকে সংকুচিত ও শতখণ্ড করিয়া ফেলে; তবে সে-জাতিকে হীনতার অপমান হইতে রক্ষা করিতে পারে এমন কোনো সভাসমিতি কন্‌গ্রেস কন্‌ফারেন্স, এমন কোনো বাণিজ্য-ব্যবসায়ের উন্নতি, এমন কোনো রাষ্ট্রনৈতিক ইন্দ্রজাল বিশ্বজগতে নাই। সে জাতি এক সংকট হইতে উদ্ধার পাইলে আর এক সংকটে আসিয়া পড়িবে এবং এক প্রবলপক্ষ তাহাকে অনুগ্রহপূর্বক সম্মানদান করিলে আর এক প্রবলপক্ষ অগ্রসর হইয়া তাহাকে লাঞ্ছনা করিতে কুণ্ঠিত হইবে না; যে আপনার সর্বোচ্চকেই সম্মান না দেয় সে কখনোই উচ্চাসন পাইবে না। ইহাতে কোনো সন্দেহমাত্র নাই যে, ধর্মের বিকারেই গ্রীস মরিয়াছে, ধর্মের বিকারেই রোম বিলুপ্ত হইয়াছে এবং আমাদের দুর্গতির কারণ আমাদের ধর্মের মধ্যে ছাড়া আর কোথাও নাই। এবং ইহাতেও কোনো সন্দেহমাত্র নাই যে, যদি উদ্ধার ইচ্ছা করি তবে কোনো বাহিরের দিকে তাকাইয়া কোনো ফল নাই, কোনো উপস্থিত বাহ্য সুবিধার সুযোগ করিয়া কোনো লাভ নাই;—রক্ষার উপায়কে কেবলই বাহিরে খুঁজিতে যাওয়া দুর্বল আত্মার মূঢ়তা;—ইহাই ধ্রুব সত্য যে, ধর্মো রক্ষতি রক্ষিতঃ।

সঞ্চয়, র/১২/৫৪৫-৫৯

৮৯। ধর্মের অর্থ

১৩১৮ (১৯১১)

মানুষের উপর একটা মস্ত সমস্যার মীমাংসাভার পড়িয়াছে। তাহার একটা বড়োর দিক আছে, একটা ছোটোর দিক আছে। দুইয়ের মধ্যে একটা ছেদ আছে, অথচ যোগও আছে। এই ছেদটাকেও রাখিতে হইবে অথচ যোগটাকেও বাড়াইতে হইবে। ছোটো থাকিয়াও তাহাকে বড়ো হইয়া উঠিতে হইবে। এই মীমাংসা করিতে গিয়া মানুষ নানা রকম চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইতেছে—কখনো সে ছোটোটাকে মায়া বলিয়া উড়াইয়া দিতে চায়, কখনো বড়োটাকে স্বপ্ন বলিয়া আমল দিতে চায় না। এই দুইয়ের সামঞ্জস্য করিবার চেষ্টাই তাহার সকল চেষ্টার মূল। এই সামঞ্জস্য যদি না করিতে পারা যায় তবে ছোটোরও কোনো অর্থ থাকে না, বড়োটিও নিরর্থক হইয়া পড়ে।...

...মানুষের নানা অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, নানা ইন্দ্রিয়বোধ, তাহার নানা বৃত্তিপ্রবৃত্তি, এ সমস্তই মানুষকে কেবলই বিচিত্রের মধ্যে বিস্তারের দিকে লইয়া চলিয়াছে। এই বিচিত্রের শেষ কোথায়?...

কিন্তু মানুষের পক্ষে কেবলই কি এই গণনাহীন বৈচিত্র্যের মধ্যে বিরামহীন ব্যাপ্তিই আছে? কোনোখানেই তাহার পৌঁছানো নাই? অন্তহীন বহু কেবলই কি তাহাকে এক হইতে দুই. দুই হইতে তিনের সিঁড়ি বাহিয়া লইয়া চলিবে—সে সিঁড়ি কোথাও যাইবার নাম করিবে না?

এ কখনো হইতেই পারে না। আমরা জগতে এই একটি কান্ড দেখি— গম্যস্থানকে আমরা পদে পদেই পাইতেছি। বস্তুত আমরা গম্যস্থানেই আসিয়া রহিয়াছি—আমরা গম্যস্থানের মধ্যেই চলিতেছি। অর্থাৎ যাহা পাইবার তাহা আমরা পাইয়া বসিয়াছি, এখন সেই পাওয়ারই পরিচয় চলিতেছে। যেন আমরা রাজবাড়িতে আসিয়াছি—কিন্তু কেবল আসিলেই তো হইল না—তাহার কত মহল কত ঐশ্বর্য কে তাহার গণনা করিতে পারে? এখন তাই দেখিয়া দেখিয়া বেড়াইতেছি। এইজন্য একটু করিয়া যাহা দেখিতেছি তাহাতেই সমস্ত রাজপ্রাসাদের পরিচয় পাইতেছি। ইহাকে তো পথে চলা বলে না। পথে কেবল আশা থাকে, আস্বাদন থাকে না। আবার যে পথ অনন্ত সেখানে আশাই বা থাকিবে কেমন করিয়া?

তাই আমি বলিতেছি আমাদের কেহ পথে বাহির করে নাই—আমরা ঘরেই আছি। সে ঘর এমন ঘর যে, তাহার বারান্ডায় ছাতে দালানে ঘুরিয়া ঘুরিয়া তাহাকে আর শেষ করিতে পারি না অথচ সর্বত্রই তাহার শেষ; সর্বত্রই তাহা ঘর, কোথাও তাহা পথ নহে।...

ব্যাপ্তি এবং সমাপ্তি এই যে দুটি তত্ত্ব সর্বত্র একসঙ্গেই বিরাজ করিতেছে আমাদের মধ্যেও নিশ্চয় ইহার পরিচয় আছে। আমরাও নিশ্চয় আপনাকে উপলব্ধি করিবার জন্য অনন্ত জীবনের প্রান্তে পৌঁছিবার দুরাশায় অপেক্ষা করিতেছি না। এ কথা বলিতেছি না যে, এখনও যখন আমার সমস্ত নিঃশেষে চুকিয়া বুকিয়া যায় নাই তখন আমি আপনাকে জানিতেছি না। বস্তুত আমার মধ্যে একদিকে চলা, এবং আর একদিকে পৌঁছানো, একদিকে বহু, আর একদিকে এক, একসঙ্গেই রহিয়াছে, নহিলে অস্তিত্বের মতো বিভীষিকা আর কিছুই থাকিত না। একদিকে আমার বিচিত্র শক্তি বাহিরের বিচিত্রের দিকে চলিয়াছে, আর একদিকে আমার আনন্দ ভিতরের একের দিকে পূর্ণ হইয়া উঠিতেছে।

এই যেখানে মানুষের আপনার আনন্দ—এইখানেই মানুষের পর্যাপ্তি, এইখানেই মানুষ বড়ো। এইখান হইতেই গতি লইয়া মানুষের সমস্ত শক্তি বাহিরে চলিয়াছে, এবং বাহির হইতে পুনরায় তাহারা এইখানেই অর্ঘ্য আহরণ করিয়া ফিরিয়া আসিতেছে।...

...চলিবার চেষ্টাই শিশুর পক্ষে স্বাভাবিক, তবু তো দেখি শিশু চলিতে পারে না। সে বারংবার পড়িয়া যায়। কিন্তু এই অক্ষমতা হইতে এই পড়িয়া যাওয়া হইতেই আমরা তাহার স্বভাব বিচার করি না। বরঞ্চ এই কথাই আমরা বলি, যে, শিশু যে বারবার করিয়া পড়িতেছে আঘাত পাইতেছে তবু চলিবার চেষ্টা ত্যাগ করিতেছে না ইহার কারণ চলাই তাহার স্বভাব—সেই স্বভাবের প্রেরণাতেই সমস্ত প্রতিকূলতার মধ্যে, সমস্ত আত্মবিরোধের মধ্যে, তাহার চলার চেষ্টা রহিয়া গিয়াছে। শিশু যখন মাটিতে গড়াইতেছে তখন পৃথিবীর আকর্ষণ কেবলই তাহাকে নিচে টানিয়া টানিয়া ফেলিতেছে তখনও তাহার স্বভাব এই প্রকৃতির আকর্ষণকে কাটাইয়া উঠিতে চাহিতেছে—সে আপনার শরীরের সম্পূর্ণ প্রভুত্ব চায়—টলিয়া টলিয়া পড়িতে চায় না;—ইহা তাহার পক্ষে প্রাকৃতিক নহে, ইহা তাহার পক্ষে স্বাভাবিক। এইজন্য প্রকৃতি যখন তাহাকে ধুলায়

টানিয়া ফেলিতে চায় তখন তাহার স্বভাব তাহাকে উপরে টানিয়া রাখিতে চাহে। সমস্ত টলিয়া পড়ার মধ্যে এই স্বভাব তাহাকে কিছুতেই ছাড়ে না।

আমার ধর্ম আমাদের সেইরূপ স্বভাব। প্রকৃতির উপরে সকল দিক হইতে আমাদিগকে খাড়া করিয়া তুলিবার জন্য সে কেবলই চেষ্টা করিতেছে—যখন ধূলায় লুটাইয়া তাহাকে অস্বীকার করিতেছি তখনও অন্তরের মধ্যে সে আছে। সে বলিতেছে আপনার স্থিতিকে পাইতেই হইবে, তাহা হইলেই গতিকে পাইবে—দাঁড়াইতে পারিলেই চলিতে পারিবে। আপনাকে পাইলেই সমস্তকে মূলে গিয়া পাইবে। তখন্ তোমার সমস্ত জীবন প্রাকৃতিক হইবে না, স্বাভাবিক হইবে। স্বভাবে যখন তুমি প্রতিষ্ঠিত হইবে প্রকৃতি তখন তোমার অনুগত হইবে। তখনই তোমার ধর্ম সার্থক হইবে—তখনই তুমি তোমার চরিতার্থকে পাইবে।

এই চরিতার্থতার সঙ্গে বিচ্ছিন্ন করিয়া মানুষ বাহির হইতে যাহা কিছু পাইতেছে তাহাতেই তাহার অন্তরতম ইচ্ছা মাথা নাড়িয়া বলিতেছে—যেনাহং নামৃতা স্যাম্ কিমহং তেন কুর্যাম্। এই চরিতার্থতা হইতে, এই পরিসমাপ্তি হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া সে যাহা কিছু দেখিতেছে তাহার মধ্যে সে মৃত্যুকেই দেখিতেছে—কেবল বিচ্ছেদ, কেবল অবসান; প্রয়োজন আছে তাহার আয়োজন পাই না, আয়োজন আছে তাহার প্রয়োজন চলিয়া যায়। এ যে মৃত্যুকে দেখা, ইহার অর্থ নিরর্থকতাকে দেখা। মানুষ ইচ্ছা করিল, কাজ করিল, সুখ দুঃখ ভোগ করিল, তাহার পর মরিয়া গেল। সেইখানে মৃত্যুকে যখন দেখি তখন মানুষের জীবনের সমস্ত ইচ্ছা সমস্ত কাজের অর্থকে আর দেখিতে পাই না। তাহার দীর্ঘকালের জীবন মুহূর্তকালে মৃত্যুর মধ্যে হঠাৎ মিথ্যা হইয়া গেল।

পদে পদে এই মৃত্যুকে দেখা, এই অর্থহীনতাকে দেখা তো কখনোই সত্য দেখা নহে। অর্থাৎ ইহা কেবল বাহিরের দেখা; ভিতরের দেখা নহে; ইহাই যদি সত্য হইত তবে মিথ্যাই সত্য হইত—তাহা কখনোই সম্ভব হইতে পারে না। জীবনের কার্য ও বিশ্বের ব্যাপ্তির মধ্যে একটি পরমার্থকে দেখিতেই হইবে। মুখে যতই বলি না কেন, কোনো অর্থ নাই; যতই বলি না কাজ কেবল কাজকে জন্ম দিয়াই চলিয়াছে তাহার কোনো পরিণাম নাই, ব্যাপ্তি কেবলই দেশে কালে ছড়াইয়া পড়িতেছে, তাহার সঙ্গে দেশকালাতীত সুগভীর পরিসমাপ্তির কোনোই যোগ নাই—মন কোনোমতেই তাহাতে সায় দিতে পারে না।...

সঞ্চয়, র/১২/৫৩২-৪৫

৯০। ধর্মের নবযুগ

১৩১৮ (১৯১১)

সংসারের ব্যবহারে প্রতিদিন আমরা ছোটো ছোটো সীমার মধ্যে আপনাকে রুদ্ধ করিয়া থাকি। এমন অবস্থায় মানুষ স্বার্থপরভাবে কাজ করে, গ্রাম্যভাবে চিন্তা করে, ও সংকীর্ণ সংস্কারের অনুসরণ করিয়া অত্যন্ত অনুদারভাবে নিজের রাগদ্বেষকে প্রচার করে। এইজন্যই দিনের মধ্যে অন্তত একবার করিয়াও নিজেকে অসীমের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়া দেখিবার উপদেশ আছে। অন্তত একবার করিয়াও একথা বুঝিতে হইবে যে কোনো ভৌগলিক ভূমিখণ্ডেই আমার চিরকালের দেশ নহে, সমস্ত ভূর্ভুব: স্ব: আমার বিরাট আশ্রয়; অন্তত একবার করিয়াও অন্তরের মধ্যে এই কথাটিকে ধ্যান করিয়া লইতে হইবে যে, আমার ধীশক্তি আমার চৈতন্য কোনো একটা কলের জিনিসের মতো আমার মধ্যেই উৎপন্ন ও আমার মধ্যেই বদ্ধ নহে, জগদ্ব্যাপী ও জগতের অতীত অনন্ত চৈতন্য হইতেই তাহা প্রতিমুহূর্তে আমার মধ্যে বিকীর্ণ হইতেছে।

এইরূপে নিজেকে যেমন সমস্ত আবরণ হইতে মুক্তি দিয়া সত্য করিয়া দেখিতে হইবে নিজের ধর্মকেও তেমনি করিয়া তাহার সত্য আধারের মধ্যে দেখিবার সাধনা করা চাই। আমাদের ধর্মকেও যখন সংসারে আমরা প্রতিদিন ব্যবহার করিতে থাকি তখন কেবলই তাহাকে নিজের নানাপ্রকার ক্ষুদ্রতার দ্বারা বিজড়িত করিয়া ফেলি। মুখে যাহাই বলি না কেন, ভিতরে ভিতরে তাহাকে আমাদের সমাজের ধর্ম আমাদের সম্প্রদায়ের ধর্ম করিয়া ফেলি। সেই ধর্মসম্বন্ধে আমাদের সমস্ত চিন্তা সাম্প্রদায়িক সংস্কারের দ্বারা অনুরঞ্জিত হইয়া উঠে। অন্যান্য বৈষয়িক ব্যাপারের ন্যায় আমাদের ধর্ম, আমাদের আত্মাভিমান বা দলীয় অভিমানের উপলক্ষ্য হইয়া পড়ে; ভেদবুদ্ধি নানাপ্রকার ছদ্মবেশ ধরিয়া জাগিতে থাকে; এবং আমরা নিজের ধর্মকে লইয়া অন্যান্য দলের সহিত প্রতিযোগিতার উত্তেজনায় হারজিতের ঘোড়দৌড় খেলিয়া থাকি। এই সমস্ত ক্ষুদ্রতা যে আমাদেরই স্বভাব, তাহা যে আমাদের ধর্মের স্বভাব নহে সে কথা আমরা ক্রমে ক্রমে ভুলিয়া যাই এবং একদিন আমাদের ধর্মের উপরেই আমাদের নিজের সংকীর্ণতা আরোপ করিয়া তাহাই লইয়া গৌরব করিতে লজ্জা বোধ করি না।

এইজন্যই আমাদের ধর্মকে অন্তত বৎসরের মধ্যে একদিনও আমাদের স্বরচিত সমাজের বেস্টন হইতে মুক্তি দিয়া সমস্ত মানুষের মধ্যে তাহার নিত্য প্রতিষ্ঠায় তাহার সত্য আশ্রয়ে প্রত্যক্ষ করিয়া দেখিতে হইবে; দেখিতে হইবে, সকল মানুষের মধ্যেই তাহার সামঞ্জস্য আছে কিনা, কোথাও তাহার বাধা আছে কিনা—বুঝিতে হইবে তাহা সেই পরিমাণেই সত্য যে পরিমাণে তাহা সকল মানুষেরই।

কিছুকাল হইতে মানুষের সভ্যতার মধ্যে একটা খুব বড়ো রকমের পরিবর্তন দেখা দিতেছে—তাহার মধ্যে সমুদ্র হইতে যেন একটা জোয়ার আসিয়াছে। একদিন ছিল যখন প্রত্যেক জাতিই ন্যূনাধিক পরিমাণে আপনার গন্ডির মধ্যে আবদ্ধ হইয়া বসিয়া ছিল। নিজের সংগে সমস্ত মানবেরই যে একটা গূঢ়গভীর যোগ আছে ইহা সে বুঝিতই না। সমস্ত মানুষকে জানার ভিতর দিয়াই যে নিজেকে সত্য করিয়া জানা যায় এ কথা সে স্বীকার করিতেই পারিত না। সে এই কথা মনে করিয়া নিজের চৌকিতে খাড়া হইয়া মাথা

তুলিয়া বসিয়াছিল যে, তাহার জাতি, তাহার সমাজ, তাহার ধর্ম যেন ঈশ্বরের বিশেষ সৃষ্টি এবং চরম সৃষ্টি—অন্য জাতি, ধর্ম সমাজের সংগে তাহার মিল নাই এবং মিল থাকিতেই পারে না। স্বধর্মে এবং পরধর্মে যেন একটা অটল অলংঘ্য ব্যবধান।...

...ব্রহ্মই যে রসস্বরূপ, এবং—এষোস্য পরম আনন্দঃ—ইনিই আত্মার পরম আনন্দ, আমাদের দেশের সেই চিরলব্ধ সত্যটিকে যদি এই নূতন যুগে নূতন করিয়া সপ্রমাণ করিতে না পারি তবে ব্রহ্মজ্ঞানকে তো আমরা ধর্ম বলিয়া মানুষের হাতে দিতে পারিব না—ব্রহ্মজ্ঞানী তো ব্রহ্মের ভক্ত নহেন। রস ছাড়া তো আর কিছুই মিলাইতে পারে না ভক্তি ছাড়া তো আর কিছুই বাঁধিতে পারে না। জীবনে যখন আত্মবিরোধ ঘটে, যখন হৃদয়ের এক তারের সংগে আর এক তারের অসামঞ্জস্যের বেসুর কর্কশ হইয়া উঠে তখন কেবলমাত্র বুঝাইয়া কোনো ফল পাওয়া যায় না—মজাইয়া দিতে না পারিলে দ্বন্দ্ব মিটেনা।

ব্রহ্ম যে সত্যস্বরূপ তাহা যেমন বিশ্বসত্যের মধ্যে জানি, তিনি যে জ্ঞানস্বরূপ তাহা যেমন আত্মজ্ঞানের মধ্যে বুঝিতে পারি, তেমনি তিনি যে রসস্বরূপ তাহা কেবল মাত্র ভক্তের আনন্দের মধ্যেই দেখিতে পাই।...

...কোনো বাহ্যমূর্তিতে নহে, কোনো ক্ষণকালীন কল্পনায় নহে—একেবারে মানুষের অন্তরতম আত্মার মধ্যেই সেই আনন্দরূপকে অমৃতরূপকে অখন্ড করিয়া অসন্দিগ্ধ করিয়া দেখিতেছি।

বস্তুত পরমাত্মাকে এই আত্মার মধ্যে দেখার জন্যই মানুষের চিত্ত অপেক্ষা করিতেছে। কেননা আত্মার সংগেই আত্মার স্বাভাবিক যোগ সকলের চেয়ে সত্য; সেইখানেই মানুষের গভীরতম মিল। আর সর্বত্র নানাপ্রকার বাধা। বাহিরের আচার-বিচার অনুষ্ঠান কল্পনাকাহিনীকে পরস্পরের মধ্যে পার্থক্যের অন্ত নাই; কিন্তু মানুষের আত্মায় আত্মায় এক হইয়া আছে—সেইখানেই যখন পরমাত্মাকে দেখি তখন সমস্ত মানবাত্মার মধ্যে তাঁহাকে দেখি, কোনো বিশেষ জাতিকল-সম্প্রদায়ের মধ্যে দেখি না।...

সঞ্চয়, র/১২/৫২৫-৩২

৯১। আমারে তুমি অশেষ করেছ

৭ই বৈশাখ ১৩১৯ (১৯১২)

আমারে তুমি অশেষ করেছ, এমনি লীলা তব-
ফুরায়ে ফেলে আবার ভরেছ জীবন নব নব।।
কত-যে গিরি কত-যে নদী-তীরে
বেড়ালে বহি ছোটো এ বাঁশিটিরে,
কত-যে তান বাজালে ফিরে ফিরে
কাহারে তাহা কব।।

তোমারি ওই অমৃতপরশে আমার হিয়াখানি
হারালো সীমা বিপুল হরষে, উথলি উঠে বাণী।
আমার শুধু একটি মুঠি ভরি
দিতেছ দান দিবস-বিভাবরী—
হল না সারা, কত-না যুগ ধরি
কেবলই আমি লব।।

গীতবিতান-২৮, র/৪/২০

৯২। পিতৃদেব

১৩১৯ (১৯১২, জুলাই)

...নূতন ব্রাহ্মণ হওয়ার পরে গায়ত্রীমন্ত্রটা জপ করার দিকে খুব-একটা ঝোঁক পড়িল। আমি বিশেষ যত্নে একমনে ওই মন্ত্র জপ করিবার চেষ্টা করিতাম। মন্ত্রটা এমন নহে যে সে-বয়সে উহার তাৎপর্য আমি ঠিকভাবে গ্রহণ করিতে পারি। আমার বেশ মনে আছে, আমি 'ভূর্ভুবঃ স্বঃ' এই অংশকে অবলম্বন করিয়া মনটাকে খুব করিয়া প্রসারিত করিতে চেষ্টা করিতাম। কী বুঝিতাম, কী ভাবিতাম তাহা স্পষ্ট করিয়া বলা কঠিন, কিন্তু ইহা নিশ্চয় যে, কথার মানে বোঝাটাই মানুষের পক্ষে সকলের চেয়ে বড়ো জিনিস নয়।...

...গায়ত্রী মন্ত্রের কোনো তাৎপর্য আমি সে-বয়সে যে বুঝিতাম তাহা নহে, কিন্তু মানুষের অন্তরের মধ্যে এমন কিছু-একটা আছে সম্পূর্ণ না বুঝিলেও যাহার চলে। তাই আমার একদিনের কথা মনে পড়ে—আমাদের পড়িবার ঘরে শানবাঁধানো মেজের এক কোণে বসিয়া গায়ত্রী জপ করিতে করিতে সহসা আমার দুই চোখ ভরিয়া কেবলই জল পড়িতে লাগিল। জল কেন পড়িতেছে তাহা আমি নিজে কিছুমাত্রই বুঝিতে পারিলাম না। অতএব, কঠিন পরীক্ষকের হাতে পড়িলে আমি মূঢ়ের মতো এমন কোনো-একটা কারণ বলিতাম গায়ত্রীমন্ত্রের সংগে যাহার কোনই যোগ নাই। আসল কথা, অন্তরের অন্তঃপুরে যে-কাজ চলিতেছে বুদ্ধির ক্ষেত্রে সকল সময়ে তাহার খবর আসিয়া পৌঁছায় না।

জীবনস্মৃতি, র/১০/৩৭-৩৯

৯৩। সত্য হওয়া

১৩১৯ (১৯১২)

বিশ্বচরাচরকে যিনি সত্য করে বিরাজ করছেন তাঁকেই একেবারে সহজে জানব এই আকাঙ্ক্ষাটি মানুষের আত্মার মধ্যে গোচরে ও অগোচরে কাজ করছে, এই কথাটি নিয়ে সেদিন আলোচনা করা গিয়েছিল।

কিন্তু, এই প্রশ্ন মনে উদয় হয়, যিনি সকলের চেয়ে সত্য, যাঁর মধ্যে আমরা আছি, তাঁকে নিতান্ত সহজেই কেন না বুঝি—তাঁকে জানবার জন্যে নিয়ত এত সাধনা, এত ডাকাডাকি কেন?

যার মধ্যে আছি তার মধ্যেই সহজ হয়ে ওঠবার জন্যে যে কঠিন চেষ্টার প্রয়োজন হয় তার একটি দৃষ্টান্ত আমাদের সকলেরই জানা আছে—এখানে তারই উল্লেখ করব।

মাতার গর্ভে ভ্রূণ অচেতন হয়ে থাকে। মাতার দেহ থেকে সে রস গ্রহণ করে, তাতে তাকে কোনো চেষ্টা করতে হয় না। মায়ের স্বাস্থ্যেই তার স্বাস্থ্য, মায়ের পোষণেই তার পোষণ, মায়ের প্রাণেই তার প্রাণ।

যখন সে ভূমিষ্ঠ হয় তখন সে নিশ্চেষ্টতা থেকে একেবারে সচেষ্টতার ক্ষেত্রে এসে পড়ে। এখানে আলোক অজস্র, আকাশ উন্মুক্ত, এখানে সে কোনো আবরণের মধ্যে আবদ্ধ থাকে না। কিন্তু, তবু এই মুক্ত-আকাশ প্রশস্ত পৃথিবীতে বাস করেও এই মুক্তির মধ্যে সঞ্চরণের সহজ অধিকার সে একেবারেই পায় না। অনেকদিন পর্যন্ত সে চলতে পারে না, বলতে পারে না। তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মধ্যে, তার হৃদয়ে মনে যে শক্তি আছে, যে-সমস্ত শক্তির দ্বারা সে এই পৃথিবীর মধ্যে সহজ হয়ে উঠবে, তাকে অশ্রান্ত চালনা করে অনেক দিনে তবে সে মানুষ হয়ে ওঠে।

ভূমিষ্ঠ শিশু গর্ভবাস থেকে মুক্তি পেয়েছে বটে, তবু অনেক দিন পর্যন্ত গর্ভের সংস্কার তার ঘোচে না। সে চোখ বুজে নিশ্চল হয়ে পড়ে থাকে, নিদ্রিত অবস্থাতেই তার অধিকাংশ সময় কাটে।

কিন্তু, জড়ত্বের এই-সমস্ত লক্ষণ দেখেও তবু আমরা জানি সে চেতনার ক্ষেত্রে বাস করছে, জানি তার এই নিশ্চেষ্ট চিরকালের সত্য নয়। এখনও যদিচ সে চোখ বুজে কাটায় তবু সে যে আলোকের ক্ষেত্রে জন্মগ্রহণ করেছে এ কথা সত্য, এবং এই সত্যটি ক্রমশই তার দৃষ্টিশক্তিকে পূর্ণতররূপে অধিকার করতে থাকবে।...

মানুষের মধ্যে আত্মা মুক্তির ক্ষেত্রে জন্মগ্রহণ করেছে। পশুর চিত্ত বিশ্বপ্রকৃতির গর্ভে আবৃত। সে প্রাকৃতিক সংস্কারের আবরণে আচ্ছন্ন হয়ে অনায়াসে কাজ করে যাচ্ছে। সমস্ত প্রকৃতির চেষ্টা তার মধ্যে চেষ্টারূপে কাজ করছে। ভ্রূণের মতো সে কেবল নিচ্ছে, কেবল বাড়ছে, আপনার প্রাণকে কেবল পোষণ করছে। এমনি করে বিশ্বের মধ্যে মিলিত হয়ে সে চলছে বলে ভ্রূণের মতো আপনাকে সে আপনি জানে না।

. মানুষের আত্মা প্রকৃতির এই গর্ভ থেকে অধ্যাত্মলোকে জন্মেছে। সে প্রকৃতির সঙ্গে জড়িত হয়ে প্রকৃতির ভিতর থেকে কেবল অন্ধভাবে প্রবৃত্তির তাড়নায় সঞ্চয় করতে

থাকবে, এ আর হতেই পারে না। এখন, সে কর্তা—এখন সে সৃষ্টি করবে, আপনাকে দান করবে।

মানুষের আত্মা মুক্তিক্ষেত্রে জন্মেছে যদিচ এই কথাটাই সত্য, তবু একেবারেই এর সম্পূর্ণ প্রমাণ আমরা পাচ্ছি নে। প্রকৃতির গর্ভবাসের মধ্যে বদ্ধ অবস্থার যে সংস্কার তা সে এই মুক্তলোকের মধ্যে এসেও একেবারে কাটিয়ে উঠতে পারছে না। আত্মশক্তির সাধনার দ্বারাই সচেষ্টভাবে সে যে আপনাকে এবং জগৎকে অধিকার করবার জন্যে প্রস্তুত হয়ে এসেছে, এ কথা এখনও তাকে দেখে স্পষ্ট অনুভব করা যায় না—এখনও সে যেন প্রবৃত্তির নাড়ির দ্বারা প্রকৃতি থেকে রস শোষণ করে কেবল জড়ভাবে আপনাকে পুষ্ট করতে থাকবে এমনি তার ভাব; আপনার মধ্যে তার আপনার যে একটি সত্য আশ্রয় আছে এখনও তার উপরে নির্ভর দৃঢ় হয় নি, এইজন্যে প্রকৃতিকেই সে প্রাণপণে আঁকড়ে ধরে আছে; এইজন্যেই শিশুর মতোই সে সব জিনিসকে মুঠোয় নিতে এবং মুখে পুরতে চায়; জানে না জ্ঞানের দ্বারা সকল জিনিসকে নির্লিপ্তভাবে অথচ পূর্ণতরভাবে গ্রহণ করবার দিন তার এসেছে। এখনও সে সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করতে পারছে না যে, শক্তিকে মুক্ত করে দেওয়ার দ্বারাই সে আপনাকে পাবে; আপনাকে ত্যাগ করার দ্বারা, দান করার দ্বারাই সে আপনাকে পূর্ণভাবে সপ্রমাণ করবে—সত্যের মধ্যেই তার যথার্থ স্থিতি, সংসার ও বিষয়ের গর্ভের মধ্যে নয়—সেই সত্যের মধ্যে তার ক্ষয় নেই, তার ভয় নেই—আপনাকে নিঃসংকোচে শেষ পর্যন্ত উৎসর্গ করে দিয়ে এই অমর সত্যকে প্রকাশ করবার পরম সুযোগ হচ্ছে মানবজন্ম, এ কথাটাকে এখনও সে নিঃসংশয়ে, গ্রহণ করতে পারছে না।

মানুষের মধ্যে এই দুর্বল দ্বিধা দেখেই একদল দীনচিত্ত লোক মানুষের মাহাত্ম্যকে অবিশ্বাস করে—মানুষের আত্মাকে তারা দেখতে পায় না; তারা ক্ষুধাতৃষ্ণানিদ্রাতুর অহংটাকেই চরম বলে জানে, অন্যটাকে কল্পনা বলে স্থির করে।...

...সমস্ত গ্রহনক্ষত্র, সমস্ত উদ্ভিদ্ পশুপক্ষী মানুষের লোকালয়ের দিকে কান পেতে রয়েছে। আমরা মানুষ হয়ে জন্মে মানুষের চিত্ত দিয়ে তাঁর অমৃতরস আস্বাদন করে কণ্ঠে তাঁকে সমস্ত আকাশে ঘোষণা করে দেব, এরই জন্যে বিশ্বপ্রকৃতি যুগ যুগান্তর ধরে তার সভা রচনা করছে। বিশ্বের সমস্ত অণুপরমাণু এই সুরের স্পন্দনে পুলকিত হবার জন্যে অপেক্ষা করছে। এখনই তোমরা জেগে ওঠো, এখনই তোমরা তাঁকে : এই বনের গাছপালার মধ্যে তার মাধুর্য শিউরে উঠতে থাকবে, এই তোমাদের সামনেকার পৃথিবীর মাটির মধ্যে আনন্দ সঞ্চারিত হতে থাকবে।

মানুষের আত্মা মুক্তিলোকে আনন্দলোকে জন্মগ্রহণ করবে বলে বিশ্বের অনেক দিন ধরে চন্দ্র সূর্য তারার মঙ্গলপ্রদীপ জ্বালানো রয়েছে। যেমনি বিজাত মুক্ত আত্মার প্রাণচেষ্টার ক্রন্দনধ্বনি সমস্ত ক্রন্দসীকে পরিপূর্ণ করে উচ্ছ্বসিত অমনি লোকে লোকান্তরে আনন্দশঙ্খ বেজে উঠবে। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সেই প্রত্যাশাকে পূরণ করাবার জন্যই মানুষ। নিজের উদরপূরণ এবং স্বার্থসাধনের জন্য নয়। কথা প্রত্যহ মনে রেখে নিখিল জগতের সাধনকে আমরা আপনার সাধনা করে নেব।

আমরা সত্যকে প্রত্যক্ষ দেখব জানব, সত্যে সঞ্চরণ করব এবং অসংকোচে ঘোষণা করব 'তুমিই সত্য'।

শান্তিনিকেতন, র/১২/৪৩১-৩৪

৯৪। প্রভাতসংগীত

১৩১৯ (১৯১২)

...একদিন জোড়াসাঁকোর বাড়ির ছাদের উপর অপরাহ্নের শেষে বেড়াইতেছিলাম। দিবাবসানের ম্লানিমার উপরে সূর্যাস্তের আভাটি জড়িত হইয়া সেদিনকার আসন্ন সন্ধ্যা আমার কাছে বিশেষভাবে মনোহর হইয়া প্রকাশ পাইয়াছিল। পাশের বাড়ির দেয়ালগুলো পর্যন্ত আমার কাছে সুন্দর হইয়া উঠিল। আমি মনে মনে ভাবিতে লাগিলাম, পরিচিত জগতের উপর হইতে এই যে তুচ্ছতার আবরণ একেবারে উঠিয়া গেল এ কি কেবলমাত্র সায়াহ্নের আলোকসম্পাতের একটি জাদু মাত্র। কখনোই তা নয়। আমি বেশ দেখিতে পাইলাম, ইহার আসল কারণটি এই যে, সন্ধ্যা আমারই মধ্যে আসিয়াছে, আমিই ঢাকা পড়িয়াছি। দিনের আলোতে আমিই যখন অত্যন্ত উগ্র হইয়া ছিলাম তখন যাহা-কিছুকেই দেখিতে শুনিতে ছিলাম সমস্তকে আমিই জড়িত করিয়া আবৃত করিয়াছি। এখন সেই আমি সরিয়া আসিয়াছি বলিয়াই জগৎকে তাহার নিজের স্বরূপে দেখিতেছি। সে-স্বরূপ কখনোই তুচ্ছ নহে—তাহা আনন্দময়, সুন্দর। তাহার পর আমি মাঝে মাঝে ইচ্ছাপূর্বক নিজেকে যেন সরাইয়া ফেলিয়া জগৎকে দর্শকের মতো দেখিতে চেষ্টা করিতাম, তখন মনটা খুশি হইয়া উঠিত। আমার মনে আছে, জগৎটাকে কেমন করিয়া দেখিলে যে ঠিকমত দেখা যায় এবং সেইসংগে নিজের ভার লাঘব হয়, সেই কথা একদিন বাড়ির কোনো আত্মীয়াকে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছিলাম—কিছুমাত্র কৃতকার্য হই নাই, তাহা জানি। এমন সময়ে আমার জীবনের একটা অভিজ্ঞতা লাভ করিলাম, তাহা আজ পর্যন্ত ভুলিতে পারি নাই।

সদর স্ট্রীটের রাস্তাটা যেখানে গিয়া শেষ হইয়াছে সেইখানে বোধ করি ফ্রি-স্কুলের বাগানের গাছ দেখা যায়। একদিন সকালে বারান্দায় দাঁড়াইয়া আমি সেইদিকে চাহিলাম। তখন সেই গাছগুলির পল্লবান্তরাল হইতে সূর্যোদয় হইতেছিল। চাহিয়া থাকিতে থাকিতে হঠাৎ এক মুহূর্তের মধ্যে আমার চোখের উপর হইতে যেন একটা পর্দা সরিয়া গেল। দেখিলাম, একটি অপরূপ মহিমায় বিশ্বসংসার সমাচ্ছন্ন, আনন্দে এবং সৌন্দর্যে সর্বত্রই তরঙ্গিত। আমার হৃদয়ে স্তরে স্তরে যে-একটা বিষাদের আচ্ছাদন ছিল তাহা এক নিমেষেই ভেদ করিয়া আমার সমস্ত ভিতরটাকে বিশ্বের আলোক একেবারে বিচ্ছুরিত হইয়া পড়িল। সেইদিনই 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' কবিতাটি নির্ঝরের মতোই যেন উৎসারিত হইয়া বহিয়া চলিল। লেখা শেষ হইয়া গেল, কিন্তু জগতের সেই আনন্দরূপের উপর

তখনো যবনিকা পড়িয়া গেল না। এমনি হইল আমার কাছে তখন কেহই এবং কিছুই অপ্রিয় রহিল না।...

জীবনস্মৃতি, র/১০/৯৯-১০০

৯৫। তোমায় আমায় মিলন হবে

১৫ পৌষ, ১৩২০

তোমায় আমায় মিলন হবে বলে আলোয় আকাশ ভরা।
তোমায় আমায় মিলন হবে বলে ফুল্ল শ্যামল ধরা।।
তোমায় আমায় মিলন হবে বলে
রাত্রি জাগে জগৎ লয়ে কোলে,
ঊষা এসে পূর্বদুয়ার খোলে কলকণ্ঠস্বরা।।
চলছে ভেসে মিলন-আশা-তরী অনাদিস্রোত বেয়ে।
কত কালের কুসুম উঠে ভরি বরণডালি ছেয়ে।
তোমায় আমায় মিলন হবে বলে
যুগে যুগে বিশ্বভুবনতলে
পরান আমার বধূর বেশে চলে চিরস্বয়ম্বরা।।

গীতবিতান, র/৪/১৪

তুলনীয় প্রসঙ্গ: আমার মিলন লাগি (৭৪), তাই তোমার আনন্দ আমার পর (৮৩)

৯৬। ছোটো ও বড়ো

১১ মাঘ ১৩২০ (১৯১৪)

...অনন্তের মধ্যে দূরের দিক এবং নিকটের দিক দুইই আছে; মানুষ সেই দূর ও নিকটের সামঞ্জস্যকে যে পরিমাণে নষ্ট করেছে সেই পরিমাণে ধর্ম যে কেবল তার পক্ষে অসম্পূর্ণ হয়েছে তা নয়, তা অকল্যাণ হয়েছে। এইজন্যই মানুষ ধর্মের দোহাই দিয়ে সংসারে যত দারুণ বিভীষিকার সৃষ্টি করেছে এমন সংসারবুদ্ধির দোহাই দিয়ে নয়। আজ পর্যন্ত ধর্মের নামে কত নরবলি হয়েছে এবং কত নরবলি হচ্ছে তার আর সীমাসংখ্যা নেই। যে বলি কেবলমাত্র মানুষের প্রাণের বলি নয়, বুদ্ধির বলি, দয়ার বলি, প্রেমের বলি। আজ পর্যন্ত কত দেবমন্দিরে মানুষ আপনার সত্যকে ত্যাগ করেছে, আপনার মঙ্গলকে

ত্যাগ করেছে এবং কুৎসিতকে বরণ করেছে। মানুষ ধর্মের নাম করেই নিজেদের কৃত্রিম গন্ডির বাইরের মানুষকে ঘৃণা করবার নিত্য অধিকার দাবি করেছে। মানুষ যখন হিংসাকে, আপনার প্রকৃতির রক্তপায়ী কুকুরটাকে, একেবারে সম্পূর্ণ শিকল কেটে ছেড়ে দিয়েছে তখন নির্লজ্জভাবে ধর্মকে আপন সহায় বলে আহ্বান করেছে; মানুষ যখন বড়ো বড়ো দস্যুবৃত্তি করে পৃথিবীকে সন্ত্রস্ত করেছে তখন আপনার দেবতাকে পূজার লোভ দেখিয়ে দলপতির পদে নিয়োগ করেছে বলে কল্পনা করেছে; কৃপণ যেমন করে আপনার টাকার থলি লুকিয়ে রাখে তেমনি করে আজও আমরা আমাদের ভগবানকে আপনার সম্প্রদায়ের লোহার সিন্দুকে তালা বন্ধ করে রেখেছি বলে আরাম বোধ করি এবং মনে করি, যারা আমাদের দলের নামটুকু ধারণ না করেছে তারা ঈশ্বরের ত্যাজ্যপুত্ররূপে কল্যাণের অধিকার হতে বঞ্চিত। মানুষ ধর্মের দোহাই দিয়েই এই কথা বলেছে—এই সংসারে বিধাতার প্রবঞ্চনা, মানবজন্মটাই পাপ, আমরা ভারবাহী বলদের মতো হয় কোনো পূর্বপিতামহের নয় নিজের জন্মজন্মান্তরের পাপের বোঝা বহে নিয়ে অন্তহীন পথে চলেছি। ধর্মের নামেই অকারণ ভয়ে মানুষ পীড়িত হয়েছে এবং অদ্ভুত মূঢ়তায় আপনাকে ইচ্ছাপূর্বক অন্ধ করে রেখেছে।

কিন্তু, তবু এই-সমস্ত বিকৃতি ও ব্যর্থতার ভিতর দিয়েও ধর্মের সত্যরূপ নিত্যরূপ ব্যক্ত হয়ে উঠছে। বিদ্রোহী মানুষ সমূলে তাকে ছেদন করবার চেষ্টা করে কেবল তার বাধাগুলিকেই ছেদন করছে। অবশেষে এই কথা মানুষের উপলব্ধি করবার সময় এসেছে যে, অসীমের আরাধনা মনুষ্যত্বের কোনো অঙ্গের উচ্ছেদ-সাধন নয়, মনুষ্যত্বের পরিপূর্ণ পরিণতি। অনন্তকে একই কালে এক দিকে আনন্দের দ্বারা অন্য দিকে তপস্যার দ্বারা উপলব্ধি করতে হবে; কেবলই রসে মজে থাকতে হবে না, জ্ঞানে বুঝতে হবে, কর্মে পেতে হবে; তাঁকে আমার মধ্যে যেমন আনতে হবে তেমনি আমার শক্তিকে তাঁর মধ্যে প্রেরণ করতে হবে। সেই অনন্ত-স্বরূপের সম্বন্ধে মানুষ এক দিকে বলেছে আনন্দ হতেই তিনি যা-কিছু সমস্ত সৃষ্টি করছেন, আবার আর-এক দিকে বলেছে: স তপোহতপ্যত। তিনি তপস্যা দ্বারা যা-কিছু সমস্ত সৃষ্টি করছেন। এ দুইই একই কালে সত্য। তিনি আনন্দ হতে সৃষ্টিকে উৎসারিত করছেন, তিনি তপস্যা দ্বারা সৃষ্টিকে কালের ক্ষেত্রে প্রসারিত করে নিয়ে চলেছেন। একই কালে তাঁকে তাঁর সেই আনন্দ এবং তাঁর সেই প্রকাশের দিক থেকে গ্রহণ না করলে আমরা চাঁদ ধরছি কল্পনা করে কেবল আকাশ ধরবার চেষ্টা করব।...

আমার সমস্ত সীমার মধ্যে সীমার অতীত সেই অচেনাকে ক্ষণে ক্ষণে জানতে পারছি, সেই অসীমকেই আমার করতে পারবার জন্যে প্রাণের ব্যাকুলতা—।

আমি কোথায় পাব তারে
আমার মনের মানুষ যে রে!

অসীমের মধ্যে যে একটি ছন্দ দূর ও নিকট-রূপে আন্দোলিত, যা বিরাট হৃৎস্পন্দনের মতো চৈতন্যধারাকে বিশ্বের সর্বত্র প্রেরণ ও সর্বত্র হতে অসীমের অভিমুখে আকর্ষণ করছে, এই গানের মধ্যে সেই ছন্দের দোলাটুকু রয়ে গেছে।

অনন্তস্বরূপ ব্রহ্ম অন্য জগতের অন্য জীবের সঙ্গে আপনাকে কী সম্বন্ধে বেঁধেছেন

তা জানবার কোনো উ ায় আমাদের নেই, কিন্তু এইটুকু মনে ভিতরে জেনেছি যে মানুষের তিনি মনের মানুষ। তিনিই মানুষকে পাগল করে পথে বের করে দিলেন, তাকে স্থির হয়ে ঘুমিয়ে থাকতে দিলেন না। কিন্তু, সেই মনের মানুষ তো আমার এই সামান্য মানুষটি নয়; তাঁকে তো কাপড় পরিয়ে, আহার করিয়ে, শয্যায় শুইয়ে, ভোগের সামগ্রী দিয়ে ভুলিয়ে রাখবার নয়। তিনি আমার মনের মানুষ বটে, কিন্তু তবু দুই হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলতে হচ্ছে—

আমার মনের মানুষ কে রে!
আমি কোথায় পাব তারে!

সে যে কে তা তো আপনাকে কোনো সহজ অভ্যাসের মধ্যে স্থূল রকম করে ভুলিয়ে রাখলে জানতে পারব না—তাকে জ্ঞানের সাধনায় জানতে হবে; সে জানা কেবলই জানা, সে জানা কোনোখানে এসে বদ্ধ হবে না। 'কোথায় পাব তারে?' কোনো বিশেষ নির্দিষ্ট স্থানে কোনো বিশেষ অনুষ্ঠানের মধ্যে তো পাওয়া যাবে না—স্বার্থবন্ধন মোচন করতে করতে, মঙ্গলকে সাধন করতে করতেই তাকে পাওয়া—আপনাকে নিয়ত দানের দ্বারাই তাকে নিয়ত পাওয়া।...

...মানুষের যে পরম নমস্কারটির তার যাত্রাপথের দুই ধারে তার নানা কল্যাণকীর্তির মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়ে চলেছে, সেই সমগ্র মানবের সমস্ত কালের চিরসাধনার নমস্কারটিকে আজ আমাদের উৎসবদেবতার চরণে নিবেদন করতে এসেছি। সে নমস্কার পরমানন্দের নমস্কার, সে নমস্কার পরম দুঃখের নমস্কার। নমঃ সম্ভবায় চ ময়োভবায় চ। নমঃ শিবায় চ শিবতরায় চ। তুমি সুখরূপে আনন্দকর, তোমাকে নমস্কার। তুমি দুঃখরূপে কল্যাণকর, তোমাকে নমস্কার।...

শান্তিনিকেতন র/১২/৪৫৫-৬৫

তুলনীয় প্রসঙ্গ : আত্মবোধ (১০৯)

৯৭। আকাশে দুই হাতে প্রেম

মে ১৯১৪

আকাশে	দুই হাতে প্রেম বিলায় ও কে!
সে সুধা	গড়িয়ে গেল লোকে লোকে।।
গাছেরা	ভরে নিল সবুজ পাতায়,
ধরণী	ধরে নিল আপন মাথায়।
ফুলেরা	সকল গায়ে নিল মেখে,
পাখিরা	পাখায় তারে নিল এঁকে।
ছেলেরা	কুড়িয়ে নিল মায়ের বুকে,

মায়েরা দেখে নিল ছেলের মুখে।
সে যে ওই দুঃখশিখায় উঠল জ্বলে,
সে যে ওই অশ্রুধারায় পড়ল গলে।।
সে যে ওই বিদীর্ণ বীর-হৃদয় হতে
বহিল মরণরূপী জীবন স্রোতে।
সে যে ওই ভাঙাগড়ার তালে তালে
নেচে যায় দেশে দেশে কালে কালে।।

গীতবিতান, র/৪/১১৪

টীকা :

এই গানটি গীতিমাল্যেও এই একই পাঠে পাওয়া যাচ্ছে, কিন্তু গীতবিতানে গানটি কিছু ভিন্নপাঠে পাওয়া যায়।

৯৮। খৃষ্টধর্ম

২৫ ডিসেম্বর ১৯১৪ (১৩০৭)

সম্প্রদায় এই বলে অহংকার করে যে সত্য আর-সকলকে ত্যাগ করে তাকেই আশ্রয় করেছে। সেই অহংকারে সে সত্যের মর্যাদা যতই ভোলে নিজের বাহ্যরূপকে ততই পল্লবিত করতে থাকে। ধনের অহংকার ধনীর যতই বাড়ে ধনেরই আড়ম্বর তার ততই বিস্তৃত হয়, মনুষ্যত্বের গৌরব তার ততই খর্ব হয়ে যায়।

বিষয়ীলোক বিষয়কে নিয়ে অহংকার করে তাতে ক্ষতি হয় না; কারণ, বিষয়কে আপনার মধ্যে বদ্ধ রাখাই তার লক্ষ্য। কিন্তু সম্প্রদায় যখন তার সত্যটিকে আপন অহংকারের বিষয় করে তোলে, তখন সেই সত্য সে দান করতে এলে অন্যের পক্ষে তা গ্রহণ করা কঠিন হয়।

খৃষ্টান খৃষ্টধর্মকে নিয়ে যখনই অহংকার করে তখনই বুঝতে পারি তার মধ্যে এমন খাদ মিশিয়েছে যা তার ধর্ম নয়, যা তার আপনি। এই জন্যে সে যখন দাতাবৃত্তি করতে আসে তখন তার হাত থেকে ভিক্ষুকের মতো সত্যকে গ্রহণ করতে আমরা লজ্জা বোধ করি। অহংকারের প্রতিঘাতে অহংকার জেগে ওঠে—এবং যে অহংকার অহংকৃতের দানগ্রহণে কুণ্ঠিত সে নিন্দনীয় নয়।

এই জন্যেই মানুষকে সাম্প্রদায়িক খৃষ্টানের হাত থেকে খৃষ্টকে, সাম্প্রদায়িক বৈষ্ণবের হাত থেকে বিষ্ণুকে, সাম্প্রদায়িক ব্রাহ্মের হাত থেকে ব্রহ্মকে উদ্ধার করে নেবার জন্যে বিশেষ ভাবে সাধনা করতে হয়।

আমাদের আশ্রমে আমরা সম্প্রদায়ের উপর রাগ করে সত্যের সংগে বিরোধ করব না। আমরা খৃষ্টধর্মের মর্মকথা গ্রহণ করবার চেষ্টা করব—খৃষ্টানের জিনিস বলে নয়, মানবের জিনিস বলে।

বেদে ঈশ্বরের একটি নাম 'আবিঃ'; অর্থাৎ, আর্বিভাবেই তাঁর স্বভাব, সৃষ্টিতে তিনি আপনাকে প্রকাশ করছেন সেই তাঁর ধর্ম। ভারতবর্ষের ঋষিরা দেখেছেন, জলে স্থলে শূন্যে সেই তাঁর নিরন্তর আনন্দধারা।

বন্ধ ঘরে কেরোসিন জ্বলছে, সমস্ত রাত সেখানে অনেকে মিলে ঘুমোচ্ছে, দূষিত বাষ্পে ঘর ভরা—তখন যদি দরজা জানলা খুলে দিয়ে বন্ধ-আকাশকে অসীম-আকাশের সঙ্গে যুক্ত করা যায় তা হলে সমস্ত সঞ্চিত তাপ এবং গ্লানি তখনি দূর হয়ে যায়। তেমনি আপনার বন্ধ চিত্তকে ভূর্লোকে ভুবর্লোকে স্বর্লোকে পরম চৈতন্যের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করে দিলেই তার চারি 'দিকের পাপসঞ্চয় সহজেই বিলীন হয়—এই মুক্তির সাধনা ভারতবর্ষের।

ভারতবর্ষ যেমন ব্রহ্মের প্রকাশকে সর্বত্র উপলব্ধি করে আপন চৈতন্যকে সর্বত্র ব্যাপ্ত করবার সাধনা করেছে, তেমনি ঈশ্বরের যে প্রকাশ মানবে সেইটির মধ্যে বিশেষভাবে আপন অনুভূতি প্রীতি ও চেষ্টাকে ব্যাপ্ত করার প্রতি খৃষ্টধর্মের লক্ষ্য।

বিশ্বে তাঁর প্রকাশ সরল, কিন্তু মানুষের মধ্যে প্রকাশে বিরোধ আছে। কারণ, সেখানে ইচ্ছার মধ্যে ইচ্ছার প্রকাশ। যতক্ষণ না প্রেম জাগে ততক্ষণ এই ইচ্ছা পরম-ইচ্ছাকে বাধা দিতে থাকে।

অভাব হতে জীব দুঃখ পায়, কিন্তু এই বিরোধ হতে মানুষের অকল্যাণ। দুঃখ পশুও পায়, কিন্তু এই অকল্যাণ বিশেষ ভাবে মানুষের। যে অংশে মানুষ পশু সে অংশে অভাবের দুঃখ তাকে কষ্ট দেয়, যে অংশে মানুষ মানুষ সে অংশে অকল্যাণের আঘাত তার অন্য সকল আঘাতের চেয়ে বেশি। তাই মানুষের পশু অংশ বলে, 'সঞ্চয় করে করে আমি অভাবের দুঃখ দূর করব'; মানুষের মানুষ অংশ বলে, 'ত্যাগ করে করে আমার ক্ষুদ্র ইচ্ছাকে পরম ইচ্ছায় উৎসর্গ করব—বাসনাকে দগ্ধ করে প্রেমে সমুজ্জ্বল করে তুলব। সেই প্রেমই আমার মধ্যে পরম-ইচ্ছার পূর্ণ প্রকাশ।'

সকল দুঃখের চেয়ে বড়ো দুঃখ মানুষের এই যে, তার বড়ো তার ছোটোর দ্বারা নিত্য পীড়া পাচ্ছে। এই তার পাপ। সে আপনার মধ্যে আপনার সেই বড়োকে প্রকাশ করতে পাচ্ছে না, সেই বাধাই তার কলুষ।

অন্নবস্ত্রের ক্লেশ সহ্য করা সহজ। কিন্তু আপনার ভিতরে আপনার সেই বড়ো কষ্ট পাচ্ছেন প্রকাশের অভাবে, এ কি মানুষ সইতে পারে? মানুষের ইতিহাসে এত যুদ্ধ কেন? কিসের খেদে উন্মত্ত হয়ে মানুষ আপন শতবৎসরের পুরাতন ব্যবস্থাকে ধূলিসাৎ করে দিয়ে আবার নূতন সৃষ্টিতে প্রবৃত্ত হয়? তার কান্না এই যে, আমার ছোটো আমার বড়োকে ঠেকিয়ে রাখছে।

এই ব্যথা যখন মানুষের মধ্যে এত সত্য তখন নিশ্চয়ই তার ঔষধ আছে। সে ঔষধ কোনো স্নানে পানে, বাহ্যিক কোনো আচারে অনুষ্ঠানে নয়। মানুষের মধ্যে ভূমার প্রকাশ যে কেমন করে বাধাহীন হতে পারে, যাঁরা মহামানুষ তাঁরা আপন জীবনের মধ্যে দিয়ে তাই দেখিয়ে দিয়ে গেছেন।

তাঁরা এই একটি আশ্চর্য ব্যাপার দেখিয়েছেন যে, মানুষ আপনার চেয়ে আপনি বড়ো; সেইজন্যে মানুষ মৃত্যুকে দুঃখকে ক্ষতিকে অগ্রাহ্য করতে পারে। এ যদি ক্ষণে ক্ষণে

নিদারুণ স্পষ্টরূপে দেখতে না পেতুম তা হলে ক্ষুদ্র মানুষের মধ্যে যে বিরাট রয়েছেন এ কথা বিশ্বাস করতুম কেমন করে?

মানুষের সেই বড়োর সঙ্গে মানুষের ছোটোর নিয়ত সংঘাতে যে দুঃখ জন্মাচ্ছে সেই দুঃখ পান করছেন কে? সেই বড়ো, সেই শিব। রাগ কাকে মারছে? চিরদিন ক্ষমা যে করে তার উপরেই সমস্ত মার গিয়ে পড়ছে। লোভ কার ধন হরণ করছে? যে কেবলই ক্ষতিস্বীকার করে এবং চোরাই মাল ফিরে আসবে বলে ধৈর্যের সঙ্গে অপেক্ষা করতে থাকে। পাপ কাকে কাঁদাতে চায়? যার প্রেমের অবধি নেই, পাপ যে তাকেই কাঁদাচ্ছে।

এ যে আমরা চারি দিকে প্রত্যক্ষ দেখি। দুর্বৃত্ত সন্তান অন্য সকলকে যে আঘাত দেয় সেই আঘাতে আপন মাকেই সকলের চেয়ে ব্যথিত করে, তাই তো দুষ্প্রবৃত্তির পাপ এতই বিষম। অকল্যাণের দুঃখ জগতের সকল দুঃখের বাড়া: কেননা, সেই দুঃখে যিনি কাঁদছেন তিনি যে বড়ো, তিনি যে প্রেম। খৃষ্টধর্ম জানাচ্ছে, সেই পরমব্যথিতই মানুষের ভিতরকার ভগবান।

এই কথাটা বিশেষ কোনো ঐতিহাসিক কাহিনীর সঙ্গে জড়িয়ে বিশেষ দেশকাল-পাত্রের মধ্যে ক্ষুদ্র করে দেখলে সত্যকে তার আপন গৃহ থেকে নির্বাসিত করে কারাশৃঙ্খলে বেঁধে মারবার চেষ্টা করা হবে।

আসল সত্য এই যে, আমার মধ্যে যিনি বড়ো, যিনি আমার হাতে চিরদিন দুঃখ পেয়ে আসছেন, তিনি বলছেন, 'জগতের সমস্ত পাপ আমাকেই মারে, কিন্তু আমাকে মারতে পারে না। আজ পর্যন্ত সব চেয়ে বড়ো চোর কি সব ধন হরণ করতে পেরেছে? মানুষের পরম সম্পদের কি ক্ষয় হল? বিশ্বাসঘাতক আছে, কিন্তু সংসারে বিশ্বাস মরে নি। হিংসক আছে, কিন্তু ক্ষমাকে সে মারতে পারলে না।'

সেই বড়ো যিনি, তিনি তাঁর বেদনায় অমর। কিন্তু সেই ব্যথাই যদি চরম সত্য হত তা হলে কি রক্ষা ছিল? বড়োর মধ্যে আনন্দের অমৃত আছে বলেই তো বেদনা সহ্য হল। ছোটো কি লেশমাত্র ব্যথা সইতে পারে? সে কি তিলমাত্র কিছু ছাড়তে পারে? কেন পারে না? তার আছে কী যে পারবে? তার প্রেম কোথায়, আনন্দ কোথায়?

আমরা তো ভারে ভারে কলুষ এনে জমাচ্ছি। যে বড়ো সে ক্রমাগত তাই ক্ষালন করছে—আপন রক্ত দিয়ে, দুঃখ দিয়ে, অশ্রু দিয়ে। প্রতিদিন এই হচ্ছে ঘরে ঘরে। বড়ো বলছেন, 'আমায় মারো, মারো, মারো! তোমার মার আমি ছাড়া আর কেউ সইবে না।' তখন আমরা কেঁদে বলছি, 'তোমাকে আর মারব না—তুমি যে আমার চেয়ে বেশি। তোমার প্রকাশে ধুলো দিয়েছি—অশ্রুজলে সব ধোব। আজ হতে বসলুম তোমার আসনে, তোমার দুঃখ আমি বইব। তুমি নাও, নাও, নাও, আমার সব নাও। তুমি ভালোবেসেছ, আমিও বাসব।' এমনি করে তবে বিরোধ মেটে। তিনি যখন শাস্তি নেন তখন সেই শাস্তির দারুণ দুঃখ আর সহ্য হয় না, তবেই তো পাপের মূল মরে; নরকদণ্ডে তো মরে না।

যিনি বড়ো তিনি যে প্রেমিক। ছোটোকে নিয়ে তাঁর প্রেমের সাধ্যসাধনা। আকাশের আলো দিয়ে, পৃথিবীর লক্ষ্মীশ্রী দিয়ে, মানুষের প্রেমের সম্বন্ধের মধ্য দিয়ে তিনি আমাকে সাধছেন। আপনার সেই বড়োটিকে দেখে মন মুগ্ধ হয়েছে বলেই কবি কবিতা লিখেছে, শিল্পী কারু রচনা করেছে, কর্মী কর্মে আপনাকে ঢেলে দিয়েছে। মানুষের সকল রচনা এই

বলেছে—'তোমার মতো এমন সুন্দর আর দেখলুম না। ক্ষুধা লোভ কাম ক্রোধ এ-যে সব কালো—কিন্তু তুমি কী সুন্দর, কী পবিত্র তুমি, তুমি আমার।'

মানুষের মধ্যে মানুষের এই-যে বড়োর আবির্ভাব, যিনি মানুষের হাতের সমস্ত আঘাত সহ্য করছেন এবং যাঁর সেই বেদনা মানুষের পাপের একেবারে মূলে গিয়ে বাজছে—এই আবির্ভাব তো ইতিহাসের বিশেষ কোনো একটি প্রান্তে নয়। সেই মানুষের দেবতা মানুষের অন্তরেই তাঁরই সঙ্গে বিরোধেই মানুষের পাপ, তাঁরই সঙ্গে যোগেই মানুষের পাপের নিবৃত্তি। মানুষের সেই বড়ো, নিয়ত আপনার প্রাণ উৎসর্গ করে মানুষের ছোটোকে প্রাণদান করছেন।

রূপকের আকারে এই সত্য খৃষ্টধর্মে প্রকাশ হচ্ছে।

খৃষ্ট, র/১১/৫১১-১৩

তুলনীয় প্রসঙ্গ :
যিশুচরিত(৭৫), খৃষ্টোৎসব (১১৮)

৯৯। আমার ভাঙা পথের

১৫ ফাল্গুন ১৩২০ (১৯১৪)

আমার ভাঙা পথের রাঙা ধুলায় পড়েছে কার পায়ের চিহ্ন!
তারি গলার মালা হতে পাপড়ি হোথা লুটায় ছিন্ন।।
এল যখন সাড়াটি নাই, গেল চলে জানালো তাই—
এমন করে আমারে হায় কে বা কাঁদায় সে জন ভিন্ন।

তখন তরুণ ছিল অরুণ আলো, পথটি ছিল কুসুমকীর্ণ।
বসন্ত যে রঙিন বেশে ধরায় সে দিন অবতীর্ণ।
সে দিন খবর মিলল না যে, রইনু বসে ঘরের মাঝে—
আজকে পথে বাহির হব বহি আমার জীবন জীর্ণ।।

গীতবিতান, র/৪/১৭৪-৭৫

পাঁচ। 'আপনি আমার কোন্‌খানে' : সহজের সাধনা

১০০। জানি নাই গো সাধন

চৈত্র ১৩২০ (১৯১৪)

জানি নাই গো সাধন তোমার বলে কারে।
আমি ধূলায় বসে খেলেছি এই
তোমার দ্বারে।।
অবোধ আমি ছিলেম বলে যেমন খুশি এলেম চলে,
ভয় করি নি তোমায় আমি অন্ধকারে।।
তোমার জ্ঞানী আমায় বলে কঠিন তিরস্কারে,
'পথ দিয়ে তুই আসিস নি যে, ফিরে যা রে।'
ফেরার পন্থা বন্ধ করে আপনি বাঁধো বাহুর ডোরে,
ওরা আমায় মিথ্যা ডাকে বারে বারে।।

গীতবিতান, র/৪/৯৪

বিষয়-সংকেত : বাউল-ভাবনা—মন্ত্রবর্জিত

তুলনীয় প্রসঙ্গ : ওরা অন্ত্যজ ওরা মন্ত্রবর্জিত (১৫৫), আমার প্রাণের মানুষ আছে (৮৫), আমি তারেই জানি (১৪৮), আমি তারেই খুঁজে বেড়াই (১১৫), আমি কান পেতে রই (১১৬), আমার হিয়ার মাঝে (১০১)

১০১। আমার হিয়ার মাঝে

২৫ চৈত্র ১৩২০, (১৯১৪)

আমার হিয়ার মাঝে লুকিয়ে ছিলে দেখতে আমি পাই নি।
তোমায় দেখতে আমি পাই নি।
বাহির-পানে চোখ মেলেছি, আমার হৃদয়-পানে চাই নি।।
আমার সকল ভালোবাসায় সকল আঘাত সকল আশায়
তুমি ছিলে আমার কাছে, তোমার কাছে যাই নি।।
তুমি মোর আনন্দ হয়ে ছিলে আমার খেলায়—
আনন্দে তাই ভুলেছিলাম, কেটেছে দিন হেলায়।
গোপন রহি গভীর প্রাণে আমার দুঃখসুখের গানে
সুর দিয়েছ তুমি, আমি তোমার গান তো গাই নি।।

গীতবিতান , র/৪/১৯

তুলনীয় প্রসঙ্গ : আমি কান পেতে রই (১১৬), আমি তারেই খুঁজে বেড়াই (১১৫), আমি তারেই জানি (১৪৮), আমার প্রাণের মানুষ (৮৫)

১০২ । তার অন্ত নাই গো

বৈশাখ ১৩২১

তার অন্ত নাই গো যে আনন্দে গড়া আমার অঙ্গ।
তার অণু-পরমাণু পেল কত আলোর সঙ্গ,
ও তার অন্ত নাই গো নাই।

তারে মোহনমন্ত্র দিয়ে গেছে কত ফুলের গন্ধ,
তারে দোলা দিয়ে দুলিয়ে গেছে কত ঢেউয়ের ছন্দ,
ও তার অন্ত নাই গো নাই।

আছে কত সুরের সোহাগ যে তার স্তরে স্তরে লগ্ন,
সে যে কত রঙের রসধারায় কতই হল মগ্ন,
ও তার অন্ত নাই গো নাই।

কত শুকতারা যে স্বপ্নে তাহার রেখে গেছে স্পর্শ,
কত বসন্ত যে ঢেলেছে তায় অকারণের হর্ষ,
ও তার অন্ত নাই গো নাই।

সে যে প্রাণ পেয়েছে পান করে যুগ-যুগান্তরের স্তন্য
ভুবন কত তীর্থজলের ধারায় করেছে তায় ধন্য,
ও তার অন্ত নাই গো নাই।

সে যে সঙ্গিনী মোর, আমারে সে দিয়েছে বরমাল্য।
আমি ধন্য, সে মোর অঙ্গনে যে কত প্রদীপ জ্বালল –
ও তার অন্ত নাই গো নাই।।

গীতবিতান, র/৪/১০০

১০৩ । এই তো তোমার আলোকধেনু

১০ই জৈষ্ঠ ১৩২১(১৯১৪)

এই তো তোমার আলোকধেনু সূর্য তারা দলে দলে –
কোথায় বসে বাজাও বেণু, চরাও মহাগগনতলে।।
তৃণের সারি তুলছে মাথা, তরুর শাখে শ্যামল পাতা –
আলোয়-চরা ধেনু এরা ভিড় করেছে ফুলে ফলে।।
সকালবেলা দূরে দূরে উড়িয়ে ধূলি কোথায় ছোটে,
আঁধার হলে সাঁজের সুরে ফিরিয়ে আন আপন গোঠে।
আশা তৃষা আমার যত ঘুরে বেড়ায় কোথায় কত –

মোর জীবনের রাখাল ওগো, ডাক দেবে কি সন্ধ্যা হলে।।

গীতবিতান, র/৪/১৫৯

১০৪। মা মা হিংসীঃ

২০শে শ্রাবণ ১৩২১ (১৯১৪)

মানুষের সকল প্রার্থনার মধ্যে এই-যে একটি প্রার্থনা দেশে দেশে কালে কালে চলে এসেছে 'মা মা হিংসী :', 'আমাকে বিনাশ কোরো না, আমাকে মৃত্যু থেকে রক্ষা করো'—এ এক আশ্চর্য ব্যাপার। যে শারীরিক মৃত্যু তার নিশ্চিত ঘটবে তার থেকে রক্ষা পাবার জন্য মানুষ প্রার্থনা করতে পারে না, কারণ এমন অনর্থক প্রার্থনা করে তার কোনো লাভ নেই। সে জানে মৃত্যুর চেয়ে সুনিশ্চিত সত্য আর নেই, দৈহিক জীবনের বিনাশ একদিন-না-একদিন ঘটবেই। এ বিষয়ে তার মনে কোনো সন্দেহ নেই।

কিন্তু, সে যখন বলেছে 'আমাকে বিনাশ কোরো না', তখন সে যে কী বলতে চেয়েছে তা তার অন্তরের দিকে চেয়ে দেখলেই বেশ বোঝা যায়। এমন যদি হত যে তার শরীর চিরকাল বাঁচত, তা হলেও সেই বিনাশ থেকে তাকে কেউ রক্ষা করতে পারত না। কারণ, সে যে প্রতি মুহূর্তের বিনাশ। সে যে কত রকমের মৃত্যু-একটার পর একটা আমাদের জীবনের উপরে আসছে। ক্ষুদ্র কালে বদ্ধ হয়ে বাইরের সুখদুঃখের আঘাতে ক্রমাগত খণ্ডিত বিক্ষিপ্ত হয়ে যে জীবন আমরা বহন করছি এতে যে প্রতিদিনই আমরা মরছি। যে গণ্ডি দিয়ে আমরা জীবনকে ঘিরে রাখতে চেষ্টা করি তারই মধ্যে জীবন কত মরা মরছে—কত প্রেম কত বন্ধুত্ব মরছে—কত ইচ্ছা কত আশা মরছে—এই ক্রমাগত মৃত্যুর আঘাতে সমস্ত জীবন ব্যথিত হয়েউঠেছে।

জীবনের মধ্যে এই মৃত্যুর ব্যথা যে আমাদের ভোগ করতে হয় তার কারণ হচ্ছে আমরা দুই জায়গায় আছি। আমরা তাঁর মধ্যেও আছি, সংসারের মধ্যেও আছি। আমাদের এক দিকে অনন্ত, অন্য দিকে সান্ত। সেইজন্যে মানুষ এই কথাই ভাবছে, কী করলে এই দুই দিককেই সে সত্য করতে পারে। আমাদের এই সংসারের পিতা, যিনি এই পার্থিব জীবনের সূত্রপাত করে দিয়েছেন, তাঁকে শুধু পিতা বলে আমাদের অন্তরের তৃপ্তি নেই। কারণ, আমরা যে জানি যে, এই শারীরিক জীবন একদিন ফুরিয়ে যাবে। আমরা তাই সেই আর-একজন পিতাকে ডাকছি যিনি কেবলমাত্র পার্থিব জীবনের নয়, কিন্তু চিরজীবনের পিতা। যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ ক্ষুদ্র বিষয় নিয়ে মরছে ততক্ষণ পর্যন্ত দুঃখের পর দুঃখ, আঘাতের পর আঘাত তার উপর আসবেই আসবে কে তাকে রক্ষা করবে! কিন্তু, যেমনি সে তার সমস্ত দুঃখ-আঘাতের মধ্যে সেই অমৃতলোকের আশ্বাস পায় অমনি তার এই প্রার্থনা আর সকল প্রার্থনাকে ছাড়িয়ে ওঠে: মা মা হিংসী :। আমাকে বাঁচাও বাঁচাও!...

যে প্রেমের মধ্যে সমস্ত জগতে মানুষ আপনার সত্য স্থানটিকে পায়, সমস্ত মানুষের সঙ্গে তার সত্য সম্বন্ধ স্থাপিত হয়, সেই পরম প্রেমটিকে না পেলে মানুষকে কে বেদনা ও আঘাত থেকে রক্ষা করতে পারে! তখন তার উপর আঘাত নানা দিক থেকে ক্রমাগতই আসবে, পাপের দহন তাকে দগ্ধ করে মারবে।...

সমস্ত য়ুরোপে আজ এক মহাযুদ্ধের ঝড় উঠেছে—কত দিন ধরে গোপনে গোপনে এই ঝড়ের আয়োজন চলছিল্। অনেক দিন থেকে আপনার মধ্যে আপনাকে যে মানুষ কঠিন করে বদ্ধ করেছে, আপনার জাতীয় অহমিকাকে প্রচন্ড করে তুলেছে, তার সেই অবরুদ্ধতা আপনাকেই আপনি একদিন বিদীর্ণ করবেই করবে।...

আজ অপ্রেমঝঞ্ঝার মধ্যে, রক্তস্রোতের মধ্যে, এই বাণী সমস্ত মানুষের ক্রন্দন-ধ্বনির মধ্যে জেগে উঠেছে। এই বাণী হাহাকার করতে করতে আকাশকে বিদীর্ণ করে বয়ে চলেছে। সমস্ত মানবজাতিকে বাঁচাও! আমাকে বাঁচাও! এই বাণী যুদ্ধের গর্জনের মধ্যে মুখরিত হয়ে আকাশকে বিদীর্ণ করে দিয়েছে।

স্বার্থের বন্ধনে জর্জর হয়ে, রিপুর আঘাতে আহত হয়ে, এই-যে আমরা প্রত্যেকে পাশের লোককে আঘাত করছি ও আঘাত পাচ্ছি—সেই প্রত্যেক আমির ক্রন্দনধ্বনির একটা ভয়ানক বিশ্বযজ্ঞের মধ্যে সকল মানুষের প্রার্থনা–রূপে রক্তস্রোতে গর্জিত হয়ে উঠেছে। মা মা হিংসী ঃ মরছে মানুষ, বাঁচাও তাকে। নইলে ভূলুণ্ঠিত হয়ে মৃত্যুর মধ্যে যে নমস্কার করতে হয় সেই মৃত্যু থেকে বাঁচাও। দেশদেশান্তরে তোমার যত যত সন্তান আছে, হে পিতা, তুমি প্রেমে ভক্তিতে কল্যাণে সকলকে একত্র করো তোমার চরণতলে। নমস্কার সর্বত্র ব্যাপ্ত হোক। দেশ থেকে দেশান্তরে, জাতি থেকে জাতিতে ব্যাপ্ত হোক। বিশ্বানি দুরিতানি পরাসুব। বিশ্বপাপের যে মূর্তি আজ রক্তবর্ণে দেখা দিয়েছে সেই বিশ্বপাপকে দূর করো। মা মা হিংসী ঃ। বিনাশ থেকে রক্ষা করো।

শান্তিনিকেতন, র/১২/৪৯৫-৯৭

১০৫। আগুনের পরশমণি ছোঁয়াও

১১ই ভাদ্র ১৩২১ (১৯১৪)

আগুনের পরশমণি ছোঁয়াও প্রাণে।
এ জীবন পুণ্য করো দহন-দানে।।
আমার এই দেহখানি তুলে ধরো,
তোমার ওই দেবালয়ের প্রদীপ করো –
নিশিদিন আলোক-শিখা জ্বলুক গানে।।
আঁধারের গায়ে গায়ে পরশ তব
সারা রাত ফোটাক তারা নব নব।
নয়নের দৃষ্টি হতে ঘুচবে কালো,
যেখানে পড়বে সেথায় দেখবে আলো -
ব্যথা মোর উঠবে জ্বলে ঊর্ধ্ব-পানে।।

গীতবিতান, র/৪/৭২

১০৬। বিশ্বজোড়া ফাঁদ পেতেছ

১৯শে আশ্বিন ১৩২১ (১৯১৪)

বিশ্বজোড়া ফাঁদ পেতেছ, কেমনে দিই ফাঁকি!
আধেক ধরা পড়েছি গো, আধেক আছে বাকি।।
কেন জানি আপনা ভুলে বারেক হৃদয় যায় যে খুলে,
বারেক তারে ঢাকি।।

বাহির আমার শুক্তি যেন কঠিন আবরণ –
অন্তরে মোর তোমার লাগি একটি কান্না-ধন।
হৃদয় বলে তোমার দিকে রইবে চেয়ে অনিমিখে,
চায় না কেন আঁখি।।

গীতবিতান, র/৪/৬৪

১০৭। অন্ধকারের উৎস হতে

আশ্বিন ১৩২১ (১৯১৪)

অন্ধকারের উৎস হতে উৎসারিত আলো
সেই তো তোমার আলো!
সকল দ্বন্দ্ববিরোধ-মাঝে জাগ্রত যে ভালো
সেই তো তোমার ভালো।।

পথের ধুলায় বক্ষ পেতে রয়েছে যেই গেহ
সেই তো তোমার গেহ।
সমরঘাতে অমর করে রুদ্রনিঠুর স্নেহ
সেই তো তোমার স্নেহ।।

সব ফুরালে বাকি রহে অদৃশ্য যেই দান
সেই তো তোমার দান।
মৃত্যু আপন পাত্রে ভরি বহিছে যেই প্রাণ
সেই তো তোমার প্রাণ।
বিশ্বজনের পায়ের তলে ধুলিময় যে ভূমি
সেই তো স্বর্গভূমি।
সবায় নিয়ে সবার মাঝে লুকিয়ে আছ তুমি
সেই তো আমার তুমি।।

গীতবিতান, র/৪/১১৩

তুলনীয় প্রসঙ্গ ঃ মনুষ্যত্ব (২২), দুঃখ (৩২), বক্ষে তোমার বাজে বাঁশি (৭৬), এই করেছো ভালো (৭৮)

১০৮। সকল জনম ভরে

পঞ্চকের গান, অচলায়তন (১৯১২)

সকল জনম ভরে ও মোর দরদিয়া,
কাঁদি কাঁদাই তোরে ও মোর দরদিয়া,
আছ হৃদয়-মাঝে
সেথা কতই ব্যথা বাজে,
ওগো এ কি তোমায় সাজে
ও মোর দরদিয়া।।

এই দুয়ার-দেওয়া ঘরে
কভু আঁধার নাহি সরে,
তবু আছ তারি 'পরে
ও মোর দরদিয়া।
সেথা আসন হয় নি পাতা,
সেথা মালা হয় নি গাঁথা,
আমার লজ্জাতে হেঁট মাথা
ও মোর দরদিয়া।।

গীতবিতান, র/৪/৫৬-৭

১০৯। আত্মবোধ

আনুমানিক ১৯১৪

কয়েক দিন হল পল্লীগ্রামে কোনো বিশেষ সম্প্রদায়ের দুইজন বাউলের সঙ্গে আমার দেখা হয়। আমি তাদের জিজ্ঞাসা করলুম, 'তোমাদের ধর্মের বিশেষত্বটি কী আমাকে বলতে পারো?' একজন বললে, 'বলা বড়ো কঠিন, ঠিক বলা যায় না।' আর-একজন বললে 'বলা যায় বইকি—কথাটা সহজ। আমরা বলি এই যে, গুরুর উপদেশে গোড়ায় আপনাকে জানতে হয়। যখন আপনাকে জানি তখন সেই আপনার মধ্যে তাঁকে পাওয়া যায়।'...

মানুষ অন্নবস্ত্রের চেয়ে গভীর প্রয়োজনের জন্যে পথে বেরিয়ে পড়েছে। কী সেই প্রয়োজন? তপোবনে ভারতবর্ষের ঋষি তার উত্তর দিয়েছেন, এবং বাংলাদেশের পল্লীগ্রামে বাউলও তার উত্তর দিচ্ছে। মানুষ আপনাকে পাবার জন্যে বেরিয়েছে—আপনাকে না পেলে, তার আপনার চেয়ে যিনি বড়ো আপন তাঁকে পাবার জো নেই। তাই এই আপনাকে বিশুদ্ধ করে, প্রবল করে, পরিপূর্ণ করে পাবার জন্যে মানুষ কত তপস্যা করছে।... সে এমন একটি বৃহৎ আপনাকে চাচ্ছে যে আপনি তার বর্তমানকে, তার চারি দিককে, তার প্রবৃত্তি ও বাসনাকে ছাড়িয়ে অনেক দূরে চলে গেছে।

আমাদের বৈরাগী বাংলাদেশের একটি ছোটো নদীর ধারে এক সামান্য কুটিরে বসে এই আপনির খোঁজ করছে এবং নিশ্চিন্তহাস্যে বলছে সবাইকে আসতে হবে এই আপনির খোঁজ করতে।...সে কেবলই বলছে, তোমার আপনিকেও পাও: আত্মনং বিদ্ধি।...

...জড়জগতে যেমন মানুষেও তেমনি। প্রাণশক্তি যে কী তা কেমন করে বলব। পর্দার উপর পর্দা যতই তুলব ততই অচিন্ত্য অনন্ত অনির্বচনীয়ে গিয়ে পড়ব। সেই প্রাণ এক দিকে যত বড়ো প্রকান্ড রহস্যই হোক-না কেন, আর-এক দিকে তাকে আমরা কী সহজেই বহন করছি—সে আমার আপন প্রাণ।...

...অসংখ্য বিরুদ্ধতা ও বৈচিত্র্যের মধ্যে মহাশক্তির যে অনির্বচনীয় ক্রিয়া চলছে তাই আমাদের কাছে জগৎরূপে প্রাণরূপে নিতান্ত সহজ হয়ে, আপন হয়ে, ধরা দিয়েছে; তাই আমরা কেবল যে তাদের ব্যবহার করছি তা নয়, তাদের ভালোবাসছি, তাদের কোনো মতেই ছাড়তে চাই নে। তারা আমার এতই আপন যে তাদের যদি বাদ দিতে যাই তবে আমার আমিত্ব একেবারে বস্তুশূন্য হয়ে পড়ে।...

অন্তরে বাহিরে মানুষ নানাখানা নিয়ে একেবারে উদ্‌ভ্রান্ত; তারই মাঝখানে সে আপনাকে ধরতে পারছে না, চারি দিকে সে কেবল টুকরো টুকরো হয়ে ছিটকে পড়ছে। কিন্তু আপনাকেই তার সব চেয়ে দরকার—তার যত কিছু দুঃখ তার গোড়াতেই এই আপনাকে না পাওয়া। যতক্ষণ এই আপনাকে পরিপূর্ণ করে না পাওয়া যায় ততক্ষণ কেবলই মনে হয় এটা পাই নি, ওটা পাই নি; ততক্ষণ যা কিছু পাই তাতে তৃপ্তি হয় না। কেননা, যতক্ষণ আমরা আপনাকে না পাই ততক্ষণ নিত্যভাবে আমরা কোনো জিনিসকেই পাই নে; এমন কোনো আধার থাকে না যার মধ্যে কোনো-কিছুকে স্থিরভাবে ধরে রাখতে পারি। ততক্ষণ আমরা বলি—সবই মায়া; সবই ছায়ার মতো চলে যাচ্ছে, মিলিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু, আত্মাকে যখন পাই, নিজের মধ্যে ধ্রুব এককে যখনই নিশ্চিত করে ধরতে পারি, তখনই সেই কেন্দ্রকে অবলম্বন করে চারি দিকের সমস্ত বিধৃত হয়ে আনন্দময় হয়ে ওঠে। আপনাকে যখন পাই নি তখন যা কিছু অসত্য ছিল, আপনাকে পাবামাত্রই সেই সমস্তই সত্য হয়ে ওঠে।...

...এই প্রার্থনাই মানুষের গভীরতম প্রার্থনা: আবিরাবীর্ম এধি। হে আবিঃ, হে প্রকাশ, তুমি আমার মধ্যে প্রকাশিত হও। মানুষের যা দুঃখ সে অপ্রকাশের দুঃখ—যিনি প্রকাশস্বরূপ তিনি এখনও তার মধ্যে ব্যক্ত হচ্ছেন না, তার হৃদয়ের উপর অনেকগুলো আবরণ রয়ে গেছে। এখনও তার মধ্যে বাধাবিরোধের সীমা নেই; এখনও সে আপনার প্রকৃতির নানা অংশের মধ্যে পরিপূর্ণ সামঞ্জস্য স্থাপন করতে পারছে না; এখনও তার এক ভাগ অন্য ভাগের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করছে, তার স্বার্থের সঙ্গে পরমার্থের মিল হচ্ছে না; এই উচ্ছৃঙ্খলতার মধ্যে যিনি আবিঃ তাঁর আবির্ভাব পরিস্ফুট হয়ে উঠছে না।...

এত বাধা বিরোধ, এত অসত্য, এত জড়তা, এত পাপ কাটিয়ে উঠে তবে ভক্তের মধ্যে ভগবানের প্রকাশ সম্পূর্ণ হয়। জড়জগতে তাঁর প্রকাশের যে বাধা নেই তা নয়—কারণ বাধা না হলে প্রকাশ হতেই পারে না। জড়জগতে তাঁর নিয়মই তাঁর শক্তিকে বাধা দিয়ে তাকে প্রকাশ করে তুলছে, এই নিয়মকে তিনি স্বীকার করেছেন। আমাদের চিত্তজগতে

যেখানে তাঁর প্রেমের মিলনকে তিনি প্রকাশ করবেন সেখানে সেই প্রকাশের বাধাকে তিনি স্বীকার করেছেন, সে হচ্ছে আমাদের স্বাধীন ইচ্ছা। এই বাধার ভিতর দিয়ে যখন প্রকাশ সম্পূর্ণ হয়—যখন ইচ্ছার সঙ্গে ইচ্ছা, প্রেমের সঙ্গে প্রেম, আনন্দের সঙ্গে আনন্দ মিলে যায়—তখন ভক্তের মধ্যে ভগবানের এমন একটি আবির্ভাব হয় যা আর কোথাও হতে পারে না।...

তুমি আমার হৃদয়ের ভিতরেই ছিলে; কিন্তু বিচ্ছেদ হয়েছে। সেই বিচ্ছেদ মিটিয়ে আবার ফিরে এসো, সমস্ত দুঃখের পথটা মাড়িয়ে আবার আমাতে ফিরে এসো—হৃদয়ের সঙ্গে হৃদয়ের মিলন সম্পূর্ণ হোক।...

আমি তোমার মধ্য থেকে এসেছি কেন যে তা জানি নে, কিন্তু হে ঈশ্বর, তুমি যেমন তেমনিই আছ; এই-যে একবার তোমা থেকে বেরিয়ে আবার যুগযুগান্তের মধ্য দিয়ে তোমাতেই ফিরে আসা, এই হচ্ছে তোমার অসীম হৃদয়ের এক-একটি হৃৎস্পন্দন।...

শান্তিনিকেতন, র/১২/৩৯৩-৪০৬

বিষয়-সংকেত :

নানা বিরুদ্ধতার মধ্যে যে সামঞ্জস্য সেইখানেই ঈশ্বরের প্রকাশ সত্য। সামঞ্জস্য থেকে বেরিয়ে নানাভাবে বিচ্ছেদ মিটিয়ে আবার আমরা সেই সামঞ্জস্যে ফিরে আসি।

তুলনীয় প্রসঙ্গ : ছোটো ও বড়ো (৯৬)

১৯০। রসের ধর্ম

আনুমানিক ১৯১৪

আমাদের ধর্মসাধনার দুটো দিক আছে—একটা শক্তির দিক , একটা রসের দিক। পৃথিবী যেমন জলে স্থলে বিভক্ত এও ঠিক তেমনি।

শক্তির দিক হচ্ছে বলিষ্ঠ বিশ্বাস। এ বিশ্বাস জ্ঞানের সামগ্রী নয়। ঈশ্বর আছেন, এইটুকুমাত্র বিশ্বাস করাকে বিশ্বাস বলি নে। আমি যার কথা বলছি এই বিশ্বাস সমস্ত চিত্তের একটি অবস্থা; এ একটি অবিচলিত ভরসার ভাব। মন এতে ধ্রুব হয়ে অবস্থিতি করে—আপনাকে সে কোনো অবস্থায় নিরাশ্রয় নিঃসহায় মনে করে না।

এই বিশ্বাস জিনিসটি পৃথিবীর মতো দৃঢ়। এ একটি নিশ্চিত আধার। এর মধ্যে মস্ত একটি জোর আছে।

যার মধ্যে এই বিশ্বাসের বল নেই, অর্থাৎ যার চিত্তে এই ধ্রুব স্থিতিতত্ত্বটির অভাব আছে, সে ব্যক্তি সংসারে ক্ষণে ক্ষণে যা-কিছুকে হাতে পায় তাকে অত্যন্ত প্রাণপণ চেষ্টায় আঁকড়ে ধরে।...আর, যে ব্যক্তির পায়ের নিচে সুদৃঢ় মাটি আছে তারও হাঁড়িকলসির প্রয়োজন আছে, কিন্তু হাঁড়িকলসি তার জীবনের অবলম্বন নয়—এগুলো

যদি কেউ কেড়ে নেয় তা হলে তার যতই অভাব অসুবিধা হোক-না সে ডুবে মরবে না।

এইজন্যে দৃঢ়বিশ্বাসী লোকের কাজকর্মে জোর আছে, কিন্তু উদ্‌বেগ নেই। সে মনের মধ্যে নিশ্চয় অনুভব করে তার একটা দাঁড়াবার জায়গা আছে, পৌঁছবার স্থান আছে। প্রত্যক্ষ ফল সে না দেখতে পেলেও সে মনে মনে জানে, ফল থেকে সে বঞ্চিত হয় নি—বিরুদ্ধ ফল পেলেও সেই বিরুদ্ধতাকে সে একান্ত করে দেখে না, তার ভিতর থেকেও একটি সার্থকতার প্রত্যয় মনে থাকে। একটি অত্যন্ত বড়ো জায়গায় চিত্তের দৃঢ় নির্ভরতা, এই জায়গাটিকে ধ্রুবসত্য বলে অত্যন্ত স্পষ্টভাবে উপলব্ধি করা—এই হচ্ছে সেই বিশ্বাস যে মাটির উপরে আমাদের ধর্মসাধনা প্রতিষ্ঠিত।

এই বিশ্বাসটির মূলে একটি উপলব্ধি আছে। সেটি হচ্ছে এই যে, ঈশ্বর সত্য।

...তিনি আছেন, তিনি আমার হয়েই আছেন, সকল দেশে সকল কালেই তিনি আছেন এবং তিনি আমারই আছেন—জীবনে যত উলট-পালটই হোক, এই সত্যটি থেকে কেউ আমাকে কিছুমাত্র বঞ্চিত করতে পারবে না, এমন জোর এমন ভরসা যার আছে সেই হচ্ছে বিশ্বাসী। তিনি আছেন এই সত্যের উপরেই সে বিশ্রাম করে এবং তিনি আছেন এই সত্যের উপরেই সে কাজ করে।

কিন্তু ঈশ্বর যে কেবল সত্যরূপে সকলকে দৃঢ় করে ধারণ করে রেখেছেন, সকলকে আশ্রয় দিয়েছেন, এই কথাটিই সম্পূর্ণ কথা নয়।

এই জীবনধাত্রী পৃথিবী খুব শক্ত বটে—এর ভিত্তি অনেক পাথরের স্তর দিয়ে গড়া। এই কঠিন দৃঢ়তা না থাকলে এর উপরে আমরা এমন নিঃসংশয়ে ভর দিতে পারতুম না। কিন্তু এই কাঠিন্যই যদি পৃথিবীর চরম রূপ হত, তা হলে তো এ একটি প্রস্তরময় ভয়ংকর মরুভূমি হয়ে থাকত।

এর সমস্ত কাঠিন্যের উপরে একটি রসের বিকাশ আছে—সেইটেই এর চরম পরিণতি। সেটি কোমল, সেটি সুন্দর, সেটি বিচিত্র। সেইখানেই নৃত্য, সেইখানেই গান, সেইখানেই সাজসজ্জা। পৃথিবীর সার্থক রূপটি এইখানেই প্রকাশ পেয়েছে।

অর্থাৎ, নিত্যস্থিতির উপরে একটি নিত্যগতির লীলা না থাকলে তার সম্পূর্ণতা নেই। পৃথিবীর ধাতুপাথরের অচল ভিত্তির সর্বোচ্চ তলায় এই গতির প্রবাহ চলেছে, প্রাণের প্রবাহ, যৌবনের প্রবাহ, সৌন্দর্যের প্রবাহ—তার চলাফেরা আসাযাওয়া মেলামেশার আর অন্ত নেই।

রস জিনিসটি সচল। সে কঠিন নয় বলে, নম্র বলে, সর্বত্র তার একটি সঞ্চার আছে। এইজন্যেই সে বৈচিত্র্যের মধ্যে হিল্লোলিত হয়ে উঠে জগৎকে পুলকিত করে তুলছে, এইজন্যেই কেবলই সে আপনার অপূর্বতা প্রকাশ করছে, এইজন্যেই তার নবীনতার অন্ত নেই।

এই রসটি যেখানে শুকিয়ে যায় সেখানে আবার সেই নিশ্চল কঠিনতা বেরিয়ে পড়ে, সেখানে প্রাণের ও যৌবনের নমনীয়তা কমনীয়তা চলে যায়, জরা ও মৃত্যুর যে আড়ষ্টতা তাই উৎকট হয়ে ওঠে।

আমাদের ধর্মসাধনার মধ্যেও এই রসময় গতিতত্ত্বটি না রাখলে তার সম্পূর্ণতা নেই, এমন কি, তার যেটি চরম সার্থকতা সেইটিই নষ্ট হয়।

অনেকসময় ধর্মসাধনায় দেখা যায়, কঠিনতাই প্রবল হয়ে ওঠে—তার অবিচলিত দৃঢ়তা নিষ্ঠুর শুষ্কভাবেই আপনাকে প্রকাশ করে। সে আপনার সীমার মধ্যে অত্যন্ত উদ্ধত হয়ে বসে থাকে; সে অন্যকে আঘাত করে; তার মধ্যে কোনোপ্রকার নড়াচড়া নেই, এইটে নিয়েই সে গৌরব বোধ করে; নিজের স্থানটি ছেড়ে চলে না বলে কেবল সে একটা দিক দিয়েই সমস্ত জগৎকে দেখে, এবং যারা অন্য দিকে আছে তারা কিছুই দেখছে না এবং সমস্তই ভুল দেখছে বলে কল্পনা করে। নিজের সঙ্গে অন্যের কোনোপ্রকার অনৈক্যকে এই কাঠিন্য ক্ষমা করতে জানে না; সবাইকে নিজের অচল পাথরের চারি ভিতের মধ্যে জোর করে টেনে আনতে চায়। এই কাঠিন্য মাধুর্য্যকে দুর্বলতা এবং বৈচিত্র্যকে মায়ার ইন্দ্রজাল বলে অবজ্ঞা করে এবং সমস্তকে সবলে একাকার করে দেওয়াটাকেই সমন্বয়সাধন বলে মনে করে।

কিন্তু কাঠিন্য ধর্মসাধনার অন্তরালদেশে থাকে। তার কাজ ধারণ করা, প্রকাশ করা নয়। অস্থিপঞ্জর মানবদেহের চরম পরিচয় নয়—সরস কোমল মাংসের দ্বারাই তার প্রকাশ পরিপূর্ণ হয়। সে যে পিন্ডাকারে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে না, সে যে আঘাত সহ্য করেও ভেঙে যায় না, সে যে আপনার মর্মস্থানগুলিকে সকলপ্রকার উপদ্রব থেকে রক্ষা করে, তার ভিতরকার কারণ হচ্ছে তার অস্থিকঙ্কাল। কিন্তু আপনার এই কঠোর শক্তিকে সে আচ্ছন্ন করেই রাখে এবং প্রকাশ করে আপনার রসময় প্রাণময় ভাবময় গতিভঙ্গীময় কোমল অথচ সতেজ সৌন্দর্যকে।

ধর্মসাধনারও চরম পরিচয় যেখানে তার শ্রী প্রকাশ পায়। এই শ্রী জিনিসটি রসের জিনিস। তার মধ্যে অভাবনীয় বিচিত্রতা এবং অনির্বচনীয় মাধুর্য ও তার মধ্যে নিত্য-চলনশীল প্রাণের লীলা। শুষ্কতায় অনম্রতায় তার সৌন্দর্যকে লোপ করে, তার সচলতাকে রোধ করে, তার বেদনাবোধকে অসাড় করে দেয়। ধর্মসাধনার যেখানে উৎকর্ষ সেখানে গতির বাধাহীনতা, ভাবের বৈচিত্র্য এবং অক্ষুন্ন মাধুর্যের নিত্যবিকাশ।

নম্রতা নইলে এই জিনিসটিকে পাওয়া যায় না। কিন্তু নম্রতা মানে শিক্ষিত বিনয় নয়। অর্থাৎ কঠিন লোহাকে পুড়িয়ে-পিটিয়ে তাকে ইস্পাতরূপে যে খরধার নমনীয়তা দেওয়া যায় এ সে জিনিস নয়। সরস সজীব তরুশাখার যে নম্রতা—যে নম্রতার মধ্যে ফুল ফুটে ওঠে, দক্ষিণের বাতাস নৃত্যের আন্দোলন বিস্তার করে, শ্রাবণের ধারা সংগীতে মুখরিত হয় এবং সূর্যের কিরণ ঝংকৃত সেতারের সুরগুলির মতো উৎক্ষিপ্ত হয়ে থাকে; চারি দিকের বিশ্বের নানা ছন্দ যে নম্রতার মধ্যে আপনার স্পন্দনকে বিচিত্র করে তোলে; যে নম্রতা সহজভাবে সকলের সঙ্গে আপনার যোগ স্বীকার করে, সায় দেয়, সাড়া দেয়, আঘাতকে সংগীতে পরিণত করে এবং স্বাতন্ত্র্যকে সৌন্দর্যের দ্বারা সকলের আপন করে তোলে।

এক কথায় বলতে গেলে এই নম্রতাটি রসের নম্রতা—শিক্ষার নম্রতা নয়। এই নম্রতা শুষ্ক সংযমের বোঝায় নত নয়, সরস প্রাচুর্যের দ্বারাই নত; প্রেমে ভক্তিতে আনন্দে পরিপূর্ণতায় নত।

কঠোরতা যেমন স্বভাবতই আপনাকে স্বতন্ত্র রাখে রস তেমনি স্বভাবতই অন্যের দিকে যায়। আনন্দ সহজেই নিজেকে দান করে—আনন্দের ধর্মই হচ্ছে সে আপনাকে

অন্যের মধ্যে প্রসারিত করতে চায়। কিন্তু উদ্ধত হয়ে থাকলে কিছুতেই অন্যের সঙ্গে মিল হয় না—অন্যকে চাইতে গেলেই নিজেকে নত করতে হয়—এমন কি, যে রাজা যথার্থ রাজা প্রজার কাছে তাকে নম্র হতেই হবে। রসের ঐশ্বর্যে যে লোক ধনী নম্রতাই তার প্রাচুর্যের লক্ষণ।

বিশ্বজগতের মধ্যে জগদীশ্বর কোন্‌খানে আমাদের কাছে নত ? যেখানে তিনি সুন্দর, যেখানে 'রসো বৈ সঃ'; সেখানে আনন্দকে ভাগ না করে তার চলে না; সেখানে নিজের নিয়মের জোরের উপরে কড়া হয়ে তিনি দাঁড়িয়ে থাকতে পারেন না; সেখানে সকলের মাঝখানে নেমে এসে সকলকে তাঁর ডাক দিতে হয়—সেই ডাকের মধ্যে কত করুণা, কত বেদনা, কত কোমলতা! স্নেহের আনন্দভারে দুর্বল ক্ষুদ্র শিশুর কাছে পিতামাতা যেমন নত হয়ে পড়েন জগতের ঈশ্বর তেমনি করেই আমাদের দিকে নত হয়ে পড়েছেন। এইটেই হচ্ছে আমাদের কাছে সকলের চেয়ে বড়ো কথা। তাঁর নিয়ম অটল, তাঁর শক্তি অসীম, তাঁর ঐশ্বর্য অনন্ত, এ-সব কথা আমাদের কাছে ওর চেয়ে ছোটো। তিনি নত হয়ে সুন্দর হয়ে ভাবে-ভঙ্গীতে হাসিতে-গানে রসে-গন্ধে রূপে আমাদের সকলকে নিতে এসেছেন এইটেই হচ্ছে আমাদের পক্ষে চরম কথা—তাঁর সকলের চেয়ে পরম পরিচয় হচ্ছে এইখানেই।

জগতে ঈশ্বরের এই-যে দুইটি পরিচয়, একটি অটল নিয়মে, আর-একটি সুনম্র সৌন্দর্যে—এর মধ্যে নিয়মটি আছে গুপ্ত আর সৌন্দর্যটি আছে তাকে ঢেকে। নিয়মটি এমন প্রচ্ছন্ন যে সে যে আছে তা আবিস্কার করতে মানুষের অনেক দিন লেগেছিল, কিন্তু সৌন্দর্য চিরদিন আপনাকে ধরা দিয়েছে। সৌন্দর্য মিলবে বলেই, ধরা দেবে বলেই সুন্দর। এই সৌন্দর্যের মধ্যেই, রসের মধ্যেই, মিলনের তত্ত্বটি রয়েছে।...

ধর্মান্দোলনের ইতিহাসের এইটি বরাবর দেখা গেছে, ধর্ম যখন আপনার রসের মূর্তি প্রকাশ করে তখনই সে বাঁধন ভাঙে এবং সকল মানুষকে এক করবার দিকে ধাবিত হয়। খৃষ্ট যে প্রেমভক্তিরসের বন্যাকে মুক্ত করে দিলেন তা য়িহুদিধর্মের কঠিন শাস্ত্রবন্ধনের মধ্যে নিজেকে বদ্ধ রাখতে পারলে না এবং সেই ধর্ম আজ পর্যন্ত প্রবল জাতির স্বার্থের শৃংখলকে শিথিল করবার জন্য নিয়ত চেষ্টা করছে, আজ পর্যন্ত সমস্ত সংস্কার এবং অভিমানের বাধা ভেদ করে মানুষের সংগে মানুষকে মেলাবার দিকে তার আকর্ষণশক্তি প্রয়োগ করছে।

বৌদ্ধধর্মের মূলে একটি কঠোর তত্ত্বকথা আছে, কিন্তু সেই তত্ত্বকথায় মানুষকে এক করে নি—তার মৈত্রী, তার করুণা এবং বুদ্ধদেবের বিশ্বব্যাপী হৃদয়প্রসারই মানুষের সংগে মানুষের প্রভেদ ঘুচিয়ে দিয়েছে। নানক বল, রামানন্দ বল, কবীর বল, চৈতন্য বল, সকলেই রসের আঘাতে বাঁধন ভেঙে দিয়ে সকল মানুষকে এক জায়গায় ডাক দিয়েছেন।

তাই বলছিলুম, ধর্ম যখন আচারকে নিয়মকে শাসনকে আশ্রয় করে কঠিন হয়ে ওঠে তখন সে মানুষকে বিভক্ত করে দেয়, পরস্পরের মধ্যে গতিবিধির পথকে অবরুদ্ধ করে। ধর্মে যখন রসের বর্ষা নেবে আসে তখন যে-সকল গহ্বর পরস্পরের মধ্যে ব্যবধান রচনা করেছিল তারা ভক্তির স্রোতে প্রেমের বন্যায় ভরে ওঠে এবং সেই পূর্ণতায় স্বাতন্ত্র্যের অচল সীমাগুলিই সচল হয়ে উঠে অগ্রসর হয়ে সকলকে মিলিয়ে দিতে চায়, বিপরীত

পারকে এক করে দেয় এবং দুর্লঙ্ঘ্য দূরকে আনন্দবেগে নিকট করে আনে। মানুষ যখনই সত্যভাবে গভীরভাবে মিলেছে তখন কোনো-একটি বিপুল রসের আবির্ভাবেই মিলেছে, প্রয়োজনে মেলে নি, তত্ত্বজ্ঞানে মেলে নি, আচারের শুষ্ক শাসনে মেলে নি।

ধর্মের যখন চরম লক্ষ্যই হচ্ছে ঈশ্বরের সঙ্গে মিলন-সাধন তখন সাধককে এ কথা মনে রাখতে হবে যে, কেবল বিধিবদ্ধ পূজার্চনা আচার-অনুষ্ঠান শুচিতার দ্বারা তা হতেই পারে না। এমন কি, তাতে মনকে কঠোর করে, ব্যাঘাত আনে এবং ধার্মিকতার অহংকার জাগ্রত হয়ে চিত্তকে সংকীর্ণ করে দেয়। হৃদয়ে রস থাকলে তবেই তাঁর সঙ্গে মিলন হয়, আর-কিছুতেই হয় না।

কিন্তু এই কথাটি মনে রাখতে হবে, ভক্তিরসের প্রেমরসের মধ্যে যে দিকটি সম্ভোগের দিক কেবল সেইটিকেই একান্ত করে তুললে দুর্বলতা এবং বিকার ঘটে। ওর মধ্যে একটি শক্তির দিক আছে, সেটি না থাকলে রসের দ্বারা মনুষ্যত্ব দুর্গতি-প্রাপ্ত হয়।...

রসের আবির্ভাবে মানুষের জড়ত্ব ঘুচে যায়। সুতরাং তখন সচলতা তার পক্ষে অস্বাভাবিক নয়; তখন অগ্রগামী গতিশক্তির আনন্দেই সে কর্ম করে, সর্বজয়ী প্রাণশক্তির আনন্দেই সে দুঃখকে স্বীকার করে।... এইজন্যে মানুষের ধর্মসাধনার মধ্যে যখন ভক্তির আবির্ভাব হয় তখনই সংসারে যেখানে যা-কিছু সমস্ত বজায় থেকেও মানুষের সকল সমস্যার মীমাংসা হয়ে যায়—তখন কর্মের মধ্যে সে আনন্দ ও দুঃখের মধ্যে সে গৌরব অনুভব করে; তখন কর্মই তাকে মুক্তি দেয় এবং দুঃখ তার ক্ষতির কারণ হয় না।

শান্তিনিকেতন, র/১২/৩২৮-৩৫

বিষয়-সংকেত :

আমাদের ধর্মসাধনায় একদিকে আছে শক্তি, কঠিনতা, বিশ্বাসের বল। তাকে বলি স্থিতিতত্ত্ব। অন্যদিকে আছে রস। রসে আছে গতি, বৈচিত্র্য, নবীনতা। কাঠিন্য এবং মাধুর্য দুয়ে মিলে ধর্মসাধনার সম্পূর্ণতা।

১১১। আত্মার দৃষ্টি

আনুমানিক ১৯১৪

বাল্যকালে আমার দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু আমি তা জানতুম না। আমি ভাবতুম, দেখা বুঝি এই রকমই—সকলে বুঝি এই পরিমাণেই দেখে। একদিন দৈবাৎ লীলাচ্ছলে আমার কোনো সঙ্গীর চশমা নিয়ে চোখে প'রেই দেখি, সব জিনিস স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। তখন মনে হল, আমি যেন হঠাৎ সকলের কাছে এসে পড়েছি; সমস্তকে এই যে স্পষ্ট দেখা ও কাছে পাওয়ার আনন্দ, এর দ্বারা বিশ্বভুবনকে যেন হঠাৎ দ্বিগুণ করে লাভ করলুম—অথচ এত দিন যে আমি এত লোকসান বহন করে বেড়াচ্ছি তা জানতুমই না।

এ যেমন চোখ দিয়ে কাছে আসা, তেমনি আত্মা দিয়ে কাছে আসা আছে। সেই রকম করে যারই কাছে আসি সেই আমার হাত তুলে ধরে বলে 'তুমি এসেছ'। এই-যে জল বায়ু চন্দ্র সূর্য, আমাদের পরমবন্ধু, এরা আমাদের নানা কাজ করছে, কিন্তু আমাদের হাত ধরছে না,'আনন্দিত হয়ে বলছে না 'তুমি এসেছ'। যদি তাদের তেমনি কাছে যেতে পারতুম, যদি তাদের সেই স্পর্শ সেই সম্ভাষণ লাভ করতুম, তা হলে মুহূর্তের মধ্যে বুঝতে পারতুম তাদের কৃত সমস্ত উপকারের চেয়ে এইটুকু কত বড়ো। মানুষের মধ্যে আমি চিরজীবন বাস করলুম, কিন্তু মানুষ আমাকে স্পর্শ করে বলছে না 'তুমি এসেছ'! আমি একটা আবরণের মধ্যে আবৃত হয়ে পৃথিবীতে সঞ্চরণ করছি। ডিমের মধ্যে পক্ষীশিশু যেমন পৃথিবীতে জন্মেও জন্মলাভ করে না এও সেই রকম।

এই অস্ফুট চেতনার ডিমের ভিতরে থেকে জন্মলাভই আধ্যাত্মিক জন্ম। সেই জন্মের দ্বারাই আমরা দ্বিজ হব। সেই জন্মই জগতে যথার্থরূপে জন্ম—জীবচৈতন্যের বিশ্বচৈতন্যের মধ্যে জন্ম। তখনই পক্ষীশিশু পক্ষীমাতার পক্ষপুটের সম্পূর্ণ সংস্পর্শ লাভ করে, তখনই মানুষ সর্বত্রই সেই সর্বকে প্রাপ্ত হয়। সেই প্রাপ্ত হওয়া যে কী আশ্চর্য সার্থকতা, কী অনির্বচনীয় আনন্দ তা আমরা জানি নে কিন্তু জীবনে কি ক্ষণে ক্ষণে তার আভাসমাত্রও পাই নে!

আধ্যাত্মিকতায় আমাদের আর কিছু দেয় না, আমাদের ঔদাসীন্য আমাদের অসাড়তা ঘুচিয়ে দেয়। অর্থাৎ তখনই আমরা চেতনার দ্বারা চেতনাকে, আত্মার দ্বারা আত্মাকে পাই। সেই রকম করে যখন পাই তখন আর আমাদের বুঝতে বাকি থাকে না যে সমস্তই তাঁর আনন্দরূপ।

তৃণ থেকে মানুষ পর্যন্ত জগতে যেখানেই আমার চিত্ত উদাসীন থাকে সেখানেই আমাদের আধ্যাত্মিকতা সীমাবদ্ধ হয়েছে, এটি জানতে হবে। আমাদের চেতনা আমাদের আত্মা যখন সর্বত্র প্রসারিত হয় তখন জগতের সমস্ত সত্তাকে আমাদের সত্তার দ্বারাই অনুভব করি, ইন্দ্রিয়ের দ্বারা নয়, বুদ্ধির দ্বারা নয়, বৈজ্ঞানিক যুক্তির দ্বারা নয়। সেই পরিপূর্ণ অনুভূতি একটি আশ্চর্য ব্যাপার। এই সমুখের গাছটিকেও যদি সেই সত্তারূপে গভীররূপে অনুভব করি তবে যে আমার সমস্ত সত্তা আনন্দে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে। তাই দেখি নে ব'লে একে চোখদিয়েদেখবামাত্র 'এতে, আমার কোনো প্রয়োজন নেই' ব'লে এর সম্মুখ দিয়ে চলে যাই, এই গাছের সত্যে আমার সত্যকে জাগিয়ে তুলে আমাকে আনন্দের অধিকারী করে না। মানুষকেও আমরা আত্মা দিয়ে দেখি নে—ইন্দ্রিয় দিয়ে, যুক্তি দিয়ে, স্বার্থ দিয়ে, সংসার দিয়ে, সংস্কার দিয়ে দেখি—তাকে পরিবারের মানুষ বা প্রয়োজনের মানুষ বা নিঃসম্পর্ক মানুষ বা কোনো একটা বিশেষ শ্রেণী-ভুক্ত মানুষ বলেই দেখি—সুতরাং সেই সীমাতেই গিয়ে আমার পরিচয় ঠেকে যায়, সেইখানেই দরজা রুদ্ধ, তার ভিতরে প্রবেশ করতে পারি নে—তাকেই আত্মা বলে আমার আত্মা প্রত্যক্ষভাবে সম্ভাষণ করতে পারে না। যদি পারত তবে পরস্পর হাত ধরে বলত: তুমি এসেছ!

আধ্যাত্মিক সাধনার যে চরম লক্ষ্য কী তা উপনিষদে স্পষ্ট লেখা আছে—

তে সর্বগং সর্বতঃ প্রাপ্য ধীরা
যুক্তাত্মানঃ সর্বমেবাবিশন্তি।

ধীর ব্যক্তিরা সর্বব্যাপীকে সকল দিক থেকে পেয়ে যুক্তাত্মা হয়ে সর্বত্রই প্রবেশ করেন।

এই সর্বত্র প্রবেশ করবার ক্ষমতাই শেষ ক্ষমতা। প্রবেশ করার মানেই হচ্ছে যুক্তাত্মা হওয়া। যখন সমস্ত পাপের সমস্ত অভ্যাসের সংস্কারের আবরণ থেকে মুক্ত হয়ে আমাদের আত্মা সর্বত্রই আত্মার সঙ্গে যুক্ত হয় তখনই সে সর্বত্র প্রবেশ করে। সেই আত্মায় গিয়ে না পৌঁছোলে সে দ্বারে এসে ঠেকে—সে মৃত্যুতেই আবদ্ধ হয়—অমৃতং যদ্‌বিভাতি, অমৃতরূপে যিনি সকলের মধ্যেই প্রকাশমান, সেই অমৃতের মধ্যে আত্মা পৌঁছোতে পারে না—সে আর-সমস্তই দেখে, কেবল আনন্দরূপমমৃতং দেখে না।

এই-যে আত্মা দিয়ে বিশ্বের সর্বত্র আত্মার মধ্যে প্রবেশ করা এই তো আমাদের সাধনার লক্ষ্য। প্রতিদিন এই পথেই যে আমরা চলছি এটা তো আমাদের উপলব্ধি করতে হবে। অন্ধভাবে জড়ভাবে তো এটা হবে না। চেতনভাবেই তো চেতনার বিস্তার হতে থাকবে। প্রতিদিন তো আমাদের বুঝতে হবে—একটু একটু করে আমাদের প্রবেশপথ খুলে যাচ্ছে, আমাদের অধিকার ব্যাপ্ত হচ্ছে। সকলের সঙ্গে বেশি করে মিলতে পাচ্ছি, অল্পে অল্পে সমস্ত বিরোধ কেটে যাচ্ছে—মানুষের সঙ্গে মিলনের মধ্যে, সংসারের কর্মের মধ্যে, ভূমার প্রকাশ প্রতিদিন অব্যাহত হয়ে আসছে। আমিত্ব বলে যে সুদুর্ভেদ্য আবরণ আমাকে সকলের সঙ্গে অত্যন্ত বিভক্ত করে রেখেছিল তা ধীরে ধীরে ক্ষীণ হয়ে আসছে, ক্রমেই তা স্বচ্ছ হয়ে তার ভিতর থেকে নিখিলের আলো ক্রমে ক্রমে স্ফুটতর হয়ে দেখা যাচ্ছে—আমি আমার দ্বারা কাউকে আচ্ছন্ন কাউকে বিকৃত করছি নে আমার মধ্যে অন্যের এবং অন্যের মধ্যে আমার বাধা প্রত্যহই কেটে যাচ্ছে।

শান্তিনিকেতন, ৫/১২/১৩১৪

বিষয়-সংকেত :

আধ্যাত্মিকতা আমাদের ঔদাসীন্য ঘুচিয়ে দেয়। তখন আমরা আমিত্বের আবরণ ঘুচিয়ে বিশ্বের সকলের সঙ্গে মিলতে পারি।

১১২। তোমায় নতুন করে

মার্চ ১৯১৫

তোমায় নতুন করে পাব ব'লে হারাই ক্ষণে-ক্ষণ
ও মোর ভালোবাসার ধন।
দেখা দেবে ব'লে তুমি হও যে অদর্শন
ও মোর ভালবাসার ধন।।
ওগো, তুমি আমার নও আড়ালের, তুমি আমার চিরকালের-
ক্ষণকালের লীলাস্রোতে হও যে নিমগন
ও মোর ভালবাসার ধন।।
আমি তোমায় যখন খুঁজে ফিরি ভয়ে কাঁপে মন—

প্রেমে আমার ঢেউ লাগে তখন।
তোমার শেষ নাহি, তাই শূন্য সেজে শেষ করে দাও আপনাকে যে-
ওই হাসিরে দেয় ধুয়ে মোর বিরহের রোদন
ও মোর ভালবাসার ধন।।

গীতবিতান, র/৪/১৮

১১৩। ধীরে বন্ধু, ধীরে ধীরে

প্রবাসী, ১৩২২ জ্যৈষ্ঠ (১৯১৫)

ধীরে বন্ধু, ধীরে ধীরে
চলো তোমার বিজনমন্দিরে।।
জানি নে পথ, নাই যে আলো, ভিতর বাহির কালোয় কালো,
তোমার চরণশব্দ বরণ করেছি
আজ এই অরণ্যগভীরে।।
ধীরে বন্ধু, ধীরে ধীরে
চলো অন্ধকারের তীরে তীরে।
চলব আমি নিশীথরাতে তোমার হাওয়ার ইশারাতে,
তোমার বসনগন্ধ বরণ করেছি
আজ এই বসন্তসমীরে।।

গীতবিতান, র/৪/১৮

১১৪। আত্মপরিচয়—৩

সবুজপত্র, আশ্বিন-কার্তিক ১৩২৪ (১৯১৭)

সকল মানুষেরই 'আমার ধর্ম' বলে একটা বিশেষ জিনিস আছে। কিন্তু সেইটিকেই সে স্পষ্ট করে জানে না। সে জানে আমি খৃস্টান, আমি মুসলমান, আমি বৈষ্ণব, আমি শাক্ত ইত্যাদি। কিন্তু সে নিজেকে যে ধর্মাবলম্বী বলে জন্মকাল থেকে মৃত্যুকাল পর্যন্ত নিশ্চিন্ত আছে সে হয়তো সত্য তা নয়। নাম গ্রহণেই এমন একটা আড়াল তৈরি করে দেয় যাতে নিজের ভিতরকার ধর্মটা তার নিজের চোখেও পড়ে না।

কোন্ ধর্মটি তার ? যে ধর্ম মনের ভিতরে গোপনে থেকে তাকে সৃষ্টি করে তুলছে। জীবজন্তুকে গড়ে তোলে তার অন্তর্নিহিত প্রাণধর্ম। সেই প্রাণধর্মটির কোনো খবর রাখা জন্তুর পক্ষে দরকারই নেই। মানুষের আর-একটি প্রাণ আছে, সেটা শরীরপ্রাণের চেয়ে

বড়ো—সেইটে তার মনুষ্যত্ব। এই প্রাণের ভিতরকার সৃজনীশক্তিই হচ্ছে তার ধর্ম। এইজন্যে আমাদের ভাষায় 'ধর্ম' শব্দ খুব একটা অর্থপূর্ণ শব্দ। জলের জলত্বই হচ্ছে জলের ধর্ম, আগুনের আগুনত্বই হচ্ছে আগুনের ধর্ম। তেমনি মানুষের ধর্মটিই হচ্ছে তার অন্তরতম সত্য।

মানুষের প্রত্যেকের মধ্যে সত্যের একটি বিশ্বরূপ আছে, আবার সেই সঙ্গে তার একটি বিশেষ রূপ আছে। সেইটেই হচ্ছে তার বিশেষ ধর্ম। সেইখানেই সে ব্যক্তি সংসারের বিচিত্রতা রক্ষা করছে। সৃষ্টির পক্ষে এই বিচিত্রতা বহুমূল্য সামগ্রী। এইজন্যে একে সম্পূর্ণ নষ্ট করবার শক্তি আমাদের হাতে নেই। আমি সাম্যনীতিকে যতই মানি-নে কেন, তবু অন্য-সকলের সঙ্গে আমার চেহারার বৈষম্যকে আমি কোনোমতেই লুপ্ত করতে পারি নে। তেমনি সাম্প্রদায়িক সাধারণ নাম গ্রহণ করে আমি যতই মনে করি না কেন যে, আমি সম্প্রদায়ের সকলেরই সঙ্গে সমান ধর্মের, তবু আমার অন্তর্যামী জানেন মনুষ্যত্বের মূলে আমার ধর্মের একটি বিশিষ্টতা বিরাজ করছে। সেই বিশিষ্টতাতেই আমার অন্তর্যামীর বিশেষ আনন্দ।

কিন্তু পূর্বেই বলেছি, যেটা বাইরে থেকে দেখা যায় সেটা আমার সাম্প্রদায়িক ধর্ম। সেই সাধারণ পরিচয়েই লোকসমাজে আমার ধর্মগত পরিচয়। সেটা যেন আমার মাথার উপরকার পাগড়ি।...

... কয়েক বৎসর পূর্বে একজন লেখক আমার রচিত ধর্মসংগীতের একটি সমালোচনা বের করেছিলেন। তাতে বেছে বেছে আমার কাঁচাবয়সের কয়েকটি গান দৃষ্টান্তস্বরূপ চেপে ধরে তিনি তাঁর ইচ্ছামত সিদ্ধান্ত গড়ে তুলেছিলেন। যেখানে আমি থামি নি সেখানে আমি থেমেছি এমন ভাবের একটা ফোটোগ্রাফ তুললে মানুষকে অপদস্থ করা হয়। চলতি ঘোড়ার আকাশে-পা-তোলা ছবির থেকে প্রমাণ হয় না যে, বরাবর তার পা আকাশেই তোলা ছিল এবং আকাশেই তোলা আছে।...

অবশ্য এ কথা মানতে হবে যে ধর্মতত্ত্ব সম্বন্ধে আমার যা-কিছু প্রকাশ সে হচ্ছে পথ-চল্‌তি পথিকের নোটবইয়ের টোকা কথার মতো। নিজের গম্যস্থানে পৌঁছে যাঁরা কোনো কথা বলেছেন তাঁদের কথা একেবারে সুস্পষ্ট। তাঁরা নিজের কথাকে নিজের বাইরে ধরে রেখে দেখতে পান। আমি আমার তত্ত্বকে তেমন করে নিজের থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখি নি।...

কথা উঠেছে আমার ধর্ম বাঁশির তানেই মোহিত, তার ঝোঁকটা প্রধানত শান্তির দিকেই, শক্তির দিকে নয়। এই কথাটাকে বিচার করে দেখা আমার নিজের জন্যেও দরকার।

কারো কারো পক্ষে ধর্ম জিনিসটা সংসারের রণে ভঙ্গ দিয়ে পালাবার ভদ্র পথ। নিষ্ক্রিয়তার মধ্যে এমন একটা ছুটি নেওয়া যে ছুটিতে লজ্জা নেই, এমন-কি, গৌরব আছে। অর্থাৎ, সংসার থেকে জীবন থেকে যে-যে অংশ বাদ দিলে কর্মের দায় চোকে, ধর্মের নামে সেই সমস্তকে বাদ দিয়ে একটা হাঁফ ছাড়তে পারার জায়গা পাওয়াকে কেউ কেউ ধর্মের উদ্দেশ্য মনে করেন। এঁরা হলেন বৈরাগী। আবার ভোগীর দলও আছেন। তাঁরা সংসারের কতকগুলি বিশেষ রসসম্ভোগকে আধ্যাত্মিকতার মধ্যে চোলাই করে

নিয়ে তাই পান করে জগতের আর-সমস্ত ভুলে থাকতে চান। অর্থাৎ একদল এমন-একটি শান্তি চান যে শান্তি সংসারকে বাদ দিয়ে, আর অন্যদল এমন একটি স্বর্গ চান যে স্বর্গ সংসারকে ভুলে গিয়ে। এই দুই দলই পালাবার পথকেই ধর্মের পথ বলে মনে করেন।

আবার এমন দলও আছেন যাঁরা সমস্ত সুখদুঃখ সমস্ত দ্বিধাদ্বন্দ্ব-সমেত এই সংসারকেই সত্যের মধ্যে জেনে চরিতার্থতা লাভ করাকেই ধর্ম বলে জানেন। সংসারকে সংসারের মধ্যেই ধরে দেখলে তার সেই পরম অর্থটি পাওয়া যায় না যে অর্থ তাকে সর্বত্র ওতপ্রোত করে এবং সকল দিকে অতিক্রম করে বিরাজ করছে। অতএব কোনো অংশে সত্যকে ত্যাগ করা নয় কিন্তু সর্বাংশে সেই সত্যের পরম অর্থটিকে উপলব্ধি করাকেই তাঁরা ধর্ম বলে জানেন।...

...এমন ছেলেও আছে ইস্কুলের সাধনার দুঃখকে স্বেচ্ছায়, এমন-কি, আনন্দে যে গ্রহণ করে, যেহেতু ইস্কুলের অভিপ্রায়কে সে মনের মধ্যে সত্য করে উপলব্ধি করেছে। এই অভিপ্রায়কে সত্য করে জানছে বলেই সে যে মুহূর্তে দুঃখকে পাচ্ছে সেই মুহূর্তে দুঃখকে অতিক্রম করছে, যে মুহূর্তে নিয়মকে মানছে সেই মুহূর্তে তার মন তার থেকে মুক্তিলাভ করছে। এই মুক্তিই সত্যকার মুক্তি। সাধনা থেকে এড়িয়ে গিয়ে মুক্তি হচ্ছে নিজেকে ফাঁকি দেওয়া। জ্ঞানের পরিপূর্ণতার একটি আনন্দচ্ছবি এই ছেলেটি চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছে বলেই উপস্থিত সমস্ত অসম্পূর্ণতাকে, সমস্ত দুঃখকে, সমস্ত বন্ধনকে সে সেই আনন্দেরই অন্তর্গত করে জানছে। এ ছেলের পক্ষে পালানো একেবারে অসম্ভব। তার যে আনন্দ দুঃখকে স্বীকার করে সে আনন্দ কিছু না করার চেয়ে বড়ো, সে আনন্দ খেলা করার চেয়ে বড়ো। সে আনন্দ শান্তির চেয়ে বড়ো, সে আনন্দ বাঁশির তানের চেয়ে বড়ো।

এমন কথা হচ্ছে এই যে, আমি কোন্ ধর্মকে স্বীকার করি। এখানে একটা কথা মনে রাখতে হবে, আমি যখন 'আমার ধর্ম' কথাটা ব্যবহার করি তখন তার মানে এ নয় যে আমি কোনো একটা বিশেষ ধর্মে সিদ্ধিলাভ করেছি। যে বলে আমি খৃস্টান সে যে খৃস্টের অনুরূপ হতে পেরেছে তা নয়—তার ব্যবহারে প্রত্যহ খৃস্টানধর্মের বিরুদ্ধতা বিস্তর দেখা যায়। আমার কর্ম, আমার বাক্য কখনো আমার ধর্মের বিরুদ্ধে যে চলে না এতবড়ো মিথ্যা কথা বলতে আমি চাই নে। কিন্তু প্রশ্ন এই যে, আমার ধর্মের আদর্শটি কী।

বাইরে আমার রচনার মধ্যে এর উত্তর নানা জায়গাতেই আছে। অন্তরেও যখন নিজেকে এই প্রশ্ন করি তখন আমার অন্তরাত্মা বলে -আমি তো কিছুকেই ছাড়বার পক্ষপাতী নই, কেননা সমস্তকে নিয়েই আমি সম্পূর্ণ।

আমি যে সব নিতে চাই রে—
আপনাকে ভাই মেলব যে বাইরে।

যখন কোনো অংশকে বাদ দিয়ে তবে সত্যকে সত্য বলি তখন তাকে অস্বীকার করি। সত্যের লক্ষণই এই যে, সমস্তই তার মধ্যে এসে মেলে। সেই মেলার মধ্যে আপাতত যতই অসামঞ্জস্য প্রতীয়মান হোক তার মূলে একটা গভীর সামঞ্জস্য আছে, নইলে সে আপনাকে আপনি হনন করত। অতএব, সামঞ্জস্য সত্যের ধর্ম বলে বাদসাদ দিয়ে গোঁজামিলন দিয়ে একটা ঘর-গড়া সামঞ্জস্য গড়ে তুললে সেটা সত্যকে বাধাগ্রস্ত করে তোলে। এক সময়ে মানুষ ঘরে বসে ঠিক করেছিল যে, পৃথিবী একটা পদ্মফুলের মতো—

তার কেন্দ্রস্থলে সুমেরু পর্বতটি যেন বীজকোষ—চারিদিকে এক-একটি পাপড়ির মতো এক-একটি মহাদেশ প্রসারিত। এরকম কল্পনা করবার মূল কথাটা হচ্ছে এই যে, সত্যের একটি সুষমা আছে—সেই সুষমা না থাকলে সত্য আপনাকে আপনি ধারণ করে রাখতে পারে না। এ কথাটা যথার্থ। কিন্তু এই সুষমাটা বৈষম্যকে বাদ দিয়ে নয়—বৈষম্যকে গ্রহণ করে এবং অতিক্রম করে—শিব যেমন সমুদ্রমন্থনের সমস্ত বিষকে পান করে তবে শিব। তাই সত্যের প্রতি শ্রদ্ধা করে পৃথিবীটি বস্তুত যেমন, অর্থাৎ নানা অসমান অংশে বিভক্ত, তাকে তেমনি করেই জানবার সাহস থাকা চাই। ছাঁট-দেওয়া সত্য এবং ঘর-গড়া সামঞ্জস্যের প্রতি আমার লোভ নেই। আমার লোভ আরো বেশি, তাই আমি অসামঞ্জস্যকেও ভয় করি নে।

যখন বয়স অল্প ছিল তখন নানা কারণে লোকালয়ের সংগে আমার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল না, তখন নিভৃতে বিশ্বপ্রকৃতির সংগেই ছিল আমার একান্ত যোগ। এই যোগটি সহজেই শান্তিময়, কেননা এর মধ্যে দ্বন্দ্ব নেই, বিরোধ নেই, মনের সংগে মনের—ইচ্ছার সংগে ইচ্ছার সংঘাত নেই। এই অবস্থা ঠিক শিশুকালেরই সত্য অবস্থা। তখন অন্তঃপুরের অন্তরালে শান্তি এবং মাধুর্যেরই দরকার। বীজের দরকার মাটির বুকের মধ্যে বিরাট পৃথিবীর পর্দার আড়ালে শান্তিতে রস শোষণ করা। ঝড়বৃষ্টি-রৌদ্রছায়ার ঘাতপ্রতিঘাত তখন তার জন্যে নয়। তেমনি এই বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে প্রচ্ছন্ন অবস্থায় ধর্মবোধের যে আভাস মেলে সে হচ্ছে বৃহতের আস্বাদনে। এইখানে শিশু কেবল তাঁকেই দেখে যিনি কেবল শান্তম্, তাঁরই মধ্যে বেড়ে ওঠে যিনি কেবল সত্যম্।

বিশ্বপ্রকৃতির সংগে নিজের প্রকৃতির মিলটা অনুভব করা সহজ, কেননা সে দিক থেকে কোনো চিত্ত আমাদের চিত্তকে কোথাও বাধা দেয় না। কিন্তু এই মিলটাতেই আমাদের তৃপ্তির সম্পূর্ণতা কখনোই ঘটতে পারে না। কেননা আমাদের চিত্ত আছে, সেও আপনার একটি বড়ো মিল চায়। এই মিলটা বিশ্বপ্রকৃতির ক্ষেত্রে সম্ভব নয়, বিশ্বমানবের ক্ষেত্রেই সম্ভব। সেইখানে আপনাকে ব্যাপ্ত করে আপনার বড়ো-আমির সংগে আমরা মিলতে চাই। সেইখানে আমরা আমাদের বড়ো পিতাকে, সখাকে, স্বামীকে, কর্মের নেতাকে, পথের চালককে চাই। সেইখানে কেবল আমার ছোটো-আমিকে নিয়েই যখন চলি তখন মনুষ্যত্ব পীড়িত হয়; তখন মৃত্যু ভয় দেখায়, ক্ষতি বিমর্ষ করে, তখন বর্তমান ভবিষ্যৎকে হনন করতে থাকে, দুঃখশোক এমন একান্ত হয়ে ওঠে যে তাকে অতিক্রম করে কোথাও সান্ত্বনা দেখতে পাই নে। তখন প্রাণপণে কেবলই সঞ্চয় করি, ত্যাগ করবার কোনো অর্থ দেখি নে, ছোটো ছোটো ঈর্ষাদ্বেষে মন জর্জরিত হয়ে ওঠে...

এই বড়ো-আমিকে চাওয়ার আবেগ ক্রমে আমার কবিতার মধ্যে যখন ফুটতে লাগল, অর্থাৎ অঙ্কুররূপে বীজ যখন মাটি ফুঁড়ে বাইরের আকাশে দেখা দিলে, তারই উপক্রম দেখি, 'সোনার তরী'র 'বিশ্বনৃত্যে'—

বিপুল গভীর মধুর মন্দ্রে
    কে বাজাবে সেই বাজনা।
উঠিবে চিত্ত করিয়া নৃত্য
    বিস্মৃত হবে আপনা।
টুটিবে বন্ধ, মহা আনন্দ,

নব সংগীতে নূতন ছন্দ,
হৃদয়সাগরে পূর্ণচন্দ্র
জাগাবে নবীন বাসনা।

কিন্তু এতেও বাজনার সুর। যদিও এ সুর মন্দ্র বটে, কিন্তু মধুরমন্দ্র। যাই হোক কবিতার গতিটা এখানে প্রকৃতির ধাপ থেকে মানুষের ধাপে উঠছে। বিরাটের চিন্ময়তার পরিচয় লাভ করছে।...

বিশ্বমানের ইতিহাসকে যে একজন চিন্ময় পুরুষ সমস্ত বাধাবিঘ্ন ভেদ করে দুর্গম বন্ধুর পথ দিয়ে চালনা করছেন এখানে তাঁরই কথা দেখি। এখন হতে নিরবচ্ছিন্ন শান্তির পালা শেষ হল।

কিন্তু বিরোধ বিপ্লবের ভিতর দিয়ে মানুষ যে ঐক্যটি খুঁজে বেড়াচ্ছে সেই ঐক্যটি কী। সেই হচ্ছে শিবম্। এই-যে মঙ্গল এর মধ্যে একটা মস্ত দ্বন্দ্ব। অঙ্কুর এখানে দুই ভাগ হয়ে বাড়তে চলেছে, সুখদুঃখ, ভালোমন্দ। মাটির মধ্যে যেটি ছিল সেটি এক, সেটি শান্তম্, সেখানে আলো-আঁধারের লড়াই ছিল না। লড়াই যেখানে বাধল সেখানে শিবকে যদি না জানি তবে সেখানকার সত্যকে জানা হবে না। এই শিবকে জানার বেদনা বড়ো তীব্র। এইখানে 'মহদ্‌ভয়ং বজ্রমুদ্যতম্'। কিন্তু এই বড়ো বেদনার মধ্যেই আমাদের ধর্মবোধের যথার্থ জন্ম। বিশ্বপ্রকৃতির বৃহৎ-শান্তির মধ্যে তার গর্ভবাস।...

যে শ্রেয় মানুষের আত্মাকে দুঃখের পথে দ্বন্দ্বের পথে অভয় দিয়ে এগিয়ে নিয়ে চলে সেই শ্রেয়কে আশ্রয় করেই প্রিয়কে পাবার আকাঙ্ক্ষাটি 'চিত্রা'য় 'এবার ফিরাও মোরে' কবিতাটির মধ্যে সুস্পষ্ট ব্যক্ত হয়েছে।...

এর পর থেকে বিরাটচিত্তের সঙ্গে মানবচিত্তের ঘাত-প্রতিঘাতের কথা ক্ষণে ক্ষণে আমার কবিতার মধ্যে দেখা দিতে লাগল। দুইয়ের এই সংঘাত যে কেবল আরামের, কেবল মাধুর্যের তা নয়। অশেষের দিক থেকে যে আহ্বান এসে পৌঁছয় সে তো বাঁশির ললিত সুরে নয়। তাই সেই সুরের জবাবেই আছে—

রে মোহিনী, রে নিষ্ঠুরা ওরে রক্তলোভাতুরা
কঠোর স্বামিনী,
দিন মোর দিনু তোরে শেষে নিতে চাস হরে
আমার যামিনী?
জগতে সবারি আছে সংসারসীমার কাছে
কোনোখানে শেষ,
কেন আসে মর্মচ্ছেদি সকল সমাপ্তি ভেদি
তোমার আদেশ?
বিশ্বজোড়া অন্ধকার সকলেরি আপনার
একেলার স্থান,
কোথা হতে তারো মাঝে বিদ্যুতের মতো বাজে
তোমার আহবান?

এ আহ্বান এ তো শক্তিকেই আহবান; কর্মক্ষেত্রেই এর ডাক; রস-সম্ভোগের কুঞ্জকাননে নয়—সেইজন্যেই এর শেষ উত্তর এই—

হবে, হবে, হবে জয় হে দেবী, করি নে ভয়,
হব আমি জয়ী।
তোমার আহ্বানবাণী সফল করিব রানী,
হে মহিমাময়ী।...

আমার ধর্ম আমার উপচেতন-লোকের অন্ধকারের ভিতর থেকে ক্রমে ক্রমে চেতন-লোকের আলোতে যে উঠে আসছে এই লেখাগুলি তারই স্পষ্ট ও অস্পষ্ট পায়ের চিহ্ন। সে চিহ্ন দেখলে বোঝা যায় যে, পথ সে চেনে না এবং সে জানে না ঠিক কোন্ দিকে সে যাচ্ছে। পথটা সংসারের কি অতিসংসারের তাও সে বোঝে নি। যাকে দেখতে পাচ্ছে তাকে নাম দিতে পারছে না, তাকে নানা নামে ডাকছে। যে লক্ষ্য মনে রেখে সে পা ফেলছিল বার বার, হঠাৎ আশ্চর্য হয়ে দেখছে, আর-একটা দিকে কে তাকে নিয়ে চলছে।

পদে পদে তুমি ভুলাইলে দিক,
কোথা যাব আজি নাহি পাই ঠিক,
ক্লান্তহৃদয় ভ্রান্ত পথিক
এসেছি নূতন দেশে।
কখনো উদার গিরির শিখরে
কভু বেদনার তমোগহ্বরে
চিনি না যে পথ সে পথের 'পরে
চলেছি পাগল বেশে।

এই আবছায়া রাস্তায় চলতে চলতে যে একটি বোধ কবির সামনে ক্ষণে ক্ষণে চমক দিচ্ছিল তার কথা তখনকার একটা চিঠিতে আছে, সেই চিঠির দুই-এক অংশ তুলে দিই—

কে আমাকে গভীর গম্ভীর ভাবে সমস্ত জিনিস দেখতে বলছে, কে আমাকে অভিনিবিষ্ট স্থির কর্ণে সমস্ত বিশ্বাতীত সংগীত শুনতে প্রবৃত্ত করছে, বাইরের সঙ্গে আমার সূক্ষ্ম ও প্রবলতম যোগসূত্রগুলিকে প্রতিদিন সজাগ সচেতন করে তুলছে?...

আমরা বাইরের শাস্ত্র থেকে যে ধর্ম পাই সে কখনোই আমার ধর্ম হয়ে ওঠে না। তার সঙ্গে কেবলমাত্র একটা অভ্যাসের যোগ জন্মে। ধর্মকে নিজের মধ্যে উদ্ভূত করে তোলাই মানুষের চিরজীবনের সাধনা। চরম বেদনায় তাকে জন্মদান করতে হয়, নাড়ির শোণিত দিয়ে তাকে প্রাণদান করতে চাই, তার পরে জীবনে সুখ পাই আর না-পাই আনন্দে চরিতার্থ হয়ে মরতে পারি।

এমনি করে ক্রমে ক্রমে জীবনের মধ্যে ধর্মকে স্পষ্ট করে স্বীকার করবার অবস্থা এসে পৌঁছল। যতই এটা এগিয়ে চলল ততই পূর্ব জীবনের সঙ্গে আসন্ন জীবনের একটা বিচ্ছেদ দেখা দিতে লাগল। অনন্ত আকাশে বিশ্বপ্রকৃতির যে শান্তিময় মাধুর্য-আসনটা পাতা ছিল, সেটাকে হঠাৎ ছিন্ন-বিছিন্ন করে বিরোধ-বিক্ষুব্ধ মানবলোকে রুদ্রবেশে কে দেখা দিল? এখন থেকে দ্বন্দ্বের দুঃখ, বিপ্লবের আলোড়ন।...

রাত্রির প্রান্তে প্রভাতের যখন প্রথম সঞ্চার হয় তখন তার আভাসটা যেন কেবল অলংকার রচনা করতে থাকে। আকাশের কোণে কোণে মেঘের গায়ে গায়ে নানারকম রঙ ফুটতে থাকে, গাছের মাথার উপরটা ঝিক্‌মিক্ করে, ঘাসে শিশিরগুলো ঝিল্‌মিল্ করতে

শুরু করে, সমস্ত ব্যাপারটা প্রধানত আলংকারিক। কিন্তু তাতে করে এটুকু বোঝা যায় যে রাতের পালা শেষ হয়ে দিনের পালা আরম্ভ হল। বোঝা যায় আকাশের অন্তরে অন্তরে সূর্যের স্পর্শ লেগেছে; বোঝা যায় সুপ্তরাত্রির নিভৃত গম্ভীর পরিব্যাপ্ত শান্তি শেষ হল, জাগরণের সমস্ত বেদনা সপ্তকে সপ্তকে মিড় টেনে এখনই অশান্ত সুরের ঝংকারে বেজে উঠবে। এমনি করে ধর্মবোধের প্রথম উন্মেষটা সাহিত্যের অলংকারেই প্রকাশ পাচ্ছিল, তা মানসপ্রকৃতির শিখরে শিখরে কল্পনার মেঘে মেঘে নানাপ্রকার রঙ ফলাচ্ছিল, কিন্তু তারই মধ্য থেকে পরিচয় পাওয়া যাচ্ছিল যে, বিশ্ব-প্রকৃতির অখণ্ড শান্তি এবার বিদায় হল, নির্জনে অরণ্যে পর্বতে অজ্ঞাতবাসের মেয়াদ ফুরোল, এবারে বিশ্বমানবের রণক্ষেত্রে ভীষ্মপর্ব। এই সময়ে বঙ্গদর্শনে 'পাগল' বলে যে গদ্য প্রবন্ধ বের হয়েছিল সেইটে পড়লে বোঝা যাবে, কী কথাটা কল্পনার অলংকারের ভিতর দিয়ে নিজেকে প্রকাশ করবার চেষ্টা করছে।—

আমি জানি, সুখ প্রতিদিনের সামগ্রী, আনন্দ প্রত্যহের অতীত। সুখ শরীরের কোথাও পাছে ধুলা লাগে বলিয়া সংকুচিত, আনন্দ ধুলায় গড়াগড়ি দিয়া নিখিলের সঙ্গে আপনার ব্যবধান ভাঙিয়া চুরমার করিয়া দেয়; এইজন্য সুখের পক্ষে ধুলা হেয়, আনন্দের পক্ষে ধুলা ভূষণ। সুখ, কিছু পাছে হারায় বলিয়া ভীত। আনন্দ, যথাসর্বস্ব বিতরণ করিয়া পরিতৃপ্ত। এইজন্য সুখের পক্ষে রিক্ততা দারিদ্র্য, আনন্দের পক্ষে দারিদ্র্যই ঐশ্বর্য। সুখ, ব্যবস্থার বন্ধনের মধ্যে আপনার শ্রীটুকুকে সতর্কভাবে রক্ষা করে। আনন্দ, সংহারের মুক্তির মধ্যে আপন সৌন্দর্যকে উদারভাবে প্রকাশ করে। এইজন্য সুখ বাহিরের নিয়মে বদ্ধ, আনন্দ সে বন্ধন ছিন্ন করিয়া আপনার নিয়ম আপনিই সৃষ্টি করে। সুখ, সুধাটুকুর জন্য তাকাইয়া বসিয়া থাকে। আনন্দ, দুঃখের বিষয়কে অনায়াসে পরিপাক করিয়া ফেলে। এইজন্য, কেবল ভালোটুকুর দিকেই সুখের পক্ষপাত—আর আনন্দের পক্ষে ভালোমন্দ দুই-ই সমান।

এই সৃষ্টির মধ্যে একটি পাগল আছেন, যাহা-কিছু অভাবনীয়, তাহা খামখা তিনিই আনিয়া উপস্থিত করেন।... নিয়মের দেবতা সংসারের সমস্ত পথকে পরিপূর্ণ চক্রপথ করিয়া তুলিবার চেষ্টা করিতেছেন, আর এই পাগল তাহাকে আক্ষিপ্ত করিয়া কুণ্ডলী-আকার করিয়া তুলিতেছেন! এই পাগল আপনার খেয়ালে সরীসৃপের বংশে পাখি এবং বানরের বংশে মানুষ উদ্‌ভাবিত করিতেছেন। যাহা হইয়াছে, যাহা আছে, তাহাকেই চিরস্থায়ি রূপে রক্ষা করিবার জন্য সংসারে একটা বিষম চেষ্টা রহিয়াছে—ইনি সেটাকে ছারখার করিয়া দিয়া, যাহা নাই তাহারই জন্য পথ করিয়া দিতেছেন। ইঁহার হাতে বাঁশি নাই, সামঞ্জস্য সুর ইঁহার নহে, বিষাণ বাজিয়া উঠে, বিধিবিহিত যজ্ঞ নষ্ট হইয়া যায়, এবং কোথা হইতে একটি অপূর্বতা উড়িয়া আসিয়া জুড়িয়া বসে।...

আমাদের প্রতিদিনের একরঙা তুচ্ছতার মধ্যে হঠাৎ ভয়ংকর তাহার জ্বলজ্জটাকলাপ লইয়া দেখা দেয়। সেই ভয়ংকর, প্রকৃতির মধ্যে একটা অপ্রত্যাশিত উৎপাত, মানুষের মধ্যে একটা অসাধারণ পাপ আকারে জাগিয়া উঠে। তখন কত সুখমিলনের জাল লণ্ডভণ্ড, কত হৃদয়ের সম্বন্ধ ছারখার হইয়া যায়। হে রুদ্র, তোমার ললাটের যে ধ্বকধ্বক অগ্নিশিখার স্ফুলিঙ্গমাত্রে অন্ধকারে গৃহের প্রদীপ জ্বলিয়া উঠে, সেই শিখাতেই লোকালয়ে সহস্রের হাহাধ্বনিতে নিশীথরাত্রে গৃহদাহ উপস্থিত হয়। হায়, শম্ভু, তোমার

নৃত্যে, তোমার দক্ষিণ ও বাম পদক্ষেপে সংসারে মহাপুণ্য ও মহাপাপ উৎক্ষিপ্ত হইয়া উঠে। সংসারের উপরে প্রতিদিনের জড়হস্তক্ষেপে যে একটা সামান্যতার একটানা আবরণ পড়িয়া যায়, ভালোমন্দ দুয়েরই প্রবল আঘাতে তুমি তাহাকে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করিতে থাক ও প্রাণের প্রবাহকে অপ্রত্যাশিতের উত্তেজনায় ক্রমাগত তরঙ্গিত করিয়া শক্তির নব নব লীলা ও সৃষ্টির নব নব মূর্তি প্রকাশ করিয়া তোল। পাগল, তোমার এই রুদ্র আনন্দে যোগ দিতে আমার ভীত হৃদয় যেন পরাঙ্মুখ না হয়। সংহারের রক্ত-আকাশের মাঝখানে তোমার রবিকরোদ্দীপ্ত তৃতীয় নেত্র যেন ধ্রুবজ্যোতিতে আমার অন্তরের অন্তরকে উদ্‌ভাসিত করিয়া তোলে। নৃত্য করো, হে উন্মাদ নৃত্য করো। সেই নৃত্যের ঘূর্ণবেগে আকাশের লক্ষকোটিযোজনব্যাপী উজ্জ্বলিত নীহারিকা যখন ভ্রাম্যমাণ হইতে থাকিবে, তখন আমার বক্ষের মধ্যে ভয়ের আক্ষেপে যেন এই রুদ্রসংগীতের তাল কাটিয়া না যায়। হে মৃত্যুঞ্জয়, আমাদের সমস্ত ভালো এবং মন্দের মধ্যে তোমারই জয় হউক।

আমাদের এই খেপা দেবতার আবির্ভাব যে ক্ষণে ক্ষণে তাহা নহে, সৃষ্টির মধ্যে ইঁহার পাগলামি অহরহ লাগিয়াই আছে—আমরা ক্ষণে ক্ষণে তাহার পরিচয় পাই মাত্র। অহরহই জীবনকে মৃত্যু নবীন করিতেছে, ভালোকে মন্দ উজ্জ্বল করিতেছে, তুচ্ছকে অভাবনীয় মূল্যবান করিতেছে। যখন পরিচয় পাই, তখন রূপের মধ্যে অপরূপ, বন্ধনের মধ্যে মুক্তির প্রকাশ আমাদের কাছে জাগিয়া উঠে।

তার পরে আমার রচনায় বার বার এই ভাবটা প্রকাশ পেয়েছে—জীবনে এই দুঃখবিপদ বিরোধমৃত্যুর বেশে অসীমের আবির্ভাব।...

...যদি কাজে থাকি আমি গৃহমাঝে
ওগো মরণ, হে মোর মরণ,
তুমি ভেঙে দিয়ো মোর সব কাজ
কোরো সব লাজ অপহরণ।
যদি স্বপনে মিটায়ে সব সাধ
আমি শুয়ে থাকি সুখশয়নে,
যদি হৃদয়ে জড়ায়ে অবসাদ
থাকি আধজাগরূক নয়নে—
তবে শঙ্খে তোমার তুলো নাদ
করি প্রলয়শ্বাস ভরণ,
আমি ছুটিয়া আসিব ওগো নাথ,
ওগো মরণ, হে মোর মরণ।

'খেয়া'তে 'আগমন' বলে যে কবিতা আছে, সে কবিতার মহারাজ এলেন তিনি কে? তিনি যে অশান্তি। সবাই রাত্রে দুয়ার বন্ধ করে শান্তিতে ঘুমিয়ে ছিল, কেউ মনে করে নি তিনি আসবেন। যদিও থেকে থেকে দ্বারে আঘাত লেগেছিল, যদিও মেঘগর্জনের মতো ক্ষণে ক্ষণে তাঁর রথচক্রের ঘর্ঘরধ্বনি স্বপ্নের মধ্যেও শোনা গিয়েছিল তবু কেউ বিশ্বাস করতে চাচ্ছিল না যে, তিনি আসছেন, পাছে তাদের আরামের ব্যাঘাত ঘটে। কিন্তু দ্বার ভেঙে গেল—এলেন রাজা।

ওরে দুয়ার খুলে দে রে,
বাজা শঙ্খ বাজা।
গভীর রাতে এসেছে আজ
আঁধার ঘরের রাজা।
বজ্র ডাকে শূন্যতলে,
বিদ্যুতেরি ঝিলিক ঝলে,
ছিন্নশয়ন টেনে এনে
আঙিনা তোর সাজা,
ঝড়ের সাথে হঠাৎ এল
দুঃখরাতের রাজা।

ঐ 'খেয়া'তে 'দান' বলে একটি কবিতা আছে। তার বিষয়টি এই যে, ফুলের মালা চেয়েছিলুম, কিন্তু কী পেলুম।

এ তো মালা নয় গো এ যে
তোমার তরবারি।
জ্বলে ওঠে আগুন যেন,
বজ্র-হেন ভারী—
এ যে তোমার তরবারি।

এমন যে দান এ পেয়ে কি আর শান্তিতে থাকবার জো আছে। শান্তি যে বন্ধন যদি তাকে অশান্তির ভিতর দিয়ে না পাওয়া যায়।

আজকে হতে জগৎমাঝে
ছাড়ব আমি ভয়,
আজ হতে মোর সকল কাজে
তোমার হবে জয়—
আমি ছাড়ব সকল ভয়।
মরণকে মোর দোসর করে
রেখে গেছ আমার ঘরে,
আমি তারে বরণ করে
রাখব পরানময়।
তোমার তরবারি আমার
করবে বাঁধন ক্ষয়।
আমি ছাড়ব সকল ভয়।

এমন আরো অনেক গান উদ্‌ধৃত করা যেতে পারে যাতে বিরাটের সে অশান্তির সুর লেগেছে। কিন্তু সেইসঙ্গে এ কথা মানতেই হবে সেটা কেবল মাঝের কথা, শেষের কথা নয়। চরম কথাটা হচ্ছে শান্তং শিবমদ্বৈতম্। রুদ্রতাই যদি রুদ্রের চরম পরিচয় হত তা হলে সেই অসম্পূর্ণতায় আমাদের আত্মা কোনো আশ্রয় পেত না—তা হলে জগৎ রক্ষা পেত কোথায়। তাই তো মানুষ তাঁকে ডাকছে, রুদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যম্—রুদ্র, তোমার যে প্রসন্ন মুখ, তার দ্বারা আমাকে রক্ষা করো। চরম সত্য এবং

পরম সত্য হচ্ছে ঐ প্রসন্ন মুখ। সেই সত্যই হচ্ছে সকল রুদ্রতার উপরে। কিন্তু এই সত্যে পৌঁছতে গেলে রুদ্রের স্পর্শ নিয়ে যেতে হবে। রুদ্রকে বাদ দিয়ে যে প্রসন্নতা, অশান্তিকে অস্বীকার করে যে শান্তি, সে তো স্বপ্ন, সে সত্য নয়।

বজ্রে তোমার বাজে বাঁশি,
সে কি সহজ গান।
সেই সুরেতে জাগব আমি
দাও মোরে সেই কান।
ভুলব না আর সহজেতে,
সেই প্রাণে মন উঠবে মেতে
মৃত্যুমাঝে ঢাকা আছে
যে অন্তহীন প্রাণ।
সে ঝড় যেন সই আনন্দে
চিত্তবীণার তারে
সপ্ত সিন্ধু দশ দিগন্ত
নাচাও যে ঝংকারে।
আরাম হতে ছিন্ন করে
সেই গভীরে লও গো মোরে
অশান্তির অন্তরে যেথায়
শান্তি সুমহান।

'শারদোৎসব' থেকে আরম্ভ করে 'ফাল্গুনী' পর্যন্ত যতগুলি নাটক লিখেছি, যখন বিশেষ করে মন দিয়ে দেখি তখন দেখতে পাই, প্রত্যেকের ভিতরকার ধুয়োটা ঐ একই। রাজা বেরিয়েছেন সকলের সঙ্গে মিলে শারদোৎসব করবার জন্যে। তিনি খুঁজছেন তাঁর সাথি। পথে দেখলেন, ছেলেরা শরৎপ্রকৃতির আনন্দে যোগ দেবার জন্যে উৎসব করতে বেরিয়েছে। কিন্তু একটি ছেলে ছিল—উপনন্দ—সমস্ত খেলাধুলো ছেড়ে সে তার প্রভুর ঋণ শোধ করবার জন্যে নিভৃতে বসে একমনে কাজ করছিল। রাজা বললেন, তাঁর সত্যকার সাথি মিলেছে, কেননা ঐ ছেলেটির সঙ্গেই শরৎপ্রকৃতির সত্যকার আনন্দের যোগ—ঐ ছেলেটি দুঃখের সাধনা দিয়ে আনন্দের ঋণ শোধ করছে—সেই দুঃখেরই রূপ মধুরতম। বিশ্বই যে এই দুঃখতপস্যায় রত; অসীমের যে দান সে নিজের মধ্যে পেয়েছে অশ্রান্ত প্রয়াসের বেদনা দিয়ে সেই দানের সে শোধ করছে। প্রত্যেক ঘাসটি নিরলস চেষ্টার দ্বারা আপনাকে প্রকাশ করছে, এই প্রকাশ করতে গিয়েই সে আপন অন্তর্নিহিত সত্যের ঋণ শোধ করছে। এই-যে নিরন্তর বেদনায় তার আত্মোৎসর্জন, এই দুঃখই তো তার শ্রী, এই তো তার উৎসব, এতেই তো সে শরৎপ্রকৃতিকে সুন্দর করেছে, আনন্দময় করেছে। বাইরে থেকে দেখলে একে খেলা মনে হয়, কিন্তু এ তো খেলা নয়, এর মধ্যে লেশমাত্র বিরাম নেই। যেখানে আপন সত্যের ঋণশোধে শৈথিল্য, সেখানেই প্রকাশে বাধা, সেইখানেই কদর্যতা, সেইখানেই নিরানন্দ। আত্মার প্রকাশ আনন্দময়। এইজন্যেই সে দুঃখকে মৃত্যুকে স্বীকার করতে পারে—ভয়ে কিম্বা আলস্যে কিম্বা সংশয়ে এই দুঃখের পথকে যে লোক এড়িয়ে চলে জগতে সেই আনন্দ থেকে বঞ্চিত হয়।

শারদোৎসবের ভিতরকার কথাটাই এই—ও তো গাছতলায় বসে বাঁশির সুর শোনাবার কথা নয়।

'রাজা' নাটকে সুদর্শনা আপন অরূপ রাজাকে দেখতে চাইলে; রূপের মোহে মুগ্ধ হয়ে ভুল রাজার গলায় দিলে মালা; তার পরে সেই ভুলের মধ্যে দিয়ে, পাপের মধ্যে দিয়ে, যে অগ্নিদাহ ঘটালে, যে বিষম যুদ্ধ বাধিয়ে দিলে, অন্তরে বাহিরে যে ঘোর অশান্তি জাগিয়ে তুললে, তাতেই তো তাকে সত্য মিলনে পৌঁছিয়ে দিলে। প্রলয়ের মধ্যে দিয়ে সৃষ্টির পথ। তাই উপনিষদে আছে, তিনি তাপের দ্বারা তপ্ত হয়ে এই সমস্ত কিছু সৃষ্টি করলেন। আমাদের আত্মা যা সৃষ্টি করছে তাতে পদে পদে ব্যথা। কিন্তু তাকে যদি ব্যথাই বলি তবে শেষ কথা বলা হল না, সেই ব্যথাতেই সৌন্দর্য, তাতেই আনন্দ।

যে বোধে আমাদের আত্মা আপনাকে জানে সে বোধের অভ্যুদয় হয় বিরোধ অতিক্রম করে, আমাদের অভ্যাসের এবং আরামের প্রাচীরকে ভেঙে ফেলে। যে বোধে আমাদের মুক্তি, দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি—দুঃখের দুর্গম পথ দিয়ে সে তার জয়ভেরী বাজিয়ে আসে—আতঙ্কে সে দিগদিগন্ত কাঁপিয়ে তোলে, তাকে শত্রু বলেই মনে করি, তার সঙ্গে লড়াই করে তবে তাকে স্বীকার করতে হয়—কেননা, নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ। 'অচলায়তনে' এই কথাটাই আছে।—

মহাপঞ্চক। তুমি কি আমাদের গুরু।

দাদাঠাকুর। হাঁ। তুমি আমাকে চিনবে না কিন্তু আমিই তোমাদের গুরু।

মহাপঞ্চক। তুমি গুরু? তুমি আমাদের সমস্ত নিয়ম লঙ্ঘন করে এ কোন্ পথ দিয়ে এলে। তোমাকে কে মানবে।

দাদাঠাকুর। আমাকে মানবে না জানি, কিন্তু আমিই তোমাদের গুরু।

মহাপঞ্চক। তুমি গুরু? তবে এই শত্রুবেশে কেন।

দাদাঠাকুর। এই তো আমার গুরুর বেশ। তুমি যে আমার সঙ্গে লড়াই করবে—সেই লড়াই আমার গুরুর অভ্যর্থনা।

মহাপঞ্চক। আমি তোমাকে প্রণাম করব না।

দাদাঠাকুর। আমি তোমার প্রণাম গ্রহণ করব না—আমি তোমাকে প্রণত করব।

মহাপঞ্চক। তুমি আমাদের পূজা নিতে আস নি।

দাদাঠাকুর। আমি তোমাদের পূজা নিতে আসি নি, অপমান নিতে এসেছি।

আমি তো মনে করি আজ য়ুরোপে যে যুদ্ধ বেধেছে সে ঐ গুরু এসেছেন বলে। তাঁকে অনেক দিনের টাকার প্রাচীর, মানের প্রাচীর, অহংকারের প্রাচীর ভাঙতে হচ্ছে। তিনি আসবেন বলে কেউ প্রস্তুত ছিল না। কিন্তু তিনি যে সমারোহ করে আসবেন তার জন্যে আয়োজন অনেকদিন থেকে চলছিল। য়ুরোপের সুদর্শনা যে মেকি রাজা সুবর্ণের রূপ দেখে তাকেই আপন স্বামী বলে ভুল করেছিল—তাই তো হঠাৎ আগুন জ্বলল, তাই তো সাত রাজার লড়াই বেধে গেল—তাই তো যে ছিল রানী তাকে রথ ছেড়ে, তার সম্পদ ছেড়ে, পথের ধুলোর উপর দিয়ে হেঁটে মিলনের পথে অভিসারে যেতে হচ্ছে। এই কথাটাই 'গীতালি'র একটি গানে আছে—

এক হাতে ওর কৃপাণ আছে
আর এক হাতে হার।

ও যে ভেঙেছে তোর দ্বার।
আসে নি ও ভিক্ষা নিতে,
লড়াই করে নেবে জিতে
পরানটি তোমার।
ও যে ভেঙেছে তোর দ্বার।
মরণেরি পথ দিয়ে ওই
আসছে জীবনমাঝে
ও যে আসছে বীরের সাজে
আধেক নিয়ে ফিরবে না রে
যা আছে সব একেবারে
করবে অধিকার।
ও যে ভেঙেছে তোর দ্বার।

এই-যে দ্বন্দ্ব, মৃত্যু এবং জীবন, শক্তি এবং প্রেম, স্বার্থ এবং কল্যাণ—এই-যে বিপরীতের বিরোধ, মানুষের ধর্মবোধই যার সত্যকার সমাধান দেখতে পায়—যে সমাধান পরম শান্তি, পরম মঙ্গল, পরম এক, এর সম্বন্ধে বার বার আমি বলেছি। 'শান্তিনিকেতন' গ্রন্থ থেকে তার কিছু কিছু উদ্ধার করে দেখানো যেতে পারত। কিন্তু যেখানে আমি স্পষ্টত ধর্মব্যাখ্যা করেছি সেখানে আমি নিজের অন্তরতম কথা না বলতেও পারি, সেখানে বাইরের শোনা কথা নিয়ে ব্যবহার করা অসম্ভব নয়। সাহিত্যরচনায় লেখকের প্রকৃতি নিজের অগোচরে নিজের পরিচয় দেয়, সেটা তাই অপেক্ষাকৃত বিশুদ্ধ। তাই কবিতা ও নাটকেরই সাক্ষ্য নিচ্ছি।

জীবনকে সত্য বলে জানতে গেলে মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে তার পরিচয় চাই। যে মানুষ ভয় পেয়ে মৃত্যুকে এড়িয়ে জীবনকে আঁকড়ে রয়েছে, জীবনের 'পরে তার যথার্থ শ্রদ্ধা নেই বলে জীবনকে সে পায় নি। তাই সে জীবনের মধ্যে বাস করেও মৃত্যুর বিভীষিকায় প্রতিদিন মরে। যে লোক নিজে এগিয়ে গিয়ে মৃত্যুকে বন্দী করতে ছুটেছে, সে দেখতে পায়, যাকে সে ধরেছে সে মৃত্যুই নয়, সে জীবন। যখন সাহস করে তার সামনে দাঁড়াতে পারি নে, তখন পিছন দিকে তার ছায়াটা দেখি। সেইটে দেখে ডরিয়ে-ডরিয়ে মরি। নির্ভয়ে যখন তার সামনে গিয়ে দাঁড়াই তখন দেখি, যে সর্দার জীবনের পথে আমাদের এগিয়ে নিয়ে যায় সেই সর্দারই মৃত্যুর তোরণদ্বারের মধ্যে আমাদের বহন করে নিয়ে যাচ্ছে। 'ফাল্গুনী'র গোড়াকার কথাটা হচ্ছে এই যে, যুবকেরা বসন্ত-উৎসব করতে বেরিয়েছে। কিন্তু এ উৎসব তো শুধু আমোদ করা নয়, এ তো অনায়াসে হবার জো নেই। জরার অবসাদ, মৃত্যুর ভয় লঙ্ঘন করে তবে সেই নবজীবনের আনন্দে পৌঁছনো যায়। তাই যুবকেরা বললে, আনব সেই জরা বুড়োকে বেঁধে, সেই মৃত্যুকে বন্দী করে। মানুষের ইতিহাসে তো এই লীলা এই বসন্তোৎসব বারে বারে দেখতে পাই। জরা সমাজকে ঘনিয়ে ধরে, প্রথা অচল হয়ে বসে, পুরাতনের অত্যাচার নূতন প্রাণকে দলন করে নির্জীব করতে চায়—তখন মানুষ মৃত্যুর মধ্যে ঝাঁপ দিয়ে পড়ে, বিপ্লবের ভিতর দিয়ে নববসন্তের উৎসবের আয়োজন করে। সেই আয়োজনই তো য়ুরোপে চলছে। সেখানে নূতন যুগের বসন্তের হোলিখেলা আরম্ভ হয়েছে। মানুষের ইতিহাস আপন চিরনবীন অমর মূর্তি প্রকাশ করবে বলে

মৃত্যুকে তলব করেছে। মৃত্যুই তার প্রসাধনে নিযুক্ত হয়েছে। তাই 'ফাল্গুনী'তে বাউল বলছে—

যুগে যুগে মানুষ লড়াই করেছে, আজ বসন্তের হাওয়ায় তারই ঢেউ।...যারা ম'রে অমর, বসন্তের কচি পাতায় তারাই পত্র পাঠিয়েছে। দিগ্‌দিগন্তে তারা রটাচ্ছে—'আমরা পথের বিচার করি নি, আমরা পাথেয়ের হিসাব রাখি নি, আমরা ছুটে এসেছি, আমরা ফুটে বেরিয়েছি। আমরা যদি ভাবতে বসতুম, তা হলে বসন্তের দশা কী হত।'

বসন্তের কচি পাতায় এই যে পত্র, এ কাদের পত্র ? যে-সব পাতা ঝরে গিয়েছে তারাই মৃত্যুর মধ্য দিয়ে আপন বাণী পাঠিয়েছে। তারা যদি শাখা আঁকড়ে থাকতে পারত,' তা হলে জরাই অমর হত—তা হলে পুরাতন পুঁথির তুলট কাগজে সমস্ত অরণ্য হলদে হয়ে যেত, সেই শুকনো পাতার সর সর শব্দে আকাশ শিউরে উঠত। কিন্তু পুরাতনই মৃত্যুর মধ্য দিয়ে আপন চিরনবীনতা প্রকাশ করে, এই তো বসন্তের উৎসব। তাই বসন্ত বলে—যারা মৃত্যুকে ভয় করে, তারা জীবনকে চেনে না; তারা জরাকে বরণ করে জীবন্মৃত হয়ে থাকে, প্রাণবান বিশ্বের সঙ্গে তাদের বিচ্ছেদ ঘটে।—

চন্দ্রহাস। এ কী, এ যে তুমি।...সেই আমাদের সর্দার। বুড়ো কোথায়।

সর্দার। কোথাও তো নেই।

চন্দ্রহাস। কোথাও না ?...তবে সে কী।

সর্দার। সে স্বপ্ন।

চন্দ্রহাস। তবে তুমিই চিরকালের ?

সর্দার। হাঁ।

চন্দ্রহাস। আর আমরাই চিরকালের ?

সর্দার। হাঁ।

চন্দ্রহাস। পিছন থেকে যারা তোমাকে দেখলে তারা যে তোমাকে কত লোকে কতরকম মনে করলে তার ঠিক নেই।...তখন তোমাকে হঠাৎ বুড়ো বলে মনে হল। তার পর গুহার মধ্য থেকে বেরিয়ে এলে। এখন মনে হচ্ছে যেন তুমি বালক। যেন তোমাকে এই প্রথম দেখলুম ! এ তো বড়ো আশ্চর্য, তুমি বারে বারেই প্রথম, তুমি ফিরে ফিরেই প্রথম।

মানুষ তার জীবনকে সত্য করে, বড়ো করে, নূতন করে পেতে চাচ্ছে। তাই মানুষের সভ্যতায় তার যে জীবনটা বিকশিত হয়ে উঠছে, সে তো কেবলই মৃত্যুকে ভেদ করে। মানুষ বলেছে—

মরতে মরতে মরণটারে
শেষ করে দে একেবারে,
তার পরে সেই জীবন এসে
আপন আসন আপনি লবে।

মানুষ জেনেছে—

নয় এ মধুর খেলা,
তোমায় আমায় সারাজীবন
সকাল-সন্ধ্যাবেলা।

কতবার যে নিবল বাতি,
গর্জে এল ঝড়ের রাতি,
সংসারের এই দোলায় দিলে
সংশয়েরি ঠেলা।
বারে বারে বাঁধ ভাঙিয়া,
বন্যা ছুটেছে,
দারুণ দিনে দিকে দিকে,
কান্না উঠেছে।
ওগো রুদ্র, দুঃখে সুখে,
এই কথাটি বাজল বুকে—
তোমার প্রেমে আঘাত আছে
নাইকো অবহেলা।

আমার ধর্ম কী, তা যে আজও আমি সম্পূর্ণ এবং সুস্পষ্ট করে জানি, এমন কথা বলতে পারি নে—অনুশাসন-আকারে তত্ত্ব-আকারে কোনো পুঁথিতে-লেখা ধর্ম সে তো নয়। সেই ধর্মকে জীবনের মর্মকোষ থেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে, উদ্‌ঘাটিত ক'রে, স্থির ক'রে দাঁড় করিয়ে দেখা ও জানা আমার পক্ষে অসম্ভব—কিন্তু অলস শান্তি ও সৌন্দর্যরসভোগ যে সেই ধর্মের প্রধান লক্ষ্য বা উপাদান নয়, এ কথা নিশ্চয় জানি। আমি স্বীকার করি, আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে এবং আনন্দং প্রয়ন্তি অভিসংবিশন্তি—কিন্তু সেই আনন্দ দুঃখকে-বর্জন-করা আনন্দ নয়, দুঃখকে-আত্মসাৎ-করা আনন্দ। সেই আনন্দের যে মঙ্গলরূপ তা অমঙ্গলকে অতিক্রম করেই, তাকে ত্যাগ করে নয়, তার যে অখণ্ড অদ্বৈত রূপ তা সমস্ত বিভাগ ও বিরোধকে পরিপূর্ণ করে তুলে, তাকে অস্বীকার করে নয়।

অন্ধকারের উৎস হতে উৎসারিত আলো
সেই তো তোমার আলো।
সকল দ্বন্দ্ববিরোধমাঝে জাগ্রত যে ভালো
সেই তো তোমার ভালো।
পথের ধূলায় বক্ষ পেতে রয়েছে যেই গেহ
সেই তো তোমার গেহ।
সমরঘাতে অমর করে রুদ্র নিঠুর স্নেহ
সেই তো তোমার স্নেহ।
সব ফুরালে বাকি রহে অদৃশ্য যেই দান।
সেই তো তোমার দান।
মৃত্যু আপন পাত্র ভরি বহিছে যেই প্রাণ
সেই তো তোমার প্রাণ।
বিশ্বজনের পায়ের তলে ধূলিময় যে ভূমি
সেই তো তোমার ভূমি।

সবায় নিয়ে সবার মাঝে লুকিয়ে আছ তুমি
সেই তো আমার তুমি ।।

সত্যং জ্ঞানম্ অনন্তম্। শান্তং শিবম্ অদ্বৈতম্। ইহুদী পুরাণে আছে—মানুষ একদিন অমৃতলোকে বাস করত। সে লোক স্বর্গলোক। সেখানে দুঃখ নেই, মৃত্যু নেই। কিন্তু যে স্বর্গকে দুঃখের ভিতর দিয়ে, মন্দের সংঘাত দিয়ে, না জয় করতে পেরেছি সে স্বর্গ তো জ্ঞানের স্বর্গ নয়—তাকে স্বর্গ বলে জানিই নে। মায়ের গর্ভের মধ্যে মাকে পাওয়া যেমন মাকে পাওয়াই নয়, তাঁকে বিচ্ছেদের মধ্যে পাওয়াই পাওয়া।

গর্ভ ছেড়ে মাটির 'পরে
যখন পড়ে,
তখন ছেলে দেখে আপন মাকে।
তোমার আদর যখন ঢাকে
জড়িয়ে থাকি তারি নাড়ীর পাকে,
তখন তোমায় নাহি জানি।
আঘাত হানি
তোমার আচ্ছাদন হতে যেদিন দূরে ফেলাও টানি
সে বিচ্ছেদে চেতনা দেয় আনি—
দেখি বদনখানি।

তাই সেই অচেতন স্বর্গলোকে জ্ঞান এল। সেই জ্ঞান আসতেই সত্যের মধ্যে আত্মবিচ্ছেদ ঘটল। সত্যমিথ্যা-ভালোমন্দ-জীবনমৃত্যুর দ্বন্দ্ব এসে স্বর্গ থেকে মানুষকে লজ্জা-দুঃখ-বেদনার মধ্যে নির্বাসিত করে দিলে। এই দ্বন্দ্ব অতিক্রম করে যে অখন্ড সত্যে মানুষ আবার ফিরে আসে তার থেকে তার আর বিচ্যুতি নেই। কিন্তু এই-সমস্ত বিপরীতের বিরোধ মিটতে পারে কোথায়? অন্তরের মধ্যে। তাই উপনিষদে আছে, সত্যং জ্ঞানম্ অনন্তম্। প্রথমে সত্যের মধ্যে জড় জীব সকলের সঙ্গে এক হয়ে মানুষ বাস করে—জ্ঞান এসে বিরোধ ঘটিয়ে মানুষকে সেখান থেকে টেনে স্বতন্ত্র করে—অবশেষে সত্যের পরিপূর্ণ অনন্ত রূপের ক্ষেত্রে আবার তাকে সকলের সঙ্গে মিলিয়ে দেয়। ধর্মবোধের প্রথম অবস্থায় শান্তম্, মানুষ তখন আপন প্রকৃতির অধীন—তখন সে সুখকেই চায়, সম্পদকেই চায়, তখন শিশুর মতো কেবল তার রসভোগের তৃষ্ণা, তখন লক্ষ্য প্রেয়। তার পরে মনুষ্যত্বের উদ্‌বোধনের সঙ্গে তার দ্বিধা আসে; তখন সুখ এবং দুঃখ, ভালো এবং মন্দ, এই দুই বিরোধের সমাধান সে খোঁজে—তখন দুঃখকে সে এড়ায় না, মৃত্যুকে সে ডরায় না। সেই অবস্থায় শিবম্, তখন তার লক্ষ্য শ্রেয়। কিন্তু এইখানেই শেষ নয়—শেষ হচ্ছে প্রেম, আনন্দ। সেখানে সুখ ও দুঃখের, ভোগ ও ত্যাগের, জীবন ও মৃত্যুর গঙ্গাযমুনা-সংগম। সেখানে অদ্বৈতম্। সেখানে কেবল যে বিচ্ছেদের ও বিরোধের সাগর পার হওয়া, তা নয়। সেখানে তরী থেকে তীরে ওঠা। সেখানে যে আনন্দ সে তো দুঃখের ঐকান্তিক নিবৃত্তিতে নয়, দুঃখের ঐকান্তিক চরিতার্থতায়। ধর্মবোধের এই-যে যাত্রা এর প্রথমে জীবন, তার পরে মৃত্যু, তার পরে অমৃত। মানুষ সেই অমৃতের অধিকার লাভ করেছে। কেননা জীবের মধ্যে মানুষই শ্রেয়ের ক্ষুরধারনিশিত দুর্গম পথে দুঃখকে

মৃত্যুকে স্বীকার করেছে। সে সাবিত্রীর মতো যমের হাত থেকে আপন সত্যকে ফিরিয়ে এনেছে। সে স্বর্গ থেকে মর্তলোকে ভূমিষ্ঠ হয়েছে, তবেই অমৃতলোককে আপনার করতে পেরেছে। ধর্মই মানুষকে এই দ্বন্দ্বের তুফান পার করিয়ে দিয়ে এই অদ্বৈতে অমৃতে আনন্দে প্রেমে উত্তীর্ণ করিয়ে দেয়। যারা মনে করে তুফানকে এড়িয়ে পালানোই মুক্তি তারা পারে যাবে কী করে। সেইজন্যেই তো মানুষ প্রার্থনা করে, অসতো মা সদ্‌গময়, তমসো মা জ্যোতির্গময়, মৃত্যোর্মামৃতং গময়। 'গময়' এই কথার মানে এই যে, পথ পেরিয়ে যেতে হবে, পথ এড়িয়ে যাবার জো নেই।

আমার রচনার মধ্যে যদি কোনো ধর্মতত্ত্ব থাকে তবে সে হচ্ছে এই যে, পরমাত্মার সংগে জীবাত্মার সেই পরিপূর্ণ প্রেমের সম্বন্ধ-উপলব্ধিই ধর্মবোধ যে প্রেমের এক দিকে দ্বৈত আর-এক দিকে অদ্বৈত, এক দিকে বিচ্ছেদ আর-এক দিকে মিলন, এক দিকে বন্ধন আর-এক দিকে মুক্তি। যার মধ্যে শক্তি এবং সৌন্দর্য, রূপ এবং রস, সীমা এবং অসীম এক হয়ে গেছে; যা বিশ্বকে স্বীকার ক'রেই বিশ্বকে সত্যভাবে অতিক্রম করে এবং বিশ্বের অতীতকে স্বীকার ক'রেই বিশ্বকে সত্যভাবে গ্রহণ করে, যা যুদ্ধের মধ্যেও শান্তকে মানে, মন্দের মধ্যেও কল্যাণকে জানে এবং বিচিত্রের মধ্যেও একেকে পূজা করে। আমার ধর্ম যে আগমনীর গান গায় সে এই—

ভেঙেছ দুয়ার, এসেছ জ্যোতির্ময়,
তোমারি হউক জয়।
তিমিরবিদার উদার অভ্যুদয়,
তোমারি হউক জয়।...
...প্রভাতসূর্য, এসেছ রুদ্রসাজে,
দুঃখের পথে তোমার তূর্য বাজে,
অরুণবহ্নি জ্বালাও চিত্তমাঝে,
মৃত্যুর হোক লয়।
তোমারি হউক জয়।

আত্মপরিচয়, র/১০/১৮৫-২০৫

টীকাঃ

আত্মপরিচয়—এই গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় ১৩৫০ (১৯৪৩) সালে। এটি বিভিন্ন সময়ের সাতটি রচনার সংকলন। এখানে তৃতীয় রচনাটি গৃহীত হয়েছে। এই প্রবন্ধটি প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল 'সবুজপত্রে' আশ্বিন-কার্তিক-১৩২৪ সংখ্যায়।

১১৫। আমি তারেই খুঁজে বেড়াই

চৈত্র ১৩২৫ (?)

আমি তারেই খুঁজে বেড়াই যে রয় মনে আমার মনে।
সে আছে ব'লে
আমার আকাশ জুড়ে ফোটে তারা রাতে,
প্রাতে ফুল ফুটে রয় বনে আমার বনে।।
সে আছে ব'লে চোখের তারার আলোয়
এত রূপের খেলা রঙের মেলা অসীম সাদায় কালোয়।
সে মোর সঙ্গে থাকে ব'লে
আমার অঙ্গে অঙ্গে হরষ জাগায় দখিন-সমীরণে।।
তারি বাণী হঠাৎ উঠে পূরে
আন্‌মনা কোন্ তানের মাঝে আমার গানের সুরে।
দুখের দোলে হঠাৎ মোরে দোলায়,
কাজের মাঝে লুকিয়ে থেকে আমারে কাজ ভোলায়।
সে মোর চিরদিনের ব'লে
তারি পুলকে মোর পলকগুলি ভরে ক্ষণে ক্ষণে।।

গীতবিতান, র/৪/১৬৬

বিষয়-সংকেত : বাউল-ভাবনা—প্রাণের মানুষ

তুলনীয় প্রসঙ্গ :

আমার প্রাণের মানুষ (৮৫), আপনি আমার কোন্‌খানে ? (১২৩), আমি তারেই জানি (১৪৮), আমি কান পেতে রই (১১৬), আমার হিয়ার মাঝে (১০১), আমি তারেই খুঁজে (১১৫)

১১৬। আমি কান পেতে রই

ভাদ্র ১৩২৯

আমি কান পেতে রই আমার আপন হৃদয়-গহন-দ্বারে বারে বারে
কোন্ গোপনবাসীর কান্নাহাসির গোপন কথা শুনিবারে।।
ভ্রমর সেথা হয় বিবাগি নিভৃত নীল পদ্ম লাগি রে,
কোন্ রাতের পাখি গায় একাকী সঙ্গীবিহীন অন্ধকারে।।
কে সে মোর কেই বা জানে, কিছু তার দেখি আভা।
কিছু পাই অনুমানে, কিছু তার বুঝি না বা।

মাঝে মাঝে তার বারতা আমার ভাষায় পায় কি কথা রে,
ও সে আমায় জানি পাঠায় বাণী গানের তানে লুকিয়ে তারে।।

গীতবিতান, র/৪/১৬৬

বিষয়-সংকেত : বাউল-ভাবনা—প্রাণের মানুষ

তুলনীয় প্রসঙ্গ :

আমার প্রাণের মানুষ (৮৫), আমি তারেই জানি (১৪৮), আমি তারেই খুঁজে বেড়াই (১১৫), আমার হিয়ার মাঝে (১০১), আপনি আমার কোন্‌খানে (১২৩)

১১৭। জীবন মরণের সীমানা ছাড়ায়ে

১৩৩০ সালের মাঘোৎসবে গীত, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, ১৮৪৫ ফাল্গুন

জীবনমরণের সীমানা ছাড়ায়ে,
বন্ধু হে আমার, রয়েছ দাঁড়ায়ে।।
এ মোর হৃদয়ের বিজন আকাশে
তোমার মহাসন আলোতে ঢাকা সে,
গভীর কী আশায় নিবিড় পুলকে
তাহার পানে চাই দু বাহু বাড়ায়ে।।
নীরব নিশি তব চরণ নিছায়ে
আঁধার-কেশভার দিয়েছে বিছায়ে।
আজি এ কোন্‌ গান নিখিল প্লাবিয়া
তোমার বীণা হতে আসিল নাবিয়া!
ভুবন মিলে যায় সুরের রণনে,
গানের বেদনায় যাই যে হারায়ে।।

গীতবিতান, র/৪/৭

১১৮। খৃস্টোৎসব

২৫ ডিসেম্বর ১৯২৩ (১৩১৬)

তাই তোমার আনন্দ আমার 'পর, তুমি তাই এসেছ নীচে।
আমায় নইলে, ত্রিভুবনেশ্বর তোমার প্রেম হত যে মিছে।

দুইয়ের মধ্যে একের যে প্রকাশ তাই হল যথার্থ সৃষ্টির প্রকাশ। নানা বিরোধে যেখানে এক বিরাজমান সেখানেই মিলন, সেখানেই এককে যথার্থভাবে উপলব্ধি করা যায়। আমাদের দেশের শাস্ত্রে তাই, এক ছাড়া দুইকে মানতে চায় নি। কারণ দুইয়ের মধ্যে একের যে ভেদ তার অবকাশকে পূর্ণ করে দেখলেই এককে যথার্থভাবে পাওয়া যায়। এইটিই হচ্ছে সৃষ্টির লীলা। উপরের সঙ্গে নিচের যে মিলন, বিশ্বকর্মার কর্মের সঙ্গে ক্ষুদ্র আমাদের কর্মের যে মিলন, বিশ্বে নিরন্তর তারই লীলা চলছে। তার দ্বারা সব পূর্ণ হয়ে রয়েছে।

যাঁরা বিচ্ছেদের মধ্যে সত্যের এই অখণ্ড রূপকে এনে দেন তাঁরা জীবনে নিয়ত আনন্দবার্তা বহন করে এনেছেন। ইতিহাসে এই-সকল মহাপুরুষ বলেছেন যে, কোনোখানে ফাঁক নেই, প্রেমের ক্রিয়া নিত্য চলেছে। মানুষের মনের দ্বার উদ্ঘাটিত যদি না'ও হয় তবু এই প্রক্রিয়ার বিরাম নেই। তার অস্ফুট চিত্তকমলের উপর আলোকপাত হয়েছে, তাকে উদ্‌বোধিত করবার প্রয়াসের বিশ্রাম নেই। মানুষ জানুক বা নাই জানুক, সমস্ত আকাশ ব্যাপ্ত করে সেই অস্ফুট কুঁড়িটির বিকাশের জন্যে আলোকের মধ্যেও প্রেমের প্রতীক্ষা আছে।

তেমনি ভাবে এক মহাপুরুষ বিশেষ করে তাঁর জীবন দিয়ে এই কথা বলেছিলেন যে, লোকলোকান্তরে যিনি তাঁর অভ্রচুম্বিত আলোকমালার প্রাসাদ সৃষ্টি করেছেন সেই বিচিত্র বিশ্বের অধিপতিই আমার পিতা, আমার কোনো ভয় নেই। এই বিরাট আকাশের তলে যাঁর প্রতাপে পৃথিবী ঘূর্ণমান হচ্ছে তাঁর শক্তির অন্ত নেই, তা অতিপ্রচণ্ড—তার তুলনায় আমরা মানুষ কত নগণ্য সামান্য জীব। কিন্তু আমাদের ভয় নেই; এই-সকলের অন্তর্যামী নিয়ন্তা আমারই পরম আত্মীয়, আমারই পিতা। বিশ্বের মূলে এই পরম সম্বন্ধ যা শূন্যকে পূর্ণতা দান করছে, মৃত্যুশোকের উপর আনন্দধারা প্রবাহিত করছে, সেই মধুর সম্বন্ধটি আজ আমাদের অন্তরে অনুভব করতে হবে। আমাদের পরম পিতা যিনি তিনি বলছেন যে, 'ভয় নেই সূর্যচন্দ্রের মধ্যে আমার অখণ্ড রাজত্ব, আমার অমোঘ নিয়ম অলঙ্ঘ্য, কিন্তু তুমি যে আমারই , তোমাকে আমার চাই।' যুগে যুগে এই মাভৈঃ বাণী যাঁরা পৃথিবীতে আনয়ন করেন তাঁরা আমাদের প্রণম্য।

এমনি করেই একজন মানবসন্তান একদিন বলেছিলেন যে, আমরা সকলে বিশ্বপিতার সন্তান, আমাদের অন্তরে যে প্রেমের পিপাসা আছে তা তাঁকে স্পর্শ করেছে। এ কথা হতেই পারে না যে, আমাদের বেদনা আকাঙ্ক্ষার কোনো লক্ষ্য নেই, কারণ তিনি সত্যই আমাদের পরমসখা হয়ে তাঁর সাড়া দিয়ে থাকেন। তাই সাহস করে মানুষ তাঁকে আনন্দদায়িনী মা, মানবাত্মার কল্যাণবিধায়ক পিতারূপে জেনেছে। মানুষ যেখানে বিশ্বকে কেবল বাহিরের নিয়মযন্ত্রের অধীন বলে জানছে সেখানে সে কেবলই আপনাকে দুর্বল অশক্ত করছে, কিন্তু যেখানে সে প্রেমের বলে সমস্ত বিশ্বলোকে আত্মীয়তার অধিকার বিস্তার করেছে সেখানেই সে যথার্থ ভাবে আপনার স্বরূপকে উপলব্ধি করেছে।

এই বার্তা ঘোষণা করতে এক দিন মহাত্মা যিশু লোকালয়ের দ্বারে এসে উপস্থিত হয়েছিলেন। তিনি তো অস্ত্রে শস্ত্রে সজ্জিত হয়ে যোদ্ধৃবেশে আসেন নি, তিনি তো বাহুবলের পরিচয় দেন নি—তিনি ছিন্নচীর পরে পথে পথে ঘুরেছিলেন। তিনি

সম্পদবান্ ও প্রতাপশালীদের কাছ থেকে আঘাত অপমান প্রাপ্ত হয়েছিলেন। তিনি যে বার্তা নিয়ে এসেছিলেন তার বদলে বাইরের কোনো মজুরি পান নি, কিন্তু তিনি পিতার আশীর্বাদ বহন করেছিলেন। তিনি নিষ্কিঞ্চন হয়ে দ্বারে দ্বারে এই বার্তা বহন করে এনেছিলেন যে, ধনের উপর আশ্রয় করলে চলবে না, পরম আশ্রয় যিনি তিনি বিশ্বকে পূর্ণ করে রয়েছেন। তিনি দেশ কাল পূর্ণ করে বিরাজমান। তিনি 'পরম-আনন্দঃ পরমাগতিঃ' এই কথা উপলব্ধি করবার জন্য যে ত্যাগের দরকার যারা তা শেখে নি তারা মৃত্যুর ভয়ে, ক্ষতির ভয়ে, প্রাণকে বুকে করে নিয়ে ফিরেছে—অন্তরের ভয় লোভ মোহের দ্বারা শ্রদ্ধাহীনতা প্রকাশ করেছে। এই মহাপুরুষ তাই আপনার জীবনে ত্যাগের দ্বারা মৃত্যুর দ্বারে উপস্থিত হয়ে মানুষের কাছে এই বাণী এনে দিয়েছিলেন। তাই তিনি মানবাত্মার পরম পথকে উন্মুক্ত করবার জন্য এক দিন দরিদ্র বেশে পথে বার হয়েছিলেন। যে-সব সরল প্রকৃতির মানুষ তাঁর অনুগমন করেছিল তারা সম্পূর্ণরূপে তাঁর বাণীর মর্ম বুঝতে পারে নি। তারা কিসের স্পর্শ পেয়েছিল জানি নে, কিন্তু ভক্তিভরে তাদের মাথা অবনত হয়ে গিয়েছিল। তাদের মাথা নিচুই ছিল—কারণ তাদের পরিচয়, নাম ধাম কেউ জানত না, তারা সামান্য ধীবর ছিল। তারা যিশুর বাণীর প্রেরণা অনুভব করেছিল, একটি অব্যক্ত মধুর রসে তাদের অন্তর আপ্লুত হয়েছিল। এমনি করে যাদের কিছু নেই তারা পেয়ে গেল। কিন্তু যারা গর্বিত তারা এই পরমা বার্তাকে প্রত্যাখ্যান করেছিল।

এই মহাত্মার বাণী যে তাঁর ধর্মবলম্বীরাই গ্রহণ করেছিল তা নয়। তারা বারে বারে ইতিহাসে তাঁর বাণীর অবমাননা করেছে, রক্তের চিহ্নের দ্বারা ধরাতল রঞ্জিত করে দিয়েছে—তারা যিশুকে এক বার নয়, বার-বার ক্রুশেতে বিদ্ধ করেছে। সেই খৃষ্টান নাস্তিকদের অবিশ্বাস থেকে যিশুকে বিচ্ছিন্ন করে তাঁকে আপন শ্রদ্ধার দ্বারা দেখলেই যথার্থ ভাবে সম্মান করা হবে। খৃষ্টের আত্মা তাই আজ চেয়ে আছে। বড়ো বড়ো গির্জায় তাঁর বাণী প্রচারিত হবে বলে তিনি পথে পথে ফেরেন নি, কিন্তু যার অন্তরে ভক্তিরস বিশুষ্ক হয়ে যায় নি তারই কাছে তিনি তাঁর সমস্ত প্রত্যাশা নিয়ে একদিন উপনীত হয়েছিলেন। তিনি সেদিনকার কালের সব চেয়ে অখ্যাত দরিদ্র অভাজনদের সঙ্গে কন্ঠ মিলিয়ে বিশ্বের অধিপতিকে বলেছিলেন যে 'পিতা নোহসি'—তুমি আমাদের পিতা।

মানুষ জীবন ও মৃত্যুকে বিচ্ছিন্ন করে দেখে, এই দুইয়ের মধ্যে সে একের মিল দেখে না। যেমন তার দেহে পিঠের দিকে চোখ নেই বলে কেবল সামনেরই অংগকে মেনে নেওয়া বিষম ভুল, তেমনি জীবন ও মৃত্যুর মধ্যে আপাত-অনৈক্যকেই সত্য বলে জানলে জীবনকে খন্ডিত করে দেখা হয়। এই মিথ্যা মায়া থেকে যারা মুক্তিলাভ করে অমৃতকে সর্বত্র দেখেছেন তাঁদের আমরা প্রণাম করি। তাঁরা মৃত্যুর দ্বারা অমৃতকে লাভ করেছেন, এই মর্ত্যলোকেই অমরাবতী সৃজন করেছেন। অমর ধামের তেমন এক যাত্রী একদিন পৃথিবীতে অমর লোকের বাণী নিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন, সেই কথা স্মরণ করে আমরাও যেন মৃত্যুর তমোরাশির উপর অমৃত আলোর সম্পাত দেখতে পাই। রাত্রিতে সূর্য অস্তমিত হলে মূঢ় যে সে ভাবে যে, আলো বুঝি নির্বাপিত হল, সৃষ্টি লোপ পেল। এমন সময় সে অন্তরীক্ষে চেয়ে দেখে যে সূর্য অপসারিত হলে লোকলোকান্তরের জ্যোতির্ধাম উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে—মহারাজার এক দরবার ছেড়ে আর-এক দরবারে আলোক সংগীত ধ্বনিত হচ্ছে। সেই সংগীতে আমাদেরও নিমন্ত্রণ বেজে উঠেছে। মহা

আলোকের মিলনে যেন আমরা পূর্ণ করে দেখি। জীবন ও মৃত্যুর মাঝখানকার এই অখণ্ড যোগসূত্র যেন আমরা না হারাই। যে মহাপুরুষ তাঁর জীবনের মধ্যেই অমৃতলোকের পরিচয় দিয়েছিলেন, তাঁর মৃত্যুর দ্বারা অমৃতরূপ পরিস্ফুট হয়ে উঠেছিল, আজ তাঁর মৃত্যুর অন্তর্নিহিত সেই পরম সত্যটিকে যেন আমরা স্পষ্ট আকারে দেখতে পাই।

খৃষ্ট, র/১১/৫১৩-১৫

তুলনীয় প্রসঙ্গ :

তাই তোমার আনন্দ আমার পর (৮৩), যিশুচরিত (৭৫), খৃষ্টধর্ম (৯৮)

১১৯। মুক্তি

২২ অক্টোবর ১৯২৪ (১৩৩১)

মুক্তি নানা মূর্তি ধরি দেখা দিতে আসে নানা জনে,—
এক পন্থা নহে।
পরিপূর্ণতার সুধা নানা স্বাদে ভুবনে ভুবনে
নানা স্রোতে বহে।
সৃষ্টি মোর সৃষ্টি সাথে মেলে যেথা, সেথা পাই ছাড়া,
মুক্তি যে আমারে তাই সংগীতের মাঝে দেয় সাড়া,
সেথা আমি খেলা-খ্যাপা বালকের মতো লক্ষ্মীছাড়া,
লক্ষ্যহীন নগ্ন নিরুদ্দেশ।
সেথা মোর চির নব, সেথা মোর চিরন্তন শেষ।

মাঝে মাঝে গানে মোর সুর আসে, যে সুরে, হে গুণী,
তোমারে চিনায়।
বেঁধে দিয়ো নিজ হাতে সেই নিত্য সুরের ফাল্গুনী
আমার বীণায়।
তাহলে বুঝিব আমি ধূলি কোন্ ছন্দে হয় ফুল
বসন্তের ইন্দ্রজালে অরণ্যেরে করিয়া ব্যাকুল;
নব নব মায়াছায়া কোন্ নৃত্যে নিয়ত দোদুল
বর্ণ বর্ণ ঋতুর দোলায়।
তোমারি আপন সুর কোন্ তালে তোমারে ভোলায়!

যেদিন আমার গান মিলে যাবে তোমার গানের
সুরের ভঙ্গীতে
মুক্তির সংগমতীর্থ পাব আমি আমারি প্রাণের
আপন সঙ্গীতে।

সেদিন বুঝিব মনে নাই নাই বস্তুর বন্ধন,
শূন্যে শূন্যে রূপ ধরে তোমারি এ বীণার স্পন্দন;
নেমে যাবে সব বোঝা, থেমে যাবে সকল ক্রন্দন,
ছন্দে তালে ভুলিব আপনা,
বিশ্বগীত-পদ্মদলে স্তব্ধ হবে অশান্ত ভাবনা।

সঁপি দিব সুখ-দুঃখ আশা ও নৈরাশ্য যত কিছু
তব বীণাতারে,—
ধরিবে গানের মূর্তি, একান্তে করিয়া মাথা নিচু
শুনিব তাহারে।
দেখিব তাদের যেথা ইন্দ্রধনু অকস্মাৎ ফুটে;
দিগন্তে বনের প্রান্তে উষার উত্তরী যেথা লুটে;
বিবাগী ফুলের গন্ধ মধ্যাহ্নে যেথায় যায় ছুটে;
নীড়ে-ধাওয়া পাখির ডানায়
সায়াহ্ন-গগন যেথা দিবসেরে বিদায় জানায়।

সেদিন আমার রক্তে শুনা যাবে দিবসরাত্রির
নৃত্যের নূপুর।
নক্ষত্র বাজাবে বক্ষে বংশীধ্বনি আকাশযাত্রীর
আলোকবেণুর।
সেদিন বিশ্বের তৃণ মোর অঙ্গে হবে রোমাঞ্চিত,
আমার হৃদয় হবে কিংশুকের রক্তিমালাঞ্ছিত;
সেদিন আমার মুক্তি, যবে হবে, হে চিরবাঞ্ছিত,
তোমার লীলায় মোর লীলা,—
যেদিন তোমার সঙ্গে গীতরঙ্গে তালে তালে মিলা।

পূরবী, র/২/৬৬৮-৬৭০

তুলনীয় প্রসঙ্গ : আমার মুক্তি এই আকাশে (১২২)

১২০। ক্ষিতিমোহন সেন সম্পাদিত 'দাদূ' গ্রন্থের ভূমিকা

প্রবাসী, ১৩৩২ ভাদ্র, ১৯২৫

...কবি সত্যকে যখন উপলব্ধি করেন তখন বুঝতে পারেন সত্যের প্রকাশ সহজেই সুন্দর। এইজন্যে তখন তিনি সত্যের রূপটিকে নিয়েই পড়েন তার অলংকারের আড়ম্বরে মন দেন না। বৈষ্ণব-পদে পড়েছি, রাধা যখন কৃষ্ণের মিলন চান, তখন গলার হারগাছির

আড়ালটুকুও তাঁর সয় না। তার মনে, কৃষ্ণই তাঁর কাছে একান্ত সত্য; সেই সত্যকে পেতে গেলে অলংকার শুধু যে বাহুল্য, তা নয়, তা বাধা।

সংসারে যেমন, সাহিত্যেও তেমনি, বিষয়াসক্ত লোক আছে। বিষয়ী লোকের লক্ষণই এই যে, তারা সত্যকে পায় না বলেই বস্তুকে নিয়ে বাড়াবাড়ি করে।...

আমার অপরিচিত হিন্দীসাহিত্যের মহলে কাব্যের বিশুদ্ধ রসরূপটি যখন খুঁজছিলুম, এমন সময় একদিন ক্ষিতিমোহন সেন মশায়ের মুখ থেকে বঘেল-খণ্ডের কবি জ্ঞানদাসের দুই-একটি হিন্দী পদ আমার কানে এল। আমি বলে উঠলুম, এই তো পাওয়া গেল। খাঁটি জিনিস, একেবারে চরম জিনিস, এর উপরে আর তান চলে না।...

ক্ষিতিবাবুর কল্যাণে ক্রমে হিন্দুস্থানের আরো কোনো কোনো সাধক কবির সঙ্গে আমার কিছু কিছু পরিচয় হল। আজ আমার মনে সন্দেহ নেই যে, হিন্দী ভাষায় একদা যে-গীত-সাহিত্যের আবির্ভাব হয়েছে তার গলায় অমরসভার বরমাল্য। অনাদরের আড়ালে আজ তার অনেকটা আচ্ছন্ন; উদ্ধার করা চাই, আর এমন ব্যবস্থা হওয়া চাই যাতে ভারতবর্ষের যারা হিন্দী ভাষা জানে না তারাও যেন ভারতের এই চিরকালের সাহিত্যে আপন উত্তরাধিকার-গৌরব ভোগ করতে পারে।

এই সকল কাব্যে যে-রস এত নিবিড় হয়ে প্রকাশ পেয়েছে সে হচ্ছে ভগবানের প্রতি প্রেমের রস। য়ুরোপীয় সাহিত্যে আমরা তো ঈশ্বর-সম্বন্ধে কাব্যরচনা কিছু কিছু পড়েছি, বার বার মনে হয়েছে, মেজ্‌রাপটাই কড়া হয়ে আওয়াজ করছে, তারটা তেমন বাজছে না। তাই খ্রীষ্টান-ধর্ম- সংগীতের বইগুলি সাহিত্যের অন্দরমহলে ঢুকতে পারলে না, গির্জাঘরেই আটকা পড়ে গেল। আসল কথা, শাস্ত্রের যে-ভগবান ধর্মকর্মের ব্যবহারে লাগেন, যিনি সনাতনপন্থী ধার্মিক লোকের ভগবান, তাঁকে নিয়ে আনুষ্ঠানিক শ্লোক চলে; তাঁর জন্যে অনেক মন্ত্রতন্ত্র; আর যে-ভগবানকে নিজের আত্মার মধ্যে ভক্ত সত্য করে দেখেছেন, যিনি অহৈতুক আনন্দের ভগবান, তাঁকে নিয়েই গান গাওয়া যায়। সত্যের পূজা সৌন্দর্যে, বিষ্ণুর পূজা নারদের বীণায়।

কবি ওয়ার্ড্‌স্বার্থ্ আক্ষেপ করে বলেছেন জগতের সঙ্গে আমরা অত্যন্ত বেশি করে লেগে আছি। আসল কথাটা জগতের সঙ্গে, আমরা বেশি করে নয়, অত্যন্ত খুচরো করে লেগে আছি। আজ এটুকু দরকার, কাল ওটুকু, আজ এখানে ডাক, কাল ওখানে। পুরো মন দিয়ে পুরো বিশ্বকে দেখি নে। আমাদের দরকারের সঙ্গে তার খানিকটা জোড়া, খানিকটা ছেঁড়া, খানিকটা বিরুদ্ধ। প্রতিদিনের এই দেনাপাওনার জগতে আমাদের হিসাবী বুদ্ধিটাই মনের আর-সব বিভাগকে কম-বেশি-পরিমাণে দাবিয়ে রেখে মুরুব্বিয়ানা করে বেড়ায়। যে হিসাবী বুদ্ধিটা গুন্‌তি করে, ওজন করে, মাপ করে, ভাগ করে, তার কাছ থেকে আমরা অনেক খবর পাই, তার যোগে ছোটোবড়ো নানা বিষয়ে সিদ্ধিলাভও করি, অর্থাৎ তার মহলটা হল লাভের মহল, কিন্তু বিশুদ্ধ আনন্দের মহল নয়।

পূর্বে কোথাও কোথাও এ-কথা বুঝিয়ে বলবার চেষ্টা করেছি যে, যেখানে স্বার্থের বাইরে, প্রয়োজনের বাইরে মানুষের বিশেষ-কোনো বাস্তব লাভক্ষতির বাইরে কোনো একটি একের পূর্ণতা হৃদয়ে অনুভব করতে পারি সেখানে আমাদের বিশুদ্ধ আনন্দ। জ্ঞানের মহলেও তার পরিচয় পেয়েছি, দেখেছি টুকরো টুকরো তথ্য মনের পক্ষে বোঝা,

যেই কোনো-একটিমাত্র তত্ত্বে সেই বিচ্ছিন্ন বহু ধরা দেয় অমনি আমাদের বুদ্ধি আনন্দিত হয়, বলে, পেয়েছি সত্যকে। তাই আমরা জানি, ঐক্যই সত্যের রূপ, আর আনন্দই তার রস।

অধিকাংশ মানুষকেই আমরা বহুর ভিড়ের ভিতরে দেখি, বিপুল অনেকের মধ্যে তারা অনির্দিষ্ট। যে-মানুষকে ভালোবাসি, সাধারণ অনেকের মাঝখানে সে বিশেষ এক। এই নিবিড় ঐক্যের বোধেই বন্ধু আমার পক্ষে হাজার লক্ষ অবন্ধুর চেয়ে সত্যতর। বন্ধুকে যেমন বিশেষ একজন ক'রে দেখলুম, বিশ্বের অন্তরতম এককে যদি তেমনি স্পষ্ট ক'রে দেখতে পাই তা হলে বুঝতে পারি সেই সত্য আনন্দময়। আমার আত্মার মধ্যে একের উপলব্ধি যদি তেমনি সত্য করে প্রকাশ পায় তা হলে জীবনের সুখে দুঃখে লাভে ক্ষতিতে কোথাও আমার আনন্দের বিচ্ছেদ ঘটে না। যতক্ষণ সেই উপলব্ধি আমাদের না হয়, ততক্ষণ আমাদের চৈতন্য বিশ্বসৃষ্টির মধ্যে বিচ্ছিন্ন। যখন সেই উপলব্ধিতে এসে পৌঁছই আমাদের চৈতন্য তখন অখণ্ডভাবে সেই সৃষ্টিসংগীতেরই অংগ হয়ে ওঠে। তখন সে শুধুমাত্র জানে না, শুধুমাত্র করে না, সমস্তের সংগে সুরে বেজে ওঠে।

সৃষ্টিতে অসৃষ্টিতে তফাত হচ্ছে এই যে, সৃষ্টিতে বহু আপন একককে দেখায়, আর তে বহু আপন বিচ্ছিন্ন বহুত্বকেই দেখায়। সমাজ হল মানুষের একটি বড়ো সৃষ্টি, সেখানে প্রত্যেক মানুষই অন্যসকলের সংগে আপন সামাজিক ঐক্যকে দেখায়; আর ভিড় হচ্ছে অসৃষ্টি, সেখানে প্রত্যেক মানুষ ঠেলাঠেলি ক'রে আপনাকেই স্বতন্ত্র দেখায়; আর দাংগাবাজি হচ্ছে অনাসৃষ্টি; তার মধ্যে কেবল পরস্পরের অনৈক্য নয় বিরুদ্ধতা। ইমারৎ হল সৃষ্টি, ইঁটের গাদা হল অসৃষ্টি, আর যখন দেয়াল ভেঙে ইঁটগুলো হুড়মুড় ক'রে পড়ছে সে হল অনাসৃষ্টি।

এই ঐক্যটি বস্তুর একত্র হওয়ার মধ্যে নয়, এ যে একটি অনির্বচনীয় অদৃশ্য সম্বন্ধের রহস্য। ফুলের মধ্যে যে-ঐক্য দেখে আমরা আনন্দ পাই, সে তার বস্তুপিণ্ডে নেই, সে তার গভীর অন্তর্নিহিত এমন একটি সত্যের মধ্যে যা সমস্ত বিশ্বভুবনে একের সংগে আরেকে নিগূঢ় সামঞ্জস্যে ধারণ করে আছে। এই সম্বন্ধের সত্য মানুষকে আনন্দ দেয়, মানুষকেও সৃষ্টিকার্যে প্রবৃত্ত করে।

মানুষের অন্তর্বর্তী সেই সৃষ্টিকর্তা মধ্যযুগের সাধকদের মধ্যে যে-ভগবানের স্পর্শ পেয়েছিলেন, তিনি শাস্ত্রে বর্ণিত কেউ নন, তিনি মনে প্রাণে হৃদয়ে আবিষ্কৃত অদ্বৈত পরমানন্দরূপ। সেইজন্যেই মন্ত্র পড়ে তাঁর পূজা হল না, গান দিয়ে তাঁর আবাহন হল। তিনি প্রত্যক্ষ সত্যরূপে জীবনে আবির্ভূত হয়েছিলেন বলে সহজসুন্দররূপে কাব্যে প্রকাশ পেলেন।

ইংরেজ কবি শেলি তাঁর সৌন্দর্য-লক্ষ্মীর স্তব নামক কবিতায় বলছেন একটি অদৃশ্য শক্তির মহতী ছায়া বিশ্বে আমাদের মধ্যে ভেসে বেড়াচ্ছে। সেই ছায়াটি চঞ্চল, সে মধুর, সে রহস্যময়, সে আমাদের প্রিয়। তারই আবির্ভাবে আমাদের পূর্ণতা, তারই অভাবে আমাদের অবসাদ। প্রশ্ন এই মনে জাগে যাঁর এই ছায়া তাঁর সংগে ক্ষণে ক্ষণে আমাদের বিচ্ছেদ কেন? কেন জগতে সুখ-দুঃখ, আশা-নৈরাশ্য, রাগ-দ্বেষের এই নিরন্তর দ্বন্দ্ব? কবি বলেন, শাস্ত্রে জনশ্রুতিতে দেবতা দৈত্য স্বর্গ প্রভৃতি যে-সব পদার্থের কল্পনা

পাওয়া যায়, তাদের নাম ধ'রে প্রশ্ন করলে জবাব মেলে কই ? কবি বলেন, তিনি তো অনেক চেষ্টা করেছেন, তত্ত্বকথা জেনে নেবেন ব'লে পোড়ো বাড়ির শূন্য ঘরে, গুহার গহবরে অন্ধকারে ভূতপ্রেতেরও সন্ধান ক'রে ফিরেছেন, কিন্তু না পেলেন কারো দেখা, না পেলেন কারো সাড়া। অবশেষে একদিন বসন্তে যখন দক্ষিণ হাওয়ার আন্দোলনে বনে বনে প্রাণের গোপন-বাণী জাগবে-জাগবে করছে এমন সময় হঠাৎ তাঁর অন্তরের মধ্যে এই সৌন্দর্য-লক্ষ্মীর স্পর্শ নেমে এল, মুহূর্তে তাঁর সংশয় ঘুচে গেল। শাস্ত্রের মধ্যে যাঁকে খুঁজে পান নি তিনি যখন হঠাৎ চিত্তের মধ্যে ধরা দিলেন, তখনই জগতের সমস্ত দ্বন্দ্বের মধ্যে একের আবির্ভাব প্রকাশিত হল, তখন কবি দেখলেন, জগতের মুক্তি এইখানে, এই মহা সুন্দরের মধ্যে। তখনই কবির আত্মনিবেদন গানে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল।

আমাদের সাধক কবিদের অন্তর থেকে গানের উৎস এমনি করেই খুলেছে। তাঁরা রামকে, আনন্দস্বরূপ পরম এককে আত্মার মধ্যে পেয়েছিলেন। তাঁরা সকলেই প্রায় অন্ত্যজ, সমাজের নীচের তলাকার; পণ্ডিতদের বাঁধা মতের শাস্ত্র, ধার্মিকদের বাঁধা নিয়মের আচার তাঁদের কাছে সুগম ছিল না। বাইরের পূজাব মন্দির তাঁদের কাছে বন্ধ ছিল বলেই অন্তরের মিলনমন্দিরের চাবি তাঁরা খুঁজে পেয়েছিলেন। তাঁরা কত শাস্ত্রীয় শব্দ আন্দাজে ব্যবহার করেছেন, শাস্ত্রের সঙ্গে তার অর্থ মেলে না। তাঁদের এই প্রত্যক্ষ উপলব্ধির রাম কোনো পুরাণের মধ্যে নেই। তুলসীদাসের মতো ভক্ত কবিও এদের এই বাঁধনছাড়া সাধনভজনে ভারি বিরক্ত। তিনি সমাজের বাহ্য বেড়ার ভিতর থেকে দেখেছিলেন, একেবারেই চিনতে পারেন নি।

এঁরা হলেন এক বিশেষজাতের মানুষ। ক্ষিতিবাবুর কাছে শুনেছি, আমাদের দেশে এঁদের দলের লোককে বলে থাকে 'মরমিয়া'। এঁদের সৃষ্টি, এঁদের স্পর্শ মর্মের মধ্যে; এঁদের কাছে আসে সত্যের বাহিরের মূর্তি নয়, তার মর্মের স্বরূপ। বাঁধা পথে যাঁরা সাবধানে চলেন তাঁরা সহজেই সন্দেহ করতে পারেন যে, এঁদের দেখা এঁদের বলা সব বুঝি পাগলের খামখেয়ালি। অথচ সকল দেশে সকল কালেই এই দলের লোকের বোধের ও বাণীর সাদৃশ্য দেখতে পাই। সব গাছেরই দেখি কাঠের থেকে একই আগুন মেলে। সে আগুন তারা কোনো চুলো থেকে যেচে নেয় নি—চার দিক থেকে আপনিই ধরে নিয়েছে। গাছের পাতায় সূর্যের আলোর ছোঁওয়া লাগে, অমনিই এক জাগ্রৎ শক্তির জোরে বাতাস থেকে তারা কার্বন ছেঁকে নেয়, তেমনি মানবসমাজের সর্বত্রই এই মরমিয়াদের একটি সহজ শক্তি দেখা যায়, উপর থেকে তাঁদের মনে আলো পড়ে আর তাঁরা চার দিকের বাতাস থেকে আপনিই সত্যের তেজোরূপটিকে নিজের ভেতরে ধ'রে নিতে পারেন, পুঁথির ভাণ্ডারে শাস্ত্রবচনের সনাতন সঞ্চয়ের থেকে কুড়িয়ে কুড়িয়ে তাঁদের সংগ্রহ নয়। এইজন্যে এঁদের বাণী এমন নবীন, তার রস কখনো শুকোয় না।

অনন্তকে তো জ্ঞানে কুলিয়ে ওঠে না—ঋষি তাই বলেন, তাঁকে না পেয়ে মন ফিরে আসে। সেই অনন্তের সমস্ত রহস্য বাদ দিয়ে তাঁকে সম্প্রদায়ের ঈশ্বর, শাস্ত্রবাক্যের ঈশ্বর, কবুলতিপত্রের দশে মিলে দস্তখতের দ্বারা স্বীকার করে নেওয়া, হাটে বাটে গোলে হরিবোলের ঈশ্বর করে নিই। সেই বরদাতা, সেই ত্রাণকর্তা, সেই সুনির্দিষ্টমতের ফ্রেম দিয়ে বাঁধানো ঈশ্বরের ধারণা একেবারে পাথরের মতো শক্ত; তাকে মুঠোয় করে নিয়ে সাম্প্রদায়িক ট্যাঁকে গজে রাখা চলে পরস্পরের মাথা ভাঙাভাঙি করা সহজ হয়।

আমাদের মরমিয়াদের ঈশ্বর কোনো একটি পুণ্যাভিমানী দলবিশেষের সরকারী ঈশ্বর নন, তিনি প্রাণেশ্বর।

কেননা ঋষি বলেছেন, জ্ঞানে তাঁকে পাওয়া যায় না, আনন্দেই তাঁকে পাওয়া যায়। অর্থাৎ হৃদয়ে যখন অনন্তকে স্পর্শ করে তখন হৃদয়মন তাঁকে অমৃত বলে বোধ করে, আর এই নিবিড় রসবোধেই সমস্ত সংশয় দূর হয়ে যায়। শেলি সেই বোধের গানই গেয়েছেন, মরমিয়া কবিদের কণ্ঠে সেই বোধেরই গান। যা রহস্য, জ্ঞানের কাছে তা নিছক অন্ধকার, তা একেবারে নেই বললেই হয়। কিন্তু যা রহস্য, হৃদয়ের কাছে তারই আনন্দ গভীর। সেই আনন্দের দ্বারাই হৃদয় অসীমতার সত্যকে প্রত্যক্ষ চিনতে পারে। তখন সে কোনো বাঁধা রীতি মানে না, কোনো মধ্যস্থের ঘটকালিকে কাছে ঘেঁষতে দেয় না।

অমৃতের রসবোধ যার হয় নি, সে-ই মানে ভয়কে, ক্ষুধাকে, ক্ষমতাকে। সে এমন একটি দেবতাকে মানে, যিনি বর দেন, নয় দণ্ড দেন। যাঁর দক্ষিণে স্বর্গ, বামে নরক। যিনি দূরে বসে কড়া হুকুমে বিশ্বশাসন করেন। যাঁকে পশুবলি দিয়ে খুশি করা চলে, যাঁর গৌরব প্রচার করবার জন্যে পৃথিবীকে রক্তে ভাসিয়ে দিতে হয়, যাঁর নাম করে মানবসমাজে এত ভেদবিচ্ছেদ, পরস্পরের প্রতি এত অবজ্ঞা, এত অত্যাচার।

ভারতের মরমিয়া কবিরা শাস্ত্রনির্মিত পাথরের বেড়া থেকে ভক্তের মনকে মুক্তি দিয়েছিলেন। প্রেমের অশ্রুজলে দেবমন্দিরের অঙ্গন থেকে রক্তপাতের কলঙ্করেখা মুছে দেওয়া ছিল তাঁদের কাজ। যাঁর আবির্ভাব ভিতরের থেকে আনন্দের আলোকে মানুষের সকল ভেদ মিটিয়ে দেয়, সেই রামের দূত ছিলেন তাঁরা। ভারত ইতিহাসের নিশীথরাত্রে ভেদের পিশাচ যখন বিকট নৃত্য করছিল তখন তাঁরা সেই পিশাচকে স্বীকার করেন নি। ইংরেজ মরমিয়া কবি যেমন দৃঢ় বিশ্বাসের সঙ্গে বলেছিলেন যে, বিশ্বের মর্মাধিষ্ঠাত্রী দেবী আনন্দ-লক্ষ্মীই মানুষকে সকল বন্ধন থেকে মুক্তি দেবেন, তেমনি তাঁরা নিশ্চয় জানতেন যাঁর আনন্দে তাঁরা আপনাকে অহমিকার বেষ্টন থেকে ভাসিয়ে দিতে পেরেছিলেন, তাঁরই আনন্দে মানুষের ভেদবুদ্ধি দূর হতে পারবে; বাইরের কোনো রফারফি থেকে নয়। তাঁরা এখনো কাজ করছেন। আজও যেখানে কোথাও হিন্দু মুসলমানের আন্তরিক প্রেমের যোগ দেখি সেখানে দেখতে পাই তাঁরাই পথ করে দিয়েছেন। তাঁদের জীবন দিয়ে গান দিয়ে সেই মিলনদেবতার পূজাপ্রতিষ্ঠা হয়েছে যিনি 'সেতুর্বিধরণরেষাং লোকানামসম্ভেদায়।' তাঁদেরই উত্তরসাধকেরা আজও বাংলা দেশের গ্রামে গ্রামে একতারা বাজিয়ে গান গায়; তাদের সেই একতারার তার ঐক্যেরই তার। ভেদবুদ্ধির পান্ডা শাস্ত্রজ্ঞের দল তাদের দণ্ড উদ্যত করেছে। কিন্তু এতদিন যারা সামাজিক অবজ্ঞায় মরে নি, তারা যে সামাজিক শাসনের কাছে আজ হার মানবে এ-কথা বিশ্বাস করি নে।

যেহেতু ভারতীয় সমাজ ভেদবহুল, যেহেতু এখানে নানা ভাষা, নানা ধর্ম, নানা জাতি, সেইজন্যেই ভারতের মর্মের বাণী হচ্ছে ঐক্যের বাণী। সেইজন্যেই যাঁরা যথার্থ ভারতের শ্রেষ্ঠপুরুষ তাঁরা মানুষের আত্মায় আত্মায় সেতু নির্মাণ করতে চেয়েছেন। যেহেতু বাহিরের আচার ভারতে নানা আকারে ভেদকেই পাকা করে রেখেছে এইজন্যেই ভারতের শ্রেষ্ঠ সাধনা হচ্ছে বাহ্য আচারকে অতিক্রম করে অন্তরের সত্যকে স্বীকার করা। পরম্পরাক্রমে ভারতবর্ষের মহাপুরুষদের আশ্রয় করে এই সাধনার ধারা চিরদিনই

চলেছে। অথচ ভারতসমাজের বাহিরের অবস্থার সংগে তার অন্তরের সাধনার চিরদিনই বিরোধ, যেমন বিরোধ ঝর্ণার সংগে তার স্রোতঃপথের পাথরগুলোর। কিন্তু অচল বাধাকেই কি সত্য বলব, না সচল প্রবাহকে ? সংখ্যাগণনায় বাধারই জিত, তার ভারও কম নয়, কিন্তু তাই বলেই তাকে প্রাধান্য দিতে পারি নে। ঝির্ ঝির্ করে একটুখানি যে-জল শৈলরাজের বক্ষ-গুহা থেকে বেরিয়ে আসছে, বহু আঘাত-ব্যাঘাতের ভিতর দিয়ে বিপুল বিস্তীর্ণ বালুকারাশির একপ্রান্তে কোনোমতে পথ করে নিয়ে সমুদ্রসন্ধানে চলেছে, পর্বতের বরফগলা বাণী তারই লহরীতে। এই শীর্ণ স্বচ্ছ প্রচ্ছন্ন ধারাটিই মহায়তন বহুবিচ্ছিন্নতার ভিতরকার ঐক্যসূত্র।

ভারতের বাণী বহন ক'রে যে-সকল একের দূত এদেশে জন্মেছেন তাঁরা যে প্রথম হতেই এখানে আদর পেয়েছেন তা নয়। দেশের লোক নিতান্তই যখন তাঁদের অস্বীকার করতে পারে নি তখন নানা কাল্পনিক কাহিনী দ্বারা তারা তাঁদের স্মৃতিকে চেয়েছে শোধন করে নিতে, যতটা পেরেছে তাঁদের চরিতের উপর সনাতনী রঙের তুলি বুলিয়েছে। তবু ভারতের এই শ্রেষ্ঠ সন্তানেরা জনাদর পেতে বাধা পেয়েছিলেন এ-কথা মনে রাখা চাই; সে আদর না পাওয়াই স্বাভাবিক, কেননা তাঁরা ভেদ-প্রবর্তক সনাতন বিধির বাহিরের লোক, যেমন খ্রীস্ট ছিলেন য়িহুদী ফ্যারিসি-গন্ডির বাহিরে। কিন্তু বহুদিন তাঁরা অনাদরের অসাম্প্রদায়িক ছায়ায় প্রচ্ছন্ন ছিলেন বলে তাঁরাই যে অভারতীয় ছিলেন তা নয়। তারাই ছিলেন যথার্থ ভারতীয়, কেননা তারাই বাহিরের কোনো সুবিধা থেকে নয় অন্তরের আত্মীয়তা থেকে হিন্দুকে মুসলমানকে এক করে জেনেছিলেন—তাঁরাই ঋষিদের সেই বাক্যকে সাধনার মধ্যে প্রমাণ করেছিলেন যে-বাক্য বলে, সত্যকে তিনিই জানেন যিনি আপনাকেই জানেন সকলের মধ্যে।

ভারতীয় এই সাধকদেরই সাধনাধারা বর্তমান কালে প্রকাশিত হয়েছে রামমোহন রায়ের জীবনে। এই যুগে তিনি উপনিষদের ঐক্যতত্ত্বের আলোকে হিন্দু-মুসলমান খ্রীষ্টানকে সত্যদৃষ্টিতে দেখতে পেয়েছিলেন, তিনি কাউকেই বর্জন করেন নি। বুদ্ধির মহিমায় ও হৃদয়ের বিপুলতায় তিনি এই বাহ্যভেদের ভারতে আধ্যাত্মিক অভেদকে উজ্জ্বল ক'রে উপলব্ধি করেছিলেন এবং সেই অভেদকে প্রচার করতে গিয়ে দেশের লোকের কাছে আজও তিনি তিরস্কৃত। যাঁর নির্মল দৃষ্টির কাছে হিন্দু-মুসলমান খ্রীস্টানের শাস্ত্র আপন দুরূহ বাধা সরিয়ে দিয়েছিল তাঁকে আজ তারাই অভারতীয় বলতে স্পর্ধা করছে পাশ্চাত্য বিদ্যা ছাড়া আর কোনো বিদ্যায় যাদের অভিনিবেশ নেই। আজকের দিনেও রামমোহন রায় আমাদের দেশে যে জন্মেছেন তাতে এই বুঝতে পারি যে, কবীর নানক দাদূ ভারতের যে সত্যসাধনাকে বহন করেছিলেন আজও সেই সাধনার প্রবাহ আমাদের প্রাণের ক্ষেত্র পরিত্যাগ করেনি। ভারতচিত্তের প্রকাশের পথ উদ্‌ঘাটিত হবেই।

মাটির নীচের তলায় জলের স্রোত বইছে, ঘোর শুষ্কতার দিনে এই আশার কথাটি মনে করিয়ে দেওয়া চাই। মরুর বেড়া লোহার বেড়ার চেয়ে দুস্তর। আমাদের দেশে সেই শুষ্কতার সেই অপ্রেমের বেড়াই সকলের চেয়ে সর্বনেশে হয়ে দিকে দিকে প্রসারিত। প্রয়োজনের যোগ মশকে জল বহে-নেওয়া সার্থবাহের যোগের মতো। তাতে ক্ষণে ক্ষণে বিশেষ কোনো একটা কাজ দেয়, কখনো বা দেয়ও না, বালির আঁধিতে সব চাপা দিয়ে

ফেলে; মশকের জল তেতে উঠে, শুকিয়ে যায়, ফুটো দিয়ে ঝরে পড়ে। এই মরুপথে যেখানে মাটির নীচের চিরবহমান লুকানো জল উৎসারিত হয়ে ওঠে সেইখানেই বাঁচোয়া। মরমিয়া কবিদের বাণীস্রোত বইছে সমাজের অগোচর স্তরে। শুষ্কতার বেড়া ভাঙবার সত্যকার উপায় আছে সেই প্রাণময়ী ধারার মধ্যে। তাকে আজ সাহিত্যের উপরিতলে উদ্ধার করে আনতে হবে। আমাদের পুরাণে আছে যে-সগর বংশ ভস্ম হয়ে রসাতলে পড়েছিল তাদেরই বাঁচিয়ে দেবার জন্যে বিষ্ণুপাদপদ্মবিগলিত জাহ্নবীধারাকে বৈকুণ্ঠ থেকে আবাহন করে আনা হয়েছিল। এর মধ্যে গভীর অর্থটি এই যে, প্রাণ যেখানে দগ্ধ হয়ে গেছে সেখানে তাকে রসপ্রবাহেই বাঁচিয়ে তোলা যায়, কেবল মাত্র, কোনো একটা কর্মের আবর্তনে তাকে নড়ানো যায় মাত্র, বাঁচানো যায় না। মৃত্যু থেকে মানুষের চিত্তকে পরিত্রাণ করার জন্যে বৈকুণ্ঠের অমৃতরস প্রস্রবণের উপরেই আমাদের মরমিয়া কবিরা দৃঢ় আস্থা রেখেছিলেন, কোনো একটা বাহ্য আচারের রাজিনামার উপরে নয়। তাঁরা যে-রসের ধারাকে বৈকুণ্ঠ থেকে এনেছিলেন, আমাদের দেশের সামাজিক বালুর তলায় তা অন্তর্হিত। কিন্তু তা মরে যায় নি। ক্ষিতিমোহনবাবু ভার নিয়েছেন বাংলা দেশে সেই লুপ্তস্রোতকে উদ্ধার ক'রে আনবার। শুধু কেবল হিন্দী ভাষা থেকে নয়, আশা ক'রে আছি বাংলা ভাষার গুহার থেকে বাউলদের সেই সুবর্ণরেখার বাণীধারাকে প্রকাশ করবেন যার মধ্যে সোনার কণা লুকিয়ে আছে।

টীকা :

ক্ষিতিমোহন সেন সম্পাদিত 'দাদূ' গ্রন্থের ভূমিকা—ক্ষিতিমোহন সেন মধ্যযুগীয় ভক্তিবাদী সাধক 'দাদূর' জীবনী ও রচনা সংকলন করে গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেন। রবীন্দ্রনাথ তার ভূমিকা রচনা করেছিলেন। এই ভূমিকাটি ১৩৩২ সালের ভাদ্র মাসের (১৯২৫) প্রবাসী পত্রিকায় ছাপা হয়েছিল।

ক্ষিতিমোহন সেন—১৯০৮ খৃঃ রবীন্দ্রনাথের আহ্বানে বিশ্বভারতীর ব্রহ্মচর্যাশ্রমে যোগদান করেন ও বিশ্বভারতী-বিদ্যাভবনের অধ্যক্ষরূপে কর্মজীবন শেষ করেন। কিছুদিন বিশ্বভারতীর অস্থায়ী উপাচার্য ছিলেন। ভারতীয় মধ্যযুগের ধর্মসাধনার বিষয়ে তাঁর প্রবল আগ্রহ ছিল। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ দাদূ, ভারতীয় মধ্যযুগের সাধনার ধারা, ইত্যাদি। ১৯৫২ খৃঃ বিশ্বভারতীর প্রথম 'দেশিকোত্তম' উপাধি পান।

তুলসীদাস—হিন্দী সাহিত্যের সুবিখ্যাত কবি। তাঁর 'রামচরিতমানস' অত্যন্ত প্রভাবশালী গ্রন্থ।

জন্ম-আনুঃ ১৫২৩ (মতান্তরে ১৫৩১); মৃত্যু-১৬২৩/২৪

রামমোহন রায়—উনিশ শতকের নবজাগরণের—বাঙালির সামাজিক ও সাংস্কৃতিক আধুনিকতার প্রধান পথিকৃৎ। বিশিষ্ট বাঙালি চিন্তানায়ক। সতীদাহ-নিবারণ ও অন্যান্য সমাজসংস্কারক-কর্মের জন্য বিখ্যাত। নিরাকারবাদী বৈদান্তিক—ব্রাহ্মধর্ম বা ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠাতা। বাংলা গদ্যের ভিত্তিস্থাপনকারীদের অন্যতম।

জন্ম-১৭৭৪, মৃত্যু-১৮৩৩।

কবীর—মধ্যযুগের ভক্তিবাদী সাধককবি। তিনি হিন্দু ও মুসলমান ধর্মের মধ্যে সমন্বয়ের চেষ্টা করেন এবং ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান, সামাজিক রীতি-নীতি ও সংস্কারের বিরোধিতা করায় তিনি উভয় সম্প্রদায়ের ধর্মান্ধ ব্যক্তিদের অপ্রীতিভাজন হন।

আনু. ১৪৪০-১৫৫৮

নানক—মধ্যযুগের উদার ভক্তিবাদী সাধক। শিখধর্মের প্রতিষ্ঠাতা। পাঞ্জাবে জন্মগ্রহণ করেন।

জন্ম-১৪৬৯, মৃত্যু-১৫৩৮

দাদূ—মধ্যযুগের বিখ্যাত ভক্তিবাদী সাধক। তিনি মানুষে মানুষে সর্বাধিক কৃত্রিম বিভেদের বিরোধ ছিলেন। নিষ্প্রাণ সাধনপদ্ধতি, অর্থহীন আচার, বাহ্য ভেখ ইত্যাদির প্রতি তাঁর বিরাগ ছিল।

জন্ম-আনুঃ ১৫৪৪, মৃত্যু-১৬০৩।

তুলনীয় প্রসঙ্গ : আমার প্রাণের মানুষ (৮৫), আমি তারেই জানি (১৪৮), আমি তারেই খুঁজে বেড়াই (১১৫), আমি কান পেতে (১১৬), আপনি আমার কোনখানে (১২৩), ওরা অন্ত্যজ, ওরা মন্ত্রহীন (১৫৫)

১২১। ধর্মমোহ

৩১ বৈশাখ ১৩৩৩ (১৯২৬)

ধর্মের বেশে মোহ যারে এসে ধরে
অন্ধ সে-জন মারে আর শুধু মরে।
নাস্তিক সেও পায় বিধাতার বর,
ধার্মিকতার করে না আড়ম্বর।
শ্রদ্ধা করিয়া জ্বালে বুদ্ধির আলো,
শাস্ত্রে মানে না, মানে মানুষের ভালো।

বিধর্ম বলি মারে পরধর্মেরে,
নিজ ধর্মের অপমান করি ফেরে,
পিতার নামেতে হানে তাঁর সন্তানে,
আচার লইয়া বিচার নাহিক জানে,
পূজাগৃহে তোলে রক্তমাখানো ধ্বজা,—

দেবতার নামে এ যে শয়তান ভজা।

অনেক যুগের লজ্জা ও লাঞ্ছনা,
বর্বরতার বিকারবিড়ম্বনা,
ধর্মের মাঝে আশ্রয় দিল যারা
আবর্জনায় রচে তারা নিজ কারা।—
প্রলয়ের ওই শুনি শৃংগধ্বনি,
মহাকাল আসে লয়ে সম্মার্জনী।

যে দেবে মুক্তি তারে খুঁটিরূপে গাড়া,
যে মিলাবে তারে করিল ভেদের খাঁড়া,
যে আনিবে প্রেম অমৃত-উৎস হতে
তারি নামে ধরা ভাসায় বিষের স্রোতে,
তরী ফুটা করি পার হতে গিয়ে ডোবে,—
তবু এরা কারে অপবাদ দেয় ক্ষোভে।

হে ধর্মরাজ, ধর্মবিকার নাশি
ধর্মমূঢ়জনেরে বাঁচাও আসি।
যে-পূজার বেদি রক্তে গিয়াছে ভেসে
ভাঙো ভাঙো, আজি ভাঙো তারে নিঃশেষে,—
ধর্মকারার প্রাচীরে বজ্র হানো,
এ অভাগা দেশে জ্ঞানের আলোক আনো।

পরিশেষ, র/২/৯৬৪

১২২। আমার মুক্তি আলোয় আলোয়

১৯ সেপ্টেম্বর ১৯২৬, ১৩৩৩

আমার মুক্তি আলোয় আলোয় এই আকাশে,
আমার মুক্তি ধুলায় ধুলায় ঘাসে ঘাসে।।
দেহমনের সুদূর পারে হারিয়ে ফেলি আপনারে,
গানের সুরে আমার মুক্তি ঊর্ধ্বে ভাসে।।
আমার মুক্তি সর্বজনের মনের মাঝে,
দুঃখবিপদ-তুচ্ছ-করা কঠিন কাজে।
বিশ্বধাতার যজ্ঞশালা, আত্মহোমের বহ্নি জ্বালা-
জীবন যেন দিই আহুতি মুক্তি-আশে।

গীতবিতান, র/৪/১১৮

১২৩। আপনি আমার কোন্‌খানে

১৯ আশ্বিন ১৩৩৩ (১৯২৬)

আপনি আমার কোন্‌খানে
বেড়াই তারি সন্ধানে।।
নানান রূপে নানান বেশে ফেরে যেজন ছায়ার দেশে
তার পরিচয় কেঁদে হেসে শেষ হবে কি, কে জানে।।
আমার গানের গহন-মাঝে শুনেছিলেম যার ভাষা
খুঁজে না পাই তার বাসা।
বেলা কখন যায় গো বয়ে, আলো আসে মলিন হয়ে,
পথের বাঁশি যায় কী কয়ে বিকালবেলার মুলতানে।।

গীতবিতান-২২৯, র/৪/১৭৭

তুলনীয় প্রসঙ্গ : আমার প্রাণের মানুষ (৮৫), আমি তারেই জানি (১৪৮), আমি তারেই খুঁজে বেড়াই (১১৫), আমি কান পেতে রই (১২৬), আমার হিয়ার মাঝে (১০১)

১২৪। মানবসম্বন্ধের দেবতা

২৫ ডিসেম্বর ১৯২৬ (১৩৩৩)

এই সংসারে একটা জিনিস অস্বীকার করতে পারি নে যে, আমরা বিধানের বন্ধনে আবদ্ধ। আমাদের জীবন, আমাদের অস্তিত্ব বিশ্বনিয়মের দ্বারা দৃঢ়ভাবে নিয়ন্ত্রিত। এ-সমস্ত নিয়মকে সম্পূর্ণভাবে স্বীকার করতেই হবে, নইলে নিষ্কৃতি নেই। নিয়মকে যে পরিমাণে জানি ও মানি সেই পরিমানেই স্বাস্থ্য পাই, সম্পদ পাই, ঐশ্বর্য পাই। কিন্তু জীবনে একটা সত্য আছে যা এই নিয়মের মধ্যে আপনাকে দেখতে পায় না। কেননা নিয়মের মধ্যে পাই বন্ধন, আত্মার মধ্যে চাই সম্বন্ধকে। বন্ধন এক-তরফা, সম্বন্ধে দুই পক্ষের সমান যোগ। যদি বলি বিশ্বব্যাপারে আমার আত্মার কোনো অসীম সম্বন্ধের ক্ষেত্র নেই, শুধু কতকগুলি বাহ্যসম্পর্কসূত্রেই সে ক্ষণকালের জন্য জড়িত—তা হলে জানব তার মধ্যে যে-একটি গভীর ধর্ম আছে নিখিলের মধ্যে তার কোনো নিত্যকালীন সাড়া নেই। কেননা, তার মধ্যে যা আছে তা কেবল সত্তার নিয়ম নয়, সত্তার আনন্দ। এই-যে তার আনন্দ এ কি কেবল সংকীর্ণভাবে তারই মধ্যে? অসীমের মধ্যে কোথাও তার প্রতিষ্ঠা নেই? এর সত্যটা তা হলে কোন্‌খানে? সত্যকে আমরা একের মধ্যে খুঁজি। হাত থেকে লাঠি পড়ে গেল, গাছ থেকে ফল পড়ল, পাহাড়ের উপর থেকে ঝরনা নিচে নেমে এল, এ-সমস্ত ঘটনাকে যেই এক তত্ত্বের মধ্যে দেখতে পেলে অমনি মানুষের মন বললে 'সত্যকে দেখেছি'। যতক্ষণ এই ঘটনাগুলি আমাদের কাছে বিচ্ছিন্ন ততক্ষণ আমাদের কাছে তারা নিরর্থক। তাই বৈজ্ঞানিক বলেন, তথ্যগুলি বহু, কিন্তু তারা সত্য হয়েছে অবিচ্ছিন্ন ঐক্যে।

এই তো গেল বস্তুরাজ্যের নিয়মক্ষেত্র, কিন্তু অধ্যাত্মরাজ্যের আনন্দক্ষেত্রে কি এই ঐক্যতত্ত্বের কোনো স্থান নেই?

আমরা আনন্দ পাই বন্ধুতে, সন্তানে, প্রকৃতির সৌন্দর্যে। এগুলি ঘটনার দিক থেকে বহু, কিন্তু কোনো অসীম সত্যে কি এদের চরম ঐক্য নেই? এ প্রশ্নের উত্তর বৈজ্ঞানিক দেন না, দেন সাধক। তিনি বলেন, 'বেদাহমেতম্, আমি যে এঁকে দেখেছি, রসো বৈ সঃ, তিনি যে রসের স্বরূপ—তিনি যে পরিপূর্ণ আনন্দ।' নিয়মের বিধাতাকে তো পদে পদেই দেখতে পাচ্ছি, কিন্তু ঋষি যাঁকে বলছেন 'স নো বন্ধুর্জনিতা', কে সেই বন্ধু, কে সেই পিতা? যিনি সত্যদ্রষ্টা তিনি হৃদা মনীষা মনসা' সকল বন্ধুর ভিতর দিয়ে সেই এক বন্ধুকে, সকল পিতার মধ্য দিয়ে সেই এক পিতাকে দেখছেন। বৈজ্ঞানিকের উত্তরে প্রশ্নের যেটুকু বাকি থাকে তার উত্তর তিনিই দেন। তখন আত্মা বলে, 'আমার জগৎকে পেলুম, আমি বাঁচলুম।' আমাদের অন্তরাত্মার এই প্রশ্নের উত্তর যাঁরা দিয়েছেন তাঁদেরই মধ্যে একজনের নাম যিশুখৃষ্ট। তিনি বলেছেন, 'আমি পুত্র, পুত্রের মধ্যেই পিতার আবির্ভাব'। পুত্রের সঙ্গে পিতার শুধু কার্যকারণের যোগ নয়, পুত্রে পিতারই আত্মস্বরূপের প্রকাশ। খৃষ্ট বলেছেন 'আমাতে তিনিই আছেন,' প্রেমিক-প্রেমিকা যেমন বলতে পারে 'আমাদের মধ্যে কোনো ফাঁক নেই।' অন্তরের সম্বন্ধে যেখানে নিবিড়, বিশুদ্ধ, সেখানেই এমন কথা বলতে পারা যায়; সেখানেই মহাসাধক বলেন, 'পিতাতে আমাতে একাত্মতা'। এ কথাটি নূতন না হতে পারে, এ বাণী হয়তো আরও অনেকে বলেছেন। কিন্তু যে বাণী সফল হল জীবনের ক্ষেত্রে, নানা ফল ফলানো, তাকে নমস্কার করি। খৃষ্ট বলেছিলেন, 'আমার মধ্যে আমার পিতারই প্রকাশ।' এই ভাবের কথা ভারতবর্ষেও উচ্চারিত হয়েছে, কিন্তু সেটি শাস্ত্রবচনের সীমানা উত্তীর্ণ হয়ে প্রাণের সীমায় যতক্ষণ না পৌঁছয় ততক্ষণ সে কথা বন্ধ্যা। যতই বড়ো ভাষায় তাকে স্বীকার করি ব্যবহারের দৈন্যে তাকে ততই বড়ো আকারে অপমানিত করি। খৃষ্টান সম্প্রদায় পদে পদে তা করে থাকেন। কথার বেলায় যাকে তারা বলে 'প্রভু', সেবার বেলায় তাকে দেয় ফাঁকি। সত্য কথার দাম দিতে হয় সত্য সেবাতেই। যদি সেই দিকেই দৃষ্টি রাখি তবে বলতে হয় যে, খৃষ্টের জন্ম ব্যর্থ হয়েছে; বলতে হয়, ফুল ফুটেছে সুন্দর, তার মাধুর্য উপভোগ করেছি, কিন্তু পরিণামে তাতে ফল ধরল না। এদিকে চোখে দেখেছি বটে হিংসা রিপুর প্রাবল্য খৃষ্টীয় সমাজে। তৎসত্ত্বেও মানুষের প্রতি প্রেম, লোকহিতের জন্য আত্মত্যাগ খৃষ্টীয় সমাজের সাফল্য দেখিয়েছে—এ কথাটি সাম্প্রদায়িকতার মোহে পড়ে যদি না মানি তবে সত্যকেই অস্বীকার করা হবে। খৃষ্টানের ধর্মবুদ্ধি প্রতিদিন বলছে—মানুষের মধ্যে ভগবানের সেবা করো, তাঁর নৈবেদ্য নিরন্নের অন্নথালিতে, বস্ত্রহীনের দেহে। এই কথাটিই খৃষ্টধর্মের বড়ো কথা। খৃষ্টানরা বিশ্বাস করেন—খৃষ্ট আপন মানবজন্মের মধ্যে ভগবান ও মানবের একাত্মতা প্রতিপন্ন করেছেন।

ধনী তাঁর গ্রামের লোকের জলাভাবকে উপেক্ষা করে পঁয়তাল্লিশ হাজার টাকা দিলেন পুত্রের অন্নপ্রাশনে দেবমন্দিরে দেবপ্রতিমার গলায় রত্নহার পরাতে। এই কথাটি তাঁর হৃদয়ে পৌঁছয় নি' যে, যেখানে সূর্যের তেজ সেখানে দীপশিখা আনা মূঢ়তা, যেখানে গভীর সমুদ্র সেখানে জলগণ্ডূষ দেওয়া বালকোচিত। অথচ মানুষের তৃষ্ণার মধ্য দিয়ে ভগবান যে জল চাইছেন সে চাওয়া অতি স্পষ্ট, অতি তীব্র; সেই চাওয়ার প্রতি বধির হয়ে এরা দেবালয়ে রত্নালংকারের জোগান দেয়।

পুত্রের মধ্যে পিতাকে বিড়ম্বিত করে দানের দ্বারা তাঁকে ভোলাবার চেষ্টায় মানুষ তাঁকে দ্বিগুণ অপমানিত করতে থাকে। দেখেছি ধনী মহিলা পান্ডার দুই পা সোনার মোহর দিয়ে ঢাকা দিয়ে মনে করেছে স্বর্গে পৌঁছবার পুরা মাশুল চুকিয়ে দেওয়া হল; অথচ সেই মোহরের জন্য দেবতা যেখানে কাঙাল হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন সেই মানুষের প্রতি দৃষ্টিই পড়ল না।

আজ প্রাতে আমাদের আশ্রমবন্ধু অ্যানড্রুজের চিঠি পেলুম। তিনি যে কাজ করতে গেছেন সে তাঁর আত্মীয়স্বজনের কাজ নয়, বরং তাদের প্রতিকূল। বাহ্যত যারা তাঁর অনাত্মীয়, যারা তাঁর স্বজাতীয় নয়, তাদের জন্য তিনি কঠিন দুঃখ সইছেন, স্বজাতীয়দের বিরুদ্ধে প্রবল সংগ্রাম করে দুঃখপীড়া পাচ্ছেন। এবার সেখানে যাবা মাত্র তিনি দেখলেন বসন্তমারীতে বহু ভারতীয় পীড়িত, মৃত্যুগ্রস্ত; তাঁর কাজ হল তাদের সেবা করা। মারীর মধ্যে ভারতীয় বণিক্‌দের এই যে তিনি সেবা করেছেন, এতে কিসে তাঁকে বল দিয়েছে? মানবসন্তানের সেবায় বিশ্বপিতার সেবার উপদেশ খৃষ্টানদেশের মধ্যে এতকাল ধরে এত গভীররূপে প্রবেশ করেছে যে সেখানে আজ যাঁরা নিজেকে নাস্তিক বলে প্রচার করেন তাঁদেরও নাড়ির রক্তে এই বাণী বহমান। তাঁরাও মানুষের জন্য প্রাণান্তকর দুঃখ স্বীকার করাকে আপন ধর্ম বলে প্রমাণ করেছেন। এ ফল কোন্ বৃক্ষে ফলল? কে এতে রসসঞ্চার করে? এ প্রশ্নের উত্তরে এ কথা অস্বীকার করতে পারি নে যে, সে খৃষ্টধর্ম।

লক্ষ্যে অলক্ষ্যে বিবিধ আকারে এই ধর্ম পশ্চিম মহাদেশে কাজ করছে। যাকে সেখানকার লোকে হিউম্যান ইন্টারেস্ট্ অর্থাৎ মানবের প্রতি ঔৎসুক্য বলে তা জ্ঞানবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ইউরোপে যেমন জাগরূক তেমন আর কোথাও দেখি নি। সে দেশে সর্বত্রই মানুষকে সেখানকার লোকে সম্পূর্ণরূপে চেনবার জন্য তথ্য অন্বেষণ করে বেড়াচ্ছে। যারা নরমাংস খায় তাদেরও মধ্যে গিয়ে জিজ্ঞাসা করেছে, 'তুমি মানুষ, তুমি কী কর, তুমি কী ভাব?' আর আমরা? আমাদের পাশের লোকেরও খবর নিই নে। তাদের সম্বন্ধে না আছে কৌতূহল, না আছে শ্রদ্ধা। উপেক্ষা ও অবজ্ঞার কুহেলিকায় আচ্ছন্ন করে দিয়ে অধিকাংশ প্রতিবেশীর সম্বন্ধে অজ্ঞান হয়ে আছি। কেন এমন হয়? মানুষকে যথোচিত মূল্য দিই নে বলেই আজকের দিনে আমাদের এই দুর্দশা। খৃষ্ট বাঁচিয়েছেন পৃথিবীর অনেককে, বাঁচিয়েছেন মানুষের ঔদাসীন্য থেকে মানুষকে। আজকে যারা তাঁর নাম নেয় না, তাঁকে অপমান করতেও কুণ্ঠিত হয় না, তারাও তাঁর সে বাণীকে কোনো-না-কোনো আকারে গ্রহণ করেছে।

মানুষ যে বহুমূল্য, তার সেবাতেই যে ভগবানের সেবা সার্থক, এই কথা ইউরোপ যেখানে মানে নি সেখানেই সে মার খেয়েছে। এ কথার মূল্য যে পরিমাণে ইউরোপ দিয়েছে সেই পরিমাণেই সে উন্নত হয়েছে। মানুষের প্রতি খৃষ্টধর্ম সে অসীম শ্রদ্ধা জাগরূক করেছে আমরা যেন নিরভিমানচিত্তে তাকে গ্রহণ করি এবং যে মহাপুরুষ সে সত্যের প্রচার করেছিলেন তাঁকে প্রণাম করি।

খৃষ্ট, র/১১/৫১৬-১৮

টীকা :

অ্যানড্রুজ—রবীন্দ্রনাথের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে ১৯১৪ সালে শান্তিনিকেতন

আশ্রমবিদ্যালয়ে যোগদান করেন। গান্ধিজীর সঙ্গেও হৃদ্যতা ছিল
জন্ম-১৮৭১, মৃত্যু-১৯৪০

১২৫। নৃত্যের তালে তালে

২৫ ফাল্গুন ১৩৩৩ (১৯২৭)

নৃত্যের তালে তালে নটরাজ, ঘুচাও সকল বন্ধ হে।
সুপ্তি ভাঙাও, চিত্তে জাগাও মুক্ত সুরের ছন্দ হে।।
তোমার চরণপবনপরশে সরস্বতীর মানসসরসে
যুগে যুগে কালে কালে সুরে সুরে তালে তালে
ঢেউ তুলে দাও, মাতিয়ে জাগাও অমলকমলগন্ধ হে।।
নমো নমো নমো—
তোমার নৃত্য আমিও বিত্ত ভরুক চিত্ত মম।।

নৃত্যে তোমার মুক্তির রূপ, নৃত্যে তোমার মায়া,
বিশ্বতনুতে অণুতে অণুতে কাঁপে নৃত্যের ছায়া।
তোমার বিশ্ব-নাচের দোলায় বাঁধন পরায় বাঁধন খোলায়
যুগে যুগে কালে কালে সুরে সুরে তালে তালে,
অন্ত কে তার সন্ধান পায় ভাবিতে লাগায় ধন্দ হে।।
নমো নমো নমো—
তোমার নৃত্য অমিত বিত্ত ভরুক চিত্ত মম।।

নৃত্যের বশে সুন্দর হল বিদ্রোহী পরমাণু,
পদযুগ ঘিরে জ্যোতিমঞ্জীরে বাজিল চন্দ্র ভানু।
তব নৃত্যের প্রাণবেদনায় বিবশ বিশ্ব জাগে চেতনায়
যুগে যুগে কালে কালে সুরে সুরে তালে তালে,
সুখে দুখে হয় তরঙ্গময় তোমার পরমানন্দ হে।।
নমো নমো নমো—
তোমার নৃত্য অমিত বিত্ত ভরুক চিত্ত মম।।

মোর সংসারে তান্ডব তব কম্পিত জটাজালে।
লোকে লোকে ঘুরে এসেছি তোমার নাচের ঘূর্ণিতালে।
ওগো সন্ন্যাসী, ওগো সুন্দর, ওগো শঙ্কর, হে ভয়ঙ্কর,
যুগে যুগে কালে কালে সুরে সুরে তালে তালে
জীবন-মরণ-নাচের ডমরু বাজাও জলদমন্দ্র হে।।
নমো নমো নমো—
তোমার নৃত্য আমিত বিত্ত ভরুক চিত্ত মম।।

গীতবিতান, র/৪/৪১৭-১৮

১২৬। পথে চলে যেতে যেতে

৪ মাঘ ১৩৩৪

পথে চলে যেতে যেতে কোথা কোন্‌খানে
তোমার পরশ আসে কখন কে জানে।।
কী অচেনা কুসুমের গন্ধে, কী গোপন আপন আনন্দে,
কোন্‌ পথিকের কোন্‌ গানে।।
সহসা দারুণ দুখতাপে সকল ভুবন যবে কাঁপে,
সকল পথের ঘোচে চিহ্ন, সকল বাঁধন যবে ছিন্ন,
মৃত্যু-আঘাত লাগে প্রাণে—
তোমার পরশ আসে কখন কে জানে।।

গীতবিতান, র/৪/১৭৪

তুলনীয় প্রসঙ্গ :

মনুষ্যত্ব (২২), দুঃখ (৩২), এই করেছো ভালো (৭৮), কাঁদালে তুমি মোরে (১২৭)

১২৭। কাঁদালে তুমি মোরে

ধনঞ্জয়ের গান, পরিত্রাণ, ১৯২৯

কাঁদালে তুমি মোরে ভালোবাসারই ঘায়ে—
নিবিড় বেদনাতে পুলক লাগে গায়ে।।
তোমার অভিসারে যাব অগম-পারে
চলিতে পথে পথে বাজুক ব্যথা পায়ে।।
পরানে বাজে বাঁশি, নয়নে বহে ধারা—
দুখের মাধুরীতে করিল দিশাহারা।
সকলই নিবে কেড়ে, দিবে না তবু ছেড়ে—
মন সরে না যেতে, ফেলিলে এ কি দায়ে।।

গীতবিতান, র/৪/২৫৭

তুলনীয় প্রসঙ্গ :

মনুষ্যত্ব (২২), দুঃখ (৩২), এই করেছো ভালো (৭৮), পথে চলে যেতে যেতে (১২৬)

ছয় । সকল মানুষের মানুষ : মানবধর্মের সাধনা

১২৮। হেমন্তবালা দেবীকে পত্র-১

২৯ চৈত্র ১৩৩৭ (১৯৩১)

...আমি নির্‌গুণ নিরঞ্জন নির্বিশেষের সাধক এমন একটা আভাস তোমার চিঠিতে পাওয়া গেল। কোনো একদিক থেকে সেটা হয় তো সত্য হতেও পারে—যেখানে সমস্তই শূন্য সেখানেও সমস্তই পূর্ণ—যিনি তিনি আছেন এটাও উপলব্ধি না করব কেন? আবার এর উল্টো কথাটাও আমারি মনের কথা। যেখানে সব-কিছু আছে সেখানেই সবার অতীত সব হয়ে বিরাজ করেন এটাও যদি না জানি তাহলে সেও বিষম ফাঁকি।...

...সুরের গান, না-সুরের গান, কাকে ছেড়ে কাকে বাছব? আমি দুইকেই সমান স্বীকার করে নিয়েছি।

এক জায়গায় কেবল আমার বাধে। খেলনা নিয়ে নিজেকে ভোলাতে আমি কিছুতেই পারি নে। এটা পারে নিতান্তই শিশু বধূ। সাথী আছেন কাছে বসে তাঁর দিকে পিছন ফিরে খেলনার বাক্স খুলে বসা একেবারেই সময় নষ্ট করা। এতে করে সত্য অনুভূতির রস যায় ফিকে হয়ে। ফুল দিতে চাও দাও না, এমন কাউকে দাও যে-মানুষ ফুল হাতে নিয়ে বল্‌বে বাঃ—তার সেই সত্য খুসি সত্য আনন্দে গিয়ে পৌঁছয়। শিলাইদহের বোষ্টমী আমার হাতে আম দিয়ে বল্‌লে, তাঁকে দিলুম। এই তো সত্যকার দেওয়া—আমারই ভোগের মধ্যে তিনি আমটিকে পান। পূজারী ব্রাহ্মণ সকালবেলায় গোলক চাঁপার গাছে বাড়ি মেরে ফুল সংগ্রহ করে ঠাকুর ঘরে যেত—তার নামে পুলিশে নালিষ করতে ইচ্ছা করত—ঠাকুরকে ফাঁকি দিচ্ছে বলে। সেই ফুল আমার মধ্যে দিয়েই ঠাকুর গ্রহণ করবেন বলেই গাছে ফুল ফুটিয়েছেন আর আমার মধ্যে ফুলে আনন্দ আছে। ঠাকুরঘরে যে মূর্ত্তি প্রতিদিন এই চোরাই মাল গ্রহণ করে সে তো সমস্ত বিশ্বকে ফাঁকি দিলে—মূঢ়তার ঝুলির মধ্যে ঢেকে তার চুরি। কত মানুষকেই বঞ্চিত করে তবে আমরা এই দেবতার খেলা খেলি। ঠাকুরঘরের নৈবেদ্যের মধ্যে আমরা ঠাকুরের সত্যকার প্রাপ্যকে প্রত্যহ নষ্ট করি।

এর থেকে একটা কথা বুঝতে পারবে, আমার দেবতা মানুষের বাইরে নেই। নির্বিকার নিরঞ্জনের অবমাননা হচ্ছে বলে' আমি ঠাকুরঘর থেকে দূরে থাকি এ কথা সত্য নয়—মানুষ বঞ্চিত হচ্ছে বলেই আমার নালিষ। যে সেবা যে প্রীতি মানুষের মধ্যে সত্য করে তোলবার সাধনাই হচ্ছে ধর্মসাধনা তাকে আমরা খেলার মধ্যে ফাঁকি দিয়ে মেটাবার চেষ্টায় প্রভূত অপব্যয় ঘটাচ্চি। এই জন্যেই আমাদের দেশে ধার্মিকতার দ্বারা মানুষ এত অত্যন্ত অবজ্ঞাত। মানুষের রোগ তাপ উপবাস মিট্‌তে চায় না, কেননা এই চিরশিশুর দেশে খেলার রাস্তা দিয়ে সেটা মেটাবার ভার নিয়েচি। মাদুরার মন্দিরে যখন লক্ষ লক্ষ টাকার গহনা আমাকে সগৌরবে দেখানো হোলো তখন লজ্জায় দুঃখে আমার মাথা হেঁট হয়ে গেল। কত লক্ষ লক্ষ লোকের দৈন্য অজ্ঞান অস্বাস্থ্য ঐ সব গহনার মধ্যে পুঞ্জীভূত হয়ে আছে। খেলার দেবতা এই সব সোনা জহরৎকে ব্যর্থ করে বসে থাকুন— এ দিকে সত্যকার দেবতা সত্যকার মানুষের কঙ্কালশীর্ণ হাতের মুষ্টি প্রসারিত করে ঐ মন্দিরের বাহিরে পথে পথে ফিরচেন। তবু আমাকে বলবে আমি নিরঞ্জনের পূজারি ঐ ঠাকুরঘরের মধ্যে যে পূজা পড়চে সমস্ত ক্ষুধিতের ক্ষুধাকে অবজ্ঞা করে সে আজ কোন্ শূন্যে গিয়ে জমা হচ্চে?

হয় তো বল্‌বে এই খেলার পূজাটা সহজ। কিন্তু সত্যের সাধনাকে সহজ কোরো না। আমরা মানুষ, আমাদের এতে গৌরব নষ্ট হয়। দেবতার পূজা কঠিন দুঃখেরই সাধনা— মানুষের দুঃখভাব পর্বতপ্রমাণ হয়ে উঠেছে সেইখানেই দেবতার আহবান শোনো—সেই দুঃসাধ্য তপস্যাকে ফাঁকি দেবার জন্যে মোহের গহবরের মধ্যে লুকিয়ে থেকো না। আমি মানুষকে ভালোবাসি বলেই এই খেলার দেবতার সঙ্গে আমার ঝগড়া।...

চিঠিপত্র-৯, পৃঃ ২-৫

টীকা:

হেমন্তবালা দেবী— রবীন্দ্রনাথের স্নেহধন্যা, ময়মনসিংহ জেলার গৌরীপুরের জমিদার ব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর কন্যা। স্বামী রংপুর-ভিতরবঙ্গের জমিদার ব্রজেন্দ্রকান্ত রায়চৌধুরী। হেমন্তবালার বিভিন্নরকম ধর্মীয় ও সামাজিক প্রশ্নের উত্তরে রবীন্দ্রনাথ তাঁকে এই পত্রগুলি লিখেছিলেন। হেমন্তবালা নিজেও সাহিত্যচর্চা করতেন। তাঁর রচিত গ্রন্থ 'হেমন্তবেলায়' ও 'অনন্তচিন্তা'।

জন্ম—১৮৯৪, মৃত্যু—১৯৭৬

১২৯। হেমন্তবালা দেবীকে পত্র-২

৪ঠা বৈশাখ ১৩৩৮ (১৯৩১)

...বাংলাদেশে আমরা শাক্ত কিম্বা বৈষ্ণব ধর্মে মুখ্যত রস সম্ভোগ করতে চাই। হৃদয়াবেগের মধ্যে তলিয়ে যাওয়াকেই সাধনার সার্থকতা মনে করি। এ'কে আধ্যাত্মিক বিলাস বলা যেতে পারে। সব রকম বিলাসের মধ্যেই বিকারের সম্ভাবনা আছে।...

...দেবতা যদি নিতান্তই অতিমানুষ হন তাহলে তাঁকে নিয়ে কেবল হৃদয়াবেগের খেলা খেল্‌লেই চলে, আমাদের কর্মে তাঁর কোনো প্রয়োজন নেই—বুদ্ধি চাই নে, শক্তি চাই নে, চরিত্র চাই নে, কেবল নিরন্তর ভাবে ডুবুডুবু হয়ে থাকলেই হোলো। অর্থাৎ তাঁকে দিয়ে হৃদয়ের সখ মেটাবার ব্যাপার। যেহেতু খেলার পুতুল সত্যকার মানুষ নয় এই জন্যে তাকে নিয়ে বালিকা আপন হৃদয়বৃত্তিকে দৌড় করায়—আর কোনো দায়িত্ব নেই। কিন্তু সন্তানের মার দায় আছে, শুধু কেবল হৃদয় নয়—তাকে বুদ্ধি খাটাতে হয়, শক্তি খাটাতে হয়, সন্তানের সেবা পরিপূর্ণ মাত্রায় সত্য করে না তুললে চলে না। মানুষের মধ্যে যে দেবতার আবির্ভাব তাকে পুতুল সাজিয়ে ফাঁকির নৈবেদ্য দিয়ে ভোলাবে কে? সেখানে তাঁর সঙ্গে ব্যবহারে পূর্ণ মানুষ হতে হবে। খেলার দেবতা মানুষের দেবতাকে বঞ্চিত করে—মাদুরার দেবতা মানুষেরই গায়ের অলঙ্কার হরণ করে নিয়ে। ঠাকুরকে এই রকম অলঙ্কার দিতে হৃদয়ের তৃপ্তি হয় মানি, কিন্তু ঠাকুরকে কেবলমাত্র হৃদয়তৃপ্তির উপলক্ষ্য করলে তাঁকে ছোট করা হয়, তাঁর সঙ্গে সম্বন্ধকে অত্যন্ত অসম্পূর্ণ করা হয়।...

...দেবতার প্রতি আমাদের মানবদায়িত্ব নেই। জগন্নাথকে পুরোহিত স্নান করায়, কাপড় পরায়, পাখার হাওয়া করে, ওষুধ খাওয়ায়—যদি তার অর্থ এই হয়, যে, মানুষের

মধ্যে জগন্নাথেরই স্নানের, কাপড় পরার ওষুধ খাওয়ার সত্যই প্রয়োজন আছে তাহলে কি এমনতরো খেলা করে নিজের দায় সেরে নিতে প্রবৃত্তি হয়? তাহলে সমস্ত বুদ্ধি সমস্ত শক্তি নিয়ে মানব-ভগবানের অন্নবস্ত্র পানীয় পথ্যের আয়োজন করতে হয়। যুগে যুগে আমরা তাতে অবহেলা করেছি বলেই মন্দিরের ভগবান পান্ডা পুরুতের মধ্যেই পরিপুষ্ট হয়ে উঠ্‌ছেন লোকালয়ে তাঁর কন্ঠার হাড় বেরিয়ে পড়ল, তাঁর পরনে ট্যানা জোটে না।...

...তুমি প্রতীকের কথা লিখেচ, সত্য আছেন দ্বারে এসে দাঁড়িয়ে, দিনের পর দিন প্রতীক্ষা করচেন, যদি থাকি দ্বার বন্ধ করে প্রতীককে নিয়ে তার চেয়ে বিড়ম্বনা নেই। সব চেয়ে বিপদ হচ্ছে প্রতীক অভ্যস্ত হয়ে যায় তখন সত্যই হয় পর। সত্যের দাবী কঠিন, প্রতীকের দাবী যৎসামান্য—সত্য বলে অকল্যাণকে অন্তরে ঠেকাতে হবে প্রাণপণ শক্তিতে, প্রতীক বলে পাঁচশিকের পূজো দিয়েই ফল পাওয়া যায়। অর্থাৎ সত্য মানুষকে মানুষ হতে বলে আর প্রতীক তাকে চিরদিন ছেলেমানুষ হতে বলে। প্রতীক মিথ্যা চোখরাঙানীতে ভারতের কোটি কোটি দুর্বল চিত্তকে কাপুরুষ করে তুলচে, সত্য তাকে যতরকম মিথ্যা ভয়ের মোহ থেকে উদ্বোধিত করতে চায়। প্রতীক দুশ্চরিত্র পান্ডার পায়ে মনুষ্যত্বের অবমাননা ঘটায় সত্য যথার্থ ভক্তির আলোয় মানুষের ললাটকে মহিমান্বিত করে। তার্কিক বলে এই প্রতীক কেবল একটা ক্ষণিক অবস্থার জন্যে, তার পরে কেটে যায়। কোনোদিন কাটে না—মূঢ়তা মানুষকে দুর্বল করে, তার চিত্তকে মোহেই দীক্ষিত করে।...

চিঠিপত্র-৯, পৃ ৬-১০

১৩০। হেমন্তবালা দেবীকে পত্র-৩

১০ বৈশাখ,১৩৩৮ (১৯৩১)

...আমি কেবল নিজের কথাই বল্‌তে পারি—আমার মন কোনো প্রতীককে আশ্রয় করতে স্বভাবতই অক্ষম। সহসা মনে হতে পারে এটা কবিজনোচিত নয়। ভাবকে রূপ দেওয়া আমার কাজ—আমার সেই সৃষ্টিতে আমার আনন্দ। সেখানে রূপ আগে নয়, ভাব আগে, রূপের সঙ্গে ভাব নিজেকে বাইরে থেকে মেলায় না—নিজের রূপ-দেহ সে নিজেই সৃষ্টি করে—আবার তাকে অনায়াসে ত্যাগ করে' নতুন রূপের মধ্যে প্রকাশ খোঁজে। কোনো ধর্মগত প্রথা যে সব রূপকে বাহির থেকে বদ্ধ করে রেখেচে, আমার চিত্তের ধ্যান তার মধ্যে বাধা পায়। শুধু তো মূর্ত্তি নয়, তার সঙ্গে আছে কাহিনী—তাকে রূপক জোর করে বলি—অভ্যস্তভাবে তাকে গ্রহণ করি, ভাবকে যেখানে প্রতিবাদ করে সেখানেও। আমার বুদ্ধি আমার কল্পনা আমার রসবোধ সবই আঘাত পায়। যদি বলো ভগবান যখন অসীম তখন সকল রূপেই সকল কাহিনীতেই তাঁকে খাপ খাওয়ায়। এক হিসাবে এ কথা সত্য—বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে ভালো মন্দ সুশ্রী কুশ্রী সবই আছে অতএব কেবল ভালো কেবল সুন্দরের গন্ডীর মধ্যে তাঁকে স্বতন্ত্র করে দেখলে তাঁর অসীমতার উপর

দোষারোপ করা হয়। ঠগীরা মানুষ খুন করাকে ধর্মসাধনা বলে গ্রহণ করেছিল—ভগবান তো নানারকম করেই মানুষকে মারেন—সেই খুনী ভগবানকেই বা পূজা করতে দোষ কি?

কিন্তু আমার ভগবান মানুষের যা শ্রেষ্ঠ তাই নিয়ে। তিনি মানুষের স্বর্গেই বাস করেন। মানুষের নরকও আছে—সেইখানে মূঢ়তা সেইখানে অত্যাচার সেইখানে অসত্য। সেই নরকও আছে কিন্তু সেই থাকাটা না-এর দিকে, হাঁ-এর দিকে নয়। সে কেবলি হাঁ-কে অস্বীকার করে কিন্তু কিছুতে তাকে বিলুপ্ত করতে পারে না। অস্বীকার করার দ্বারাই সে সেই চিরন্তন ওঁ-কে প্রমাণ করতে থাকে। এই জন্যেই, ভগবান অসীম বলেই তাঁকে সব কিছুতেই আরোপ করলে চলে এ কথা আমি মানতে রাজি নই। যেখানে জ্ঞানে ভাবে কর্মে পরিপূর্ণ শ্রেষ্ঠতা সেইখানেই তাঁকে উপলব্ধি না করলে ঠকতে হবে।...

চিঠিপত্র-৯, পৃ ১২-১৫

১৩১। পান্থ

২৪ বৈশাখ,১৩৩৮ (১৯৩১)

শুধায়ো না মোরে তুমি মুক্তি কোথা, মুক্তি কারে কই
আমি তো সাধক নই, আমি গুরু নই।
আমি কবি, আছি
ধরণীর অতি কাছাকাছি,
এ পারের খেয়ার ঘাটায়।
সম্মুখে প্রাণের নদী জোয়ার-ভাঁটায়
নিত্য বহে নিয়ে ছায়া আলো,
মন্দ ভালো,
ভেসে-যাওয়া কত কী যে, ভুলে-যাওয়া কত রাশি রাশি
লাভক্ষতি কান্নাহাসি,—
এক তীর গড়ি তোলো অন্য তীর ভাঙিয়া ভাঙিয়া;
সেই প্রবাহের 'পরে উষা ওঠে রাঙিয়া রাঙিয়া,
পড়ে চন্দ্রালোকরেখা জননীর অঙ্গুলির মতো;
কৃষ্ণরাতে তারা যত
জপ করে ধ্যানমন্ত্র, অস্তসূর্য রক্তিম উত্তরী
বুলাইয়া চলে যায়, সে-তরঙ্গে মাধবীমঞ্জরি
ভাসায় মাধুরীডালি;
পাখি তার গান দেয় ঢালি।
সে তরঙ্গনৃত্যছন্দে বিচিত্র ভঙ্গীতে
চিত্ত যবে নৃত্য করে আপন সংগীতে
এ বিশ্বপ্রবাহে,

সে-ছন্দে বন্ধন মোর, মুক্তি মোর তাহে।
রাখিতে চাহি না কিছু, আঁকড়িয়া চাহি না রহিতে,
ভাসিয়া চলিতে চাই সবার সহিতে
বিরহমিলনগ্রন্থি খুলিয়া খুলিয়া,
তরণীর পালখানি পলাতকা বাতাসে তুলিয়া।
হে মহাপথিক,
অবারিত তব দশদিক।
তোমার মন্দির নাই, নাই স্বর্গধাম,
নাইকো চরম পরিণাম;
তীর্থ তব পদে পদে;
চলিয়া তোমার সাথে মুক্তি পাই চলার সম্পদে,
চঞ্চলের নৃত্যে আর চঞ্চলের গানে,
চঞ্চলের সর্বভোলা দানে—
আঁধারে আলোকে,
সৃজনের পর্বে পর্বে, প্রলয়ের পলকে পলকে।

পরিশেষ/র/২/৪৭৭-৭৮

১৩২। হেমন্তবালা দেবীকে পত্র-৪

৩১ জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৮ (১৪ই জুন ১৯৩১)

...ঠাকুরকে ঘুম থেকে তোলা, কাপড় পরানো, পাছে তাঁর পিত্তি পড়ে এই ভয়ে যথাসময়ে আদর করে খাওয়ানো ইত্যাদি ব্যাপারের বাস্তবতা আমার মতো লোকের কাছে নেই, তোমাদের কাছে আছে তোমাদের স্ত্রীপ্রকৃতির নিরতিশয় প্রয়োজনের মধ্যে—যেমন করে হোক্ সেই প্রকৃতিকে চরিতার্থতা দেবার মধ্যে। প্রাণের বেদনা যে আমার প্রাণেও বাজে না, তা নয়, কিন্তু সে বেদনা যথাস্থানেই কাজ খোঁজে, কাল্পনিক সেবায় নিজেকে তৃপ্ত করবার চেষ্টা একেবারেই অসম্ভব। আমার ঠাকুর মন্দিরেও নয়, প্রতিমাতেও নয়, বৈকুণ্ঠেও নয়,—আমার ঠাকুর মানুষের মধ্যে—সেখানে ক্ষুধাতৃষ্ণা সত্য, পিত্তিও পড়ে, ঘুমেরও দরকার আছে—যে দেবতা স্বর্গের তাঁর মধ্যে এসব কিছুই সত্য নয়। ফ্লোরেন্স্ নাইটিঙ্গেল যুদ্ধক্ষেত্রে আহত সৈনিকদের শুশ্রূষা করেচেন, সেইখানে নারীর পূজা সত্য হয়েচে। মানুষের মধ্যে যে দেবতা ক্ষুধিত তৃষিত রোগার্ত শোকাতুর, তাঁর জন্যে মহাপুরুষেরা সর্বস্ব দেন, প্রাণ নিবেদন করেন, সেবাকে ভাব-বিলাসিতায় সমাপ্ত না করে তাকে বুদ্ধিতে বীর্যে ত্যাগে মহৎ করে তোলেন। তোমার লেখায় তোমাদের পূজার বর্ণনা শুনে আমার মনে হয় এ সমস্তই অবরুদ্ধ অতৃপ্ত অসম্পূর্ণ জীবনের আত্মবিড়ম্বনা। আমার মানুষরূপী ভগবানের পূজাকে এত সহজ করে তুলে তাঁকে যারা প্রত্যহ বঞ্চিত করে তারা প্রত্যহ নিজে বঞ্চিত হয়। তাদের দেশের মানুষ

একান্ত উপেক্ষিত, সেই উপেক্ষিত মানুষের দৈন্যে ও দুঃখে সে দেশ ভারাক্রান্ত হয়ে পৃথিবীতে সকল দেশের পিছনে পড়ে আছে। এ সব কথা বলে' তোমাকে ব্যথা দিতে আমার সহজে ইচ্ছা করে না—কিন্তু যেখানে মন্দিরের দেবতা মানুষের দেবতার প্রতিদ্বন্দ্বী, যেখানে দেবতার নামে মানুষের প্রবঞ্চিত সেখানে আমার মন ধৈর্য্য মানে না। গয়াতে যখন বেড়াতে গিয়েছিলেম তখন পশ্চিমের কোন্ এক পূজামুগ্ধা রাণী পান্ডার পা মোহরে ঢেকে দিয়েছিলেন—ক্ষুধিত মানুষের অন্নের থালি থেকে কেড়ে নেওয়া অন্নের মূল্যে এই মোহর তৈরি। দেশের লোকের শিক্ষার জন্যে, অন্নের জন্যে, আরোগ্যের জন্যে এরা কিছু দিতে জানে না, অথচ নিজের অর্থ-সামর্থ্য সময় প্রীতি ভক্তি সমস্ত দিচ্ছে সেই বেদীমূলে যেখানে তা নিরর্থক হয়ে যাচ্চে। মানুষের প্রতি মানুষের এত নিরৌৎসুক্য, এত ঔদাসীন্য অন্য কোনো দেশেই নেই, এর প্রধান কারণ এই যে, এ দেশে হতভাগা মানুষের সমস্ত প্রাপ্য দেবতা নিচ্চেন হরণ করে।...

চিঠিপত্র-৯, পৃ ৩৯-৪৪

১৩৩। হেমন্তবালা দেবীকে পত্র-৫

৮ আষাঢ় ১৩৩৮ (২৩ জুন ১৯৩১)

...নিজেকে বৃহৎ কালে বৃহৎ দেশে তাঁর মধ্যে ব্যাপ্ত করে দিয়ে যখন আমি ধ্যান করি তখনি নিজেকে আমি সত্যরূপে জানি, আমার ছোটো-আমির যত কিছু ক্ষুদ্রতা সব বিলীন হয়ে যায়—তখন আমি সত্য আধারে নিত্য আধারে থাকি। তাঁরই আহবানে রাজপুত্র ছিন্নকন্থা পরে' পথে বেরিয়েছেন। বীরের বীর্য্য, গুণীর গুণ, প্রেমিকের প্রেম তাঁরি মধ্যে চিরন্তন। তুমিও হৃদয় দিয়ে তাঁকেই গভীরের মধ্যে স্পর্শ কর, যেখানে তোমার ভক্তি, তোমার প্রীতি, তোমার সত্যকার আত্মনিবেদন। তং বেদ্যং পুরুষং বেদ—তিনি সেই পরম পুরুষ যাঁকে সত্য অনুভবের দ্বারা জানতে হবে, নিজের বাইরে, নিজের গভীরে। আমি সহরের মানুষ, একদিন হঠাৎ এক পল্লীবাসী বাউল ভিখারীর মুখে গান শুনলুম, "আমি কোথায় পাব তারে, আমার মনের মানুষ যে রে।" আমি যেন চম্‌কে উঠলুম, বুঝতে পারলুম, এই মনের মানুষকে, এই সত্য মানুষকেই আমরা দেবতায় খুঁজি, মানুষে খুঁজি, কল্পনায় খুঁজি, ব্যবহারে খুঁজি, "হৃদা মনীষা"—হৃদয় দিয়ে মন দিয়ে, কর্ম দিয়ে। সেই মহান্ আত্মার অমরাবতী হচ্চে, "সদা জনানাং হৃদয়ে।" কত লোক দেখেচি যারা নিজেকে নাস্তিক বলেই কল্পনা করে, অথচ সর্বজনের উদ্দেশে নিজেকে নিঃশেষে নিবেদন করচে, আবার এও প্রায়ই দেখা যায় যারা নিজেকে ধার্মিক বলেই মনে করে তারা সর্বজনের সেবায় পরম কৃপণ, মানুষকে তারা নানা উপলক্ষ্যেই পীড়িত করে বঞ্চিত করে। বিশ্বকর্মার সংগে কর্মের মিল আছে মহান্ আত্মার সংগে আত্মার যোগ আছে কত নাস্তিকের,—তাদের সত্য পূজা জ্ঞানে ভাবে কর্মে, কত বিচিত্র কীর্তিতে জগতে নিত্য হয়ে গেছে, তাদের নৈবেদ্যের ডালি কোনোদিন রিক্ত হবে না। মনের মানুষের শাশ্বত রূপ তারা অন্তরে দেখেচে, তাই তারা অনায়াসে মৃত্যুকে পর্যন্ত পণ করতে পারে।—তং বেদ্যং পুরুষং বেদ

মা বো মৃত্যুঃ পরিব্যথাঃ—সেই বেদনীয় পুরুষকে আপনার মধ্যে জানো, মৃত্যু তোমাকে ব্যথা না দিক্। য এতদ্ বিদুঃ অমৃতাস্তে ভবন্তি—কারণ তারা বেঁচে থাকে সকল কালের সকল লোকের মধ্যে, যাঁর উপলব্ধির মধ্যে তাঁদের আত্মোপলব্ধি তাঁর বিরাট আয়ু ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমানের সকল সত্তাকে নিয়ে। মানুষকে অন্নবস্ত্রবিদ্যা, আরোগ্য শক্তির সাহস দিতে-হবে এই সাধনায় যারা আত্ম নিবেদন করেচে তারা কোনো দেবতাকে বিশেষ সংজ্ঞাদ্বারা মানুক্ বা না মানুক তারা সেই বেদ্য পুরুষকে জেনেচে, সেই মহান্ আত্মাকে, সেই বিশ্বকর্মাকে, যাঁকে জান্‌লে মৃত্যুর অতীত হওয়া যায়। সম্প্রদায়ের গণ্ডীর ভিতর থেকে বাঁধা অনুষ্ঠানের মধ্যে তাঁরা পূজাকে নিঃশেষিত করে তৃপ্তিলাভ করতে পারেন না, কেননা, তাঁরা মনের মানুষকে দেখেচেন মনের মধ্যে, মানুষের মধ্যে নিত্যকালের বেদীতে। দেশ বিদেশের সেই সব নাস্তিক ভক্তদের আমি আপন ধর্মভাই বলেই জানি। সত্য কথা বলি, বিদেশেই তাঁদের বেশি দেখলুম, কিন্তু তাঁরা যে দেশে থাকেন সে দেশ বিদেশ নয়, সে যে সর্বমানবলোক। সেই দেশেরই দেশাত্মবোধ আমার হোক্ এই আমার কামনা। তোমার চিঠিতে বারবার তুমি লিখেচ, নিজের দেশের কাছ থেকেই নিতে হবে। সত্য কথা, নিজের দেশ সকল দেশেই আছে, অন্য দেশের যা কিছু শ্রেষ্ঠ তা সকল দেশের—যদি অভিমানে বা অশক্তিতে তা না দিই তবে নিজের সম্পত্তিকে অস্বীকার করা হয়,—বিশ্বমানবের বেদীতে যে নৈবেদ্য দেওয়া হয়, জ্ঞানের প্রেমের কর্মের, তাতে সকল মানুষেরই ভোগের অধিকার,—তাকে নিয়েও যদি জাত মানতে হয় তবে সংকীর্ণভাবে হিঁদু হয়েই মরব মানুষ হয়ে বাঁচব না। যদি বলো নকল, তা নিজের দেশের নকলও নকল, পরের দেশের নকলও নকল—যে কর্ম খাঁটি তা নকল নয়, যা মেকি তাই নকল, তার উপর স্বদেশেরই ছাপ থাক্ আর বিদেশের।....

চিঠিপত্র-৯, পৃ ৪৮-৫১

১৩৪। হেমন্তবালা দেবীকে পত্র-৬

১২ আষাঢ় ১৩৩৮ (২৭ জুন ১৯৩১)

...তুমি মনে কোরো না, বিচ্ছিন্ন ব্যক্তিগত মানুষ আমার সাধনার লক্ষ্য। চিরন্তন বিরাট মানবকে আমি ধ্যানের দ্বারা আপনার মধ্যে গ্রহণ করবার চেষ্টা করি—নিজের ব্যক্তিগত সুখ দুঃখ ও স্বার্থকে ডুবিয়ে দিতে চাই তাঁর মধ্যে, অনুভব করতে চাই, আমার মধ্যে সত্য যা কিছু, জ্ঞানে প্রেমে কর্মে, তার উৎস তিনি। সেই জ্ঞানে প্রেমে কর্মে আমি আমার ছোটো আমিকে ছাড়িয়ে যাই, সেই যিনি বড়ো আমি, মহান্ আত্মা, তাঁর স্পর্শ পেয়ে ধন্য হই, অমৃতকে উপলব্ধি করি। সেই উপলব্ধির যোগে আমার পূজা আমার সেবা সত্য হয়, আত্মাভিমানের কলঙ্ক থেকে মুক্ত হয়। কর্মই বন্ধন হয়ে ওঠে এই উপলব্ধির সঙ্গে যদি যুক্ত না হয়। য়ুরোপে এমন অনেক নাস্তিক আছেন যাঁরা বিশ্বমানবের উপলব্ধির দ্বারা তাঁদের কর্মকে মহৎ করে তোলেন,—তাঁরা দূর কালের জন্যে প্রাণপণ করেন, সর্বদেশের জন্যে।...

...আমার কথা ব্রাহ্মসমাজের কথা নয়, কোনো সম্প্রদায়ের কথা নয়, য়ুরোপ থেকে ধার-করা বুলি নয়। য়ুরোপকে আমার কথা শোনাই, বোঝে না; নিজের দেশ আরো কম বোঝে। অতএব আমাকে কোনো সম্প্রদায়ে বা কোনো দেশখণ্ডে বদ্ধ করে দেখো না। আমি যাঁকে পাবার প্রয়াস করি সেই মনের মানুষ সকল দেশের সকল মানুষের মনের মানুষ, তিনি স্বদেশের স্বজাতির উপরে।...

চিঠিপত্র-৯, পৃ ৫২-৫৮

১৩৫। হেমন্তবালা দেবীকে পত্র-৭

২০ জুলাই ১৯৩১

...যাঁর ধ্যান আমার চিত্তের অবলম্বন শাস্ত্রমতে তাঁকে কি সংজ্ঞা দেওয়া যায় জিজ্ঞাসা করেচ। সহজে বোঝাতে পারব না, উপলব্ধির জিনিষকে ব্যাখ্যার দ্বারা স্পষ্ট করা যায় না। তোমার প্রশ্ন এই তিনি কি সর্বমানবের সমষ্টি। সমষ্টি কথাটায় ভুল বোঝার আশঙ্কা আছে। এক বস্তা আলুকে আলুর সমষ্টি যদি বল তবে সে হল আর এক কথা। মানুষের সজীব দেহ লক্ষকোটি জীবকোষের সমষ্টি, কিন্তু সমগ্র মানুষ জ্ঞানে প্রেমে কর্মে আত্মানুভূতিতে জীবকোষসমষ্টির চেয়ে অসীমগুণে বড়। ব্যক্তিগত মানব মহামানব থেকে বিচ্ছিন্ন নয়, তারি মধ্যেই তার জন্ম ও বিলয় কিন্তু তাই বলে সে তাঁর সমান হতে পারে না। ব্যক্তিগত মানব মহামানবকে উপলব্ধি করে আনন্দিত হয়, মহিমালাভ করে যখন সে নিজের ভোগ নিজের স্বার্থকে বিস্মৃত হয়, যখন তার কর্ম তার চিন্তা মরণধর্মী জীবনলীলাকে পেরিয়ে যায়, যখন তার ত্যাগ তার প্রয়াস সুদূর দেশ সুদূর কালকে আশ্রয় করে, তার আত্মীয়তার বোধ সংকীর্ণ সমাজের মধ্যে খণ্ডিত হয়ে থাকে না। এই বোধের দ্বারা আমরা এমন একটি সত্তাকে অন্তরতমরূপে অনুভব করি যা আমার ব্যক্তিগত পরিধিকে উত্তীর্ণ করে পরিব্যাপ্ত। তখন সেই মহাপ্রাণের জন্যে মহাত্মার জন্যে নিজের প্রাণ ও আত্মসুখকে আনন্দে নিবেদন করতে পারি। অর্থাৎ তখন আমি যে জীবনে জীবিত সে জীবন আমার আয়ুর দ্বারা পরিমিত নয়। এই জীবন কার? সেই পুরুষের, যিনি সকলের মধ্যে ও সকলকে অতিক্রম করে, উপনিষদ যাঁর কথা বলেছেন "তং বেদ্যং পুরুষং বেদ যথা মা বো মৃত্যুঃ পরিব্যথাঃ"। কেবলমাত্র জপতপ পূজার্চনা করে তাঁর উপলব্ধি নয়, মানুষের যে-কোনো প্রকাশে মহিমা আছে, বিজ্ঞানে দর্শনে শিল্পে সাহিত্যে; অর্থাৎ যাতে সে এমন কিছুকে প্রকাশ করে যার মধ্যে পূর্ণতার সাধনা আছে। এ সমস্তই মানুষের সম্পদ, ক্ষণজীবী পশুমানুষের নয়, কিন্তু সেই চিরমানবের,—ইতিহাস যাঁর মধ্যে দিয়ে ক্রমাগতই বর্বরতার প্রাদেশিকতার সাম্প্রদায়িকতার বন্ধন কাটিয়ে সর্বজনীন সত্যরূপকে উদ্ঘাটিত করচে। সকল ধর্মেই যাঁকে সর্বোচ্চ বলে ঘোষণা করে তাঁর মধ্যে মানবধর্মেরই পূর্ণতা,—মানুষ যা-কিছুকে কল্যাণের মহৎ আদর্শ বলে মানে তারই উৎস যাঁর মধ্যে। নক্ষত্রলোকে মানবের রূপ নেই মানবের গুণ নেই, সেখানে কেবল বিশ্বশক্তির নৈর্ব্যক্তিক বিকাশ, বিজ্ঞান তাকে সন্ধান করে, কিন্তু মানুষের প্রেম ভক্তির স্থান সেখানে নেই।

মহাপুরুষেরা সেই নিত্যমানবকেই একান্ত আনন্দের সঙ্গেই অন্তরে দেখেচেন, কিন্তু বারে বারে তাঁকে নানা নামে, নানা আখ্যানে, নানা রূপ কল্পনায় দূরে ফেলা হয়েছে, এমন কি অনেক সময় মানুষ তাঁকে নিজের চেয়েও ছোট করেচে—এবং ভূমার সাধনাকে সংকীর্ণ ক্ষেত্রে আধ্যাত্মিক ভোগবিলাসের সামগ্রী করে তুলেচে।...

...সত্য যদি নিতান্তই আত্মতৃপ্তির উপকরণমাত্র হোত তবে যে অভ্যাসের মধ্যে যে সুখ পায় তাই নিয়েই তাকে থাকতে বলা যেত। সত্যের সঙ্গে ব্যবহারে তৃপ্তি গৌণ, মুক্তি মুখ্য—যে ক্ষুদ্রতার আবরণ থেকে মুক্তি হলে নিজেদের স্পষ্ট করে জানি অমৃতস্য পুত্রাঃ সেই মুক্তি—তার সাধনায় দুঃখ আছে। আমরা দ্বিজ, একটা জন্ম পশুলোকে, আর একটা জন্ম মানবলোকে, এই দ্বিতীয় জন্মের জন্যেই প্রার্থনা করি অসতো মা সদ্গময়।

চিঠিপত্র-৯, পৃ ৬৬-৬৯

১৩৬। হেমন্তবালা দেবীকে পত্র-৮

১১ শ্রাবণ ১৩৩৮ (২৭ জুলাই ১৯৩১)

...মানবের পরিপূর্ণতার শাশ্বত আদর্শ শাশ্বত মানবের মধ্যে আছে,—যে অংশে সেই পরিপূর্ণতা আমরা লাভ করি সেই অংশে সেই পরিপূর্ণের সঙ্গে আমাদের মিলন হয়। সেই মিলনে এত গভীর আনন্দ যে তার জন্যে মানুষ প্রাণ দিতে পারে। এমনি করেই যুগে যুগে কত সাধকের ত্যাগের উপরেই মানবসভ্যতা প্রশস্ততর প্রতিষ্ঠা লাভ করচে। পূর্ণ মানুষের ডাক না শুনতে পেলে মানুষ বর্বরতার অন্ধকূপে চিরদিনই পশুর মতো পড়ে থাকত। আজো অনেক বধির আছে, কিন্তু যাদের মর্মের মধ্যে পূর্ণের বাণী প্রবেশ করে এমন অল্পসংখ্যক লোকও যদি থাকে তাহলেই যথেষ্ট। বস্তুত তারাই অতি কঠিন বাধার ভিতর দিয়ে মানুষকে এগিয়ে নিয়ে চলেচে। আদিকাল থেকে আজ পর্য্যন্ত মানুষের সমস্ত ইতিহাসই হচ্চে সেই অভিসার। নক্ষত্রের আলোকে অন্ধকার রাত্রের এই অভিসারে মানুষ বারেবারেই পথ হারিয়েছে, পিছিয়ে গেছে, কিন্তু এ কথাটা কখনোই সে ভুলতে পারে নি যে তাকে চলতেই হবে, যেখানে আছে সেইখানেই তার চরম আশ্রয় এমন কথা বল্লেই মানুষ মরে—এমন কি, যখন সে পিছিয়ে চলে তখনো চলার উপরে তার শ্রদ্ধা প্রকাশ পায়।

আমি যাকে মানুষের সাধনার বিষয় বলি তার একটা বিশেষ দিক হয় তো তোমার কাছে যথেষ্ট স্পষ্ট হয় নি। মানুষের পূর্ণতা শতদল পদ্মের মতো, তার বিকাশে বৈচিত্র্যের অন্ত নেই। প্রকৃতির অন্য সকল দিক খর্ব করে' কেবল একটিমাত্র ভাবাবেগের প্রবল উৎকর্ষসাধনকেই আধ্যাত্মিক সাধনার আদর্শ বলে আমি স্বীকার করি নে। অনেক সময় দেখা যায় দৃষ্টি যখন অন্ধ হয় তখন স্পর্শশক্তি অদ্ভুত রকমে বেড়ে যায়। কিন্তু তবুও বলতে হবে দৃষ্টি ও স্পর্শের যোগেই আমাদের ইন্দ্রিয়শক্তির পূর্ণ সার্থকতা। মানুষের চিত্ত যত কিছু ঐশ্বর্য্য পেয়েচে, সাধনার লক্ষ্যকে সংকীর্ণ করে তার মধ্যে যেটাকেই বাদ দেব সেটাই সমগ্রকে পঙ্গু করবে।...

চিঠিপত্র-৯, পৃ ৭২-৭৬

১৩৭। নর-দেবতা

প্রবাসী, আশ্বিন ১৩৩৮ (১৯৩১)

যৎকিঞ্চিৎ জগত্যাং জগৎ, এই চলমান জগতে যা-কিছু চল্‌চে, তারই সঙ্গে আমাদের মনের এবং প্রাণের চলাকে মেলাতে হ'ল তারই নাম জীবযাত্রা।

নিজের দৈহিক মানসিক চলার মূলে মানুষ যে-চালনাকে অনুভব করেচে তাকে মানুষ বলে শক্তি। তারই দৃষ্টান্তে সে স্থির করেচে জাগতিক সমস্ত চলাফেরার মূলে তেমনি একটি চালনাশক্তি আছে। এই শক্তির প্রকৃতি কি তাও সে নিজের প্রকৃতি থেকে বুঝে নিয়েচে। একটি মাত্র শক্তিকে সে নিজের মধ্যে অব্যবহিতভাবে একান্তভাবে জানে, সে হচ্ছে ইচ্ছাশক্তি। জগতের গোড়াকার শক্তিকেও সে ইচ্ছাশক্তি ব'লে ধরে নিয়েছিল।

কর্ম ব্যাপারটা চোখে পড়ে, ইচ্ছাটা থাকে অলক্ষ্যে। এই অদৃশ্য ইচ্ছা শান্ত থাকলে কর্ম শান্ত থাকে, ইচ্ছা প্রয়োজনের অনুকূল হ'লে কর্ম অনুকূল, প্রতিকূল হ'লে কর্ম বিরুদ্ধ হয়ে ওঠে। এই জন্য যে-ইচ্ছা নিজের বাইরে অন্যের মধ্যে, তাকে ভয়, লোভ বা প্রেমের দ্বারা ব'শ ক'রে নিজের অভিপ্রায় সিদ্ধ করতে হয়।

জাগতিক ক্রিয়া যে-ইচ্ছার চালনায় ঘটে ব'লে মানুষ স্থির করেচে তাকে নিজের আনুকূল্যে আনবার বিবিধ প্রক্রিয়ায় মানুষের পূজা আরম্ভ। জগতের শক্তিকে নিজের শক্তির সহায় করবার এই সাধনাকে ব্যাবহারিক বিজ্ঞানের প্রথম সোপান ব'লে ধরা যেতে পারে।

মানুষ নিজের মধ্যে একটা বৈপরীত্য দেখেচে। দেখেচে যে, তার কর্ম স্থূল কিন্তু কর্মের উদ্ভব যে ইচ্ছা সেটা ইন্দ্রিয়বোধের অতীত। রূপধারী তার দেহ কিন্তু দেহের গভীরে যে প্রাণ তা অরূপ। চারিদিকের বস্তু তার প্রত্যক্ষ কিন্তু যে মনের কাছে সেই বস্তু গোচর হচ্ছে সে নিজে অগোচর।

এর থেকে মানুষের এই প্রত্যয় জন্মেচে বাস্তব ব'লে যা-কিছু সে দেখ্‌চে জানচে সেই দেখা-জানার মধ্যেই তা চরম নয়, এমন কিছুকে সে আশ্রয় করে আছে যা দেখা-জানার মূলে। মানুষ নিজেকে যদি একান্ত বাইরে থেকেই দেখে তবে দেখতে পাবে পরে পরে কতকগুলি কর্ম ও ছবি। মানুষ পদার্থের বাস্তব প্রমাণ এর বেশি আর কিছু নেই। কিন্তু এই সমস্ত কর্ম ও ছবির চেয়েও নিঃসংশয় ও অব্যবহিতভাবে এমন একটি সত্যকে সে জানে, যে সত্য তার সমস্ত কর্মকে ও প্রত্যক্ষ প্রকাশকে সম্বন্ধযুক্ত ক'রে এক ক'রে তুলেচে। এই হচ্চে তার আত্মোপলব্ধি।

এই যে নিজের মধ্যে ঐক্যোপলব্ধি, এই উপলব্ধিকে মানুষ আপন ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ছাড়িয়ে অনেক দূরে নিয়ে গেচে। এমন কথা বলেচে, যে-মানুষ নিজের মধ্যে সকলকে ও সকলের মধ্যে নিজেকে জানেন তিনিই সত্যকে জানেন। যে ঐক্যতত্ত্ব তার নিজেকে অখণ্ড করেচে সেই তত্ত্বই অন্যের সঙ্গে তাকে সংযুক্ত করেচে।

বস্তুকে বিশ্লেষণ ক'রে তার উপাদান বাহুল্য দেখা যায় কিন্তু সম্বন্ধকে বিশ্লেষণ করা যায় না, তা এক, তা সৃষ্টির মূল রহস্য। বস্তুকে সন্ধান করতে করতে তার মূলে গিয়ে পাওয়া যায় একটি বৈদ্যুতমণ্ডল, সেই মণ্ডলের কেন্দ্রে আছে ধনাত্মক বৈদ্যুতাণু ও সেই কেন্দ্রকে প্রদক্ষিণ ক'রে ঘুরচে ঋণাত্মক বৈদ্যুতাণু। এই আবিষ্কারটি পরম বিস্ময়কর

কিন্তু তার চেয়ে বিস্ময়কর এদের সম্বন্ধ-সূত্র। এই সম্বন্ধের বিচিত্র লীলা অনুসারেই বৈদ্যুতকণার নৃত্য ভিন্ন ভিন্ন ধাতুরূপ ধারণ করচে। আবার সেই মূল ধাতুগুলি একটি নিরবচ্ছিন্ন বিরাট সম্বন্ধযোগে বিশ্বজগতে সংঘটিত করেচে। এই ক্রিয়াশীল সম্বন্ধই বিচিত্রতাকে সৃষ্টি করে, আবার সেই বিচিত্রতার মধ্যে পরিব্যাপ্ত হয়ে তাকে একের যোগে যুক্ত করে থাকে।

এই কথাটিই আছে ঈশোপনিষদে—ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ। বিচিত্র ক্রিয়াশীল জগতকে এক সত্য অধিকার ক'রে আছেন। নিজের আত্মায় আমরা এই সত্যেরই আভাস পাই। এই আত্মা আমার সম্পর্কীয় অসংখ্য নানাকে অধিকার ক'রে এক। তারই যোগে আমার সমস্তকিছু সম্বন্ধযুক্ত। এই পরম রহস্যময় সম্বন্ধকে যাঁরা যত ব্যাপক ক'রে উপলব্ধি করেচেন সত্যকে তাঁরা তত বড় ক'রে জেনেচেন।

যে সত্যকে আমরা কেবল শক্তিরূপে জানি, প্রয়োজন সিদ্ধির জন্যই আপন শক্তির সংগে তার যোগসাধন করি। আমরা চাই অন্ন। কিন্তু এইখানেই ত শেষ হ'ল না, আরও একটা মস্ত চাওয়া বাকী রইল। বিনা প্রয়োজনে মানুষ চায় আনন্দ,—এই আনন্দের পূর্ণতা পায় যার কাছে, সে শক্তি নয় সে ব্যক্তি। সেই ব্যক্তির সংগে আপন ব্যক্তিস্বরূপের পূর্ণ মিলনেই অহৈতুক তৃপ্তি।

ডাক্তারের কাছে যখন যাই তখন ডাক্তারকে দেখি শক্তিরূপে, আরোগ্যশক্তি। তার কাছে প্রয়োজন-সিদ্ধির দাবি। কিন্তু বন্ধুত্বের টানে সেই ডাক্তারের কাছে যখন যাই তখন তাকে দেখি ব্যক্তিরূপে। তখন তার মধ্যে আত্মা আপন আত্মীয় সম্বন্ধ অনুভব করে। এই সম্বন্ধ অনির্বচনীয়, এই সম্বন্ধ সকল সৃষ্টির মূলে। এই সম্বন্ধের অন্তরতম উপলব্ধিকেই বলে প্রেম। এর কাছে সকল প্রয়োজন গৌণ হয়ে পড়ে। তখনই বলা সহজ হয়, "মা গৃধঃ", লোভ ক'রো না।

কেন না, এই অন্তরতম সত্য-সম্বন্ধের যে সম্ভোগ, সে ত্যাগের দ্বারা, আপনাকে দিয়ে। যেখানে শক্তির দরবার সেখানে নেবার দাবি, যেখানে প্রেমের আহবান সেখানে আপনাকে দেবার ঔৎসুক্য। না দিতে পারলে মিলনের মাঝখানে নিজেই আড়াল হয়ে দাঁড়াই। যতক্ষণ ব্যক্তিস্বরূপে এসে পৌঁছলে তার ঐশ্বর্য্য আনন্দে, প্রেমে। লোভ আশ্রয় করে অর্থকে, আনন্দ আশ্রয় করে পরমার্থকে, যাকে ইংরেজীতে বলে value।

অর্থ নিয়ে আছে বিশেষ ব্যক্তি, বিশেষ রাজা, বিশেষ ধনী। পরমার্থ আছে বিশ্ব-ব্যক্তির অধিকারে। একটা দৃষ্টান্ত দিলে কথাটা বোঝা যাবে। বীণা যন্ত্রটা আছে অর্থের কোঠায়। তাকে নিয়ে দরদস্তুর, কাড়াকাড়ি, মামলা-মকদ্দমা চলে। কিন্তু গীতমাধুর্য্য আছে পরমার্থ-শ্রেণীতে; তার ভোগ নিয়ে সীমানার লড়াই নেই। অবারিত বিশ্বজনীনতাতেই তার সম্মান। বীণার অধিকার নিয়ে যেখানে আমার অহংকার সেখানে আমি ব্যক্তিবিশেষ—সংগীতের রস নিয়ে আমার যে আনন্দ, সেই আনন্দ আমার অন্তরংগ বিশ্বমানবের; সে আনন্দ সকল কালের, সকল জনের। মাথা গণতি হিসাবে প্রত্যেক মানুষই যে তাতে সুখ পায় তা নয়, কিন্তু সেই সুখেরই সদাব্রত তার, কোনো বিশেষ মানুষ যদি বঞ্চিত হয় তবে সেটা শিক্ষার অভাব, বোধের জড়তা, বিকৃত অভ্যাস প্রভৃতি কোনো আকস্মিক অপূর্ণতাবশত।

নিখিল পুরুষের ব্যক্তিরূপকে যদি নিজের ব্যক্তিস্বরূপের মধ্যে নিবিড় প্রেমে উপলব্ধি করি তা'হলেই বাহিরের ব্যক্তি-বিশেষের ধনে যে লোভ তার বন্ধন কাটে। আত্মীয় সম্বন্ধকে বিরাটের মধ্যে পেয়েচেন বলেই ত্যাগী। তাঁরাই মৈত্রেয়ীর মত সহজে বলতে পারেন—যেনাহং নামৃতাস্যাম্ কিমহং তেন কুর্য্যাম্। এই কথাটাই ঈশোপনিষদের প্রথম শ্লোক—

ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনং।

ঈশ আছেন চলমান জগতের সমস্ত-কিছুকে অধিকার ক'রে; অতএব ত্যাগের দ্বারা ভোগ করবে, কারও ধনে লোভ করবে না।

এই পরিব্যাপক পরম সত্য সম্বন্ধে ঈশোপনিষৎ বলেচেন, তাঁকে যারা একান্ত সীমাবদ্ধভাবে দেখে তাদের মন তমসাবৃত হয়। কিন্তু যারা তাঁকে একান্ত অসীমভাবে দেখে তাদের অন্ধকার আরও বেশী। যারা সীমাকে অসীমকে মিলিয়ে দেখে তারাই সত্যকে জানে। অর্থাৎ এই পরমপুরুষ বিশেষের মধ্যেও এবং বিশেষকে অতিক্রম করেও। বিশেষকে একেবারে না-ক'রে দিয়ে যে-অসীম সে সম্পূর্ণ অন্ধকার ছাড়া কিছুই নয়।

মানুষের সত্তাও দেখি দুই কোটিকে স্পর্শ ক'রে আছে। একদিকে তার স্বভাব, আর একদিকে বিশ্বভাব। স্বভাবে সে পশুর স্বজাতীয়; প্রাণরক্ষা ও বংশরক্ষার উপযোগী প্রবৃত্তি দ্বারাই সীমাবদ্ধ; এখানে তার অঞ্জলি আছে গ্রহণ করবার অভিমুখে। বিশ্বভাবকে নিয়ে তার মানবধর্ম, এইখানে সর্বমানবের সত্য সে আপনার মধ্যে উপলব্ধি করে, যে-মানব ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমানে অধিষ্ঠিত। এখানে তার অঞ্জলি দানের দিকে। এখানে তার সাধনা এই যে, সম্পূর্ণ ভাল হ'তে হবে, শোভন হ'তে হবে, মহৎ হ'তে হবে, অর্থাৎ তার স্বভাবকে উৎসর্গ করতে হবে বিশ্বভাবের কাছে, প্রাণকে নিবেদন করতে হবে অমৃতের জন্যে; যথার্থ পাওয়া পাবে ব'লে ত্যাগ করতে হবে, যথার্থ বাঁচা বাঁচবে ব'লে মরতে হবে।

যাকে আমরা ভাল বলি সে জিনিষটি বিশেষ মানুষের অধিকার দ্বারা সীমাবদ্ধ নয়। অর্থে এই ভাল নয়, এই ভালো পরমার্থে—এই ভালর সম্বন্ধ সকল মানুষকে নিয়ে। এর জন্যে প্রার্থনা রাজার কাছে নয়, ধনীর কাছে নয়, পরমপুরুষের কাছে। তাঁকেই বলি "যদ্ভদ্রং তন্ন আসুব।" যা ভাল তাই আমাদের দাও। তাই ঋষি বলেচেন, "বিচৈতি চান্তে বিশ্বমাদৌ স দেবঃ সনো বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু।" যে দেবতা বিশ্বের আদিতে অন্তে, (অর্থাৎ নিখিলকে সম্বন্ধযুক্ত ক'রে আছেন) তিনিই আমাদের সকলকে শুভবুদ্ধির দ্বারা যোগযুক্ত করুন।

অন্য জীবজন্তুর প্রয়োজনবুদ্ধি আছে কেবল মানুষেরই শুভবুদ্ধি। তার কারণ, মানুষই অন্য সত্তার উপলব্ধিকে নিজ সত্তার উপলব্ধির সঙ্গে যে-পরিমাণে এক ক'রে দেখে সেই পরিমাণেই সে মহামানুষ মহাত্মার পরিচয় দেয়, ধনী হ'তে হবে এ ইচ্ছা মানুষের বিষয়বুদ্ধিতে, ভাল হ'তে হবে এই ইচ্ছা তার ধর্মবুদ্ধিতে। অর্থাৎ এইটেতেই তার সত্য মানবপ্রকৃতি প্রকাশ পায়। পূর্বেই শাস্ত্রবাক্যে বলা হয়েচে, যে-মানুষ অন্যের মধ্যে নিজেকে ও নিজের মধ্যে অন্যকে জানে সে-ই সত্যকে জানে।

এমন আশ্চর্য্য কথা কেবল মানুষই বলতে পেরেচে, অন্য কোনো প্রাণী পারে নি। এবং এই আশ্চর্য্য কথাটির পরে'ই তার ধর্মসাধনার প্রতিষ্ঠা। সকলকে নিয়ে মানুষ এইটিকে অভিব্যক্ত করবার জন্যেই তার যত কিছু ধর্মমত।

ধর্মের সাহায্যে মানুষ মুক্তিকামনা করেচে। কিসের থেকে মুক্তি? যা অসত্য তার থেকে। কি অসত্য? অন্য জন্তুর মত নিজের সত্তাকে আর-সব থেকে পৃথক জানার বুদ্ধি অসত্য। বিরাট পুরুষের মধ্যে মানুষ সত্য। সেই জন্যেই মানুষকে পূর্ণতা চাইতে হবে ভালর মধ্যে, সুন্দরের মধ্যে, প্রেমের মধ্যে—যে-সব প্রবৃত্তিকে রিপু বলা যায় তারা পশুধর্ম থেকে মানবধর্মে মানুষকে মুক্তি দেবার বিরুদ্ধে শত্রুতা করে।

মানুষ এই আশ্চর্য্য কথা বলেচে, এ এবং সে এই দুইটিকে নিয়ে তার পরম ঐক্যের ক্ষেত্র।

> এষাস্যাপরমা গতিঃ এষাস্য পরমা সম্পৎ
> এষোহস্য পরমো লোকঃ এষোহস্য পরম আনন্দ।

ইনি এর পরমা গতি, ইনি এর পরমা সম্পৎ, ইনি এর পরমা আশ্রয়, ইনি এর পরমা আনন্দ। পশুর পক্ষে এ আছে সে নেই, তাই পরমের কোনো অর্থ নেই। তার গতি, তার সম্পদ, তার আশ্রয়, তার আনন্দ, তার স্বভাবের সঙ্কীর্ণ সীমানার মধ্যেই। মানুষের যা পরম তা মহান্ পুরুষকে নিয়ে। সেখানে তার গতি কোনো সুযোগকে নিয়ে নয়, তা'র সম্পদ অর্থকে নিয়ে নয়, তা'র আশ্রয় আরামকে নিয়ে নয়, তা'র আনন্দ ভোগসুখ নিয়ে নয়। এখানে তার আনন্দ সেই গভীর সম্বন্ধকে নিয়ে যে-সম্বন্ধে সকলের যোগে সে সত্য। মানুষের অমরত্ব নিয়ে অনেক মত অনেক তর্ক। উপনিষৎ কাল-গণনামূলক অমরতার কথা বলচেন না। উপনিষৎ বলেন, যা এতদ্বিদুরমৃতান্তে ভবন্তি—যাঁরা এঁকে জানেন তাঁরা অমৃত হ'ন। কে তিনি?

> এষ দেবো বিশ্বকর্ম্মা মহাত্মা
> সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ—

তিনি সেই দেবতা যাঁর কর্ম সকলকে নিয়ে, সকলের আত্মায় যিনি মহাত্মা, সর্বদা যিনি সকলের হৃদয়ে সন্নিবিষ্ট।

তং বেদ্যং পুরুষং বেদ যথা মা বো মৃত্যুঃ পরিব্যথাঃ—মৃত্যুভয় দুঃখ দেবে না আত্মা যদি সেই বেদনীয় পুরুষকে আত্মীয় জানে। স্বতন্ত্র আমিই মরে, কিন্তু সকলকে নিয়ে যিনি আছেন তাঁর সঙ্গে যোগে আমার মৃত্যু নেই। ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা, ত্যাগের দ্বারা সর্বব্যাপী পুরুষের মধ্যে আনন্দ পাও, লোভ যাবে কেটে; তং বেদ্যং পুরুষং বেদ, সর্বব্যাপী পুরুষের মধ্যে আপনাকে জানো, মৃত্যুভয় যাবে দূরে। সীমাকে নিয়ে লোভ, ভূমাকে নিয়ে আনন্দ, সীমার মধ্যে মৃত্যু, ভূমার মধ্যে অমৃত। ভোগকে সত্য করো ভোগকে বর্জন না করে, সীমাকে বর্জন করে। আনন্দভোগই ব্যক্তিস্বরূপের (পার্সোনালিটির) চরম ইচ্ছা। এই ইচ্ছাকে পরমের অভিমুখে না নিয়ে গিয়ে সঙ্কীর্ণের মধ্যে অবরুদ্ধ করলেই যত মারামারি কাটাকাটি। সত্য ইচ্ছাতেই শান্তি। সত্য ইচ্ছা সেই পরমপুরুষের ইচ্ছা যাঁর ইচ্ছা সকলকে নিয়ে। তাঁর ইচ্ছাকে নিজের ইচ্ছা করার সাধনাকেই বলি ধর্ম-সাধনা। ভালো হওয়া তাকেই বলে। এই ভালোর ইচ্ছা মানবের ধর্ম।

নিজের জীবনে পরিপূর্ণ পুরুষের সাধনাই নানা নামে নানা ধর্মরূপে স্বীকৃত। যিশু বলেচেন, আমি মানুষের পুত্র, পরিপূর্ণ মানুষের মধ্যে আপন পুত্রত্ববোধ তিনি একান্ত ভাবে অনুভব করেচেন, তাই বলতে পেরেচেন দীনতম মানুষকে অন্ন যে দেয় সে আমাকেই দেয়।

এতক্ষণ এই বলবার চেষ্টা করেছি যে, যে-পূর্ণপুরুষ "সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ:", তিনি বিশেষভাবে মানবিক, তাঁর মধ্যে মানব-সম্বন্ধের চরমোৎকর্ষ। তাই তাঁকে বলি "পিতৃতমঃ পিতৃণাং", তাঁকে বলি, "স এব বন্ধুর্জনিতা স বিধাতা" তিনিই বন্ধু, তিনিই পিতা, তিনিই বিধাতা।

সূর্য্যে আগুনে বাতাসে যে জাগতিক ক্রিয়া তার মধ্যে ভালমন্দের আদর্শ নেই, তার মধ্যে মানব-সম্বন্ধের তৃপ্তি নেই। তার সঙ্গে আমাদের বিজ্ঞানের সম্বন্ধ, ব্যবহারের সম্বন্ধ, কিন্তু প্রেমের সম্বন্ধ, সেবার সম্বন্ধ নয়। অর্থাৎ সেখানে আমাদের অর্থ, কিন্তু পরমার্থ নয়।

এক সময়ে জাগতিক শক্তির কাছ থেকে অন্ন, ধন ও শত্রুপরাভবের প্রত্যাশা করেছিলুম; বিজ্ঞানের কাছে আজও সেই প্রত্যাশা ক'রে থাকি। কিন্তু যখন থেকে প্রেয়ের উপরে শ্রেয়কে বড় করেচি, অর্থের উপরে পরমার্থকে, তখন থেকে যাঁর কাছে আমাদের প্রার্থনা তিনি মানবিক। তাঁর সঙ্গে ব্যবহারের যোগ নয়, ভালোবাসার যোগ। সংসারযাত্রায় সিদ্ধিলাভ জাগতিক নিয়মে, আত্মার চরিতার্থতালাভ পরমাত্মার প্রেমে। বৈষয়িক অভাব, সাংসারিক ব্যর্থতা দ্বারা তার ন্যূনতা ঘটে না—সেই প্রেমের পূর্ণতা প্রেমেরই মধ্যে।

"আত্মানমেব প্রিয়মুপাসীত। স য আত্মানমেব প্রিয়মুপাস্তে ন হাস্য প্রিয়ং প্রমায়ুকং ভবতি।" পরমাত্মাকে ভালবেসে উপাসনা করতে হবে, যিনি তাঁকে ভালবেসে উপাসনা করেন তাঁর প্রিয় মরণধর্মী হন না। নির্গুণ সত্তা বলে যদি কোনো পদার্থ থাকা সম্ভব হয় তবে তার প্রতি প্রেমের কোনো অর্থ নেই। মানবিক গুণের পরমতা যাঁর গুণে, মানুষ তাঁকেই এমন প্রেম দিতে পারে যা সকল প্রেমের উপরে।

এই প্রেমের সত্য প্রমাণ কোথায়? ভাবুকতায় নয়, বিশ্বকর্মে। সাধকের সংজ্ঞা এই—"আত্মারতিঃ ক্রিয়াবান", পরমাত্মায় তাঁর আনন্দ, কিন্তু সেই আনন্দ ক্রিয়াবান, ভাবরসে অন্তর্বিলীন নিষ্ক্রিয়তা নয়।

"সর্ব্বব্যাপী স ভগবান, তস্মাৎ সর্ব্বগতঃ শিবঃ।"
ভগবান সর্বব্যাপী, অতএব তিনি সর্বগত কল্যাণ। তাঁকে প্রিয় ব'লে যে উপাসনা করবে সেই পরম প্রিয়ের সঙ্গে তার যোগ হবে সকলের কল্যাণ কর্মে।

পরপুরুষকে কেন মানবিক বলছি এই কথাটাকে স্পষ্ট করা চাই। বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের সাহায্যে দেখতে পাই এই দেহ অসংখ্য পৃথক জীব কোষের সমবায়। প্রত্যেকের স্বতন্ত্র জীবনক্রিয়া, আয়তনের অনুপাতে পরস্পরের মধ্যে তাদের ব্যবধান যথেষ্ট। শুধু দেশের ব্যবধান নয়, কালের ব্যবধান। যে সব জীবকোষ অতীত, আর যারা এখনও আসেনি এই দেহ তাদের মধ্যেকার সেতু। বস্তুত এই দেহের অধিকাংশই বর্তমানে নেই।

এই জীবকোষগুলি একদিকে স্বতন্ত্র অন্যদিকে সমগ্র দেহের সম্পর্কে বিশ্বতন্ত্র। সমস্ত দেহের সম্বন্ধেই তারা সত্য, একান্ত পার্থক্যে তারা নিরর্থক, সমস্ত দেহের কাছে সম্পূর্ণ আত্মদানের দ্বারা তারা সার্থক।

কল্পনা করা যাক্ এই সমস্ত জীবকোষের একটা সাধনা আছে। সে সাধনা কী হতে পারে? দেহাত্মবোধের সাধনা। মনে করা যেতে পারে সমগ্র দেহ ব'লে একটা কিছু আছে এ বোধ তাদের অধিকাংশেরই নেই। যদি মনে করা যায় তাদের মধ্যে কেউ সমগ্র দেহে অনুভূতি নিশ্চিত রূপে পেয়েছে তাহলে সন্দেহ নেই যে সেই অনুভাবে তার অবরুদ্ধ চৈতন্য একটা বিরাট সত্যের মধ্যে মুক্তি লাভ করে। এই মুক্তির আনন্দ সমগ্র দেহের কর্মকে আপন কর্মরূপে সচেষ্টভাবে গ্রহণ করে। সমগ্র দেহে তার আনন্দ, সমগ্র দেহের কর্মে সে ক্রিয়াবান।

এমনি করেই মহামানবের চেতনা যাঁর কাছে বাধাহীন তিনি জানেন মানুষে মানুষে যে-ব্যবধান আছে সেই ব্যবধানটি একটি সক্রিয় অদৃশ্য সম্বন্ধের দ্বারা অধিকৃত। এই সম্বন্ধের স্বভাব হচ্চে আনন্দ, অর্থাৎ প্রেম। সম্বন্ধের পূর্ণতাতেই আনন্দ, তাকেই বলে প্রেম। তাই উপনিষৎ বলেন, "কোহ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ।" আকাশ, যাকে শূন্য মনে করি, তা যদি আনন্দময় সম্বন্ধের দ্বারা বিরাজিত না থাক্‌ত তাহ'লে কেই-বা প্রাণ চেষ্টা করত! বাইরে থেকে যাকে মনে হয় পৃথক প্রাণচেষ্টা, সেটা সম্ভবপর হয়েচে একটি সর্বব্যাপী সত্য সম্বন্ধের যোগে।

এই সম্বন্ধ-তত্ত্ব মানুষের মধ্যে শক্তিমান হয়েচে ব'লেই মানুষের দ্বারা সমাজ-সৃষ্টি সম্ভব হ'ল। সমাজে মানুষের প্রয়োজন সাধন হয় সন্দেহ নেই, কিন্তু প্রয়োজন-সম্বন্ধের চেয়ে সত্যতর আনন্দের সম্বন্ধ। এই সম্বন্ধটি যদি সমাজে কাজ না করে তবে কেবল স্বার্থবুদ্ধি দ্বারা কোনো সমাজ বেশি দিন টেঁকে না। দশের প্রয়োজনের চরমে নিজের প্রয়োজন, সমাজের ব্যাখ্যায় মানুষ এমন কথা ব'ল্‌তে পারে না। তা যদি বল্‌ত তাহ'লে দশের প্রয়োজনের উদ্দেশে নিজের মৃত্যু বা চরম ক্ষতি স্বীকার করত না। সমাজে প্রয়োজনসিদ্ধির স্থান আছে, কিন্তু সেটা বাহিরের এবং তা নিয়ে বিরোধ বেধে ওঠে। এক শ্রেণীর সঙ্গে অন্য শ্রেণীর স্বার্থে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ঘটে, ধনিকে কর্মিকে লাগে হানাহানি। এইক্ষেত্রে সমাজ নিজের ধর্মকে আঘাত করে ব'লেই আত্মঘাতী হয়। তখন সে "মা গৃধঃ" এই বাণীকে উচ্চারণ করতে পারে না, কেননা, যে বিরাট পুরুষের আসন সমস্ত সমাজকে ব্যাপ্ত করে ব্যক্তিগত বা শ্রেণীগত স্বার্থ তাঁর উপলব্ধিকে খণ্ডিত করে। সমাজ মরে এই রাস্তায়।

সমাজে আর একটি বাহ্যিকতা আছে, তারও আতিশয্যে বিপদ। সে হচ্চে আচার। প্রেমে সত্যের উপলব্ধি পূর্ণ হয় তাই মিলন সেখানেই, শান্তি সেখানে। আচার সত্যের চেয়ে প্রবল হয়ে উঠে সর্ব্বব্যাপী যে ভগবান সর্বগত শিব তাঁকে অতিক্রম ক'রে নিজেকে দাম্ভিকতার সঙ্গে প্রচার করে, সমাজেরই দোহাই দিয়ে সমাজের নিত্য ধর্মকে খর্ব করতে থাকে। তখন আচারীতে আচারীতে সর্বনাশ বাধে।

বিষয়ের অভিমান যেমন, আচারের অভিমানও তেমনি। বৈষয়িকতা সর্বজনীনতার বিরুদ্ধ, আচারিকতাও তাই। আচার সাম্প্রদায়িক অহংবুদ্ধিকে প্রবল করে, এই অহং-এর

তাপ ব্যক্তিগত অহং-এর চেয়ে বেশী বই কম নয়। একথা মনে রাখা চাই যে, সেই সকল প্রবৃত্তিতে আমরা পরস্পরকে নিষ্ঠুর ক'রে মারি যারা বিশ্বমানবের বোধকে বাধা দেয়। সাধারণতঃ ধর্মে, সমাজে, রাষ্ট্রতন্ত্রে এই বাধা পদে পদে। এই কারণেই বড় বড় নামের আড়ালে মানুষ মানুষকে যেমন সাংঘাতিক পীড়া দেয় এমন আর কিছুতে নয়। মানুষের যিনি দেবতা তাঁর বোধ বাধাগ্রস্ত হ'লে মানুষকে মারবার জন্যে ঠকাবার জন্যে ধার্মিক নামধারীরা মানৎ দিয়ে থাকে।

দেবতাকে মানুষ ডেকেচে, পিতানোহসি, তুমি আমাদের পিতা। পিতা নামের মধ্যে মানবের বোধ প্রকাশ পায় একথা মানতেই হবে। পিতা নো বোধি—প্রার্থনা এই যে, তুমি পিতা এই বোধটি সত্য হোক, তুমি সকল মানুষের পিতা এই বোধটি সত্য হওয়ার সঙ্গে সকল মানুষের মধ্যে আত্মীয়তার বোধ স্বীকার করতে হবে। মানুষ-মারা লড়াই করতে যাবার পূর্বে একথা বলার মতো কপটতা ও অপরাধ আর নেই—যে তুমি আমাদের পিতা। এতে মানবের পিতাকে দানব বলাই হয়। আমরা যেন জিতি এ দাবি আমাদের দলের লোকের কাছে, আমরা যেন মিলি এ প্রার্থনা তাঁর কাছে যিনি সর্বগতঃ শিবঃ। সনো বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্ত, তিনি আমাদের পরস্পরকে শুভবুদ্ধি দ্বারা সংযুক্ত করুন।

১৩৮। হেমন্তবালা দেবীকে পত্র-৯

৮ নভেম্বর ১৯৩১

...তোমার গ্রহ উপগ্রহের অপমানে তুমি অত্যন্ত বিরক্ত হয়েছো। তুমি স্থির করেছো আমি হিন্দুধর্মকেই অস্বীকার করতে বসেছি। মুস্কিল এই, আকাশে পাতালে যা-কিছু আছে সমস্তকেই যদি মানতে হয় তাহলে সমস্তকেই সম্মান করা অসম্ভব হয়ে ওঠে। উপনিষদ বলেন "স এব বন্ধুর্জনিতা স বিধাতা।" তোমরা উপনিষদকে যথেষ্ট পরিমাণে হিন্দু বলে স্বীকার করো কি না জানি নে, আমি উপনিষদকে সর্বধর্মের ভিত্তি বলে মানি। উপনিষদে ঈশ্বরকে বলচেন বন্ধু, তাঁকেই বলচেন বিধানকর্ত্তা। তোমরা যদি এক কাল্পনিক ভৃগুমুনির দোহাই দিয়ে বলো যে পঞ্চমস্থানে বৃহস্পতিই হচ্চেন বন্ধু, আর আকাশময় গ্রহতারা মিলে আমাদের ছোটো বড়ো ভালোমন্দ সমস্তই বিধান করচেন, তাহলে ঈশ্বরকে কী বলে মানব? আর যদি নাই মানি তাহলে অপরাধ হবে কোন্ যুক্তিতে? কেননা আমার না মানার হেতুই হচ্চে আমার কোষ্ঠীর আকাশে কোনো এক জায়গায় কেতু বসে আছেন তাঁরই প্রভাব। বহুদূর আকাশে কোনো একটা দুষ্ট চক্রান্ত অনিবার্যশক্তিতে আমার বুদ্ধিকে যদি বিপথে নিয়ে যায় তাকে যদি অপরাধ বল্লো, তাহলে ভূমিকম্পের ধাক্কায় কারো ঘাড়ের উপর পড়ে তাকে জখম করলে সেও হবে অপরাধ। হিন্দুধর্ম যদি বলে অপরাধ বাইরেকার জিনিষ, এই জন্যেই তিথিনক্ষত্রের হিসাব মিলিয়ে বিশেষ মুহূর্তে ব্রাহ্মণকে পেট ভরে খেতে দিলে বা গঙ্গাস্নান করলে চুরি ডাকাতি

নরহত্যার পাপ নির্মল হয়ে যাবে তবে এমন অনুশাসন আমি যদি অন্যায় বলেই বোধ করি, এমন কি একে যদি নাস্তিকতা বলি তাহলে আমার ধর্মস্থানে যে গ্রহের দৃষ্টি আছে তাঁর প্রতি তাকিয়ে আমাকে ক্ষমা করতেই হবে। নাস্তিকতা কেন বলচি সেটা বুঝিয়ে বলি। অন্ন বস্ত্র ধন স্বাস্থ্য প্রভৃতি বাইরের পদার্থকে বাইরের নিয়মে অর্জন বা তার ত্রুটি দূর করতে হয়—সেই সব অমোঘ নিয়ম বিজ্ঞান শাস্ত্র আবিষ্কার করচে—এ সম্বন্ধে যতই আমাদের অজ্ঞান দূর হয় ততই আমরা সফলতা লাভ করি। তুমি বোধ হয় বইয়ে পড়েচ, যে,আমেরিকার কটিদেশ ছিন্ন করে যে খাল কাটা হয়েচে সেই খাল কাটবার চেষ্টা প্রথমে ব্যর্থ করে দিয়েছিল সেখানকার নিদারুণ ম্যালেরিয়া। তার পরে বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি ও উদ্যমের সাহায্যে সেখান থেকে ম্যালেরিয়া সম্পূর্ণ দূর হয়ে গেছে। তার কারণ এ নয় যে সেখানে যত অধিবাসী আছে তাদের সকলের কুষ্টি থেকে ম্যালেরিয়াবিধায়ক কুটিল গ্রহ সরে দাঁড়িয়েচে। তার কারণ এই যে ঈশ্বর আমাদের যে-বুদ্ধি দিয়েচেন তাকে স্বীকার করার দ্বারাই প্যানামা প্রদেশের ব্যাধি দূর হয়ে গেছে। অথচ আমাদের দেশে আমরা ঈশ্বরদত্ত বুদ্ধিকে মানিনে আমাদের আয়ত্তের অতীত গ্রহকে মানি ম্যালেরিয়াও নড়তে চায় না। যদি কখনো তুমি পাশ্চাত্য মহাদেশে যেতে তাহলে সেখানকার লোকদের দৈহিক মানসিক শক্তি স্বাস্থ্য সম্পদ দেখলে বিস্মিত হতে। তার প্রধান কারণ অন্ন বস্ত্র আরোগ্য সমস্তই তারা নিজের বুদ্ধির দ্বারা উদ্ভাবন করচে, তারা গ্রহ মুখাপেক্ষীদের উপরে জয়ী হচ্চে। বসন্ত প্রভৃতি অনেক মারীকেই তারা তাড়িয়েচে। এখনো ক্যান্সার ও যক্ষ্মার উপরে জোর খাটচে না—কিন্তু তাদের নিশ্চিত বিশ্বাস, বিজ্ঞাননির্দিষ্ট আত্মবুদ্ধির পথে অধ্যাবসায় চালনা করলে একদিন তারা ও দুটি রোগকেও আয়ত্তে আনতে পারবে। ইতিমধ্যে আমরা যে কেবল মঙ্গল গ্রহের দিকেই সভয়ে তাকিয়ে আছি তা নয় শীতলা আছেন, ওলাবিবি আছেন আরও কত কি আমার জানা নেই। বিধিদত্ত নিজের বুদ্ধিকে যারা অবিশ্বাস করে তাদের ভয়ের আর অন্ত নেই। তারা মা শীতলাকেও ছাড়বে না ডাক্তারকেও না, গ্রহকেও মানবে এদিকে আপিসের বড়ো বাবুরও পায়ে তেল দেবে। এমন দেশে বিধাতার দান বুদ্ধিটাই কি যত অপরাধ করলে! সে ছাড়া আর সব কিছুর জন্যেই পূজো মিলবে! এই তো গেল বাহ্যিক, ভৌতিক—মানুষের আর একটা দিক যেটা তার আন্তরিকতার আত্মিক—সেইখানে তার পাপ পুণ্য। সেই সব রিপুকেই আমরা পাপ বলি যাতে করে বিশ্বাত্মার সঙ্গে আমাদের জীবাত্মার সম্বন্ধ বিকৃত হয়। কাম ক্রোধ লোভ মোহ প্রভৃতি রিপুর দ্বারা আমরা নিজের অহংসীমার মধ্যে বদ্ধ হই। আত্মা তাতে আপন ধর্ম থেকে ভ্রষ্ট হয়। কেননা আত্মার ধর্মই হচ্চে নিজের সত্যকে সকলের মধ্যে উপলব্ধি করা। ভৌতিক জগতে আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি যেমন বিশ্বশক্তির সঙ্গে আমাদের শক্তিকে যোগযুক্ত করে, বিশ্বনিয়মের দ্বারা আমাদের সকল কর্মকে নিয়মিত করে, খেয়ালের দ্বারা নয়, অন্ধ সংস্কারের দ্বারা নয়—তেমনি আমাদের অন্তরাত্মায় যে কল্যাণবৃত্তি আছে সে করুণার দ্বারা মৈত্রীর দ্বারা বিশুদ্ধ জ্ঞানসম্মত লোকহিতৈষিতার দ্বারা আপনাকে সকলের মধ্যে উপলব্ধি করে। স্বার্থ তখন পরমার্থে উত্তীর্ণ হয়—অর্থাৎ তখন সকলের হিতে নিজের হিত জানি।...

চিঠিপত্র-৯, পৃ ১১৬-১২০

১৩৯। হেমন্তবালা দেবীকে পত্র-১০

২৪ নভেম্বর ১৯৩১

তুমি কি আমাকে বৈরাগী মনে করে বসে আছো? নানা রাগে নানা রসে আমার মন বিচিত্র। কিন্তু তা সম্ভবপর হোতো না যদি না আমি বাঁধনছাড়া হতুম। আকাশে মেঘে মেঘে, ঋতুতে ঋতুতে ফুলে পল্লবে রঙের রসের অন্তহীন খেলা—এই খেলা ভেঙে যেত যদি বাঁধনের জালে আট্‌কা পড়ত। বিশ্বব্যাপারকে আমরা লীলা বলে জানি—সেই লীলার মানেই এই যে তার মধ্যে সবই আছে কিন্তু কিছুই বাঁধা নেই। রসের ঝরনা পূর্ণ থাকচে কেননা সে কোথাও বদ্ধ থাকচে না। কুমারসম্ভবে শুনি দৈত্যেরা স্বর্গকে অধিকার করেছে। তার মানে, যে-আনন্দ ছিল মুক্ত তাকে তারা বন্দী করতে চেয়েছিল। তখন সেটা হয়ে গেল ভোগ—ভোগে শ্রান্তি, ভোগে ম্লানতা, ভোগ নিজেকে নিঃশেষ করে দেউলে হয়ে যায়। সেই জন্যেই মন বলে লোভ কোরো না। লোভে আমরা আপনাকেই বন্দী করি কিন্তু যা পাই তাকে শেষ পর্যন্ত বাঁধতে পারি নে।...

...জীবনের সব দুর্মূল্য আনন্দই হচ্চে এই রকমের মুক্ত সম্পদ। তাকে বাঁধতে গেলেই নিজেকে বাঁধি। আমি তাই বলি মুক্তি মানে ত্যাগ নয় বৈরাগ্য নয়, আপন অনুরাগের হাতকড়ি খসিয়ে দেওয়া, তাকে নিরাসক্তির সিংহাসনে রাজা করা—তাকে পাওয়া কিন্তু ধরা নয়।...

চিঠিপত্র-৯, পৃ ১২৪-১২৫

১৪০। হেমন্তবালা দেবীকে পত্র-১১

১২ শ্রাবণ ১৩৩৯ (২৮ জুলাই ১৯৩২)

ভারতবর্ষে দ্রাবিড়জাতীয়দের সমাজ মাতৃতন্ত্র, অর্থাৎ সে সমাজে স্ত্রীপ্রাধান্য। এটা যে হতে পেরেছে তার প্রধান কারণ, তাদের ভাবপ্রবল স্বভাব। সর্বদা ভাবরসে তাদের মন আর্দ্র। যাদের এই রকমের প্রকৃতি নিজের মধ্যে এই ভাবরসকে উদ্বেল করে তোলাই তাদের ধর্মসাধনার চরম লক্ষ্য। তারা আপন হৃদয়বৃত্তিকে চরিতার্থতা দেবার জন্যই নিজের দেবতাকে ব্যবহার করে। এই রসোন্মত্ততায় বিশ্বসংসারকে ভুলে থাকাকেই তারা ধার্মিকতা বলে মনে করে।...

...এইরকম মনোভাবটি মেয়েলি—সেই চিত্তবৃত্তির মধ্যে কর্মের প্রাধান্য নেই, বুদ্ধির সর্বদা গদ্‌গদ বাষ্পাবিলতা। এই প্রেমভক্তি নিজের মধ্যেই নিজে আবর্তিত। এ'কে স্বার্থপরতা যদি বা না বলি তবু এ'কে বলা যায় আত্মপরতা। বাঙালী অনেক অংশে দ্রাবিড়, এই জন্যে তার এত বেশি ভাবাকুলতা। বাঙালী অত্যন্ত বেশি মেয়েলি। তার মানসক্ষেত্রের এই অতিরিক্ত আর্দ্রতা যদি না ঘোচে তাহলে সে ভাবোদ্বেগে মরীয়া হতে পারবে কিন্তু কিছুই সৃষ্টি করতে পারবে না। একদিকে তার আছে কোনো একটা সঙ্কীর্ণ

কেন্দ্রকে ঘিরে ভাবাবিষ্ট অন্ধ আত্মনিবেদন, আর একদিকে নিজের চক্রের বাইরে ঈর্ষা বিদ্বেষ কলহপরতা। কী জানি আমার প্রকৃতির কাছে এই মাতামাতি, এই হৃদয়াবেগে আবর্তিত বিচিত্র নিরর্থকতা একান্ত অরুচিকর।....

চিঠিপত্র-৯, পৃ. ১৫২-১৫৪

১৪১। হেমন্তবালা দেবীকে পত্র-১২

৮ আশ্বিন ১৩৩৯ (২৪ সেপ্টেম্বর ১৯৩২)

যাদের তোমরা অন্ত্যজ বলো তাদের নির্মল ও শুচি হবার উপদেশ দিতে আমাকে অনুরোধ করেচ। করতে পারি যদি তুমি নিশ্চিত করে বলতে পারো যে অন্যজাতীয় যারা ঠাকুরের দর্শন স্পর্শন ও সেবার অধিকারী তারা সকলেই নির্মল নিরাময়, তারা অন্ত্যজগমন করে না, তাদের কারো দুষ্ট ব্যাধি নেই, অন্তরে বাহিরে তারা সকলেই বা অধিকাংশই শুচি—তারা মিথ্যা মকদ্দমা করে না, তারা অকপট। তারা মন্দিরে প্রবেশ করলে দেবতা যদি অশুচি না হন, শত শত বৎসর তাদের সংস্রবেও যদি তাঁদের দেবত্বে কোনো সঙ্কোচ না ঘটে থাকে, তবে কেবল জন্মগত হীনতাই কি তাঁদের অসহ্য। দেবতা কি কেবল তোমাদেরই দেবতা, তোমাদের বিষয়সম্পত্তির মতো। দেবতা সম্বন্ধে এমন ধারণার মতো দেবতার অপমান আর কিছুই হতে পারে না—ভারতবর্ষে দেবতা অপমানিত এবং মানুষ অপমানিত।...

চিঠিপত্র-৯, পৃ. ১৬৫-১৬৬

১৪২। ভূমিকা, মানুষের ধর্ম

১৮ মাঘ ১৩৩৯ (১৯৩২)

মানুষের একটা দিক আছে যেখানে বিষয় বুদ্ধি নিয়ে সে আপন সিদ্ধি খোঁজে। সেইখানে আপন ব্যক্তিগত জীবযাত্রা নির্বাহে তার জ্ঞান তার কর্ম, তার রচনাশক্তি একান্ত ব্যাপৃত। সেখানে সে জীবরূপে বাঁচতে চায়।

কিন্তু, মানুষের আর-একটা দিক আছে যা এই ব্যক্তিগত বৈষয়িকতার বাইরে। সেখানে জীবনযাত্রার আদর্শে বলি ক্ষতি তাই লাভ, যাকে বলি মৃত্যু সেই অমরতা। সেখানে বর্তমান কালের জন্যে বস্তু সংগ্রহ করার চেয়ে অনিশ্চিত কালের উদ্দেশে আত্মত্যাগ করার মূল্য বেশি। সেখানে জ্ঞান উপস্থিত-প্রয়োজনের সীমা পেরিয়ে যায়, কর্ম স্বার্থের প্রবর্তনকে অস্বীকার করে। সেখানে আপন স্বতন্ত্র জীবনের চেয়ে যে বড়ো

জীবন সেই জীবনে মানুষ বাঁচতে চায়।

স্বার্থ আমাদের যে-সব প্রয়াসের দিকে ঠেলে নিয়ে যায় তার মূল প্রেরণা দেখি জীবপ্রকৃতিতে; যা আমাদের ত্যাগের দিকে তপস্যার দিকে নিয়ে যায় তাকেই বলি মনুষ্যত্ব, মানুষের ধর্ম।

কোন্ মানুষের ধর্ম। এতে কার পাই পরিচয়। এ তো সাধারণ মানুষের ধর্ম নয়, তা হলে এর জন্যে সাধনা করতে হত না।

আমাদের অন্তরে এমন কে আছেন যিনি মানব অথচ যিনি ব্যক্তিগত মানবকে অতিক্রম করে 'সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ', তিনি সর্বজনীন সর্বকালীন মানব। তাঁরই আকর্ষণে মানুষের চিন্তায় ভাবে কর্মে সর্বজনীনতার আবির্ভাব। মহাত্মারা সহজে তাঁকে অনুভব করেন সকল মানুষের মধ্যে, তাঁর প্রেমে সহজে জীবন উৎসর্গ করেন। সেই মানুষের উপলব্ধিতেই মানুষ আপন জীবসীমা অতিক্রম করে মানব-সীমায় উত্তীর্ণ হয়। সেই মানুষের উপলব্ধি সর্বত্র সমান নয় ও অনেক স্থলে বিকৃত বলেই সব মানুষ আজও মানুষ হয় নি। কিন্তু, তাঁর আকর্ষণ নিয়ত মানুষের অন্তর থেকে কাজ করছে বলেই আত্ম প্রকাশের প্রত্যাশায় ও প্রয়াসে মানুষ কোথাও সীমাকে স্বীকার করছে না। সেই মানবকেই মানুষ নানা নামে পূজা করেছে, তাঁকেই বলেছে 'এষ দেবো বিশ্বকর্মা মহাত্মা'। সকল মানবের ঐক্যের মধ্যে নিজের বিচ্ছিন্নতাকে পেরিয়ে তাঁকে পাবে আশা ক'রে তাঁর উদ্দেশে প্রার্থনা জানিয়েছে—

স দেবঃ
স নো বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্ত।

সেই মানব, সেই দেবতা, য একঃ, যিনি এক তাঁর কথাই আমার এই বক্তৃতাগুলিকে আলোচনা করেছি।

মানুষের ধর্ম, র/১২/৫৬৮

টীকাঃ

মানুষের ধর্ম—বিশ্বভারতী কর্তৃক প্রকাশিত 'মানুষের ধর্ম' গ্রন্থের গ্রন্থপরিচয় থেকে নিচের অংশটি উদ্‌ধৃত করা হল :-

মাঘ ১৩৩১ তারিখে (৩, ৫ ও ৭) উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে 'কমলা বক্তৃতা' রূপে পঠিত হয়। পরিশিষ্টে মুদ্রিত মানবসত্য কমলাবক্তৃতার অনুবৃত্তিরূপে শান্তিনিকেতনে কথিত এবং প্রবাসী পত্রের ১৩৪০ বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় মুদ্রিত।
মুদ্রিত মানবসত্য কমলাবক্তৃতার অনুবৃত্তিরূপে শান্তিনিকেতনে কথিত এবং প্রবাসী পত্রের ১৩৪০ বৈশাখ ও জৈষ্ঠ সংখ্যায় মুদ্রিত।

প্রসঙ্গসূত্রে এই গ্রন্থের বক্তৃতাগুলির যোগ ১৯৩০ সনের হিবার্ট্ বক্তৃতামালার সহিত। ঐ বক্তৃতা দেওয়া হয় ১৯৩০ মে মাসের ১৯, ২১ ও ২৬ তারিখে অক্সফোর্ডের ম্যাঞ্চেস্টার কলেজে। সেগুলি বিষেশভাবে সম্পাদনা করিয়া The Religion of Man গ্রন্থে সংকলনের সময় (১৯৩১) রচনা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ ভূমিকায় বলেন: [these]

contain also the gleanings of my thoughts on the same subject from the harvest of many lectures and addresses delivered in different countries of the world over a considerable period of my life. The fact that one theme runs through all onlyproves to me that the Religion of Man has been growing within my mind as a religious experience and not merely as a philosophical subject. In fact, a very large portion of my writings, beginning from the earlier products of my immature youth down to the present time, carry an almost continuous trace of the history of this growth. To-day I am made conscious of the fact that the works I have started and the words that I have uttered are deeply linked by a unity of inspiration whose proper definition has often remained unrevealed to me.

এই কথাগুলি মানুষের ধর্ম গ্রন্থের নিবন্ধ-কয়টি সম্পর্কেও সমভাবেই স্মরণ করা যাইতে পারে। ইংরেজি গ্রন্থের অনুবাদ সারসংকলন বা সম্প্রসারণ বাংলা গ্রন্থ নয়, অথচ উভয়ের নাম যেমন আলোচ্য বিষয়ও তেমনি এক।

১৪৩। মানুষের ধর্ম-১

৩ মাঘ ১৩৩৯ (১৬ জানুয়ারি ১৯৩০)

পথ চলেছিল একটানা বাইরের দিকে, তার নিজের মধ্যে নিজের অর্থ ছিল না। পৌঁছল এসে ঘরে, সেখানে অর্থ পাওয়া গেল, আরম্ভ হল ভিতরের লীলা। মানুষে এসে পৌঁছল সৃষ্টিব্যাপার, কর্মবিধির পরিবর্তন ঘটল, অন্তরের দিকে বইল তার ধারা। অভিব্যক্তি চলছিল প্রধানত প্রাণীদের দেহকে নিয়ে, মানুষে এসে সেই প্রক্রিয়ার সমস্ত ঝোঁক পড়ল মনের দিকে। পূর্বের থেকে মস্ত একটা পার্থক্য দেখা গেল। দেহে দেহে জীব স্বতন্ত্র; পৃথকভাবে আপন দেহরক্ষায় প্রবৃত্ত, তা নিয়ে প্রবল প্রতিযোগিতা। মনে মনে সে আপনার মিল পায় এবং মিল চায়, মিল না পেলে সে অকৃতার্থ, তার সফলতা সহযোগিতায়। বুঝতে পারে, বহুর মধ্যে সে এক; জানে, তার নিজের মনের জানাকে বিশ্বমানবমন যাচাই করে, প্রমাণিত করে, তবে তার মূল্য। দেখতে পায়, জ্ঞানে কর্মে ভাবে যতই সকলের সঙ্গে সে যুক্ত হয় ততই সে সত্য হয়। যোগের এই পূর্ণতা নিয়েই মানুষের সভ্যতা। তাই মানুষের সেই প্রকাশকেই শ্রেষ্ঠ যা একান্ত ব্যক্তিগত মনের নয়, যাকে সকল কালের সকল মানুষের মন স্বীকার করতে পারে। বুদ্ধির বর্বরতা তাকেই বলে যা এমন মতকে এমন কর্মকে সৃষ্টি করে যাতে বৃহৎকালে সর্বজনীন মন আপনার সায় পায় না। এই সর্বজনীন মনকে উত্তরোত্তর বিশুদ্ধ করে উপলব্ধি করাতেই মানুষের অভিব্যক্তির উৎকর্ষ। মানুষ আপন উন্নতি সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তিসীমাকে পেরিয়ে বৃহৎমানুষ হয়ে উঠেছে, তার সমস্ত শ্রেষ্ঠ সাধনা এই বৃহৎমানুষের সাধনা। এই বৃহৎমানুষ অন্তরের মানুষ। বাইরে আছে-নানা দেশের নানা সমাজের নানা জাত, অন্তরে আছে এক মানব।

ইতিহাসে দেখা যায়, মানুষের আত্মোপলব্ধি বাহির থেকে অন্তরের দিকে আপনিই গিয়েছে, যে অন্তরের দিকে তার বিশ্বজনীনতা, যেখানে বস্তুর বেড়া পেরিয়ে সে পৌঁচেছে বিশ্বমানসলোকে—যে লোকে তার বাণী, তার শ্রী, তার মুক্তি। সফলতালাভের জন্যে সে মন্ত্রতন্ত্র ক্রিয়াকর্ম নিয়ে বাহ্য পরীক্ষায় প্রবৃত্ত হয়েছিল—অবশেষে সার্থকতালাভের জন্যে একদিন সে বললে, তপস্যা বাহ্যানুষ্ঠানে নয়, সত্যই তপস্যা; গীতার ভাষায় ঘোষণা করলে, দ্রব্যময় যজ্ঞের চেয়ে জ্ঞানযজ্ঞই শ্রেয়; খ্রীস্টের বাণীতে শুনলে, বাহ্য বিধিনিষেধে পবিত্রতা নয়, পবিত্রতা চিত্তের নির্মলতায়। তখন মানবের রুদ্ধমনে বিশ্বমানবচিত্তের উদ্‌বোধন হল। এই তার আন্তর সত্তার বোধ দৈহিক সত্তার ভেদসীমা ছাড়িয়ে দেশে কালে সকল মানুষের মধ্যে ঐক্যের দিকে প্রসারিত। এই বোধেরই শেষ কথা এই যে, যে মানুষ আপনার আত্মার মধ্যে অন্যের আত্মাকে ও অন্যের আত্মার মধ্যে আপনার আত্মাকে জানে, সেই জানে সত্যকে।

মানুষ আছে তার দুই ভাবকে নিয়ে, একটা তার জীবভাব, আর-একটা বিশ্বভাব। জীব আছে আপন উপস্থিতকে আঁকড়ে, জীব চলেছে আশু প্রয়োজনের কেন্দ্র প্রদক্ষিণ করে। মানুষের মধ্যে সেই জীবকে পেরিয়ে গেছে যে সত্তা সে আছে আদর্শকে নিয়ে। এই আদর্শ অন্নের মতো নয়, বস্ত্রের মতো নয়। এ আদর্শ একটা আন্তরিক আহবান, এ আদর্শ একটা নিগূঢ় নির্দেশ। কোন্ দিকে নির্দেশ। যে দিকে সে বিচ্ছিন্ন নয়, যে দিকে তার পূর্ণতা, যে দিকে ব্যক্তিগত সীমাকে সে ছাড়িয়ে চলেছে, যে দিকে বিশ্বমানব।...

মানবদেহে বহুকোটি জীবকোষ; তাদের প্রত্যেকের স্বতন্ত্র জন্ম, স্বতন্ত্র মরণ। অনুবীক্ষণ যোগে জানা যায়, তাদের প্রত্যেকের চারি দিকে ফাঁক। এক দিকে এই জীবকোষগুলি আপন আপন পৃথক জীবনে জীবিত, আর-এক দিকে তাদের মধ্যে একটি গভীর নির্দেশ আছে, প্রেরণা আছে, একটি ঐক্যতত্ত্ব আছে, সেটি অগোচর পদার্থ; সেই প্রেরণা সমগ্র দেহের দিকে, সেই ঐক্য সমস্ত দেহে ব্যাপ্ত। মনে করা যেতে পারে, সেই সমগ্র দেহের উপলব্ধি অসংখ্য জীবকোষের অগম্য, অথচ সেই দেহের পরম রহস্যময় আহবান তাদের প্রত্যেকের কাছে দাবি করছে তাদের আত্মনিবেদন। যেখানে তারা প্রত্যেকে নিজেরই স্বতন্ত্র জীবনসীমায় বর্তমান সেখানে তার মধ্যে রহস্য কিছুই নেই। কিন্তু, যেখানে তারা নিজের জীবনসীমাকে অতিক্রম করে সমস্ত দেহের জীবনে সত্য সেখানে তারা আশ্চর্য, সেখানে তারা আপন স্বতন্ত্র জন্মমৃত্যুর মধ্যে বদ্ধ নয়। সেইখানেই তাদের সার্থকতা।

শোনা যায়, প্রতি সাত বছর অন্তর মানুষের দেহে এই জীবকোষগুলির পরিবর্তন ঘটে। তারা বিদায় নেয়, অর্থাৎ তাদের পৃথক সত্তা থাকে না। কিন্তু তাদের মধ্যে যে সত্তা সমস্ত দেহের আয়ুর অন্তর্গত, অর্থাৎ যেটা তাদের স্বদৈহিক নয়, বিশ্বদৈহিক, সেই সত্তা সমস্ত দেহের জীবনপ্রবাহে থেকে যায়।

দেহে কখনো কখনো কর্কটরোগ অর্থাৎ ক্যান্সার জন্মায়; সেই ক্যান্সার একান্তই স্বতন্ত্র, বলা যেতে পারে তার মধ্যে দেহাত্মবোধ নেই। সমগ্র দেহের সে প্রতিকূল। দেহের পক্ষে একেই বলা যায় অশুভ।

মানুষের দেহের জীবকোষগুলির যদি আত্মবোধ থাকত তা হলে এক দিকে তারা ক্ষুদ্রভাবে আপনাদেরকে স্বতন্ত্র জানত, আবার বৃহৎভাবে নিজেদেরকে জানত সমগ্র

দেহে। কিন্তু জানত অনুভবে, কল্পনায়; সমগ্র দেহকে প্রত্যক্ষত ও সম্পূর্ণত জানা সম্ভব হত না। কেননা এই দেহ শুধু যে বর্তমানে অধিষ্ঠিত তা নয়, এই দেহে রয়েছে তার অতীত, অপেক্ষা করছে তার ভবিষ্যৎ। আরো একটা প্রত্যক্ষাতীত পদার্থ রয়েছে যা সর্বদেহব্যাপী কল্যাণ, যাকে বলি স্বাস্থ্য, যাকে বিশ্লেষণ করা যায় না। তা ছাড়াও সমগ্র জীবনরক্ষার গভীরতর চেষ্টা প্রত্যেক জীবকোষের আছে, যে চেষ্টা রোগের অবস্থায় সর্বদেহের শত্রুহননে নিজেদের আত্মহানিও ঘটায়, দেশপ্রেমিক যেমন করে দেশের জন্যে প্রাণ দেয়। এই চেষ্টার রহস্য অনুসরণ করলেই বোঝা যেতে পারে, এই ক্ষুদ্র দেহগুলির চরম লক্ষ্য অর্থাৎ পরম ধর্ম এমন-কিছুকে আশ্রয় করে যাকে বলব তাদের বিশ্বদেহ।

মানুষও আপন অন্তরের গভীরতর চেষ্টার প্রতি লক্ষ করে অনুভব করেছে যে, সে শুধু ব্যক্তিগত মানুষ নয়, সে বিশ্বগত মানুষের একাত্ম। সেই বিরাট মানব 'অবিভক্তঞ্চ ভূতেষু বিভক্তমিব চ স্থিতম্'। সেই বিশ্বমানবের প্রেরণায় ব্যক্তিগত মানুষ এমন-সকল কাজে প্রবৃত্ত হয় যা তার ভৌতিক সীমা অতিক্রমণের মুখে। যাকে সে বলে ভালো, বলে সুন্দর, বলে শ্রেষ্ঠ; কেবল সমাজরক্ষার দিক থেকে নয়, আপন আত্মার পরিপূর্ণ পরিতৃপ্তির দিক থেকে।...

...মানুষের চিত্তবৃত্তির যে ঔৎসুক্য মানুষের পূর্ণ সত্যের সাক্ষ্য দেয় সেইখানেই অনুভব করি তার ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য থেকে মুক্তি। সেইখানে সে বিশ্বাভিমুখী।...

নীচের দিকে ঝুঁকে পড়ে জন্তু দেখতে পায় খণ্ড খণ্ড বস্তুকে। তার দেখার সঙ্গে তার ঘ্রাণ দেয় যোগ। চোখের দেখাটা অপেক্ষাকৃত অনাসক্ত, জ্ঞানের রাজ্যে তার প্রভাব বেশি। ঘ্রাণের অনুভূতি দেহবৃত্তির সংকীর্ণ সীমায়। দেখা ও ঘ্রাণ নিয়ে জন্তুরা বস্তুর যে পরিচয় পায় সে পরিচয় বিশেষভাবে আশু প্রয়োজনের। উপরে মাথা তুলে মানুষ দেখলে কেবল বস্তুকে নয়, দেখলে দৃশ্যকে অর্থাৎ বিচিত্র বস্তুর ঐক্যকে। একটি অখণ্ড বিস্তারের কেন্দ্রস্থলে দেখলে নিজেকে। একে বলা যায় মুক্তদৃষ্টি। খাড়া-হওয়া মানুষের কাছে নিকটের চেয়ে দূরের দাম বেশি। অজ্ঞাত অভাবনীয়ের দিকে তার মন হয়েছে প্রবৃত্ত। এই দৃষ্টির সঙ্গে যোগ দিয়েছে অন্তরের কল্পনাদৃষ্টি। শুধু দৃষ্টি নয় সঙ্গে সঙ্গে দুটো হাতও পেয়েছে মুক্তি। পায়ের কাজ থেকে হাত যদি ছুটি না পেত তা হলে সে থাকত দেহেরই একান্ত অনুগত, চতুর্থ বর্ণের মতো অস্পৃশ্যতার মলিনতা নিয়ে। পুরাণে বলে, ব্রহ্মার পায়ের থেকে শূদ্র জন্মেছে, ক্ষত্রিয় হাতের থেকে।

মানুষের দেহে শূদ্রের পদোন্নতি হল ক্ষাত্রধর্মে, পেল সে হাতের গৌরব, তখন মনের সঙ্গে হল তার মৈত্রী।...

মানুষের ঋজু মুক্ত দেহ, মাটির নিকটস্থ টান ছাড়িয়ে যেতেই তার মন এমন একটা বিরাট রাজ্যের পরিচয় পেলে যা অন্নব্রহ্মের নয়, যাকে বলা যায় বিজ্ঞানব্রহ্মের আনন্দব্রহ্মের রাজ্য। এ রাজ্যে মানুষ যে কাজগুলো করে হিসাবি লোক জিজ্ঞাসা করতে পারে, "এ-সব কেন।" একমাত্র তার উত্তর, "আমার খুশি।" তার বিজ্ঞানে, তার সাহিত্যে, তার শিল্পকলায় এই এক উত্তর, "আমার খুশি।" মাথাতোলা মানুষের এতবড়ো গর্ব। জন্তুদেরও যথেচ্ছ খেলার অবকাশ আছে, কিন্তু জীবনে তাদের খেলাটা গৌণ। তা ছাড়া তাদের খেলাও প্রকৃতির অনুগত।...

কিন্তু, মানুষের যে কাজটাকে লীলা বলা যায় অর্থাৎ যা তার কোনো দরকারের

আমলে আসে না, কথায় কথায় সেইটেই হয়ে ওঠে মুখ্য, ছাড়িয়ে যায় তার প্রাণযাত্রাকে। সেইটের দ্বারাই তার শ্রেষ্ঠতার পরিচয়। অবকাশের ভূমিকায় মানুষ সর্বত্রই আপন অমরাবতী রচনায় ব্যস্ত, সেখানে তার আকাশকুসুমের কুঞ্জবন। এই-সব কাজে সে এত গৌরব বোধ করে যে চাষের ক্ষেতে তার অবজ্ঞা।...

...দূরতম তারায় মানুষের ন্যূনতম প্রয়োজন, সেই তারার যে আলোকরশ্মি চার-পাঁচ হাজার এবং ততোধিক বৎসর ধরে ব্যোমবিহারী গৃহত্যাগী, তারই দৌড় মাপতে মানুষের দিন যায়, তার রাত কাটে। তা ছাড়া মানুষ অকারণে কথার সংগে কথার বিনুনি করে কবিতাও লেখে; এমন-কি, যারা আধপেটা খেয়ে কৃশতনু তারাও বাহবা দেয়। এর থেকেই আন্দাজ করি, মানুষের অন্নের ক্ষেত প্রকৃতির এলাকায় থাকতে পারে, দেহের দ্বারে পেয়াদার তাগিদে তার খাজনাও দিতে হয়, কিন্তু যেখানে মানুষের বাস্তুভিটে সেই লাখেরাজ দেবত্রভূমি প্রকৃতির এলেকার বাইরে। সেখানে জোর-তলবের দায় নেই, সেখানে সকলের চেয়ে বড়ো দায়িত্ব স্বাধীন দায়িত্ব, তাকে বলব আদর্শের দায়িত্ব, মনুষ্যত্বের দায়িত্ব।

দেহের দিক থেকে মানুষ যেমন ঊর্ধ্বশিরে নিজেকে টেনে তুলেছে খন্ডভূমির থেকে বিশ্বভূমির দিকে, নিজের জানাশোনাকেও তেমনি স্বাতন্ত্র্য দিয়েছে জৈবিক প্রয়োজন থেকে, ব্যক্তিগত অভিরুচির থেকে। জ্ঞানের এই সম্মানে মানুষের বৈষয়িক লাভ হোক বা না হোক, আনন্দ লাভ হল। এইটেই বিস্ময়ের কথা। পেট না ভরিয়েও কেন হয় আনন্দ। বিষয়কে বড়ো করে পায় বলে আনন্দ নয়, আপনাকেই বড়ো ক'রে সত্য ক'রে পায় ব'লে আনন্দ। মানবজীবনের যে বিভাগ অহৈতুক অনুরাগে অর্থাৎ আপনার বাহিরের সংগে অন্তরংগ যোগের, তার পুরস্কার আপনারই মধ্যে। কারণ, সেই যোগের প্রসারেই আত্মার সত্য।

...জীবলোকে চৈতন্যের নীহারিকা অস্পষ্ট আলোকে ব্যাপ্ত। সেই নীহারিকা মানুষের মধ্যে কেন্দ্রীভূত হয়ে উজ্জ্বল দীপ্তিতে বললে, 'অয়মহং ভোঃ—এই-যে আমি।' সেইদিন থেকে মানুষের ইতিহাসে নানা ভাবে নানা রূপে নানা ভাষায় এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া চলল 'আমি কী'। ঠিক উত্তরটিতে তার আনন্দ, তার গৌরব। জন্তুর উত্তর পাওয়া যায় তার দৈহিক ব্যবস্থার যথাযোগ্যতায়। সনাতন গন্ডারের মতো স্থূল ব্যবহারে গন্ডার যদি কোনো বাহ্য বাধা না পায় তা হলে আপন সার্থক্য সম্বন্ধে তার কোনো সংশয় থাকে না। কিন্তু, মানুষে কী করে হবে মানুষের মতো তাই নিয়ে বর্বরদশা থেকে সভ্য অবস্থা পর্যন্ত তার চিন্তা ও প্রয়াসের অন্ত নেই। সে বুঝেছে সে সহজ নয়, তার মধ্যে একটা রহস্য আছে, এই রহস্যের আবরণ উদ্‌ঘাটিত হতে হতে তবে সে আপনাকে চিনবে। শত শত শতাব্দী ধরে চলেছে তার প্রয়াস। কত ধর্মতন্ত্র, কত অনুষ্ঠানের পত্তন হল; সহজ প্রবৃত্তির প্রতিবাদ করে নিজেকে সে স্বীকার করাতে চায় যে, বাইরে সে যা ভিতরে ভিতরে তার চেয়ে সে বড়ো। এমন কোনো সত্তার স্বরূপকে সে মনের মধ্যে গ্রহণ করবার চেষ্টা করছে, আদর্শরূপে যিনি তার চেয়ে বড়ো অথচ তার সংগে চিরসম্বন্ধযুক্ত। এমনি করে বড়ো ভূমিকায় নিজের সত্তকে স্পষ্ট করে উপলব্ধি করতে তার অহৈতুক আগ্রহ। যাকে সে পূজা করে তার দ্বারাই সে প্রমাণ করে তার মতে নিজে সে সত্য কিসে, তার বুদ্ধি কাকে বলে পূজনীয়, কাকে জানে পূর্ণতা বলে। সেইখানেই আপন দেবতার নামে মানুষ

উত্তর দিতে চেষ্টা করে, 'আমি কী—আমার চরম মূল্য কোথায়।' বলা বাহুল্য, উত্তর দেবার উপলক্ষে পূজার বিষয়কল্পনায় অনেক সময়ে তার এমন চিত্ত প্রকাশ পায় বুদ্ধিতে যা অন্ধ, শ্রেয়োনীতিতে যা গর্হিত, সৌন্দর্যের আদর্শে যা বীভৎস। তাকে বলব ভ্রান্ত উত্তর এবং মানুষের কল্যাণের জন্যে সকলরকম ভ্রমকেই যেমন শোধন করা দরকার এখানেও তাই। এই ভ্রমের বিচার মানুষেরই শ্রেয়োবুদ্ধি থেকেই, মানুষের দেবতার শ্রেষ্ঠতার বিচার মানুষেরই পূর্ণতার আদর্শ থেকে।

জীবসৃষ্টির প্রকাশপর্যায়ে দেহের দিকটাই যখন প্রধান ছিল তখন দেহসংস্থানঘটিত ভ্রম বা অপূর্ণতা নিয়ে অনেক জীবের ধ্বংস বা অবনতি ঘটেছে। জীবসৃষ্টির প্রকাশে মানুষের মধ্যে যখন 'আমি' এসে দাঁড়ালো তখন এই 'আমি' সম্বন্ধে ভুল করলে দৈহিক বিনাশের চেয়ে বড়ো বিনাশ। এই আমিকে নিয়ে ভুল কোথায় ঘটে, সে প্রশ্নের একই উত্তর দিয়েছেন আমাদের সকল মহাপুরুষ। তাঁরা এই অদ্ভুত কথা বলেন, যেখানে আমিকে না-আমির দিকে জানতে বাধা পাই, তাকে অহং-বেড়ায় বিচ্ছিন্ন সীমাবদ্ধ করে দেখি। এক আত্মলোকে সকল আত্মার অভিমুখে আত্মার সত্য; এই সত্যের আদর্শেই বিচার করতে হবে মানুষের সভ্যতা, মানুষের সমস্ত অনুষ্ঠান, তার রাষ্ট্রতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, ধর্মতন্ত্র—এর থেকে যে পরিমাণে সে ভ্রষ্ট সেই পরিমাণে সে বর্বর।

মানুষের দায় মহামানবের দায়, কোথাও তার সীমা নেই। অন্তহীন সাধনার ক্ষেত্রে তার বাস। জন্তুদের বাস ভূমণ্ডলে, মানুষের বাস সেইখানে যাকে সে বলে তার দেশ। দেশ কেবল ভৌমিক নয়, দেশ মানসিক। মানুষে মানুষে মিলিয়ে এই দেশ জ্ঞানে জ্ঞানে, কর্মে কর্মে। যুগযুগান্তরের প্রবাহিত চিন্তাধারায় প্রীতিধারায় দেশের মন ফলে শস্যে সমৃদ্ধ। বহু লোকের আত্মত্যাগে দেশের গৌরব সমুজ্জ্বল। যে-সব দেশবাসী অতীতকালের, তাঁরা বস্তুত বাস করতেন ভবিষ্যতে। তাঁদের ইচ্ছার গতি কর্মের গতি ছিল আগামীকালের অভিমুখে। তাঁদের তপস্যার ভবিষ্যৎ আজ বর্তমান হয়েছে আমাদের মধ্যে কিন্তু আবদ্ধ হয় নি। আবার আমরাও দেশের ভবিষ্যতের জন্য বর্তমানকে উৎসর্গ করছি। সেই ভবিষ্যৎকে ব্যক্তিগতরূপে আমরা ভোগ করব না। যে তপস্বীরা অন্তহীন ভবিষ্যতে বাস করতেন, ভবিষ্যতে যাঁদের আনন্দ, যাঁদের আশা, যাঁদের গৌরব, মানুষের সভ্যতা তাঁদেরই রচনা। তাঁদেরই স্মরণ করে মানুষ আপনাকে জেনেছে অমৃতের সন্তান; বুঝেছে যে, তার দৃষ্টি তার সৃষ্টি তার চরিত্র মৃত্যুকে পেরিয়ে। মৃত্যুর মধ্যে গিয়ে যাঁরা অমৃতকে প্রমাণ করেছেন তাঁদের দানেই দেশ রচিত। ভাবীকালবাসীরা, শুধু আপন দেশকে নয়, সমস্ত পৃথিবীর লোককে অধিকার করেছেন। তাঁদের চিন্তা, তাঁদের কর্ম, জাতিবর্ণ-নির্বিচারে সমস্ত মানুষের। সবাই তাঁদের সম্পদের উত্তরাধিকারী। তাঁরাই প্রমাণ করেন সব মানুষকে নিয়ে, সব মানুষকে অতিক্রম ক'রে, সীমাবদ্ধ কালকে পার হয়ে এক-মানুষ বিরাজিত। সেই মানুষকেই প্রকাশ করতে হবে শ্রেষ্ঠ স্থান দিতে হবে ব'লেই মানুষের বাস দেশে। অর্থাৎ, এমন জায়গায় যেখানে প্রত্যেক মানুষের বিস্তার খণ্ড খণ্ড দেশকালপাত্র ছাড়িয়ে—যেখানে মানুষের বিদ্যা, মানুষের সাধনা সত্য হয় সকল কালের সকল মানুষকে নিয়ে।

ভবিষ্যৎকাল অসীম, অতীতকালও তাই। এই দুই দিকে মানুষের মন প্রবলভাবে আকৃষ্ট।...

...পূর্ণ পুরুষের অধিকাংশ এখনো আছে অব্যক্ত। তাঁকেই ব্যক্ত করবার প্রত্যাশা নিয়ত চলেছে ভবিষ্যতের দিকে। পূর্ণপুরুষ আগন্তুক। তাঁর রথ ধাবমান; কিন্তু তিনি এখনো এসে পৌঁছন নি। বরযাত্রীরা আসছে, যুগের পর যুগ অপেক্ষা করছে, বরের বাজনা আসছে দূর থেকে। তাঁকে এগিয়ে নিয়ে আসবার জন্যে দূতেরা চলেছে দুর্গম পথে। এই-যে অনিশ্চিত আগামীর দিকে মানুষের এত প্রাণপণ আগ্রহ—এই-যে অনিশ্চিতের মধ্যে, অনাগতের মধ্যে, তার চিরনিশ্চিতের সন্ধান অক্লান্ত—তারই সংকটসংকুল পথে মানুষ বার বার বাধা পেয়ে ব্যর্থ হয়েও যাত্রা বন্ধ করতে পারলে না। এই অধ্যাবসায়কে বলা যেতে পারত পাগলামি, কিন্তু মানুষ তাকেই বলেছে মহত্ত্ব। এই মহত্ত্বের আশ্রয় কোথায়। অলক্ষ্য একটা পরিপূর্ণতার দিকে মানুষের মনের আকর্ষণ দেখতে পাই; অন্ধকার ঘরের গাছে, তার শাখায় প্রশাখায়, যেমন একটা স্বাভাবিক ব্যাকুলতা প্রাচীরের ও পারের আলোকের দিকে। আলোক যেমন সত্য, পূর্ণের আকর্ষণ নিয়ত যেখান থেকে প্রেরিত সেও যদি তেমনি সত্য না হত তা হলে জীবিকার প্রয়োজনের বাইরে আত্মার উৎকর্ষের জন্যে মানুষ যা-কিছু চিন্তা করে, কর্ম করে, তার কোনো অর্থই থাকে না। এই সত্যকে ক্ষণে ক্ষণে স্পর্শ করি আমাদের সংকল্পে, আমাদের ধ্যানে, আমাদের আদর্শে। সেই অভাবনীয় পূর্ণকে দেখতে পাই দুঃখের দীপ্তিতে, মৃত্যুর গৌরবে। সে আমাদের জ্ঞানকে ঘরছাড়া ক'রে বড়ো ক্ষেত্রে মুক্তি দিয়েছে, নইলে পরমাণুতত্ত্বের চেয়ে প্রাকপ্রণালী মানুষের কাছে অধিক আদর পেত। সীমাবদ্ধ সৃষ্টিকে মানুষ প্রত্যক্ষ দেখছে, তাকে ব্যবহার করছে, কিন্তু তার মন বলছে এই-সমস্তেরই সত্য রয়েছে সীমার অতীতে। এই সীমাকে যদি প্রশ্ন করি তার শেষ উত্তর পাই নে এই সীমার মধ্যেই।...

...পশুরা যদি বিচারক হত মানুষকে বলত জন্ম-পাগল। বস্তুত মানুষের বিজ্ঞান সব মানুষকে এক-পাগলামিতে-পাওয়া জীব বলে প্রমাণ করছে। বলছে, সে যাকে যেরকম জানছে বলে মনে করে সেটা একেবারেই তা নয়, সম্পূর্ণ উলটো। জন্তুরা নিজেদের সম্বন্ধে এরকম লাইবেল প্রচার করে না। তাদের বোধের কাছে যেটা যা সেটা তাই; অর্থাৎ তাদের কাছে কেবল আছে তথ্য, তাদের অবিচলিত নিষ্ঠা প্রতীয়মানের প্রতি। তাদের জগতের আয়তন কেবল তলপৃষ্ঠ নিয়ে। তাদের সমস্ত দায় ঐ একতলাটাতেই। মানব-জগতের আয়তনে বেধ আছে, যা চোখে পড়ে তার গভীরে। প্রত্যক্ষ তথ্যকে উপেক্ষা করলে মানুষের চলে না, আবার সত্যকেও নইলে নয়।

অন্যান্য জন্তুর মতোই তথ্য মানুষের সম্বল, কিন্তু সত্য তার ঐশ্বর্য। ঐশ্বর্যের চরম লক্ষ্য অভাব দূর করা নয়, মহিমা উপলব্ধি করানো। তাই ঐশ্বর্য-অভিমানী মানুষ বলেছে : ভূমৈব সুখং নাল্পে সুখমস্তি। বলেছে, অল্পে সুখ নেই, বৃহত্তেই সুখ।

এটা নিতান্তই বেহিসাবি কথা হল। হিসাবি বুদ্ধিতে বলে, যা চাই আর যা পাই এই দুটো মাপে মিলে গেলেই সুখের বিষয়।...

...শাস্ত্রেও বলছে : সন্তোষং পরমাস্থায় সুখার্থী সংযতো ভবেৎ। তবেই তো দেখছি, সন্তোষে সুখ নেই আবার সন্তোষেই সুখ এই দুটো উলটো কথা সামনে এসে দাঁড়ালো। তার কারণ, মানুষের সত্তায় দ্বৈধ আছে। তার যে সত্তা জীবসীমার মধ্যে, সেখানে যেটুকু আবশ্যক সেইটুকুতেই তার সুখ। কিন্তু অন্তরে অন্তরে জীবমানব বিশ্বমানবে প্রসারিত; সেই দিকে সে সুখ চায় না, সে সুখের বেশি চায়, সে ভূমাকে চায়। তাই সকল জীবের মধ্যে

মানুষই কেবল অমিতাচারী। তাকে পেতে হবে অমিত, তাকে দিতে হবে অমিত, কেননা তার মধ্যে আছে অমিতমানব। সেই অমিতমানব সুখের কাঙাল নয়, দুঃখভীরু নয়। সেই অমিতমানব আরামের দ্বার ভেঙে কেবলই মানুষকে বের করে দিয়ে চলেছে কঠোর অধ্যবসায়ে।...

উপনিষদে ভগবান-সম্বন্ধে একটি প্রশ্নোত্তর আছে। স ভগবঃ কস্মিন্ প্রতিষ্ঠিতঃ। সেই ভগবান কোথায় প্রতিষ্ঠিত। এই প্রশ্নের উত্তর : স্বে মহিম্নি। নিজের মহিমায়। সেই মহিমাই তাঁর স্বভাব।...

মানুষেরও আনন্দ মহিমায়।... কিন্তু, যে স্বভাবে তার মহিমা সেই স্বভাবকে সে পায় বিরোধের ভিতর দিয়ে, পরম সুখকে পায় পরম দুঃখে। মানুষের সহজ অবস্থা ও স্বভাবের মধ্যে নিত্যই দ্বন্দ্ব। তাই ধর্মের পথকে, অর্থাৎ মানুষের পরম স্বভাবের পথকে, দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি।

জন্তুর অবস্থাও যেমন স্বভাবও তার অনুগত। তার বরাদ্দও যা কামনাও তার পিছনে চলে বিনা বিদ্রোহে; তার যা পাওনা তার বেশি তার দাবি নেই। মানুষ বলে বসল, ‘আমি চাই উপরি-পাওনা।’...

জীবধর্মরক্ষার চেষ্টাতেও মানুষের নিরন্তর একটা দ্বন্দ্ব আছে। সে হচ্ছে প্রাণের সঙ্গে অপ্রাণের দ্বন্দ্ব। অপ্রাণ আদিম, অপ্রাণ বিরাট। তার কাছে থেকে রসদ সংগ্রহ করতে হয় প্রাণকে, মালমসলা নিয়ে গড়ে তুলতে হয় দেহযন্ত্র। সেই অপ্রাণ নিষ্ঠুর মহাজনের মতো, ধার দেয় কিন্তু কেবলই টানাটানি করে ফিরে নেবার জন্যে, প্রাণকে দেউলে করে দিয়ে মিলিয়ে দিতে চায় পঞ্চভূতে।

এই প্রাণচেষ্টাতে মানুষের শুধু কেবল অপ্রাণের সঙ্গে প্রাণের দ্বন্দ্ব নয়, পরিমিতের সঙ্গে অপরিমিতের। বাঁচবার দিকেও তার উপরি-পাওনার দাবি। বড়ো করে বাঁচতে হবে; তার অন্ন যেমন-তেমন নয়—তার বসন, তার বাসস্থান কেবল কাজ চালাবার জন্যে নয়—বড়োকে প্রকাশ করবার জন্যে। এমন-কিছুকে প্রকাশ যাকে সে ব'লে থাকে ‘মানুষের প্রকাশ’, জীবনযাত্রাতেও যে প্রকাশে ন্যূনতা ঘটলে মানুষ লজ্জিত হয়। সেই তার বাড়তি ভাগের প্রকাশ নিয়ে মানুষের যেমন দুঃসাধ্য প্রয়াস এমন তার সাধারণ প্রয়োজন মেটাবার জন্যও নয়। মানুষের মধ্যে যিনি বড়ো আছেন, আহারে বিহারেও পাছে তাঁর অসম্মান হয় মানুষের এই এক বিষম ভাবনা।...

...মনুষ্যত্ব বাঁচানোর দ্বন্দ্ব মানবধর্মের সঙ্গে পশুধর্মের দ্বন্দ্ব, অর্থাৎ আদর্শের সঙ্গে বাস্তবের। মানুষের ইতিহাসে এই পশুও আদিম। সে টানছে তামসিকতায় মূঢ়তার দিকে। পশু বলছে, ‘সহজধর্মের পথে ভোগ করো।’ মানুষ বলছে, ‘মানবধর্মের দিকে তপস্যা করো।’ যাদের মন মন্থর, যারা বলে ‘যা আছে তাই ভালো—যা হয়ে গেছে তাই শ্রেষ্ঠ’, তারা রইল জন্তুধর্মের স্থাবর বেড়াটার মধ্যে; তারা মুক্ত নয়, তারা স্বভাব থেকে ভ্রষ্ট। তারা পূর্বসঞ্চিত ঐশ্বর্যকে বিকৃত করে, নষ্ট করে।

মানুষ এক দিকে মৃত্যুর অধিকারে, আর-এক দিকে অমৃতে; এক দিকে সে ব্যক্তিগত সীমায়, আর-এক দিকে বিশ্বগত বিরাটে। এই দুয়ের কোনোটাকেই উপেক্ষা করা চলে না। মানুষ নিজেকে জানে : তদ্‌দূরে তদ্বন্তিকে চ। সে দূরেও বটে, সে নিকটেও। সেই

দূরের মানুষের দাবি নিকটের মানুষের সব-কিছুকেই ছাড়িয়ে যায়। এই অপ্রত্যক্ষের দিকে মানুষের কল্পনাবৃত্তি দৌত্য করে। ভুল করে বিস্তর, যেখানে থই পায় না সেখানে অদ্ভুত সৃষ্টি দিয়ে ফাঁক ভরা; তবুও এই অপ্রতিহত প্রয়াস সত্যকেই প্রমাণ করে, মানুষের এই একটি আশ্চর্য সংস্কারের সাক্ষ্য দেয় যে, যেখানে আজও তার জানা পৌঁছয় নি সেখানেও শেষ হয় নি জানা।

গাছে গাছে ঘর্ষণে আগুন জ্বলে। জ্বলে ব'লেই জ্বলে, এই জেনে চুপ করে থাকলে মানুষের বুদ্ধিকে দোষ দেওয়া যেত না।...

কিন্তু, অল্পে-সন্তুষ্ট মূঢ়তার মাঝখানেও মানুষের প্রশ্ন বাধা ঠেলে ঠেলে চলে। কাজেই উনুন ধরাবার জন্যে আগুন জ্বালতে মানুষকে যত চেষ্টা করতে হয়েছে তার চেয়ে সে কম চেষ্টা করে নি 'আগুন জ্বলে কেন' তার অনাবশ্যক উত্তর বের করতে।...

এই অদ্ভুত বুদ্ধির সকলের চেয়ে স্পর্ধা প্রকাশ পায় যখন মানুষকে সে ঠেলা দিয়ে দিয়ে প্রশ্ন করে, 'তুমি আপনি কে।' এমন কথা বলতেও তার বাধে না যে, 'মনে হচ্ছে বটে তুমি আছ কিন্তু সত্যই তুমি আছ কি, তুমি আছ কোথায়।' উপস্থিতমত কোনো জবাব না খুঁজে পেয়ে তাড়াতাড়ি যদি বলে বসি 'আছি দেহধর্মে' অমনি অন্তর থেকে প্রবাহণ রাজা মাথা নেড়ে বলবেন, ওখানে প্রশ্নের শেষ হতে পারে না। তখন মানুষ বললে: ধর্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াম্। মানবধর্মের গভীর সত্য নিহিত আছে গোপনে। আমার 'এই আমি' আছে প্রত্যক্ষে, 'সেই আমি' আছে অপ্রত্যক্ষে।...

প্রকৃতির গুহাহিত শক্তিকে আবিষ্কার ও ব্যবহার করেই মানুষের বাহিরের সমৃদ্ধি; যে সত্যে তার আত্মার সমৃদ্ধি সেও গুহাহিত, তাকে সাধনা করেই পেতে হবে। সেই সাধনাকে মানুষ বলে ধর্মসাধনা।

ধর্ম শব্দের অর্থ স্বভাব। চেষ্টা ক'রে সাধনা ক'রে স্বভাবকে পাওয়া, কথাটা শোনায় স্ববিরোধী অর্থাৎ স্বভাবকে অতিক্রম করে স্বভাবকে পাওয়া। খ্রীস্টানশাস্ত্রে মানুষের স্বভাবকে নিন্দা করেছে; বলেছে, তার আদিতেই পাপ, অবাধ্যতা। ভারতীয় শাস্ত্রেও আপনার সত্য পাবার জন্য স্বভাবকে অস্বীকার করতে বলে। মানুষে নিজে সহজে যা, তাকে শ্রদ্ধা করে না। মানুষ বলে বসল, তার সহজ স্বভাবের চেয়ে তার সাধনার স্বভাব সত্য। একটা স্বভাব তার নিজেকে নিয়ে আর-একটা স্বভাব তার ভূমাকে নিয়ে।...

প্রবৃত্তির প্রেরণায় আমরা যা ইচ্ছা করি সেই প্রেয়ের ইচ্ছা মানুষের স্বভাবে বর্তমান, আবার যা ইচ্ছা করা উচিত সেই শ্রেয়ের ইচ্ছাও মানুষের স্বভাবে। শ্রেয়কে গ্রহণ করার দ্বারা মানুষ কিছু একটা পায় যে তা নয়, কিছু একটা হয়। সেই হওয়াকে বলে সাধু হওয়া। তার দ্বারা ধনী হয় না, বলী হয় না, সমাজে সম্মানিত হতেও পারে না-হতেও পারে, এমন-কি, অবমানিত হওয়ার সম্ভাবনা যথেষ্ট। সাধু হওয়া পদার্থটা কী, প্রকৃতির রাজ্যে তার কোনো কিনারা নেই। শ্রেয় শব্দটাও তেমনি। অপর পক্ষে প্রেয়কে একান্তরূপে বরণ করার দ্বারা মানুষ আর-একটা কিছু হয়, তাকে উপনিষদ্ বলছেন, আপন অর্থ থেকে হীন হওয়া।

...একান্তভাবে প্রেয়কে অবলম্বন করলে, মানুষ বলতে যা বোঝায় সেই সত্য হীন হয়ে যায়। নিজের মধ্যে সর্বকালীন বিশ্বভূমীন মনুষ্যধর্মের উপলব্ধিই সাধুতা, হীনতা সেই মহামানবের উপলব্ধি থেকে বিচ্যুত হওয়া। প্রাকৃতিক স্বভাবের উপরেও মানুষের

আত্মিক স্বভাব যদি না থাকত তা হলে এ-সব কথার অর্থই থাকত না।

ডিমের মধ্যেই পাখির প্রথম জন্ম। তখনকার মতো সেই ডিমটাই তার একমাত্র ইদম্। আর-কিছুই সে জানে না। তবু তার মধ্যে একটা প্রবর্তনা আছে বাইরের অজানার মধ্যে সার্থকতার দিকে।...

যদি খোলাটার মধ্যেই একশো বছর সে বেঁচে থাকত তা হলে সেটাকেই বলা যেত তার মহতী বিনষ্টি।

মানুষের সাধনাও এক স্বভাব থেকে স্বভাবান্তরের সাধনা। ব্যক্তিগত সংস্কার ছাড়িয়ে যাবে তার জিজ্ঞাসা, তবেই বিশ্বগত জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হবে তার বিজ্ঞান। ব্যক্তিগত স্বার্থ ও জড় প্রথাগত অভ্যাস কাটিয়ে যাবে তার প্রয়াস, তবেই বিশ্বগত কর্মের দ্বারা সে হবে বিশ্বকর্মা। অহংকারকে ভোগাসক্তিকে উত্তীর্ণ হবে তার প্রেম, তবেই বিশ্বগত আত্মীয়তায় মানুষ হবে মহাত্মা। মানুষের একটা স্বভাবে আবরণ, অন্য স্বভাবে মুক্তি।...

...মানুষের যে সংসার তার অহং-এর ক্ষেত্র সে দিকে তার অহংকার ভূরিতায়, যে দিকে তার আত্মা সে দিকে তার সার্থকতা ভূমায়। এক দিকে তার গর্ব স্বার্থসিদ্ধিতে, আর-এক দিকে তার গৌরব পরিপূর্ণতায়। সৌন্দর্য, কল্যাণ, বীর্য, ত্যাগ প্রকাশ করে মানুষের আত্মাকে; অতিক্রম করে প্রাকৃত মানুষকে; উপলব্ধি করে জীবমানবের অন্তরতম বিশ্বমানবকে। যং লব্ধ্বা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ।

চারি দিকে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে অন্য সকল প্রাণী, বাইরে থেকে জীবিকার অর্থ খুঁজে খুঁজে। মানুষ আপন অন্তরের মধ্যে আশ্চর্য হয়ে কাকে অনুভব করলে যিনি নিহিতার্থো দধাতি, যিনি তাকে তার অন্তর্নিহিত অর্থ দিচ্ছেন। সেই অর্থ মানুষের আপন আত্মারই গভীর অর্থ। সেই অর্থ এই যে, মানুষ মহৎ; মানুষকে প্রমাণ করতে হবে যে সে মহৎ, তবেই প্রমাণ হবে যে সে মানুষ। প্রাণের মূল্য দিয়েও তার আপন ভূমাকে প্রকাশ করতে হবে; কেননা তিনি চিরন্তন মানব, সর্বজনীন মানব, তিনি মৃত্যুর অতীত, তাঁকে যে অর্ঘ্য দিতে হবে সে অর্ঘ্য সকল মানুষের হয়ে সকল কালের হয়ে আপনারই অন্তরতম বেদীতে। আপনারই পরমকে না দেখে মানুষ বাইরের দিকে সার্থকতা খুঁজে বেড়ায়। শেষকালে উদ্ভ্রান্ত হয়ে ক্লান্ত হয়ে সে বলে : কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম। মানুষের দেবতা মানুষের মনের মানুষ; জ্ঞানে কর্মে ভাবে যে পরিমাণে সত্য হই সেই পরিমাণেই সেই মনের মানুষকে পাই—অন্তরে বিকার ঘটলে সেই আমার আপন মনের মানুষকে মনের মধ্যে দেখতে পাই নে। মানুষের যত-কিছু দুর্গতি আছে সেই আপন মনের মানুষকে হারিয়ে, তাকে বাইরের উপকরণে খুঁজতে গিয়ে, অর্থাৎ আপনাকেই পর করে দিয়ে। আপনাকে তখন টাকায় দেখি, খ্যাতিতে দেখি, ভোগের আয়োজনে দেখি। এই নিয়েই তো মানুষের যত বিবাদ, যত কান্না। সেই বাইরে-বিক্ষিপ্ত আপন-হারা মানুষের বিলাপগান একদিন শুনেছিলেম পথিক ভিখারির মুখে—

> আমি কোথায় পাব তারে
> আমার মনের মানুষ যে রে।
> হারায়ে সেই মানুষে তার উদ্দেশে
> দেশ-বিদেশে বেড়াই ঘুরে।

সেই নিরক্ষর গাঁয়ের লোকের মুখেই শুনেছিলেম—

তোরই ভিতর অতল সাগর।

সেই পাগলই গেয়েছিল—

মনের মধ্যে মনের মানুষ করো অন্বেষণ।.

মানুষের ধর্ম, র/১২/৫৬৯-৫৮২

১৪৪। মানুষের ধর্ম ২

৫ মাঘ ১৩৩৯ (১৮ জানুয়ারী ১৯৩৩)

অথর্ববেদ বলেছেন—

ঋতং সত্যং তপো রাষ্ট্রং শ্রমো ধর্মশ্চ কর্ম চ
ভূতং ভবিষ্যদুচ্ছিষ্টে বীর্যং লক্ষ্মীর্বলং বলে।

ঋত সত্য তপস্যা রাষ্ট্র শ্রম ধর্ম কর্ম ভূত ভবিষ্যৎ বীর্য সম্পদ বল সমস্তই উচ্ছিষ্টে অর্থাৎ উদ্‌বৃত্তে আছে।। অর্থাৎ মানবধর্ম বলতে আমরা যা বুঝি প্রকৃতির প্রয়োজন সে পেরিয়ে, সে আসছে অতিরিক্ততা থেকে। সেই অতিরিক্ততাতেই উৎপন্ন হচ্ছে স্বাস্থ্য আনন্দ শক্তি, সেই অতিরিক্ততাকেই অধিকার করে আছে সৌন্দর্য, সেই অতিরিক্ততাতেই প্রসারিত ভূত ভবিষ্যৎ। জীবকোষ এই সমগ্র দেহগত বিভূতি উপলব্ধি করে না। কিন্তু, মানুষ প্রকৃতি-নির্দিষ্ট আপন ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্যকে পেরিয়ে যায়; পেরিয়ে গিয়ে যে আত্মিক সম্পদ্‌কে উপলব্ধি করে অথর্ববেদ তাকেই বলেছেন, ঋতং সত্যম্‌। এ সমস্তই বিশ্বমানবমনের ভূমিকায়, যারা একে স্বীকার করে তারাই মনুষ্যত্বের পদবীতে এগোতে থাকে। অথর্ববেদ যে-সমস্ত গুণের কথা বলেছেন তার সমস্তই মানবগুণ। তার যোগে আমরা যদি আমাদের জীবধর্মসীমার অতিরিক্ত সত্তাকে অনুভব করি তবে বলতে হবে, সে সত্তা কখনোই অমানব নয়, তা মানবব্রহ্ম। আমাদের ঋতে সত্যে তপস্যায় ধর্মে কর্মে সেই বৃহৎ মানবকে আমরা আত্মবিষয়ীকৃত করি। এই কথাটিকেই উপনিষদ্‌ আর-এক রকম করে বলেছেন—

এষাস্য পরমা গতি রেষাস্য পরমা সম্পদ্‌
এষোহস্য পরমো লোক এষোহস্য পরম আনন্দঃ।

এখানে উনি এবং এ, এই দুয়ের কথা। বলছেন, উনি এর পরম গতি, উনি এর পরম সম্পদ্‌, উনি এর পরম আশ্রয়, উনি এর পরম আনন্দ। অর্থাৎ, এর পরিপূর্ণতা তাঁর মধ্যে। উৎকর্ষের পথে এ চলেছে সেই বৃহতের দিকে, এর ঐশ্বর্য সেইখানেই, এর প্রতিষ্ঠা তাঁর মধ্যেই, এর শাশ্বত আনন্দের ধন যা-কিছু সে তাঁতেই।

এই তিনি বস্তু-অবচ্ছিন্ন একটা তত্ত্বমাত্র নন। যাকে বলি 'আমার আমি' সে যেমন অন্তরতমভাবে আমার একান্ত বোধবিষয় তিনিও তেমনি। যখন তাঁর প্রতি ভক্তি জেগে ওঠে, যখন তাঁতে আনন্দ পাই, তখন আমার এই আমি-বোধই বৃহৎ হয়, গভীর হয়, প্রসারিত হয় আপন সীমাতীত সত্যে। তখন অনুভব করি, এক বৃহৎ আনন্দের অন্তর্গত আমার আনন্দ।...

...ব্যক্তিগত মানুষগুলির মধ্যে দেশকালের ব্যবধান যথেষ্ট, কিন্তু সমস্ত মানুষকে নিয়ে আছে একটি বৃহৎ এবং গভীর ঐক্য। সেই ইন্দ্রিয়বোধাতীত ঐক্য সাংখ্যিক সমষ্টিকে নিয়ে নয়, সমষ্টিকে অতিক্রম করে। সেই হচ্ছে সমস্তের এক গূঢ় আত্মা, একধৈবানুদ্রষ্টব্যঃ, কিন্তু বহুধাশক্তিযোগে তার প্রকাশ। সমস্ত মানুষের মধ্যে সেই এক আত্মাকে নিজের মধ্যে অনুভব করবার উদার শক্তি যাঁরা পেয়েছেন তাঁদেরই তো বলি মহাত্মা, তাঁরাই তো সর্ব মানবের জন্যে প্রাণ দিতে পারেন।...

বৈজ্ঞানিক এই কথা শুনে ধিক্কার দেন; বলেন দেবতাকে প্রিয় বললে দেবতার প্রতি মানবিকতা আরোপ করা হয়। আমি বলি, মানবত্ব আরোপ করা নয়, মানবত্ব উপলব্ধি করা। মানুষ আপন মানবিকতারই মাহাত্ম্যবোধ অবলম্বন ক'রে আপন দেবতায় এসে পৌচেছে। মানুষের মন আপন দেবতায় আপন মানবত্বের প্রতিবাদ করতে পারে না। করা তার পক্ষে সত্যই নয়। ঈথরের কম্পনে মানুষ আলোকত্ব আরোপ করে না, তাকে স্বতই আলোকরূপে অনুভব করে, আলোকরূপেই ব্যবহার করে, ক'রে ফল পায়—এও তেমনি।

পরম মানবিক সত্তাকে পেরিয়ে গিয়েও পরম জাগতিক সত্তা আছে। সূর্যলোককে ছাড়িয়ে যেমন আছে নক্ষত্রলোক। কিন্তু, যার অংশ এই পৃথিবী, যার উত্তাপে পৃথিবীর প্রাণ, যার যোগে পৃথিবীর চলাফেরা, পৃথিবীর দিনরাত্রি, সে একান্তভাবে এই সূর্যলোক। জ্ঞানে আমরা নক্ষত্রলোককে জানি কিন্তু জ্ঞানে কর্মে আনন্দে দেহমনে সর্বতোভাবে জানি এই সূর্যলোককে। তেমনি জাগতিক ভূমা আমাদের জ্ঞানের বিষয়, মানবিক ভূমা আমাদের সমগ্র দেহমন ও চরিত্রের পরিতৃপ্তি ও পরিপূর্ণতার বিষয়। আমাদের ধর্মশ্চ কর্ম চ, আমাদের ঋতং সত্যং, আমাদের ভূতং ভবিষ্যৎ সেই সত্তারই অপর্যাপ্তিতে।

মানবিক সত্তাকে সম্পূর্ণ ছাড়িয়ে যে নৈর্ব্যক্তিক জাগতিক সত্তা, তাঁকে প্রিয় বলা বা কোনো-কিছুই বলার কোনো অর্থ নেই। তিনি ভালোমন্দ সুন্দর-অসুন্দরের ভেদ-বর্জিত। তাঁর সঙ্গে সম্বন্ধ নিয়ে পাপপুণ্যের কথা উঠতে পারে না। তিনি আছেন, এ ছাড়া তাঁকে কিছুই বলা চলে না। মানবমনের সমস্ত লক্ষণ সম্পূর্ণ লোপ ক'রে দিয়ে সেই নির্বিশেষে মগ্ন হওয়া যায়, এমন কথা শোনা গেছে। এ নিয়ে তর্ক চলে না। মন-সমেত সমস্ত সত্তার সীমানা কেউ একেবারেই ছাড়িয়ে গেছে কি না, আমাদের মন নিয়ে সে কথা নিশ্চিত বলব কী করে। আমরা সত্তামাত্রকে যে-ভাবে যেখানেই স্বীকার করি সেটা মানুষেরই মনেরই স্বীকৃতি। এই কারণেই দোষারোপ ক'রে মানুষের মন স্বয়ং যদি তাকে অস্বীকার করে, তবে শূন্যতাকেই সত্য বলা ছাড়া উপায় থাকে না। এমন নাস্তিবাদের কথাও মানুষ বলেছে, কিন্তু বৈজ্ঞানিক তা বললে তার ব্যাবসা বন্ধ করতে হয়। বৈজ্ঞানিক অভিজ্ঞতায় আমরা যে জগৎকে জানি বা কোনোকালে জানবার সম্ভাবনা রাখি, সেও মানবজগৎ। অর্থাৎ, মানুষের বুদ্ধির যুক্তির কাঠামোর মধ্যে কেবল মানুষই তাকে আপন চিন্তার আকারে আপন বোধের দ্বারা বিশিষ্টতা দিয়ে অনুভব করে। এমন কোনো চিত্ত কোথাও থাকতেও পারে যার উপলব্ধ জগৎ আমাদের গাণিতিক পরিমাপের অতীত, আমরা যাকে আকাশ বলি সেই আকাশে যে বিরাজ করে না। কিন্তু, যে জগতের গূঢ়তত্ত্বকে মানব আপন অন্তর্নিহিত চিন্তাপ্রণালীর দ্বারা মিলিয়ে পাচ্ছে তাকে অতিমানবিক বলব কী করে। এইজন্যে কোনো আধুনিক পণ্ডিত বলেছেন, বিশ্বজগৎ গাণিতিক মনের সৃষ্টি।

সেই গাণিতিক মন তো মানুষের মনকে ছাড়িয়ে গেল না। যদি যেত তবে এ জগতের বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব আমরা জানতেই পারতুম না, যেমন কুকুর বিড়াল কিছুতেই জানতে পারে না। যিনি আমাদের দর্শনশাস্ত্রে সগুণ ব্রহ্ম তাঁর স্বরূপসম্বন্ধে বলা হয়েছে, সর্বেন্দ্রিয়গুণাভাসম্। অর্থাৎ, মানুষের বহিরিন্দ্রিয় অন্তরিন্দ্রিয়ের যত-কিছু গুণ তার আভাস তাঁরই মধ্যে। তার অর্থই এই যে, মানবব্রহ্ম, তাই তাঁর জগৎ মানবজগৎ। এ ছাড়া অন্য জগৎ যদি থাকে তা হলে সে আমাদের সম্বন্ধে শুধু যে আজই নেই তা নয়, কোনো কালেই নেই।

এই জগৎকে জানি আপন বোধ দিয়ে। যে জানে সেই আমার আত্মা সে আপনাকেও আপনি জানে। এই স্বপ্রকাশ আত্মা একা নয়। আমার আত্মা, তোমার আত্মা, তার আত্মা, এমন কত আত্মা। তারা যে এক আত্মার মধ্যে সত্য তাঁকে আমাদের শাস্ত্রে বলেন পরমাত্মা। এই পরমাত্মা মানবপরমাত্মা, ইনি সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ। ইনি আছেন সর্বদা জনে-জনের হৃদয়ে।

বলা হয়েছে বটে, আমাদের সকল ইন্দ্রিয়গুণের আভাস এঁর মধ্যে, কিন্তু এতেই সব কথা শেষ হল না। এক আত্মার সঙ্গে আর-এক আত্মার যে সম্বন্ধ সকলের চেয়ে নিবিড়, সকলের চেয়ে সত্য, তাকেই বলে প্রেম। ভৌতিক বিশ্বের সঙ্গে আমাদের বাস্তব পরিচয় ইন্দ্রিয়বোধে, আত্মিক বিশ্বের সঙ্গে আমাদের সত্য পরিচয় প্রেমে। আত্মিক বিশ্বের পরিচয় মানুষ জন্মমুহূর্তেই আরম্ভ করেছে পিতামাতার প্রেমে। এইখানে অপরিমেয় রহস্য, অনির্বচনীয়ের সংস্পর্শ। প্রশ্ন উঠল মনে, এই পিতামাতার সত্য কোথায় প্রতিষ্ঠিত। পিতামাতার রহস্য বুঝতে পারি আপনারই আত্মার গভীরে এবং সেই গভীরেই উপলব্ধি করি পিতৃতমকে। সেই পিতৃতম বিশেষ কোনো স্বর্গে নেই, বিশেষ কোনো দেশকালেবদ্ধ ইতিহাসে নেই, ইনি বিশেষ কোনো একটি মানুষে একদা অবতীর্ণ নন, ইনি প্রেমের সম্বন্ধে মানবের ভূতভবিষ্যৎকে পূর্ণ করে আছেন নিখিল মানবলোকে। আহ্বান করছেন দুর্গম পথের ভিতর দিয়ে পরিপূর্ণতার দিকে, অসত্যের থেকে সত্যের দিকে, অন্ধকার থেকে জ্যোতির দিকে, মৃত্যু থেকে অমৃতের দিকে, দুঃখের মধ্য দিয়ে, তপস্যার মধ্য দিয়ে।

এই আহ্বান মানুষকে কোনোকালে কোথাও থামতে দিলে না; তাকে চিরপথিক করে রেখে দিলে। শ্রান্ত হয়ে যারা পথ ছেড়ে পাকা করে ঘর বেঁধেছে তারা আপন সমাধিঘর রচনা করেছে। মানুষ যথার্থই অনাগরিক। জন্তুরা পেয়েছে বাসা, মানুষ পেয়েছে পথ। মানুষের মধ্যে শ্রেষ্ঠ যাঁরা তাঁরা পথনির্মাতা, পথপ্রদর্শক।...

বিশ্বে ছোটোবড়ো নানা পদার্থই আছে। থাকা-মাত্রের যে দাম তা সকলের পক্ষেই সমান। নিছক অস্তিত্বের আদর্শে মাটির ঢেলার সঙ্গে পদ্মফুলের উৎকর্ষ-অপকর্ষের ভেদ নেই। কিন্তু মানুষের মনে এমন একটি মূল্যভেদের আদর্শ আছে যাতে প্রয়োজনের বিচার নেই, যাতে আয়তনের বা পরিমাণের তৌল চলে না। মানুষের মধ্যে বস্তুর অতীত একটি অহৈতুক পূর্ণতার অনুভূতি আছে, একটা অন্তরতম সার্থকতার বোধ। তাকেই সে বলে শ্রেষ্ঠতা।...

পুরোনো সভ্যতার মাটিচাপা ভাঙাচোরা চিহ্নশেষ উদ্ধার করলে তার মধ্যে দেখা যায় আপন শ্রেষ্ঠতাকে প্রকাশ করবার জন্যে মানুষের প্রভূত প্রয়াস। নিজের মধ্যে যে কল্পনাকে সকল কালের সকল মানুষের ব'লে সে অনুভব করেছেন তারই দ্বারা

সর্বকালের কাছে নিজের পরিচয় দিতে তার কত বল, কত কৌশল। ছবিতে, মূর্তিতে, ঘরের ব্যবহারের সামগ্রীতে, সে ব্যক্তিগত মানুষের খেয়ালকে প্রচার করতে চায় নি— বিশ্বগত মানুষের আনন্দকে স্থায়ী রূপ দেবার জন্যে তার দুঃসাধ্য সাধনা। মানুষ তাকেই জানে শ্রেষ্ঠতা যাকে সকল কাল ও সকল মানুষ স্বীকার করতে পারে। সেই শ্রেষ্ঠতার দ্বারা মানুষ আত্মপরিচয় দিয়ে থাকে। অর্থাৎ, আপন আত্মায় সকল মানুষের আত্মার পরিচয় দেয়। এই পরিচয়ের সম্পূর্ণতাতেই মানুষের অভ্যুদয়, তার বিকৃতিতেই মানুষের পতন।...

বিশুদ্ধ সত্যের উপলব্ধিতে বিশ্বমানবমনের প্রকাশ, এ কথা স্বীকার করা সহজ; কিন্তু রসের অনুভূতিতে সেই বিশ্বমনকে হৃদয়ঙ্গম করি কি না, এ নিয়ে সংশয় জন্মাতে পারে। সৌন্দর্যে আনন্দবোধের আদর্শ দেশকালপাত্রভেদে বিচিত্র যদি হয় তবে এর শাশ্বত আদর্শ কোথায়। অথচ, বৃহৎ কালে মেলে দিয়ে মানুষের ইতিহাসকে যখন দেখি তখন দেখতে পাই, শিল্প-সৌন্দর্যের শ্রেষ্ঠতা সম্বন্ধে সকল কালের সকল সাধকদের মন মেলবার দিকেই যায়। এ কথা সত্য যে, নিশ্চিতভাবে প্রত্যেক ব্যক্তিই সুন্দর সৃষ্টিতে সম্পূর্ণ রস পায় না। অনেকের মন রূপকানা, তাদের ব্যক্তিগত অভিরুচির সঙ্গে বিশ্বরুচির মিল নেই। মানুষের মধ্যে অনেকে আছে স্বভাবতই বিজ্ঞানমূঢ়, বিশ্বসম্বন্ধে তাদের ধারণা মোহাচ্ছন্ন বলেই তা বহু, এক সংস্কারের সঙ্গে আর-এক সংস্কারের মিল হয় না, অথচ নিজ নিজ অন্ধ সংস্কারের সত্যতা সম্বন্ধে তাদের প্রত্যেকের এমন প্রচন্ড দম্ভ যে তা নিয়ে তারা খুনোখুনি করতেও প্রস্তুত। তেমনি সংসারে স্বভাবতই অরসিক বা বেরসিকের অভাব নেই, তাদেরও মতভেদ সাংঘাতিক হয়ে ওঠে। নিম্নসপ্তক থেকে উচ্চসপ্তক পর্যন্ত উদারা মুদারা তারা নানা পর্যায়ে জন্মমূঢ়তা আছে বলেই যেমন জ্ঞানের বিশ্বভূমীন সম্পূর্ণতায় অশ্রদ্ধা করা যায় না, সৌন্দর্যের আদর্শ সম্বন্ধেও তেমনি।

বারট্রান্ড্ রাসেল কোনো-এক গ্রন্থের ভূমিকায় লিখেছেন যে, বেটোভেনের 'সিম্ফনি'কে বিশ্বমানের রচনা বলা যায় না, সেটা ব্যক্তিগত; অর্থাৎ, সেটা তো গাণিতিক তত্ত্বের মতো নয়, যার উদ্ভাবনা সম্বন্ধে ব্যক্তিগত মন উপলক্ষমাত্র, যা নিখিল মনের সামগ্রী। কিন্তু, যদি এ কথা স্বীকার করতে হয় যে বেটোভেনের রচনা সকলেরই ভালো লাগা উচিত অর্থাৎ ঠিকমত শিক্ষা পেলে, স্বাভাবিক চিত্তজড়তা না থাকলে, অজ্ঞান-অনভ্যাসের আবরণ দূর হলে, সকল মানুষের তা ভালো লাগবে, তা হলে বলতেই হবে— শ্রেষ্ঠ গীতরচয়িতার শ্রেষ্ঠত্ব সকল মানুষের মনেই সম্পূর্ণ আছে, শ্রোতৃরূপে ব্যক্তিবিশেষের মনে তা বাধাগ্রস্ত।

বুদ্ধি জিনিসটা অস্তিত্বরক্ষার পক্ষে অপরিহার্য, কিন্তু সৌন্দর্যবোধের অপূর্ণতাসত্ত্বেও সংসারে সিদ্ধিলাভের দৃষ্টান্ত অনেক আছে। সৌন্দর্যবোধের কোনো সাংঘাতিক তাগিদ নেই। এ সম্বন্ধে যথেচ্ছাচারের কোনো দন্ডনীয় বাধা নেই। যুক্তিস্বীকারকারী বুদ্ধি মানুষের মনে যত সুনিশ্চিত হয়েছে প্রাণের বিভাগে, শাসনের অভাবে সৌন্দর্যস্বীকারকারী রুচি তেমন পাকা হয় নি। তবু সমস্ত মানবসমাজে সৌন্দর্যসৃষ্টির কাজে মানুষের যত প্রভূত শক্তির প্রয়োগ হচ্ছে এমন অল্প বিষয়েই। অথচ, জীবনধারণে এর প্রয়োজন নেই, এর প্রয়োজন আতিরিক। অর্থাৎ, এর দ্বারা বাইরের জিনিসকে পাই নে, অন্তরের দিক থেকে দীপ্তিমান হই, পরিতৃপ্ত হই। এই পরিতৃপ্ত

হওয়ার দ্বারা যাঁকে জানি তাঁকে বলি: রসো বৈ সঃ।...

পূর্বে বলেছি, ভৌতিক সত্যকে বিশুদ্ধ করে দেখতে গেলে কাছের সমস্ত মলিনতা ও চাঞ্চল্য, ব্যক্তিগত সমস্ত বিকার দূর করা চাই। আত্মিক সত্য সম্বন্ধে সে কথা আরো বেশি খাটে। যখন পশুসত্তার বিকার আমরা আত্মিক সত্যে আরোপ করি তখন সেই প্রমাদ সব চেয়ে সাংঘাতিক হয়ে ওঠে। কেননা, তখন আমাদের হওয়ার ভিত্তিতেই লাগে আঘাত। জানার ভুলের চেয়ে হওয়ার ভুল কত সর্বনেশে তা বুঝতে পারি যখন দেখতে পাই বিজ্ঞানের সাহায্যে যে শক্তির আমরা আয়ত্ত করেছি সেই শক্তিই মানুষের হিংসা ও লোভের বাহন হয়ে তার আত্মঘাতকে বিস্তার করছে পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে। এইজন্যে সম্প্রদায়ের নামে ব্যক্তিগত বা বিশেষজনগত স্বভাবের বিকৃতি মানুষের পাপবুদ্ধিকে যত প্রশ্রয় দেয় এমন বৈজ্ঞানিক ভ্রান্তিতে কিংবা বৈষয়িক বিরোধেও না। সাম্প্রদায়িক দেবতা তখন বিদ্বেষবুদ্ধির, অহংকারের, অবজ্ঞাপরতার, মূঢ়তার দৃঢ় আশ্রয় হয়ে দাঁড়ায়; শ্রেয়ের নামাঙ্কিত পতাকা নিয়ে অশ্রেয় জগদ্ব্যাপী অশান্তির প্রবর্তন করে—স্বয়ং দেবত্ব অবমানিত হয়ে মানুষকে অবমানিত ও পরস্পর-ব্যবহারে আতঙ্কিত করে রাখে। আমাদের দেশে এই দুর্যোগ আমাদের শক্তি ও সৌভাগ্যের মূলে আঘাত করছে।

অন্য দেশেও তার দৃষ্টান্ত আছে। সাম্প্রদায়িক খ্রীস্টান ভারতবর্ষের সাম্প্রদায়িক দেবচরিত্রে পূজাবিধিতে চরিত্রবিকৃতি বা হিংস্রতা দেখে অবজ্ঞা প্রকাশ করেন। সংস্কারবশত দেখতে পান না, মানুষের আপন অহিতবুদ্ধি তাঁদেরও দেবতার ধারণাকে কিরকম নিদারুণভাবে অধিকার করতে পারে।...

...য়ুরোপে মধ্যযুগে শাস্ত্রগত ধর্মবিশ্বাসকে অবিচলিত রাখার জন্যে যে বিজ্ঞানবিদ্বেষী ও ধর্মবিরুদ্ধ উৎপীড়ন আচরিত তার ভিত্তি এইখানে। সেই নরকের আদর্শ সভ্যমানুষের জেলখানায় আজও বিভীষিকা বিস্তার করে আছে। সেখানে শোধন করবার নীতি নেই, আছে শাসন করবার হিংস্রতা।

মনুষ্যত্বের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গেই দেবতার উপলব্ধি মোহমুক্ত হতে থাকে, অন্তত হওয়া উচিত। হয় না যে তার কারণ, ধর্মসম্বন্ধীয় সব-কিছুকেই আমরা নিত্য ব'লে ধ'রে নিয়েছি। ভুলে যাই যে, ধর্মের নিত্য আদর্শকে শ্রদ্ধা করি বলেই ধর্মমতকেও নিত্য বলে স্বীকার করতে হবে এমন কথা বলা চলে না। ভৌতিক বিজ্ঞানের মূলে নিত্য সত্য আছে বলেই বৈজ্ঞানিক মতমাত্রই নিত্য, এমন গোঁড়ামির কথা যদি বলি তা হলে আজও বলতে হবে সূর্যই পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করছে। ধর্ম সম্বন্ধে সাধারণত এই ভুলই ঘটে; সম্প্রদায় আপন মতকেই বলে ধর্ম, আর ধর্মকেই করে আঘাত। তার পরে যে বিবাদ, যে নির্দয়তা, যে বুদ্ধিবিচারহীন অন্ধসংস্কারের প্রবর্তন হয়, মানুষের জীবনে আর কোনো বিভাগে তার তুলনাই পাওয়া যায় না।

এ কথা মানতে হবে, ভুল মত মানুষেরই আছে, জন্তুর নেই। আদিম কাল থেকে আজ পর্যন্ত ভুল মতবাদের উদ্ভব হচ্ছে, যেহেতু মানুষের একটা দুর্নিবার সমগ্রতার বোধ আছে। কোনো একটা তথ্য যখন স্বতন্ত্রভাবে বিচ্ছিন্নভাবে তার সামনে আসে তখন তাকেই সম্যক্ বলে সে স্বীকার করে নিতে পারে না। তাকে পূর্ণ করবার আগ্রহে কল্পনার আশ্রয় নেয়। সেই কল্পনা প্রকৃতিভেদে মূঢ় বা প্রাজ্ঞ, সুন্দর বা কুৎসিত, নিষ্ঠুর বা সকরুণ,

নানাপ্রকার হতে পারে।...

মানুষ অন্তরে বাহিরে অনুভব করে—সে আছে একটি নিখিলের মধ্যে। সেই নিখিলের সঙ্গে সচেতন সচেষ্ট যোগ-সাধনের দ্বারাই সে আপনাকে সত্য করে জানতে থাকে। বাহিরের যোগে তার সমৃদ্ধি, ভিতরের যোগে তার সার্থকতা।...

আপন সত্তার পরিচয়ে মানুষের ভাষায় দুটি নাম আছে। একটি 'অহং', আর-একটি 'আত্মা': প্রদীপের সঙ্গে একটিকে তুলনা করা যায়, আর-একটিকে শিখার সঙ্গে। প্রদীপ আপনার তেল সংগ্রহ করে। আপনার উপাদান নিয়ে প্রদীপের বাজারদর—কোনোটার দর সোনার, কোনোটার মাটির। শিখা আপনাকেই প্রকাশ করে, এবং তারই প্রকাশে আর-সমস্তও প্রকাশিত।,প্রদীপের সীমাকে উত্তীর্ণ হয়ে সে প্রবেশ করে নিখিলের মধ্যে।

মানুষের আলো জ্বালায় তার আত্মা, তখন ছোটো হয়ে যায় তার সঞ্চয়ের অহংকার। জ্ঞানে প্রেমে ভাবে বিশ্বের মধ্যে ব্যাপ্তি-দ্বারাই সার্থক হয় সেই আত্মা। সেই যোগের বাধাতেই তার অপকর্ষ। জ্ঞানের যোগে বিকার ঘটায় মোহ, ভাবের যোগে অহংকার, কর্মের যোগে লোভ স্বার্থপরতা; ভৌতিক বিশ্বে সত্য আপন সর্বব্যাপক ঐক্য প্রমাণ করে, সেই ঐক্য-উপলব্ধিতে আনন্দিত হয় বৈজ্ঞানিক। তেমনি আত্মার আনন্দ আত্মিক ঐক্যকে উপলব্ধি-দ্বারা।...

পৃথিবী আপনাতে আপনি আবর্তিত, আবার বৃহৎ কক্ষপথে সে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করছে। মানুষের সমাজেও যা-কিছু চলছে সেও এই দুই রকমের বেগে। এক দিকে ব্যক্তিগত আমি'র টানে ধনসম্পদ প্রভুত্বের আয়োজন পুঞ্জিত হয়ে উঠছে; আর-এক অমিতমানবের প্রেরণায় পরস্পরের সঙ্গে তার কর্মের যোগ, তার আনন্দের যোগ, পরস্পরের উদ্দেশে ত্যাগ। এইখানে আত্মার লক্ষণকে স্বীকার করার দ্বারাই তার শ্রেষ্ঠতার উপলব্ধি।...

সতের ধর্ম বলতে বোঝায় মানুষের মধ্যে যে সত্য তাঁরই ধর্ম, মানুষের মধ্যে যে মহৎ তাঁরই ধর্ম। যুদ্ধ করতে গিয়ে মানুষ যদি তাঁকে অস্বীকার করে তবে ছোটো দিকে তার জিত হলেও বড়ো দিকে তার হার। উপকরণের দিকে তার সিদ্ধি, অমৃতের দিকে সে বঞ্চিত; এই অমৃতের আদর্শ মাপজোখের বাইরে।...

মানুষ আপনার স্বভাবকে তখনই জানে যখন পাপ থেকে নিবৃত্ত হয়ে কল্যাণের অর্থাৎ সর্বজনের হিত সাধনা করে। অর্থাৎ মানুষের স্বভাবকে জানে মানুষের মধ্যে যারা মহাপুরুষ। জানে কী ক'রে। তেন সর্বমিদং বুদ্ধম্। স্বচ্ছ মন নিয়ে চেষ্টা করে। এক দিকে তার পবিত্রতার বাহ্যাড়ম্বর অন্য দিকে পারত্রিক দুর্গতির বিভীষিকা, সেই সঙ্গে সম্মিলিত শাসনের নানাবিধ কঠোর, এমন-কি, অন্যায় প্রণালী—ঘরগড়া নরকের তর্জনীসংকেতে নিরর্থক অন্ধ আচারের প্রবর্তন।...

মানুষের এই-যে কল্যাণের মতি এর সত্য কোথায়—ক্ষুধাতৃষ্ণার মতো প্রথম থেকেই আমাদের মনে তার বোধ যদি পূর্ণ থাকত তা হলে তার সাধনা করতে হত না। বলব, বিশ্বমানবমনে আছে।কিন্তু,সকল মানুষের মন সমষ্টিভূত হয়ে বিশ্বমানবমনের মহাদেশ সৃষ্ট, এ কথা বলব না। ব্যক্তিমন বিশ্বমনে আশ্রিত কিন্তু ব্যক্তিমনের যোগফল বিশ্বমন নয়। তাই যদি হত তা হলে যা আছে তাই হত একান্ত, যা হতে পারে তার জায়গা পাওয়া

যেত না। অথচ, যা হয় নি, যা হতে পারে, মানুষের ইতিহাসে তারই জোর তারই দাবি বেশি। তারই আকাঙ্ক্ষা দুর্নিবার হয়ে মানুষের সভ্যতাকে যুগে যুগে বর্তমানের সীমা পার করিয়ে দিচ্ছে। সেই আকাঙ্ক্ষা শিথিল হলেই সত্যের অভাবে সমাজ শ্রীহীন হয়।

দ্বিতীয় প্রশ্ন এই যে, আমার ব্যক্তিগত মনে সুখদুঃখের যে অনুভূতি সেটা বিশ্বমনের মধ্যেও সত্য কি না। ভেবে দেখলে দেখা যায়, অহংসীমার মধ্যে যে সুখদুঃখ আত্মার সীমায় তার রূপান্তর ঘটে। যে মানুষ সত্যের জন্যে জীবন উৎসর্গ করেছে, দেশের জন্যে, লোকহিতের জন্যে—বৃহৎ ভূমিকায় যে নিজেকে দেখছে, ব্যক্তিগত সুখদুঃখের অর্থ তার কাছে উলটো হয়ে গেছে। সে মানুষ সহজেই সুখকে ত্যাগ করতে পারে এবং দুঃখকে স্বীকার ক'রে দুঃখকে অতিক্রম করে। স্বার্থের জীবনযাত্রায় সুখদুঃখের ভার গুরুতর, মানুষ স্বার্থকে যখন ছাড়িয়ে যায় তখন তার ভার এত হালকা হয়ে যায় যে, তখন পরম দুঃখের মধ্যে তার সহিষ্ণুতাকে, পরম অপমানের আঘাতে তার ক্ষমাকে, অলৌকিক বলে মনে হয়। আপনাকে বৃহতে উপলব্ধি করাই সত্য, অহংসীমায় অবরুদ্ধ জানাই অসত্য। ব্যক্তিগত দুঃখ এই অসত্যে।

আমরা দুঃখকে যে ভাবে দেখি বৃহতের মধ্যে সে ভাব থাকতে পারে না যদি থাকত তা হলে সেখানে দুঃখের লাঘব বা অবসান হত না। অপূর্ণতাকে ক্ষয় করার দ্বারা পূর্ণের সঙ্গে মিলন বিশুদ্ধ আনন্দময় হবে, এই অভিপ্রায় আছে বিশ্বমানবের মধ্যে। তাঁর প্রতি প্রেমকে জাগরিত ক'রে তাঁরই প্রেমকে সার্থক করব, যুগে যুগে এই প্রতীক্ষার আহ্বান আসছে আমাদের কাছে।

সেই আহ্বানের আকর্ষণে মানুষ বেরিয়ে পড়েছে অজানার দিকে, এই যাত্রার ইতিহাসই তার ইতিহাস। তার চলার পথপার্শ্বে কত সাম্রাজ্য উঠল এবং পড়ল, ধনসম্পদ হল স্তূপাকৃত আবার গেল মিলিয়ে ধুলোর মধ্যে। তার আকাঙ্ক্ষাকে রূপ দেবার জন্যে কত প্রতিমা সে গড়ে তুললে আবার ভেঙে দিয়ে গেল, বয়স পেরিয়ে ছেলেবেলাকার খেলনার মতো। কত মায়ামন্ত্রের চাবি বানাবার চেষ্টা করলে—তাই দিয়ে খুলতে চেয়েছিল প্রকৃতির রহস্যভাণ্ডার, আবার সমস্ত ফেলে দিয়ে নূতন ক'রে খুঁজতে বেরিয়েছে গহনে প্রবেশের গোপন পথ। এমনি ক'রে তার ইতিবৃত্তে এক যুগের পর আর-এক যুগ আসছে—মানুষ অশ্রান্ত যাত্রা করেছে অন্নবস্ত্রের জন্যে নয়, আপনার সমস্ত শক্তি দিয়ে মানবলোকে মহামানবের প্রতিষ্ঠা করবার জন্যে, আপনার জটিল বাধার থেকে আপনার অন্তরতম সত্যকে উদ্ধার করবার জন্যে; সেই সত্য যা তার পুঞ্জিত দ্রব্যভারের চেয়ে বড়ো, তার সমস্ত কৃতকর্মের চেয়ে বড়ো, তার সমস্ত প্রথা-মত-বিশ্বাসের চেয়ে বড়ো, যার মৃত্যু নেই, যার ক্ষয় নেই।...

মানুষের ধর্ম, র/১২/৫৪২-৯৪

টীকা :

· **বারট্রান্ড রাসেল**—বিশশতকের শ্রেষ্ঠ চিন্তানায়কদের একজন। ইনি, দর্শন, গণিত, বিজ্ঞান, রাজনীতি, সমাজনীতি, ইতিহাস, ধর্ম প্রভৃতি নানাবিষয়ে অনেক গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ রচনা করেছেন। তাঁর রচিত গ্রন্থগুলি সবই বহুখ্যাত ও প্রভাবশালী। যদিও দার্শনিক

হিসেবেই এর প্রসিদ্ধি তাহলেও রাজনীতি, সমাজনীতিতে এর দান সকলেই স্বীকার করেন। ইনি রাজনৈতিক মতে প্যাসিফিস্ট্ ছিলেন এবং পৃথিবীর যুদ্ধবিরোধী শান্তি আন্দোলনে তাঁর দান অপরিসীম।

বেটোভেন (বেটোফেন, Beethoven, Ludwig Van)—জার্মান সংগীতশিল্পী (কম্পোজার)। পাশ্চাত্য সংগীতের জগতে সর্বাগ্রগণ্যদের একজন।
জন্ম—১৭৭০, মৃত্যু—১৮২৭।

১৪৫। মানুষের ধর্ম-৩

৭ মাঘ ১৩৩৯ (২০ জানুয়ারি ১৯৩৩)

বৃহদারণ্যকে একটি আশ্চর্য বাণী আছে—...
যে মানুষ অন্য দেবতাকে উপাসনা করে, সেই দেবতা অন্য আর আমি অন্য এমন কথা ভাবে, সে তো দেবতাদের পশুর মতোই।...

এই যেমন শোনা গেল উপনিষদে, আবার সেই কথাই আপন ভাষায় বলছে নিরক্ষর অশাস্ত্রজ্ঞ বাউল। সে আপন দেবতাকে জানে আপনার মধ্যেই, তাকে বলে মনের মানুষ। বলে, 'মনের মানুষ মনের মাঝে করো অন্বেষণ।'...

এমনতরো কথায় একটা ক্রুদ্ধ কলরব উঠতে পারে। তবে কি মানুষ নিজেকে নিজেই পূজা করবে। নিজেকে ভক্তি করা কি সম্ভব। তা হলে পূজা-ব্যাপারকে তো বলতে হবে অহংকারের বিপুলীকরণ।

একেবারে উলটো। অহংকে নিয়েই অহংকার। সে তো পশুও করে। অহং থেকে বিযুক্ত আত্মায় ভূমার উপলব্ধি একমাত্র মানুষের পক্ষেই সাধ্য। কেননা মানুষের পক্ষে তাই সত্য। ভূমা আহারে বিহারে আচারে বিচারে ভোগে নৈবেদ্যে মন্ত্রে তন্ত্রে নয়। ভূমা বিশুদ্ধ জ্ঞানে, বিশুদ্ধ প্রেমে, বিশুদ্ধ কর্মে। বাইরে দেবতাকে রেখে স্তবে অনুষ্ঠানে পূজোপচারে শাস্ত্রপাঠে বাহ্যিক বিধিনিষেধ-পালনে উপাসনা করা সহজ কিন্তু আপনার চিন্তায়, আপনার কর্মে, পরম-মানবকে উপলব্ধি ও স্বীকার করা সব চেয়ে কঠিন সাধনা।...

...আমার মধ্যে যে মহান আত্মা আছেন, যিনি জরামৃত্যুশোক ক্ষুধাতৃর অতীত, যিনি সত্যকাম, সত্যসংকল্প, তাঁকে অন্বেষণ করতে হবে, তাঁকে জানতে হবে।। 'মনের মানুষ মনের মাঝে করো অন্বেষণ।' এই-যে তাঁকে সন্ধান করা, তাঁকে জানা, এ তো বাইরে জানা, বাইরে পাওয়া নয়; এ যে আপন অন্তরে আপনি হওয়ার দ্বারা জানা, হওয়ার দ্বারা পাওয়া।...

আমাদের বাংলাদেশের বাউল বলেছে—
মনের মানুষ মনের মাঝে করো অন্বেষণ।...
একবার দিব্যচক্ষু খুলে গেলে দেখতে পাবি সর্বঠাঁই।

সেই মনের মানুষ সকল-মনের মানুষ, আপন মনের মধ্যে তাঁকে দেখতে পেলে সকলের মধ্যেই তাঁকে পাওয়া হয়।...

পূর্বেই বলেছি, মানুষের অভিব্যক্তির গতি অন্তরের দিকে। এই দিকে তার সীমার আবরণ খুলে যাবার পথ। একদা মানুষ ছিল বর্বর, সে ছিল পশুর মতো, তখন ভৌতিক জীবনের সীমায় তার মন তার কর্ম ছিল বদ্ধ। জ্বলে উঠল যখন ধীশক্তি তখন চৈতন্যের রশ্মি চলল সংকীর্ণ জীবনের সীমা ছাড়িয়ে বিশ্বভৌমিকতার দিকে।...

...আমার মন আর বিশ্বমন একই, এই কথাই সত্যসাধনার মূলে, আর ভাষান্তরে এই কথাই সোহহম্।

একদিন ব্রাহ্মণ রামানন্দ তাঁর শিষ্যদের কাছে থেকে চলে গিয়ে আলিঙ্গন করলেন নাভা চন্ডালকে, মুসলমান জোলা কবীরকে, রবিদাস চামারকে। সেদিনকার সমাজ তাঁকে জাতিচ্যুত করলে। কিন্তু তিনি একলাই সেদিন সকলের চেয়ে বড়ো জাতিতে উঠেছিলেন যে জাতি নিখিল মানুষের। সেদিন ব্রাহ্মণমন্ডলীর ধিক্কারের মাঝখানে একা দাঁড়িয়ে রামানন্দই বলেছিলেন, সোহহম্; সেই সত্যের শক্তিতেই তিনি পার হয়ে গিয়েছিলেন সেই ক্ষুদ্র সংস্কারগত ঘৃণাকে যা নিষ্ঠুর হয়ে মানুষে মানুষে ভেদ ঘটিয়ে সমাজস্থিতির নামে সমাজধর্মের মূলে আঘাত করে।

একদিন যীশুখ্রীস্ট বলেছিলেন, সোহহম্—আমি আর আমার পরমপিতা একই। কেননা, তাঁর যে প্রীতি, যে কল্যাণবুদ্ধি সকল মানুষের প্রতি সমান প্রসারিত সেই প্রীতির আলোকেই আপন অহংসীমাকে ছাড়িয়ে পরম-মানবের সঙ্গে তিনি আপন অভেদ দেখেছিলেন।

বুদ্ধদেব উপদেশ দিলেন, সমস্ত জগতের প্রতি বাধাশূন্য হিংসাশূন্য শত্রুতাশূন্য মানসে অপরিমাণ মৈত্রী পোষণ করবে। দাঁড়াতে বসতে চলতে শুতে, যাবৎ নিদ্রিত না হবে, এই মৈত্রীস্মৃতিতে অধিষ্ঠিত থাকবে—একেই বলে ব্রহ্মবিহার।

এত বড়ো উপদেশ মানুষকেই দেওয়া চলে। কেননা, মানুষের মধ্যে গভীর হয়ে আছে সোহহংতত্ত্ব। সে কথা বুদ্ধদেব নিজের মধ্য থেকেই জেনেছেন, তাই বলেছেন অপরিমাণ প্রেমেই আপনার অন্তরের অপরিমেয় সত্যকে মানুষ প্রকাশ করে।...

উপনিষদ্ বলেন, অসম্ভূতি ও সম্ভূতিকে এক করে জানলেই তবে সত্য জানা হয়। অসম্ভূতি যা অসীমে অব্যক্ত, সম্ভূতি যা দেশে কালে অভিব্যক্তি। এই সীমায় অসীমে মিলে মানুষের সত্য সম্পূর্ণ। মানুষের মধ্যে যিনি অসীম তাঁকে সীমার মধ্যে জীবনে সমাজে ব্যক্ত করে তুলতে হবে। অসীম সত্যকে বাস্তব সত্য করতে হবে। তা করতে গেলে কর্ম চাই। ঈশোপনিষদ্ তাই বলেন, 'শত বৎসর তোমাকে বাঁচতে হবে, কর্ম তোমার না করলে নয়।' শত বৎসর বাঁচাকে সার্থক করো কর্মে, এমনতরো কর্মে যাতে প্রত্যয়ের সঙ্গে প্রমাণের সঙ্গে বলতে পারা যায় 'সোহহম্'। এ নয় যে, চোখ উলটিয়ে, নিশ্বাস বন্ধ ক'রে বসে থাকতে হবে মানুষের থেকে দূরে। অসীম উদ্‌বৃত্ত থেকে মানুষের মধ্যে যে শ্রেষ্ঠতা সঞ্চারিত হচ্ছে সে কেবল সত্যং ঋতং নয়, তার সঙ্গে আছে রাষ্ট্রং শ্রমো ধর্মশ্চ কর্ম চ ভূতং ভবিষ্যৎ। এই-যে কর্ম, এই-যে শ্রম, যা জীবিকার জন্যে নয়, এর নিরন্তর উদ্দম কোন্

সত্যে। কিসের জোরে মানুষ প্রাণকে করছে তুচ্ছ, দুঃখকে করছে বরণ, অন্যায়ের দুর্দান্ত প্রতাপকে উপেক্ষা করছে বিনা উপকরণে, বুক পেতে নিচ্ছে অবিচারের দুঃসহ মৃত্যুশেল। তার কারণ, মানুষের মধ্যে শুধু কেবল তার প্রাণ নেই, আছে তার মহিমা। সকল প্রাণীর মধ্যে মানুষেরই মাথা তুলে বলবার অধিকার আছে, সোহহম্। সেই অধিকার জাতিবর্ণনির্বিচারে সকল মানুষেরই। ক্ষিতিমোহনের অমূল্য সংগ্রহ থেকে বাউলের এই বাণী পাই—

জীবে জীবে চাইয়া দেখি
সবই যে তার অবতার—
ও তুই নূতন লীলা কী দেখাবি,
যার নিত্যলীলা চমৎকার।

প্রতিদিনই মানবসমাজে এই লীলা। অসংখ্য মানুষ জ্ঞানে প্রেমে ত্যাগে নানা আকারেই অপরিমেয়কে প্রকাশ করছে। ইতিহাসে তাদের নাম ওঠে না, আপন প্রাণ থেকে মানুষের প্রাণপ্রবাহে তারা ঢেলে দিয়ে যায় তাঁরই অমিততেজ যশ্চায়মস্মিন্ তেজোময়োহমৃতময়ঃ পুরুষঃ সর্বানুভূঃ— যিনি এই আত্মার মধ্যেই তেজোময় অমৃতময় পুরুষ, যিনি সমস্তই অনুভব করেন, যেমন আকাশব্যাপী তেজকে উদ্ভিদ্ আপন প্রাণের সামগ্রী করে নিয়ে পৃথিবীর প্রাণলোকে উৎসর্গ করে।...

ভূমা থেকে উৎশিষ্ট যে শ্রেষ্ঠতার কথা অথর্ববেদ বলেছেন সে কোনো একটিমাত্র বিশেষ সিদ্ধিতে নয়। মানুষের সকল তপস্যাই তার মধ্যে, মানুষের বীর্যং লক্ষ্মীর্বলং সমস্ত তার অন্তর্গত। মনুষ্যত্বের বহুধা বৈচিত্র্যকে একটিমাত্র বিন্দুতে সংহত ক'রে নিশ্চল করলে হয়তো তার আত্মভোলা একটা আনন্দ আছে। কিন্তু, ততঃ কিম্, কী হবে সে আনন্দে। সে আনন্দকে বলব না শ্রেয়, বলব না চরম সত্য। সমস্ত মানবসংসারে যতক্ষণ দুঃখ আছে, অভাব আছে, অপমান আছে, ততক্ষণ কোনো একটিমাত্র মানুষ নিষ্কৃতি পেতে পারে না। একটিমাত্র প্রদীপ অন্ধকারে একটুমাত্র ছিদ্র করলে তাতে রাত্রির ক্ষয় হয় না। সমস্ত অন্ধকারের অপসারণে রাত্রির অবসান। সেইজন্যে মানুষের মুক্তি যে মহাপুরুষেরা কামনা করেছেন তাঁদেরই বাণী: 'সম্ভবামি যুগে যুগে।' যুগে যুগেই তো জন্মাচ্ছেন তাঁরা দেশে দেশে। আজও এই মুহূর্তেই জন্মেছেন, কালও জন্মাবেন। সেই জন্মের ধারা চলেছে ইতিহাসের মধ্য দিয়ে, এই বাণী বহন ক'রে—সোহহম্। I and my Father are one.

সোহহম্ মন্ত্র মুখে আউড়িয়ে তুমি দুরাশা কর কর্ম থেকে ছুটি নিতে! সমস্ত পৃথিবী রইল পড়ে, তুমি একা যাবে দায় এড়িয়ে! যে ভীরু চোখ বুজে মনে করে 'পালিয়েছি' সে কি সত্যই পালিয়েছে। সোহহম্ সমস্ত মানুষের সম্মিলিত অভিব্যক্তির মন্ত্র, কেবল একজনের না। ব্যক্তিগত শক্তিতে নিজে কেউ যতটুকু মুক্ত হচ্ছে সেই মুক্তি তার নিরর্থক, যতক্ষণ সে তা সকলকে না দিতে পারে।...

...মানুষের ইতিহাসের ক্ষেত্রে মাঝে মাঝে মহাপুরুষদের দেখি। তাঁদের থেকে এই কথাই বুঝি যে, সমস্ত মানুষের অন্তরেই কাজ করছে অভিব্যক্তির প্রেরণা। সে ভূমার অভিব্যক্তি। জীবমানব কেবলই তার অহং-আবরণ মোচন ক'রে আপনাকে উপলব্ধি করতে চাচ্ছে বিশ্বমানবে। বস্তুত, সমস্ত পৃথিবীরই অভিব্যক্তি আপন সত্যকে খুঁজছে

সেইখানে, এই বিশ্বপৃথিবীর চরম সত্য সেই মহামানবে। পৃথিবীর আরম্ভকালের লক্ষ লক্ষ যুগের পরে মানুষের সূচনা। সেই সাংখ্যিক তথ্য মনে নিয়ে কালের ও আয়তনের পরিমাণে মানুষের ক্ষুদ্রতা বিচার ক'রে কোনো কোনো পন্ডিত অভিভূত হয়ে পড়েন। পরিমাণকে অপরিমেয় সত্যের চেয়ে বড়ো করা একটা মোহ মাত্র। যাকে আমরা জড় বলি সেই অব্যক্তপ্রাণ বহু কোটি কোটি বৎসর সুপ্ত ছিল। কিন্তু, একটিমাত্র প্রাণকণা যেদিন এই পৃথিবীতে দেখা দিল সেইদিনই জগতের অভিব্যক্তি তার একটি মহৎ অর্থে এসে পৌঁছল। জড়ের বাহ্যিক সত্তার মধ্যে দেখা দিল একটি আন্তরিক সত্য। প্রাণ আন্তরিক। যেহেতু সেই প্রাণকণা জড়পুঞ্জের তুলনায় দৃশ্যত অতিক্ষুদ্র এবং যেহেতু সুদীর্ঘকালের এক প্রান্তে তার সদ্য জন্ম, তাই তাকে হেয় করবে কে। মৃকতার মধ্যে এই-যে অর্থ অবারিত হল তার থেকে মানুষ বিরাট প্রাণের রূপ দেখলে; বললে: যদিদং কিঞ্চ সর্বং প্রাণ এজতি নিঃসৃতম্। যা-কিছু সমস্তই প্রাণ থেকে নিঃসৃত হয়ে প্রাণে কম্পিত হচ্ছে। আমরা জড়কে তথ্যরূপে জানি, কেননা সে যে বাইরের। কিন্তু, প্রাণকে আমাদের অন্তর থেকে জানি সত্যরূপে। প্রাণের ক্রিয়া অন্তরে অন্তরে—তার সমস্তটাই গতি। তাই চলার একটিমাত্র ভাষা আমাদের কাছে অব্যবহিত, সে আমাদের প্রাণের ভাষা। চলা ব্যাপারকে অন্তর থেকে সত্য করে চিনেছি নিজেরই মধ্যে।...

উপনিষদ্ বলেছেন: কো হ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ। একটা কীটও প্রাণের ইচ্ছা করত কিসের জোরে যদি প্রাণের আনন্দ সমস্ত আকাশে না থাকত।...

...জগতের বিপুল অভিব্যক্তিতে প্রথম অর্থ দেখলুম প্রাণকণায়, তার পরে জন্তুতে, তার পরে মানুষে। বাহির থেকে অন্তরের দিকে একে একে মুক্তির দ্বার খুলে যেতে লাগল। মানুষে এসে যখন ঠেকল তখন যবনিকা উঠতেই জীবকে দেখলুম তার ভূমায়। দেখলুম রহস্যময় যোগের তত্ত্বকে, পরম ঐক্যকে। মানুষ বলতে পারলে, যাঁরা সত্যকে জানেন তাঁরা সর্বমেবাবিশন্তি—সকলের মধ্যেই প্রবেশ করেন।

আলোকেরই মতো মানুষের চৈতন্য মহাবিকিরণের দিকে চলেছে জ্ঞানে কর্মে ভাবে। সেই প্রসারণের দিকে দেখি তার মহৎকে, দেখি মহামানবকে।...

...শুভকামনায় হৃদয়কে সর্বত্র এই বলে ব্যাপ্ত করতে পারি।...

সকল জীব সুখিত হোক, নিঃশত্রু হোক, অবধ্য হোক, সুখী হয়ে কালহরণ করুক! সকল জীব দুঃখ হতে প্রমুক্ত হোক, সকল জীব যথালব্ধ সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত না হোক।।—সেইসঙ্গে এও বলতে পারি, দুঃখ আসে তো আসুক, মৃত্যু হয় তো হোক, ক্ষতি ঘটে তো ঘটুক—মানুষ আপন মহিমা থেকে বঞ্চিত না হোক, সমস্ত দেশকালকে ধ্বনিত করে বলতে পারুক: সোহহম্।

মানুষের ধর্ম, র/১২/৫৯৫-৬০৩

টীকা ঃ

রামানন্দ—মধ্যযুগের বিখ্যাত ভক্তিবাদী সাধক।

জন্ম—আনু ১৪০০, মৃত্যু—আনু ১৪৭৩।

নাভা—মধ্যযুগের ভক্তিবাদী সাধক। 'ভক্তমাল'-গ্রন্থের রচয়িতা। ১৬০০ খৃঃতে জীবিত ছিলেন বলে অনুমিত।

রবিদাস—মধ্যযুগের ভক্তিবাদী সন্ত।

১৪৬। মানবসত্য

বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ ১৩৪০ (১৯৩৩)

আমাদের জন্মভূমি তিনটি, তিনটিই একত্র জড়িত। প্রথম পৃথিবী। মানুষের বাসস্থান পৃথিবীর সর্বত্র। শীতপ্রধান তুষারাদ্রি, উত্তপ্ত বালুকাময় মরু, উত্তুংগ দুর্গম গিরিশ্রেণী আর এই বাংলার মতো সমতলভূমি, সর্বত্রই মানুষের স্থিতি। মানুষের বস্তুত বাসস্থান এক। ভিন্ন ভিন্ন জাতির নয়, সমগ্র মানুষজাতির। মানুষের কাছে পৃথিবীর কোনো অংশ দুর্গম নয়। পৃথিবী তার কাছে হৃদয় অবারিত করে দিয়েছে।

মানুষের দ্বিতীয় বাসস্থান স্মৃতিলোক। অতীতকাল থেকে পূর্বপুরুষদের কাহিনী নিয়ে কালের নীড় সে তৈরি করেছে। এই কালের নীড় স্মৃতির দ্বারা রচিত, গ্রথিত। এ শুধু এক-একটা বিশেষ জাতির কথা নয়, সমস্ত মানুষজাতির কথা। স্মৃতিলোকে সকল মানুষের মিলন। বিশ্বমানবের বাসস্থান—এক দিকে পৃথিবী, আর-এক দিকে সমস্ত মানুষের স্মৃতিলোক। মানুষ জন্মগ্রহণ করে সমস্ত পৃথিবীতে, জন্মগ্রহণ করে নিখিল ইতিহাসে।

তার তৃতীয় বাসস্থান আত্মিকলোক। সেটাকে বলা যেতে পারে সর্বমানবচিত্তের মহাদেশ। অন্তরে অন্তরে সকল মানুষের যোগের ক্ষেত্র এই চিত্তলোক। কারো চিত্ত হয়তো বা সংকীর্ণ বেড়া দিয়ে ঘেরা, কারো বা বিকৃতির দ্বারা বিপরীত। কিন্তু, একটি ব্যাপক চিত্ত আছে যা ব্যক্তিগত নয়, বিশ্বগত। সেটির পরিচয় অকস্মাৎ পাই। একদিন আহবান আসে। অকস্মাৎ মানুষ সত্যের জন্যে প্রাণ দিতে উৎসুক হয়। সাধারণ লোকের মধ্যেও দেখা যায়—যখন সে স্বার্থ ভোলে, যেখানে সে ভালোবাসে, নিজের ক্ষতি করে ফেলে। তখন বুঝি মনের মধ্যে একটা দিক আছে যেটা সর্বমানবের চিত্তের দিকে।

বিশেষ প্রয়োজনে ঘরের সীমায় খণ্ডাকাশ বদ্ধ, কিন্তু মহাকাশের সংগে তার সত্যকার যোগ। ব্যক্তিগত মন আপন বিশেষ প্রয়োজনের সীমায় সংকীর্ণ হলেও তার সত্যকার বিস্তার সর্বমানবচিত্তে। সেইখানকার প্রকাশ আশ্চর্যজনক। একজন কেউ জলে পড়ে গেছে, আর-একজন জলে ঝাঁপ দিলে তাকে বাঁচাবার জন্যে। অন্যের প্রাণরক্ষার জন্যে নিজের প্রাণ সংকটাপন্ন করা। নিজের সত্তাই যার একান্ত সে বলবে, আপনি বাঁচলে বাপের নাম। কিন্তু আপনি বাঁচাকে সব চেয়ে বড়ো বাঁচা বললে না, এমনও দেখা গেল। তার কারণ, সর্বমানবসত্তা পরস্পর যোগযুক্ত।

আমার জন্ম যে পরিবারে সে পরিবারের ধর্মসাধন একটি বিশেষ ভাবের। উপনিষদ্ এবং পিতৃদেবের অভিজ্ঞতা, রামমোহন এবং আর-আর সাধকদের সাধনাই আমাদের

পারিবারিক সাধনা। আমি পিতার কনিষ্ঠ পুত্র। জাতকর্ম থেকে আরম্ভ করে আমার সব সংস্কারই বৈদিক মন্ত্র দ্বারা অনুষ্ঠিত হয়েছিল, অবশ্য ব্রাহ্মমতের সঙ্গে মিলিয়ে। আমি ইস্কুলপালানো ছেলে। যেখানেই গন্ডী দেওয়া হয়েছে সেখানেই আমি বনিবনাও করতে পারি নি কখনো। যে অভ্যাস বাইরে থেকে চাপানো তা আমি গ্রহণ করতে অক্ষম। কিন্তু, পিতৃদেব সেজন্যে কখনো ভর্ৎসনা করতেন না। তিনি নিজেই স্বাধীনতা অবলম্বন করে পৈতামহিক সংস্কার ত্যাগ করেছিলেন। গভীরতর জীবনতত্ত্ব সম্বন্ধে চিন্তা করার স্বাধীনতা আমারও ছিল। এ কথা স্বীকার করতেই হবে, আমার এই স্বাতন্ত্র্যের জন্যে কখনো কখনো তিনি বেদনা পেয়েছেন। কিছু বলেন নি।

বাল্যে উপনিষদের অনেক অংশ বার বার আবৃত্তি দ্বারা আমার কন্ঠস্থ ছিল। সব-কিছু গ্রহণ করতে পারি নি সকল মন দিয়ে। শ্রদ্ধা ছিল, শক্তি ছিল না হয়তো। এমন সময় উপনয়ন হল। উপনয়নের সময় গায়ত্রীমন্ত্র দেওয়া হয়েছিল। কেবলমাত্র মুখস্থ ভাবে না। বারংবার সুস্পষ্ট উচ্চারণ করে আবৃত্তি করেছি এবং পিতার কাছে গায়ত্রীমন্ত্রের ধ্যানের অর্থ পেয়েছি। তখন আমার বয়স বারো বৎসর হবে। এই মন্ত্র চিন্তা করতে করতে মনে হত, বিশ্বভুবনের অস্তিত্ব আর আমার অস্তিত্ব একাত্মক। ভূর্ভুবঃ স্বঃ—এই ভূলোক, অন্তরীক্ষ, আমি তারই সঙ্গে অখন্ড। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের আদি-অন্তে যিনি আছেন তিনিই আমাদের মনে চৈতন্য প্রেরণ করছেন। চৈতন্য ও বিশ্ব; বাহিরে ও অন্তরে সৃষ্টির এই দুই ধারা এক ধারায় মিলছে।

এমনি করে ধ্যানের দ্বারা যাঁকে উপলব্ধি করছি, তিনি বিশ্বাত্মাতে আমার আত্মাতে চৈতন্যের যোগে যুক্ত। এইরকম চিন্তার আনন্দে আমার মনের মধ্যে একটা জ্যোতি এনে দিলে। এ আমার সুস্পষ্ট মনে আছে।

যখন বয়স হয়েছে হয়তো আঠারো কি উনিশ হবে, বা বিশও হতে পারে, তখন চৌরঙ্গিতে ছিলুম দাদার সঙ্গে। এমন দাদা কেউ কখনো পায় নি। তিনি ছিলেন একাধারে বন্ধু, ভাই, সহযোগী।

তখন প্রত্যুষে ওঠা প্রথা ছিল। আমার পিতাও খুব প্রত্যুষে উঠতেন। মনে আছে, একবার ডালহৌসি পাহাড়ে পিতার সঙ্গে ছিলুম। সেখানে প্রচন্ড শীত। সেই শীতে ভোরে আলো হাতে এসে আমাকে শয্যা থেকে উঠিয়ে দিতেন। সেই ভোরে উঠে একদিন চৌরঙ্গির বাসার বারান্দায় দাঁড়িয়েছিলুম। তখন ওখানে ফ্রি ইস্কুল বলে একটা ইস্কুল ছিল। রাস্তাটা পেরিয়েই ইস্কুলের হাতাটা দেখা যেত। সে দিকে চেয়ে দেখলুম, গাছের আড়ালে সূর্য উঠছে। যেমনি সূর্যের আবির্ভাব হল গাছের অন্তরালের থেকে, অমনি মনের পরদা খুলে গেল। মনে হল, মানুষ আজন্ম একটা আবরণ নিয়ে থাকে। সেটাতেই তার স্বাতন্ত্র্য। স্বাতন্ত্র্যের বেড়া লুপ্ত হলে সাংসারিক প্রয়োজনের অনেক অসুবিধা। কিন্তু, সেদিন সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে আমার আবরণ খসে পড়ল। মনে হল, সত্যকে মুক্ত দৃষ্টিতে দেখলুম। মানুষের অন্তরাত্মাকে দেখলুম। দুজন মুটে কাঁধে হাত দিয়ে হাসতে হাসতে চলেছে। তাদের দেখে মনে হল কী অনির্বচনীয় সুন্দর। মনে হল না তারা মুটে। সেদিন তাদের অন্তরাত্মাকে দেখলুম, যেখানে আছে চিরকালের মানুষ।

সুন্দর কাকে বলি। বাইরে যা অকিঞ্চিৎকর, যখন দেখি তার আন্তরিক অর্থ তখন দেখি সুন্দরকে। একটি গোলাপফুল বাছুরের কাছে সুন্দর নয়। মানুষের কাছে সে সুন্দর,

যে মানুষ তার কেবল পাপড়ি না, বোঁটা না, একটা সমগ্র আন্তরিক সার্থকতা পেয়েছে। পাবনার গ্রামবাসী কবি যখন প্রতিকূল প্রণয়িনীর মানভঞ্জনের জন্যে 'ট্যাহা দামের মোটরি' আনার প্রস্তাব করেন তখন মোটরির দাম এক টাকার চেয়ে অনেক বেড়ে যায়। এই মোটরি বা গোলাপের আন্তরিক অর্থটি যখন দেখতে পাই তখনই সে সুন্দর। সেদিন তাই আশ্চর্য হয়ে গেলুম। দেখলুম সমস্ত সৃষ্টি অপরূপ। আমার এক বন্ধু ছিল, সে সুবুদ্ধির জন্যে বিশেষ বিখ্যাত ছিল না। তার সুবুদ্ধির একটু পরিচয় দিই। একদিন সে আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিল, 'আচ্ছা, ঈশ্বরকে দেখেছ?' আমি বললুম, 'না, দেখি নি তো।' সে বললে, 'আমি দেখেছি।' জিজ্ঞাসা করলুম, 'কিরকম।' সে উত্তর করলে, 'কেন। এই-যে চোখের কাছে বিজ্‌বিজ্ করছে।' সে এলে ভাবতুম, বিরক্ত করতে এসেছে। সেদিন তাকেও ভালো লাগল। তাকে নিজেই ডাকলুম। সেদিন মনে হল, তার নির্বুদ্ধিতাটা আকস্মিক, সেটা তার চরম ও চিরন্তন সত্য নয়। তাকে ডেকে সেদিন আনন্দ পেলুম। সেদিন সে 'অমুক' নয়। আমি যার অন্তর্গত সেও সেই মানবলোকের অন্তর্গত। তখন মনে হল, এই মুক্তি। এই অবস্থায় চার দিন ছিলুম। চার দিন জগৎকে সত্যভাবে দেখেছি। তার পর জ্যোতিদা বললেন, 'দার্জিলিঙ চলো।' সেখানে গিয়ে আবার পর্দা পড়ে গেল। আবার সেই অকিঞ্চিৎকরতা, সেই প্রাত্যহিকতা। কিন্তু তার পূর্বে কয়দিন সকলের মাঝে যাঁকে দেখা গেল তাঁর সম্বন্ধে আজ পর্যন্ত আর সংশয় রইল না। তিনি সেই অখণ্ড মানুষ যিনি মানুষের ভূত-ভবিষ্যতের মধ্যে পরিব্যাপ্ত, যিনি অরূপ, কিন্ত সকল মানুষের রূপের মধ্যে যাঁর অন্তরতম আবির্ভাব।

২

সেই সময়ে এই আমার জীবনের প্রথম অভিজ্ঞতা যাকে আধ্যাত্মিক নাম দেওয়া যেতে পারে। ঠিক সেই সময়ে বা তার অব্যবহিত পরে, যে ভাবে আমাকে আবিষ্ট করেছিল তার স্পষ্ট ছবি দেখা যায় আমার সেই সময়কার কবিতাতে—প্রভাতসংগীতের মধ্যে। তখন স্বতই যে ভাব আপনাকে প্রকাশ করেছে তাই ধরা পড়েছে প্রভাতসংগীতে। পরবর্তীকালে চিন্তা করে লিখলে তার উপর ততটা নির্ভর করা যেত না। গোড়াতেই বলে রাখা ভালো, প্রভাতসংগীত থেকে যে কবিতা শোনাব তা কেবল তখনকার ছবিকে স্পষ্ট দেখাবার জন্যে, কাব্যহিসাবে তার মূল্য অত্যন্ত সামান্য। আমার কাছে এর একমাত্র মূল্য এই যে, তখনকার কালে আমার মনে যে-একটা আনন্দের উচ্ছ্বাস এসেছিল তা এতে ব্যক্ত হয়েছে। তার ভাব অসংলগ্ন, ভাষা কাঁচা, যেন হাৎড়ে হাৎড়ে বলবার চেষ্টা। কিন্তু 'চেষ্টা' বললেও ঠিক হবে না। বস্তুত চেষ্টা নেই তাতে—অস্ফুটবাক্ মন বিনা চেষ্টায় যেমন করে পারে ভাবকে ব্যক্ত করেছে, সাহিত্যের আদর্শ থেকে বিচার করলে স্থান পাওয়ার যোগ্য সে মোটেই নয়।

যে কবিতাগুলো পড়ব তা একটু কুণ্ঠিতভাবেই শোনাব, উৎসাহের সঙ্গে নয়। প্রথম দিনেই যা লিখেছি সেই কবিতাটাই আগে পড়ি। অবশ্য, ঠিক প্রথম দিনেরই লেখা কি না, আমার পক্ষে জোর করে বলা শক্ত। রচনার কাল সম্বন্ধে আমার উপর নির্ভর করা চলে না; আমার কাব্যের ঐতিহাসিক যাঁরা তাঁরা সে কথা ভালো জানেন। হৃদয় যখন উদ্‌বেল হয়ে উঠেছিল আশ্চর্য ভাবোচ্ছ্বাসে, এ হচ্ছে তখনকার লেখা। একে এখনকার অভিজ্ঞতার

সঙ্গে মিলিয়ে দেখতে হবে। আমি বলেছি, আমাদের এক দিক অহং, আর-একটা দিক আত্মা। অহং যেন খন্ডাকাশ, ঘরের মধ্যেকার আকাশ, যা নিয়ে বিষয়কর্ম মামলা-মকদ্দমা এই সব। সেই আকাশের সঙ্গে যুক্ত মহাকাশ, তা নিয়ে বৈষয়িকতা নেই; সেই আকাশ অসীম, বিশ্বব্যাপী। বিশ্বব্যাপী আকাশে ও খন্ডাকাশে যে ভেদ, অহং আর আত্মার মধ্যেও সেই ভেদ। মানবত্ব বলতে যে বিরাট পুরুষ, তিনি আমার খন্ডাকাশের মধ্যেও আছেন। আমারই মধ্যে দুটো দিক আছে—এক আমাতেই বদ্ধ, আর-এক সর্বত্র ব্যাপ্ত। এই দুই-ই যুক্ত এবং এই উভয়কে মিলিয়েই আমার পরিপূর্ণ সত্তা। তাই বলেছি, যখন আমরা অহংকে একান্তভাবে আঁকড়ে ধরি তখন আমরা মানবধর্ম থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়ি। সেই মহামানব, সেই বিরাটপুরুষ, যিনি আমার মধ্যে রয়েছেন তাঁর সঙ্গে তখন ঘটে বিচ্ছেদ।

জাগিয়া দেখিনু আমি, আঁধারে রয়েছি আঁধা,
আপনারি মাঝে আমি আপনি রয়েছি বাঁধা।
রয়েছি মগন হয়ে আপনারি কলস্বরে,
ফিরে আসে প্রতিধ্বনি নিজেরি শ্রবণ-'পরে।

এইটেই হচ্ছে অহং, আপনাতে আবদ্ধ, অসীম থেকে বিচ্যুত হয়ে, অন্ধ হয়ে থাকে অন্ধকারের মধ্যে। তারই মধ্যে ছিলুম, এটা অনুভব করলুম। সে যেন একটা স্বপ্নদশা।

গভীর—গভীর গুহা, গভীর আঁধার ঘোর,
গভীর ঘুমন্ত প্রাণ একেলা গাহিছে গান,
মিশিছে স্বপনগীতি বিজন হৃদয়ে মোর।

নিদ্রার মধ্যে স্বপ্নের যে লীলা, সত্যের যোগ নেই তার সঙ্গে। অমূলক, মিথ্যা, নানা নাম দিই তাকে। অহং-এর মধ্যে সীমাবদ্ধ যে জীবন সেটা মিথ্যা। নানা অতিকৃতি দুঃখ ক্ষতি সব জড়িয়ে আছে তাতে। অহং যখন জেগে উঠে আত্মাকে উপলব্ধি করে তখন সে নূতন জীবন লাভ করে। এক সময়ে সেই অহং-এর খেলাঘরের মধ্যে বন্দী ছিলুম। এমনি করে নিজের কাছে নিজের প্রাণ নিয়েই ছিলুম, বৃহৎ সত্যের রূপ দেখি নি।

আজি এ প্রভাতে রবির কর
কেমনে পশিল প্রাণের 'পর,
কেমনে পশিল গুহার আঁধারে
　　প্রভাতপাখির গান!
না জানি কেন রে এত দিন পরে
　　জাগিয়া উঠিল প্রাণ!
　　জাগিয়া উঠেছে প্রাণ,
ওরে উথলি উঠেছে বারি,
ওরে প্রাণের বাসনা প্রাণের আবেগ
　　রুধিয়া রাখিতে নারি।

এটা হচ্ছে সেদিনকার কথা যেদিন অন্ধকার থেকে আলো এল বাইরের, অসীমের। সেদিন চেতনা নিজেকে ছাড়িয়ে ভূমার মধ্যে প্রবেশ করল। সেদিন কারার দ্বার খুলে বেরিয়ে পড়বার জন্যে, জীবনের সকল বিচিত্র লীলার সঙ্গে যোগযুক্ত হয়ে প্রবাহিত হবার

জন্যে, অন্তরের মধ্যে তীব্র ব্যাকুলতা। সেই প্রবাহের গতি মহান বিরাট সমুদ্রের দিকে। তাকেই এখন বলেছি বিরাটপুরুষ। সেই-যে মহামানব তারই মধ্যে গিয়ে নদী মিলবে, কিন্তু সকলের মধ্যে দিয়ে। এই-যে ডাক পড়ল, সূর্যের আলোতে জেগে মন ব্যাকুল হয়ে উঠল, এ আহবান কোথা থেকে। এর আকর্ষণ মহাসমুদ্রের দিকে, সমস্ত মানবের ভিতর দিয়ে, সংসারের ভিতর দিয়ে, ভোগ ত্যাগ কিছুই অস্বীকার ক'রে নয়। সমস্ত স্পর্শ করে নিয়ে শেষে পড়ে এক জায়গায় যেখানে—

> কী জানি কী হল আজি, জাগিয়া উঠিল প্রাণ,
> দূর হতে শুনি যেন মহাসাগরের গান।
> সেই সাগরের পানে হৃদয় ছুটিতে চায়—
> তারি পদপ্রান্তে গিয়ে জীবন টুটিতে চায়।

সেখানে যাওয়ার একটা ব্যাকুলতা অন্তরে জেগেছিল। মানবধর্ম সম্বন্ধে যে বক্তৃতা করেছি, সংক্ষেপে এই তার ভূমিকা। এই মহাসমুদ্রকে এখন নাম দিয়েছি মহামানব। সমস্ত মানুষের ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান নিয়ে তিনি সর্বজনের হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত। তাঁর সঙ্গে গিয়ে মেলবারই এই ডাক।

এর দু-চার দিন পরেই লিখেছি 'প্রভাত-উৎসব'। একই কথা, আর-একটু স্পষ্ট করে লেখা—

> হৃদয় আজি মোর কেমনে গেল খুলি।
> জগৎ আসি সেথা করিছে কোলাকুলি।
> ধরায় আছে যত মানুষ শত শত
> আসিছে প্রাণে মোর, হাসিছে গলাগলি।

এই তো সমস্তই মানুষের হৃদয়ের তরঙ্গলীলা। মানুষের মধ্যে স্নেহ-প্রেম-ভক্তির যে সম্বন্ধ সেটা তো আছেই। তাকে বিশেষ করে দেখা, বড়ো ভূমিকার মধ্যে দেখা, যার মধ্যে সে তার একটা ঐক্য, একটা তাৎপর্য লাভ করে। সেদিন যে-দুজন মুটের কথা বলেছি তাদের মধ্যে যে আনন্দ দেখলুম, সে সখ্যের আনন্দ, অর্থাৎ এমন কিছু যার উৎস সর্বজনীন সর্বকালীন চিত্তের গভীরে। সেইটে দেখেই খুশি হয়েছিলুম। আরো খুশি হয়েছিলুম এইজন্যে যে, যাদের মধ্যে ঐ আনন্দটা দেখলুম তাদের বরাবর চোখে পড়ে না, তাদের অকিঞ্চিৎকর বলেই দেখে এসেছি। যে মুহূর্তে তাদের মধ্যে বিশ্বব্যাপী প্রকাশ দেখলুম অমনি পরম সৌন্দর্যকে অনুভব করলুম। মানবসম্বন্ধের যে বিচিত্র রসলীলা, আনন্দ, অনির্বচনীয়তা, তা দেখলুম সেইদিন। সে দেখা বালকের কাঁচা লেখায় আঁকুবাঁকু করে নিজেকে প্রকাশ করেছে কোনোরকমে, পরিস্ফুট হয় নি। সে সময়ে আভাসে যা অনুভব করেছি তাই লিখেছি। আমি যে যা-খুশি গেয়েছি, তা নয়। এ গান দুদণ্ডের নয়, এর অবসান নেই। এর একটা ধারাবাহিকতা আছে, এর অনুবৃত্তি আছে মানুষের হৃদয়ে হৃদয়ে। আমার গানের সঙ্গে সকল মানুষের যোগ আছে। গান থামলেও সে যোগ ছিন্ন হয় না।

> কাল গান ফুরাইবে, তা বলে গাবে না কেন,
> আজ যবে হয়েছে প্রভাত।

কিসের হরষ-কোলাহল
শুধাই তোদের, তোরা বল্‌!
আনন্দ-মাঝারে সব উঠিতেছে ভেসে ভেসে,
আনন্দে হতেছে কভু লীন,
চাহিয়া ধরণী-পানে নব আনন্দের গানে
মনে পড়ে আর-এক দিন।

এই-যে বিরাট আনন্দের মধ্যে সব তরঙ্গিত হচ্ছে তা দেখি নি বহুদিন, সেদিন দেখলুম। মানুষের বিচিত্র সম্বন্ধের মধ্যে একটি আনন্দের রস আছে। সকলের মধ্যে এই যে আনন্দের রস, তাকে নিয়ে মহারসের প্রকাশ। রসো বৈ সঃ। রসের খন্ড খন্ড প্রকাশের মধ্যে তাকে পাওয়া গিয়েছিল। সেই অনুভূতিকে প্রকাশের জন্যে মরিয়া হয়ে উঠেছিলুম, কিন্তু ভালোরকম প্রকাশ করতে পারি নি। যা বলেছি অসম্পূর্ণভাবে বলেছি।

প্রভাতসংগীতের শেষের কবিতা—

আজ আমি কথা কহিব না।
আর আমি গান গাহিব না।
হেরো আজি ভোরবেলা এসেছে রে মেলা লোক,
ঘিরে আছে চারি দিকে,
চেয়ে আছে অনিমিখে,
হেরে মোর হাসিমুখ ভুলে গেছে দুখশোক।
আজ আমি গান গাহিব না।

এর থেকে বুঝতে পারা যাবে, মন তখন কী ভাবে আবিষ্ট হয়েছিল, কোন্‌ সত্যকে মন স্পর্শ করেছিল। যা-কিছু হচ্ছে সেই মহামানবে মিলছে, আবার ফিরেও আসছে সেখান থেকে প্রতিধ্বনিরূপে নানা রসে সৌন্দর্যে মন্ডিত হয়ে। এটা উপলব্ধি হয়েছিল অনুভূতিরূপে, তত্ত্বরূপে নয়। সে-সময় বালকের মন এই অনুভূতিদ্বারা যেভাবে আন্দোলিত হয়েছিল তারই অসম্পূর্ণ প্রকাশ প্রভাতসংগীতের মধ্যে। সেদিন অক্‌স্‌ফোর্ডে যা বলেছি তা চিন্তা করে বলা। অনুভূতি থেকে উদ্ধার করে অন্য তত্ত্বের সঙ্গে মিলিয়ে যুক্তির উপর খাড়া করে সেটা বলা। কিন্তু, তার আরম্ভ ছিল এখানে। তখন স্পষ্ট দেখেছি, জগতের তুচ্ছতার আবরণ খসে গিয়ে সত্য অপরূপ সৌন্দর্যে দেখা দিয়েছে। তার মধ্যে তর্কের কিছু নেই, সেই দেখাকে তখন সত্যরূপে জেনেছি। এখনও বাসনা আছে, হয়তো সমস্ত বিশ্বের আনন্দরূপকে কোনো-এক শুভমুহূর্তে আবার তেমনি পরিপূর্ণভাবে কখনও দেখতে পাবো। এইটে যে একদিন বাল্যাবস্থায় সুস্পষ্ট দেখেছিলুম, সেইজন্যেই 'আনন্দরূপমমৃতং যদ্‌বিভাতি' উপনিষদের এই বাণী আমার মুখে বারবার ধ্বনিত হয়েছে। সেদিন দেখেছিলুম, বিশ্ব স্থূল নয়, বিশ্বে এমন কোনো বস্তু নেই যার মধ্যে রসস্পর্শ নেই। যা প্রত্যক্ষ দেখেছি তা নিয়ে তর্ক কেন—স্থূল আবরণের মৃত্যু আছে, অন্তরতম আনন্দময় যে সত্তা তার মৃত্যু নেই।

বর্ষার সময় খালটা থাকত জলে পূর্ণ। শুকনোর দিনে লোক চলত তার উপর দিয়ে। এপারে ছিল একটা হাট, সেখানে বিচিত্র জনতা। দোতলার ঘর থেকে লোকালয়ের লীলা দেখতে ভালো লাগত। পদ্মায় আমার জীবনযাত্রা ছিল জনতা থেকে দূরে। নদীর চর— ধূ-ধূ বালি, স্থানে স্থানে জলকুণ্ড ঘিরে জলচর পাখি। সেখানে যে-সব ছোটো গল্প লিখেছি তার মধ্যে আছে পদ্মাতীরের আভাস। সাজাদপুরে যখন আসতুম চোখে পড়ত গ্রাম্য জীবনের চিত্র, পল্লীর বিচিত্র কর্মোদ্যম। তারই প্রকাশ 'পোস্ট্‌মাস্টার' 'সমাপ্তি' 'ছুটি' প্রভৃতি গল্পে। তাতে লোকালয়ের খণ্ড খণ্ড চলতি দৃশ্যগুলি কল্পনার দ্বারা ভরাট করা হয়েছে।

সেই সময়কার একদিনের কথা মনে আছে। ছোটো শুকনো পুরানো খালে জল এসেছে। পাঁকের মধ্যে ডিঙিগুলো ছিল অর্ধেক ডোবানো, জল আসতে তাদের ভাসিয়ে তোলা হল। ছেলেগুলো নতুন জলধারার ডাক শুনে মেতে উঠেছে। তারা দিনের মধ্যে দশবার করে ঝাঁপিয়ে পড়ছে জলে।

দোতলার জানলায় দাঁড়িয়ে সেদিন দেখছিলুম, সামনের আকাশে নববর্ষার জলভারনত মেঘ, নিচে ছেলেদের মধ্যে দিয়ে প্রাণের তরঙ্গিত কল্লোল। আমার মন সহসা আপন খোলা দুয়ার দিয়ে বেরিয়ে গেল বাইরে সুদূরে। অন্তত নিবিড়ভাবে আমার অন্তরে একটা অনুভূতি এল; সামনে দেখতে পেলুম নিত্যকালব্যাপী একটি সর্বানুভূতির অনবচ্ছিন্ন ধারা, নানা প্রাণের বিচিত্র লীলাকে মিলিয়ে নিয়ে একটি অখণ্ড লীলা। নিজের জীবনে যা বোধ করছি, যা ভোগ করছি, চার দিকে ঘরে-ঘরে জনে-জনে মুহূর্তে-মুহূর্তে যা-কিছু উপলব্ধি চলেছে, সমস্ত এক হয়েছে একটি বিরাট অভিজ্ঞতার মধ্যে। অভিনয় চলেছে নানা নটকে নিয়ে, সুখদুঃখের নানা খণ্ডপ্রকাশ চলছে তাদের প্রত্যেকের স্বতন্ত্র জীবযাত্রায়, কিন্তু সমস্তটার ভিতর দিয়ে একটা নাট্যরস প্রকাশ পাচ্ছে এক পরমদ্রষ্টার মধ্যে যিনি সর্বানুভূঃ। এতকাল নিজের জীবনে সুখদুঃখের যে-সব অনুভূতি একান্তভাবে আমাকে বিচলিত করেছে, তাকে দেখতে পেলুম দ্রষ্টারূপে এক নিত্যসাক্ষীর পাশে দাঁড়িয়ে।

এমনি করে আপনা থেকে বিবিক্ত হয়ে সমগ্রের মধ্যে খণ্ডকে স্থাপন করবামাত্র নিজের অস্তিত্বের ভার লাঘব হয়ে গেল। তখন জীবনলীলাকে রসরূপে দেখা গেল কোনো রসিকের সঙ্গে এক হয়ে। আমার সেদিনকার এই বোধটি নিজের কাছে গভীর ভাবে আশ্চর্য হয়ে ঠেকল।

একটা মুক্তির আনন্দ পেলুম। স্নানের ঘরে যাবার পথে একবার জানালার কাছে দাঁড়িয়েছিলুম ক্ষণকাল অবসরযাপনের কৌতুকে। সেই ক্ষণকাল এক মুহূর্তে আমার সামনে বৃহৎ হয়ে উঠল। চোখ দিয়ে জল পড়ছে তখন; ইচ্ছে করছে, সম্পূর্ণ আত্মনিবেদন করে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করি কাউকে। কে সেই আমার পরম অন্তরঙ্গ সঙ্গী যিনি আমার সমস্ত ক্ষণিককে গ্রহণ করছেন তাঁর নিত্যে। তখনই মনে হল, আমার এক দিক থেকে বেরিয়ে এসে আর-এক দিকের পরিচয় পাওয়া গেল। এষোহস্য পরম আনন্দঃ। আমার

মধ্যে এ এবং সে—এই এ যখন সেই সে'র দিকে এসে দাঁড়ায় তখন তার আনন্দ।

সেদিন হঠাৎ অত্যন্ত নিকটে জেনেছিলুম, আপন সত্তার মধ্যে দুটি উপলব্ধির দিক আছে। এক, যাকে বলি আমি আর তারই সঙ্গে জড়িয়ে মিশিয়ে যা-কিছু—যেমন আমার সংসার, আমার দেশ, আমার ধনজনমান, এই যা-কিছু নিয়ে মারামারি কাটাকাটি ভাবনা-চিন্তা। কিন্তু, পরমপুরুষ আছেন সেই, সমস্তকে অধিকার করে এবং অতিক্রম করে, নাটকের স্রষ্টা ও দ্রষ্টা যেমন আছে নাটকের সমস্তটাকে নিয়ে এবং তাকে পেরিয়ে। সত্তার এ দুই দিককে সব সময়ে মিলিয়ে অনুভব করতে পারি নে। একলা আপনাকে বিরাট থেকে বিচ্ছিন্ন করে সুখে দুঃখে আন্দোলিত হই। তার মাত্রা থাকে না, তার বৃহৎ সামঞ্জস্য দেখি নে। কোনো-এক সময়ে সহসা দৃষ্টি ফেরে তার দিকে, মুক্তির স্বাদ পাই তখন। যখন অহং আপন ঐকান্তিকতা ভোলে তখন দেখে সত্যকে। আমার এই অনুভূতি কবিতাতে প্রকাশ পেয়েছে 'জীবনদেবতা' শ্রেণীর কাব্যে।

ওগো অন্তরতম,
মিটেছে কি তব সকল তিয়াষ
আসি অন্তরে মম।

আমি যে পরিমাণে পূর্ণ অর্থাৎ বিশ্বভূমীন, সেই পরিমাণে আপন করেছি তাঁকে, ঐক্য হয়েছে তাঁর সঙ্গে। সেই কথা মনে করে বলেছিলুম, 'তুমি কি খুশি হয়েছ আমার মধ্যে তোমার লীলার প্রকাশ দেখে।'

বিশ্বদেবতা আছেন, তাঁর আসন লোকে লোকে, গ্রহচন্দ্রতারায়। জীবনদেবতা বিশেষভাবে জীবনের আসনে, হৃদয়ে হৃদয়ে তাঁর পীঠস্থান, সকল অনুভূতি সকল অভিজ্ঞতার কেন্দ্রে। বাউল তাঁকেই বলেছে মনের মানুষ। এই মনের মানুষ, এই সর্বমানুষের জীবনদেবতার কথা বলবার চেষ্টা করেছি Religion of Man বক্তৃতাগুলিতে। সেগুলিকে দর্শনের কোঠায় ফেললে ভুল হবে। তাকে মতবাদের একটা আকার দিতে হয়েছে, কিন্তু বস্তুত সে কবিচিত্তের একটা অভিজ্ঞতা। এই আন্তরিক অভিজ্ঞতা অনেক কাল থেকে ভিতরে ভিতরে আমার মধ্যে প্রবাহিত; তাকে আমার ব্যক্তিগত চিত্তপ্রকৃতির একটা বিশেষত্ব বললে তাই আমাকে মেনে নিতে হবে।

যিনি সর্বজগদ্‌গত ভূমা তাঁকে উপলব্ধি করবার সাধনায় এমন উপদেশ পাওয়া যায় যে, 'লোকালয় ত্যাগ করো, গুহাগহবরে যাও, নিজের সত্তাসীমাকে বিলুপ্ত করে অসীমে অন্তর্হিত হও।' এই সাধনা সম্বন্ধে কোনো কথা বলবার অধিকার আমার নেই। অন্তত, আমার মন যে সাধনা স্বীকার করে তার কথাটা হচ্ছে এই যে, আপনাকে ত্যাগ না করে আপনার মধ্যেই সেই মহান পুরুষকে উপলব্ধি করবার ক্ষেত্র আছে—তিনি নিখিলমানবের আত্মা। তাঁকে সম্পূর্ণ উত্তীর্ণ হয়ে কোনো অমানব বা অতিমানব সত্যে উপনীত হওয়ার কথা যদি কেউ বলেন, তবে সে কথা বোঝবার শক্তি আমার নেই। কেননা, আমার বুদ্ধি মানববুদ্ধি, আমার হৃদয় মানবহৃদয়, আমার কল্পনা মানবকল্পনা। তাকে যতই মার্জনা করি, শোধন করি, তা মানবচিত্ত কখনোই ছাড়াতেই পারে না। আমরা যাকে বিজ্ঞান বলি তা মানববুদ্ধিতে প্রমাণিত বিজ্ঞান, আমরা যাকে ব্রহ্মানন্দ বলি তাও মানবের চৈতন্যে প্রকাশিত আনন্দ। এই বুদ্ধিতে, এই আনন্দে যাঁকে উপলব্ধি করি তিনি ভূমা কিন্তু মানবিক ভূমা। তাঁর বাইরে অন্য কিছু থাকা না-থাকা মানুষের পক্ষে সমান।

মানুষকে বিলুপ্ত করে যদি মানুষের মুক্তি, তবে মানুষ হলুম কেন।

এক সময় বসে বসে প্রাচীন মন্ত্রগুলিকে নিয়ে ঐ আত্মবিলয়ের ভাবেই ধ্যান করেছিলুম। পালাবার ইচ্ছে করেছি, শান্তি পাই নি তা নয়। বিক্ষোভের থেকে সহজেই নিষ্কৃতি পাওয়া যেত। এভাবে দুঃখের সময় সান্ত্বনা পেয়েছি। প্রলোভনের হাত থেকে এমনিভাবে উদ্ধার পেয়েছি। আবার এমন একদিন এল যেদিন সমস্তকে স্বীকার করলুম, সবকে গ্রহণ করলুম। দেখলুম, মানবনাট্যমঞ্চের মাঝখানে যে লীলা তার অংশের অংশ আমি। সব জড়িয়ে দেখলুম সকলকে। এই-যে দেখা এ'কে ছোটো বলব না। এও সত্য। জীবনদেবতার সঙ্গে জীবনকে পৃথক করে দেখলেই দুঃখ, মিলিয়ে দেখলেই মুক্তি।

মানুষের ধর্ম, র/১২/৬০৫-৬১৩

টীকা :

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক পঠিত 'কমলা বক্তৃতার' অনুবৃত্তি 'মানুষের ধর্ম' গ্রন্থের পরিশিষ্ট। 'ভূমিকা, মানুষের ধর্ম' (১৪৬) রচনার টীকা দ্রষ্টব্য।

১৪৭। পথের শেষ কোথায়

৪ ভাদ্র ১৩৪০ (১৯৩৩)

পথের শেষ কোথায়, শেষ কোথায়, কী আছে শেষে!
এত কামনা, এত সাধনা কোথায় মেশে।।
ঢেউ ওঠে পড়ে কাঁদার, সম্মুখে ঘন আঁধার,
পার আছে কোন্ দেশে।।

আজ ভাবি মনে মনে মরীচিকা-অন্বেষণে
বুঝি তৃষ্ণার শেষ নেই। মনে ভয় লাগে সেই—
হাল-ভাঙা পাল-ছেঁড়া ব্যথা চলেছে নিরুদ্দেশে।।

গীতবিতান, র/৪/১৮৭

১৪৮। আমি তারেই জানি

ভাদ্র ১৩৪০ (১৯৩৩)

আমি তারেই জানি তারেই জানি আমায় যে জন আপন জানে—
তারি দানে দাবি আমার যার অধিকার আমার দানে।।
যে আমারে চিনতে পারে সেই চেনাতে চিনি তারে গো—

একই আলো চেনার পথে তার প্রাণে আর আমার প্রাণে ।।
আপন মনের অন্ধকারে ঢাকল যারা
আমি তাদের মধ্যে আপনহারা।
ছুঁইয়ে দিল সোনার কাঠি, ঘুমের ঢাকা গেল কাটি গো—
নয়ন আমার ছুটেছে তার আলো-করা মুখের পানে ।।৮

গীতবিতান, র/৪/১৬৮

বিষয়-সংকেত ঃ
বাউল-ভাবনা—প্রাণের মানুষ

তুলনীয় প্রসঙ্গ ঃ
আমার প্রাণের মানুষ (৮৫), আমি তারেই খুঁজে বেড়াই (১১৫), আমি কান পেতে রই (১১৬), আমার হিয়ার মাঝে (১০১), ওরা অন্ত্যজ ওরা মন্ত্রবর্জিত (১৫৫), জানি নাই গো (১০০)

১৪৯। হেমন্তবালা দেবীকে পত্র-১৩

১২ই আশ্বিন ১৩৪০ (২৮ সেপ্টেম্বর ১৯৩৩)

...তোমাদের হিঁদুয়ানিতে অত্যন্ত বেশি আধুনিক ঝাঁজ—তাতে সাবেক কালের পরিণতির মোলায়েম রঙ লাগেনি। মিশনারিদের মতোই ভঙ্গী তোমাদের। যেন হিঁদুয়ানির মোল্লা মৌলবী। গভীরভাবে আমি তোমাদের চেয়ে অনেক বেশি ভারতীয়। যথার্থ ভারতবর্ষ মহাভারতবর্ষ। মনুসংহিতা ও রঘুনন্দনের ছাঁটাকাটা হাড়-বেরকরা শুচিবায়ুগ্রস্ত ভারতবর্ষ নয়। যে দেশ কেবলি বিশ্বের ছোঁওয়া বাঁচিয়ে নাক তুলে চলে সে রুগ্ন দেশ—আমি সেই বাতে পঙ্গু দেশের মানুষ নই। আমি ভারতবর্ষের মানুষ—সেই ভারতবর্ষ স্বাস্থ্যের প্রাবল্যদ্বারাই চিরশুচি,—সেই আমার মহাকাব্যের চিরন্তন ভারতবর্ষ।....

চিঠিপত্র-৯, পৃ-২০৪-০৫

১৫০। হেমন্তবালা দেবীকে পত্র-১৪

১০ ডিসেম্বর ১৯৩৪

আমি আজন্ম ব্রাত্য। মর্ত্তধরণীর বুকের কাছে আমার বাসা—এখানকার মাটির ভাঁড়ে যে অমৃত পাই তাই আমার যথেষ্ট। পারত্রিকের ঠিকানা জানি নে, যারা সেখানকার

বিবরণ জটিল ভাষায় বিস্তারিত করে বলতে আসে তাদের কথা বুঝতেও পারি নে বিশ্বাসও করি নে। সকল জাতির সকল শাস্ত্রই দৈবদত্ত নির্খুঁৎ সত্যের অহংকার করে অথচ তাদের পরস্পরের সম্বন্ধ আদায় কাঁচকলায়। মধ্য আফ্রিকার বর্বরও তাদের নিরর্থক আচারকে ধর্মের পদবী দিয়ে তার শুচিতার অভিমানে রোমাঞ্চিত, আমাদেরও সেই একই দশা। এই পরস্পর প্রতিযুধ্যমান শাস্ত্রকে আমি দূর থেকে নমস্কার করি—শ্রেয়োবোধের অনুমোদিত শুচিতাকেই পালন করতে আমার প্রয়াস,—যে বাহ্য আচার মানুষে মানুষে ভেদ ঘটিয়ে প্রাচীর তুলে বেড়ায় মানবপ্রেমকে, ঈশ্বরদত্ত বুদ্ধিকে অবজ্ঞা করে শাস্ত্রের অক্ষর বাঁচাবার জন্যে খুনোখুনি করতেও অগ্রসর হয় তাকে বর্জন করে নাস্তিক অধার্মিক পদবী নিতে আমার কোনো সংকোচ নেই। পান্ডার পা পূজো করে যে আত্মাবমাননা হয় তার দ্বারাও ভক্তির সার্থকতা ব্যাখ্যা করবার মতো শাস্ত্রিক সূক্ষ্ম তর্ক আমার বুদ্ধির অতীত। অতএব আমাকে ভিন্ন জাতের মানুষ বলেই জেনো, আমি তোমাদের ত্যাজ্য।....

...যে বিধাতা আমাকে বুদ্ধি দিয়েচেন, মানুষভ্রাতার প্রতি শ্রদ্ধা দিয়েছেন, মানবপ্রেমের ত্যাগপরায়ণ দুঃসাধ্য সাধনার দিকে আহ্বান করেছেন, তাঁকে ভক্তি করেই আমার ভক্তিবৃত্তিকে ধন্য বলে মানি—তাঁরই বিধান আমার যুক্তিতে আমার শুভবুদ্ধিতে সহজ বলে বোধ হয়, তাই আমার শিরোধার্য্য।...

চিঠিপত্র-৯, পৃ-২৬৫-৬৭

১৫১। বুদ্ধদেব

বৈশাখী পূর্ণিমা: ৪ জ্যৈষ্ঠ ১৩৪২ (১৯৩৫)

আমি যাকে অন্তরের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ মানব বলে উপলব্ধি করি আজ এই বৈশাখ পূর্ণিমায় তাঁর জন্মোৎসবে আমার প্রণাম নিবেদন করতে এসেছি। এ কোনো বিশেষ অনুষ্ঠানের উপকরণগত অলংকার নয়, একান্তে নিভৃতে যা তাঁকে বার-বার সমর্পণ করেছি সেই অর্ঘ্যই আজ এখানে উৎসর্গ করি।....

...বর্তমান কালের পরিধি অতি সংকীর্ণ, সদ্য উৎক্ষিপ্ত ঘটনার ধূলি-আবর্তে আবিল, এই অল্পপরিসর অস্বচ্ছ কালের মধ্যে মহামানবকে আমরা পরিপূর্ণ করে উপলব্ধি করতে পারি নে ইতিহাসে বার-বার তার প্রমাণ হয়েছে। বুদ্ধদেবের জীবিতকালে ক্ষুদ্র মনের কত ঈর্ষা, কত বিরোধ তাঁকে আঘাত করেছে; তাঁর মাহাত্ম্য খর্ব করবার জন্যে কত মিথ্যা নিন্দার প্রচার হয়েছিল। কত শত লোক যারা ইন্দ্রিয়গত ভাবে তাঁকে কাছে দেখেছে তারা অন্তরগত ভাবে নিজেদের থেকে তাঁর বিপুল দূরত্ব অনুভব করতে পারে নি, সাধারণ লোকালয়ের মাঝখানে থেকে তাঁর অলৌকিকত্ব তাদের মনে প্রতিভাত হবার অবকাশ পায় নি। তাই মনে করি, সেদিনকার প্রত্যক্ষ ধাবমান ঘটনাবলীর অস্পষ্টতার মধ্যে তাঁকে যে দেখি নি সে ভালোই হয়েছে। যাঁরা মহাপুরুষ তাঁরা জন্মমুহূর্তেই স্থান

গ্রহণ করেন মহাযুগে, চলমান কালের অতীত কালেই তাঁরা বর্তমান, দূরবিস্তীর্ণ ভাবী কালে তাঁরা বিরাজিত। এ কথা সেদিন বুঝেছিলুম সেই মন্দিরেই। দেখলুম, দূর জাপান থেকে সমুদ্র পার হয়ে একজন দরিদ্র মৎসজীবী এসেছে কোন দুষ্কৃতির অনুশোচনা করতে। সায়াহ্ন উত্তীর্ণ হল নির্জন্ন নিঃশব্দ মধ্যরাত্রিতে, সে একাগ্রমনে করজোড়ে আবৃত্তি করতে লাগল : আমি বুদ্ধের শরণ নিলাম। কত শত শতাব্দী হয়ে গেছে, একদা শাক্যরাজপুত্র গভীর রাত্রে মানুষের দুঃখ দূর করবার সাধনায় রাজপ্রাসাদ ত্যাগ করে বেরিয়েছিলেন; আর সেদিনকার সেই মধ্যরাত্রে জাপান থেকে এল তর্থযাত্রী গভীর দুঃখে তাঁরই শরণ কামনা করে। সেদিন তিনি ঐ পাপপরিতপ্তের কাছে পৃথিবীর সকল প্রত্যক্ষ বস্তুর চেয়ে প্রত্যক্ষতম, অন্তরতম; তাঁর জন্মদিন ব্যাপ্ত হয়ে রয়েছে ঐ মুক্তিকামীর জীবনের মধ্যে। সেদিন সে আপন মনুষ্যত্বের গভীরতম আকাঙ্ক্ষার দীপ্তশিখার সম্মুখে দেখতে পেয়েছে তাঁকে যিনি নরোত্তম। যে বর্তমান কালে ভগবান বুদ্ধের জন্ম হয়েছিল সেদিন যদি তিনি প্রতাপশালী রাজরূপে, বিজয়ী বীররূপেই প্রকাশ পেতেন, তা হলে তিনি সেই বর্তমান কালকে অভিভূত করে সহজে সম্মান লাভ করতে পারতেন; কিন্তু সেই প্রচুর সম্মান আপন ক্ষুদ্র কালসীমার মধ্যেই বিলুপ্ত হত। প্রজা বড়ো করে জানত রাজাকে, নির্ধন জানত ধনীকে,দুর্বল জানত প্রবলকে—কিন্তু মনুষ্যত্বের পূর্ণতাকে সাধনা করছে যে মানুষ সেই স্বীকার করে, সেই অভ্যর্থনা করে মহামানবকে। মানবকর্তৃক মহামানবের স্বীকৃতি মহাযুগের ভূমিকায়। তাই আজ ভগবান বুদ্ধকে দেখছি যথাস্থানে মানবমনের মহাসিংহাসনে মহাযোগের বেদীতে, যার মধ্যে অতীত কালের মহৎপ্রকাশ বর্তমানকে অতিক্রম করে চলেছে। আপনার চিত্তবিকারে আপন চরিত্রের অপূর্ণতায় পীড়িত মানুষ আজও তাঁরই কাছে বলতে আসছে : বুদ্ধের শরণ কামনা করি। এই সুদূর কালে প্রসারিত মানবচিত্তের ঘনিষ্ঠ উপলব্ধিতেই তাঁর যথার্থ আবির্ভাব।

আমরা সাধারণ লোক পরস্পরের যোগে আপনার পরিচয় দিয়ে থাকি; সে পরিচয় বিশেষ শ্রেণীর, বিশেষ জাতির, বিশেষ সমাজের। পৃথিবীতে এমন লোক অতি অল্পই জন্মেছেন যাঁরা আপনাতে স্বতই প্রকাশবান্, যাঁদের আলোক প্রতিফলিত আলোক নয়, যাঁরা সম্পূর্ণ প্রকাশিত আপন মহিমায়, আপনার সত্যে। মানুষের খণ্ড প্রকাশ দেখে থাকি অনেক বড়ো লোকের মধ্যে; তাঁরা জ্ঞানী, তাঁরা বিদ্বান, তাঁরা বীর, তাঁরা রাষ্ট্রনেতা; তাঁরা মানুষকে চালনা করেছেন আপন ইচ্ছামত; তাঁরা ইতিহাসকে সংঘটন করেছেন আপন সংকল্পের আদর্শে। কেবল পূর্ণ মনুষ্যত্বের প্রকাশ তাঁরই, সকল দেশের সকল কালের সকল মানুষকে যিনি আপনার মধ্যে অধিকার করেছেন, যাঁর চেতনা খণ্ডিত হয় নি রাষ্ট্রগত জাতিগত দেশকালের কোনো অভ্যস্ত সীমানায়।

মানুষের প্রকাশ সত্যে। এই সত্য যে কী তা উপনিষদে বলা হয়েছে: আত্মবৎ সর্বভূতেষু য পশ্যতি স পশ্যতি। যিনি সকল জীবকে আপনার মতো করে জানেন তিনিই সত্যকে জানেন। আপনার মধ্যে সত্যকে যিনি এমনি করে জেনেছেন তাঁর মধ্যে মনুষ্যত্ব প্রকাশিত হয়েছে, তিনি আপন মানবমহিমায় দেদীপ্যমান।

যস্তু সর্বাণি ভূতানি আত্মন্যেবানুপশ্যতি
চাত্মানং সর্বভূতেষু ন ততো বিজুগুপ্সতে।

সকলের মধ্যে আপনাকে ও আপনার মধ্যে সকলকে যিনি দেখতে পেয়েছেন, তিনি আর

গোপন থাকতে পারেন না, সকল কালে তাঁর প্রকাশ।

মানুষের এই প্রকাশ জগতে আজ অধিকাংশ লোকের মধ্যে আবৃত। কিছু কিছু দেখা যায়, অনেকখানি দেখা যায় না। পৃথিবীসৃষ্টির আদি যুগে ভূমণ্ডল ঘন বাষ্প-আবরণে আচ্ছন্ন ছিল। তখন এখানে সেখানে উচ্চতম পর্বতের চূড়া অবারিত আলোকের মধ্যে উঠতে পেরেছে। আজকের দিনে তেমনি অধিকাংশ মানুষ প্রচ্ছন্ন, আপন স্বার্থে, আপন অহংকারে, অবরুদ্ধ চৈতন্যে। যে সত্যে আত্মার সর্বত্র প্রবেশ সেই সত্যের বিকাশ তাদের মধ্যে অপরিণত।

মানুষের সৃষ্টি আজও অসম্পূর্ণ হয়ে আছে। এই অসমাপ্তির নিবিড় আবরণের মধ্যে থেকে মানুষের পরিচয় আমরা পেতুম কী করে যদি না মানব সহসা আমাদের কাছে আবির্ভূত হত কোনো প্রকাশবান্ মহাপুরুষের মধ্যে? মানুষের সেই মহাভাগ্য ঘটেছে, মানুষের সত্যস্বরূপ দেদীপ্যমান হয়েছে ভগবান বুদ্ধের মধ্যে, তিনি সকল মানুষকে আপন বিরাট হৃদয়ে গ্রহণ করে দেখা দিয়েছেন। ন ততো বিজুগুপ্সতে—আর তাঁকে গোপন করবে কিসে, দেশকালের কোন্ সীমাবদ্ধ পরিচয়ের অন্তরালে, কোন্ সদ্যপ্রয়োজন—সিদ্ধির প্রলুব্ধতায়?

ভগবান বুদ্ধ তপস্যার আসন থেকে উঠে আপনাকে প্রকাশিত করলেন। তাঁর সেই প্রকাশের আলোকে সত্যদীপ্তিতে প্রকাশ হল ভারতবর্ষের। মানব-ইতিহাসে তাঁর চিরন্তন আবির্ভাব ভারতবর্ষের ভৌগোলিক সীমা অতিক্রম করে ব্যাপ্ত হল দেশে দেশান্তরে। ভারতবর্ষ তীর্থ হয়ে উঠল, অর্থাৎ স্বীকৃত হল সকল দেশের দ্বারা, কেননা বুদ্ধের বাণীতে ভারতবর্ষ সেদিন স্বীকার করেছে সকল মানুষকে। সে কাউকে অবজ্ঞা করে নি, এইজন্যে সে আর গোপন রইল না। সত্যের বন্যায় বর্ণের বেড়া দিলে ভাসিয়ে; ভারতের আমন্ত্রণ পৌঁছল দেশ-বিদেশের সকল জাতির কাছে। এল চীন ব্রহ্মদেশ জাপান, এল তিব্বত মঙ্গোলিয়া। দুস্তর গিরি-সমুদ্র পথ ছেড়ে দিলে অমোঘ সত্যবার্তার কাছে। দূর হতে দূরে মানুষ বলে উঠল, মানুষের প্রকাশ হয়েছে, দেখেছি—মহান্তং পুরুষং তমসঃ পরস্তাৎ। এই ঘোষণাবাক্য অক্ষয় রূপ নিল মরুপ্রান্তরে প্রস্তরমূর্তিতে। অদ্ভুত অধ্যবসায়ে মানুষ রচনা করলে বুদ্ধবন্দনা, মূর্তিতে, চিত্রে, স্তূপে। মানুষ বলেছে, যিনি অলোকসামান্য দুঃসাধ্য সাধন করেই তাঁকে জানাতে হবে ভক্তি। অপূর্ব শক্তির প্রেরণা এল তাদের মনে; নিবিড় অন্ধকারে গুহাভিত্তিতে তারা আঁকল ছবি, দুর্বহ প্রস্তরখণ্ডগুলোকে পাহাড়ের মাথায় তুলে তারা নির্মাণ করলে মন্দির, শিল্পপ্রতিভা পার হয়ে গেল সমুদ্র, অপরূপ শিল্পসম্পদ রচনা করলে, শিল্পী আপনার নাম করে দিলে বিলুপ্ত, কেবল শাশ্বত কালকে এই মন্ত্র দান করে গেল: বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি। জাভাদ্বীপে বরোবুদরে দেখে এলুম সুবৃহৎ স্তূপ পরিবেষ্টন করে শত শত মূর্তি খুদে তুলেছে বুদ্ধের জাতককথার বর্ণনায়; তার প্রত্যেকটিতেই আছে, কারুনৈপুণ্যের উৎকর্ষ, কোথাও লেশমাত্র আলস্য নেই; একে বলে শিল্পের তপস্যা, একই সঙ্গে এই তপস্যা ভক্তির—খ্যাতিলোভহীন নিষ্কাম কৃচ্ছ্রসাধনায় আপন শ্রেষ্ঠশক্তিকে উৎসর্গ করা চিরবরণীয়ের চিরস্মরণীয়ের নামে। কঠিন দুঃখ স্বীকার করে মানুষ আপন ভক্তিকে চরিতার্থ করেছে; তারা বলেছে, যে প্রতিভা নিত্যকালের সর্বমানবের ভাষায় কথা বলে সেই অকৃপণ প্রতিভার চূড়ান্ত প্রকাশ না করতে পারলে কোন্ উপায়ে যথার্থ করে বলা হবে 'তিনি এসেছিলেন সকল মানুষের জন্যে সকল কালের জন্যে'? তিনি মানুষের কাছে

সেই প্রকাশ চেয়েছিলেন, যা দুঃসাধ্য, যা চিরজাগরূক, যা সংগ্রামজয়ী, যা বন্ধনচ্ছেদী। তাই সেদিন পূর্ব মহাদেশের দুর্গমে দুস্তরে বীর্যবান পূজার আকারে প্রতিষ্ঠিত হল তাঁর জয়ধ্বনি, শৈলশিখরে, মরুপ্রান্তরে, নির্জন গুহায়। এর চেয়ে মহত্তর অর্ঘ্য এল ভগবান বুদ্ধের পদমূলে যেদিন রাজাধিরাজ অশোক শিলালিপিতে প্রকাশ করলেন তাঁর পাপ, অহিংস্র ধর্মের মহিমা ঘোষণা করলেন, তাঁর প্রণামকে চিরকালের প্রাঙ্গণে রেখে গেলেন শিলাস্তম্ভে।

এত বড়ো রাজা কি জগতে আর কোনো দিন দেখা দিয়েছে। সেই রাজাকে মাহাত্ম্য দান করেছেন যে গুরু তাঁকে আহ্বান করবার প্রয়োজন আজ যেমন একান্ত হয়েছে এমন সেদিনও হয় নি যেদিন তিনি জন্মেছিলেন এই ভারতে। বর্ণে বর্ণে, জাতিতে জাতিতে, অপবিত্র ভেদবুদ্ধির নিষ্ঠুর মূঢ়তা ধর্মের নামে আজ রক্তে পঙ্কিল করে তুলেছে এই ধরাতল; পরস্পর হিংসার চেয়ে সাংঘাতিক পরস্পর ঘৃণায় মানুষ এখানে পদে পদে অপমানিত। সর্বজীবে মৈত্রীকে যিনি মুক্তির পথ বলে ঘোষণা করেছিলেন সেই তাঁরই বাণীকে আজ উৎকণ্ঠিত হয়ে কামনা করি এই ভ্রাতৃবিদ্বেষকলুষিত হতভাগ্য দেশে। পূজার বেদীতে আবির্ভূত হোন মানবশ্রেষ্ঠ, মানবের শ্রেষ্ঠতাকে উদ্ধার করবার জন্যে। সকলের চেয়ে বড়ো দান যে শ্রদ্ধাদান, তার থেকে কোনো মানুষকে তিনি বঞ্চিত করেন নি। যে দয়াকে , যে দানকে তিনি ধর্ম বলেছেন সে কেবল দূরের থেকে স্পর্শ বাঁচিয়ে অর্থদান নয়, সে দান আপনাকে দান—যে দানধর্মে বলে 'শ্রদ্ধয়া দেয়ম্'। নিজের শ্রেষ্ঠতাভিমান, পুণ্যাভিমান, ধনাভিমান প্রবেশ করে দানকে অপমানকর অধর্মে পরিণত করতে পারে এই ভয়ের কারণ আছে; এইজন্যে উপনিষদ্ বলেন: ভিয়া দেয়ম্। ভয় করে দেবে। যে ধর্মকর্মের দ্বারা মানুষের প্রতি শ্রদ্ধা হারাবার আশঙ্কা আছে তাকেই ভয় করতে হবে। আজ ভারতবর্ষে ধর্মবিধির প্রনালী যোগ মানুষের প্রতি অশ্রদ্ধার পথ চারি দিকে প্রসারিত হয়েছে। এই ভয়ানকত্ব কেবল আধ্যাত্মিক দিকে নয়, রাষ্ট্রীয় মুক্তির দিকে সর্বপ্রধান অন্তরায় হয়েছে এ প্রত্যক্ষ দেখছি। এই সমস্যার কি কোনো দিন সমাধান হতে পারে রাষ্ট্রনীতির পথে কোনো বাহ্য উপায়ের দ্বারা

ভগবান্ বুদ্ধ একদিন রাজসম্পদ ত্যাগ করে তপস্যা করতে বসেছিলেন। সে তপস্যা সকল মানুষের দুঃখমোচনের সংকল্প নিয়ে। এই তপস্যার মধ্যে কি অধিকারভেদ ছিল ? কেউ ছিল কি ম্লেচ্ছ ? কেউ ছিল কি অনার্য ? তিনি তাঁর সব-কিছু ত্যাগ করেছিলেন দীনতম মূর্খতম মানুষেরও জন্যে। তাঁর সেই তপস্যার মধ্যে ছিল নির্বিচারে সকল দেশের সকল মানুষের প্রতি শ্রদ্ধা। তাঁর সেই এত বড়ো তপস্যা আজ কি ভারতবর্ষ থেকে বিলীন হবে ?

জিজ্ঞাসা করি, মানুষে মানুষে বেড়া তুলে দিয়ে আমরা কি পেরেছি ঠেকাতে ? ছিল আমাদের পরিপূর্ণ ধনের ভান্ডার; তার দ্বার, তার প্রাচীর, বাইরের আঘাতে ভেঙে পড়ে নি কি ? কিছু কি তার অবশিষ্ট আছে ? আজ প্রাচীরের পর প্রাচীর তুলেছি মানুষের প্রতি আত্মীয়তাকে অবরুদ্ধ করে, আজ দেবতার মন্দিরের দ্বারে পাহারা বসিয়েছি দেবতার অধিকারকেও কৃপণের মতো ঠেকিয়ে রেখে। দানের দ্বারা, ব্যায়ের দ্বারা, যে ধনের অপচয় হয় তাকে বাঁচাতে পারলুম না; কেবল দানের দ্বারা যার ক্ষয় হয় না, বৃদ্ধি হয়, মানুষের প্রতি সেই শ্রদ্ধাকে সাম্প্রদায়িক সিন্দুকের মধ্যে তালা বন্ধ করে রাখলুম। পুণ্যের ভান্ডার বিষয়ীর ভান্ডারের মতোই আকার ধরল। একদিন যে ভারতবর্ষ মানুষের প্রতি

শ্রদ্ধার দ্বারা সমস্ত পৃথিবীর কাছে আপন মনুষ্যত্ব উজ্জ্বল করে তুলেছিল আজ সে আপন পরিচয়কে সংকুচিত করে এনেছে; মানুষকে অশ্রদ্ধা করেই সে মানুষের অশ্রদ্ধাভাজন হল। আজ মানুষ মানুষের বিরুদ্ধ হয়ে উঠেছে; কেননা মানুষ আজ সত্যভ্রষ্ট, তার মনুষ্যত্ব প্রচ্ছন্ন। তাই আজ সমস্ত পৃথিবী জুড়ে মানুষের প্রতি মানুষের এত সন্দেহ, এত আতঙ্ক, এত আক্রোশ। তাই আজ মহামানবকে এই বলে ডাকবার দিন এসেছে: তুমি আপনার প্রকাশের দ্বারা মানুষকে প্রকাশ করো।

ভগবান্ বুদ্ধ বলেছেন, অক্রোধের দ্বারা ক্রোধকে জয় করবে। কিছুদিন পূর্বেই পৃথিবীতে এক মহাযুদ্ধ হয়ে গেল। এক পক্ষের জয় হল, সে জয় বাহুবলের। কিন্তু যেহেতু বাহুবল মানুষের চরম বল নয়, এইজন্যে মানুষের ইতিহাসে সে জয় নিষ্ফল হল, সে জয় নূতন যুদ্ধের বীজ বপন করে চলেছে। মানুষের শক্তি অক্রোধ, ক্ষমাতে, এই কথা বুঝতে দেয় না সেই পশু যে আজও মানুষের মধ্যে মরে নি। তাই মানবের সত্যের প্রতি শ্রদ্ধা করে মানবের গুরু বলেছেন: ক্রোধকে জয় করবে অক্রোধের দ্বারা, নিজের ক্রোধকে এবং অন্যের ক্রোধকে। এ না হলে মানুষ ব্যর্থ হবে, যেহেতু সে মানুষ। বাহুবলের সাহায্যে ক্রোধকে প্রতিহিংসাকে জয়ী করার দ্বারা শান্তি মেলে না, ক্ষমাই আনে শান্তি, এ কথা মানুষ আপন রাষ্ট্রনীতিতে সমাজনীতিতে যতদিন স্বীকার করতে না পারবে ততদিন অপরাধীর অপরাধ বেড়ে চলবে; রাষ্ট্রগত বিরোধের আগুন কিছুতে নিভবে না; জেলখানার দানবিক নিষ্ঠুরতায় এবং সৈন্যনিবাসের সশস্ত্র ভ্রূকুটিবিক্ষেপে পৃথিবীর মর্মান্তিক পীড়া উত্তরোত্তর দুঃসহ হতে থাকবে—কোথাও এর শেষ পাওয়া যাবে না। পাশবতার সাহায্যে মানুষের সিদ্ধিলাভের দুরাশাকে যিনি নিরস্ত করতে চেয়েছিলেন, যিনি বলেছিলেন "অক্কোধেন জিনে কোধং", আজ সেই মহাপুরুষকে স্মরণ করে মনুষ্যত্বের জগদ্ব্যাপী এই অপমানের যুগে বলবার দিন এল: বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি। তাঁরই শরণ নেব যিনি আপনার মধ্যে মানুষকে প্রকাশ করেছেন। যিনি সেই মুক্তির কথা বলেছেন, যে মুক্তি নঙর্থক নয়, সদর্থক; যে মুক্তি কর্মত্যাগে নয়, সাধুকর্মের মধ্যে আত্মত্যাগে; যে মুক্তি রাগদ্বেষবর্জনে নয়, সর্বজীবনের প্রতি অপরিমেয় মৈত্রীসাধনায়। আজ স্বার্থক্ষুধান্ধ বৈশ্যবৃত্তির নির্মম নিঃসীম লুব্ধতার দিনে সেই বুদ্ধের শরণ কামনা করি যিনি আপনার মধ্যে বিশ্বমানবের সত্যরূপ প্রকাশ করে আবির্ভূত হয়েছিলেন।

র/১১/৪৬৭-৪৭৩

টীকা :

বুদ্ধদেব—গৌতম বুদ্ধ, পূর্বনাম সিদ্ধার্থ, শাক্যবংশের রাজপুত্র ছিলেন। বৌদ্ধধর্মের প্রবর্তন করেন। আনুমানিক ৫৬৩ খৃষ্ট-পূর্বাব্দে জন্ম, আনুমানিক ৪৮৩ খৃষ্ট-পূর্বাব্দে মহাপরিনির্বাণ।

১৫২। নমস্কার,
৩ আগষ্ট ১৯৩৫ (১৩৪২)

প্রভু,
সৃষ্টিতে তব আনন্দ আছে

মমত্ব নাই তবু,
ভাঙায় গড়ায় সমান তোমার লীলা।
তব নির্ঝরধারা
যে-বারতা বহি সাগরের পানে
চলেছে আত্মহারা
প্রতিবাদ তারি করিছে তোমার শিলা।
দোঁহার এ দুই বাণী,
ওগো উদাসীন, আপনার মনে
সমান নিতেছে মানি;
সকল বিরোধ তাই তো তোমায়
চরমে হারায় বাণী।

বর্তমানের ছবি
দেখি যবে, দেখি, নাচে তার বুকে
ভৈরব ভৈরবী।
তুমি কী দেখিছ তুমিই তা জান
নিত্যকালের কবি—
কোন্ কালিমার সমুদ্রকূলে
উদয়াচলের রবি।

বুঝিছে মন্দ ভালো।
তোমার অসীম দৃষ্টিক্ষেত্রে
কালো সে রয় না কালো।
অঙ্গার সে তো তোমার চক্ষে
ছদ্মবেশের আলো।

দুঃখ লজ্জা ভয়
ব্যাপিয়া চলেছে উগ্র যাতনা
মানববিশ্বময়;
সেই বেদনায় লভিছে জন্ম
বীরের বিপুল জয়।
হে কঠোর, তুমি সম্মান দাও,
দাও না তো প্রশ্রয়।

তপ্ত পাত্র ভরি
প্রসাদ তোমার রুদ্র জ্বালায়
দিয়েছ অগ্রসরি,—
যে আছে দীপ্ত তেজের পিপাসু
নিক তাহা পান করি।

নিঠুর পীড়নে যাঁর
তন্দ্রাবিহীন কঠিন দণ্ডে

মথিছে অন্ধকার,
তুলিছে আলোড়ি অমৃত জ্যোতি,
তাঁহারে নমস্কার।

বীথিকা, র/৩/৩২৯-৩০

১৫৩। হেমন্তবালাদেবীকে পত্র-১৫

১৯ অক্টোবর ১৯৩৫

...তোমার ধর্মদীক্ষা তোমার সংসারকে এবং উপাস্যকে পরস্পর প্রতিদ্বন্দী করে দিয়েছে—একটাকে ত্যাগ না করলে তুমি স্থিতির আশা করতে পার না। আমি দুটোর মধ্যে সামঞ্জস্য করতে চাই আপন স্বভাবেরই প্রবর্ত্তনায়। এই আমার চারদিকেই সকল সম্বন্ধের মধ্যেই যেখানেই সুন্দরকে দেখি, যেখানেই কল্যাণের সাধনা করি সেখানেই আমার মর্ত্তে অমর্ত্ত্য এক হয়ে যায় সত্যের মধ্যে আত্মবিচ্ছেদ নেই, সত্য সব নিয়ে এক। মর্ত্ত্যজগৎ শয়তানের সৃষ্টি নয়, আমারও ঘরের বানানো নয়, সে সেই মহাসত্যেরই অন্তর্গত যার মধ্যে তুমি সংসারাতীতকে খুঁজে বেড়াচ্চ। পরমার্থসাধনাকে অশুচি করা হয় যখন সত্যের কোনো অংগকে অশুচি কল্পনা করে ঘৃণার অন্ধ সংস্কার রচনা করো। অশুচিতা আমাদের নিজের বিকৃতিতে। পরমার্থচিন্তাকেও আমরা অশুচি করি যখন তার মধ্যে অহংকার আসে, অন্ধতা আসে, ভেদবুদ্ধি দেখা যায়। সংসারও পবিত্র, স্বয়ং পরমাত্মার আনন্দরূপ, যখন তাকে সেই ভাবে দেখতে পারি। শুচিতা জলে মাটিতে অশনে বসনে মন্ত্রে তন্ত্রে নেই—শুচিতা অন্তরপ্রকৃতিতে—যেহেতু মানুষ মুখ্যত: আধ্যাত্মিক। যিশুখৃষ্ট এই কথাই বলেছেন, ভগবান বুদ্ধেরও এই উপদেশ। ভগবদ্‌গীতায় শ্রীকৃষ্ণ তাই বলেন যখন যজ্ঞকে তিনি বাহ্য উপকরণগত না বলে বলেছেন আন্তরিক। সত্যই যজ্ঞ, দান যজ্ঞ, জীবে দয়া যজ্ঞ, সর্ব মানুষে মৈত্রী যজ্ঞ। যেখানে সত্য নেই, দয়া নেই, চিত্তের নির্মলতা নেই আছে পূজা অর্চনা, আছে ভক্তিরসের সম্ভোগ সেখানে আধ্যাত্মিকতা আত্মপ্রবঞ্চনা। বিধাতার জগৎকে অবিশ্বাস কোরো না, ঘৃণা কোরো না, তিনি পৃথক একটা স্বর্গ সৃষ্টি করে নিজের পরিপূর্ণ সত্যের মধ্যে বিরোধ বাধান নি। সব কিছুতে আনন্দিত হও, সবাইকে আনন্দিত করার সাধনা করো, এতেই মুক্তির স্বাদ।...

চিঠিপত্র-৯, পৃ.৩০৪-০৫

১৫৪। হেমন্তবালা দেবীকে পত্র-১৬

২৮ ডিসেম্বর ১৯৩৫

...সমস্ত পৃথিবীর মধ্যে একমাত্র ভারতবর্ষেই ভগবানকে পূজার ক্ষেত্রে জাতের বেড়ায় বিভক্ত করা হয়েছে— অর্থাৎ যেখানে শত্রুরাও মেলবার অধিকার রাখে হিন্দুরা সেখানেও মিলতে পারে না। এই মর্মান্তিক বিচ্ছেদে হিন্দুরা পদে পদে পরাভূত। তারা সর্বজনের ঈশ্বরকে খর্ব করে নিজেদেরই পংগু করেছে—তাদের এই নিত্যধর্মবিরোধী

আত্মঘাতী আচরণকে দেশের হিতাকাঙ্ক্ষীরা কখনোই শ্রেয় বলে স্বীকার করতে পারে না। বাংলাদেশে আজ যে মুসলমানের সংখ্যা এত অত্যন্ত বেশি, তার কারণ ঘটিয়েছে সনাতনীরা, আমি যখন জমিদারী পরিদর্শনে মফস্বলে যেতুম প্রতিদিন তার প্রমাণ পেয়েছি। মানুষকে হিন্দুসমাজ অবমাননার দ্বারা দূর করে দিয়েছি, সকলের চেয়ে লজ্জার বিষয় এই যে সেই অবমাননা ধর্মের নামেই। সনাতনীরা নিত্যধর্মবিদ্রোহী। মুসলমানের কাছে একদিন তারা হয়েছে আবার হারবে। মুসলমানের আর যত দোষ থাক তারা ঈশ্বরকে খন্ডিত করে নি, তাদের ধর্মের বিধানেই তাদের ঐক্য। আমাদের ধর্মের বিধানেই আমাদের অনৈক্য। এই অনৈক্যের ফাটল দিয়েই বহুশতাব্দী ধরে আমাদের শক্তি গেল বহিঃসৃত হয়ে। সনাতনীরা যদি এই অন্ধ সংস্কারের ভেদবুদ্ধিকেই, এই নরনারায়ণের অবমাননাকেই ধর্মের অনুশাসন ব'লে আঁকড়ে ধরে থাকে তাহলে স্বদেশের মুক্তির সাধকেরা কদাচ তাদের এই আত্মবিনাশের পন্থাকে শ্রদ্ধা করতে পারে না। বিদেশী যারা বাহির থেকে আমাদের হাতে হাতকড়ি লাগিয়েছে, ভিতর থেকে হিন্দুরা নিজের হাতে তাদের চেয়ে আরও বেশি কড়া শিকল এঁটে দিয়ে সেই শিকলকে ফুলচন্দন দিয়ে পূজো করচে।...

চিঠিপত্র-৯,পৃ. ৩০৯-১১

১৫৫। ওরা অন্ত্যজ, ওরা মন্ত্রবর্জিত :

পত্রপুটের পনেরো সংখ্যক কবিতা

১৮ বৈশাখ, ১৩৪৩ (১৯৩৬)

ওরা অন্ত্যজ, ওরা মন্ত্রবর্জিত।
দেবালয়ের মন্দিরদ্বারে
পূজা-ব্যবসায়ী ওদের ঠেকিয়ে রাখে।
ওরা দেবতাকে খুঁজে বেড়ায় তাঁর আপন স্থানে
সকল বেড়ার বাইরে
সহজ ভক্তির আলোকে,
নক্ষত্রখচিত আকাশে,
পুষ্পখচিত বনস্থলীতে,
দোসর-জনার মিলন-বিরহের
গহন বেদনায়।
যে দেখা বানিয়ে-দেখা বাঁধা ছাঁচে,
প্রাচীর ঘিরে, দুয়ার তুলে,
সে দেখার উপায় নেই তাদের হাতে।
কতদিন দেখেছি ওদের সাধককে
একলা প্রভাতের রৌদ্রে সেই পদ্মানদীর ধারে,
যে নদীর নেই কোনো দ্বিধা
পাকা দেউলের পুরাতন ভিত ভেঙে ফেলতে।

দেখেছি একতারা-হাতে চলেছে গানের ধারা বেয়ে
মনের মানুষকে সন্ধান করবার
গভীর নির্জন পথে।
কবি আমি ওদের দলে—
আমি ব্রাত্য, আমি মন্ত্রহীন,
দেবতার বন্দীশালায়
আমার নৈবেদ্য পৌঁছল না।...
এমন করে দিন গেল;
আজ আপন মনে ভাবি,
"কে আমার দেবতা,
কার করেছি পূজা।"
শুনেছি যাঁর নাম মুখে মুখে,
পড়েছি যাঁর কথা নানা ভাষায় নানা শাস্ত্রে,
কল্পনা করেছি তাঁকেই বুঝি মানি।
তিনিই আমার বরণীয় প্রমাণ করব বলে
পূজার প্রয়াস করেছি নিরন্তর।
আজ দেখেছি প্রমাণ হয় নি আমার জীবনে।
কেননা, আমি ব্রাত্য, আমি মন্ত্রহীন।
মন্দিরের রুদ্ধ দ্বারে এসে আমার পূজা
বেরিয়ে চলে গেল দিগন্তের দিকে—
সকল বেড়ার বাইরে,
নক্ষত্রখচিত আকাশতলে,
পুষ্পখচিত বনস্থলীতে,
দোসর-জনার মিলন-বিরহের
বেদনা-বন্ধুর পথে।
বালক ছিলেম যখন
পৃথিবীর প্রথম জন্মদিনের আদি মন্ত্রটি
পেয়েছি আপন পুলককম্পিত অন্তরে,
আলোর মন্ত্র।
পেয়েছি নারকেল-শাখার ঝালর-ঝোলা
আমার বাগানটিতে,
ভেঙে-পড়া শ্যাওলা-ধরা পাঁচিলের উপর
একলা বসে।
প্রথম প্রাণের বহ্নি-উৎস থেকে
নেমেছে তোজোময়ী লহরী,
দিয়েছে আমার নাড়ীতে
অনির্বচনীয়ের স্পন্দন।

আমার চৈতন্যে গোপনে দিয়েছে নাড়া
অনাদিকালের কোন্ অস্পষ্ট বার্তা,
প্রাচীন সূর্যের বিরাট বাষ্পদেহে বিলীন
আমার অব্যক্ত সত্তার রশ্মিস্ফুরণ।
হেমন্তের রিক্তশস্য প্রান্তরের দিকে চেয়ে
আলোর নিঃশব্দ চরণধ্বনি
শুনেছি আমার রক্তচাঞ্চল্যে।
সেই ধ্বনি আমার অনুসরণ করেছে
জন্মপূর্বের কোন্ পুরাতন কালযাত্রা থেকে।
বিস্ময়ে আমার চিত্ত প্রসারিত হয়েছে অসীম কালে
যখন ভেবেছি
সৃষ্টির আলোকতীর্থে
সেই জ্যোতিতে আজ আমি জাগ্রত
যে জ্যোতিতে অযুত নিযুত বৎসর পূর্বে
সুপ্ত ছিল আমার ভবিষ্যৎ।
আমার পূজা আপনিই সম্পূর্ণ হয়েছে প্রতিদিন
এই জাগরণের আনন্দে।
আমি ব্রাত্য, আমি মন্ত্রহীন,
রীতিবন্ধনের বাহিরে আমার আত্মবিস্মৃত পূজা
কোথায় হল উৎসৃষ্ট জানতে পারি নি।...
...জন্মেছিলেম অনাচারের অনাদৃত সংসারে,
চিহ্ন-মোছা, প্রাচীরহারা।
প্রতিবেশীর পাড়া ছিল ঘন বেড়ায় ঘেরা,
আমি ছিলেম বাইরের ছেলে, নাম-না-জানা।
ওদের ছিল তৈরি বাসা, ভিড়ের বাসা—
ওদের বাঁধা পথের আসা-যাওয়া
দেখেছি দূরের থেকে
আমি ব্রাত্য, আমি পঙ্ক্তিহারা।...
দলের উপেক্ষিত আমি,
মানুষের মিলন-ক্ষুধায় ফিরেছি,
যে মানুষের অতিথিশালায়
প্রাচীর নেই, পাহারা নেই।
লোকালয়ের বাইরে পেয়েছি আমার নির্জনের সঙ্গী
যারা এসেছে ইতিহাসের মহাযুগে
আলো নিয়ে, অস্ত্র নিয়ে, মহাবাণী নিয়ে।...
মানুষকে গন্ডির মধ্যে হারিয়েছি,
মিলেছে তার দেখা
দেশবিদেশের সকল সীমানা পেরিয়ে।

তাকে বলেছি হাত জোড় করে—
হে চিরকালের মানুষ, হে সকল মানুষের মানুষ,
পরিত্রাণ করো
ভেদচিহ্নের-তিলক-পরা
সংকীর্ণতার ঔদ্ধত্য থেকে।
হে মহান্ পুরুষ, ধন্য আমি, দেখেছি তোমাকে
তামসের পরপার হতে
আমি ব্রাত্য, আমি জাতিহারা।

একদিন বসন্তে নারী এল সঙ্গীহারা আমার বনে
প্রিয়ার মধুর রূপে।
এল সুর দিতে আমার গানে,
নাচ দিতে আমার ছন্দে,
সুধা দিতে আমার স্বপ্নে। . . .

ভালবেসেছি তাকে।
সেই ভালবাসার একটা ধারা
ঘিরেছে তাকে স্নিগ্ধ বেষ্টনে
গ্রামের চিরপরিচিত অগভীর নদীটুকুর মতো। . .

আমার ভালোবাসার আর-একটা ধারা
মহাসমুদ্রের বিরাট ইঙ্গিত-বাহিনী।
মহীয়সী নারী স্নান করে উঠেছে
তারই অতল থেকে।
সে এসেছে অপরিসীম ধ্যানরূপে
আমার সর্ব দেহে মনে,
পূর্ণতর করেছে আমাকে, আমার বাণীকে।
জ্বেলে রেখেছে আমার চেতনার নিভৃত গভীরে
চিরবিরহের প্রদীপশিখা।

আমার গানের মধ্যে সঞ্চিত হয়েছে দিনে দিনে
সৃষ্টির প্রথম রহস্য, আলোকের প্রকাশ,
আর সৃষ্টির শেষ রহস্য, ভালোবাসার অমৃত।
আমি ব্রাত্য, আমি মন্ত্রহীন,
সকল মন্দিরের বাহিরে
আমার পূজা আজ সমাপ্ত হল
দেবলোক থেকে
মানবলোকে,
আকাশে জ্যোতির্ময় পুরুষে

আর মনের মানুষে আমার অন্তরতম আনন্দে।

পত্রপুট, র/৩/৩৭৬-৮১

বিষয়-সংকেত ঃ 'আমার পূজা'। দুই সত্য: নারী বা ভালোবাসা এবং সৃষ্টি বা প্রকাশ।

তুলনীয় প্রসঙ্গ ঃ ক্ষিতিমোহন সেন সম্পাদিত 'দাদূ'-র ভূমিকা (১২0)

১৫৬ । The Religion of an Artist-1

১৯৩৬

...My religion is essentially a poet's religion. Its touch comes to me through the same unseen and trackless channels as does the inspiration of my music. My religious life has followed the same mysterious line of growth as has my poetical life. Somehow they are wedded to each other, and though their betrothal had a long period of ceremony,it was kept secret from me. I am not, I hope, boasting when I confess to my gift of poesy, an instrument of expression delicately responsive to the breath that comes from depth of feeling. From my infancy I had the keen sensitiveness which always kept my mind tingling with consciousness of the world around me, natural and human.

I had been blessed with that sense of wonder which gives a child his right of entry into the treasure-house of mystery which is in the heart of existence. I neglected my studies because they rudely summoned me away from the world around me, which was my friend and my companion, and when I was thirteen I freed myself from the clutch of an educational system that tried to keep me imprisoned within the stone-walls of lessons.

I had a vague notion as to who or what it was that touched my heart's chords, like the infant which does not know its mother's name, or who or what she is. The feeling which I always had was a deep satisfaction of personality that flowed into my nature through living channels of communication from all sides.

It was a great thing for me that my consciousness was never dull about the facts of the surrounding world. That the cloud was the cloud, that a flower was a flower, was enough, because they directly spoke to me, because I could not be indifferent to then. I still

remember the very moment, one afternoon, when coming back from school I alighted from the carriage and suddenly saw in the sky, behind the upper terrace of our house, an exuberance of deep, dark rain-clouds lavishing rich, cool shadows on the atmosphere. The marvel of it, the very generosity of its presence, gave me a joy which was freedom, the freedom we feel in the love of our dear friend....

The Religion of An Artist (Visva-Bharati, 1953), pp. 15-17

টীকা :

The Religion of An Artist—রবীন্দ্রনাথ ১৯২৪ সালে চীনে কবির ধর্ম বিষয়ে একটি বক্তৃতা দেন। পরে এটি Talks in China (Visva-Vharati, 1925) গ্রন্থে গৃহীত হয়। অনেকটা অনুরূপ বিষয়ে আর-একটি বক্তৃতা দেন ১৯২৬ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। এই বক্তৃতা Meaning of Art নামে Visva-Bharati Quarterly, April 1926 সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। ১০ বছর পরে পরিবর্তিত আকারে প্রবন্ধদুটি একসংগে রাধাকৃষ্ণন সম্পাদিত Contemporary Indian Philosophy (1936) গ্রন্থে প্রকাশিত হয় 'The Religion of An Artist' নামে। এটিকে কার্যত নতুন লেখা বলে ধরা যায়। সেই হিসেবে ১৯৩৬ সালকেই এই প্রবন্ধের রচনাকাল বলে ধরা হয়েছে। অনেক পরে ১৯৫৩ সালে বিশ্বভারতী এই রচনাটিকে স্বতন্ত্র পুস্তিকার আকারে প্রকাশ করে। এখানে আমাদের আকর বিশ্বভারতী কর্তৃক প্রকাশিত পুস্তিকা।

১৫৭ । The Religion of an Artist-2

১৯৩৬

...Mere information of facts, mere discovery of power, belongs to the outside and not to the inner soul of things. gladness is the one criterion of truth as we know when we have touched Truth by the music it gives, by the joy of the greeting it sends forth to the truth in us. That is the true foundation of all religions; it is not in dogma. As I have said before, it is not as ether waves that we receive light ; the morning does not wait for some scientist for its introduction to us. In the same way, we touch the infinite reality immediately within us only when we perceive the pure truth of love or goodness, not through the explanation of theologians, not through the erudite discussion of ethical doctrines.

I have already confessed that my religion is a poet's religion; all that I feel about it is from vision and not from knowledge. I frankly say that I cannot satisfactorily answer questions about the problem of evil, or about what happens after death. And yet I am sure that there have come moments when my soul has touched the infinite and has become intensely conscious of it through the illumination of joy. It has been said in our Upanishads that our mind and our words come away beffled from the supreme Truth, but he who knows That, through the immediate joy of his own soul, is saved from all doubts and fears.

In the night we stumble over things and become acutely conscious of their individual separateness, but the day reveals the great unity which embraces them. And the man, whose inner vision is bathed in an illumination of his consciousness, at once realizes the spiritual unity reigning supreme over all differences of race and his mind no longer awkwardly stumbles over individual facts of separateness in the human world, accepting them as final ; he realizes that peace is in the inner harmony which dwells in truth, and not in any outer adjustments ; and that beauty carries an eternal assurance of our spiritual relationship to reality, which waits for its perfection in the response of our love.

The Religion of an Artist, p 17-18

১৫৮ । The Religion of an Artist-3

১৯৩৬

...This living atmosphere of superfluity in man is dominated by his imagination, as the earth's atmosphere by the light. It helps us to integrate desultory facts in a vision of harmony and then to translate it into our activities for the very joy of its perfection, it invokes in us the Universal Man who is the seer and the doer of all times and countries. The immediate consciousness of reality in its purest form, unobscured by the shadow of self-interest, irrespective of moral or utilitarian recommendation, gives us joy as does the self-revealing personality of our own. What in common language we call beauty, which is in harmony of lines, colours, sounds, or in

grouping of words or thoughts, delights us only becausse we cannot helps admitting a truth in it that is ultimate. "Love is enough", the poet has said ; it carries its own explanation, the joy of which can only be expressed in a form of art which also has that finality. Love given evidence to something which is outside us but which intensely existence. It radiantly reveals the reality of its objects, though these may lack qualities that are valuable or brilliant. ...

The Religion of an Artist, p 19-20

১৫৯। প্রান্তিক-৬ নং কবিতা

শান্তিনিকেতন, ৪/১০/৩৭

মুক্তি এই—সহজে ফিরিয়া আসা সহজের মাঝে,
নহে কৃচ্ছ্রসাধনায় ক্লিষ্ট কৃশ বঞ্চিত প্রাণের
আত্ম—অস্বীকারে। রিক্ততায় নিঃস্বতায়, পূর্ণতার
প্রেতচ্ছবি ধ্যান করা অসম্মান জগৎলক্ষ্মীর।
আজ আমি দেখিতেছি, সম্মুখে মুক্তির পূর্ণরূপ
ওই বনস্পতিমাঝে, ঊর্ধ্বে তুলি ব্যগ্র শাখা তার
শরৎপ্রভাতে আজি স্পর্শিছে সে মহা- অলক্ষ্যেরে
কম্পমান পল্লবে পল্লবে, লভিল মজ্জার মাঝে
সে মহা-আনন্দ যাহা পরিব্যাপ্ত লোকে লোকান্তরে,
বিচ্ছুরিত সমীরিত আকাশে আকাশে, স্ফুটোন্মুখ
পুষ্পে পুষ্পে, পাখিদের কণ্ঠে কণ্ঠে স্বত উৎসারিত।
সন্ন্যাসীর গৈরিক বসন লুকায়েছে তৃণতলে
সর্ব-আবর্জনাগ্রাসী বিরাট ধূলায়, জপমন্ত্র
মিলে গেছে পতঙ্গগুঞ্জনে। অনিঃশেষ যে-তপস্যা
প্রাণরসে উচ্ছ্বসিত, সব দিতে সব নিতে
যে বাড়ালো কমণ্ডলু দ্যুলোকে ভূলোকে, তারি বর
পেয়েছি অন্তরে মোর, তাই সর্ব দেহমন প্রাণ
সূক্ষ্ম হয়ে প্রসারিল আজি ঐ নিঃশব্দ প্রান্তরে
ছায়ারৌদ্রে হেথাহোথা যেথায় রোমন্থরত ধেনু
আলস্যে শিথিল-অঙ্গ, তৃপ্তিরসসম্ভোগ তাদের
সঞ্চারিছে ধীরে মোর পুলকিত সত্তার গভীরে।
দলে দলে প্রজাপতি রৌদ্র হতে নিতেছে কাঁপায়ে
নীরব আকাশবাণী শেফালির কানে কানে বলা,
তাহারি বীজন আজি শিরায় শিরায় রক্তে মোর
মৃদু স্পর্শে শিহরিত তুলিছে হিল্লোল।

হে সংসার,
আমাকে বারেক ফিরে চাও ; পশ্চিমে যাবার মুখে
বর্জন কোরো না মোরে উপেক্ষিত ভিক্ষুকের মতো।
জীবনের শেষপাত্র উচ্ছলিয়া দাও পূর্ণ করি,
দিনান্তের সর্বদানযজ্ঞে যথা মেঘের অঞ্জলি
পূর্ণ করি দেয় সন্ধ্যা, দান করি চরম আলোর
অজস্র ঐশ্বর্যরাশি সমুজ্জ্বল সহস্ররশ্মির—
সর্বহর আঁধারের দস্যুবৃত্তি ঘোষণার আগে।

প্রান্তিক, র/৩/৫৩৮

১৬০। সম্মুখে শান্তি পারাবার

৩ ডিসেম্বর ১৯৩৯

সম্মুখে শান্তিপারাবার
ভাসাও তরণী হে কর্ণধার।
তুমি হবে চিরসাথি,
লও লও হে ক্রোড়পাতি,
অসীমের পথে জ্বলিবে জ্যোতি
ধ্রুবতারকার।
মুক্তিদাতা, তোমার ক্ষমা, তোমার দয়া
হবে চিরপাথেয় চিরযাত্রার।
হয় যেন মর্ত্যের বন্ধন ক্ষয়,
বিরাট বিশ্ব বাহু মেলি লয়,
পায় অন্তরে নির্ভয় পরিচয়
মহা-অজানার।

শেষলেখা, র/৩/৮৯৫

১৬১। রোগশয্যায়-২১ নং কবিতা

২৪ নভেম্বর ১৯৪০(১৩৪৭)

সকালে জাগিয়া উঠি
ফুলদানে দেখিনু গোলাপ;
প্রশ্ন এল মনে—
যুগ-যুগান্তের আবর্তনে
সৌন্দর্যের পরিণামে যে শক্তি তোমারে আনিয়াছে

অপূর্ণের কুৎসিতের প্রতি পদে পীড়ন এড়ায়ে,
সে কি অন্ধ, সে কি অন্যমনা,
সেও কি বৈরাগ্যব্রতী সন্ন্যাসীর মতো
সুন্দরে ও অসুন্দরে ভেদ নাহি করে—
শুধু জ্ঞানক্রিয়া, শুধু বলক্রিয়া তার,
বোধের নাইকো কোনো কাজ?
কারা তর্ক করে বলে, সৃষ্টির সভায়
সুশ্রী কুশ্রী বসে আছে সমান আসনে—
প্রহরীর কোনো বাধা নাই।
আমি কবি তর্ক নাহি জানি,
এ বিশ্বেরে দেখি তার সমগ্র স্বরূপে—
লক্ষকোটি গ্রহতারা আকাশে আকাশে
বহন করিয়া চলে প্রকাণ্ড সুষমা,
ছন্দ নাহি ভাঙে তার সুর নাহি বাধে,
বিকৃতি না ঘটায় স্খলন;
ঐ তো আকাশে দেখি স্তরে স্তরে পাপড়ি মেলিয়া
জ্যোতির্ময় বিরাট গোলাপ।

রোগশয্যায় র/৩/৮০১

১৬২। মালিনী (সূচনা)

১৯৪০

...কবিতার মর্মকথাটি প্রথম থেকেই যদি রচনার মধ্যে জেনেশুনে বপন করা না হয়ে থাকে তবে কবির কাছেও সেটা প্রত্যক্ষ হয়ে উঠতে দেরি লাগে। আজ আমি জানি মালিনীর মধ্যে কী কথাটি লিখতে লিখতে উদ্ভাবিত হয়ে ছিল গৌণরূপে ঈষৎগোচর। আসল কথা, মনের একটা সত্যকার বিস্ময়ের আলোড়ন ওর মধ্যে দেখা দিয়েছে।

আমার মনের মধ্যে ধর্মের প্রেরণা তখন গৌরীশংকরের উত্তুংগ শিখরে শুভ্র নির্মল তুষারপুঞ্জের মতো নির্মল নির্বিকল্প হয়ে স্তব্ধ ছিল না, সে বিগলিত হয়ে মানবলোকে বিচিত্র মংগলরূপে মৈত্রীরূপে আপনাকে প্রকাশ করতে আরম্ভ করেছে। নির্বিকার তত্ত্ব নয় সে, মূর্তিশালার মাটিতে পাথরে নানা অদ্ভুত আকার নিয়ে মানুষকে সে হতবুদ্ধি করতে আসে নি। কোনো দৈববাণীকে সে আশ্রয় করে নি। সত্য যার স্বভাবে, যে মানুষের অন্তরে অপরিমেয় করুণা, তার অন্তঃকরণ থেকে এই পরিপূর্ণ মানব-দেবতার আবির্ভাব অন্য মানুষের চিত্তে প্রতিফলিত হতে থাকে। সকল আনুষ্ঠানিক সকল পৌরাণিক ধর্মজটিলতা ভেদ করে তবেই এর যথার্থ স্বরূপ প্রকাশ হতে পারে।

আমার এ মতের সত্যাসত্য আলোচ্য নয়। বক্তব্য এই যে, এই ভাবের উপরে মালিনী

স্বতই নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছে; এরই যা দুঃখ, এরই যা মহিমা, সেইটেতেই এর কাব্যরস। এই ভাবের অঙ্কুর আপনাআপনি দেখা দিয়েছিল 'প্রকৃতির প্রতিশোধ'এ, সে-কথা ভেবে দেখবার যোগ্য। নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গে হয়তো তারও আছে এর আভাস পাওয়া যায়।

মালিনী, র/৫/৪৮৬

টীকা ঃ

মালিনী—মালিনী আশ্বিন ১৩০৩ (১৮৯৬)-তে কাব্যগ্রন্থাবলীর অন্তর্গত হয়ে প্রথম প্রকাশিত হয়। অনেক পরে, ১৩৪৭ সালে (১৯৪০) বিশ্বভারতীর রচনাবলী প্রকাশের কালে রবীন্দ্রনাথ মালিনী নাটকটিতে একটি সূচনা যুক্ত করে দেন। এই রচনাটি সেই সূচনার শেষের অংশ।

১৬৩। আরোগ্য-২ নং কবিতা

১২ জানুয়ারী ১৯৪১ (১৩৪৮)

পরম সুন্দর
আলোকের স্নানপুণ্য প্রাতে।
অসীম অরূপ
রূপে রূপে স্পর্শমণি
রসমূর্তি করিছে রচনা,
প্রতিদিন
চিরনূতনের অভিষেক
চিরপুরাতন বেদিতলে।
মিলিয়া শ্যামলে নীলিমায়
ধরণীর উত্তরীয়
বুনে চলে ছায়াতে আলোতে।
আকাশের হৃৎস্পন্দন।
পল্লবে পল্লবে দেয় দোলা।
প্রভাতের কণ্ঠ হতে মণিহার করে ঝিলিমিলি
বন হতে বনে।
পাখিদের অকারণ গান
সাধুবাদ দিতে থাকে জীবনলক্ষ্মীরে।
সবকিছু সাথে মিশে মানুষের প্রীতির পরশ
অমৃতের অর্থ দেয় তারে,
মধুময় করে দেয় ধরণীর ধূলি,
সর্বত্র বিছায়ে দেয় চিরমানবের সিংহাসন।

আরোগ্য, র/৩/৮১৫-১৬

১৬৪। আরোগ্য-১ নং কবিতা

১৪ ফেব্রুয়ারী ১৯৪১ (১৩৪৮)

এ দ্যুলোক মধুময়, মধুময় পৃথিবীর ধূলি—
অন্তরে নিয়েছি আমি তুলি
এই মহামন্ত্রখানি,
চরিতার্থ জীবনের বাণী।
দিনে দিনে পেয়েছিনু সত্যের যা-কিছু উপহার
মধুরসে ক্ষয় নাই তার।
তাই এই মন্ত্রবাণী মৃত্যুর শেষের প্রান্তে বাজে—
সব ক্ষতি মিথ্যা করি অনন্তের আনন্দ বিরাজে।
শেষ স্পর্শ নিয়ে যাব যবে ধরণীর
বলে যাব, তোমার ধূলির
তিলক পরেছি ভালে,
দেখেছি নিত্যের জ্যোতি দুর্যোগের মায়ার আড়ালে।
সত্যের আনন্দরূপ এ ধূলিতে নিয়েছে মুরতি,
এই জেনে এ ধূলায় রাখিনু প্রণতি।

আরোগ্য, র/৩/৮১৫

১৬৫। আরোগ্য-৩৩নং কবিতা

১১ মাঘ ১৩৪৭ (১৯৪০)

এ আমির আবরণ সহজে স্খলিত হয়ে যাক;
চৈতন্যের শুভ্র জ্যোতি
ভেদ করি কুহেলিকা
সত্যের অমৃত রূপ করুক প্রকাশ।
সর্বমানুষের মাঝে
এক চিরমানবের আনন্দকিরণ
চিত্তে মোর হোক বিকিরিত।
সংসারের ক্ষুব্ধতার স্তব্ধ ঊর্ধ্বলোকে
নিত্যের যে শান্তিরূপ তাই যেন দেখে যেতে পারি,
জীবনের জটিল যা বহু নিরর্থক,
মিথ্যার বাহন যাহা সমাজের কৃত্রিম মূল্যেই,
তাই নিয়ে কাঙালের অশান্ত জনতা
দূরে ঠেলে দিয়ে

এ জন্মের সত্য অর্থ স্পষ্ট চোখে জেনে যাই যেন
সীমা তার পেরোবার আগে।

আরোগ্য, র/৩/৮৩৫

১৬৬। ঐ মহামানব আসে

১ বৈশাখ ১৩৪৮ (১৯৪১)

ঐ মহামানব আসে;
দিকে দিকে রোমাঞ্চ লাগে
মর্ত্যধূলির ঘাসে ঘাসে।
সুরলোকে বেজে উঠে শঙ্খ,
নরলোকে বাজে জয়ডঙ্ক—
এল মহাজন্মের লগ্ন।
আজি অমারাত্রির দুর্গতোরণ যত
ধূলিতলে হয়ে গেল ভগ্ন।
উদয়শিখরে জাগে মাভৈঃ মাভৈঃ রব
নব জীবনের আশ্বাসে।
জয় জয় জয় রে মানব-অভ্যুদয়,
মন্দ্রি উঠিল মহাকাশে।

শেষলেখা, র/৩/৮৯৮

সাত। সংযোজন

সাত । সংযোজন

১৬৭ । গান্ধারীর আবেদন

৯ কার্তিক ১৩০৪ (১৮৯৭)

গান্ধারী । ......তবু কহি, মহারাজ,
সেই পুত্র দুর্যোধনে ত্যাগ করো আজ।
ধৃতরাষ্ট্র । কী রাখিব তারে ত্যাগ করি।
গান্ধারী । ধর্ম তব।
ধৃতরাষ্ট্র । কী দিবে তোমারে ধর্ম।
গান্ধারী । দুঃখ নব নব।
পুত্রসুখ রাজ্যসুখ অধর্মের পণে

জিনি লয়ে চিরদিন বহিব কেমনে
দুই কাঁটা বক্ষে আলিঙ্গিয়া ?
ধৃতরাষ্ট্র । হায় প্রিয়ে,
ধর্মবশে একবার দিনু ফিরাইয়ে
দ্যূতবদ্ধ পাণ্ডবের হৃত রাজ্যধন।
পরক্ষণে পিতৃস্নেহ করিল গুঞ্জন
শতবার কর্ণে মোর, "কী করিলি ওরে।
এককালে ধর্মাধর্ম দুই তরী-'পরে
পা দিয়ে বাঁচে না কেহ। ....

গান্ধারী । ধর্ম নহে সম্পদের হেতু,
মহারাজ, নহে সে সুখের ক্ষুদ্র সেতু–
ধর্মেই ধর্মের শেষ।....
....পুত্রে তব ত্যজ এইবার;
নিষ্পাপেরে দুঃখ দিয়ে নিজে পূর্ণ সুখ
লইয়ো না; ন্যায়ধর্মে কোরো না বিমুখ
কৌরবপ্রাসাদ হতে—দুঃখ সুদুঃসহ
আজ হতে, ধর্মরাজ, লহো তুলি লহো,
দেহো তুলি মোর শিরে।......

কাহিনী, র/৫/৫২৫-২৬

১৬৮। নীড় ও আকাশ

নৈবেদ্যের ৮১নং কবিতা (১৩০৮)

একাধারে তুমিই আকাশ, তুমি নীড়।
হে সুন্দর, নীড়ে তব প্রেম সুনিবিড়
প্রতি ক্ষণে নানা বর্ণে নানা গন্ধে গীতে
মুগ্ধ প্রাণ বেষ্টন করেছে চারিভিতে।
সেথা উষা ডান হাতে ধরি স্বর্ণথালা
নিয়ে আসে একখানি মাধুর্যের মালা
নীরবে পরায়ে দিতে ধরার ললাটে;
সন্ধ্যা আসে নম্রমুখে ধেনুশূন্য মাঠে
চিহ্নহীন পথ দিয়ে লয়ে স্বর্ণঝারি
পশ্চিমসমুদ্র হতে ভরি শান্তিবারি।

তুমি যেথা আমাদের আত্মার আকাশ
অপার সঞ্চারক্ষেত্র, সেথা শুভ্র ভাস,
দিন নাই, রাত্রি নাই, নাই জনপ্রাণী,
বর্ণ নাই, গন্ধ নাই—নাই নাই বাণী।

র/১/৮৯৮

১৬৯। ব্রহ্মমন্ত্র

৮ মাঘ ১৩০৭ (১৯০১)

তদেতৎ সত্যং তদমৃতং তদ্বেদ্ধব্যং সোম্য বিদ্ধি।
তিনি সত্য, তিনি অমৃত, তাঁহাকে বিদ্ধ করিতে হইবে, হে সৌম্য, তাঁহাকে বিদ্ধ করো।...

এই উপমার মধ্যে যেমন সরলতা তেমনি একটি প্রবলতা আছে। ব্রহ্মকে বিদ্ধ করিতে হইবে—ইহার মধ্যে লেশমাত্র কুন্ঠিত ভাব নাই।...

...উপনিষদের এই ব্রহ্মজ্ঞান কেবলমাত্র বুদ্ধিবৃত্তির সাধনা নহে—সকল সত্যকে অতিক্রম করিয়া ঋষি যাঁহাকে একমাত্র তদেতৎ সত্যং বলিয়াছেন, প্রাচীন ব্রহ্মজ্ঞদের পক্ষে তিনি কেবল জ্ঞানলভ্য একটি দার্শনিক তত্ত্বমাত্র ছিলেন না। একাগ্রচিত্ত ব্যাধের ধনু হইতে শর যেরূপ প্রবলবেগে প্রত্যক্ষ সন্ধানেলক্ষ্যের দিকে ধাবমান হয়, ব্রহ্মর্ষিদের আত্মা সেই পরম সত্যের মধ্যে প্রবেশ করিয়া তন্ময় হইবার জন্য সেইরূপ আবেগের সহিত ধাবিত হইত। কেবলমাত্র সত্যনিরূপণ নহে, সেই সত্যের মধ্যে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ তাঁহাদের লক্ষ্য ছিল।

কারণ, সেই সত্য কেবলমাত্র সত্য নহে, তাহা অমৃত।...

কর্ম করিতেই হইবে এবং জীবনের প্রতি উদাসীন হইবে না, কিন্তু ঈশ্বর সর্বত্র আচ্ছন্ন করিয়া আছেন ইহাই স্মরণ করিয়া কর্মের দ্বারা জীবনের শতবর্ষ যাপন করিবে। ঈশ্বর সর্বত্র আছেন অনুভব করিয়া ভোগ করিতে হইবে এবং ঈশ্বর সর্বত্র আছেন অনুভব করিয়া কর্ম করিতে হইবে।

সংসারের সমস্ত কর্তব্য পরিত্যাগ করিয়া কেবল ব্রহ্মে নিরত থাকা তাহাও ঈশোপনিষদের উপদেশ নহে—

অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি যে অবিদ্যামুপাসতে।
ততো ভূয় ইব তে তমো য উ বিদ্যায়াং রতাঃ।

যাহারা কেবলমাত্র অবিদ্যা অর্থাৎ সংসারকর্মেরই উপাসনা করে তাহারা অন্ধতমসের মধ্যে প্রবেশ করে, তদপেক্ষা ভূয় অন্ধকারের মধ্যে প্রবেশ করে যাহারা কেবলমাত্র ব্রহ্মবিদ্যায় নিরত।

ঈশ্বর আমাদিগকে সংসারের কর্তব্য কর্মে স্থাপিত করিয়াছেন। সেই কর্ম যদি আমরা ঈশ্বরের কর্ম বলিয়া না জানি, তবে পরমার্থের উপরে স্বার্থ বলবান হইয়া উঠে এবং আমরা অন্ধকারে পতিত হই। অতএব কর্মকেই চরম লক্ষ্য করিয়া কর্মের উপাসনা করিবে না, তাহাকে ঈশ্বরের আদেশ বলিয়া পালন করিবে।

কিন্তু বরঞ্চ মুগ্ধভাবে সংসারের কর্ম-নির্বাহও ভাল, তথাপি সংসারকে উপেক্ষা করিয়া সমস্ত কর্ম পরিহার-পূর্বক কেবলমাত্র আত্মার আনন্দসাধনের জন্য ব্রহ্মসম্ভোগের চেষ্টা শ্রেয়স্কর নহে। তাহা আধ্যাত্মিক বিলাসিতা, তাহা ঈশ্বরের সেবা নহে।

কর্মসাধনাই একমাত্র সাধনা। সংসারের উপযোগিতা, সংসারের তাৎপর্যই তাই। মঙ্গলকর্মসাধনেই আমাদের স্বার্থপ্রবৃত্তি সকল ক্ষয় হইয়া আমাদের লোভ মোহ, আমার হৃদগত বন্ধন সকলের মোচন হইয়া থাকে—আমাদের যে রিপুসকল মৃত্যুর মধ্যে আমাদিগকে জড়িত করিয়া রাখে সেই মৃত্যুপাশ অবিশ্রাম মঙ্গলকর্মের সংঘর্ষেই ছিন্ন হইয়া যায়। কর্তব্য কর্মের সাধনাই স্বার্থপাশ হইতে মুক্তির সাধনা।...

র/১২/৬১৭-২৫

টীকা ঃ

৭ পৌষ ১৩০৭ (১৯০০) শান্তিনিকেতনের মন্দিরে পৌষ উৎসবের ভাষণ হিসাবে পঠিত হয়।

মন্তব্য ঃ

ভাষণটি খানিকটা ফরমায়েসী রচনার মতো। কিন্তু পুরোপুরি ফরমায়েসী বলা সংগত হবে না, কারণ রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব ভাবনাচিন্তার আভাসও এর মধ্যে লক্ষ করা যায়।

১৭০। জীবনে আমার যত আনন্দ

আষাঢ় ১৩০৮ (১৯০১)

জীবনে আমার যত আনন্দ
পেয়েছি দিবসরাত
সবার মাঝারে তোমারে আজিকে
স্মরিব জীবননাথ।

যেদিন তোমার জগৎ নিরখি
হরষে পরান উঠেছে পুলকি
সেদিন আমার নয়নে হয়েছে
তোমারি নয়নপাত।
সব আনন্দ-মাঝারে তোমারে
স্মরিব জীবননাথ।

বার বার তুমি আপনার হাতে
স্বাদে গন্ধে ও গানে
বাহির হইতে পরশ করেছ
অন্তর-মাঝখানে।
পিতা মাতা ভ্রাতা প্রিয় পরিবার,
মিত্র আমার, পুত্র আমার,
সকলের সাথে হৃদয়ে প্রবেশি
তুমি আছ মোর সাথ।
সব আনন্দ-মাঝারে তোমারে
স্মরিব জীবননাথ।

নৈবেদ্য, র/১/৪৬০-৬১

১৭১। জগতে আনন্দযজ্ঞে

৩০শে আশ্বিন ১৩১৬ (১৯০৯)

জগতে আনন্দযজ্ঞে আমার নিমন্ত্রণ।
ধন্য হল, ধন্য হল মানবজীবন।।
নয়ন আমার রূপের পুরে সাধ মিটায়ে বেড়ায় ঘুরে,
শ্রবণ আমার গভীর সুরে হয়েছে মগন।।
তোমার যজ্ঞে দিয়েছ ভার, বাজাই আমি বাঁশি—
গানে গানে গেঁথে বেড়াই প্রাণের কান্না হাসি।

এখন সময় হয়েছে কি? সভায় গিয়ে তোমায় দেখি
জয়ধ্বনি শুনিয়ে যাব এ মোর নিবেদন।

গীতবিতান, র/৪/১০২

১৭২। আরো আঘাত সইবে

৪ঠা আষাঢ় ১৩১৭ (১৯১০)

আরো আঘাত সইবে আমার, সইবে আমারো।
আরো কঠিন সুরে জীবন-তারে ঝঙ্কারো।।
যে রাগ জাগাও আমার প্রাণে বাজে নি তা চরম তানে,
নিঠুর মূর্ছনায় সে গানে মূর্তি সঞ্চারো।।
লাগে না গো কেবল যেন কোমল করুণা,
মৃদু সুরের খেলায় এ প্রাণ ব্যর্থ কোরো না।
জ্বলে উঠুক সকল হুতাশ, গর্জি উঠুক সকল বাতাস,
জাগিয়ে দিয়ে সকল আকাশ পূর্ণতা বিস্তারো।।

গীতবিতান, র/৪/৭৫

১৭৩। তুমি যে চেয়ে আছ

১৩ চৈত্র ১৩২০ (১৯১৪)

তুমি যে চেয়ে আছ আকাশ ভরে
নিশিদিন অনিমেষে দেখছ মোরে।।
আমি চোখ এই আলোকে মেলব যবে
তোমার ওই চেয়ে-দেখা সফল হবে,
এ আকাশ দিন গুনিছে তারি তরে।।
ফাগুনের কুসুম-ফোটা হবে ফাঁকি
আমার এই একটি কুঁড়ি রইলে বাকি।
সে দিনে ধন্য হবে তারার মালা
তোমার এই লোকে লোকে প্রদীপ জ্বালা
আমার এই আঁধারটুকু ঘুচলে পরে।।

গীতবিতান, র/৪/২৭

তুলনীয় প্রসঙ্গ ঃ

আমার মিলন লাগি (৭৪), তাই তোমার আনন্দ (৮৩), তোমায় আমায় মিলন হবে (৯৫), অন্তরতর শান্তি (১৭৫)

১৭৪। কর্মযোগ

১৩২১ (আনু)

জগতে আনন্দযজ্ঞে তাঁর যে নিমন্ত্রণ আমরা আমাদের জীবনের সংগে সংগেই পেয়েছি তাকে আমাদের কেউ কেউ স্বীকার করতে চাচ্ছে না।...তারা বলছে, ফাঁকি ধরা পড়ে গেছে, দেখছি যা-কিছু সব নিয়মেই চলছে—এর মধ্যে আনন্দ কোথায়?...

...নিয়মের কঠিন দন্ড একেবারে অটল হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে; কিন্তু তাকে জড়িয়ে জড়িয়ে, তাকে আচ্ছন্ন করে যে লতাটি উঠেছে তাতে কি আমরা কোনো ফুল ফুটতে দেখি নি? দেখি নি কি কোথাও শ্রী এবং শান্তি, সৌন্দর্য এবং ঐশ্বর্য? দেখছি নে কি প্রাণের লীলা, গতির নৃত্য, বৈচিত্র্যের অজস্রতা?

বিশ্বের নিয়ম সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে নিজেকেই চরমরূপে প্রচার করছে না—একটি অনির্বচনীয়ের পরিচয় তাকে চারি দিকে আচ্ছন্ন করে প্রকাশ পাচ্ছে।...যিনি আনন্দস্বরূপ, মুক্ত, তিনিই নিয়মের বন্ধনের মধ্য দিয়ে দেশকালে আপনাকে প্রকাশ করছেন।...

যারা জেনেছে ভয়ের মধ্য দিয়েই অভয়, নিয়মের মধ্য দিয়েই আনন্দ আপনাকে প্রকাশ করেন, তারাই নিয়মকে পার হয়ে চলে গেছে।...

নিয়মকে আনন্দের বিপরীত জ্ঞান করে কেউ কেউ যেমন মাতলামিকেই আনন্দ বলে ভুল করে তেমনি আমাদের দেশে এমন লোক প্রায় দেখা যায় যাঁরা কর্মকে মুক্তির বিপরীত বলে কল্পনা করেন। তাঁরা মনে করেন কর্ম পদার্থটা স্থূল, ওটা আত্মার পক্ষে বন্ধন।

কিন্তু, এই কথা মনে রাখতে হবে, নিয়মেই যেমন আনন্দের প্রকাশ, কর্মেই তেমনি আত্মার মুক্তি।...

মানুষ যতই কর্ম করছে ততই সে আপনার ভিতরকার অদৃশ্যকে দৃশ্য করে তুলছে, ততই সে আপনার সুদূরবর্তী অনাগতকে এগিয়ে নিয়ে আসছে। এই উপায়ে মানুষ আপনাকে কেবলই স্পষ্ট করে তুলছে—মানুষ আপনার নানা কর্মের মধ্যে, রাষ্ট্রের মধ্যে সমাজের মধ্যে আপনাকেই নানা দিক থেকে দেখতে পাচ্ছে।

এই দেখতে পাওয়াতেই মুক্তি। অন্ধকার মুক্তি নয়, অস্পষ্টতা মুক্তি নয়। অস্পষ্টতার মতো ভয়ংকর বন্ধন নেই। অস্পষ্টতাকে ভেদ করে উঠবার জন্যেই বীজের মধ্যে অঙ্কুরের চেষ্টা, কুঁড়ির মধ্যে ফুলের প্রয়াস।... আমাদের আত্মাও অনির্দিষ্টতার কুহেলিকা থেকে আপনাকে মুক্ত করে বাইরে আনবার জন্যেই কেবলই কর্ম সৃষ্টি করছে। যে কর্মে তার কোনো প্রয়োজনই নেই, যা তার জীবনযাত্রার পক্ষে আবশ্যক নয়, তাকেও কেবলই সে তৈরি করে তুলছে। কেননা, সে মুক্তি চায়। সে আপনার অন্তরাচ্ছাদন থেকে মুক্তি চায়, সে আপনার অরূপের আবরণ থেকে মুক্তি চায়। সে আপনাকে দেখতে চায়, পেতে চায়।...

উপনিষৎ বলেছেন : কুর্বন্নেবেহ কর্মাণি জিজীবিষেৎ শতং সমাঃ। কর্ম করতে করতেই শত বৎসর বেঁচে থাকতে ইচ্ছা করবে।...

মানুষের মধ্যে এই-যে জীবনের আনন্দ, এই-যে কর্মের আনন্দ আছে এ অত্যন্ত সত্য। এ কথা বলতে পারব না, এ আমাদের মোহ; এ কথা বলতে পারব না, একে ত্যাগ না করলে আমরা ধর্মসাধনার পথে প্রবেশ করতে পারব না। ধর্মসাধনার সঙ্গে মানুষের কর্মজগতের বিচ্ছেদ ঘটানো কখনোই মঙ্গল নয়।... মানুষের মতো কাজ কোনো জীবকে করতে হয় না। আপনার সমাজের মধ্যে একটি অতি বৃহৎ কাজের ক্ষেত্র তাকে নিজে তৈরি করতে হয়েছে।... কর্ম করা এবং বাঁচা, এই দুয়ের মধ্যে অবিচ্ছেদ্য যোগ আছে।

প্রাণের লক্ষণই হচ্ছে এই যে, আপনার ভিতরটাতেই তার আপনার সীমা নেই; তাকে বাইরে আসতেই হবে। তার সত্য অন্তর এবং বাহিরের যোগে।...

...কর্মকে ত্যাগ করা নয়, কিন্তু আমাদের প্রতিদিনের কর্মকেই চিরদিনের সুরে ক্রমশ বেঁধে তোলবার-সাধনাই হচ্ছে সত্যের সাধনা, ধর্মের সাধনা।...

শান্তিনিকেতন, র/১২/৩৮৩-৩৯৩

বিষয়-সংকেত ঃ

নিয়ম আনন্দের বিপরীত নয়, কর্ম মুক্তির বিপরীত নয়। নিয়মেই আনন্দের প্রকাশ, কর্মেই আত্মার মুক্তি। ধর্মসাধনার সঙ্গে মানুষের কর্মসাধনার বিচ্ছেদ মঙ্গলের নয়। কর্মকে ত্যাগ করা নয়, প্রতিদিনের কর্মকেই চিরদিনের সত্যের সুরে বেঁধে তোলাই হচ্ছে ধর্মের সাধনা।

তুলনীয় প্রসঙ্গ ঃ

বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি (১৬), জগতে আনন্দযজ্ঞে (১৭১), অন্তরতর শান্তি (১৭৫)

১৭৫। অন্তরতর শান্তি

৭ পৌষ ১৩২১ (১৯১৪)

তুমি যে চেয়ে আছ আকাশ ভরে।
নিশিদিন অনিমেষে দেখছ মোরে।

তিনি যে চেয়ে রয়েছেন আমার মুখের দিকে, আমার অন্তরের মাঝখানে — এ কি উপলব্ধি করব এইখানে? এ-সব কথা কি এই কোলাহলে বলবার কথা? তারার আলোকে, স্নিগ্ধ অন্ধকারে ভক্তের অন্তরের নিস্তব্ধলোকে যখন অনন্ত আকাশ থেকে একটি অনিমেষ নেত্রের দৃষ্টি পড়ে, তখন সেই নিঃশব্দ বিরলতার মধ্যেই এই পরম আনন্দের গভীর বাণী জেগে উঠতে পারে — এই কথাই মনে হয়। কিন্তু, তা নয়, সেই বিরলতার মধ্যেই যে সাধকের উৎসব সম্পূর্ণ হয় তা কখনোই সত্য নয়। মানুষের এই কোলাহলময় হাটে যেখানে কেনাবেচার বিচিত্র লীলা চলেছে, এরই মধ্যে, এই মুখর কোলাহলের মধ্যেই তাঁর পূজার গীত উঠছে — এর থেকে দূরে সরে গিয়ে কখনোই তাঁর উৎসব নয়। আকাশের তারায় তারায় যে সংগীত উঠছে যুগযুগান্তর ধরে সে সংগীতের

কেবলই পুনরাবৃত্তি চলছে। সেখানে কোনো কোলাহল নেই, ভিড় নেই, ঠেলাঠেলি নেই — নক্ষত্রলোকে যেন বিশ্বরূপ বাউল তার একতারার একটি সুর ফিরে ফিরে বাজাচ্ছে। কিন্তু মানুষের জগতে যে গান উঠছে সে কি একটি তারের সংগীত? কত যুদ্ধবিগ্রহ বিরোধ সংগ্রামের কত বিচিত্র তার সেখানে ঝংকৃত হচ্ছে — তার বৈচিত্র্যের সীমা নেই। কিন্তু, এই সমস্ত বৈচিত্র্যের মধ্যে, বিরোধের মধ্যে, শান্তির সুর বাজছে। মানুষের চারি দিকে ষড়্‌রিপুর হানাহানি, তান্ডবলীলা চলেছে — কিন্তু, এত বেসুর এসে কই এই একটি সুরকে তো লুপ্ত করতে পারলে না! সকল বিরোধ, সকল বিপ্লব, সকল যুদ্ধবিগ্রহের ভিতর দিয়ে দিয়ে এই সুর বেজে উঠল: শান্তং শিবং অদ্বৈতম্।...

...মানুষই কোলাহল করে, আর তো কেউ করে না। কিন্তু মানুষের কোলাহল আজ পর্যন্ত কি মানুষের সংগীতকে থামাতে পারল? ঈশ্বর যে খনির ভিতর থেকে রত্নকে উদ্ধার করতে চান, তিনি যে বিরোধের এই কোলাহলের মধ্য থেকেই তাঁর পূজাকে উদ্ধার করবেন—কারণ, এই কোলাহলের জীব মানুষ যখন শান্তিকে পায় তখন সেই গভীরতম শান্তির তুলনা কোথায়? সে শান্তি জনহীন সমুদ্রে নেই, মরুভূমির স্তব্ধতায় নেই, পর্বতের দুর্গম শিখরে নেই—আত্মার মধ্যে সেই গভীর শান্তি। চারি দিকের কোলাহল তাকে আক্রমণ করতে গিয়ে পরাস্ত হয়—কোলাহলের ভিতরে নিবিড়রূপে সুরক্ষিত সেই শান্তি। হাট বসে গিয়েছে, বেচাকেনার রব উঠছে—তারই মধ্যে প্রত্যেক মানুষ তার আপনার আত্মার ভিতরে একটি যোগাসনকে বহন করছে।... মানুষ তার বৈষয়িকতার বুকের উপর তার ইষ্টদেবতাকে সর্বত্রই তো প্রতিষ্ঠিত করেছে। যেখানে তার আসক্তি জীবনের সব সূত্রগুলিকে জড়িয়ে রেখেছে, তারই মাঝখানে তার মন্দিরের চূড়া দেবলোকের দিকে তাকিয়ে রয়েছে।

...এই হাটের রাস্তায় তার পদচিহ্ন পড়েছে। মানুষের এই আনাগোনার হাটেই তাঁর আনাগোনা—তিনি এইখানেই দেখা দিচ্ছেন।

শান্তিনিকেতন, র/১২/৫০৮-৯

বিষয়-সংকেত:

মানুষের জীবন কর্ম-কোলাহল মুখর, সেখানে অনেক আসক্তি, অনেক রকম বৈষয়িকতা, অনেক বিরোধ-বৈচিত্র্য, অনেক যুদ্ধ-বিগ্রহ, অনেক হানাহানি। মানুষের সাধনা কেবল যে বিরলতার মধ্যে তা নয়, মানুষের সাধনা এই কোলাহলের মধ্যেই। মানুষের জীবনে এই বিচিত্র কর্ম-কোলাহলের মধ্যে সেই গভীর শান্তির সুর বাজে, যা তার দেবলোকের সুর—শান্ত শিব এবং অদ্বৈতের সুর। মানুষের জীবনে হাটের মধ্যেই ঈশ্বরের আনাগোনা—বিজনে নয়, বিরলতার মধ্যে নয়।

তুলনীয় প্রসঙ্গ:

বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি (১৬), ভজন পূজন সাধন (৮২), বিশ্বসাথে যোগে যেথায় (৮৬), কর্মযোগ (১৭৪), আমার ভাঙা পথের (৯৯), অন্ধকারের উৎস হতে (১০৭), তুমি যে চেয়ে আছ (১৭৩),

১৭৬। আমি যখন তাঁর দুয়ারে

[১৭ পৌষ ১৩২৪ (১৯১৮)

আমি যখন তাঁর দুয়ারে ভিক্ষা নিতে যাই তখন যাহা পাই
সে যে আমি হারাই বারে বারে।।
তিনি যখন ভিক্ষা নিতে আসেন আমার দ্বারে
বন্ধ তালা ভেঙে দেখি আপন-মাঝে গোপন রতনভার,
হারায় না সে আর।।
প্রভাত আসে তাঁহার কাছে আলোক ভিক্ষা নিতে,
সে আলো তার লুটায় ধরণীতে।
তিনি যখন সন্ধ্যা-কাছে দাঁড়ান ঊর্ধ্বকরে তখন স্তরে স্তরে
ফুটে ওঠে অন্ধকারের আপন প্রাণের ধন,
মুকুটে তাঁর পরেন সে রতন।।

গীতবিতান, র/৪/১১১

১৭৭। অরূপবীণা রূপের আড়ালে

মাঘ ১৩২৬ (১৯২০)

অরূপবীণা রূপের আড়ালে লুকিয়ে বাজে,
সে বীণা আজি উঠিল বাজি হৃদয়মাঝে।।
ভুবন আমার ভরিল সুরে, ভেদ ঘুচে যায় নিকটে দূরে,
সেই রাগিনী লেগেছে আমার সকল কাজে।।
হাতে-পাওয়ার চোখে-চাওয়ার সকল বাঁধন
গেল কেটে আজ, সফল হল সকল কাঁদন।
সুরের রসে হারিয়ে যাওয়া সেই তো দেখা, সেই তো পাওয়া-
বিরহ মিলন মিলে গেল আজ সমান সাজে।।

গীতবিতান, র/৪/১১০

১৭৮। আমার প্রাণে গভীর

[২৭ চৈত্র ১৩৩২ (১৯২৬)

আমার প্রাণে গভীর গোপন মহা-আপন সে কি,
অন্ধকারে হঠাৎ তারে দেখি।।

যরে দুর্দম ঝড়ে আগল খুলে পড়ে,
কার সে নয়ন-'পরে নয়ন যায় গো ঠেকি।
যখন আসে পরম লগন তখন গগন-মাঝে
তাহার ভেরী বাজে।
বিদ্যুৎ-উদ্ভাসে বেদনারই দূত আসে,
আমন্ত্রণের বাণী যায় হৃদয়ে লেখি'।।

গীতবিতান, র/৪/১০৮

১৭৯। আমার মন যখন

আমার মন যখন জাগলি না রে
তোর মনের মানুষ এল দ্বারে।
তার চলে যাওয়ার শব্দ শুনে ভাঙল রে ঘুম—
ও তোর ভাঙল রে ঘুম অন্ধকারে।।
মাটির 'পরে আঁচল পাতি একলা কাটে নিশীথরাতি।
তার বাঁশি বাজে আঁধার-মাঝে, দেখি না যে চক্ষে তারে।।
ওরে তুই যাহারে দিলি ফাঁকি খুঁজে তারে পায় কি আঁখি?
এখন পথে ফিরে পাবি কি রে ঘরের বাহির করলি যারে।।

গীতবিতান, র/৪/১৬৭-৬৮

টীকা:
আমার মন যখন—রচনার তারিখ অনিশ্চিত

১৮০। আকাশ জুড়ে শুনিনু

আকাশ জুড়ে শুনিনু ওই বাজে
তোমারি নাম সকল তারার মাঝে।
সে নামখানি নেমে এল ভুঁয়ে,
কখন আমার ললাট দিল ছুঁয়ে,
শান্তিধারায় বেদন গেল ধুয়ে—
আপন আমার আপনি মরে লাজে
মন মিলে যায় আজ ওই নীরব রাতে
তারায় ভরা ওই গগনের সাথে।

অমনি করে আমার এ হৃদয়
তোমার নামে হোক-না নামময়,
আঁধারে মোর তোমার আলোর জয়
গভীর হয়ে থাক্ জীবনের কাজে।।

গীতবিতান, র/৪/১১১

টীকা:

আকাশ জুড়ে শুনিনু—রচনার তারিখ অনিশ্চিত

১৮১। তব কাছে এই মোর শেষ নিবেদন

[নৈবেদ্য, ৯৯ সংখ্যক কবিতা (১৯০১)

তব কাছে এই মোর শেষ নিবেদন—
সকল ক্ষীণতা মম করহ ছেদন
দৃঢ়বলে, অন্তরের অন্তর হইতে
প্রভু মোর। বীর্য দেহো সুখেরে সহিতে,
সুখেরে কঠিন করি। বীর্য দেহো দুখে,
যাহে দুঃখ আপনারে শান্তস্মিত মুখে
পারে উপেক্ষিতে। ভকতিরে বীর্য দেহো
কর্ম যাহে হয় সে সফল, প্রীতি স্নেহ
পুণ্যে ওঠে ফুটি। বীর্য দেহো ক্ষুদ্র জনে
না করিতে হীন জ্ঞান, বলের চরণে
না লুটিতে। বীর্য দেহো চিত্তেরে একাকী
প্রত্যহের তুচ্ছতার ঊর্ধ্বে দিতে রাখি।

বীর্য দেহো তোমার চরণে পাতি শির
অহর্নিশি আপনারে রাখিবারে স্থির

র/১/৯০৭

তুলনীয় প্রসঙ্গ ঃ

যে ভক্তি তোমারে লয়ে (১৫), পিতার বোধ (১৮৫)

১৮২। প্রভু আমার, প্রিয় আমার

৫ আশ্বিন ১৩১৭ (১৯১০)

প্রভু আমার, প্রিয় আমার, পরম ধন হে।
চিরপথের সঙ্গী আমার চিরজীবন হে।।
তৃপ্তি আমার, অতৃপ্তি মোর, মুক্তি আমার, বন্ধনডোর,
দুঃখসুখের চরম আমার জীবন মরণ হে।।
আমার সকল গতির মাঝে পরম গতি হে,
নিত্য প্রেমের ধামে আমার পরম পতি হে।
ওগো সবার, ওগো আমার, বিশ্ব হতে চিত্তে বিহার—
অন্তবিহীন লীলা তোমার নূতন নূতন হে।।

গীতালি, সংযোজন অংশ, র/৪/২৫

তুলনীয় প্রসঙ্গ ঃ

পিতার বোধ (১৮৫)

মন্তব্য ঃ

পিতা এবং দয়িত, প্রভু এবং প্রেমাস্পদ এখানে এক সঙ্গে মিলে গিয়েছে।

১৮৩। একটি নমস্কারে, প্রভু, একটি নমস্কারে

২৩ শ্রাবণ ১৩১৭ (১৯১০)

একটি নমস্কারে, প্রভু, একটি নমস্কারে
সকল দেহ লুটিয়ে পড়ুক তোমার এ সংসারে।।
ঘন শ্রাবণমেঘের মতো রসের ভারে নম্র নত
একটি নমস্কারে, প্রভু, একটি নমস্কারে
সমস্ত মন পড়িয়া থাক্ তব ভবনদ্বারে।।
নানা সুরের আকুল ধারা মিলিয়ে দিয়ে আত্মহারা
একটি নমস্কারে, প্রভু, একটি নমস্কারে
সমস্ত গান সমাপ্ত হোক, নীরব পারাবারে।
হংস যেমন মানসযাত্রী তেমনি সারা দিবসরাত্রি
একটি নমস্কারে, প্রভু, একটি নমস্কারে
সমস্ত প্রাণ উড়ে চলুক মহামরণ-পারে।।

গীতাঞ্জলি, র/৪/১৫৫

তুলনীয় প্রসঙ্গ ঃ

পিতার বোধ (১৮৫)

১৮৪। যে রাতে মোর দুয়ারগুলি

যে রাতে মোর দুয়ারগুলি ভাঙল ঝড়ে
জানি নাই তো তুমি এলে আমার ঘরে।।
সব যে হয়ে গেল কালো, নিবে গেল দীপের আলো,
আকাশ-পানে হাত বাড়ালেম কাহার তরে।।
অন্ধকারে রইনু পড়ে স্বপন মানি।
ঝড় যে তোমার জয়ধ্বজা তাই কি জানি!
সকালবেলায় চেয়ে দেখি, দাঁড়িয়ে আছ তুমি এ কি
ঘর-ভরা মোর শূন্যতারই বুকের 'পরে।।

গীতবিতান, র/৪/৭৪

তুলনীয় প্রসঙ্গ ঃ

বক্ষে তোমার বাজে বাঁশি (৭৬), এই করেছ ভালো নিঠুর (৭৮)

১৮৫। পিতার বোধ

১১ মাঘ ১৩১৮ (১৯১২)

...নিজেকে যে লোক কেবলই ধন মান জোগাচ্ছে সে লোক নিজের সত্যকে কেবলই অবিশ্বাস করছে।...

...আরামের পর্দা ছিন্ন করে ফেলে দুঃখের দিন তো বিনা আহবানে আমাদের সুসজ্জিত ঘরের মাঝখানে হঠাৎ এসে দাঁড়ায়...। ...অকস্মাৎ বজ্রের মতো মৃত্যু এসে আমাদের সংসারের মর্মস্থানের মাঝখানটায় যখন মস্ত একটা ফাঁক রেখে দিয়ে যায় তখন রাশি রাশি ধনজনমান দিয়ে ফাঁক তো কিছুতেই ভরিয়ে তুলতে পারি নে।....

আমাদের অন্তরের সত্য মানুষটি কোন্ আশ্রয়ের জন্য পথ চেয়ে আছে ? ...রাত্রি গভীর হল, অন্ধকার নিবিড় হয়ে এল; সেই তার একলা ঘরের নিবিড় অন্ধকারের মাঝখানে ধুলায় বসে সে যখন কেঁদে উঠল আমরা তখন প্রহরে প্রহরে কী বলে তাকে আশ্বাস দিলুম!...

ওরে মত্ত, কোন্ মাভৈঃ বাণীটির জন্য আমার এই অন্তরের একলা মানুষ এমন উৎকণ্ঠিত হয়ে কান পেতে রয়েছে ? সে হচ্ছে চিরদিনের সেই সত্য বাণী: পিতা নোহসি। পিতা, তুমিই আছ।...

আর, ওটা কী ভয়ানক মিথ্যা—ওই যে 'আমি আছি'? কই আছ, আমি আছ কোথায়? তুমি ভবসমুদ্রের কোন্ ফেনাগুলাকে আশ্রয় করে বলছ 'আমি আছি' ? যে বুদ্বুদটি যখনই ফেটে যাচ্ছে তাতেই তখন তোমারই ক্ষয় হয়ে যাচ্ছে।...তুমি আছ কিসের উপরে ? তুমি কে ?...তুমি আছ কিসের উপরে ? তুমি কে ?...তুমি কি সেই নির্ভর নাকি! তবে কী ভরসা দেবার জন্যে তুমি তার কানের কাছে এসে মন্ত্র জপছ 'আমি আছি'!

পিতা নোহসি—পিতা তুমি আছ, তুমি আছ—এই আমার অন্তরের একমাত্র মন্ত্র। তুমি আছ এই দিয়েই আমার জীবনের এবং জগতের সমস্ত-কিছু পূর্ণ। 'সত্যং' এই বলে ঋষিরা তোমাকে একমনে জপ করেছেন, সে কথাটির মানে হচ্ছে এই যে: ...পিতা তুমি আছ। যা সত্য তা শুধু মাত্র সত্য নয়, তাই আমার পিতা।

কিন্তু, তুমি আছ এই বোধটিকে তো সমস্ত প্রাণমন দিয়ে পেতে হবে। তুমি আছ এ তো শুধু একটা মন্ত্র নয়। তুমি আছ এ তো শুধু কেবল একটা জেনে রাখবার কথা নয়। তুমি আছ এই বোধটিকে যদি আমি পূর্ণ করে না যেতে পারি তবে কিসের জন্যে এ জগতে এসেছিলুম, কেনই বা কিছু দিনের জন্য নানা জিনিস আঁকড়ে ধরে ধরে ভেসে বেড়ালুম, শেষকালে কেনই বা এই অসংলগ্ন নিরর্থকতার মধ্যে হঠাৎ দিন ফুরিয়ে গেল!

শক্ত হয়েছে এই যে, আমি আছি এই বোধটিকেই আমি দিবারাত্রি সকল রকম করেই অভ্যাস করে অভ্যাস করে ফেলেছি। জীবনের সকল চেষ্টাতেই কেবল এই আমিকেই নানা রকম করে স্বীকার করে এসেছি, প্রতি দিনের সমস্ত খাজনা তারই হাতে শেষ কড়াটি পর্যন্ত জমা করে দিয়েছি। আমি-বোধটা একেবারে অস্থিমজ্জায় জড়িয়ে গেছে; সে যদি বড়ো দুঃখ দেয় তবু তাকে অন্যমনস্ক হয়েও চেপে ধরি, তাকে ভুলতে ইচ্ছা করলেও ভুলতে পারি নে।

সেইজন্যেই আমাদের প্রতিদিনের প্রার্থনা এই যে: পিতা নো বোধি। তুমি যে পিতা, তুমি যে আছ, এই সত্যের বোধে আমার সমস্ত জীবন পূর্ণ করে দাও। পিতা নো বোধি। পিতার বোধ দিয়ে আমার সমস্তকে সমস্তটা ভরে তোলো, কিছুই আর বাকি না থাক্। আমার প্রত্যেক নিশ্বাস প্রশ্বাস পিতার বোধ নিয়ে আমার সর্বশরীরে প্রাণের আনন্দ তরঙ্গিত করে তুলুক, আমার সর্বাঙ্গের স্পর্শচেতনা পিতার বোধে পুলকিত হয়ে উঠুক। পিতার বোধের আলোক আমার দুই চক্ষুকে অভিসিক্ত করে দিক। পিতা নো বোধি। আমার জীবনের সমস্ত সুখকে পিতার বোধে বিনম্র করে দিক, আমার জীবনের সমস্ত দুঃখকে পিতার বোধ করুণাবর্ষণে সফল করে তুলুক! আমার ব্যথা, আমার লজ্জা, আমার দৈন্য, সকলের সঙ্গে আমার সমস্ত পিতার বোধের অসীমতার মধ্যে একেবারে ভাসিয়ে দিই। এই বোধ প্রতিদিন প্রসারিত হতে থাক্—নিকট হতে দূরে, দূর হতে দূরান্তরে, আত্মীয় হতে পরে, মিত্র হতে শত্রুতে, সম্পদ হতে বিপদে, জীবন হতে মৃত্যুতে—প্রসারিত হতে থাক্—প্রিয় হতে অপ্রিয়ে, লাভ হতে ত্যাগে, আমার ইচ্ছা হতে তোমার ইচ্ছায়।

প্রতিদিন মন্ত্র পড়ে গিয়েছি: পিতা নো বোধি। কিন্তু একবারও মনেও আনি নি কত বড়ো চাওয়া চাচ্ছি; মনেও আনি নি এই প্রার্থনাকে যদি সত্য করে তুলতে চাই তবে জীবনের সাধনাকে কত বড়ো সাধনা করতে হবে। কত ত্যাগ, কত ক্ষমা, কত পাপের স্খালন, কত সংস্কারের আবরণ মোচন, কত হৃদয়ের গ্রন্থিছেদন—জীবনকে সত্য করতে না পারলে সেই অনন্ত সত্যের বোধকে পাব কেমন করে!...

নমস্তেঽস্তু! তোমাকে যেন নমস্কার করতে পারি। এই আমার পিতার বোধ যখন জাগে তখন নমস্কারের মধুর রসে সমস্ত জীবন একেবারে পরিপূর্ণ হয়ে যায়। সর্বত্র যখন পিতাকে পাই তখন সর্বত্র হৃদয় আনন্দে অবনত হয়ে পড়ে। তখন শুনতে পাই জগৎ-ব্রহ্মাণ্ডের গভীরতম মর্মকুহর হতে একটিমাত্র ধ্বনি অনন্তের মধ্যে নিশ্বসিত হয়ে উঠছে:

নমো নমঃ।...

...আমাদের সেই নমস্কার সত্য হোক ...পিতার বোধ পূর্ণ হোক এবং বিশ্বভুবনে সন্তানের প্রণামের সঙ্গে পিতার বিগলিত আনন্দধারা সম্মিলিত হোক। নমস্তেস্তু।—

সকল দেহ লুটিয়ে পড়ুক তোমার এ সংসারে
একটি নমস্কারে, প্রভু, একটি নমস্কারে।...

শান্তিনিকেতন, র/১২/৪৪২-৫০

টীকা :

পিতার বোধ—১৩১৮ সালের মাঘোৎসবের প্রাতঃকালীন ভাষণ।

বিষয়-সংকেত :

আমাদের ভিতরে যে মানুষটি আছে আর বাইরে যে মানুষটি দুয়ের চাওয়া এক নয়। বাইরের মানুষ কেবল উপকরণই চায়, তা ক্ষণিক, তুচ্ছ এবং মিথ্যা। ভিতরের মানুষ চায় সত্যকে, সত্যের বোধকে। সত্যের বোধই হল পিতার বোধ। ঈশ্বরকে যখন পিতা বলে জানি, পিতা বলে মানি, তখন সমস্ত মন নমস্কারে অবনত হয়ে পড়ে। একটি পরম নমস্কারের মধ্যে নিজেকে সমর্পিত করে দেওয়াই হল পিতার বোধের স্বাভাবিক অভিব্যক্তি।

মন্তব্য ঃ

এই পিতার বোধের সঙ্গে নৈবেদ্যের অনেক কবিতার (দ্বিতীয় পর্ব) যেমন ভাবসাম্য, তেমনি শান্তিনিকেতনে'র অনেক ভাষণেরও (তৃতীয় পর্ব) তেমনি ভাবসাম্য। ভাবটি বাৎসল্য ও প্রতিবাৎসল্যের। পিতার দিক থেকে বাৎসল্য, সন্তানের দিক থেকে নমস্কার। পিতার দিক থেকে বিগলিত করুণাধারা, সন্তানের দিক থেকে সুগভীর ভক্তি।

'পিতার বোধ' ভাষণটি শেষ হয়েছে গীতাঞ্জলির 'একটি নমস্কারে, প্রভু, একটি নমস্কারে' গানের একটি স্তবক দিয়ে। আমরা জানি, প্রণামে বা নমস্কারে যে রস তা ভক্তির রস, প্রেমের রস নয়, মধুর রস নয়। 'শান্তিনিকেতনে'র অনেক ভাষণেই ভক্তির ভাব প্রবল, কিন্তু মধ্যে মধ্যে অনতিপ্রচ্ছন্নভাবে, প্রেমভাবেরও স্ফুরণ ঘটেছে। এই ভাষণে রবীন্দ্রনাথ 'নমস্কারের মধুর রসে সমস্ত জীবন একেবারে পরিপূর্ণ হয়ে' যাবার কথা বলেছেন। এই যে 'মধুর রস' কথাটির অনুপ্রবেশ, এইটি তাৎপর্যপূর্ণ। সূক্ষ্মভাবে এটি ভাবের দ্বৈততার ইঙ্গিত করে। এই দ্বৈততাই এক ভাব থেকে অন্য ভাবে যাবার—পিতার ভাব থেকে প্রেমিকের ভাবে যাবার সেতু।

তুলনীয় প্রসঙ্গ ঃ

তব কাছে এই মোর (১৮১), প্রভু আমার, প্রিয় আমার (১৮২), একটি নমস্কারে, প্রভু, একটি নমস্কারে (১৮৩)

১৮৬। ভারতবর্ষীয় দার্শনিক সঙ্ঘের সভাপতির অভিভাষণ

বঙ্গবাণী, মাঘ ১৩৩২ (১৯২৬)

..,আমাদের ভারতে যাবতীয় বিদ্যা- .দর্শন কাব্য যাহা হউক- একটি একান্নবর্তী পরিবারের অন্তর্ভুক্ত। স্বাতন্ত্র্য-প্রসূত অসূয়ার বালাই তাহাদের নাই, সুতরাং পাশ্চাত্য-সুলভ দন্ডবিধির সাহায্যে অনধিকার প্রবেশকে ঠেকাইয়া রাখিতে হয় না।

দার্শনিকপ্রবর প্লেটো তাঁহার আদর্শ গণরাষ্ট্র হইতে কবিদের নির্বাসিত করেন। কিন্তু ভারতবর্ষে দর্শন চিরদিন কাব্যকে মিত্রপক্ষীয় বলিয়া আদর করিয়া আসিয়াছেন। কারণ এখানে দর্শনের চরম লক্ষ্য সাধারণের জীবনকে অধিকার করা—বিদগ্ধমন্ডলীর রুদ্ধদ্বার খাসকামরা আশ্রয় করা নহে। এই জন্যই বোধ হয় শঙ্করাচার্যের মত দার্শনিকের প্রতিও অনেক কবিতার আরোপ করিতে আমাদের জনশ্রুতি কিছুমাত্র দ্বিধা করে নাই। অথচ এই শঙ্করাচার্যকে কোনও আতিথ্যদ্বেষী "ইমিগ্রেশন" আইনের সাহায্যেই প্লেটো তাঁহার আদর্শরাষ্ট্র হইতে বহিষ্কৃত করিতে পারিতেন কিনা সন্দেহ। হয়ত সেইসব কবিতা অধিকাংশই উচ্চ অঙ্গের কাব্য নহে, কিন্তু কবিতা সরবরাহ করাটা তত্ত্বজ্ঞানীর পক্ষে একটা অপরাধ বা রুচিবিগর্হিত ব্যাপার বলিয়া কোন কাব্যামোদী দোষারোপ করেন না।

আমাদের জনসাধারণ সহজেই তত্ত্বদর্শীকে কবিত্বের অধিকার দিয়া থাকে যখন তাঁহার ধীশক্তি প্রজ্ঞার আভায় প্রদীপ্ত হইয়া উঠে। আমাদের মহাকাব্য মহাভারত ইহার সাক্ষী। বিশ্বসাহিত্যে ইহা অতুলনীয়। ছোট বড় কত রকমের মানব চরিত্র, কি অদ্ভুত বৈচিত্র্যে, কত বিভিন্ন স্তরের মনস্তত্ত্বে ছত্রে ছত্রে ফুটিয়া উঠিয়াছে! কিন্তু শুধু তাহাই নহে; কত নীতি, রাষ্ট্রীয় ও আধ্যাত্ম তত্ত্বের কত বিচারবিন্যাস এই মহাভারতের উদার আয়তনে কেমন সহজে আশ্রয় পাইয়াছে! এই অমিতাচারী ঔদার্য্যের ফলে কাব্য তার নিজস্ব সীমা লঙ্ঘন করিবার বিপদ স্বীকার করিয়াছে। কিন্তু ইহাও সম্ভব হইল ভারতবর্ষে; কারণ এখানে সাহিত্যের বিভিন্ন গোষ্ঠী এক বিরাট্ সাধারণতন্ত্রে (Communism)বিধৃত। বস্তুত মহাভারত যেন একটী ব্রহ্মান্ড বিশেষ; ইহার মধ্যে কত বিচিত্র মানস সৃষ্টি, অসংখ্য গ্রহনক্ষত্রের মত জটিল-বিষম ছন্দে নৃত্য করিয়া ফিরিবার যথেষ্ট অবকাশ পাইয়াছে। একজন বিশেষ কবির খামখেয়ালী ইহাতে নাই, সমগ্র জাতির সাধারণ মনোভাব এখানে দেখিতে পাই। আমাদের এই জাতিটি বিচিত্র তর্কবিতর্কজটিল পন্হা আশ্রয় করিয়া সেই ভাবলোকে ভ্রমণ করিতে শ্রান্তি বোধ করে না যাহা অসংখ্য উপাখ্যানের উপগ্রহপরিবেষ্টিত একটি মহা আখ্যায়িকার সৌরমন্ডল বলিলেই হয়।

মুসলমানযুগেও এই ভারতে যে-সব সাধুসন্ত আবির্ভূত হইয়াছেন, তাঁহারা প্রায় প্রত্যেকেই গীতরসিক। তাঁহাদের গান ভাবের আগুনে দীপ্তিমান, তাঁহাদের ধর্মবোধ তত্ত্বজ্ঞানের মর্মস্থল হইতে উৎসারিত, মানবের চিরন্তন প্রশ্নগুলি ও জীবনের চরম সার্থকতা লইয়া তাঁহাদের কারবার। হয়ত ইহাতে আশ্চর্য হইবার কোন কথা নাই। কিন্তু যখন দেখি যে তাঁহাদের সেই সমস্ত বাণী, সমস্ত সঙ্গীত কেবলমাত্র শিক্ষিত পন্ডিতমন্ডলীর জন্য নহে, তাহা গ্রামে গ্রামে নিরক্ষর নরনারীর আদরের ধন, তখন বুঝিতে পারি দর্শন বস্তুটি কি গভীরভাবে আমাদের সাধারণের মগ্নচৈতন্যলোকে প্রবেশ করিয়াছে এবং সমস্ত জীবনকে ওতপ্রোতভাবে পরিব্যাপ্ত করিয়াছে।

শৈশবে মনে পড়ে একজন ভক্ত হিন্দু গায়কের মুখে কবীরের এই গানটি শুনি :—

"পানীমে মীন পিয়াসী রে
মুকো শুনত শুনত লাগে হাঁসী রে।
পূরণ ব্রহ্ম সকল ঘট্ট বরতে;
ক্যা মথুরা ক্যা কাশীরে।"

কবীরের এই উচ্চ হাস্য সেই হিন্দু গায়কের ধর্মনিষ্ঠায় এতটুকু আঘাত করে নাই। বরং কবীরের সঙ্গে তিনি একাত্ম; কারণ, তত্ত্বজ্ঞান যে তাঁহার মনকে মুক্তি দিয়াছে এবং তিনি বুঝিয়াছেন তীর্থ হিসাবে মথুরা বা কাশীর প্রতীকগত তাৎপর্য থাকিলেও চিরন্তন সত্য হিসাবে তাহাদের স্থান নাই। সুতরাং উক্ত স্থানদ্বয়ে তীর্থযাত্রা করিতে উন্মুখ হইলেও তিনি নিঃসংশয়ে জানেন যে ব্রহ্মের সর্বব্যাপিত্ব সাক্ষাৎভাবে উপলব্ধি করিবার শক্তি যদি তাঁহার থাকিত তাহা হইলে কোন বিশেষ স্থানে যাইয়া ধর্মবোধ জাগাইবার কোন প্রয়োজনই হইত না। তবে যে সমস্ত ধর্মমন্দিরে কত যুগ ধরিয়া কত সাধকের ভজন পূজন কেন্দ্রীভূত হইয়াছে, তাহার উদ্বোধনী শক্তিটি তাঁহার মত সাধকের তেমনই প্রয়োজন বলিয়া তিনি স্বীকার করেন যেমন প্রয়োজন আমাদের আবহমানকাল প্রচলিত মন্ত্রের, যে মন্ত্র বহুযুগের ভক্তসাধকের কণ্ঠস্বরে প্রাণবান্ হইয়া আমাদের প্রাণকে সহজে উদ্বোধিত করিতে পারে।

পূর্ব্ববঙ্গের একটি গ্রাম্য কবির গানে দর্শনের একটি বড় তত্ত্ব পাই—সেটি এই যে, ব্যক্তিস্বরূপের সহিত সম্বন্ধসূত্রেই বিশ্ব সত্য। তিনি গাহিলেন;

"মম আঁখি হইতে পয়দা আসমান জমীন;
শরীরে করিল পয়দা শক্ত আর নরম;
আর পয়দা করিয়াছে ঠান্ডা আর গরম।
নাকে পয়দা করিয়াছে খুষবয় বদবয়।"

এই সাধক কবি দেখিতেছেন যে, শাশ্বত পুরুষ তাঁহারই ভিতর হইতে বাহির হইয়া তাঁহার নয়নপথে আবির্ভূত হইলেন। বৈদিক ঋষিও এমনই ভাবে বলিয়াছেন যে, যে-পুরুষ তাঁহার মধ্যে তিনিই আদিত্যমন্ডলে অধিষ্ঠিত।

"রূপ দেখিলাম রে নয়নে, আপনার রূপ দেখিলাম রে।
আমার মাঝত বাহির হইয়া দেখা দিল আমারে।।"

এই সব তত্ত্ব-সঙ্গীতের বিশেষত্ব এই যে, ইহা গ্রাম্য সাধারণের ভাষায় লিখিত এবং নিতান্ত অমার্জিত বলিয়া উচ্চ সাহিত্য কর্ত্তৃক অবজ্ঞাত। এইসব গ্রাম্য গায়কেরা তত্ত্ববিদ্যার কোন ধার ধারেন না, সেটা তাঁহারা বেশ একটু জোরের সঙ্গেই বলিয়া থাকেন। এমনি একটি কবির সম্বন্ধে কিম্বদন্তী আছে যে, বৈষ্ণব রসতত্ত্বের ব্যাখান শুনিয়া তিনি এই গানটি রচনা করেন :—

"ফুলের বনে কে ঢুকেছেরে সোণার জহরি
নিকষে ঘসয়ে কমল আ মরি মরি।"

বাউল সম্প্রদায় আমাদের বাঙলার সেই শ্রেণী হইতে আসিয়াছে যাহারা প্রচলিত অর্থে শিক্ষিত নয়। আমি তাহাদের গান কতকগুলি আমায় লিখিয়া দিতে অনুরোধ করায় দেখি তাহারা বেশ একটু বিব্রত হইয়াছিল; শেষে যখন ভরসা করিয়া লিখিল, আমি তাহার পাঠোদ্ধার করিতে যাইয়া হতাশ হইলাম, তাহাদের বানান ও অক্ষরবিন্যাস এমনই

অপ্রত্যাশিত রকম অসনাতনী। কিন্তু এই সব কবি-বাউলদের সাধন-পদ্ধতি মানবদেহতন্ত্রের যে অতীন্দ্রিয় অনুভূতির উপর প্রতিষ্ঠিত, তাহা জটিল ও দুরবগাহ। ইহারা পথে বিপথে তাহাদের গান গাহিয়া ফেরে; আমার পথের ধারের জানালা হইতে একটী গান বহুকাল পূর্বে শুনি, কিন্তু এখনও মনের মধ্যে গাঁথা হইয়া আছে।

"খাঁচার মধ্যে অচিন পাখী কম্‌নে আসে যায়,
ধরতে পারলে মনোবেড়ি দিতেম তারি পায়।"

এই গ্রাম্য কবি দেখি উপনিষদের ঋষিদের সংগে একমত; আমাদের বাক্য ও মন ভূমাকে ধরিতে যাইয়া প্রতিনিবৃত্ত হয়, তবু সেই প্রাচীন ঋষিদের মত এই গ্রাম্য কবি অসীমের অভিসার হইতে নিরস্ত নন; বরং এই দুঃসাহসিক ব্রতে সার্থক হইবার একটা পন্থা আছে তাহার ইংগিত করিতেছেন। ইহা শেলীর সেই কবিতাটির কথা স্মরণ করায় যাহাতে তিনি সুন্দরের অতীন্দ্রিয় আবেশের বন্দনা গাহিয়াছেন।

সেই অজানা দুরধিগম্য হইলেও যেসকল সত্যের মূল সত্য, তাহা এই বিখ্যাত ইংরেজ কবি এবং এই অজ্ঞাতনামা বাঙালী বাউল উভয়েই বুঝিয়াছেন। সেইজন্য তাহার গ্রাম্য সংগীত সেই অজানা পাখীর ডানার ছন্দে মুখরিত। শুধু এই প্রভেদ যে শেলীর ভাষা জনকয়েক শিক্ষিত লোকের জন্য আর এই বাউল গান গ্রামের চাষী ও সর্ব্বসাধারণের, যাহারা এই গানের অধ্যাত্মিক অতি-বাস্তবতায় অতিষ্ঠ হইয়া উঠে না।

একটি কারণে এসমস্ত সম্ভব হইয়াছে; লোকশিক্ষার যে আশ্চর্য প্রণালী বহুকাল ধরিয়া ভারতে চলিয়া আসিয়াছে তাহাই সমস্ত বিকাশের মূলে; কিন্তু তাহা আজ ধ্বংসোন্মুখ। আমাদের প্রাক্তন বিদ্যায়তনগুলিতে দলে দলে ছাত্রগণ নানা দেশ হইতে আসিয়া প্রসিদ্ধ অধ্যাপক ও আর্যগণের চারিদিকে সমবেত হইত। সেই শিক্ষাসত্রগুলি গভীর ও স্থিরসলিল হ্রদের মত; সেখানে আসিতে হইলে দুর্গম পথ অতিবাহন করিতে হয়। কিন্তু সেই সব জলাশয় হইতে প্রতিনিয়ত বাষ্পোদ্গম হইয়া যে সব মেঘ জন্মিত, তাহা বায়ুভরে কত প্রান্তর পর্ব্বত উপত্যকার উপর দিয়া সমগ্র দেশে পরিব্যাপ্ত হইত। পৌরাণিক কাহিনীকে অবলম্বন করিয়া কত গীতিনাট্য, কথকশিল্পীর মুখে কত বিচিত্র উপাখ্যান-কথা, ভিক্ষুক বাউল গায়কের মুখে লোকসাহিত্যের কত অমূল্য গীতসম্পদ দেশে বিদেশে প্রচারিত হইত, এবং এই মেঘপুঞ্জই ত জন-সাধারণের চিত্তক্ষেত্রকে সুসিক্তিত ও উর্ব্বর করিয়া তুলিত এবং যে সমস্ত তত্ত্ব মূলতঃ অতি কঠিন তাহা সাধারণগম্য করিত। সাংখ্যযোগ ও বেদান্ত দর্শনের গভীর মতবাদগুলি লোকসাহিত্যে রূপান্তরিত হইয়া প্রাণের ফসল ফলাইত এবং যে অগণ্য নরনারী শিক্ষা ও অবসরের অভাবে কোন দিনই সেই তত্ত্ববিদ্যার মূল উৎসে যাইতে পারিত না, তাহাদেরও গৃহদ্বারে সেই তত্ত্বগুলিকে উপস্থিত করিত।

সভ্যতাবিস্তারের সংগে সংগে সমাজের নানা জটিল কর্মভার বহিবার জন্য এক দল লোককে বাস্তব অভাবাদি দূর করিবার ভার লইতে হয়। সে দায়িত্ব যতই গুরুতর হউক না কেন, তাহা এড়ান চলে না। সুতরাং এই সব মানুষদের পক্ষে মানসিক উন্নতি সাধন করার সুযোগ হয় না। এইভাবে বিরাট্ জনসংঘ শুধু পণ্য উৎপাদনের চাপে লুপ্তচৈতন্য যন্ত্রমাত্রে পর্যবসিত হয় বলিয়াই কয়েক জন মানুষ বড় ভাব ও অমর শিল্পরূপের স্ফূরণ করে এবং বিশ্বমানবকে অধ্যাত্মসাধনার উত্তুংগ শিখরে লইয়া যায়।

সমাজের জন্য এই যে সকল ব্যক্তি আত্মবলিদান দিয়াছেন, তাঁহাদিগকে ভারত কোন দিন উপেক্ষা করে নাই; তাঁহাদের জীবনব্যাপী শ্রমের ভীষণ অন্ধকারের উপর আলোকপাত করিতে চেষ্টা করিয়াছে এবং নানা অনুষ্ঠানের ভিতর দিয়া মানসিক ও আধ্যাত্মিক খাদ্য তাঁহাদের উপযোগী করিয়া তাঁহাদের সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছে এবং সহজ কর্ত্তব্য-বোধেই তাহা করিয়াছে। কোন বিধিবন্ধ রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের দ্বারা এই কাজটি হয় নাই; কিন্তু স্বতঃস্ফূর্ত্ত সামাজিক ব্যবস্থার ফলেই ইহা জীবদেহে রক্তপ্রবাহের মত সর্ব্বত্র সঞ্চারিত হইয়াছে। এই জন্যই তাহার মূল উদ্দেশ্যটি চাপা পড়িলেও কাজটি চলিতেছে।

এক সময় আমি বাঙলার একটি সামান্য গ্রামে যাই। সেখানে প্রধানত মুসলমান চাষীদের বাস। গ্রামবাসীরা আমার জন্য একটি যাত্রা গানের পালা অভিনয় করে। সে নাট্যের আখ্যানবস্তু একটি লুপ্তপ্রায় ধর্মপন্থীদের শাস্ত্র হইতে আহরিত, একদা সেই ধর্মের বিস্তৃত প্রভাব ছিল। সে ধর্ম আজ প্রাণহীন, তবু তাহার বিশেষ বাণী জনসাধারণের নিকট ইহার নিজস্ব তত্ত্বটি প্রচার করিতেছে এবং শিক্ষা ও সংস্কারের সেই লোকেরা ভিন্ন হইলেও সে বাণী শুনিতে তাহাদের বিতৃষ্ণা নাই। এই সম্প্রদায়ের বিশেষ মতবাদ অনুসারে উক্ত গীতি-নাট্যটি মানবস্বরূপের বিভিন্ন উপাদান, তাহার দেহ, অহংবোধ ও আত্মা লইয়া বিচার করিয়া চলিল। পরে কথোপকথন ব্যপদেশ একটি মানুষের ইতিহাস বিবৃত হইল। মানুষটি রসকুঞ্জ বৃন্দাবনে যাইতে চায় কিন্তু এক প্রহরী পথরোধ করিয়া তাহার বিরুদ্ধে চৌর্য্যাপরাধ উপস্থিত করিল। স্তম্ভিত হইয়া মানুষটি প্রশ্ন করায় প্রহরী তাহাকে অপরাধী প্রমাণ করিয়া দিল, যেহেতু যাত্রীটি তাহার গাত্রাবরণের মধ্যে অতি সংগোপনে তাহার অহংটিকে অবৈধপণ্য হিসাবে বৃন্দাবনে আমদানি করিতে উদ্যত; অহং বস্তুটি যে মালিকের, তাহার নিজের নয়, সেটা সে স্বীকার করে নাই! সেই বমালশুদ্ধ ধরা পড়ায় অপরাধীর নিকট তার কল্পলোকের পথ অবরুদ্ধ। বাঁশের উপর ছিন্ন সামিয়ানা খাটাইয়া, ধোঁয়াটে কেরোসিনের আলোয় গ্রামের লোক ভিড় করিয়া শুনিতেছে, মধ্যে মধ্যে ধান্যক্ষেত্র হইতে শৃগালের পাল চীৎকার করিয়া রসভঙ্গ করিতেছে। রাত্রি প্রায় শেষ হইয়া আসে, তবু শ্রোতাদের ঔৎসুক্যের অন্ত নাই। তাহারা নাটকটির অভিনয় দেখিতেছে এবং আপাত-বিসদৃশ নৃত্যগীত ও হাস্যপরিহাসের আবেষ্টনে মানব-জীবনের অনেক চরম সমস্যা ও তাৎপর্য্যের ব্যাখ্যান চলিতেছে।

এই উদাহরণগুলি হইতে বুঝা যাইবে, ভারতে কাব্য ও দর্শন কেমন হাত ধরাধরি করিয়া চলিয়াছে। জীবনে পূর্ণতা লাভের সহজ ও সম্ভব পথটি মানুষকে ধরাইয়া দিবার দায়িত্ব দর্শন গ্রহণ করিয়াছে বলিয়াই এটি ভারতে সম্ভব হইয়াছে। সে পূর্ণতার অর্থ কি? ইহার অর্থ সত্যের মধ্যে মুক্তি, যাহার জন্য এই প্রার্থনা জাগিয়াছে—অসতো মা সদ্গময়—কারণ যাহা সত্য, তাহাই আনন্দ।

আমি ছন্দ-শিল্পী। কাব্য-কারবারের ভিতর দিয়া আমি সত্যের একটি আনন্দরূপ উপলব্ধি করিয়াছি। চিত্তের মুক্তিপথ দিয়া সত্যের আস্বাদ আমাদের দান করাই সমস্ত শিল্পের মূল প্রকৃতি। সেই সম্বন্ধটি মনে রাখিয়া যখন আমরা সৌন্দর্য্যতত্ত্বের (aesthetics) কথা বলি, তখন সৌন্দর্য্যের সাধারণ সংজ্ঞা ছাড়িয়া তাহাতে কবিগণ যে গভীরতর তাৎপর্য দিয়াছেন সেই কথাই ভাবি; "সত্যই সুন্দর এবং সুন্দরই সত্য।" চিত্র-

শিল্পী একটি জরাজীর্ণ মানুষের ছবি আঁকিলেন, ইহা দেখিতে শোভন নয়, তথাপি তার সেই ছবিখানি ছবি হিসাবে সম্পূর্ণ হইয়া উঠে যখন আমরা তাহার সত্য মূর্তিটি গভীরভাবে অনুভব করি। ব্রাউনিঙ্-এর কবিতায় ঈর্ষাউন্মত্ত যে নারীটি বিষ প্রস্তুত হইতে দেখিতেছে এবং সেই বিষ তাহার প্রেমঈর্ষার পাত্রীটিকে কি ভাবে জর্জর করিবে তাহা কল্পনায় উপভোগ করিতেছে—এ-হেন নারীর মনকে সুন্দর বলা যায় না। কিন্তু যখন এই নারীর ছবিটি পরিকল্পন ও রূপস্ফুরণের সুসংগতিতে আমাদের চোখের সম্মুখে জীবন্ত সত্য হইয়া উঠে, তখন আমরা এই ছবিও উপভোগ করি। মহাভারতে বীরশ্রেষ্ঠ কর্ণের চরিত্রে মধ্যে মধ্যে যে নীচতা প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে—তাহার দরুন শিল্পসংগতির আনন্দ ইহাতে আমরা যতটা পাই, কেবল মাত্র অবিমিশ্র ঔদার্যের আদর্শ চিত্র হইতে ততটা পাইতাম না। নৈতিক আদর্শের পূর্ণতাটি নানা বিসংবাদী রসের দ্বারা প্রতিহত হইয়াছে বলিয়াই উক্ত চরিত্রটি আমাদের কাছে সত্য হইয়া উঠিয়াছে এবং সেইজন্যই ইহা আমাদের আনন্দ দেয়, প্রীতিকর বলিয়া নহে, সৃষ্টির ছন্দে সুনির্দিষ্ট বলিয়া।

জীবনে যাহা আমাদের মিলে না তাহা শিল্পের ভিতর দিয়া আমরা কতকটা উপভোগ করি বলিয়াই যে শিল্পের এত মূল্য তাহা সম্পূর্ণ সত্য নহে। শিল্পের আসল মূল্য এইখানে যে তাহার বিচিত্র সৃষ্টির ভিতর দিয়া ইহা আমাদের সংগে সত্যের সাক্ষাৎ পরিচয় স্থাপন করিয়া দেয়। সেই শিল্প-সৃষ্টিগুলি আমাদের অভিজ্ঞতালব্ধ তথ্যের সংগে হুবহু মিলিয়া যাইবার দরকার নাই, তাহারা আমাদের উপলব্ধির মধ্যে সত্য হইয়া উঠিলেই আনন্দ দেয়। শিল্পের জগতে আমাদের চেতনা ও অনুভূতি স্বার্থবন্ধন হইতে মুক্ত বলিয়াই আমরা ঐক্য ও সংগতির একটি অপ্রতিহত স্বপ্নরূপ উপভোগ করি; পূর্ণসত্যের মানসী প্রতিমা বলিয়াই তাহা চিরন্তন আনন্দের উৎস।

শিল্পীর জগতে যে নিয়ম, বিধাতার জগতেও তাই; সৃষ্টির উৎস ও চরম লক্ষ্য যে নিঃস্বার্থ আনন্দ, তাহা লাভ করিতে হইলে অহমের কবল হইতে মুক্ত হওয়া চাই। সেই মুক্তির প্রতীক্ষায় আমাদের আত্মা উন্মুখ হইয়া আছে এবং তাহার যে তৃষিত আমিটা আপাত সত্যের মৃগতৃষিকার পিছনে ছুটিয়া মরিতেছে, তাহাকে সত্যের ঐক্যলোকে মুক্তি দিবার জন্য ক্রন্দন করিতেছে। এই মুক্তির আদর্শটি আমাদের তত্ত্বজ্ঞানের ভিত্তিকে আশ্রয় করিয়া আছে ইহা ভারতের জীবনকে গভীরভাবে স্পর্শ করিয়াছে এবং আমাদের সমস্ত ভাবপ্রেরণা ও প্রার্থনাকে উৎসারিত করিয়া দিব্য লোকের পানে ছুটাইয়াছে; কাব্য পক্ষপুটে ভর করিয়া আমাদের আত্মা ঊর্ধ্বে উড়িয়া যায়। সহজবিশ্বাসী তুচ্ছশিক্ষিত কত লোক দেখি তাহাদের প্রার্থনা মুক্তিদায়িনী তারাকে নিবেদন করিয়া গাহিতেছে—

"তারা, কোন্ অপরাধে দীর্ঘ মেয়াদে সংসার-গারদে থাকি বল্।"

আমাদের দেশের এই সব সাধারণ মানুষ সত্যের জগৎ হইতে বিচ্যুত হইবার ভয়ে সদা সন্ত্রস্ত; বস্তু-জগতের ফেনপুঞ্জের মধ্যে একটানা ভাসিয়া যাওয়া, পুলক-বেদনার তরংগভংগে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হওয়া, জীবনের কোন চরম লক্ষ্য খুঁজিয়া না পাওয়া, ইহার মত আতঙ্কের বিষয় তাহাদের তার কিছু নাই। ইহাদের মধ্যে কেহ গাড়োয়ান হাটে গাড়ী হাঁকাইয়া যায়, কেহ বা জেলে মাছ ধরিয়া বেড়ায়। তাহারা যে সকল গান গায় তাহার গভীর অর্থ সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলে তাহারা খুব সম্ভব উপযুক্ত জবাব দিতে পারিবে না,

কিন্তু তাহাদের মনের মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যায় যে, একটি বিষয়ে সেখানে কোন সন্দেহ নাই। সেটি এই যে, সমস্ত দুঃখের কারণ জীবনের আসবাব্ পত্রের অভাব নয়, জীবনের সত্য তাৎপর্য সম্বন্ধে চেতনার অভাব। এই জন্যই দেখি যে "আমি ও আমার", এই ভাবটার উপর অযথা জোর দিলেই আমাদের দেশের লোক তাহার নিন্দা করিয়া থাকে, কারণ 'আমি ও আমার' উগ্রবোধটা সত্যের পরিপ্রেক্ষণকে অলীক করিয়া তোলে। তাহারা যে দেখিয়াছে, সংসারের সমস্ত সম্বল পিছনে ফেলিয়া দিয়া সত্যের অভিসারে বাহির হইয়াছে কত মানুষ, যাহাদের সামাজিক পদবী বা মানসিক বিকাশ সাধারণের উপরে যায় না।

এই সকল দুর্গমপথ-যাত্রীদের যে পার্থিব শক্তি সম্পদ বাড়াইবার দিকে লক্ষ্য নাই, তাহারা যে মুক্তির ভিখারী, সেকথা আমাদের দেশের লোক বোঝে। তাহারা হয় ত এমন মানুষকে দেখিয়াছে যে তাহাদেরই মত দরিদ্র এবং গ্রামে তাহাদের সংগে ব্যবসায়লিপ্ত। সে তাহার দৈনন্দিন কাজ করিয়া সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছে, তবু তাহার সম্বন্ধে মানুষের ধারণা যে সে একজন মুক্তজীব—শাশ্বত পুরুষের হৃদয়ে সে আশ্রয় পাইয়াছে। এমন একটি মানুষ একবার আমার চোখে পড়িয়াছিল; সে একটি জেলে, সারাদিন গংগায় মাছ ধরিয়া ফেরে আর তন্ময় হইয়া গান গাহিয়া যায়; একজন মাঝি তাহাকে ভক্তিভরে দেখাইয়া বলিল, উনি মুক্তপুরুষ। সমাজ মানুষের উপর যে মামুলী নির্দ্ধারণ করিয়া থাকে, এ-লোকটি তাহার ঊর্দ্ধে উঠিয়া গিয়াছে; বাজার দর অনুসারে দোকানে সাজান পুতুলের মত মানুষকে সমাজ যে ভাবে সাজায়, তার কোন কোটায় এ লোকটি পড়ে না।

এই জেলেটির মুখ যখন মনে পড়ে, তখন না ভাবিয়া থাকিতে পারি না যে, বন্ধন-মুক্ত আত্মার মহাকাব্য যাহারা জীবন দিয়া রচনা করিয়া যায় তাহাদের সংখ্যা হয় ত নিতান্ত কম নয়—যদিও ইতিহাসে তাহাদের নাম কখনও দেখিব না। এই সব অবিকৃতআত্মা সামান্য চাষাভুষা জানে যে, সম্রাট তাহার সাম্রাজ্যের সংগে শৃংখলিত হইলে বিচিত্রবেশী ক্রীতদাস মাত্র; লক্ষপতি তাহার কর্ম্মফলে সোনার খাঁচায় বন্দী, কিন্তু ঐ সামান্য জেলেটি জ্যোতির্লোকে মুক্তি পাইয়াছে।

যখন অন্ধকারে হাত বাড়াইয়া ফিরিতেছি, তখন কোন একটি জিনিষে ঠোক্কর খাইয়া সেইটিকে আঁকড়াইয়া ধরি এবং তাহাকে আমাদের একমাত্র আশা ও নির্ভরস্থল মনে করি। কিন্তু যখন আলোকের প্রকাশ হয়, তখন ঐ সমস্ত টুক্রা টুক্রা বস্তুকে ছাড়িয়া দিই। কারণ দেখি যে ভূমার সংগে আমরা সকলে সম্বন্ধযুক্ত, বস্তুগুলি ত তার অংশমাত্র। গ্রামের সামান্য লোকেরা জানে মুক্তি কি জিনিষ—অহমের বিচ্ছিন্নতা হইতে মুক্তি, যাহা হইতে আমাদের অত্যুগ্র অধিকার বোধ জাগে সেই বস্তুর ভেদলিপ্সা হইতে মুক্তি। তাহারা জানে যে কেবল মাত্র বন্ধন অস্বীকার করিলেই মুক্তি আসে না, সম্পদের হ্রাস হইলেও নয়—মুক্তি আসে আস্তিক্যবোধের সাধনে, তাহার সিদ্ধি প্রাণে বিশুদ্ধ আনন্দের প্লাবন বহাইয়া দেয়, তাই গান উঠে :—

"যে জন ডুব্‌লে সখী তার কি আছে বাকি গো।"

তাই ত ইহারা গাহিয়া থাকে :—

"মনরে আমার মনের সাথে মিল্‌বি যদি আয়
দুই মনেতে এক মন হয়ে আজব সহর চলে যাই।"

এক মনে আমারে বাহিরে এই বৈচিত্র্যের রাজ্যে নানা বস্তু খুঁজিয়া ফেরে আর এক মন ভিতরে ঐক্যের স্বপ্নমূর্তির সন্ধানে ছোটে—এই দুই মনের মধ্যে দ্বন্দ্বটি যখন মিটিয়া যায়, তখনই আমরা 'আজব'কে, অনির্বচনীয়কে উপলব্ধি করি। কবীরও এই সত্যটির প্রচার করিয়াছেন।

পরব্রহ্ম কেবল মাত্র অন্তরের অধ্যাত্ম লোকে বাস করেন ইহা বলিলে বাহিরের এই বস্তুলোকের অপমান করা হয় এবং যখন তাঁহাকে কেবল মাত্র বাহিরে নির্দেশ করি তখনও সত্যি বলি না।

এই সব বাউল গায়কদের মতে সত্য ঐক্যের উপর প্রতিষ্ঠিত, সুতরাং মুক্তি ঐক্যের সাধনে। আমাদের দৈনিক আরাধনা ও মন্ত্রাদি মনকে সেই শিক্ষা দিতে চেষ্টা করে যাহাতে মনকে বিশ্ব হইতে বিচ্ছিন্ন করিবার যত ব্যবধান আছে সব জয় করিতে পারা যায় এবং তাঁহাকে চিনিতে পারা যায় যিনি অদ্বৈতম্ বলিয়াই অনন্তম্। গভীর তত্ত্বজ্ঞান বাষ্পের মত ভারতের জনসাধারণের চিত্তে সর্বত্র ব্যাপ্ত হইয়া আমাদের দৈনন্দিন প্রার্থনা ও আধ্যাত্মিক অনুষ্ঠানাদি জাগাইয়াছে। এই জ্ঞান প্রতিনিয়ত আমাদের তাড়া দিতেছে এই সৃষ্টিপ্রপঞ্চের বাহিরে চলিয়া যাইতে; কারণ এখানে তথ্য মাত্র তথ্য বলিয়া আমাদের কাছে বিদেশী সংগীতের ধ্বনির মত অপরিচিত। কিন্তু স্বরগ্রামের সহিত পরিচয় হইলে যেমন আমরা তাহাদের ঐক্যটিকে সংগীতরূপে পাই, তেমনি অন্তহীন বহু যেখানে এককে প্রকাশ করে, সেই সর্বভূতের অন্তরতম সত্যের মধ্যে মুক্তি লাভ করিবার পরামর্শ এই জ্ঞান হইতে আসে।

এই মুক্তি একমাত্র সত্যেই আছে, সত্যাভাসে নাই; সেইজন্য ফলপ্রাপ্তির লোভ তাড়াতাড়ি যে সার্থকতার পথ কাটিয়া বসে, তাহা ঠিক পথ নহে। একজন নগণ্য গ্রাম্য কবি যাহাকে বিশ্বের মান্যগণ্য লোকেরা কেহ জানে না, যাহার মনের উপর সরকারী শিক্ষাবিভাগ তাহার ছাঁচেঢালা শিক্ষার নিগড় চাপায় নাই, সেই মানুষটি গানের ভিতর দিয়া ঐ পরম সত্যের ইঙ্গিত করিয়াছে।

> "নিঠুর গরজী,
> তুই কি মানস-মুকুল ভাজ্‌বি আগুনে?
> তুই ফুল ফুটাবি, বাস ছুটাবি সবুর বিহুনে।
> দেখ্‌না আমার পরম গুরু সাঁই,
> সে যুগযুগান্তে ফুটায় মুকুল, তাড়া হুড়া নাই।
> তোর লোভ প্রচণ্ড, তাই ভরসা দণ্ড;
> এর আছে কোন্ উপায়?
> কয় সে মদন, দিস্‌নে বেদন, শোন নিবেদন,
> সেই শ্রীগুরুর মনে,
> সহজ ধারা আপন-হারা তাঁর বাণী শোনে,
> রে গরজী।"

কবি জানেন জোর করিয়া মুক্তি লাভের কোন বাহ্য উপায় নাই। অন্তরের সাধনপ্রক্রিয়ায় নিজেদের উৎসর্গ করিয়া হারাইতে পারিলেই তবে মুক্তির দিকে যাওয়া যায়। বন্ধন তার অসংখ্য রূপে আমাদের এই অহমের মধ্যেই কেল্লা গড়িয়া বসিয়াছে।

তাহা বহির্জগতে নাই। রন্ধন রহিয়াছে আমাদের চৈতন্যের নিষ্প্রভতায়, আমাদের দৃষ্টি-রাজ্যের সংকীর্ণতায় এবং সর্বত্র আমাদের স্থায়ী মূল্য নির্ধারণের ভ্রমে।

ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাই আমাদের বর্তমান সভ্যতার মধ্যে; এই সভ্যতা এক নিরবচ্ছিন্ন অভাবের তাড়নায় চালিত; এই যে দুর্দমনীয় গতিবেগের অন্ধশক্তি (inertia), যাহা কোথায় কেমন করিয়া থামিতে হয় তাহা জানে না—এই আপাতমুক্তিকেই সত্য মুক্তি বলিয়া মানুষ ভ্রম করিতেছে। কোন কোন বর্বর জাতি মানুষের মাথার খুলির উপর একটা মনগড়া মূল্যের আরোপ করিয়া থাকে এবং সেই সম্বন্ধে তাহাদের গাণিতিক উন্মত্ততা এমনই বাড়িয়া যায় যে, তাহারা নরমুন্ড সংগ্রহ আর শ্রান্ত হয় না। নিষ্ঠুর নিয়তি যেন তাহাদিগকে একটা অন্তহীন বাড়াবাড়ির পথে টানিয়া লইয়া যায় এবং তাহারা কেবলই যোগের পর যোগ দিয়া ছুটিতে থাকে। এই বীভৎস সংগ্রহের পথে যে অবাধ স্বাধীনতা তাহা ঘৃণ্যতম বন্ধনেরই নামান্তর। ইহাদের এই নিষ্ঠুর দাবীর তাড়না কেবল বাড়িয়াই চলে, কারণ যে-বস্তু তাহাদের লক্ষ্য ও কাম্য তাহা সত্যের উপর নির্ভর করিয়া নাই। সেইরূপ এ কথাটাও আমাদের মনে রাখা উচিত যে, কেবল মাত্র গতিবেগকে বাড়াইয়া তামসিক ভোগের আড়ম্বর ও আস্‌বাব পর্ব্বতপ্রমাণ করিয়া, প্রাণহিংসার যাবতীয় উপাদান ও অস্ত্রশস্ত্রের বিভীষিকা বিপুল করিয়া তুলিয়া, যাহা মহান্, যাহা বিরাট্ তাহার একটা কান্ডজ্ঞানহীন কদর্য পরিহাসোৎসব মাত্র করিতেছি। বন্ধনের শৃঙ্খল কেবলই বাড়িয়া চলিতেছে এবং একটা নিরর্থক নিরবচ্ছিন্ন অভাব ও দাবীর তাড়না সমস্ত পৃথিবীকে শৃঙ্খলিত করিতে উদ্যত হইয়াছে।

খৃষ্টীয় ধর্মতত্ত্বে দেখি যে, জন্মগত একটী শাস্তি হইতে নিস্তার লাভই মুক্তি। ভারতে মুক্তি হয় অবিদ্যার অজ্ঞানের অন্ধকারা হইতে, যে অবিদ্যা অহম্‌কেই চরম বলিয়া মোহ উৎপাদন করে। কিন্তু যে প্রজ্ঞা আমাদিগকে এই অবিদ্যা হইতে মুক্তি দিবে তাহা শূন্যগর্ভ নহে। শূন্যতায় মুক্তি নাই। যে অবাধ সুসংগত গতিবিধির ভিতর দিয়া আমরা আমাদের এই আবেষ্টন—এই পার্থিব জীবনের সংগে একাত্ম হইতে পারি, তাহাই মুক্তি। শূন্য নিষ্ফল নিঃসংগতা নহে, সমগ্রের সংগে সংগতি—ইহাই ত উপনিষদের কথা—সর্ব্বভূতে যিনি নিজের আত্মাকে মিলাইয়া দেখিয়াছেন, তাঁহার কাছে সত্য আর অপ্রকাশ থাকেন না।

বাস্তব জগতেও মুক্তির সেই একই তাৎপর্য। শুধু তাহা তাহার নিজস্ব ভাষায় প্রকাশিত হইয়াছে। প্রাকৃতিক ঘটনাবলী যতদিন আমাদের কাছে এক দুর্বোধ্য যুক্তিহীন খামখেয়ালীর প্রকাশ মনে হইয়াছে, ততদিন আমরা যেন এক অজ্ঞেয় বিজাতীয় লোকে বাস করিয়াছি। তাহার মধ্যে যে আমাদের স্বরাজের স্থান আছে, তাহা স্বপ্নেও ভাবি নাই। কিন্তু যে-মুহূর্তে এই জগতের চালচলনের সংগে আমাদের জ্ঞানের যোগ হইয়া গেল, সেই মুহূর্তে সেই মিলনের সেই সংগতির মধ্যেই যে ঐক্য ও মুক্তি দেখা দিল। অবিদ্যাই আমাদের আবেষ্টনের সংগে আমাদের অনৈক্য ঘটায়। এবং বিদ্যা যাহা বস্তুজগতের মধ্যে ব্রহ্মের প্রকাশকে বুঝাইয়া দেয়, সেই ব্রহ্মবিদ্যাই ত বাস্তবজগতের মর্মস্থলের ঐক্যটিকে ধরাইয়া দেয়—অদ্বৈতম্‌কে চিনাইয়া দেয়।

জগতের ব্যবস্থা সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণার মধ্যে যাহারা বাড়িয়াছে, যাহারা জানে না যে, জ্ঞানের দাবীতে এই জগত তাঁহাদেরই সেই সব মানুষ কাপুরুষ কায়েমী শিক্ষা লাভ

করিয়াছে। যে নিয়তি অসন্দিগ্ধভাবে আঘাত করিয়া চলিয়াছে—যাহার বিরুদ্ধে আপিল নাই—সেই নিয়তির উপরই আশাহতদের আস্থা। এমন-কি মানুষের স্বাভাবিক অধিকার হইতেও যখন তাহারা বঞ্চিত হয় তখনও তাহারা বিনা সংগ্রামে আত্মসমর্পণ করে। কারণ তাহারা ভাবিতে অভ্যস্ত হইয়াছে যেন তাহারা জন্ম হইতেই আইনের বাহিরে এবং এ জগৎ সর্ব্বদাই তাহাদের উপর দুর্ব্বোধ্য দুর্ঘটনার উপদ্রব চাপাইবে।

সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও এই পর-ভাব এবং অদ্বৈতবোধের অভাবই মুক্তির অন্তরায়। মিলনের গ্রন্থিগুলির উপর জবরদস্তি চলিতেছে বলিয়াই আমাদের বন্ধন। কেহ কেহ মনে করিতে পারেন যে যাহাদের সংগে একত্র বাস করা যাইতেছে, তাহাদের সংগে সমস্ত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করাই মুক্তি; কারণ সম্বন্ধের অর্থই হইতেছে অপরের প্রতি দায়িত্ব-বোধ। কিন্তু হেঁয়ালীর মত শুনাইলেও ইহা সত্য যে, জীবজগতে অন্যোন্যসম্বন্ধবোধটি পূর্ণ করিয়া সুসংগত করিয়া পরস্পরের ভার গ্রহণেই মুক্তি। উৎকট ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের বশে কোন দায়িত্বই স্বীকার না করা কেবল মাত্র বর্ব্বরদের পক্ষেই সম্ভব এবং সেই জন্যই বর্ব্বরদের পূর্ণ আত্মবিকাশ সম্ভব নয়। যে আগুন ভাল করিয়া জ্বলে নাই সুতরাং ধূমজালেই আচ্ছন্ন, সেই আগুনের মতই বর্ব্বরগণ চাপা পড়িয়া থাকে, তাহারা তামস সমুদ্রে ডুবিয়া আছে। এই নির্ব্বাপিতপ্রায় তমসাচ্ছন্ন জীবনের কারাবাস হইতে তাহারাই মুক্তি পায়, যাহারা পরস্পরের সংগে বোঝাপড়া করিতে ও এক জোটে কাজ করিতে সমর্থ। মানবের মুক্তির ইতিহাস মানবসম্বন্ধের পূর্ণবিকাশেরই ইতিহাস।

এই সর্ব্বাংগীণ মুক্তির পথে সর্ব্বপ্রধান অন্তরায় ব্যক্তির বা দলের স্বার্থপরতা। বিশ্বমানবের পূর্ণ বিকাশে যত দূর সম্ভব সাহায্য করাই সভ্যতার চরম লক্ষ্য। কিন্তু নৈতিক আদর্শের স্থান অধিকার করিয়া যখন কোন রকম স্বার্থপরতা অবাধে সমাজের মূল উপাদানগুলি গ্রাস করিতে বসে, তখন সভ্যতার মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। কারণ, গ্রাস করিবার লোভ এবং সৃষ্টি করিবার জীবন্ত শক্তি পরস্পরবিরোধী। জড়ের জগতে প্রাণই প্রথম মুক্তির জয়ধ্বজা উড়াইয়াছে; কারণ প্রাণ কেবল বাহ্যিক ঘটনা মাত্র নহে, ইহা অন্তর-জগতের প্রকাশ, ইহা বস্তুর সীমা ছাড়াইয়া যায়—উপাদানের ভারে আত্মাকে আটক করিতে দেয় না, অথচ নিজের সত্য সীমাটি মানিয়া চলে। প্রাণের প্রাচুর্যে তাহার বৃদ্ধি ও সংগতি চাপা পড়ে না; ভিতর এবং বাহির, লক্ষ্য এবং উপায়, বর্ত্তমান এবং অনাগত এক সমন্বয়ে ঐক্য লাভ করে।

জীবন কেবলমাত্র সঞ্চয় করে না, পরিপাক করে। ইহার বস্তু এবং শক্তি, কর্ম্ম এবং সত্তা নিগূঢ়ভাবে একীভূত। আমাদের পারিপার্শ্বিক জগতের জড় উপাদান যখন ওজন ছাড়াইয়া ভয়াবহ হইয়া উঠে, যখন তাহারা যন্ত্র এবং সঞ্চয়ের স্তূপ মাত্র, তখন আমাদের জীবন ও আমাদের জগতের মধ্যে সংগ্রামে জীবনই পরাস্ত হয়। প্রাণনদীর স্রোতটি ক্ষীণ হইয়া হটিয়া যাওয়ায় যে খাদ বাহির হইয়া পড়ে, তাহা অবিশ্রাম ধন বর্ষণে পূর্ণ করিতে আমরা চেষ্টা করি কিন্তু দেখি যে ধন ভরাট করিতে পারিলেও যোগ স্থাপন করিতে পারে না। সেজন্য বস্তুস্তূপের চোরাবালির চাকচিক্য বিপদ্জনক ফাটলগুলিকে শুধু লুকাইয়া রাখে। কিন্তু একদিন যখন আমরা গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন তখন পুঞ্জীভূত বস্তুর ভারে হঠাৎ সব তলাইয়া যায়।

কিন্তু আসল দুর্দৈব মনুষ্যত্বের পরাভবে, বৈষয়িক অনুদ্বেগের বিনাশে নহে। মানুষ

তাহার আবেষ্টনকে তাহার প্রাণে ও প্রেমে সজীব করিয়া সৃষ্টিধারা বজায় রাখিয়া চলিয়াছে; কিন্তু তাহার সুযোগধর্মী দুরাকাঙ্ক্ষার বশে সেই মানুষই আবার নির্ম্মম লোভের দাস হইয়া সমস্ত জগৎকে বিকৃত কদর্য্য করিয়া তুলিতেছে। মানুষের সৃষ্ট এই যন্ত্রজগতের বেসুরো আর্ত্তনাদ ও কলের মতন নড়াচড়া মানুষের প্রকৃতির উপর বিষম প্রভাব বিস্তার করিতেছে এবং সর্ব্বদা এমন একটি বিশ্ব-সংস্থানের দ্যোতনা করিতেছে যাহা সম্বন্ধহীন ও নিরপেক্ষ। এহেন জগতে মুক্তির অবকাশ নাই; কারণ বিচ্ছিন্ন তথ্যের চাপে তাহা নিরেট হইয়া গিয়াছে। শুধু খাঁচাটাই সর্ব্বস্ব, তাহার বাহিরে আকাশ নাই। তাই জগৎটা সর্ব্বতোভাবে একটা বদ্ধ জগৎ; কঠিন খোলার ভিতর বীজের মত বন্দী। কিন্তু বীজের মর্ম্মস্থলে তখনও প্রাণ কাঁদিতেছে মুক্তির জন্য তাহার সম্ভাবনা পর্য্যন্তও যখন মৌন অন্ধকারে আচ্ছন্ন। মুক্তির জন্য এই জীবন্ত পিপাসাকে যখন কোন একটা বিরাট্ লোভ পদদলিত করিয়া স্তব্ধ করিয়া দেয়, তখন স্ফুরণশক্তিহীন বীজের মত মানব সভ্যতা মরিয়া যায়।

ভারতের মুক্তির আদর্শ নিষ্ক্রিয়তা-তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত. ইহা পূর্ণভাবে সত্য নহে। ঈশোপনিষৎ উচ্চকন্ঠে প্রচার করিয়াছেন যে, মানুষের কর্ত্তব্য শতায়ু কর্ম্ম করা। কারণ ইহার মতে পূর্ণতার নিষ্ক্রিয় আদর্শ এবং তাহার বিকাশের সক্রিয় পদ্ধতির মিলন করা চাই অসীম ও সসীমের সমন্বয়সাধন চাই; ইহাতেই পূর্ণ সত্য। সুতরাং শুধু অসীমকেই চরম সত্য বলিয়া যাহারা অনুসরণ করে, তাহারা গভীরতর অন্ধকারে পতিত হয়; তাহাদের তুলনায় সসীমবাদীদের অধঃপতন কম গুরুতর। পরিবর্ত্তনশীল কতকগুলি স্বরের সমষ্টিতেই অপরিবর্ত্তনীয় সংগীতের চরম তাৎপর্য্য বলিয়া যে বিশ্বাস করে, সে নিশ্চয় নির্ব্বোধ; কিন্তু যে ব্যক্তি ভাবে সংগীতে স্বরের কোন বালাই নাই, তাহার নির্ব্বুদ্ধিতা ততোধিক। কিন্তু সমন্বয় কোথায়? তুরীয়ধর্ম্মা (Transcendental) সংগীত কেমন করিয়া বিচ্ছিন্ন স্বরগ্রামকে তাহার আত্মপ্রকাশের বাহন করিয়া লয়? ইহার সৃষ্টির পর্ব্বে পর্ব্বে যে ছন্দ, যে সীমা দেখা দেয় তাহার দ্বারাই ইহার সম্ভব হয়। সসীমের পন্থা অতিক্রম করিয়াই আমরা অসীমকে লাভ করি। এই কথাই ঈশোপনিষৎ ইঙ্গিত করিয়াছেন—

"বিদ্যাঞ্চাবিদ্যাঞ্চ যস্তদ্বেদোভয়ং সহ—
অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা বিদ্যয়াহমৃতমশ্নুতে।"

সীমার ছন্দেই আমাদের জীবন সুনিয়ন্ত্রিত এবং তাহার বিধিনিষেধের ভিতর দিয়াই আমরা অমরত্ব লাভ করি। অমৃতত্ব মাত্র এই বাহ্য জীবনের প্রসারমাত্র নহে—ইহা পূর্ণতার সিদ্ধি, ইহা জীবনের সুসংগত সুন্দর সীমানির্দ্দেশ; প্রাণ প্রতি মুহূর্ত্তে সেই সীমা অতিক্রম করিয়া ভূমাকে প্রকাশ করে। ঈশোপনিষদের প্রথম শ্লোকেই উপদেশ আছে, মা গৃধঃ; লোভ করিও না। কিন্তু কেন করিব না? কারণ লোভ সীমার মর্য্যাদা রক্ষা করে না বলিয়া জীবনের ছন্দকে বিনষ্ট করে; সেই ছন্দের ভিতর দিয়াই যে অসীম আত্মপ্রকাশ করেন।

আধুনিক সভ্যতায় দেখি আত্মহননকারীদের সংখ্যা বাড়িতেছে। ইহারা আধ্যাত্মিক আত্মঘাতক। এই সভ্যতায় অনিয়ন্ত্রিত বাসনা ও 'অহম্'কে অতিস্ফীত করিয়া তুলিবার অন্তহীন প্রবৃত্তি সীমাবদ্ধ করিবার শক্তি চলিয়া গিয়াছে। জীবনের ধর্ম্ম

হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছি বলিয়াই আমরা জীবনের সৌন্দর্য্য-সংস্কৃতিও হারাইতেছি। অলীক কবির মত আমরা বাক্‌চাতুর্য্যকেই শক্তি বলিয়া, বাস্তববাদকে সত্যবস্তু বলিয়া, ভ্রম করিতেছি। মধ্যযুগে যখন ইউরোপ স্বর্গরাজ্যে আস্থাবান্ ছিল, তখন জীবনের বিচিত্র শক্তিকে ছন্দোবন্ধ করিতে এবং সেই আদর্শের সংগে মিলাইতে চেষ্টা করিয়াছে। প্রবৃত্তির রুদ্রসংঘাতের মধ্যে সেই আদর্শ জীবন ডাক দিয়াছে এবং ইউরোপের কর্ম্মপ্রচেষ্টাকে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে। এই প্রয়াসের মূলে ছিল একটি সৃষ্টির প্রেরণা— একটি গভীর আস্তিক্যবোধ যাহা আদেশ করিয়া বলিত—লোভ করিও না, আপন সীমাটি চিনিয়া লও। সুসংগত সৌধের স্থান জুড়িয়া অসংখ্য ইটের পাঁজা গড়িয়া তুলিবার প্রচন্ড, উৎসাহ দেখা দিয়াছে, এবং চূর্ণইটের গুঁড়ায় দক্ষ স্থপতির আদর্শটি চাপা পড়িয়া গিয়াছে। ইহাতে বিদ্যার সহিত অবিদ্যার বিচ্ছেদ সূচিত হইতেছে। সেই জন্যই এক ছন্দহীন শক্তি সমস্ত সৃষ্টিপ্রক্রিয়াকে উপেক্ষা করিয়া এক প্রচ্ছন্ন অগ্নিদাহের সৃষ্টি করিয়াছে, যাহাতে দীপ্তি নাই, শুধু তাপ আছে।

ছন্দেই সৃষ্টি; ছন্দেই বিদ্যা ও অবিদ্যার, সীমা ও অসীমের মিলনভূমি। অরূপের বক্ষ হইতে শতদলটি কেমন করিয়া ফুটিয়া উঠিল জানি না। অস্পষ্টতার গর্ভে যতদিন ইহা লুকাইয়াছিল ততদিন আমাদের কাছে ইহার কোন তাৎপর্যই ছিল না, তবু কোথাও সেই পদ্মটি ছিল ত। কোন দুরবগাহের তলদেশ হইতে উঠিয়া কেমন করিয়া অপূর্ব ছন্দসীমায় ইহা ধরা দিল, আমাদের চেতনায় একটি নূতন আবর্ত জাগাইল! অসীমের স্পর্শে যে আনন্দ চিনিলাম তাহা যে সীমারই দান। সৃষ্টিকর্তার সর্বাপেক্ষা বড় কাজই যে সীমা নির্দেশ করা; তিনি যে বন্ধনের মধ্য দিয়াই মুক্তি পান, সীমার ভিতর দিয়াই অসীমকে পান। জড়-বস্তুর উপাসনায় অসীম অতৃপ্তি। তাহা ক্রমবর্ধমান আতিশয্যের পথে শুধু ছুটায়, কিছু প্রকাশ করে না; তাহার কোন রূপ নাই। এই লোক চিরঅন্ধকারে আবৃত, অন্ধেন তমসাবৃতা; এখানে আছে শুধু মূক বস্তুপিন্ডের বোঝা। মানুষের সত্য প্রার্থনা বৃহৎকে চায় না; সত্যকে চায়, আলোককে চায়। তাহা অগ্নিকান্ড নয়, জ্যোতিরুন্মেষ; মানুষ অমৃতকে চায়, কালের ব্যাপ্তিতে নয়, পূর্ণের শাশ্বত গৌরবে।

মুক্তির অন্তর্লোকের পথ রুদ্ধ করিয়া ফেলিয়াছি বলিয়াই আমাদের নিকট বহির্জগতের দাবী এমন ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিয়াছে। সে লোকে বস্তু আছে কিন্তু তাহার অর্থ-সিদ্ধির পথ অবরুদ্ধ। সে লোকে বাঁচিয়া থাকা দাসত্ব। জীবনের সত্য যাহাতে নিহিত, অন্ধতার বশবর্তী হইয়া তাহাই আমরা হারাইয়া ফেলিয়াছি বলিয়া মানুষের পক্ষে জীবনকে পাপ বলা সম্ভব হইয়াছে। একটি পাখায় ভর করিয়া পাখী আকাশে উড়িতে গিয়া বাতাসের উপরেই ক্রোধ প্রকাশ করে—কেন সে তাহাকে আঘাত করিয়া ধূলায় ফেলিয়া দিল। খন্ড সত্যমাত্রই পাপ। খন্ড সত্য মানুষকে পীড়া দেয়; কারণ তাহা যাহা দিতে পারেনা আভাসে তাহারই কথা মনে জাগায়। মৃত্যু আমাদের পীড়া দেয় না, কিন্তু রোগ যন্ত্রণা দেয়, কারণ রোগ কেবলই স্বাস্থ্যকে স্মরণ করাইয়া দিয়া তাহাকেই কাড়িয়া রাখে। অসম্পূর্ণ জগতে জীবনও পাপ; কারণ যেখানে জীবনের অসম্পূর্ণতা প্রত্যক্ষ, সেখানেও তাহা পূর্ণতার ভান করে, শুধু পানপাত্রটি মুখের কাছে ধরে কিন্তু প্রাণ-রস হইতে আমাদের বঞ্চিত রাখে। সত্য খন্ডিত থাকিয়া যায় বলিয়া, তাহার বিকাশযন্ত্রটির পূর্ণাবর্তন হয় না বলিয়াই সৃষ্টির মধ্যে এত দুর্দৈব।

টীকা:

ভারতবর্ষীয় দার্শনিক সঙ্ঘের সভাপতির অভিভাষণ—১৯২৫ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেট হলে ভারতবর্ষীয় দর্শন-সম্মেলনের (Indian Philosophical Congress) প্রথম অধিবেশন হয়। রবীন্দ্রনাথ ওই অধিবেশনের সভাপতিত্ব করেন। ১৯ ডিসেম্বর সভাপতির অভিভাষণে তিনি যে ইংরেজি প্রবন্ধটি পাঠ করেন, এটি তার বাংলা অনুবাদ। মূল ইংরেজি প্রবন্ধটি 'The Philosophy of our People' নামে Calcutta Review-তে (January 1926) এবং Visva-Bharati Quarterly-তে (Jan-March 1926) ছাপা হয়। বঙ্গানুবাদ প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই, ১৩৩২ সালের মাঘ সংখ্যার (১৯২৬) বঙ্গবাণী ও প্রবাসী পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

প্লেটো—প্রাচীন গ্রীক দার্শনিক—সর্বকালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বলে খ্যাত। সক্রেটিসের শিষ্য এবং অ্যারিস্টটলের গুরু। আইডিয়া-ভিত্তিক তদ্‌গত (objective) ভাববাদের প্রবক্তা। এঁর মতে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য এবং পরিবর্তনশীল বস্তুনিচয় সত্য নয়, আইডিয়াই অপরিবর্তনীয় নিত্যসত্য। সত্য ইন্দ্রিয়গম্য নয়, বুদ্ধিগম্য। যাকে আমরা বাস্তব জগৎ বলি, তা নিত্যসত্যের অক্ষম অনুকরণ, অতএব মিথ্যা।

প্লেটোর প্রচারিত কাব্যতত্ত্ব বা শিল্পতত্ত্বকে বলা হয় অনুকরণবাদ। প্লেটোর মতে শিল্প বা কাব্য জগতের বা প্রকৃতির অনুকরণ। যেহেতু প্রকৃতি নিজেই অনুকরণ এবং কাব্য বা শিল্প তার অনুকরণ—অর্থাৎ অনুকরণের অনুকরণ, তাই তা ডবল মিথ্যা। কবিরা সেই ডবল মিথ্যার কারবারী। মিথ্যার বেসাতি ক'রে এই অভিযোগে প্লেটো তাঁর কল্পিত রিপাবলিক থেকে কবি বা শিল্পীদের নির্বাসনের নির্দেশ দিয়েছেন।

জন্ম—খৃঃ পূঃ ৪২৭/২৮ মৃত্যু— ৩৪৭/৪৮

শঙ্করাচার্য—ভারতের বহুখ্যাত ব্রহ্মবাদী দার্শনিক। ৮ম শতকের শেষ দিকে (৭৮৮ খৃঃ ?) জন্ম। বাদরায়ণের ব্রহ্মসূত্রের কেবলাদ্বৈতবাদী বা মায়াবাদী ভাষ্যকার। এঁর মতে ব্রহ্ম ছাড়া আর কিছু সত্য নয়। জগৎ মায়ার সৃষ্টি।

ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যকার হিসাবে শঙ্কর অত্যন্ত বিখ্যাত, কিন্তু আরো কয়েকজন ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যকার ভারতে কয়েকটি প্রতিদ্বন্দ্বী সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করেছেন। যেমন রামানুজ, নিম্বার্ক, মধ্ব, বল্লভ প্রমুখ। এঁরা কেউ-ই শঙ্করের মতো চূড়ান্ত অদ্বৈতবাদী নন, কেউ-ই বলেন নি, জগৎ সম্পূর্ণ মিথ্যা, মানুষ—বা ভক্ত সম্পূর্ণ মিথ্যা। এঁরা সকলেই অল্প-বিস্তর ভক্তিবাদী, একা শঙ্করাচার্যই বিশুদ্ধ জ্ঞানবাদী।

কবীর—মধ্যযুগের প্রসিদ্ধ ভক্তিবাদী সন্ত। রামানন্দের শিষ্য, রামানন্দের অন্যান্য অনুগামীদের মতোই জাতি-প্রথা, পৌত্তলিকতা, তীর্থযাত্রা ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদির বিরোধী। শাস্ত্রগ্রন্থ ও মন্দির-মসজিদের প্রতি আস্থাহীন। মধ্যযুগের অন্যান্য অনেক সাধকদের মতো ধর্মব্যাপারে উদার ও সম্পূর্ণ অসাম্প্রদায়িক। হিন্দু ও মুসলমান দুই সম্প্রদায়েরই শিষ্য কবীরের ছিল। জন্মসূত্রে সম্ভবত মুসলমান জোলা।

জন্ম—আনু.১৪৩৮ খৃ: মৃত্যু- আনু'১৫১৮ খৃ:

শেলি—উনবিংশ শতকের প্রথমমার্ধের বিখ্যাত ইংরেজ রোমান্টিক কবি।

জন্ম—১৭৯২ খৃঃ মৃত্যু—১৮২২ খৃঃ

ব্রাউনিঙ্—ভিক্টোরীয় যুগের বিখ্যাত ইংরেজ কবি।

জন্ম—১৮১২ খৃঃ মৃত্যু—১৮৮৯

বিষয়-সংকেত—

ভারতবর্ষে দর্শন, সাহিত্য, ধর্মতত্ত্ব, অধ্যাত্মতত্ত্ব, সাধনা. সংগীত-এদের খুব পৃথক করা যায় না, একে অপরের সংগে মিলে একাকার। যেমন মহাভারতে সবই একসংগে স্হান পেয়েছে। লোকশিক্ষার নানান সূত্রে এবং গানে গানে দর্শন ও ধর্মতত্ত্বের অধ্যাত্মতত্ত্বের অনেক অমূল্য সম্পদ জনচিত্তে স্হান ক'রে নিয়েছে। মধ্যযুগের সন্ত সাধকেরা অনেকেই শিক্ষিত পদবাচ্য নন। তাঁরাও তত্ত্ববিদ্যা ঘরে ঘরে পৌঁছিয়ে দিয়েছেন। তাঁরা ছিলেন একই সংগে মরমিয়া সাধক ও গীতরসিক। বাংলার বাউলেরাও তাই। গ্রাম্য কবির অসীমেরসাধনা উপনিষদের ঋষির সুগভীর বাণীর সংগে অনায়াসে মিলে যায়। জীবনে পূর্ণতালাভের সহজ পন্হাটি এই ভাবেই ভারতবর্ষে সহজে সাধারণ মানুষের অধিগম্য হতে পেরেছে। জীবনে পূর্ণতার অর্থ একটাই—সে হল সত্যের মধ্যে মুক্তি। সত্যলাভের অর্থই মুক্তিলাভ। আমাদের দেশের অশিক্ষিত গ্রাম্য সাধকেরা জানেন, মুক্তি কোনো আচার-অনুষ্ঠানে নেই, কোনো বাহ্য পন্হায় নেই, সত্যেই মুক্তি, সত্যের সংগে মিলনে যে আনন্দ তা মুক্তির আনন্দ। এ আনন্দ অনির্বচনীয়। আমাদের উপনিষদও এই অনির্বচনীয় আনন্দের কথাই বলেছেন।

আমাদের গ্রামের বাউলেরা বলেন, বাইরের মন আর ভিতরের মনের দ্বন্দ্ব মুক্তির অন্তরায়, এই দ্বন্দ্ব মিটলেই—দুয়ের মিল হলেই মুক্তি। মুক্তি ঐক্যের সাধনে। উপনিষদও এই কথাই বলেছেন: অদ্বৈতবোধের অভাবই মুক্তির অন্তরায়। অহংবোধ—আমি আমার এই ভাব বিচ্ছিন্নতার ভাব। আমাদের গ্রামের সামান্য লোকেরাও জানেন, অহংবোধ মুক্তির বাধা, অহমের বিচ্ছিন্নতা থেকে মুক্তিই আসল মুক্তি। তার সিদ্ধি প্রাণে বিশুদ্ধ আনন্দের প্লাবন এনে দেয়।

শুধু ব্যক্তির ক্ষেত্রে নয়, সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও স্বার্থপরতা, পর-ভাব, এই হল মুক্তির অন্তরায়। মানবের মুক্তির ইতিহাস মানবসম্বন্ধের পূর্ণবিকাশেরই ইতিহাস।

মুক্তির আদর্শ নিষ্ক্রিয়তার আদর্শ নয়—কর্ম ও অনাসক্তির সামঞ্জস্য। অসীম ও সসীমের সমন্বয়সাধনেই পূর্ণতর সত্য। সীমাকে একান্ত করলেও অন্ধকারে পতন, অসীমকে একান্ত করলেও অন্ধকারে পতন। সৃষ্টির ছন্দ দুয়ের মিলনে।

তুলনীয় প্রসঙ্গ :

আত্মবোধ (১০৯), ক্ষিতিমোহন সেন সম্পাদিত 'দাদূ' গ্রন্থের ভূমিকা (১২০), ওরা অন্ত্যজ, ওরা মন্ত্রহীন (১৫৫), কর্মযোগ (১৭৪),

মন্তব্য :

এই অভিভাষণ সম্পর্কে কয়েকটি বিষয় লক্ষণীয়।—

এক, যদিও'টি দর্শনসভার অভিভাষণ, তা হলেও এতে রবীন্দ্রনাথ ধর্ম বা সাধনার কথা দ্বিধাহীনভাবে বলেছেন, কাব্য ও গানের কথাও বলেছেন। ভারতীয় ঐতিহ্যে দর্শন কাব্য সাধনা, এরা একে অপরের আত্মীয় বলে গণ্য। রবীন্দ্রনাথ সেই ধারাতেই কথা বলেছেন।

দুই, ভাষণের গোড়ার দিকে অদ্বৈতের কথা বললেও, একটু এগিয়ে রবীন্দ্রনাথ আর বিশুদ্ধ অদ্বৈতে স্থির থাকেন নি। না থাকাই স্বাভাবিক। উপনিষদের শংকরভাষ্য বা কেবলাদ্বৈতবাদী ভাষ্য দেবেন্দ্রনাথেরও মনঃপূত ছিল না, রবীন্দ্রনাথেরও মনঃপূত নয়। অদ্বৈতের মধ্যে দ্বৈত, এই ভাবটি রবীন্দ্রনাথের চিন্তায় স্পষ্ট। অনুভবে, অর্থাৎ কবিতায় গানে তা স্পষ্টতর। এই ভাষণেও তার আভাস পাওয়া যাবে।

তিন, উপনিষদাশ্রিত অদ্বৈতসাধনাকেই রবীন্দ্রনাথ ভারতধর্ম বা ভারতবর্ষীয় সাধনা বলে ঘোষণা করেছেন। ভারতবর্ষে যে আরো অনেক রকমের দর্শন ও ধর্মসাধনা আছে, হিন্দুধর্মের মধ্যেও, হিন্দুধর্মের বাইরেও, রবীন্দ্রনাথ তাদের গণ্য করেন নি। প্রাগার্য নরগোষ্ঠীর ধর্ম, বিভিন্ন অঞ্চলের নানা আদিবাসী-উপজাতির ধর্ম, পার্শীদের ধর্ম, খৃষ্টানধর্ম ও শিখ-ধর্ম, অথবা বৌদ্ধ কি জৈনধর্ম কিংবা ইসলামধর্ম—এর কোনো টিকেই রবীন্দ্রনাথ এখানে ভারতবর্ষীয় ধর্মসাধনার প্রসঙ্গে স্মরণ করেন নি। এর মধ্যে কি কোনো অলক্ষ্য হিন্দুপ্রভাব ক্রিয়া করেছে ? খৃষ্টানধর্ম বৌদ্ধধর্ম ইসলামধর্ম, এদের কারো প্রসারই ভারতে আবদ্ধ নয়। এরা কেউই একান্তভাবে ভারতধর্ম না হতে পারে, কিন্তু ভারতেও তো এরা অসত্য নয়। দর্শনের প্রসঙ্গে এদের অনেককেই হয়তো বাদ দেওয়া যায়, কিন্তু ভারতবর্ষের ধর্মসাধনার প্রসঙ্গে এদের সকলকেই একেবারে পাশ কাটিয়ে যাওয়া কি সংগত ?

চার, মধ্যযুগের ভক্তিবাদী সন্তদের, মরমিয়া সাধকদের উপদেশে ও গানে রবীন্দ্রনাথ উপনিষদের অদ্বৈতসাধনার সত্যকে দেখতে পেয়েছেন। শুধু তা-ই নয়, পরবর্তীকালের গ্রাম্য বাউল-দরবেশদের গানেও রবীন্দ্রনাথ উপনিষদের অদ্বৈততত্ত্বের সন্ধান পেয়েছেন। এখানে প্রশ্ন উঠবে : উপনিষদের সঙ্গে বাউলের তত্ত্বের এই মিল কি মর্মগত মিল ? বাউলের তত্ত্বে আরো অনেক উৎস থেকে নানা বিচিত্র উপাদান এসে মিশেছে, তাদের কি কোনো শক্তি, কোনো প্রভাবই নেই। ভারতের লৌকিক ধর্মসাধনাকে কি উচ্চমার্গের শিষ্টজনের তত্ত্বের সঙ্গে এইভাবে মিলিয়ে দেওয়া যায় ? বাউলে উপনিষদে সমন্বয় কি একটু কষ্ট-কল্পিত সমন্বয় নয় ?

আমরা জানি, রবীন্দ্রনাথ অসামান্য সমন্বয়-সাধক। আবার আমরা এ-ও জানি, রবীন্দ্রনাথ যাকে গ্রহণ করেন তাকে নিজের মনোমতো করে নিয়েই গ্রহণ করেন— খানিকটা রবীন্দ্রায়িত করে নিয়েই গ্রহণ করেন। এই কারণেই অন্তত আপাতদৃষ্টিতে

সমন্বয় সহজ হয়। এখানে উপনিষদের সমুন্নত সুমার্জিত দার্শনিক তত্ত্ব আর বাউলের লৌকিক ভাবনা কি এই কারণেই মিলতে পেরেছে যে রবীন্দ্র সান্নিধ্যে দুয়েরই খানিকটা রবীন্দ্রায়ণ ঘটে গিয়েছে? অথবা কি প্রকৃতপক্ষে সমন্বয়টাই সিদ্ধ হয় নি?

আমরা জানি, উপনিষদে রবীন্দ্রনাথের উত্তরাধিকার প্রশ্নাতীত, উপনিষদে তাঁর আকর্ষণও দৃঢ়, শ্রদ্ধাও সুগভীর। আবার এ-ও জানি, বাউল এবং গ্রাম কবিদের প্রতি রবীন্দ্রনাথের টানও প্রচুর। বিশেষ করে শেষের দিকে এই টান রবীন্দ্রনাথের মনে নিজের জন্য একটি তত্ত্বগত ভিত্তিও রচনা করে তুলেছিল। বাউলেরা একদিকে যেমন ব্রাত্য, অন্যদিকে তেমনি মধুর-রসের সাধক। এই কারণে শেষের দিকে রবীন্দ্রনাথ বাউলদের নিজের আত্মীয় বলেই গণ্য করেছেন। এমন কি হতে পারে না যে, রবীন্দ্রনাথ এদের দুয়ের কাউকেই ছাড়তে চান না? দুয়ের কোনোটিকেই ছাড়তে চান না বলেই কি দুই ভিন্ন ভাবভূমির উভয়কে রাখতে চান বলেই কি তাদের ভিন্নতাকে অগ্রাহ্য করেছেন—ভাবনার মধ্যে দুয়ের এমন মসৃণ একাকার ঘটিয়ে দিয়েছেন? নইলে কোথায়-বা ঔপনিষদিক ব্রহ্মের পিতৃভাব, সুগম্ভীর ব্রহ্মধ্যান, আর কোথায়-বা সূফীতে সহজিয়ায় বৈষ্ণবে দরবেশে আউলে সাঁই-ভজাতে মেশানো বাউলদের অনতিপ্রচ্ছন্ন কায়াসাধনা, সহজিয়াদের মতো রূপে স্বরূপ আরোপ করা, প্রাকৃতধর্মী রস-সাধনা, ক্ষ্যাপা-ক্ষেপীর নাচ আর গান। বাউলের ব্রাত্য পন্থায় আর উপনিষদের ভাবগম্ভীর শিষ্টজনোচিত পন্থায় কোনো দোটানা যদি রবীন্দ্রনাথের থেকেও থাকে, শেষের দিকে কিন্তু গ্রামপ্রান্তের রাঙা মাটির পথের টানটাই রবীন্দ্রনাথের বেশি হয়ে উঠেছিল। বর্তমান অভিভাষণের দশ বছর পরে, পত্রপুট বইয়ের ১৫ সংখ্যক কবিতা, 'ওরা অন্ত্যজ, ওরা মন্ত্রবর্জিত' কবিতাটিতে (১৮ বৈশাখ ১৩৪৩, ইং ১৯৩৬, সংকলনের ১৫৫ নং রচনা) রবীন্দ্রনাথ সম্পূর্ণ দ্বিধাহীন কন্ঠে ঘোষণা করেছেন যে, প্রচলিত কোনো শিষ্ট ধর্মসাধনায় এখন আর তাঁর আস্থা নেই, ধর্মগ্রন্থে যাঁর কথা পড়েছেন এবং এতদিন যাঁর পূজার প্রয়াস করেছেন নিরন্তর, আজ দেখছেন তা প্রমাণ হয় নি তাঁর নিজের জীবনে। এই কবিতায় তিনি স্পষ্ট করে এবং জোর দিয়ে বলেছেন, তিনি বাউলদেরই স্ববর্ণ, তিনিও তাঁদেরই মতো ব্রাত্য এবং মন্ত্রবর্জিত। বলেছেন দেবতার কথা নয়, চিরকালের মানুষের কথা, সকল মানুষের মানুষ যে, তাঁর কথা। কবিতার শেষের সহজ প্রত্যয়ে বলেছেন, দুটি মাত্র সত্য এখন তাঁর কাছে বরণীয়: এক—আলোকের প্রকাশ, যাকে বলা যায় সৃষ্টির রহস্য। আর দুই হল—ভালোবাসার অমৃত। এর মধ্যে নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত ব্রহ্ম কোথায়? একটিতে আছে রূপের উৎসার, সৃজনশীলতার সত্য, অন্যটিতে আছে প্রেমের ঐশ্বর্য, মিলনের মাধুর্য। কোনোটিই তুরীয় অর্থে নয়, জীবনের কাছাকাছি থেকেই—মানবিক অর্থে। শেষের দিকে এই মানবিকতাই রবীন্দ্রনাথের ভাবনাবেদনায় চরম হয়ে উঠেছে।

প্রশ্ন উঠতে পারে, রবীন্দ্রনাথের এই মানুষ কি একান্তই ধুলোমাটির মানুষ? রবীন্দ্রনাথ ইতিহাসের মানুষের কথা বলেছেন, মানবসমগ্রতার কথা বলেছেন, চিরকালের মানুষের কথা বলেছেন, সকল মানুষের মানুষ যিনি তাঁর কথাও বলেছেন। এর মধ্যে দিয়ে অলক্ষ্যে কি মানুষের দেবায়ন বা apotheosis ঘটে গিয়েছে? নইলে শুধু মানুষ না বলে রবীন্দ্রনাথ 'মানবব্রহ্ম' বলবেন কেন? মানবব্রহ্ম কি সমগ্র সত্তার, যাম্বিভাতি-র সমার্থক? হোক না হোক, এ কি কোনো নতুন ধর্ম? দর্শন হতে পারে, কিন্তু এর মধ্যে সেই গভীর

আধ্যাত্মিক উপলব্ধি কোথায়, সাধকের দিক থেকে সেই বিগলিত আত্মসমর্পণের আবেগ কোথায় ধর্মের কাছে যা সব সময় প্রত্যাশিত ? অথবা এ কি আত্মবিস্মৃত প্রচ্ছন্ন নাস্তিকতা ? আত্মবিস্মৃত বলেই এতটা প্রচ্ছন্ন ?

অন ভ্যস্ত বলেই কি কিছুটা কুণ্ঠিত এবং কুণ্ঠিত বলেই কি এতটা প্রচ্ছন্ন ? অথবা কি মানব.... ছদ্মবেশে নির্বাসিত ব্রহ্মাই আবার ফিরে এলেন ? বলা কঠিন।

১৮৭। ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়কে পত্র

আর্যাবর্ত, অগ্রহায়ণ ১৩১৮ (১৯১১)

...সাহিত্যের দিক দিয়া আপনি অচলায়তনের উপর যে রায় লিখিয়াছেন তাহার বিরুদ্ধে আপনার নিকট আমি কোনো আপিল রুজু করিব না। আপনি যে ডিগ্রী দিয়াছেন সে আমার যথেষ্ট হইয়াছে। কিন্তু ওই-যে একটা উদ্দেশ্যের কথা তুলিয়া আমার উপরে একটা মস্ত অপরাধ চাপাইয়াছেন সেটা আমি চুপচাপ করিয়া মানিয়া লইতে পারি না। কেবলমাত্র ঝোঁক দিয়া পড়ার দ্বারা বাক্যের অর্থ দুই-তিন-রকম হইতে পারে। কেনো কাব্য বা নাটকের উদ্দেশ্যটা সাহিতিক বা অসাহিত্যিক তাহাও কোনো কোনো স্থলে ঝোঁকের দ্বারা সংশয়াপন্ন হইতে পারে। পাখি পিঞ্জরের বাহিরে যাইবার জন্য ব্যাকুল হইতেছে ইহা কাব্যের কথা, কিন্তু পিঞ্জরের নিন্দা করিয়া খাঁচাওয়ালার প্রতি খোঁচা দেওয়া হইতেছে এমনভাবে সুর করিয়াও হয়তো পড়া যাইতে পারে। মুক্তির জন্য পাখির কাতরতাকে ব্যক্ত করিতে হইলে খাঁচার কথাটা একেবারেই বাদ দিলে চলে না। পাখির বেদনাকে সত্য করিয়া দেখাইতে হইলে খাঁচার বন্ধতা ও কঠিনতাকে পরিস্ফুট করিতেই হয়।

জগতের যেখানেই ধর্মকে অভিভূত করিয়া আচার আপনি বড়ো হইয়া উঠে,সেখানেই মানুষের চিত্তকে সে রুদ্ধ করিয়া দেয়, এটা একটা বিশ্বজনীন সত্য। সেই রুদ্ধ চিত্তের বেদনাই কাব্যের বিষয়, এবং আনুষঙ্গিক ভাবে শুষ্ক আচারের কদর্যতা স্বতই সেই সঙ্গে ব্যক্ত হইতে থাকে।

ধর্মকে প্রকাশ করিবার জন্য, গতি দিবার জন্যই, আচারের সৃষ্টি; কিন্তু কালে কালে ধর্ম যখন সেই-সমস্ত আচারকে নিয়মসংযমকে অতিক্রম করিয়া বড়ো হইয়া উঠে, অথবা ধর্ম যখন সচল নদীর মতো আপনার ধারাকে অন্য পথে লইয়া যায়, তখন পূর্বতন নিয়মগুলি অচল হইয়া শুষ্ক নদীপথের মতো পড়িয়া থাকে—বস্তুত তখন তাহা তপ্ত মরুভূমি, তৃষাহারা তাপনাশিনী স্রোতস্বিনী সম্পূর্ণ বিপরীত। সেই শুষ্ক পথটাকেই সনাতন বলিয়া সম্মান করিয়া নদীর ধারার সন্ধান যদি একেবারে পরিত্যাগ করা যায় তবে মানবত্মাকে পিপাসিত করিয়া রাখা হয়। সেই পিপাসিত মানবাত্মার ক্রন্দন কি সাহিত্যে প্রকাশ করা হইবে না, পাছে পুরাতন নদীপথের প্রতি অনাদর দেখানো হয়?

আপনি যাহা বলিয়াছেন সে কথা সত্য। সকল ধর্মসমাজেই এমন অনেক পুরাতন প্রথা সঞ্চিত হইতে থাকে যাহার ভিতর হইতে প্রাণ সরিয়া গিয়াছে। অথচ চিরকালের

অভ্যাস-বশত মানুষ তাহাকেই প্রাণের সামগ্রী বলিয়া আঁকড়িয়া থাকে—তাহাতে কেবলমাত্র তাহার অভ্যাস তৃপ্ত হয়, কিন্তু তাহার প্রাণের উপবাস ঘুচে না—এমনি করিয়া অবশেষে এমন একদিন আসে যখন ধর্মের প্রতিই তাহার অশ্রদ্ধা জন্মে—এ কথা ভুলিয়া যায় যাহাকে সে আশ্রয় করিয়াছিল তাহা ধর্মই নহে, ধর্মের পরিত্যক্ত আবর্জনা মাত্র।

এমন অবস্থায় সকল দেশেই সকল কালেই মানুষকে কেহ-না-কেহ শুনাইয়াছে যে, আচারই ধর্ম নহে, বাহ্যিকতায় অন্তরের ক্ষুধা মেটে না এবং নিরর্থক অনুষ্ঠান মুক্তির পথ নহে, তাহা বন্ধন। অভ্যাসের প্রতি আসক্ত মানুষ কোনো দিন এ কথা শুনিয়া খুশি হয় নাই এবং যে এমন কথা বলে তাহাকে পুরস্কৃত করে নাই—কিন্তু ভালো লাগুক আর না লাগুক এ কথা তাহাকে বারংবার শুনিতেই হইবে।

প্রত্যেক মানুষের একটা অহং আছে; সেই অহং-এর আবরণ হইতে মুক্ত হইবার জন্য সাধকমাত্রেরই একটা ব্যগ্রতা আছে। তাহার কারণ কী। তাহার কারণ এই, মানুষের নিজের বিশেষত্ব যখন তাহার অপনাকেই ব্যক্ত করিতে থাকে, আপনার চেয়ে বড়োকে নহে, তখন সে আপনার অস্তিত্বের উদ্দেশ্যকেই ব্যর্থ করে। আপনার অহংকার, আপনার স্বার্থ, আপনার সমস্ত রাগদ্বেষকে ভেদ করিয়া ভক্ত যখন আপনার সমস্ত চিন্তায় ও কর্মে ভগবানের ইচ্ছাকে ও তাঁহার আনন্দকেই প্রকাশ করিতে থাকেন তখন তাঁহার মানবজীবনে সার্থক হয়।

ধর্মসমাজেরও সেইরূপ একটা অহং আছে। তাহার অনেক রীতি-পদ্ধতি নিজেকেই চরমরূপে প্রকাশ করিতে থাকে। চিরন্তনকে আচ্ছন্ন করিয়া নিজের অহংকারকেই সে জয়ী করে। তখন তাহাকে পরাভূত করিতে না পারিলে সত্যধর্ম পীড়িত হয়। সেই পীড়া যে সাধক অনুভব করিয়াছে সে এমন গুরুকে খোঁজে যিনি এই-সমস্ত সামাজিক অহংকে অপসারিত করিয়া ধর্মের মুক্ত স্বরূপকে দেখাইয়া দিবেন। মানবসমাজে যখনই কোনো গুরু আসিয়াছেন তিনি এই কাজই করিয়াছেন।

আপনি প্রশ্ন করিয়াছেন, উপায় কী। 'শুধু আলো, শুধু প্রীতি' লইয়াই কি মানুষের পেট ভরিবে। অর্থাৎ আচার-অনুষ্ঠানের বাধা দূর করিলেই কি মানুষ কৃতার্থ হইবে। তাই যদি হইবে তবে ইতিহাসে কোথাও তাহার কোনো দৃষ্টান্ত দেখা যায় না কেন।

কিন্তু এরূপ প্রশ্ন কি অচলায়তনের লেখককে জিজ্ঞাসা করা ঠিক হইয়াছে। অচলায়তনের গুরু কি ভাঙিবার কথাতেই শেষ করিয়াছেন। গড়িবার কথা বলেন নাই? পঞ্চক যখন তাড়াতাড়ি বন্ধন ছাড়াইয়া উধাও হইয়া যাইতে চাহিয়াছিল তখন তিনি কি বলেন নাই 'না, তা যাইতে পারিবে না—যেখানে ভাঙা হইল এইখানেই আবার প্রশস্ত করিয়া গড়িতে হইবে'? গুরুর আঘাত নষ্ট করিবার জন্য নহে বড়ো করিবার জন্যই। তাঁহার উদ্দেশ্য ত্যাগ করা নহে, সার্থক করা। মানুষের স্থূল দেহ যখন মানুষের মনকে অভিভূত করে তখন সেই দেহগত রিপুকে আমরা নিন্দা করি, কিন্তু তাহা হইতে কি প্রমাণ হয় প্রেতত্ব লাভই মানুষের পূর্ণতা। স্থূল দেহের প্রয়োজন আছে। কিন্তু সেই দেহ মানুষের উচ্চতর সত্তার বিরোধী হইবে না, তাহার অনুগত হইবে, এ কথা বলার দ্বারা দেহকে নষ্ট করিতে বলা হয় না।

অচলায়তনে মন্ত্রমাত্রের প্রতি তীব্র শ্লেষ প্রকাশ করা হইয়াছে এ কথা কখনোই সত্য হইতে পারে না, যেহেতু মন্ত্রের সার্থকতা সম্বন্ধে আমার মনে কোনো সন্দেহ নাই। কিন্তু মন্ত্রের যথার্থ উদ্দেশ্য মননে সাহায্য করা। ধ্যানের বিষয়ের প্রতি মনকে অভিনিবিষ্ট করিবার উপায় মন্ত্র। আমাদের দেশে উপাসনার এই-যে আশ্চর্য পন্থা সৃষ্ট হইয়াছে, ইহা ভারতবর্ষের বিশেষ মাহাত্ম্যের পরিচয়।

কিন্ত সেই মন্ত্রকে মনন-ব্যাপার হইতে যখন বাহিরে বিক্ষিপ্ত করা হয়, মন্ত্র যখন তাহার উদ্দেশ্যকে অভিভূত করিয়া নিজেই চরম পদ অধিকার করিতে চায়, তখন তাহার মতো মননের বাধা আর কী হইতে পারে কতকগুলি বিশেষ শব্দসমষ্টির মধ্যে কোনো অলৌকিক শক্তি আছে, এই বিশ্বাস যখন মানুষের মনকে পাইয়া বসে তখন সে আর সেই শব্দের উপরে উঠিতে চায় না। তখন মনন ঘুচিয়া গিয়া সে উচ্চারণের ফাঁদেই জড়াইয়া পড়ে। তখন চিত্তকে যাহা মুক্ত করিবে বলিয়াই রচিত তাহাই চিত্তকে বদ্ধ করে। এবং ক্রমে দাঁড়ায় এই, মন্ত্র পড়িয়া দীর্ঘ জীবন লাভ করা, মন্ত্র পড়িয়া শত্রু জয় করা ইত্যাদি নানাপ্রকার নিরর্থক দুশ্চেষ্টায় মানুষের মূঢ় মন প্রলুব্ধ হইয়া ঘুরিতে থাকে। এইরূপে মন্ত্রই যখন মননের স্থান অধিকার করিয়া বসে তখন মানুষের পক্ষে তাহা অপেক্ষা শুষ্ক জিনিস আর কী হইতে পারে। যেখানে মন্ত্রের এরূপ ভ্রষ্টতা সেখানে মানুষের দুর্গতি আছেই। সেই-সমস্ত কৃত্রিম বন্ধন-জাল হইতে মানুষ আপনাকে উদ্ধার করিয়া ভক্তির সজীবতা ও সরসতা-লাভের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠে, ইতিহাসে বারংবার ইহার প্রমাণ দেখা গিয়াছে। যাগযজ্ঞ মন্ত্রতন্ত্র যখনই অত্যন্ত প্রবল হইয়া মানুষের মনকে চারি দিকে বেষ্টন করিয়া ধরে তখনইতো মানবের গুরু মানবের হৃদয়ের দাবি মিটাইবার জন্য দেখা দেন; তিনি বলেন, পাথরের টুকরা দিয়া রুটির টুকরার কাজ চালানো যায় না, বাহ্য অনুষ্ঠানকে দিয়া অন্তরের শূন্যতা পূর্ণ করা চলে না। কিন্তু তাই বলিয়া এ কথা কেহই বলে না যে, মন্ত্র যেখানে মননের সহায়, বাহিরের অনুষ্ঠান যেখানে অন্তরের ভাবস্ফূর্তির অনুগত, সেখানে তাহা নিন্দনীয়। ভাব তো রূপকে কামনা করে, কিন্তু রূপ যদি ভাবকে মারিয়া একলা রাজত্ব করিতে চায় তবে বিধাতার দণ্ডবিধি অনুসারে তাহার কপালে মৃত্যু আছেই। কেননা, সে যত দিনই বাঁচিবে তত দিনই কেবলই মানুষের মনকে মারিতে থাকিবে। ভাবের পক্ষে রূপের প্রয়োজন আছে বলিয়াই রূপের মধ্যে লেশমাত্র অসতীত্ব এমন নিদারুণ। যেখানেই সে নিজেকে প্রবল করিতে চাহিবে সেইখানেই সে নির্লজ্জ, সে অকল্যাণের আকর। কেননা, ভাব যে রূপকে টানিয়া আনে সে যে প্রেমের টান, আনন্দের —রূপ যখন সেই ভাবকে চাপা দেয় তখন সে সেই প্রেমকে আঘাত করে, আনন্দকে আচ্ছন্ন করে—সেইজন্য যাহারা ভাবের ভক্ত তাহারা রূপের এইরূপ ভ্রষ্টাচার একেবারে সহিতে পারে না। কিন্তু রূপে তাহাদের পরমানন্দ, যখন ভাবের সঙ্গে তাহার পূর্ণ মিলন দেখে। কিন্তু শুধু রূপের দাসখত মানুষের সকলের অধম দুর্গতি। যাঁহারা মহাপুরুষ তাহারা মানুষকে এই দুর্গতি হইতেই উদ্ধার করিতে আসেন। তাই অচলায়তনে এই আশার কথাই বলা হইয়াছে যে, যিনি গুরু তিনি সমস্ত আশ্রয় ভাঙিয়া চুরিয়া দিয়া একটা শূন্যতা বিস্তার করিবার জন্য আসিতেছেন না; তিনি স্বভাবকে জাগাইবেন, অভাবকে ঘুচাইবেন, বিরুদ্ধকে মিলাইবেন; যেখানে অভ্যাসমাত্র আছে সেখানে লক্ষ্যকে উপস্থিত করিবেন, এবং যেখানে তপ্ত বালুবিছানো খাদ পড়িয়া আছে মাত্র সেখানে

প্রাণপরিপূর্ণ রসের ধারাকে বহাইয়া দিবেন। এ কথা কেবল যে আমাদেরই দেশের সম্বন্ধে খাটে না তাহা নহে; ইহা সকল দেশেই সকল মানুষেরই কথা। অবশ্য এই সর্বজনীন সত্য অচলায়তনে ভারতবর্ষীয় রূপ ধারণ করিয়াছে; তাহা যদি না করিত তবে উহা অপাঠ্য হইত।...

ইতি ৩রা অগ্রহায়ণ ১৩১৮, শান্তিনিকেতন।

টীকা :

ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়কে পত্র—১৩১৮ সালের আশ্বিন মাসের 'প্রবাসী পত্রিকায় 'অচলায়তন' নাটকটি প্রকাশিত হয়। অধ্যাপক ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 'আর্যাবর্ত' মাসিক পত্রিকায় (কার্তিক ১৩১৮) এর একটি সমালোচনা প্রকাশ করেন। রবীন্দ্রনাথ সেই সমালোচনার উত্তর দিয়েছিলেন এই পত্রটিতে। প্রায় একই সময়ে 'অচলায়তন' প্রকাশে হিন্দুসমাজের তরফ থেকে প্রতিবাদের বিষয় অনুরূপ কিন্তু অপেক্ষাকৃত ছোট একটি চিঠি (৭ অগ্রহায়ণ ১৩১৮) রবীন্দ্রনাথ অমল হোমকেও লেখেন [ভূমিকা দ্রষ্টব্য]।

অচলায়তন

১৯২২ সালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। প্রথম প্রকাশ—প্রবাসী পত্রিকায় ১৩১৮ আশ্বিন (১৯১১) সংখ্যায়।

ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়—

বঙ্গবাসী কলেজের অধ্যাপক ছিলেন। হাস্যরসাত্মক রচনায় বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ—পাগলা ঝোরা, ফোয়ারা ইত্যাদি।

জন্ম—১২৭৫; মৃত্যু—১৩৩৬।

নির্দেশিকা

নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জী

সাধারণভাবে–

রবীন্দ্ররচনাবলী – বিশ্বভারতী/পশ্চিমবঙ্গ সরকার

বিশেষভাবে–

ধর্ম – রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আলোচনা – ,,

ছিন্নপত্রাবলী ।

সাধারণভাবে–

রবীন্দ্ররচনাবলী – বিশ্বভারতী/পশ্চিমবঙ্গ সরকার

বিশেষভাবে–

ধর্ম – রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আলোচনা – ,,

ছিন্নপত্রাবলী – ,,

শান্তিনিকেতন, ১ম ও ২য় খন্ড – ,,

নৈবেদ্য – ,,

জীবনস্মৃতি – ,,

আত্মপরিচয় – ,,

মানুষের ধর্ম – ,,

চারিত্রপূজা – ,,

চিঠিপত্র-৯ম (হেমন্তবালা দেবীকে) – ,,

গীতবিতান – ,,

Sadhana – ,,

Creative Unity – ,,

Personality – ,,

Religion of Man – ,,

Man – ,,

Religion of an Artist – ,,

রবীন্দ্রজীবনী, ৪ খন্ড – প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

রবীন্দ্রনাথের ধর্মচিন্তা – তারকনাথ ঘোষ

ধর্মপথিক রবীন্দ্রনাথ – বীরেন্দ্র কুমার ঘোষ

রবীন্দ্রসাহিত্যে ধর্মচেতনা – স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ

রবীন্দ্রনাথের ধর্মদর্শন – প্রতিমা রায়

রবীন্দ্রনাথের ধর্ম – মনোরঞ্জন জানা

রবীন্দ্রনাথের জীবনবেদ – সত্যেন্দ্রনারায়ণ মজুমদার

রবীন্দ্রচেতনায় মানবধর্ম – তুষারকণা রায়

মানবধর্ম ও রবীন্দ্রনাথ – সাধনা সরকার

উপনিষদের পটভূমিকায় রবীন্দ্রমানস – শশীভূষণ দাশগুপ্ত

Ranindranath Tagore, Poet and Dramatist — Edward Thompson
Rabindranath Tagore, A Biography — Krishna Kripalani
Life and letters of Raja Rammohun Roy — S.D. Collet
Henry Derozio — Thomas Edwards
Introduction to the Science of Religion — Max Muler
Religion and Philosophy of the Veda — A.B. Keith
Indian Theism — M. Macnicol
The Living Religion of Indian People
Religious Thought and Life in India — Monier Williams
Hinduism — Ed. Lous Renoiu
Hinduism — Nirad C. Choudhuri
Modern Religious Movements in India — N. Farquhar
Religious Movements in Bengal — Benoy Gopal Roy
Dhammapada — Ed. S. Radhakrishnan
Islam — Alfred Guillaume
The Way of the Sufi — Idris Shah
Medieval Mysticism of India — K.M. Sen
Mysticism — Sisir Kumar Ghosh
A History of Indian Philosophy 5 vols. — S.N. Das Gupta
The Mothers — R. Briffault
Future of an Illusion — S. Freud
Civilisation and Its Discontents
Studies in Bengal Renaissance — Ed. Atulchandra Gupta
History of the Brahmo Samaj — Sibnath Sastri
British Orientalism and Bengal Renaissance — David Kopf

রবীন্দ্রনাথের চিন্তাজগৎ

আধুনিকতা ও রবীন্দ্রনাথ	আবু সয়ীদ আইয়ুব
পান্থজনের সখা	
পথের শেষ কোথায়	
এ আমির আবরণ	শঙ্খ ঘোষ
নির্মাণ আর সৃষ্টি	"
কবি মানসী	জগদীশ ভট্টাচার্য
রবীন্দ্রশিল্পে প্রেমচৈতন্য ও বৈষ্ণবভাবনা	সুকুমার সেন
রবীন্দ্রনাথ ধর্ম ও সমাজ	নগেন্দ্রচন্দ্র শ্যাম
রবীন্দ্রনাথ ও সংস্কৃতি সাহিত্য	কল্যাণীশঙ্কর ঘটক
রবীন্দ্রনাথের বিশ্বাসের জগৎ	সত্যেন্দ্রনাথ রায়
সৃষ্টি ও মননের নানা দিকে রবীন্দ্রনাথ	"
রবীন্দ্র-রচনাবীক্ষা	দেবব্রত মল্লিক
বিশ্বকোষ	নগেন্দ্রনাথ বসু
ভারতকোষ, ৫খণ্ড	বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ
রবীন্দ্রসাহিত্যে পদাবলীর স্থান	বিমান বিহারী মজুমদার
উপনিষদ	হীরেন্দ্রনাথ দত্ত
উপনিষদ্	বিধুশেখর শাস্ত্রী
উপনিষদের আলো	মহেন্দ্রনাথ সরকার
বেদান্ত ও সূফী দর্শন	রমা চৌধুরী
অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ	সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ
ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায়	অক্ষয়কুমার দত্ত
চৈতন্যচরিতামৃত	কৃষ্ণদাস কবিরাজ
বাংলায় বৈষ্ণব ধর্ম	প্রমথনাথ তর্কভূষণ
Comparative Religion (Lectures on)	A.A. Macdonell
Eastern Religion and Western Thought	S.Radhakrishnan
Hymns of the Alvars	J.S.M. Hooper
Vaisnavism, Saivism and Minor Religious Systems	R.G. Bandarkar
The Philosophy of Vaisnava Raligion	Girindra Narayan Mallik
Bengal Vaisnavism	Bipinchandra Pal
Early History of Vaisnava Faith and Movement	S.K. De

ধর্মচিন্তা

শান্তিনিকেতন ভাষণাবলী	–	হিরন্ময় বন্দোপাধ্যায়
রবীন্দ্রসংস্কৃতির ভারতীয় রূপ ও উৎস	–	পম্পা মজুমদার
রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে বৌদ্ধধর্ম	–	অমূল্য সেন
বৌদ্ধধর্ম ও রবীন্দ্রনাথ	–	আশা দাশ
রবীন্দ্রনাথ ও বৌদ্ধসংস্কৃতি	–	শুধাংশুবিমল বড়ুয়া
পালিভাষা-সাহিত্য বৌদ্ধদর্শন ও রবীন্দ্রনাথ	–	রাধারমণ জানা
উপনিষৎ গ্রন্থাবলী (নানাখন্ড)	–	উদ্বোধন
উপনিষৎ-প্রসঙ্গ (নানাখন্ড)	–	অনির্বাণ
উপনিষদের দর্শন	–	হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা		
ভগবান বুদ্ধ	–	ধর্মানন্দ কোসম্বী
ধম্মপদ-পরিচয়	–	প্রবোধচন্দ্র সেন
ভারতীয় ধর্মের ইতিহাস	–	নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য
কোরাণ (৫ খন্ড-বঙ্গানুবাদ)	–	আবু তাহের
রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দ	–	আদিত্য মজুমদার
ভারতীয় ও ইসলাম	–	সুরজিত দাশগুপ্ত
ভারতীয় মধ্যযুগে সাধনার ধারা	–	ক্ষিতিমোহন সেন
ভারত সংস্কৃতি	–	
ভারতে হিন্দুমুসলমানের যুক্ত সাধনা	–	
বংলার বাউল	–	
দাদূ	–	
রামমোহন গ্রন্থাবলী, ৭ খন্ড	–	বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ
মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের জীবন চরিত	–	নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়
রামমোহন-সমীক্ষা	–	দিলীপকুমার বিশ্বাস
নবযুগের বাংলা	–	বিপিনচন্দ্র পাল
চরিত-চিত্র	–	"
স্বরচিত জীবনচরিত (আত্মজীবনী)	–	দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর
ব্রাহ্মধর্ম গ্রন্থ	–	"
মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর	–	অজিতকুমার চক্রবর্তী
ধর্মতত্ত্ব	–	বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
কৃষ্ণচরিত্র	–	
রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ	–	শিবনাথ শাস্ত্রী
রবীন্দ্রনাথ	–	অজিতকুমার চক্রবর্তী
রবীন্দ্রনাথ	–	সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত
বিবেকানন্দ রচনাসমগ্র (অখন্ড)	–	বিবেকানন্দ (নবপত্র)

Brahmo Samaj and the
Shaping of Modern Indian
Mind
Brahmo Reform Movement